বিনীত বাজপেয়ী

প্রথা

কার্স অব দ্য ব্লাড রিভার

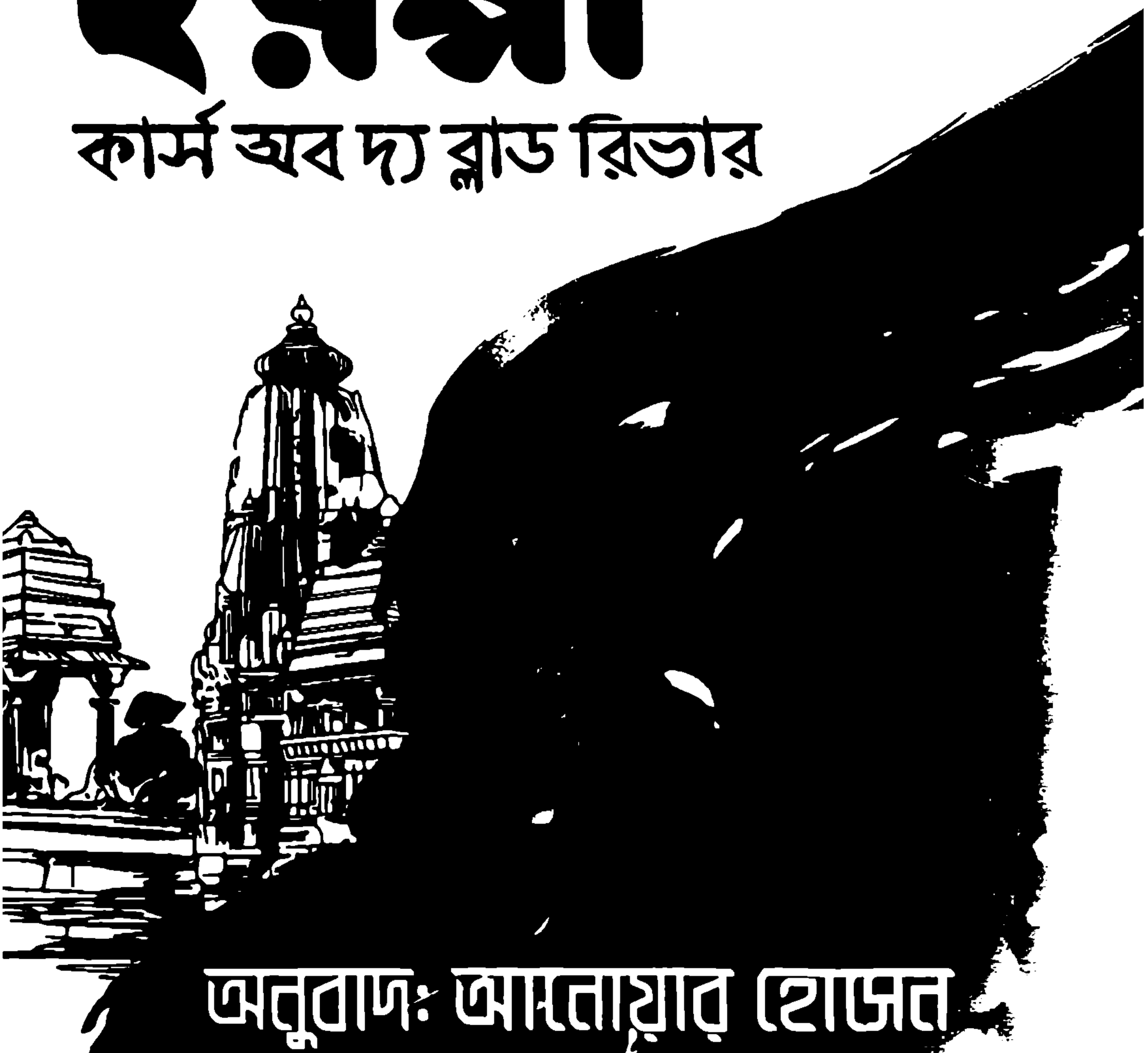

অনুবাদ: আনোয়ার হোজেন

হরপ্পা : কার্স অব দ্য ব্লাড রিভার

হরপ্পা : কার্স অব দ্য ব্লাড রিভার

বিনীত বাজপায়ী

অনুবাদ : আনোয়ার হোসেন

সম্পাদনা : আশরাফুল সুমন

নয়া উদ্যোগ

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর ২০২১

প্রকাশক

নয়া উদ্যোগ

সাফায়েত খন্দকার

৩৮/এ, হাজী এন আলী টাওয়ার (২য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

© প্রকাশক

প্রচ্ছদ

আদনান আহমেদ রিজন

অক্ষর বিন্যাস

আপন কম্পিউটার্স

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

আমানত প্রিন্টার্স

৫/৬ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন

দাম : ৩৮০.০০ টাকা

ISBN 978-984-95727-7-0

Harappa : Curse of the Blood River

by Vineet Bajpai, Translated by Anower Hossian

Published by Naya Udyog, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100

First Published : November 2021, Cover Design : Adnan Ahmed Rizon

Price : 380.00 Taka Only

U.S.A. Distributor ❑ **Muktadhara**

37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372

Kolkata Distributor ❑ **Jeet International, Kolkata, Phone : +917003779462**

উৎসর্গ

এফ এম শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড,
ত্রিশাল শাখা, ময়মনসিংহ

সূচনা
২০১৭, নয়া দিল্লি

মৃত্যুসজ্জায় থাকা ১০৮ বছর বয়সি দাদার কাছ থেকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ডাক পেল বিদ্যুৎ শাস্ত্রী নামে এক তরুণ উদ্যোক্তা। প্রাচীন ভারতীয় শহর কাশী (বানারস)-এর বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষ বা গোত্র প্রধান বিদ্যুৎকে ঘিরে থাকা একটা প্রাগৈতিহাসিক গোপন অভিশাপের কথা বলে যেতে চান। এমন একটা অভিশাপ যা হাজার হাজার বছর আগে কেবল একটা পুরো সভ্যতাকেই ধ্বংস করে দেয়নি, মুছে দিয়েছে একটা চরম সত্যকেও।

অন্তত এখনো পর্যন্ত।

বানারসের শিব মন্দিরের গোলক ধাঁধার চক্করে লুকোনো কোনো এক ভূগর্ভস্থ সিন্দুকের উত্তরাধিকারসূত্রে রক্ষক মৃত্যুপথযাত্রী এই ব্রাহ্মণ দ্বারকা শাস্ত্রী। সেখানে লুকোনো আছে ৩,৫০০ বছরের পুরোনো, হস্তলিখিত সাংকেতিক এক পাণ্ডুলিপি। যাতে লেখা আছে একটা মাত্র সংস্কৃত শ্লোক। সেখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে হিন্দু ক্যালেন্ডার শাকা-সম্বাত অনুসারে, কোনো এক ভরা পূর্ণিমা রাতে রোহিনী নক্ষত্ররাজি উদিত হলে তাদেরই রক্ত বহনকারী কোনো ব্যক্তি, যার গায়ে এখনো পূর্বপুরুষের কলঙ্ক লাগেনি, গোপন সত্যটা অবমুক্ত করবেন। মানবজাতিকে মুক্ত করবেন তিনি ইতিহাসের ভয়ংকরতম অভিশাপ থেকে।

বিদ্যুৎকে তার পরদাদার ডেকে পাঠানোর একটা কারণ রয়েছে।

কারণটা হলো, পবিত্র সময় সমাগত।

তিন প্রজন্ম ধরে বিদ্যুৎকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ একটাই, তাদের রক্ত বহন করে চলেছে এক অভিশাপ। ৩,৫০০ বছর আগে নিজের জনগণ আর সভ্যতার সাথে বেইমানি করেছিলেন তাদেরই পূর্বপুরুষ বিভাষণ পূজারি। যার ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো পৃথিবীর প্রথম মহানগরী–হরপ্পা। সবচেয়ে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হলো, তিনি বেইমানি করেছিলেন প্রজ্ঞা নদীর সাথে। একে তিনি পরিণত করেছিলেন রক্তের নদীতে।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ সাল, হরপ্পা:

ভূ-উপগ্রহের সবচেয়ে মহাপরাক্রমশালী শহর হরপ্পা বৈদিক জ্ঞান ও ন্যায়নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়। খুব শীঘ্রই হরপ্পার প্রধান পুরোহিত হিসেবে ঘোষণা করা হবে বিভাষণ পূজারির নাম। এটা আর্যব্রত বা বীর আর্যদের দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর পদ। বহুল আকাঙ্ক্ষিত এই পুণ্যবান অবস্থানে পৌঁছানোর লক্ষে অর্ধ-শতাব্দী ধরে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি।

কিন্তু কোথায় যেন ঘটে গেছে ভয়ংকর উলটা-পালটা কিছু।

তার বন্ধুরা পরিণত হয়েছে চিরশত্রুতে। চতুর পণ্ডিত চন্দ্রধর আর তার অপূর্ব রূপবতী স্ত্রী মেসোপটেমিয়ার অন্ধ জাদুকর দিয়ে তাকে ঠান্ডা মাথার খুনি হিসেবে অপবাদ দিলো। নয়নতারা নামের এক নর্তকীকে নাকি খুন করেছেন তিনি। হাতভরতি চুড়ি পরে নাচতো যে মেয়েটা। ক্ষমতাবান আর ঘনিষ্ঠ লোকেদের সামনে কেবল ঐটুকু পরেই নাচতো সে।

জনতার আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলেন বিভাষণ পূজারি। তাকে নিক্ষেপ করা হলো মৃৎ কারাবাস বা অন্ধকূপে। সেখানে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি। চন্দ্রধরের বিরুদ্ধে নয়, বিষাক্ত চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে নয়, তাকে দোষী সাব্যস্ত করা বিচারক বা মেসোপটেমিয়ার অন্ধ জাদুকরের বিরুদ্ধে নয়; সমগ্র হরপ্পার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি। জনতার সম্মুখে মহাবিচার কক্ষে অনুষ্ঠিত হলো তার বিচার। তার উপর থুতু আর পাথর নিক্ষেপ করলো তারা। তারই নিজের জনগণ, যাদের জন্য তিনি উৎসর্গ করেছেন নিজের সারাটা জীবন! তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হলো, আর তার প্রিয় পরিবারকে নির্বাসন দেওয়া হলো উষর মরুভূমিতে। ঘৃণা আর যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি। নিজের রক্ত দিয়ে অন্ধকূপের দেয়ালে লিখলেন একটাই শব্দ: *প্রতিশোধ*।

১৫৭৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ, পর্তুগাল:

ভ্যাটিকান থেকে একটা জরুরি চিঠি পেলেন পর্তুগালের রাজা ইমানুয়েল। চিঠিতে মহামানব এক অশুভ সত্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যা প্রকাশ পেলে চিরতরে বদলে যাবে সমগ্র পৃথিবী। পশ্চিম ভারতীয় বন্দর শহরের বালির নিচে লুকিয়ে থাকা গোপন ঐ সত্যকে খুঁজে বের করতে হবে, এবং ধ্বংস করে ফেলতে হবে পৃথিবীর বুক থেকে। আবারও সেই হারানো শহর, আবারও সেই রূপকথার নদী। মানবসভ্যতার ইতিহাস থেকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে এই অধ্যায়। কারণ এর উপর নির্ভর করছে চার্চের নেতৃত্ব।

সম্রাটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর ভয়ংকরতম নৃশংস তলোয়ার বাহিনী ব্যবহার করতে। ভারতের শান্ত, নিরিবিলি গোয়ার উদ্দেশে দুইশত যুদ্ধজাহাজের প্রাণঘাতী এক বহর প্রেরণ করলেন ইমানুয়েল। গোয়ার বিখ্যাত মন্দিরের সিন্দুকের গভীরে লুকিয়ে রাখা গোপন সত্য সম্পর্কে কিছুই জানতো না স্থানীয় লোকজন। জানতো না উপমহাদেশের বুকে রচিত হতে যাচ্ছে কী এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের।

॥ঌ॥

১৮৫৬ খ্রিষ্টপূর্ব, ব্যারাকপুর:

গভীর রাতে নিজের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কর্নেল মার্ক স্যান্ডার্সের সাথে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা ওয়েন অ্যাশক্রুক। তিনি এমন কিছু জানতে পেরেছেন যা অবিলম্বে তার উপরওয়ালাকে জানানো প্রয়োজন। তার ভারতীয় দিনপঞ্জি আর ডায়েরিতে যা লিপিবদ্ধ করার কথা এটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। পৃথিবীর বুকে এ এক মহামায়া। আর্য আক্রমণ সম্পর্কে যা নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন, বিষয়টা তার সাথে সম্পর্কিত। বিষয়টা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যা স্থানীয় ভারতীয়দের দাসে পরিণত করেছিলো। তিনি এমন একটা নথি খুঁজে পেয়েছেন যাতে মহাপরাক্রমশালী আর্যদের সম্পর্কে অবিশ্বাস্য এক মহাসত্য লুকোনো রয়েছে। ওয়েন জানেন তার এই বিস্ময়কর আবিষ্কার উলট-পালট করে দিতে পারে পৃথিবীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গতিধারার মৌলিক তত্ত্বকে।

চরম অবিশ্বাসের সাথে ওয়েন দেখলেন, কর্নেল স্যান্ডার্স তাকে নীরবে মিথ্যা তথ্য লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। আর্যদের সম্পর্কে তিনি যে কিছু আবিষ্কার করেছেন, সে কথা ভুলে যেতে বললেন, নয়তো চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। তিনি ওয়েনকে বললেন যে এর মাত্রা ও তাৎপর্য এবং এর পেছনের শক্তি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তার। মাথা নেড়ে স্যান্ডার্সের কাছ থেকে বিদায় নিলেন ওয়েন। তবে নিজের বিবেক তাকে উপরওয়ালার নির্দেশ মান্য

করতে বাধা দিচ্ছে। তিনি চেষ্টা করলেন কলকাতা ট্রিবিউনে যাতে সত্যটা প্রকাশিত হয়।

পরদিন সকালে লেখকের বাসভবনের বাইরে একটা গাছে ওয়েনের বিকৃত মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। এটা দুজন ভারতীয় সিপাইয়ের অপরাধমূলক কাজ বলে বর্ণনা করলো খবরের কাগজগুলো। তবে সত্যটা অবশ্যই ভিন্ন। চরম ভীতিজাগানিয়া কিছু একটা আছে এর মধ্যে।

ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আবার মাথাচাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে রক্ততৃষ্ণা।

প্রস্তাবনা
খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ সাল

কয়েক মাইলের মধ্যে আর কোনো জনমানব ছিলো না। ভয়ংকর সেই ঝড়ের রাতে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি। বিশেষ করে কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের ধারা, অশ্রু আর ঘামের সাথে অকালের ভারী বর্ষণে সৃষ্ট কাদা মিশে তার দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা করে করে দিচ্ছিলো। সেই কালিগোলা রাতে ন্যাড়ামাথার ব্রাহ্মণ খালি গায়ে আচ্ছন্নের মতো তার কুঠার চালাচ্ছিলেন। ইট ও পাথরের তৈরি মনুষ্যসৃষ্ট পর্বতের স্তম্ভের সাথে বাঁধা মোটা মোটা দড়িগুলোর অন্তত একটা কেটে ফেলার চেষ্টা করছিলেন তিনি। নদীর গতিপথ পালটে দেওয়ার জন্য ইট, পাথর আর বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি করা হলেও বিশাল এই স্থাপনা সমুদ্র থেকে ধেয়ে আসা তীব্র সুনামিকে রুখে দিতে সক্ষম। তবে নদীটির শক্তিও একটা সাগরের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলো না।

ভারী বর্ষণে ভিজতে ভিজতে আনমনে বিড়বিড় করে চলেছেন বিভাষণ পূজারি। অনেক বছরের কঠোর সাধনা আর বৈদিক শৃঙ্খলা মেনে চলা শরীরের সবটুকু শক্তি একত্র করলেন তিনি। হাতে ফোসকা পড়ে রক্ত ঝরলেও লোহার তারের মতো শক্ত রশিটা কুপিয়ে চলেছেন এখনো। যখন আর পারছিলেন না, তখন হাত থেকে কুঠারটা ছুঁড়ে ফেলে উপর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। তীরের মতো বৃষ্টির ঝাপটা এসে আঘাত করলো তার চোখেমুখে। নির্মম বারিধারা যখন তার চোখের পাতায় লেগে থাকা রক্ত আর কাদাগুলো ধুয়ে নিচ্ছিলো, এমন সময় আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে উঠলেন তিনি। এটা সম্ভবত

নিজের বর্ণনাতীত দুর্দশা দেবতাদেরকে শোনানোর জন্য তার কলুষিত আত্মার একটা শেষ প্রচেষ্টা। তবে তিনি জানেন যে দেরি হয়ে গেছে। তার কাজে দেবতারা শঙ্কিত এবং তারা তাকে কখনোই ক্ষমা করবে না। কাউকেই করবে না।

আগের চেয়ে আরো প্রবল আক্রোশে রশি কাটতে লাগলেন বিভাষণ। তিনি জানেন যে ঘণ্টারও অধিক সময় ধরে একটা মাত্র রশি কাটার চেষ্টা করছেন তিনি। রশিগুলো তারই নির্দেশনা অনুসারে বিশেষভাবে তৈরি। তিনি জানেন ৯৯৮ টা ইট, পাথর আর তামার সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে এক-একটা স্তম্ভ। সেখানে রয়েছে এমন ধরনের হাজারো রশির গিঁট, যা বাঁধটাকে করেছে সুরক্ষিত। দিন-রাত কাজ করলে হাজার লোকের এক সপ্তাহ লাগবে এটা ভাঙতে। তার বিশেষ স্থাপত্যকলা আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের নির্দেশনা অনুসারে তৈরি করা হয়েছিলো ৯৯৯ টা কৌশলগতভাবে স্থাপিত এবং সুরক্ষিত স্তম্ভ। কী করছেন তিনি? তিনি কি তবে পাগল হয়ে গিয়েছেন? তিনি জানেন এই দৈত্যাকার পর্বতসম স্থাপনায় আঁচড়ও বসাতে পারবেন না। তারপরও পাগলের মতো হতাশভাবে কুঠার চালাতে লাগলেন।

মধ্যরাতের চরাচর ধুয়ে যাওয়া প্রবল বর্ষণ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিঃসঙ্গ বিভাষণ পূজারি। তিনি কয়েক দশক ধরে লোকের পূজা পেয়ে আসা এক দেবতা (অর্ধ মানব-অর্ধ দেবতা)। একসময় হরপ্পায় সূর্য হয়ে জ্বলজ্বল করা দেবতাকে ভূতের মতো লাগছে আজ। তীব্র বেদনা আর অনুতাপে পুড়ছেন তিনি। জানেন অশুভ পরিণতিটা এড়ানো সম্ভব নয়। কাঁদছেন তিনি, কোপানো বন্ধ করে প্রলাপ বকছেন। তখনই তিনি শুনতে পেলেন।

প্রলয় শুরু হয়ে গেছে।

তিনি শুনতে পাচ্ছেন অশুভ গর্জনে এগিয়ে আসছে প্রমত্ত নদী। সবকিছু চুরমার করে এগিয়ে আসছে তার দিকেই। সে গর্জন শুনে জমাট বেঁধে গেল তার শরীরের রক্ত। একসময়ের স্নেহময়ী, মমতাময়ী নদীটি পরিণত হয়েছে রক্তধারায়। গিলে ফেলতে চাইছে নিজের সন্তানদের। জ্ঞানের নদীর সাথে প্রতারণা করেছে তারই এক প্রিয় সন্তান। তার সাথে প্রতারণা করেছে তার দেবতা ছেলে, বিভাষণ পূজারি।

একদা যে ছিলো ন্যায়ের প্রতীক আর অদম্য, সেই বিভাষণ পূজারি হাত থেকে ছুঁড়ে মারলেন তার কুঠার। মৃদু থপ শব্দ করে কাদামাটির উপর পড়লো সেটা। শরীরটা যেন পাথরের মতো জায়গায় জমে গেছে। বিভাষণ পূজারি দেখলেন তার উন্মত্ত মা দানবীতে পরিণত হয়েছে। সাথে সাথে তিনি বুঝতে পারলেন, মায়ের বেদিতে প্রথম রক্তটা হবে তারই। তিনিও মেনে নিলেন; তাই যেন হয়।

ধীরে ধীরে এক ধরনের প্রশান্তি আর মুক্তির স্বাদ অনুভব করলেন দেবতা। হয়তো মা তার জীবনটা নিয়ে নেবেন ঠিকই, তার বিনিময়ে বাকিদের জীবন ভিক্ষা দেবেন। নিজেকে সমর্পণের ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন বিভাষণ, হাতদুটো প্রসারিত করে দিলেন। তার ক্লান্ত, ক্ষত-বিক্ষত শরীর ধুয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছে বারিধারা। সম্ভবত শেষবারের মতো।

'হে জগৎ জননী মা আমার, আমার জীবন নিয়ে নাও! আমি তোমার আদেশ অমান্য করেছি। আমি নিজেকে তোমার পায়ে সমর্পণ করলাম!' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। আকাশ ঝলসে উঠলো কানফাটানো বজ্রপাতের শব্দে। সম্ভবত পতিত দেবতার প্রার্থনা এইমাত্র প্রত্যাখ্যান করলেন ঈশ্বর।

আবার মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার কণ্ঠ। *'তুমি তোমার ভগ্নহৃদয় সন্তানের কান্না শুনতে পাচ্ছো না, মা? আমার জীবন নিয়ে বাকিদের ক্ষমা করে দাও! তারা তো কোনো পাপ করেনি!'*

আবারও ঝলসে উঠলো আকাশ। কয়েক মুহূর্তের জন্য দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল চারদিক। বিভাষণ পূজারির রক্তাক্ত, ঘর্মাক্ত, বিকৃত মুখের উপর দিয়ে নীরবে চলে গেল আলোর ঝলকানি। সেটাকে অনুসরণ করলো বজ্রপাতের শব্দ। মনে হলো যেন সূর্যটা বিস্ফোরিত হচ্ছে।

ঈশ্বর বলছেন, *না*!

মুখমণ্ডলে প্রবল বাতাসের একটা ঝাপটা অনুভব করলেন বিভাষণ পূজারি। দেখতে পেলেন দৈত্যাকার পানির একটা পর্বত এগিয়ে আসছে সোজা তারই দিকে। মনে হচ্ছে বিশালাকার কোনো জলদানব যেন তার শিকারের দিকে মুখ তুলে তাকালো। মুহূর্তখানেক আগের বজ্রপাতের শব্দের চেয়ে হাজারগুণ জোরালো এই এগিয়ে আসা জলপর্বতের শব্দ। হতবিহ্বল হয়ে বসে রইলেন বিভাষণ পূজারি। অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছেন দ্রুত অগ্রসরমান পাহাড়সম উঁচু পানির অপচ্ছায়া। নিজেকে পর্বত সুমেরুর সামনে একটা পিঁপড়ের মতো মনে হলো তার। একটু পরেই তাকে গ্রাস করবে তার মাতৃনদীর আকাশ সমান উঁচু সুনামি।

গত কয়েক দিনে অনেক অধঃপতন হয়েছে বিভাষণ পূজারির। সারা জীবনের অর্জিত সম্মান ধুলোয় মিশে গেছে অন্ধ প্রতিশোধের নেশায়। তারপরও তিনি বিভাষণ পূজারি। একজন দেবতা। উচ্চতর যোগজ্ঞানসম্পন্ন অন্য সব মানুষের মতোই স্বীয় আত্মাকে ডেকে নিজের কুণ্ডলিনিতে কেন্দ্রীভূত করলেন তিনি। হৃৎকম্প থামিয়ে দিয়ে তার নশ্বর শরীরকে প্রস্তুত করলেন মৃত্যুর জন্য। অগ্রসরমান জলদানবের ধাক্কায় তুলোর মতো উড়ে যাচ্ছিলেন দেবতা, ঐ অবস্থায় শেষবারের মতো নিজেকে শান্ত করে প্রার্থনা করলেন।

'মা, ক্ষমা করো ওদের। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ওদের ধ্বংস করে দিও না। ওদের ক্ষমা করো, মা!'

একটা বিশাল টর্নেডো যেভাবে আগাছা উপড়ে ফেলে, প্রলয়ংকরী নদী ঠিক সেভাবে উড়িয়ে নিয়ে গেল বিভাষণ পূজারিকে। ঈশ্বর, খুনে রক্ত নদী, আঁধার কালো রাত, ইন্দ্রের বজ্র (বিদ্যুৎ ও ঝড়ের দেবতা), বিশাল, বিস্তৃত বিরানভূমি আর নির্মম বৃষ্টি নীরবে তাকিয়ে দেখলো সময়ের শ্রেষ্ঠতম মানুষের বিলীন হয়ে যাওয়া। কিন্তু বিভাষণ পূজারির মৃত্যুতেই এই গ্রহে তার প্রভাব শেষ হয়ে গেল না। এটা কেবল শুরু। হাজার বছর ধরে ঘৃণা, শঠতা, ষড়যন্ত্র আর নৃশংস সংঘাতের মাঝে বেঁচে থাকবেন তিনি। তিনি কেবল আর্যব্রতদেরই তাড়া করে ফিরবেন না, যে ঈশ্বর আজ তাকে পরিত্যাগ করলেন তার নামে সীমাহীন রক্তপাত আর হত্যার মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীকে তাড়িয়ে বেড়াবেন তিনি। এমনকি মৃত্যুতেও এই অভিশাপ থেকে মুক্তি মিলবে না তার, মুক্তি মিলবে না সমগ্র মানবসভ্যতার।

নিজের গতিতে ছুটে চলেছে নদী। বিভাষণ পূজারির মৃত্যুপূর্ব শেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও এই রক্তনদী ওদের কাউকে ক্ষমা করবে না।

প্রমত্ত স্বরস্বতী গ্রাস করতে যাচ্ছে জৌলুসপূর্ণ মহানগরী হরপ্পাকে। সেই সাথে গ্রাস করতে যাচ্ছে এর সর্বশেষ বাসিন্দাটিকেও।

দিল্লি, ২০১৭
বিদ্যুৎ

ফোনটা বেজেই চলেছে। বিদ্যুৎ আর দামিনী উভয়েই এত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন যে কারোরই উঠে ফোনটা রিসিভ করার মতো শক্তি নেই। সময় ভোর ৪:৩০। ফোনটা বাজছে তো বাজছেই। বিদ্যুৎকে আলতো করে ধাক্কা দিলো দামিনী।

'বিদ্যুৎ...ওঠো। তোমার ফোন বাজে।'

'উমম...' বিড়বিড় করলো বিদ্যুৎ।

'আরে ওঠো না,' দামিনী চোখ না খুলেই তাড়া দেয়।

ফোনের উদ্দেশে হাত বাড়ালো বিদ্যুৎ। বিছানার পাশে টেবিলের উপর হাতড়াচ্ছে।

'এই অসময়ে কে ফোন দিলো? হ্যালো?' ফোনটা রিসিভ করে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো সে।

কক্ষটা পুরোপুরি নিস্তব্ধ। বিছানায় উঠে বসলো বিদ্যুৎ। গভীর মনোযোগে বোঝার চেষ্টা করছে ফোনের অপর পাশে কে আছে। চোখের ভ্রুদুটির মতোই তার পেশিবহুল শরীরটা টানটান হয়ে আছে উত্তেজনায়।

'সব ঠিক আছে?' জানতে চাইলো দামিনী।

তার হাতের উপর আলতো চাপ দিলো বিদ্যুৎ। এর মানে সম্পূর্ণ নীরবতা চাইছে সে। বিদ্যুৎকে ভালোভাবেই চেনে দামিনী। সে চোখ খুলে তাকালো।

দেখতে পেল দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হাতে ফোনটা কানের কাছে ধরে রেখেছে বিদ্যুত। গভীর মনোযোগে চোখদুটো বন্ধ।

'কিন্তু পুরোহিতজি, আমাকে আরো আগে জানালেন না কেন?' ফোনের অপর প্রান্তে থাকা লোকটার উদ্দেশে বললো বিদ্যুৎ। এই পুরোহিতজিটা কে কোনো ধারণা নেই দামিনীর। তাছাড়া বিদ্যুৎকেই বা কেন এত উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে হঠাৎ। কনুইয়ে ভর দিয়ে সতর্কতার সাথে শুনতে শুরু করলো সে।

'আর কতক্ষণ সময় আছে তার, পুরোহিতজি?' চিন্তিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ। কয়েক সেকেন্ড থেমে সে আবার বললো, 'আজ সন্ধ্যার মধ্যে সেখানে থাকবো আমি।'

ফোনটা রেখে খাটের ব্যাকরেস্টে হেলান দিলো বিদ্যুৎ। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সিলিঙের দিকে। সুগঠিত বুক, বাহু আর কাঁধের সাথে গায়ের ফর্সা ত্বকের ঔজ্জ্বল্য তার চেহারাকে দিয়েছে রাজকীয় আভিজাত্য। লম্বা, হালকা বাদামি চুলের সাথে ধারালো চেহারা আর অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাকে করেছে আরো আকর্ষণীয়। বিদ্যুৎ দেখতে তার নামের মতোই। তবে গ্রিক দেবতার মতো চেহারার বাইরেও আরো কিছু একটা আছে তার মধ্যে যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

দামিনী জানে অদ্ভুত আর শক্ত মানসিকতার এক লোককে ভালোবাসে সে। যদিও কখনো মুখ ফুটে তাকে বলা হয়নি, তারপরও তার মনের গহীনে একটা আশা যে একদিন তাকে সে বিয়ে করবে। সে জানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরের ক্যাম্পাস হংসরাজ কলেজের প্রিমিয়ারে যাদের সাথে পরিচয় হয়েছিলো তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ছেলে বিদ্যুৎ। অন্যভাবে বললে, পৃথিবীর সবার চেয়ে আলাদা সে। এমন মানুষকে জীবনে পাওয়ায় মনে মনে একধরনের গোপন, প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করে সে। বাইবেলে বর্ণিত সুদর্শন, সুগঠিত চেহারার বিজেতাদের মতো দেখতে বাদামি চোখের এই মানুষটি যে পৃথিবীতে এসেছে নেতৃত্ব দিতে, এতে কোনো সন্দেহ নেই তার। সে নিশ্চিত ঈশ্বর বিরল ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন বিদ্যুৎকে। আসলেও তাই। প্রতিভা, দক্ষতা, আধ্যাত্মিকতা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক জ্বলন্ত অগ্নিগোলক এই বিদ্যুৎ। ৩৪ বছর বয়সেই সে একজন সফল উদ্যোক্তা। সেই সাথে সে একজন সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, লেখক, চিত্রকর, মার্শাল আর্ট শিল্পী, আড্ডাবাজ এবং সহজাত নেতা। বন্ধুরা তাকে আদর করে ডাকে ভিডিও বলে। তার বিচিত্র ধরনের বন্ধুদের দেখে মাঝে মাঝে চিন্তা হয় দামিনীর।

'তুমি ঠিক আছো তো?' মিনিটখানেক পরে মৃদু স্বরে জানতে চাইলো দামিনী। 'কে এই পুরোহিতজি? আর তোমাকেই বা আজ সন্ধ্যায় যেতে হবে কোথায়?'

'বারানসি। মানে কাশী বা বানারস...বেশিরভাগ মানুষ এ নামেই ডাকে,' জবাবে বললো বিদ্যুৎ। এখনো সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'কেন যেতে হবে বানারসে, প্রিয়তম? বলা নেই কওয়া নেই...'

'ঠিক বলা নেই কওয়া নেই এমন নয়, দামিনী...তবে এভাবে ডাক পড়বে তা আশা করিনি আমি। বলা হয়েছিলো আমি আর কোনোদিন কাশীতে ফিরবো না।'

কক্ষের ভেতরে নিস্তব্ধ নীরবতা। দামিনী অবিশ্বাসের সাথে অবাক হয়ে শুনছে বিদ্যুতের রহস্যময় অতিপ্রাকৃত বর্ণনা। বিদ্যুৎ নয়, এ যেন অন্য কেউ। ব্যাপারটা যেন ঠিক কোনো উৎসাহী সাংবাদিককে তার প্রশ্নের উত্তরের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করানোর মতো। সম্পূর্ণ মনোযোগ নিয়ে বসলো সে, চুলের কাঁটাটা দাঁতে কামড়ে ধরে অভ্যস্থ হাতে নিজের চুলগুলো খোঁপায় বেঁধে নিচ্ছে। সুন্দরী আর আত্মবিশ্বাসী মেয়েরা এমনটি করে থাকে। নম্রভাবে অথচ দৃঢ়তার সাথে প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দিলো সে।

'কাশী? তুমি বলতে চাচ্ছো বানারস...অথবা বারানসি...সে যাই হোক না কেন...কেন সেখানে যেতে হবে তোমাকে? আর কী প্রত্যাশা করোনি তুমি? ঈশ্বরের দোহাই...বলো কেন তোমার সেখানে ফিরে যাওয়ার কথা ছিলো না? আর ফিরে যাওয়া বলতেই বা কী বোঝাতে চেয়েছ? কখন তুমি সেখানে ছিলে? আর এ ব্যাপারে তুমি কখনো আমাকে কিছু বলোনি এটাই বা কীভাবে সম্ভব? তুমি কি দয়া করে আমাকে সবকিছু খুলে বলবে?' দামিনী এখন যতটা না অনুসন্ধিৎসু তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন।

তার দিকে ফিরলো বিদ্যুৎ। এমনভাবে তাকালো যেন ফোন বাজার পর এই প্রথমবার দামিনীর উপস্থিতি লক্ষ করলো সে।

'বলার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে এ নিয়ে কথা বলিনি আমরা। আমার জন্য কাশী ছিলো বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা অধ্যায়। বছরের পর বছর যখন আমি সেখানে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম, আমাকে মানা করা হয়েছিলো। আর এখন আমি যখন ভূতুড়ে অতীত ভুলে বাঁচতে শিখেছি, ওরা আমাকে ডাকলো?' অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললো বিদ্যুৎ।

দামিনী কিছু বলার আগেই লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে নিজের ওয়ার্ড্রোবের কাছে হেঁটে গেল। সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে একটা সিগারেট ধরালো। এখন সত্যি সত্যি ভয় পাচ্ছে দামিনী। দীর্ঘ নয় মাস পর আজ আবার সিগারেট খাচ্ছে সে। দামিনী বুঝতে পারলো আসলেই কোথাও একটা গুরুতর ঘাপলা হয়ে গেছে। টনি গার্গোনে তার প্রাসাদোপম অট্টালিকার বেলকনির দিকে এগিয়ে যাওয়া

বিদ্যুতের পিছু পিছু এগোলো সেও। ব্যালকনির রেলিঙে ভর দিয়ে তার কাছাকাছি দাঁড়ালো সে। ছোটখাটো স্বচ্ছ একটা নেগলিজি পরেছে সে, যা তার আকর্ষণীয় স্লিম শরীরের বাঁকগুলোকে করে তুলেছে আরো মোহনীয়। দেখতে যতটা সুন্দরী, ততটাই বুদ্ধিমতী দামিনী। কোনো কথা বললো না সে। ধ্যানমগ্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যুৎ। তাদের চেনাজানা হওয়ার পর থেকে এই প্রথমবার তার মনে হলো, বিদ্যুৎ ভয় পেয়েছে। কিন্তু কেন? সেটা জানা নেই তার।

□

হিন্দু শাস্ত্রে কাশী হলো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থার পবিত্রতম শহর। প্রকৃতপক্ষে কাশী এবং ভারানাসি উভয় নামেই ডাকা হয় একে। পালি সাহিত্যের প্রভাবে শতসহস্র বছর পরে প্রথমে বারানসি এবং তারপর সেটা পরিবর্তিত হয়ে বানারস নাম ধারণ করে এই শহর। হিন্দু পৌরাণিক শাস্ত্রমতে, যখন প্রলয় বা মহাপ্লাবনে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, প্রভু শিবা তার ত্রিশূলের মাথায় তুলে নিয়ে কাশী শহরকে রক্ষা করেছিলেন। দশ সহস্র শীতকালের সাক্ষী এই শহর পৃথিবীর তাবৎ অলৌকিক সাধনাকারী আর সাধুদের আবাসস্থল। গ্রহের সবচেয়ে অমঙ্গলসূচক রহস্যেরও ধারক এই শহর।

বিমানে করে নয়া দিল্লি থেকে বানারস যেতে নব্বই মিনিট সময় লাগে। বিকেল তিনটের ফ্লাইট ধরলে সন্ধ্যা ছটায় পুরোহিতজির সাথে মিলিত হতে পারবে বিদ্যুৎ। একদল অনুগত বন্ধু আর সহকর্মী রয়েছে বিদ্যুতের। যারা তার সব বিষয়-আশয় দেখাশোনা করে। মূল দলটা যেন একটা মাত্র সত্তা। তাই কাজের সময় নিজেদের মধ্যে খুব বেশি কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না তাদের। বেশিরভাগ কাজ হয়ে যায় একটা মাত্র চোখের ইশারায়, দু-একটা কথা বা একটা মাত্র মোবাইল মেসেজে। বিদ্যুতের জানের বন্ধু হলো বালা। পুরো নাম বালাকৃষ্ণান। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং একমাত্র ব্যক্তি, যাকে বিদ্যুৎ পুরোপুরি বিশ্বাস করে। বালা কেবল কোম্পানিতে বিদ্যুতের পর দ্বিতীয় কর্মকর্তাই নয়, সে তার বেস্ট ফ্রেন্ডও বটে। একজন প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা সে। চাকুরিজীবনে একজন দক্ষ আর্মি অফিসার হিসেবে সুনাম ছিলো তার। খালি হাতে যেমন সহজেই প্রতিপক্ষের পাঁজরের হাড় গুঁড়ো করে দিতে পারে সে, তেমনি সহজেই পারে জটিল যেকোনো ফিন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি কোড ভেঙে ফেলতে।

একটা কর্পোরেট সিকিউরিটি কোম্পানি পরিচালনা করে বিদ্যুৎ। আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন গুপ্তচরদের হাত থেকে মাল্টিন্যাশনাল ক্লায়েন্টদের সুরক্ষা দেওয়ার কাজ করে তার প্রতিষ্ঠান। শূন্য থেকে শুরু করেছিলো বিদ্যুৎ। যা এখন ইন্ডিয়ার সিকিউরিটি কোম্পানিগুলোর মধ্যে সেরাদের একটি। কোম্পানির সাফল্য বিদ্যুৎকে

এনে দিয়েছে ভারত জুড়ে পরিচিতি আর ভারতের কর্পোরেট জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন এমন ব্যক্তিদের অন্দরে অবাধ যাতায়াতের অনুমতি। যাদের সবচেয়ে বেশি প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা প্রয়োজন, সেই ক্ষমতাশালী রাজনীতিবিদেরা চোখ বন্ধ করে তার কোম্পানির সেবা গ্রহণ করেন। তাদের অনেকেরই স্পিড ডায়ালে রয়েছে বিদ্যুতের মোবাইল নম্বর। সামাজিক অনুষ্ঠান আর গার্ডেন ডিনারে বিদ্যুৎকে পেলে গর্ববোধ করেন তারা। তরুণ বয়সেই বিদ্যুৎ একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। তবে যারা তার বংশলতিকা সম্পর্কে জানে, যেমন পুরোহিতজি, এটা তাদের কাছে বিস্ময়কর কিছু নয়। বিদ্যুৎ কোনো সাধারণ মানুষ নয়। সাধারণ মানুষ হওয়ার কথাও ছিলো না তার।

ঘরোয়া ধূসর টি-শার্ট আর নীল জিন্সে বিদ্যুৎকে বয়সের তুলনায় আরো তরুণ দেখাচ্ছে। খুব বেশি জিনিসপত্তর সাথে নিচ্ছে না সে। মাত্র দুটো দিন। ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহে উদ্বিগ্ন বোধ করছে দামিনী। তারপরও মুখটা হাসিখুশি আর নির্ভার রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে তার দিকে তাকিয়ে অভয়ের সুরে হাসছে বা চোখ টিপছে বিদ্যুৎ। আসলে ওকে শান্ত করতে চাইছে সে। বোঝাতে চাইছে যে সবকিছু ঠিকই আছে। তবে তারা উভয়েই জানে, আসলে সবকিছু ঠিক নেই।

দ্রুত প্যাকেজিং শেষ করে একটু থামলো সে এবং জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। এর মধ্যে ঘরে প্রবেশ করেছে বালা। ফ্রিজ থেকে এক বোতল ডাবের পানি নিয়ে নিজের তৃষ্ণা মেটালো। তারপর ডাইনিং চেয়ারে বসে নীরবে ডাবের পানি পান করতে লাগলো সে। বিদ্যুৎ এবং দামিনী উভয়েই বালার উপস্থিতি সম্পর্কে অভ্যস্ত। বরং তারা এটা উপভোগ করে। পরিবারের সদস্য সে।

বালাকে দেখতে পেল বিদ্যুৎ। 'হাই, বালা।'

'হেই, ভিডিও।'

'কী অবস্থা, ম্যান? খানা খায়া? লাঞ্চ করেছ?' জানতে চাইলো বিদ্যুৎ।

'হ্যাঁ...' বন্ধুর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলো বালা। ভালোবাসা প্রকাশের জন্য এক দিনে এটুকুই যথেষ্ট। তবে বিদ্যুতের কাছে এটাই সবকিছু। এরপর যা ভয় পাচ্ছিলো দামিনী তাই ঘটলো। তবে সে ভাবতে পারছিলো না যে এসব সত্যি সত্যি ঘটছে। স্টাডি রুমের সিন্দুকের দিয়ে এগিয়ে গেল বিদ্যুৎ। বের করে আনলো *মহাপঞ্চাং*–হিন্দু বা সনাতন দিনপঞ্জি ও কর্মতালিকা। ভয়ে জমে গেল দামিনী, গলা শুকিয়ে গেছে। শেষবার যখন সে এটা বের করেছিলো সেটা ছিলো তার সবচেয়ে ভয়ংকর দিন। ঐ দিন সে তার স্নেহময়ী মাকে হারিয়েছিলো। আধুনিক পোশাক-আশাক, দৃষ্টিভঙ্গি, চকচকে গাড়ি এবং টেকনোলজি কোম্পানি

সত্ত্বেও বৈদিক জ্যোতির্বিদ্যার একজন তুখোড়, দক্ষ জ্যোতির্বিদ বিদ্যুৎ। ঠিক যেভাবে সফটওয়্যারের কোডগুলো পড়ে একইভাবে মানুষের কুণ্ডলি (হস্তরাশি) পড়তে পারে সে।

দামিনীর মুখ থেকে অস্ফুটে আতঙ্কসূচক একটা শব্দ বেরিয়ে গেল। দুহাতে মুখ ঢাকলো সে আতঙ্কে। বিদ্যুৎ সেটা লক্ষ করলেও তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো চেষ্টা করলো না সে। আবার মূর্তির মতো লাগছে তাকে। বালা যেখানে বসে আছে সেই ডাইনিং টেবিলে *মহাপঞ্চং* মেলে দিলো সে। বিশাল চার্টের উপর ঝুঁকে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করছে। বাজারে যেসব *মহাপঞ্চং* পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে তারটায়। প্রতিবছর হিমালয়ের হিন্দু আশ্রম থেকে তার প্রিয় বন্ধু গোপাল এই সঠিক *মহাপঞ্চং* পাঠায় তাকে। বৈদিক জ্যোতির্বিদ্যার ওস্তাদরাই কেবল এটার ব্যাখ্যা, গবেষণা আর ব্যবহার করতে পারে। বিদ্যুৎ তেমনই একজন। বিদ্যুতের আরো অনেক বন্ধুর মতোই দামিনীর কাছে রহস্যময় মানুষ এই গোপাল।

দামিনীর চোখে আতঙ্ক আর অশ্রু চোখে পড়লো বালার। সে বিদ্যুতের হাতের উপর হাত রেখে মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললো, 'কী করছো তুমি? এখন এসবের কী প্রয়োজন তোমার?'

সাড়া দিলো না বিদ্যুৎ। দামিনী আর সহ্য করতে পারলো না। সে বিদ্যুতের পাশে ছুটে গিয়ে শক্ত করে তার বাহুদুটো ধরে নিজের দিকে ফেরালো।

'কী করছো তুমি?' চিৎকার করে জানতে চাইলো সে। কান্নায় ভেঙে পড়তে দেরি নেই।

এভাবে বাধা পেয়ে একটু বিরক্তি ফুটে উঠলো বিদ্যুতের মুখে। তবে দ্রুত নিজেকে ফিরে পেল সে। বুঝতে পারলো একটা ব্যাখ্যা প্রদান জরুরি হয়ে পড়েছে। পুরোহিতজির ফোন পাওয়ার পর থেকে অদ্ভুত আচরণ করে যাচ্ছে সে। যেহেতু সে দামিনীর সাথে সবকিছু অথবা প্রায় সবকিছু শেয়ার করে, সুতরাং তার ভালোবাসার মানুষ এটুকু ব্যাখ্যা দাবি করতেই পারে।

'এদিকে এসো,' দামিনীকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে ডাইনিং টেবিলের পাশে একটা সোফায় বসিয়ে দিতে দিতে স্নেহভরা কণ্ঠে বললো সে। 'আমি তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে দু-মিনিটে বলতে পারি, অথবা সবকিছু খুলে বলতে পারি তোমাকে। তবে সেজন্য দুদিন পিছিয়ে পড়বো আমি,' বলে চলেছে সে।

দামিনী কেবল মায়াভরা চোখে বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে রইলো। চোখদুটো ভেজা। কান্নার দমকে ক্ষণে ক্ষণে ফুঁপিয়ে উঠছে সে। প্রাণান্ত চেষ্টা করছে অশ্রু সংবরণ করার।

'এমনকি আমি যদি তোমাকে সবকিছু খুলেও বলি, তোমার বিশ্বাস হবে না। তুমি ভাবতে পারো যে বিদ্যুৎ পাগল হয়ে গেছে। আমাকে একজন মনোবিদ

দেখানোর কথাও মনে হতে পারে তোমার। কে জানে, ইতোমধ্যেই তুমি কারো অ্যাপয়েন্টম্যান্ট নিয়ে ফেলেছ কি না!' দুষ্টুমির হাসি হেসে পরিস্থিতি একটু হালকা করার একটা বৃথা চেষ্টা করলো সে। আগের মতো চোখে আতঙ্ক আর অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইলো দামিনী।

'আমাকে কেবল বলো কী হয়েছে? তোমার প্রিয়তমা শক্ত মনের মানুষ। নিজেকে সামলে নিতে জানে সে,' যতটা সম্ভব আবেগ ঝেড়ে ফেলে বললো সে। 'আমি তোমাকে কোনো চাপ দিতে চাই না। তবে আমি তোমাকে ভালো করেই চিনি। মারাত্মক কোনো কিছু না ঘটলে তুমি *মহাপঞ্চং* বের করতে না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো বিদ্যুৎ। তারপর দামিনীর হাতদুটো তুলে নিলো নিজের হাতে। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো তার সামনে। মনোমুগ্ধকরভাবে মাথা দুলিয়ে নিজের ভুবনভোলানো হাসিটা হাসলো। তারপর দামিনীর হাতে একটা চুমু খেয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো, 'দামিনী, আমি অর্ধেক মানব আর অর্ধেক দেবতা।'

প্যারিস, ২০১৭
‘হত্যা করো ঐ আর্য-বালককে।’

চার্লস ডি গল এয়ারপোর্টে এসে অবতরণ করলো রেগ মিরিয়ানির লুফথানসা ফ্লাইট। নিজের ফার্স্টক্লাস উইন্ডো দিয়ে বাইরে তাকালো সে। প্যারিসের বৃষ্টিস্নাত আলো ঝলমলে সন্ধ্যা। তবে এসব সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো সময় নেই তার। অনেক কাজ পড়ে আছে।

মধ্য-চল্লিশের লম্বা-চওড়া-সুদর্শন রেগ দ্রুত এয়ারপোর্টের এক্সিটের উদ্দেশে হাঁটা দিলো। ছয় নম্বর গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে উঠে বসলো অপেক্ষারত একটা মার্সিডিজ বেঞ্জ এস-৫০০ এর ভেতরে। *রু ডি রিভোলি*-র মনোরম হোটেল *রেজিনা*-য় যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলো ড্রাইভারকে। পঞ্চাশ মিনিট পর সৌজন্যমূলক চেক ইন শেষে প্যারিসের সেরা হোটেলের সবচেয়ে বিলাসবহুল কক্ষটি দেওয়া হলো রেগকে। যেখান থেকে লুভর জাদুঘর দেখা যায়। টাকা নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না তাকে। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং ধনী প্রতিষ্ঠানটি পৃষ্ঠপোষকতা করছে তাকে। সর্বকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং ধনীও বলা যায়।

দ্রুত গোসল সেরে সবচেয়ে দামি ইতালিয়ান স্যুট পরে ডিনারের নির্দিষ্ট স্থানে রওয়ানা দিলো সে মাশ্চেরা বিয়ানকার সাথে দেখা করার জন্য। এ নামেই পরিচিত সে। যদিও এটা তার আসল নাম নয়। রেগের মতে, এ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর মানুষ। অথবা দ্বিতীয় ভয়ংকর। সবচেয়ে ভয়ংকর মানুষ হলেন যিনি একটা হস্তলিখিত নোট দিয়ে রেগকে রোম থেকে প্যারিসে পাঠিয়েছেন তিনি।

চল্লিশ বছর বয়সি ড্যাশিং একজন মানুষ মাশ্চেরা বিয়ানকা। এতটাই সুদর্শন আর ফর্সা যে কেমন একটা মেয়েলি ভাব এসে যায় চেহারায়। ধাতব পদার্থে ছিদ্র করে ফেলার মতো ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বিলাসবহুল রেস্টুরেন্টে বসে নির্ভার ভঙ্গিতে ভদকার গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডের একটা সিগারেট টানছে সে। পরিচিত এক লোক ইন্ডিয়া থেকে নিয়মিতভাবে তার প্রিয় ব্র্যান্ডের এই সিগারেট পাঠিয়ে থাকে। চমৎকার ফিটফাট পোশাক পরা সব লোকজনে ভরতি রেস্টুরেন্টটা। অবাক করা ব্যাপার হলো, মেয়েমানুষ নেই বললেই চলে। রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করতেই হাত নেড়ে চওড়া হাসিতে রেগকে অভ্যর্থনা জানালো মাশ্চেরা। এটাই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ নয়।

উষ্ণ করমর্দন শেষে রেগের জন্য একটা ডাবল ভদকার অর্ডার দিলো সে, ম্যানুর সবচেয়ে দামিটা। নিজের ইন্ডিয়ান প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে রেগকে অনুরোধ করলো মাশ্চেরা। মৃদু হেসে সিগারেটটা হাতে নিয়ে সামান্য ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলো রেগ, 'তাহলে, ইন্ডিয়ান মালিকের সাথে এখনো যোগাযোগ রয়েছে তোমার?' রেগের সিগারেটটা জ্বেলে দিয়ে হাসলো মাশ্চেরা, 'মালিক নয়। বন্ধু! আমি কেবল বন্ধুদের হয়ে কাজ করি, রেগ। তোমার এটা জানা থাকার কথা।'

মুচকি হেসে মাথা নাড়লো রেগ। সে জানে মাশ্চেরার কোনো বন্ধু নেই।

'এবার বলো, আমি কীভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি?' জিজ্ঞেস করলো মাশ্চেরা।

'তুমি তো জানোই আমি কার হয়ে কাজ করি। তুমি এটাও জানো বছরের পর বছর ধরে আমার মনিবকে কোন জিনিসটা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।'

মাশ্চেরা মাথা নাড়লো। জানে সে। মাশ্চেরাকে নির্ভার দেখালেও অস্বস্তি বোধ করছে রেগ। তার মতো ভয়ংকর পেশার একজন মানুষ কীভাবে একটা পাবলিক রেস্টুরেন্টে একাকী বসে আছে এটা ভেবে পাচ্ছে না সে। রেগ ভেবেছিলো আমেরিকার প্রেসিডেন্টের চেয়ে বেশি নিরাপত্তা থাকবে মাশ্চেরার। তা সত্ত্বেও বলতে লাগলো সে।

'সত্যি সত্যি অবস্থা এখন ভয়ংকর। ওকে গোত্রের হেড কোয়ার্টারে ডেকেছে তারা।'

জমে গেছে মাশ্চেরা, চোখদুটো স্থির। তার মতো বুদ্ধিমান মানুষ সহজেই বুঝতে পারলো ভবিষ্যদ্বাণীকৃত সময় এসে গেছে।

'তাহলে, মহামানব কী চান?' সামান্য থেমে জানতে চাইলো মাশ্চেরা। রেগের মনিবকে মহামানব বলে সম্বোধন করছে সে।

মুখবন্ধ খামটা দ্রুত বের করে মাশ্চেরাকে দিলো রেগ। দ্বিতীয়জন খামটা খুলে সেকেন্ডের মাঝে পড়ে ফেললো নোটটা এবং পুনরায় ফেরত দিলো রেগকে। এক মুহূর্ত ভেবে ভদকার গ্লাসটা উঁচু করে এক চুমুকে খালি করে ফেললো মাশ্চেরা। তারপর লম্বা একটা টান দিয়ে সিগারেটটাও এশট্রেতে নিভিয়ে দিলো।

একটু পরে রেগের মনিবকে সম্বোধন করে মাশ্চেরা আবার কথা বললো, 'মহামানব জানেন যে কাজটা সহজ হবে না, ঠিক? এই...এই...চরম আঘাত ব্যতীত এই লোকের একটা চুলও ছেঁড়া যাবে না।'

'হ্যাঁ, সেটা জানেন তিনি,' উত্তর দিলো রেগ। 'তিনি জানেন কারণ প্রথমে তিনি নিজের অস্ত্র ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। ওতে কাজ হয়নি। সাধারণ কোনো মানুষের জন্য তোমার সাথে আমাকে দেখা করতে বলতেন না তিনি।'

ভয়ংকর শীতল চোখে রেগের চোখের গভীরে তাকালো মাশ্চেরা। কয়েক সেকেন্ড পর হাসলো সে। 'ধরে নাও কাজটা হয়ে গেছে, রেগ। মহামানবকে জানিয়ে দিও।'

এই বলে উঠে পড়লো মাশ্চেরা এবং পুরোনো বন্ধুর মতো রেগের সাথে করমর্দন করলো। সে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরতেই রেগসহ আরো চারজন অতিথি অবাক হয়ে দেখলো, পুরো রেস্টুরেন্ট যেন একসাথে উঠে দাঁড়ালো। একমাত্র তখনই রেগ বুঝতে পারলো, রেস্টুরেন্টে উপস্থিত ৫০জন অতিথির মধ্যে ৪৫জনই মাশ্চেরার নিরাপত্তা কর্মকর্তা ছিলো। তারা সবাই একসাথে উঠে দাঁড়ালো, এরপর বেরিয়ে গেল। তাদের ভেতরে হারিয়ে গেল মাশ্চেরা। রেগ এখন বুঝতে পারছে তারা দুজন যখন কথা বলছিলো, কমপক্ষে একশো লুকোনো আগ্নেয়াস্ত্র তাক করা ছিলো তাদের দিকে। আগে থেকেই জানে যে মাশ্চেরার নিরাপত্তা কর্মীরা একেকজন কমপক্ষে দুটো আগ্নেয়াস্ত্র বহন করে।

মাশ্চেরাকে সব সময় সমীহ করে রেগ। ইউরোপের ভয়ংকরতম মাফিয়া বসই নয় কেবল, মাশ্চেরার চেহারাতেই অশুভ, অস্বস্তিকর কিছু একটা রয়েছে যেন।

মাশ্চেরার ফেরত দেওয়া কুঁচকানো নোটটার কথা মনে পড়লো রেগের। তুলে নিলো সে ওটা। তার প্রভাবশালী গুরুর পরিচিত হস্তলেখা দেখতে পেল।

ওটাতে লেখা পাঁচটা শব্দ পড়ে আঁতকে উঠলো সে: *হত্যা করো ঐ অশুভ আর্য-বালককে।*

বানারস, ২০১৭
প্রাচীন শহরঃ কাশী

মূল শহরের ২৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ভবতপুরে অবস্থিত বারানসির লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বিমানবন্দর। প্লেন থেকে নেমে সোজা অফিসের ঠিক করে রাখা অপেক্ষারত ক্যাবের দিকে হাঁটা দিলো বিদ্যুৎ। তার টিমের লোকজন জানে সময়কে টাকার চেয়ে মূল্যবান মনে করে বিদ্যুৎ। অতএব, ট্যাক্সি খুঁজতে গিয়ে নষ্ট করার মতো একটা মিনিট সময়ও তার নেই। প্রতিটা মিনিটের হিসেব রাখে সে, এবং প্রতিটা মুহূর্তই তার কাছে মূল্যবান। একটা আধুনিক বিলাসবহুল ক্যাব প্রত্যাশা করেছিলো বিদ্যুত। ঠিক তাই রয়েছে। সে প্রত্যাশা করেছিলো ক্যাবের ড্রাইভার ঠিক জানবে কোথায় যেতে হবে। এবং ড্রাইভার সেটা জানে।

বিদ্যুতের এক্সিকিউটিভ এসিস্ট্যান্ট রিতা সুপ্রশিক্ষিত। তার উপর বিদ্যুৎকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা-ভক্তি করে সে। সত্যি বলতে কী, বিদ্যুৎকে পাগলের মতো ভালোবাসে মেয়েটা। যাদের সাথে একবার সময় কাটিয়েছে বিদ্যুৎ, ছেলে হোক মেয়ে হোক প্রত্যেকের উপর একটা প্রভাব রয়ে যায়। ৩,৭০০ বছর আগে বহুদূরে ভিন্ন এক স্থানে তার এক কীর্তিমান পূবপুরুষ ঠিক একই কাজ করতে পারতেন।

স্বচ্ছন্দে বিমানবন্দর ছেড়ে বেরিয়ে এলো সাদা বিএমডব্লিউ সাব এবং দ্রুত প্রথম কয়েক কিলোমিটার পেরিয়ে গেল। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসে আছে বিদ্যুৎ। কালো টি-শার্ট, নীল জিন্সের সাথে রোদচশমা আর দামি রোলেক্স ঘড়ি পরেছে সে হাতে। পাশে বসে অস্বস্তি আর উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে

ড্রাইভার। এমন যাত্রী সে কখনো বহন করেনি আর। পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারছে, আজকে তার যাত্রীর শরীর থেকে কেমন যেন একধরনের শক্তিশালী প্রাণশক্তির তরঙ্গ বের হচ্ছে। নিজেকে সামলাতে পারলো না পরশ।

'স্যার, আপনি কি দিল্লি থেকে এসেছেন?'

'হুম,' নিজের স্মার্টফোনে দ্রুত একটা ই-মেইলের জবাব দিতে দিতে বিড়বিড় করলো বিদ্যুৎ।

'স্যার, আপনি কি বানারসে ছুটি কাটাতে এসেছেন?'

'না।'

ক্যাবের ড্রাইভার বুঝতে পারলো কথা বলার কোনো মুড নেই তার যাত্রীর। তা সত্ত্বেও পীড়াপীড়ি করেই চললো সে। কী এক রহস্যময় কারণে এই সুদর্শন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের লোকটার কাছে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে ইচ্ছে করছিলো তার।

'স্যার, আমি পরশ পান্ডে।'

এবার পরশ পান্ডের দিকে ফিরে নিজের ভুবনভোলানো হাসিটা হাসলো বিদ্যুৎ। নিজের কাজে ব্যস্ত না থাকলে মানুষের সাথে সর্বদা মহানুভব ব্যবহার করে সে। পরশের কথা বলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে পারলো সে। পারতপক্ষে, এমন ক্ষেত্রে কাউকে নিরাশ করে না সে। নিজের রহস্যময় যাত্রীর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হলো পরশ।

'হ্যালো, পরশ। আমি বিদ্যুৎ,' পরশের দিকে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো সে। প্রবল আগ্রহ আর উদ্দীপনার সাথে বিদ্যুতের হাতটা ধরলো সে। বিদ্যুতের দিকে চেয়ে চওড়া হেসে হাতটা ঝাঁকিয়ে দিলো। তবে কী এক অদৃশ্য কারণে যেন হাতটা তার কাছে ভীষণ পবিত্র মনে হলো। স্বর্গীয় এক অনুভূতিতে ভরে গেল মন।

'স্যার, কতদিন বানারসে থাকবেন আপনি?' ভাঙা তবে ভীষণ কার্যকর ইংরেজিতে জানতে চাইলো সে। পর্যটন ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট লোকজন আর ক্যাব ড্রাইভাররা ব্যবহার করে এমন ইংরেজি।

'এক দিন,' জবাবে জানালো বিদ্যুৎ।

'না, স্যার...তিনি অনুমতি না দিলে আপনি প্রভু ভোলানাথের (শিবের অপর নাম) শহর বানারস ছেড়ে যেতে পারবেন না,' আনন্দ চিত্তে বললো পরশ।

পরশ ঘুণাক্ষরেও জানতো না যে তার ঠাট্টাচ্ছলে বলা কথাই ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ বারানসি ছেড়ে ও যাতে জীবিত বেরোতে না পারে সেজন্য ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে কেউ।

বানারসের গলি মহল্লার নামগুলো একেকটা ভীষণ দাঁতভাঙা। নাতি-ইমলি, লাহুরা-বিয়ার, কবির-চওড়া, বিশ্বনাথ-গলি, বাশ-পাঠক, ধূপ-চান্দি, আশি, গাধুলিয়া, লংকা ইত্যাদি। তবে খুব কমসংখ্যক মানুষই জানে এসব নামের পেছনে রয়েছে সুবিশাল ইতিহাস এবং একটা গল্প যা মানবসভ্যতার মতো সুপ্রাচীন। উদাহরণস্বরূপ, কিংবদন্তি দার্শনিক ও তাপস্বী সাধক কবীরের স্মৃতিতে তার অনুসারীরা যেখানে একটা আশ্রম স্থাপন করেছিলেন ঐ স্থানটাকে বলে কবীর-চওড়া। একইভাবে প্রাচীন আসশি নদীর বিসর্জন ঘাট-এর নামে নামকরণ করা হয়েছিলো আশি জায়গাটার। আর প্রাচীন নদী ভার্নার নাম থেকে এসেছে ভারানাসি নামটি। ভারানাসি বা বারানসির কোনো কিছুই ছেলেমানুষি বা খামখেয়ালিপূর্ণ নয়। কোনো কিছুই নয়। কেবল অনাহুত আগন্তুকদের সন্দেহপ্রবণ চোখেই এসব ছেলেমানুষি মনে হয়।

পরশ জানে শহরে বিদ্যুতের গন্তব্য হলো বারানসির সবচেয়ে ভয়ংকর হিন্দু আশ্রম দেব-রাক্ষস আশ্রম বা দেবতা-দানব আশ্রম। ভয় পেল সে। কারণ অতিথি যাচ্ছে রহস্যময়, পূজনীয়, ভয়ংকর ব্রাহ্মণ সাধু দ্বারকা শাস্ত্রীর আশ্রমে। বারানসির অধিকাংশ আশ্রম বা মঠ, প্রশিক্ষণশালা বা আকাদাসমূহ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হোস্টেলেরই রয়েছে রহস্যময় বা গোপনীয় ব্যাপার-স্যাপার, কিন্তু এই আশ্রমের বিশেষভাবে ভয়ের ব্যাপার হলো এটা পরিচালনা করেন দ্বারকা শাস্ত্রী নিজে। আর এই আধুনিক, বালকসুলভ, শহরে বেড়ে ওঠা বিদ্যুৎ যেতে চাচ্ছে কি না নরক কুণ্ডলীর সেই কেন্দ্রস্থলে! তাকে সতর্ক করে দেওয়ার গভীর তাড়না অনুভব করলো পরশ।

'বিদ্যুৎ স্যার, আপনি কেন সেখানে যেতে চাচ্ছেন? জায়গাটা ভীষণ রকম ভয়ংকর,' পরামর্শ দিলো পরশ। তার কণ্ঠ শুনেই বোঝা যায় সে ভয় পেয়েছে। এদিকে বলে চলেছে সে, 'দ্বারকা শাস্ত্রীজি একজন সাধু...তবে ভীষণ বদমেজাজি। আপনি জানেন, যখন-তখন অভিশাপ দেন তিনি? আর তার অভিশাপ কখনো বিফল হয় না।'

পরিষ্কার সতর্কবাণী শুনেও তার যাত্রীটি প্রভাবিত হলো না দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল পরশ। সামনের রাস্তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে বিদ্যুৎ। পরশ ভাবছে লোকটা কি ভয়ডরহীন, বোকা নাকি অন্য কিছু?

॥ ৯ ॥

বারানসি সবার। দুর্গন্ধ, অসুন্দর, ধুলো-ময়লা, জনারণ্য, ট্রাফিক জ্যাম, দারিদ্রতা আর পঙ্কিলতা সবই আছে এখানে। মানবসভ্যতার সাথে বেমানান অনেক কিছুই

রয়েছে এখানে। তারপরও নিঃসন্দেহে এটা পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর শহর। এর উপরিভাগের ইঞ্চিখানেক নিচেই রয়েছে মানুষের চেনা জগতের সবচেয়ে গোপন সবচেয়ে ভয়ংকর আধ্যাত্মিক রহস্য। সৃষ্টির শুরু থেকেই এমন দ্বৈত সত্তা বহন করে চলেছে কাশী। সেটা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষই বুঝতে পারে।

শহরের চিরচেনা সরু গলি দিয়ে আর এগোতে না পেরে গাড়ি থামালো পরশ। দ্বারকা শাস্ত্রীর মঠের খুব কাছেই নামিয়ে দিলো সে বিদ্যুৎকে। জায়গাটা শহরের সবচেয়ে বড় শিব মন্দির, রাজসিক কাশী-বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছেই। অদম্য জনস্রোত, রিক্সা-বাইসাইকেলের কর্কশ হর্নের শব্দ সত্ত্বেও জায়গাটার মাঝে একটা পবিত্র ভাব আছে। এমনকি ফেরার সময় কপালে হাতের আঙুল ছুঁয়ে একটু প্রার্থনা করে নিলো পরশ। ঈশ্বরের কাছে মার্জনা ভিক্ষে করার চিরাচরিত হিন্দু রীতি। ফিরে আসার সময় জানালা দিয়ে মাথা বের করে শেষবারের মতো বিদ্যুৎকে বললো সে, 'বিদ্যুৎ বাবু, আমার নম্বর ৯৮৪৫৬৭৮৯১৭। কোনো প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন করবেন।' প্রতিউত্তরে হেসে মাথা নাড়লো বিদ্যুৎ। প্রায় ফটোগ্রাফিক বা ফনোগ্রাফিক স্মৃতিশক্তি তার। একবার দেখলেই সব মনে রাখতে পারে।

র‍্যাকস্যাকটা পিঠে ঝুলিয়ে সরু গলিপথ ধরে কথিত ভয়ালো মঠের দিকে রওয়ানা দিলো বিদ্যুৎ। প্রায় আড়াই দশক পর এখানে ফিরলেও হাতের তালুর মতোই সবকিছু চিনতে পারছে সে। কিছুই বদলায়নি। শত শত বছর পূর্বে নির্মিত আবাসিক ভবনের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া সেই সরু রাস্তা। প্রায় প্রতিটা দেয়ালে হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিকৃতি আঁকা। উজ্জ্বল রঙের প্রতিটা প্রতিকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে অগাধ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। মন্দিরের ধূপের গন্ধের সাথে মিশেছে গাঁদাফুলের ঘ্রাণ। বারানসির প্রায় ঘরেই ছোটখাটো মন্দির আছে। এটা নিয়ম করে প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষগুলোও প্রায় একইরকম; দরিদ্র তবে তাতেই সন্তুষ্ট। হেঁটে যাওয়া প্রতিটা মানুষই একজন পুরোহিত বা পুণ্যবান মানুষ। নিজের গন্তব্যস্থল কোথায় সেটা বিদ্যুৎ জানে। প্রতিটা পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন সে। কিছুক্ষণ পর সে বুঝতে পারলো কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। যত কাছে যাচ্ছে ততই তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। উদ্বেগ বা ভয় নয়, অনেক বছর পর পরিবারের কাছে ফিরে আসার আনন্দের হৃৎস্পন্দন এটা। বিদ্যুৎ জানে সে বাড়ি ফিরছে–তার আসল বাড়ি।

ॐ

দেব-রাক্ষস মঠের প্রবেশচিহ্ন-সংবলিত খোদাই করা পাথরের বিশাল দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো বিদ্যুৎ। ধনুকাকৃতি খিলানটায় জটিল সব সুন্দর নকশা করা হয়েছে। প্রথম দর্শনে মনে ভয়জাগানিয়া অনুভূতি হয়। খুব কাছ থেকে দেখলে যে

কেউ শিকাররত প্রাচীন মহামানবদের দেখতে পাবে। যাই হোক, বিদ্যুতের কোনো ভয় লাগছে না। সে কেবল ওখানে ভালোবাসা আর উষ্ণ আলিঙ্গন দেখতে পাচ্ছে। খিলানের একপাশে কাছে গিয়ে গভীর মমতায় হাত রাখলো সে। ঠিক যেন ছোট্ট এক শিশু তার প্রিয় দাদুর গাল স্পর্শ করলো। বিদ্যুৎ যখন আনন্দময় স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত, এমন সময় একটা বাজখাঁই কণ্ঠ গর্জে উঠলো, 'দুয়ারে হাত রাখার সাহস কী করে হলো তোমার?'

ঘুরে হিন্দু সন্ন্যাসীদের গেরুয়া পোশাক পরা মধ্য বিশের এক তরুণকে দেখতে পেল বিদ্যুৎ। তেড়ে আসছে তার দিকে। তার প্রশস্ত কপালে বিশাল এক তিলক আঁকা। সবচেয়ে ভয়ংকর হলো তিন বল্লমওয়ালা ত্রিশূলটা উঁচিয়ে আক্রমণের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে সে। বিহ্বল হয়ে গেল বিদ্যুৎ।

'কে তুমি? আর এই পবিত্র স্তম্ভ স্পর্শ করার সাহসই বা তোমার হলো কী করে?' জানতে চাইলো তরুণ। বিদ্যুৎ লক্ষ করলো, নির্ভেজাল চেহারা আর পবিত্র অভিব্যক্তির সুদর্শন তরুণ সে।

'এই স্তম্ভ আর খিলান সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো, ভাই?' মৃদু হেসে প্রশ্ন করলো বিদ্যুৎ।

আগন্তুকের ভয়ডরহীন ঔদ্ধত্য দেখে অবাক হলো তরুণ। বিদ্যুৎ সম্পর্কে অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো তার। তবে বলতে পারবে না সেটা ঠিক কী ধরনের অনুভূতি।

'এই গেটটা ৮০০ বছরের পুরোনো,' কণ্ঠের রাগ লুকোনোর কোনো চেষ্টা না করেই জবাব দিলো তরুণ।

'আর?' জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ।

'আর বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছো তুমি? বিরল পাথর দিয়ে নির্মিত হয়েছে এটা।'

'আর?'

'আর তুমি যদি এক্ষুনি এখান থেকে চলে না যাও, তাহলে তোমার মুখ ফাটিয়ে দেবো আমি!' গর্জন করে উঠলো তরুণ।

সরাসরি ভালোমানুষ তরুণের চোখের গভীরে তাকালো বিদ্যুৎ। এক মুহূর্ত থেমে দীপ্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে আরম্ভ করলো। 'তখনকার মঠাদ্দেশ শ্রী ভৈরবা শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ১২৫৩ সালে তৈরি করা হয়েছিলো এই প্রবেশদ্বার। এটা তৈরিতে যে পাথরখণ্ডগুলো ব্যবহৃত হয়েছিলো তা দান করেছিলেন রাজা কনৌজ। ওজন ছিলো ১,০০৮ টন। প্রথম দিকে এটার স্থপতি ছিলেন পণ্ডিত রমাকান্ত দীক্ষিত। মথুরা থেকে ২৭ জন কারিগর ভাড়া করেছিলেন তিনি। বিস্ময়কর এ কাজটা সম্পন্ন করতে ৩ বছর সময় লেগেছিলো তাদের। ১২৫৬ সালের শীতকালে

এটা উদ্বোধন করা হয়েছিলো। উদ্বোধন করেছিলেন আর কেউ নয়, স্বয়ং কাশী নরেশ, মানে কাশীর রাজা নিজে।'

বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তরুণ। 'কে তুমি?' এই-ই ছিলো তার একমাত্র বাক্য।

'আমার নাম বিদ্যুৎ শাস্ত্রী।'

অবিশ্বাসে জমে গেল তরুণ। এক মুহূর্তের মাঝে বিদ্যুৎ দেখতে পেল তার চোখে অশ্রু জমছে। বিদ্যুৎ কিছু বলার আগেই তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো তরুণ। হতবুদ্ধি হয়ে গেল বিদ্যুৎ। গভীর নিবেদনের সাথে তরুণ জড়িয়ে ধরেছে তার পা। বিদ্যুৎ নিচু হয়ে তরুণকে ধরার আগেই উঠে পড়লো সে। সম্মোহিতের মতো ঘুরে দৌড় দিলো মন্দিরের ভেতরের দিকে।

'সে এসে গেছে! সে এসে গেছে! সে এসে গেছে!' চিৎকার করতে করতে মঠের ভেতর হারিয়ে গেল ছেলেটা।

বিদ্যুতের জন্য অপেক্ষায় ছিলো তারা। শতবর্ষ ধরে।

হরপ্পা, খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
শেষ দেবতা

হরপ্পার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রমত্ত সরস্বতীর শাখা-নদী সিন্ধুর পবিত্র টলটলে জলে স্নান সেরে নিলো বিভাষণ পূজারি। জীবনদাত্রী-জ্ঞানদাত্রী হিসেবে হরপ্পাবাসী এই শক্তিশালী নদীর পূজা করে। তাকে যতটা ভালোবাসে তারা, ঠিক ততটাই ভক্তি করে। অনেকেই ভালোবেসে তাকে সরা মা বলে ডাকে।

হরপ্পা, তার আশপাশ এবং মহেঞ্জোদারো আর লোথাল-এর মতো দূরবর্তী প্রদেশগুলোর অস্তিত্ব সরস্বতীর উপর নির্ভরশীল। খাবার পানি, চাষাবাদ, পরিবহন, মাছ, ঔষধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা এবং আধুনিক বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান পালনের পবিত্র জায়গা প্রদান করে এই নদী। হরপ্পান সমাজ ব্যবস্থার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে এই নদী।

আগামী পরশুদিন হতে যাচ্ছে বিভাষণ পূজারির জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। বয়স পঞ্চান্ন বছর হলেও দেখে পঁয়ত্রিশের বেশি মনে হয় না। তার তামাটে বর্ণের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হয় বিরল আভা, এবং তার রয়েছে একজন শক্তিমান সন্ন্যাসীর মতো বিশাল কপাল। বিজয়ের পর হরপ্পার সুরিয়া বা সূর্য উপাধিতে ভূষিত হবেন তিনি, পাবেন প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব। ক্রীড়াবিদের ন্যায় পাথরের মতো পেটানো শরীরে অঙ্গবস্ত্রম (লম্বা জোব্বা)-এর নিচে কিলবিল করছে পেশি। বিভাষণ পূজারি কেবল প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, মন্ত্র আর কীর্তনের একজন বিজ্ঞ জানেওয়ালাই নন, সুগভীর এবং আধুনিক বেদের একজন রচয়িতাও বটে যা সাহিত্য, প্রকৃতিবিজ্ঞান আর

আধ্যাত্মিকতাবাদের উপর সবচেয়ে সমকালীন কাজ। বলা হয়ে থাকে যে তার উপর প্রাচীন ঋষিদের স্বর্গীয় আশীর্বাদ রয়েছে। এই ঋষিরা হলো তারা যারা শিব এবং শক্তির সাথে সৃষ্টির সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিভাষণ পূজারি মানুষ নন। তিনি একজন স্বর্গীয় সত্তা। পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া শেষ দেবতা।

অথবা এমনটাই ছিলো তাদের বিশ্বাস।

নিজের লাইব্রেরিতে দ্রুত পায়ে পায়চারি করছেন চন্দ্রধর। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে খুশি না হলেও তার উদ্বেগের কারণটা ভিন্ন। কেবল অসাধারণ বুদ্ধিমানই নন, তার সময়কার সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক আর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্য চন্দ্রধরের। হরপ্পার দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি তিনি। সেই সাথে রাজ্যের প্রদান কোষাধ্যক্ষ। পুরোহিত কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত প্রধানের দায়িত্বও পালন করছেন তিনি। হরপ্পার অমূল্য সম্পদ স্বর্গীয় দুগ্ধ প্রদায়ক পশু বা গো-পালকদের প্রধানও চন্দ্রধরই। যার হাতে এর নিয়ন্ত্রণ থাকে, হরপ্পার নিয়ন্ত্রণকর্তা তিনিই। তারপরও দ্বিতীয় প্রভাবশালী মানুষটা ঈর্ষায় পুড়ছেন। ঈর্ষায় পুড়ছেন হরপ্পার প্রধান প্রভাবশালী মানুষটার প্রতি। নিজের প্রাণের বন্ধুর প্রতি ঈর্ষান্বিত তিনি, ঈর্ষান্বিত নিজের ভায়রা ভাইয়ের উপর।

চন্দ্রধর যার উপর ঈর্ষান্বিত তিনি আর কেউ নন, মহাশক্তিধর বিভাষণ পূজারি।

তবে চন্দ্রধরের আসল উদ্বেগের কারণ অন্য কিছু। তার আসল চিন্তা স্ত্রী প্রিয়ংবদা বা স্বল্পভাষিনীকে নিয়ে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, তার স্ত্রী নামের ঠিক উলটোটা। তার জীবনের সবচেয়ে বড় ধাঁধা সে। চন্দ্রধরের ঠিক উলটো প্রিয়ংবদা; সে সবাইকে, সবকিছুকে ঘৃণা করে। তিনি বুঝতে পারছেন ভয়ংকর অশুভ কিছুর পরিকল্পনা আঁটছে তার স্ত্রী। এত ভয়ংকর যা হরপ্পাবাসী কল্পনাও করতে পারবে না। তাকে ঘৃণা করেন তিনি, একইসাথে পাগলের মতো ভালোও বাসেন। ওকে ছাড়া বাঁচা অসম্ভব তার।

প্রিয়ংবদা গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলো। ওখানে তখন পাগলের মতো পায়চারি করছিলেন চন্দ্রধর। তিনি দেখতে পেলেন তার অপরূপ সুন্দর মুখে হাসির অন্তরালে তীব্র ঘৃণা জমাট বাঁধছে।

'অভিনন্দন, পণ্ডিত চন্দ্রধর,' উৎফুল্ল চিত্তে বললো সে। তারপরই ডাইনির মতো হিসহিস করে উঠলো, 'আবার হেরে গেলে তুমি, বোকা!'

পবিত্র সিন্ধু-সরস্বতীর ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা রাজ্য-নিরাপত্তারক্ষীদের দিকে উপরে উঠে এলেন বিভাষণ পূজারি। তার প্রতীকচিহ্ন উজ্জ্বল সূর্যরশ্মির ব্যানারটা উঁচিয়ে ধরে আছে তারা। যেকোনো পরিস্থিতিতে বিভাষণ পূজারিকে রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব। তবে যতটা না দায়িত্ব, বিভাষণ পূজারির আশেপাশে থাকাটাকে তারচেয়ে বেশি আশীর্বাদ মনে করে তারা। কারণ তিনি হরপ্পা সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তির সময় আর্যব্রতদের দশটা যোদ্ধা উপজাতি নিয়ে আসা ছাড়াও হরপ্পায় বিভাষণ পূজারির অসামান্য অবদান আছে বলে মনে করা হয়। হরপ্পায় তিনিই প্রথমবার পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারি একত্র করে তাকে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীতে রূপান্তর করেন। অল্প সময়ের মধ্যে দূরপ্রাচ্যের অদ্ভুত, বিজাতীয় ভাষায় কথাবলা, যুদ্ধবাজ, মহাপরাক্রমশালী সুরাকে পরাজিত করেন তিনি। সুবিশাল সমভূমিতে বিভাষণ ছিলেন পরম পূজনীয় ব্যক্তি। লোকে জানতো তিনি সাধারণ কোনো মানুষ নন। বিভাষণ পূজারি যা অর্জন করেছেন এবং প্রতিদান দিয়েছেন, সাধারণ কোনো মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন দেবতা–অর্ধ মানব, অর্ধ ঈশ্বর।

বিভাষণের মনটা আজ ভীষণ ফুরফুরে। সপ্তর্ষি বা সাত ঋষির আশীর্বাদে আগামী পরশু সকালে তাকে হরপ্পার প্রধান পুরোহিত বলে ঘোষণা করা হবে। যা তাকে কার্যত সম্রাটে পরিণত করবে। বিভাষণ পূজারি আর পণ্ডিত চন্দ্রধর যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন, তার সাথে অবশ্য সম্রাট উপাধিটা মানায় না। তবে প্রধান পুরোহিতই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকর্তা।

তবে সবাই কিন্তু তার এই সাফল্যকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। প্রিয়ংবদা তো অবশ্যই না।

নিজের বিশাল, সাধারণ বাসগৃহে প্রবেশ করলেন বিভাষণ পূজারি। এটি হরপ্পার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রকাণ্ড এক স্থাপনা যেখান থেকে রাজ্য শাসন করবেন তিনি। তথাপি এটা দেখে কোনো সন্ন্যাসীর আশ্রম ব্যতীত অন্য কিছু মনে হয় না। এখানে পরিবারসহ কঠোর মিতব্যয়িতার জীবন যাপন করে ঈশ্বর আর তার প্রজাদের সেবা করে যাচ্ছেন বিভাষণ।

গৃহে প্রবেশ করতেই বিভাষণকে স্বাগত জানালো তার সতী-সাধ্বী প্রিয়তমা সুন্দরী স্ত্রী সানজানা। বিভাষণ পূজারির সহধর্মিনী হিসেবে মানুষের যথেষ্ট শ্রদ্ধা-

ভালোবাসা পায় সে। মানব সেবা আর অগাধ বৈদিক জ্ঞানের পারদর্শীতার কারণে মেয়েটাকে যথেষ্ট গুণবতীও বলা যায়।

'তারপর, অথর্ব বেদ শিক্ষা কেমন চলছে তোর, মানু?' কলা পাতায় স্ত্রীর বেড়ে দেওয়া ক্ষির খেতে খেতে পুত্রের কাছে জানতে চাইলেন বিভাষণ। 'যে বিজ্ঞানগুলো তোকে জানতেই হবে, এ তার মাঝে অন্যতম, তা জানিস তো? অলৌকিকবিদ্যা আর জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এতে।'

'হ্যাঁ, বাবা, আমি মন দিয়ে পড়ছি। কারণ এ ব্যাপারে জানার ভীষণ আগ্রহ আমার,' মানু উত্তর দিলো। 'যদিও ওখানে আত্মার জগত নিয়ে কিছু ভয়ংকর বিষয় রয়েছে, যা সরাসরি আপনার কাছ থেকে শিখতে হবে আমার,' দুষ্টুমির ভঙ্গিতে বললো মানু। সে ভালো করেই জানে কালো জাদু তরুণ সাধকদের জন্য নিষিদ্ধ। তারপরও বাবাকে জ্বালাতে পছন্দ করে সে।

'একদিন সময় করে কষে একটা থাপ্পড় বসাবো তোর গালে। শেষবার মেরেছিলাম কত বছর হলো, মনে আছে?' আমুদে কণ্ঠে বললেন বিভাষণ। তিনি জানেন যে ছেলে দুষ্টুমি করছে তার সাথে। দুজনেই শব্দ করে হেসে উঠলো একসাথে। মানু আর সানজানাকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন তিনি।

মানুর পাশে এসে বসলো সানজানা। একটু পরপরই ছেলের কলাপাতার প্লেটে ক্ষির, আলুর নিরামিষ আর পুরি তুলে দিচ্ছে। বিভাষণ আর মানুকে সূর্য আর আলোর মতো দেখতে পাওয়াটা তার কাছে ভীষণ আনন্দের। বিশ্বাস, ভালোবাসা, সরলতা আর একাত্মবোধের এক প্রতিমূর্তি বিভাষণ পূজারি। সরা মা আর ঈশ্বর মিলে যেন সাজিয়েছেন তাদের সুন্দর পরিবারটা। তাদের অনন্ত আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য বেশ কয়েক ঘণ্টা তাদের পূজা করে কাটায় সানজানা।

卐

প্রভাবশালী হলেও অতি সাধারণ ধার্মিক এই পরিবারের বিরুদ্ধে অশুভ চক্রান্ত শুরু করেছে এক অন্ধকার শক্তি। বহুদূরে এক জঙ্গলের গুহায় শুরু হয়েছে এক নির্মম কালো জাদুর যজ্ঞ। মেসোপটেমিয়ার তিন অন্ধ জাদুকর মিলিত হয়েছে একসাথে। মানব রক্তে স্নান করতে করতে খলখল করে হেসে উঠলো তারা। শুরু হয়ে গেছে এক বীভৎস আচার-আনুষ্ঠানিকতা। তাদের অপার্থিব মন্ত্রপাঠ প্রতিধ্বনিত হলো বনের ভেতর। সাথে সাথে মারা যেতে থাকলো আশেপাশের সব প্রাণী, পশুপাখি আর উদ্ভিদ। তাদের তিনজনের মিলিত অন্ধকার শক্তিকে হাজির করতে হবে। হিংস্র আর অতৃপ্ত আত্মারা জড়ো হচ্ছে শেষ জীবনমরণ লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার জন্য।

স্বয়ং দেবতাকে উৎখাত করা সহজ কাজ নয়।

বানারস, ২০১৭
রুমি পেরেরা

সার্ডিনের ক্যানের মতো রেলওয়ের কোচের ভেতরে গা ঝলসানো গরম আর স্যাঁতস্যাঁতে আর্দ্রতা। দ্বিতীয় শ্রেণির কামরাটায় হাড়সর্বস্ব, চশমাপরা এক তরুণ ভিড়ের মাঝে ঠেলা-ধাক্কা খেয়ে এপাশ থেকে ওপাশে চলে যাচ্ছিলো। ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছিলো তাকে। প্রায় সবাই তাকে ইচ্ছেমতো ঠেলছে। নিজের বর্তমান আবাসস্থল পন্ডিচেরি থেকে বানারস পৌঁছানোর জন্য বেশ কয়েকটা ট্রেন পরিবর্তন করেছে সে। ভারতের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোস্টেল থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের মতো দেখাচ্ছে রুমিকে। লিকলিকে, হাড্ডিসার দেহের এবং এলোমেলো চুলের সুদর্শন ছেলেটার মুখটা নিষ্পাপ ধরনের। চোখে মোটা, কালো রিমের চশমা।

ভীষণ দুর্বল, ভঙ্গুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী রুমি। কারো সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না সে। বিশেষ করে তার সাবেক মুম্বাই পুলিশ কমকর্তা বাবার নির্মম নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে পারেনি কখনো। ভীষণ নরম আর জটিল চরিত্র নিয়ে বেড়ে উঠেছে রুমি। সবাইকে আর সবকিছুতেই তার ভয়। মৃদু, মিষ্টি কণ্ঠে প্রতিটা কথা বলার সময় তোতলায় সে।

রুমির যখন তেরো বছর বয়স, অদ্ভুতভাবে বাড়িতে মারা যায় তার বাবা। জন্মের দুবছরের মাথায় তাকে আর তার অর্ধ-পাগল বাবাকে ছেড়ে চলে যায় তার মা। বাবার মৃত্যুর পর অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে যায় রুমি। মাতাল আর হিংস্র বাবার শেষকৃত্য করার সময় একফোঁটা অশ্রুও বিসর্জন করেনি সে। দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা ভাবলো, অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছে ছেলেটা।

ইঞ্জিনিয়ারিং-এ নিজের ব্যাচে প্রথম হলো রুমি। না স্কুলে না ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, কোথাও কখনো কোনো বন্ধু ছিলো না তার। পুরো ক্লাসের হাসির পাত্র ছিলো সে। এমনকি প্রিয়া পর্যন্ত হাসতো ওকে নিয়ে। প্রিয়া! ইংরেজিতে ভীষণ দক্ষ ছিলো রুমি। তাই ক্লাসের সবচেয়ে সুদর্শন আর জনপ্রিয় ছাত্র রাহুল যখন রহস্যজনকভাবে আত্মহত্যা করলো, সবাই তাকে একটা শোকবার্তা লিখতে অনুরোধ করলো। সুন্দরভাবে লেখা হস্তলিখিত নোটটা প্রিয়ার গার্লস হোস্টেলের কক্ষে রেখে এসেছিলো সে। এটা নিয়েও ভীষণ হাসাহাসি করেছিলো তারা। কারণ প্রিয়া ছিলো রাহুলের গার্লফ্রেন্ড।

যে বিষয়টা তারা খেয়াল করলো না সেটা হলো, রুমির বাবা আর প্রিয়ার বয়ফ্রেন্ড উভয়েই মারা গেছে রহস্যজনকভাবে। এবং বেশ নৃশংসভাবে।

বিশালাকার বারানসি রেলওয়ে স্টেশনে অল্প সময়ের জন্য থামলো ট্রেনটা। নির্গমন পথের দিকে এগোনোর জন্য সংগ্রাম করছে রুমি। তার লিকলিকে, ভয়ার্ত শরীরটা নিয়ে কম্পার্টম্যান্টের দরজার দিকে পিছলে এগিয়ে যাচ্ছে সে। সামনে দাঁড়ানো প্রতিটা মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তখনই তার পা পড়লো বিশালদেহী এক কালো দৈত্যের পায়ে। মুহূর্তের মাঝে ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা। সমানে খিস্তি করতে করতে বিশাল ওজনের এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলো সোজা রুমির গালে। বালকসুলভ মুখ থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়লো চোখের চশমাটা।

'দুঃখিত, স্যার,' প্রায় কাঁদতে কাঁদতে কালো লোকটার উদ্দেশে বললো রুমি। অন্ধের মতো হাতড়াচ্ছে চশমাটা খোঁজার জন্য। বেগুনি রঙের শার্ট পরা দশাসই কালো লোকটা রাগে গজগজ করছে। বিজয়ী যোদ্ধার মতো ভাব নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সে। যেন কিছুই ঘটেনি এমনভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে সবাই।

বারানসি রেলস্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কোচ থেকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলা হলো রুমিকে। ব্যাকপ্যাকটা সামলে নিয়ে দুর্বল, লিকলিকে শরীরে কোনোমতে সোজা হয়ে তাকালো ছেলেটা, চোখটা জলে ভরে গেছে। এক হাতে চোখ মুছে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম ধরে শরীরটা টেনে নিয়ে চললো। সে এক করুণ দৃশ্য। সবাই তাকে একজন চরম ব্যর্থ মানুষ বলেই চেনে। যার নেই কোনো প্রতিভা, নেই কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা।

আবার ছুটে চলেছে ট্রেন। বেগুনি শার্ট পরা বিশালদেহী কালো লোকটা এই মুহূর্তে নিজের রক্তে গড়াগড়ি খাচ্ছে। জনতার ভিড়ে কোনো এক দক্ষ আততায়ী তার গলাটা চিরে দিয়েছে। ক্ষতটা মাত্র ইঞ্চিখানেক গভীর হলেও নিশ্চিত মারা যাবে লোকটা। মারা যাবে ধীরে ধীরে এবং অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করে।

রুমিকে সবাই পরাজিত একজন মানুষ হিসেবে চেনে, যার প্রতিরোধ করার মতো বুদ্ধি বা সৎ-সাহস কোনোটাই নেই। কিন্তু ওরা যা জানে না তা হলো, রুমি পৃথিবীর সেরা এবং নৃশংস আততায়ীদের একজন।

সাদা মুখোশধারী ইতালিয়ান মাশ্চেরা বিয়ানকা কিন্তু ঠিকই লক্ষ করলো ব্যাপারটা।

বানারস, ২০১৭
‘কেউ তোমার অভাব বোধ করেনি?’

সামনে স্তূপ করে রাখা আগুন গরম কাচুরি আর মিষ্টি কমলা রঙের জিলাপির স্তূপ দেখে লোভ সামলানো মুশকিল। বিখ্যাত *বাসন্তী মহল হালুয়াই* কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে এসব। এগুলো গত দুই ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎকে তার শৈশবের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো বারবার।

তরুণ সন্ন্যাসীর চিৎকার পুরোহিতজিকে বাধ্য করেছিলো ত্বরিত গতিতে মঠের প্রবেশপথে হাজির হতে। বিদ্যুতকে একনজর দেখে ভেঙে পড়লেন তিনি। বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে ফোঁপাতে শুরু করলেন তিনি। হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার মানুষটা ফিরে এলে যেমন হয়। হবে না-ই বা কেন? বিদ্যুৎ তার কাছে ছেলের মতো। নিজের বাবা কার্তিকেয়কে হারানোর পর পুরোহিতজিই একমাত্র পিতৃসুলভ ব্যক্তিত্ব, যার কাছে নিরাপদ বোধ করে বিদ্যুৎ।

তীব্র আবেগ বিনিময় আর অসংখ্যবার কোলাকুলি; অভিযোগ আর পালটা অভিযোগ করে দুজন মানুষ যেন প্রমাণ করতে চাইছিলো কে কাকে বেশি ভালোবাসে। দেব-রাক্ষস মঠের ভেতরের পবিত্র দেবালয়ে নিয়ে যাওয়া হলো বিদ্যুৎকে। কঠোরভাবে এখানে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হলেও বিদ্যুতের ব্যাপারে পুরোহিতজির মনে কোনো সংশয় নেই। নিজের গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিটি হলো বিদ্যুৎ। নিজের ন্যায়সঙ্গত জায়গা বুঝে নেওয়ার জন্য মঠের আধ্যাত্মিক শক্তি তলব করেছে তাকে।

খাবার পর্ব দিয়ে শুরু হলো। অনেক দিন পর দূর থেকে ফিরে এলে স্নেহময়ী মা যেভাবে ছেলেকে যত্ন করে খাওয়ায়, পুরোহিতজি আর তার অনুসারীরা সেটার চেয়ে কোনো অংশে কম করলেন না। টেবিলে রাখা পাহাড়ের মতো খাবারের স্তূপ শেষ করতে পীড়াপীড়ি করছে সবাই। ভোজন রসিকদের স্বর্গ বলা চলে বারানসিকে। শহরের সুস্বাদু সব খাবার এনে জড়ো করা হয়েছে বিদ্যুতের সামনে।

শুরুটা হলো কাচুরি দিয়ে। গোলাকার, কড়া ভাজা খাবারটার ভেতরে মাংসের কিমা আর মসলাযুক্ত ডাল ভরা। খেতে ভীষণ মজার। তারপর এলো মুচমুচে সমুচা। পরিশোধিত ময়দা রুটির ভেতরে মসলাযুক্ত আলুর কুচি দিয়ে বানানো পিরামিড আকৃতির খাবার। এটাও কড়া ভাজা এবং ভীষণ সুস্বাদু। ওটা শেষ হতেই এলো বানারসের বিখ্যাত টমেটো চাপ। টমেটো, আলু, মরিচগুঁড়ো, পেঁয়াজ আর ভারতের সেরা মসলা দিয়ে বানানো ঘন সিরাপ। এবং তারপর এলো বানারসের বিখ্যাত মিঠাই বা মিষ্টি।

বানারসের দুগ্ধজাত মিষ্টি নিয়ে রীতিমতো একটা মহাকাব্য লিখে ফেলা যাবে। মিষ্টির বৈচিত্র্য আর উৎকৃষ্টতার ব্যাপারে বিশ্বে কলকাতাই একমাত্র এশিয়ান শহর যার সাথে বারানসির মিল রয়েছে। অভিজ্ঞ আর সূক্ষ্ম রন্ধনশিল্পীরা ঘ্রাণ শুঁকে বা দেখেই বানারসের মিঠাই চিনতে পারে। ঘন দুধের অনন্য লংলাটা আর বিখ্যাত জিলাপি দেখে যে-কারো মুখে পানি আসবে।

শারীরিকভাবে ভীষণ ফিট একজন মানুষ বিদ্যুৎ। গরমের সময় প্রায় এক মাইল সাঁতরানো আর শীতের সময় ট্রেডমিলে ম্যারাথন সমান দৌড়ানো তার রুটিন বাঁধা কাজ। প্রতিদিন সকালে উচ্চতর প্রণায়মা সাধনাও করে বিদ্যুৎ (শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের যোগ সাধনা)। তার শারীরিক ফিটনেস এত উঁচু যে বানারসের তেল, চর্বি আর মিঠাই কিছুই করতে পারবে না। তা সত্ত্বেও এমন খাদ্য ঝড়ের পর নড়তে পারছিলো না বিদ্যুৎ। প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করছিলো সে। বিশেষ করে খাবারের সাথে বয়ে নিয়ে আসা মমত্ববোধটা।

তিন দশক আগে বানারসে থাকার অনুভূতি ফিরে এলো তার।

শৈশবের অনেক বন্ধুর সাথেই পুনরায় পরিচিত হতে হলো তাকে। ভয়ংকর ত্রিশূলধারী যুবকটি আর কেউ নয়, পুরোহিতজির ছেলে সনু। ভীষণ লজ্জা পেয়েছে সে নিজের ব্যবহারে। বারবার বিদ্যুতের সাথে কোলাকুলি করছে আর ক্ষমা চাইছে। তার বাচ্চাদের মতো সরলতা দেখে উচ্চ স্বরে হেসে ফেললো বিদ্যুৎ।

তারপর রইলো বলভান্ত, শৈশবে দুষ্টুমি করে তাকে গরিলা বলে ডাকতো বিদ্যুৎ। সে দেখতেও অনেকটা দানবের মতো। সব সময় ভ্রু কুঁচকে থাকা এক ক্ষত্রিয় যোদ্ধা। হাসতে শেখেনি সে, হাসি কী জিনিস জানেও না বোধহয়। মানুষের সুখের নিক্তিতে সে নিঃসঙ্গ। তবে ও একজন রক্ষক। এছাড়া কালারিপায়াত্তুর ও একজন দক্ষ শিল্পী। কালারিপায়াত্তু হলো সন্ন্যাসী-বীর পরশুরামের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভারতীয় মার্শাল আর্ট শিল্প।

তারপর বিদ্যুতের দেখা হলো গোবর্ধন দাদার সাথে। প্রায় অন্ধ এক আয়ুর্বেদিক ঔষধবিশারদ। মাথার চুলগুলো কেবল বরফসাদা হয়ে গেছে। এছাড়া একটুও বদলায়নি সে। তারপর বিদ্যুৎ পরিচিত হলো নার্সারি স্কুলের বন্ধু বিজির সাথে। সে নিজেও বর্তমানে একজন স্কুল শিক্ষক। তীব্র আবেগ আর ভালোবাসায় একে অপরের সাথে পুনরায় পরিচিত হলো তারা সবাই।

তারপর তার দেখা হলো অপূর্ব সুন্দরী ন্যায়নার সাথে।

তার বাদামি চোখে উদ্ধত তবে সবিনয় নিবেদন দেখে মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল বিদ্যুৎ। দীপ্ত পদক্ষেপে তার পাশে হেঁটে এলো সে। তারপর বিদ্যুতের চোখ থেকে একপলকের জন্যও চোখ না সরিয়ে গাঢ় কণ্ঠে মাথা নত করে নমস্তে বললো। অন্য সময় হলে বিদ্যুৎ হয়তো তাকে উষ্ণ আলিঙ্গন করতো। তবে এটা একটা মঠ। আর প্রায় কয়েক দশক পরে এখানে এসেছে সে। বর্তমানে এখানকার রীতিনীতি কী তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে আগে–যদিও ন্যায়না তার বাল্যকালের বান্ধবী।

ন্যায়নার পরিবর্তন ছিলো বিদ্যুতের কল্পনার বাইরে। বানারসের মতো শহরে চরম রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে বড় হলেও পাগল করা সৌন্দর্য ন্যায়নার। উজ্জ্বল টানটান ত্বকে দেবীর মতো বৈশিষ্ট্য। বড় বড় তীক্ষ্ণ চোখ। গোলাকার মুখ, বাঁশির মতো খাড়া নাক, গাঢ় বাদামি চুল কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে ঢেউ খেলে। অতি সাধারণ পোশাকেই তাকে ভীষণ আবেদনময়ী লাগছিলো। তবে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে বিদ্যুৎকে সেটা ন্যায়নার অস্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস। ওকে এখানকার রানির মতো লাগছে।

'নমস্তে, বিদ্যুৎ,' হাতজোড়া করে বললো ন্যায়না। তার চোখের তারা সমানে নাচছে।

'নমস্তে, ন্যায়না,' একগাল হেসে জবাব দিলো বিদ্যুৎ।

'অবশেষে দিল্লির কর্পোরেট জগতের নক্ষত্র আমাদের মতো ছোটখাটো মানুষের সাথে দেখা করার সময় বের করতে পারলো?'

শব্দ করে হেসে উঠলো বিদ্যুৎ। বললো, 'মনে হচ্ছে এখানে কেউ আমার অভাব বোধ করেনি।'

হঠাৎ পুরোহিতজি ডাকলেন বিদ্যুৎকে।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো ন্যায়না। তার পূর্বে প্রয়োজনের তুলনায় এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো সে।

একটু আগে তার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া খাদ্যঝড় সম্পর্কে বিদ্যুতের বর্ণনা শুনে একচোট হেসে নিলেন পুরোহিতজি।

'আমার হজমশক্তি ঠিকঠাকভাবে কাজ করলেই হলো,' নিজের বর্তুলাকার পেটের উপর হাত বোলাতে বোলাতে বললো সে।

'চিন্তা কোরো না। গোবর্ধন তোমাকে হজমের ঔষধ দিয়ে দেবে,' জবাবে বললেন পুরোহিতজি, এখনো হাসছেন।

তারপর ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। অঙ্গবস্ত্রম দিয়ে নিজের মুখটা মুছলেন একবার। যেন মুখ থেকে নিজের হাসিটাই মুছে ফেললেন। তারপর বললেন, 'বিদ্যুৎ, নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে তোমাকে।'

'কী জন্যে, পুরোহিতজি?'

মৃদু ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে আছেন পুরোহিতজি। 'তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য, বিদ্যুৎ।'

'কীসের সাক্ষাৎ, পুরোহিতজি?' সোজাসুজি জানতে চাইলো বিদ্যুৎ।

নিজেকে সামলানোর জন্য একটু সময় নিলেন পুরোহিতজি। স্পষ্টতই শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন তিনি। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'মহান দ্বারকা শাস্ত্রীজির সাথে তোমার সাক্ষাতের কথা বলছি। তোমার প্রপিতামহের সাথে সাক্ষাতের কথা বলছি, বিদ্যুৎ।'

বিদ্যুৎ সব সময় জানতো, একজন পৌত্রের তার পরদাদার সাথে স্বাভাবিক সাক্ষাতের চেয়ে দ্বারকা শাস্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ অনেক ভয়ংকর হবে। তা সত্ত্বেও জানতে চাইলো, 'আমাকে কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে?'

'তোমাকে সারা রাত্র ধরে ভজন করতে হবে (এক ধরনের অগ্নিপরীক্ষা) সেই সাথে ১,০০৮ বার পবিত্র মন্ত্রপাঠ করতে হবে।'

ভ্রু কুঁচকালো বিদ্যুৎ। 'কিন্তু পুরোহিতজি, আমি নিয়মিত যোগসাধনা করি। সেই সাথে আমি একজন এডভান্স তান্ত্রিক। প্রণায়মনা সাধনা করি আমি। আটটি সিদ্ধির (অলৌকিক দক্ষতা) যা যা আপনি আমাকে বাল্যকাল থেকে শিখিয়ে এসেছেন, সবকটিতে দক্ষতা অর্জন করেছি। তাহলে আমাকে আর কী ভজনা করতে হবে?' একটু বিরক্তি সহকারে নিজের বিস্ময় প্রকাশ করলো বিদ্যুৎ। এমনটি সে সাধারণত করে না।

নিজের রাগ সামলাতে পারলেন না পুরোহিতজি। বিদ্যুতের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। হঠাৎ নিজের চরিত্রের বিপরীতে গিয়ে ফেটে পড়লেন। 'অহংকারী গর্দভ, তুমি জানো কার সাথে দেখা করতে যাচ্ছো? বর্তমানে জগতের সবচেয়ে ক্ষমতাবান আত্মা দ্বারকা শাস্ত্রীজি। যদিও এখন তিনি মৃত্যুশয্যায়, তারপরও তার বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং সেটার তীব্রতা সামলাতে পারবে না, বিদ্যুৎ!' পুরোহিতজি রীতিমতো চিল্লাচ্ছেন এখন।

এক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো সেখানে। বিদ্যুৎ জানে সে সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। নয়তো ঠান্ডা মাথার প্রচণ্ড বুদ্ধিমান পুরোহিতজি মেজাজ হারাতেন না।

নিজেকে সামলে এবার মৃদু কণ্ঠে বলতে লাগলেন পুরোহিতজি, 'বিদ্যুৎ, আমি জানি তুমি কে। আমি জানি মহান উত্তরসূরি বিভাষণ পূজারির মতো তুমি নিজেও একজন দেবতার আসনে বসতে যাচ্ছো। তবে বৎস, এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যেও না দ্বারকা শাস্ত্রী মানুষ, যোগী, দেবতা আর রাক্ষসের এক বায়বীয় সংমিশ্রণ। তার ক্ষমতার কাছে সব তুচ্ছ।'

স্নেহমাখা একটা হাত বিদ্যুতের কাঁধের উপর রেখে পুরোহিতজি বলে চলেছেন, 'তার ক্রোধের সামনে কেউ টিকতে পারবে না। এমনকি তুমিও না, বিদ্যুৎ।'

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বললো না। পুরোহিতজির দিকে তাকিয়ে সম্ভ্রমের সাথে মাথা নাড়লো বিদ্যুৎ। এবার পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে সে। আজকের দিনের মতো এখানেই শেষ করে বড় মিটিং-এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। হাতজোড় করে পুরোহিতজিকে বিদায় জানালো সে। মহাসন্ন্যাসীর সবকটা উপদেশ মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিলো। নিজের আত্মবিশ্বাস আর ক্ষমতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ জানে মৃত্যু পথযাত্রী মঠ প্রধানের সাথে দেখা করার সময় সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থানে থাকতে হবে তাকে।

মঠের বাসগৃহগুলোর মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তার পাকস্থলীতে প্রজাপতির নাচন অনুভব করছে বিদ্যুৎ। পুরোহিতজির সাথে তপ্ত বাক্যবিনিময়, এমনকি মহাশক্তিশালী দ্বারকা শাস্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের শঙ্কা ছাপিয়ে ক্রমাগত তাকে বিরক্ত করে যাচ্ছে কিছু একটা।

আসলে কিছু একটা নয়। কেউ একজন।

ন্যায়না।

হরপ্পা, খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

সপ্তর্ষি

নিজের বিশাল, সাদা অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন বিভাষণ পূজারি। মহান সপ্তর্ষি বা সপ্ত সাধুদের সাথে দেখা করার জন্য বিশ্বস্ত দেহরক্ষীদের নিয়ে পূর্ণ ছয় ঘণ্টা যাবৎ দ্রুতগতিতে অশ্ব চালনা করে এসেছেন তিনি। একজন দেবতা হওয়া সত্ত্বেও সপ্তর্ষিদের মুখোমুখি হওয়ার কথা ভেবে বিচলিত হচ্ছেন বিভাষণ। স্বর্গে ফিরে যাওয়ার আগে এই চন্দ্র বৎসরে পৃথিবীতে এটাই সপ্তর্ষিদের শেষ দিন।

মহান সপ্তর্ষিগণ কোনো সাধারণ সাধু নন। কেউ জানে না তারা কোথা থেকে পৃথিবীতে এসেছেন। পৃথিবীতে তাদের অবস্থানের উদ্দেশ্যই বা কী সেটাও কেউ জানে না। তাদের অমিত শক্তির উৎস সম্পর্কেও জানা নেই কারো। সবাই কেবল জানে যে তারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন-বনভূমি, পশুপাখি, আকাশ, নদী এমনকি ঈশ্বরকেও। সপ্তর্ষিরা মানুষের সব ইচ্ছে পূরণ করার সামর্থ্য রাখেন।

অসীম ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও সাত মহাজ্ঞানী ভীষণ নম্র, হরপ্পা ও এর জনগণের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী। বলা হয়ে থাকে যে এদের একজন একবার ফিরে তাকালেই সহস্র পুনর্জন্মের পাপমোচন হয়ে যায়। সেরে যায় সবচেয়ে ভয়ংকরতম অসুখ। তাদের নিয়ত উপস্থিতি হরপ্পার ফসলাদি আর মহানগরীর পশুসম্পদ রক্ষা করে এবং জনগণের দুঃখ-কষ্ট দূর করে। সবচেয়ে বড় কথা, তারা হলেন প্রমত্ত সরস্বতী নদীর স্নেহের সন্তান। তাদের কথা শুনেন তিনি। তারাই তার সবকিছু।

হরপ্পার পশ্চিমের সর্বশেষ প্রান্তে বিস্ময়কর তুষার আচ্ছাদিত পর্বতে সপ্তর্ষিরা অবস্থান করেন। চারপাশে সবকিছুতে তাদের শক্তিশালী উপস্থিতি অনুভব করতে

পারছিলো বিভাষণ পূজারি। বনভূমি, প্রবহমান স্রোতস্বিনী, পায়ের নিচে কাঁকড় কণা, বহমান বাতাস আর সমুন্নত পর্বত চূড়া সবখানেই আছেন তারা। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে সপ্তর্ষিরা হলেন পৃথিবী সৃষ্টির পর তার সুরক্ষার জন্য আদিম ঋষিদের রেখে যাওয়া তত্ত্বাবধায়ক। সপ্তর্ষিরা সাধারণ মানুষের মতো নন। এমনকি তারা দেবতাও নন। তারা হলেন অকল্পনীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরম স্বতঃসিদ্ধ বিস্ময়কর সৃষ্টি। ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা হলেন পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার সর্বশেষ প্রকৃত উপস্থিতি।

হাতজোড় করে হাঁটু গেড়ে বসলেন বিভাষণ পূজারি। সপ্তর্ষিদের ভালোবাসেন তিনি এবং তারাও তাকে ভালোবাসে। গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মিতহাস্যে স্বর্গীয় সপ্তর্ষিদের ডাকলেন তিনি। 'হে মহান ঋষিগণ, হরপ্পার রক্ষক, বেদের সুরক্ষা প্রদানকারী, হে এই অধমের পূজনীয় বড় ভাইয়েরা, হে সপ্তর্ষিগণ...দয়া করে এই অধমকে দর্শন দান করুন।'

দূর পর্বতচূড়া থেকে ঠান্ডা বাতাসের একটা ঝাপটা এসে লাগলো বিভাষণ পূজারির মুখে। তার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন কেউ এবং প্রকৃতি সেই খবর বয়ে নিয়ে আসছে। তারপরই বিভাষণ শুনতে পেলেন; সপ্তর্ষিদের সাথে দেখা করতে এলে প্রতিবার যা শুনতে পান। তিনি শুনতে পেলেন পাহাড়চূড়া, নদীস্রোত, বনভূমি, আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী শব্দ: ওম।

ঋষিগণ তাদের দর্শন দিতে যাচ্ছেন।

হাঁটু গেড়ে দুহাত জোড় করে গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নত করে বসে আছেন বিভাষণ পূজারি। পার্থিব আবাসস্থল থেকে একজনের পর আরেকজন ঋষি হাজির হতে লাগলেন। তারা কিন্তু হেঁটে হেঁটে তার কাছে আসলেন না। হঠাৎ করে কোথা থেকেও এসে উপস্থিত হননি তারা। মনে হচ্ছিলো আকাশ, মাটি, পাহাড়, বন বা নদীস্রোতের সাথেই মিশে ছিলেন তারা। যেন বহমান স্রোতের নিচে থাকা কাঁকড়চূর্ণ থেকে উদিত হলেন তারা। তারপর দেবদারু গাছের বাকল থেকে মনুষ্যরূপ ধারণ করলেন। ধূসর-নীল পর্বতের এক লুকোনো গুহামুখ থেকে দেহধারণ করলেন। সপ্তর্ষিরা সত্যি সত্যি ঈশ্বর নাকি মহান জাদুকর সেটা কেউ বলতে পারে না।

'হে হরপ্পার সূর্য, হে মহান দেবতা, উঠুন,' স্নেহময়ী মায়ের মতো কোমল কণ্ঠে বলে উঠলেন একজন সপ্তর্ষি। অশ্রুভেজা চোখে মুখ তুলে তাকালেন বিভাষণ। শতবর্ষ যোগ সাধনা করে কাটানোর চেয়ে সপ্তর্ষিদের পানে একবার চোখ তুলে তাকানো পরম প্রশান্তিদায়ক। এই প্রথমবার সপ্তর্ষিদের দর্শন লাভ করছে না

বিভাষণ। নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। সপ্তর্ষিদের প্রতি তার ভালোবাসার সাথে আর কোনো কিছুর তুলনা হতে পারে না।

'হে মহান ঋষিগণ, হে জনতার রক্ষক, হে সপ্তর্ষি...পরম শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় এই ভৃত্য কুর্নিশ আপনাদের করছে,' বললেন বিভাষণ পূজারি। তার সবকজন দেহরক্ষী ভয় আর অবিশ্বাসে হতবাক হয়ে চেয়ে আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নতুনজন এই প্রথমবার সপ্তর্ষি দেখছে। তারা জানে হরপ্পার সবচেয়ে পবিত্র তীর্থযাত্রার চেয়েও পুণ্যের কাজ মনে করা হয় একে। সপ্তর্ষিদের দর্শনলাভ (অথবা প্রভুর দেখা) ভাগ্যের ব্যাপার। এটা ভক্তগণকে সরস্বতী মায়ের সান্নিধ্য লাভের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসে যিনি সপ্তর্ষিদের জন্ম দিয়েছেন।

'কী মনোবাসনা নিয়ে এখানে এসেছেন, হে পবিত্র দেবতা?' একজন ঋষি জানতে চাইলেন।

'আপনাদের দর্শন এবং আশীর্বাদ লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, হে মহান ঋষিগণ,' জবাবে জানালেন বিভাষণ। সপ্তর্ষিদের দিকে তাকিয়ে এখন শিশুদের মতো হাসছেন তিনি। ঋষিদের দর্শন লাভে মনের গভীরে প্রশান্তি আর গভীর সন্তুষ্টি অনুভব করছেন বিভাষণ। মাইলখানেক দূর থেকেও তাদের আধ্যাত্মিক শক্তির বিচ্ছুরণ অনুভব করা যায়। যা আশেপাশের প্রতিটা সৃষ্টিকে পুনযৌবন আর জীবনীশক্তি প্রদান করছে। তাদের মুখোমুখি হওয়া মানে কেন্দ্রস্থল থেকে তাদের অবর্ণনীয় জীবনীশক্তি লাভ করা। বিভাষণ তাদের অদৃশ্য তবে শক্তিশালী অমীয়সুধার প্রতিটি তরঙ্গ শুষে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

'আপনাদের পূজারি আগামী পরশু হরপ্পার প্রধান পুরোহিত হিসাবে ঘোষিত হতে যাচ্ছে। পবিত্র সরা মায়ের তীরে আপনাদের করুণাধারা দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন,' বলে চলেছেন বিভাষণ।

সাত ঋষি একসাথে হেসে উঠলেন। তারপর একযোগে কথা বলে উঠলেন। যা শুনে মনে হলো একটা সত্তাই যেন কথা বলছে। 'আপনার জন্য আমাদের স্নেহ সীমাহীন। তবে একান্তই প্রয়োজন না হলে পবিত্র সরস্বতী মায়ের নাম নেবেন না।'

কথাটা শুনে বিভাষণ পূজারি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি কখনোই অকারণে সরা মায়ের নাম ব্যবহার করেন না। মনে হচ্ছে কোনো কারণে সপ্তর্ষিগণ সরা মায়ের ব্যাপারে ভীষণ সংবেদনশীল। মহান ঋষিদের সবকিছুই সংবেদনশীল। তাদের ভালোবাসা, তাদের মহত্ত্ব, তাদের ধৈর্য, তাদের ক্ষমতা...এমনকি তাদের জিঘাংসা।

তর্ক করে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলো না বিভাষণ পূজারি। সপ্তর্ষিদের পায়ের উদ্দেশে হাতদুটো জোড় করে ধাবমান স্রোতের কিনারে বালির উপর মাথা নত করে পড়ে গেলেন তিনি।

'হে মহান ঋষিগণ, আমাকে ক্ষমা করুন। অপ্রয়োজনে সরা মায়ের নাম নিয়ে কোনো অশ্রদ্ধা করতে চাইনি আমি।' এক মুহূর্ত থেমে তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'তিনি আমাকে জন্ম দেননি ঠিকই কিন্তু নিজেকে আমি তার সন্তান বলে মনে করি।'

হেসে উঠলেন ঋষিগণ। তাদের সাথে সমগ্র বিশ্বও যেন হেসে উঠলো। পাখিরা উড়ে উড়ে কিচিরমিচির করতে লাগলো। নদীস্রোতে ঢেউ উঠলো। ফুলেরা সবাই একসাথে চোখ মেলে তাকালো, এবং বিভাষণ পূজারির দেহরক্ষীদের ঘোড়াগুলো সামনের পাদুটো শূন্যে তুলে দিয়ে আনন্দে চিঁহি স্বরে ঢেকে উঠলো।

'আপনি সবার চেয়ে মহৎ, বিভাষণ পূজারি,' নির্মল হাসিমুখে তাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো।

মাথা তুলে তাকালেন বিভাষণ পূজারি। দ্রুত ক্ষমা লাভ করে স্বস্তিবোধ করছেন। এখনো বুঝে উঠতে পারেননি তিনি ভুল কী বলেছিলেন।

'প্রধান পুরোহিত হিসেবে অধিষ্ঠানের সময় আমাদের বা সরস্বতী মায়ের পবিত্র পানি প্রয়োজন নেই আপনার, বিভাষণ,' আরেকজন ঋষি বলে চলেছেন। 'আপনি জেনে খুশি হবেন যে সপ্তর্ষিগণ আপনাকে তাদের অষ্টম ভাই হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

বিভাষণ পূজারি বিশ্বাস করতে পারছেন না এইমাত্র তিনি কী শুনেছেন। ধীরে ধীরে একটা ঘোরের মধ্যে উঠে বসলেন তিনি। মুখ লেগে থাকা ধুলো ঝাড়ছেন।

'অবাক হওয়ার কিছু নেই, হে মহান দেবতা। আজকের এই অবস্থান আপনি অর্জন করে নিয়েছেন এবং একজন ভাই হিসেবে আপনাকে নিজেদের মাঝে পেয়ে আমরাও সম্মানিত বোধ করছি। খুব শীঘ্রই সপ্তর্ষিগণ অষ্টার্ষি হিসেবে পরিচিত হবেন।'

হাস্যরত সপ্তর্ষিগণ একসাথে মাথা নিচু করে বহমান নদীর স্রোত থেকে ডান হাতে কিছুটা পানি তুলে নিলেন। সেই পানি তাদের ডান বাহুতে রেখে একসাথে চোখ বন্ধ করে সমস্বরে সুরেলা কণ্ঠে গাইতে লাগলেন।

'হে বিভাষণ পূজারি, আপনাকে আমাদের একজন ভাই হিসেবে ঘোষণা করছি আমরা,' সপ্তর্ষিগণ বলে চলেছেন। তাদের শ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্য, শান্ত চেহারা থেকে উজ্জ্বল আভা বেরোচ্ছে। 'আজ থেকে আমাদের একজন হিসেবে গণ্য হবেন আপনি। আমাদের প্রজ্ঞাবান সরস্বতি মা আজ থেকে আপনারও মা।'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না বিভাষণ পূজারি। গভীর শ্রদ্ধায় সপ্তর্ষিদের পায়ে পড়ে গেলেন তিনি। মর্ত্যে দায়িত্ব পালন শেষে তিনি অষ্টার্ষি হিসেবে আলোকিত হবেন, এই ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন পুরোপুরি। কোনো মনুষ্য দেবতার এর চেয়ে বেশি আর চাওয়া থাকতে পারে না জীবনে।

বানারস, ২০১৭
মুমূর্ষু ব্রাহ্মণ গোত্র প্রধান

বাহির থেকে দেখে অপরিচিত কারো কাছে দেব-রাক্ষস মঠকে একটা অপয়া বাড়ি বলে মনে হবে। যার রয়েছে অন্ধকার করিডর আর দৈত্যাকার দর্শন ভাস্কর্যে পরিবেষ্টিত বিশাল এক আঙিনা। পাথর কেটে বানানো মানুষের দেহের উপর ভয়ংকর দর্শন সিংহের মাথাটা প্রভু বিষ্ণুর অবতার নরসিমার প্রতিমূর্তি। পেশিবহুল মানব শরীরের উপরে ভয়ংকর বিশালাকার ঈগলটা হলো স্বর্গীয় পাখি গরুড়। সেখানে অনেকগুলো অতল গহ্বরে জ্বলন্ত কয়লা গড়গড় করে জ্বলছে। হাজার বছর ধরে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এ আগুন। গেরুয়া কালো পোশাক পরা ভয়ংকর দর্শন সান্ত্রীরা তলোয়ার, ত্রিশূল আর পুরোনো দিনের এনফিল্ড রাইফেল হাতে প্রতিটা কোনায় কোনায় পাহারা দিচ্ছে। ধোঁয়া, কালো দেয়াল, বিরান আঙিনা, ভূতুড়ে স্তবগান, বিপরীত শক্তি আর খ্যাপাটে মুখ সব; পুরো এলাকাটাকে বলা হয় রাক্ষসখণ্ড বা দানব আশ্রম।

যারা এই মঠকে তাদের বসতবাড়ি আর আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র মনে করে, তাদের কাছে এটা জীবন্ত আর সুন্দর। এই নির্বাচিত মানুষগুলোরই কেবল দেবখণ্ড বা মঠের ভেতরের অংশে প্রবেশের অনুমতি রয়েছে। বহিস্থ অংশের তুলনায় এই অংশ সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে সুন্দর বাগান, ফুলবাগিচা, পদ্মপুকুর আর হাভানকুণ্ড বা পবিত্র বৈদিক ভজনের অগ্নিগর্ভ। গোলাপ আর গাঁদাফুলের গন্ধে সুবাসিত

বাতাস। বিজ্ঞ পুরোহিতগণ পবিত্র আগুন ঘিরে নানাবিদ উচ্চতর আচার-অনুষ্ঠান পালনে ব্যস্ত। বিভিন্ন স্থানে সুদর্শন ন্যাড়া মাথার তরুণ বালকেরা সমস্বরে পবিত্র মন্ত্রপাঠ করছে। পুরো আশ্রমে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বৈদিক আর পৌরাণিক স্তবগান। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে স্বর্গীয় আর আধ্যাত্মিক স্থান হচ্ছে এই দেবখণ্ড।

মঠের ভেতর এবং বাহিরের এই বর্তমান রূপ কোনো দুর্ঘটনার কারণে হয়নি। এটা মহান দ্বারকাশাস্ত্রী ও তার পূর্বপুরুষদের সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফসল এই। যার সাথে জড়িত রয়েছে মঠ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। সারা পৃথিবীকে যখন বিশ্বাস করানো হয়েছিলো এই মঠ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা আর কালো শক্তির চর্চাকেন্দ্র, প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী এই আশ্রম নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা নির্মাণ করা হয়েছিলো মানুষের কল্পনার বাইরের সব পারজাগতিক আক্রমণ প্রতিরোধ আর রুখে দেওয়ার আধ্যাত্মিক সেনানিবাস এবং দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসেবে। এটা নির্মাণ করা হয়েছিলো উত্তাধিকারীদের সুরক্ষার জন্য। বিভাষণ পূজারির উত্তরাধিকারী।

খুব কমসংখ্যক মানুষই জানে বারানসি বা কাশী সাতটা সমকেন্দ্রীয় পবিত্র বৃত্তের মাঝখানে অবস্থিত। প্রতিটা বৃত্ত এক-একজন শক্তিশালী দেবতার প্রতিনিধিত্ব করে। সাধারণ দর্শনার্থী আর কাফেলার কাছে ৫৬ টা মন্দির হলো কল্যাণ আর প্রার্থনার স্থান। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী কাশীতে ছুটে আসেন এবং দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে এই বৃত্ত আর মন্দিরগুলো খালি পায়ে প্রদক্ষিণ করেন। কেবল কাশীর গুটিকয়েক রহস্যময় পুরোহিত আর যোগী জানেন হাজার বছর ধরে এই বৃত্তগুলো রয়েছে এবং পরিমণ্ডলের অর্ধেক দূরে জন্ম নেওয়া কালো শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে।

বৃত্তগুলোর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রাচীন শহর কাশী। কাশীর কেন্দ্রে বিশ্বনাথ মন্দিরের কাছেই অবস্থিত দেব-রাক্ষস মঠ। মঠের ঠিক কেন্দ্রে বিশাল বাগান আর চতুর্দিকে প্রভু শিবার বিশাল মূর্তি পরিবেষ্টিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে দ্বারকা শাস্ত্রীর রাজসিক বাসগৃহ। নিখুঁত বাস্তু (প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যবিজ্ঞান) অনুসারে নির্মিত এবং জ্যোতিষ পূর্বানুমান অনুসারে পৃথিবীর নিরাপদতম স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে এই বাসগৃহ। এবং এটা পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান তান্ত্রিক আর বিজ্ঞ যোগীর বাসগৃহ।

প্রদীপের আলোয় মৃদু আলোকিত মহান দ্বারকা শাস্ত্রীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করতেই শক্তির উপস্থিতি টের পেল বিদ্যুৎ, যা সে এর আগে কখনো অনুভব করেনি। যে বিশাল বিছানায় প্রায় ডজনখানেক বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন

দ্বারকা শাস্ত্রী, তার আশেপাশে বিশাল কক্ষ জুড়ে শখানেক বা হাজারেরও বেশি অশরীরী আত্মার উপস্থিতি অনুভব করতে পারলো সে।

বয়সের মতো বৃদ্ধ মনে হলেও অসংখ্য বলিরেখাযুক্ত মুখ থেকে একটা পবিত্র আভা বের হচ্ছে যেন। তার বরফসাদা ঘন চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করা, যা তাকে যুদ্ধক্লান্ত মুহিকান গোত্র প্রধানের মতো ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। তার কপালে সিঁদুরের বিশাল রক্ততিলক। গলায় বেশ কয়েকটি রুদ্রাক্ষের মালা (রুদ্রাক্ষ গোটা দিয়ে তৈরি মালা। রুদ্র বা শিবের অস্ত্র বলে মনে করা হয়। এটার জীববৈজ্ঞানিক নাম হলো ইলেওকার্পাস গ্যানিট্রাস)। সাদা জোব্বা পরে আছেন তিনি। তার আঙুলগুলো দ্রুত একটার পর একটা গোটায় স্পর্শ করছে। সর্বোপরি তাকে দেখে একজন গ্যালাকটিক ওয়ার লর্ড বলে মনে হচ্ছিলো।

কক্ষের নিস্তব্ধ নীরবতার মাঝেও একটা হিসহিস শব্দ শোনা যাচ্ছে। অদৃশ্য কোনো জায়গা থেকে ভেসে আসছে ক্ষীণ একটা *ব্রহ্ম-রাক্ষস* ধ্বনি। এখানকার কোনো কিছুই সাধারণ বা পার্থিব নয়। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ ভাবছিলো তার পরদাদা একজন সন্ন্যাসী, একজন দেবতা, একজন রাক্ষস নাকি এ সবকিছুর এক বিপজ্জনক সম্মিলন।

'তোমার অথর্ব বেদ মুখস্থ আছে, বিদ্যুৎ?' গমগম কণ্ঠে জানতে চাইলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। মনে হলো কোনো ফায়ার ড্রাগন যেন চিৎকার করে উঠলো। পুরো কক্ষ জুড়ে প্রতিধ্বনিত হলো সে শব্দ।

'হ্যাঁ, বাবা...অথর্ব বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ আর ঋগ্বেদ...চারটের সবকটি আমার পুরো মুখস্থ আছে,' নিরহংকারী কণ্ঠে বললো বিদ্যুৎ। পরদাদার কাছ থেকে ভালোবাসার কোনো বহিঃপ্রকাশ প্রত্যাশা না করলেও একমাত্র রক্তের সম্পর্কের কাছে স্নেহের সামান্য ছোঁয়া না পেয়ে কিছুটা আহত হলো বিদ্যুৎ।

'হুম...' দ্বারকা শাস্ত্রী বললেন। মনে হলো কোনো বিশাল ডিজেল ইঞ্জিন যেন গর্জে উঠলো। 'কী কারণে এখানে এসেছ তুমি?'

'বাবা, পুরোহিতজি জানালেন আপনার শরীরটা ভালো নেই।'

'এখন তাহলে পুরোহিতজি সিদ্ধান্ত নেবেন দ্বারকা শাস্ত্রী কখন ভালো বা মন্দ আছেন?' প্রচণ্ড রাগান্বিত কণ্ঠে বলতে বলতে কাশতে লাগলেন তিনি। চিন্তিত ভঙ্গিতে এক পা এগিয়ে গেল বিদ্যুৎ। 'পিছিয়ে যাও!' চিৎকার করে উঠলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। জায়গায় জমে গেল বিদ্যুৎ।

'শোনো, বৎস,' বলে চলেছেন তিনি। 'তুমি যখন এসেছ, এটা একটা শুভ সুযোগ। আমি চলে গেলে তোমার জন্য আসবে ওরা।' স্বভাববিরুদ্ধভাবে কেঁপে গেল দ্বারকা শাস্ত্রীর কণ্ঠটা। শত বছরেরও বেশি বয়সের বৃদ্ধের কণ্ঠে এমন আবেগ আগে কখনো দেখা যায়নি। এর সাথে মিশে ছিলো ভয়।

বিদ্যুৎ অনুভব করলো তার কপাল আর কণ্ঠা বেয়ে ঘামের ধারা নামছে। পরদাদা যাদের ইঙ্গিত করেছেন তাদের সম্পর্কে সামান্য ধারণা রয়েছে তার। যদি তার কথা সত্য হয়, কোনো কিছুই আর আগের মতো থাকবে না বিদ্যুতের জন্য, মঠের জন্য, প্রিয় দামিনী এমনকি পুরো মানবসভ্যতার জন্য। এর মানে হলো ভুলে যাওয়া প্রাগৈতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী তার হিংস্র মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। প্রাচীন অভিশাপের কারণে গর্জে উঠছে একটা যুদ্ধ। ঈশ্বরের নামে যুদ্ধ। কথিত দেবতা আর দানবের মাঝে যুদ্ধ।

আর মঠের সবাই যেমনটি বিশ্বাস করে, সেই সাথে রোমের অর্ডারও যে বিষয়ে নিশ্চিত তা হলো: বিদ্যুৎই রয়ে যাওয়া শেষ দেবতা।

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ
শব-সাধনা

ভয়ংকর এক দৃশ্য।

অন্ধকার এক গুহায় বসে আছে মেসোপটেমিয়ার তিন অন্ধ জাদুকর। গুহার এক কোণে মিটমিট করা জ্বলা প্রদীপের আলোয় সে আঁধার দূর হয়নি, বরং ভীতি জাগানিয়া সব ছায়ার সৃষ্টি করে পরিবেশটাকে আরো ভয়ংকর করে তুলেছে। তাদের তিনজনকে সাক্ষাৎ শয়তানের মতো লাগছে। তাদের শূন্য অক্ষিকোটরগুলো যেন একেকটা কৃষ্ণগহ্বর, বয়ে নিয়ে চলেছে নিঃসীম মহাশূন্যের পথে। তাদের চোয়াল ঝুলে পড়েছে, এবং তাদের দেখে অন্য গ্রহের হিংস্র কোনো শ্বাপদের মতো মনে হচ্ছে।

বিভাষণ পূজারির বিরুদ্ধে কালো জাদু চর্চার সময় তারা তিনজন পচা মনুষ্য রক্তে স্নান করেছে। ফলে গুহার ভেতেরে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি সব উলটে আসতে চাইছে। তবে তাদের তেজস্বী নিয়োগকর্তা পাহাড়ের মতো অবিচল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। অপার্থিব সৌন্দর্য আর অভিজাত একজন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তিন পাষণ্ডের চেয়ে তাকে বেশি ভয়ংকর দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড জিঘাংসায় পুড়ছে সে।

'কী হলো, হে পশ্চিমের ভয়ংকর জাদুকরেরা?' চাবুকের মতো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ফিসফিস করে জানতে চাইলো সে।

লাল মস্তিষ্ক-আবরণী পরা তার দেহরক্ষীরা তিন জাদুকরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মিটমিটে আলোয় জ্বলজ্বল করছে তাদের হাতের ধারালো, নাঙ্গা তলোয়ার।

তাদের প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী মালকিনের একটা আঙুলের ইশারায় কালো জাদুর এই তিন ভেলকিবাজের মাথা মুহূর্তেই ধড় থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে। মৃদু প্রদীপের আলো অশুভ কালো ছায়া ফেলেছে পাথুরে গুহার দেয়ালে। পাথরের মতো স্থবির বসে আছে পরাজিত তিন মায়া সাধক।

'কী হলো?' আবারও মৃদু স্বরে জানতে চাইলো মহিলা।

'জজজঅঅঅররররগগগগগ...উউউউররগগগগহহ...বববররররগগগগহহহহ...'

একসাথে বীভৎস স্বরে চেঁচাতে শুরু করলো তিন বজ্জাত। যা শুনে বোঝা যায় এটা তাদের নিজের কণ্ঠ নয়। বড় বড় ময়লা নখ দিয়ে নিজেদের মুখের কাঁচা চামড়া আর মাংস খুবলে তুলে আনছে। নিশ্চিতভাবে এখনো তারা তাদের উপর ভর করা অশুভ শক্তির প্রভাবে রয়েছে।

তাদের একজন কথা বলে উঠলো বীভৎস, গায়ে কাঁটা দেওয়া কণ্ঠে। যে কণ্ঠ তার নয়, মনে হচ্ছে হাজার বছর বেঁচে থাকা অন্য জগতের কোনো বুড়োর। উপস্থিত মহিলা আর তার নিরাপত্তা রক্ষীরা এর চেয়ে ভয়ংকর কণ্ঠস্বর এর আগে আর কখনো শুনেনি।

'শব...শশশহহহববব...' জাদুকরের মুখ দিয়ে অশরীরী কণ্ঠটা বলে উঠলো। তার মুখটা তীব্র যন্ত্রণায় দুমড়ে-মুচড়ে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

শব মানে মৃতদেহ। দুষ্ট জাদুকরের ভেতরে অবস্থান নেওয়া অশরীরী সত্তাটা একটা মানুষের মরা লাশ চাইছে।

দেবতা অপরাজেয়। গান, শা এবং এপ এই হাস্যকর তিন নামের কালো জাদুকর বিভাষণ পূজারির উপর একটা শক্তিশালী জাদু প্রয়োগ করেছিলো। বাস্তব পৃথিবীতে এই জাদুকে প্রচণ্ড ভয় করা হয়। কারণ এটা কার্যকর, তবে চরম অশুভ আর ভয়ংকর একটা জাদু। এটা মূলত টার্গেটের আত্মাকে চুরি করে তার বদলে সেখানে অন্য জগতের হিংস্র আর অতৃপ্ত একটা আত্মাকে প্রতিস্থাপন করে। ফলে যে মানুষের উপর এটা করা হয়, কার্যত তার জীবন আর শারীরিক অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বিভাষণ পূজারি সাধারণ কোনো মানুষ নন।

জাদু হিতে বিপরীত হয়ে ফিরে এসেছে। দেবতার আত্মা এতটাই সুরক্ষিত যে কোনো অশুভ শক্তি তাকে বশ করতে পারে না। বছরের পর বছর ধরে একনিষ্ঠ ধ্যান, আত্ম নিপীড়ন আর অথর্ব বেদের (অকাল্ট সম্পর্কিত বেদ) উপর অসাধারণ নৈপুণ্য বিভাষণ পূজারিকে করেছে অদম্য। এমনকি তার অজ্ঞাতেই বিভাষণ পূজারির আত্মা রুখে দিয়েছে এই অশুভ আক্রমণ। অশুভ অতৃপ্ত আত্মা ফিরে

এসেছে আরো ক্রোধান্বিত হয়ে এবং তিন জাদুকরের দেহে আশ্রয় নিয়েছে। তারা প্রতিশোধ চায়।

জাদুটোনায় শব-সাধনা হলো সবচেয়ে অন্ধকার এবং ভয়ংকরতম বিপজ্জনক তন্ত্র। এজন্য তরতাজা মানুষের লাশের প্রয়োজন হয় এবং সেখানে সবচেয়ে বিপজ্জনক অশুভ আত্মাটিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যারা পূর্বে এই তন্ত্র করার চেষ্টা করেছে, তাদের বেশিরভাগই এটা করতে গিয়ে মারা গেছে। হরপ্পার পবিত্র ধর্মগ্রন্থে শব-সাধনাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এটা সৃষ্টির মূলনীতির বিপরীতে যায়।

শব-সাধনা মৃতকে জীবিত করতে পারে। আর এই জীবন খুবই অসম্মানের।

‘কে সেই নর্তকী যে নাচার সময় কেবল চুড়ি পরে নাচে?’ সুন্দরী অথচ ডাইনির মতো দেখতে মহিলাটি জানতে চাইলো। তার রক্ষীদের কেউই উত্তর দিলো না। যদিও তারা সবাই জানে কার কথা বলছে সে।

‘তোমরা কি শুনতে পাওনি আমি কী জিজ্ঞেস করেছি?’ আবার বললো সে। ‘রাঙা!’ এবার ভ্রু উঁচু করে তার দেহরক্ষীদের সর্দারকে জিজ্ঞেস করলো মহিলা।

‘আপনার ভৃত্যকে ক্ষমা করবেন, মা। আমি বুঝতে পারছি না আপনি কার কথা বোঝাচ্ছেন।’

হাসলো সে। তাকে এত সুন্দর লাগছে যে হয়তো স্বয়ং ঈশ্বরও আফসোস করছেন এই ভেবে যে এই মহিলার মুখের সৌন্দর্যের ক্ষুদ্রতম কণাও যদি তার হৃদয়ে থাকতো।

‘সত্যি? তবে শোনো, এ হলো সেই ডাইনি যার সঙ্গ পেতে চায় হরপ্পার প্রতিটা পুরুষ।’ মাথাটা ঈষৎ বাঁকা করে কর্তৃত্বের সুরে গর্জে উঠলো সে। ‘এবার আমার কথার জবাব দাও!’ বজ্রপাত হলো যেন।

‘নয়নতারা, মালকিন...তার নাম নয়নতারা,’ তড়িঘড়ি করে জবাব দিলো রাঙা। ভয়ংকর নৃশংসতার জন্য হরপ্পায় কুখ্যাতি রয়েছে তার। তবে মালকিনের সামনে দাঁড়িয়ে দৈত্যাকার রাঙা কেবল ভিজে বেড়াল ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার হেসে উঠলো সে। মুখটা ধীরে ধীরে পাথরের মতো হয়ে গেছে। ঘৃণা আর প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদ হয়ে গেছে সে।

‘ওকে ব্যবহার করো। এই কুকুর তিনটাকে একটা যুবতী মেয়ের দেহ এনে দাও। তারপর নয়নতারার আত্মাকে বন্দি করার চেষ্টা করো। বিভাষণ পূজারির পবিত্র আত্মাকে সে-ই কেবল অপবিত্র করতে পারবে।’

মনে মনে খ্যাঁক খ্যাঁক করে দুষ্ট ডাইনির মতো হেসে উঠলো গান। পৈশাচিক আনন্দে গড়গড় করে উঠলো শা। ইতোমধ্যে দুর্বোধ্য ভীতি জাগানিয়া কিছু পাঠ করতে শুরু করেছে এপ। ভয়ংকরতম দুঃস্বপ্নের চেয়ে ভীতিকর কিছু মনে হচ্ছে ওদেরকে।

রাঙা আর তার লোকজন ভয়ে ঢোক গিললো। তবে গুহার ভেতরে একমাত্র মহিলাটিকে অবিচল মনে হলো। পণ্ডিত চন্দ্রধরের স্ত্রীকে যতটা ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার কথা তার উলটোটা মনে হচ্ছে। গোখরা সাপের হলুদ বিষের চেয়ে কোনো অংশেই কম বিষাক্ত নয় প্রিয়ংবদার রক্ত।

বানারস, ২০১৭
মানবসভ্যতার চরম অসত্য: ১ম পর্ব

'হরপ্পা?' বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো বিদ্যুৎ। এখন সে প্রপিতামহের পাশে বিছানার উপরে বসে আছে।

প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে দ্বারকা শাস্ত্রীর বাসগৃহে অবস্থান করছে সে। একবার কেবল আশ্রমের চিকিৎসক গোবর্ধন বাবু এসে সাময়িক বিচ্যুতি ঘটিয়েছিলেন। এই ছটি ঘণ্টা বিদ্যুতের জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর এবং সেই সাথে সবচেয়ে সেরা সময়। এখন সে জানে পরদাদার সাথে দেখা করার আগে কেন পুরোহিতজি তাকে বিশেষ স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আচার পালন করতে বলেছিলো। তার মনে হচ্ছে মাথাটা যেন অগ্নিগোলকের মতো বিস্ফোরিত হবে।

এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে মহান বিভাষণ পূজারি, চন্দ্রধর, নয়নতারা, প্রিয়ংবদা, মানু, সাঞ্জনা, সমদূত, সরস্বতী নদী, সপ্তর্ষিগণ আর হরপ্পার শ্বাসরোদ্ধকর নির্মম গল্পের একটা অংশ বর্ণনা করছিলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। তিনি হরপ্পা শহর, এর সংস্কৃতি আর সরস্বতীর তীরে কীভাবে মহান সনাতন ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিলো তা বর্ণনা করছিলেন। এটা বিশ্বাস করতে বিদ্যুতের কষ্ট হচ্ছিলো যে হাজার বছর আগে হরপ্পায় রচিত একটি সত্য ঘটনা শুনছে সে। একটা সভ্যতা যার কথা এতদিন স্কুলের পাঠ্য বইয়ে পড়ে এসেছে।

বিদ্যুৎ বুঝে উঠতে পারছিলো না সে কী প্রতিক্রিয়া দেখাবে। এটা যদি তার মহা ক্ষমতাবান পরদাদা না হয়ে অন্য কেউ হতো, তাহলে সে এটাকে একজন গল্পকথকের কল্পনা বলে হেসে উড়িয়ে দিতো। কিন্তু ইনি দ্বারকা শাস্ত্রী, যিনি বর্ণনা

দিচ্ছিলেন অসাধারণ এই ভয়ংকর গল্পের। এবং দ্বারকা শাস্ত্রী কোনো গল্পকথক নন।

'কিন্তু বাবা, শিশুকাল থেকে আমরা শিখে এসেছি যে হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারো হলো প্রাগৈতিহাসিক শহর, এমনকি বেদ আর পুরানেরও আগের।'

প্রপৌত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে বলে যাওয়ার সুযোগ দিলেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

'মাফ করবেন, বাবা। যা প্রতিষ্ঠিত, প্রচারিত এবং সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে সারা বিশ্বে যা শেখানো হয়, হাস্যকরভাবে এটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই যে দেখুন না, আপনি যেভাবে বিভাষণ পূজারির পাঁচ হাজার ঘোড়াকে হরপ্পায় নিয়ে এসে সেনাবাহিনী গঠন করার বর্ণনা করলেন। এখন প্রবলভাবে বিশ্বাস করা হয় যে হরপ্পাতে কখনো কোনো ঘোড়া ছিলোই না। আর্য আক্রমণের সময় এগুলো হরপ্পায় এসেছিলো।'

পরিহাসের ভঙ্গিতে হাসলেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

'তুমি যে নামগুলো ব্যবহার করেছ সেগুলো লক্ষ করো। হরপ্পাকে তুমি বলেছ সিন্ধু সভ্যতা। তুমি যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছ সেগুলো লক্ষ করো–প্রতিষ্ঠিত, প্রচারিত, শেখানো এবং...আর কী যেন...ও হ্যাঁ, বিশ্বাস।' আবার শুরু করার আগে এক মুহূর্তের জন্য থামলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। 'এখন আমাকে বলো, কে প্রতিষ্ঠা করলো এই বিশ্বাস? কারা প্রচার করলো? কেন শেখানো হলো? কীভাবে গত দেড় শতাব্দী ধরে তুমি সহ লক্ষ লক্ষ মানুষ মানবসভ্যতার এই বিরাট অসত্য কাহিনিটাকে বোকার মতো বিশ্বাস করলো?'

'কিন্তু বাবা, আপনি কীভাবে বলবেন যে সিন্ধু সভ্যতা...'

'যথেষ্ট হয়েছে!' বিদ্যুতের কথার মাঝ পথে গর্জে উঠলেন বৃদ্ধ। 'বন্ধ করো ঐ ষড়যন্ত্রমূলক নামের ব্যবহার, সিন্ধু সভ্যতা!' আবারও প্রচণ্ড কাশতে শুরু করলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। তারপরও রাগান্বিতভাবে চিৎকার করে বলে চলেছেন তিনি। 'তুমি কি এখনো বুঝতে পারছো না, বোকা ছেলে? হরপ্পা সিন্ধু বা এটার উপত্যকা নয়!'

এক মুহূর্তের জন্য থেমে তিনি দেখলেন বিদ্যুৎ তার কথা ধরতে পারছে কি না। তারপর প্রায় ফিসফিস করে ক্লান্ত স্বরে বলতে লাগলেন, 'হরপ্পা ছিলো সরস্বতী সভ্যতা, বিদ্যুৎ!'

॥ ৯ ॥

আলাপ শুরুর সময় থেকে আঠার মতো চেয়ারে বসে আছে বিদ্যুৎ। প্রভু শিবের প্রতি প্রার্থনার সময় হয়ে গেছে দ্বারকা শাস্ত্রীর। সে হতবুদ্ধি, নির্বাক আর উত্তেজিত

হয়ে বসে আছে। পরদাদা তাকে হরপ্পার শুরুর গল্পটা তাকে বলেছেন। হারিয়ে যাওয়া নদী সরস্বতীর তীরে গড়ে ওঠা সিন্ধু উপত্যকার বিশাল সব স্থাপনাসংবলিত সভ্যতা। কিন্তু বিদ্যুৎ কিছুতেই মেলাতে পারছে না এসবের সাথে তার বা তার পরদাদার সম্পর্ক কী। আরো জানতে চায় সে...সব জানতে চায়! প্রাত্যহিক আচার পালনের জন্য প্রস্তুতি সারতে দ্বারকা শাস্ত্রীর বিশ্বস্ত ভৃত্য প্রবেশ করলো কক্ষে। সুতরাং, এখন তাকে কক্ষ ত্যাগ করতে হবে।

বাগান-বেষ্টিত কুঁড়েঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো সে। এই মুহূর্তে তার একটা সিগারেট ভীষণ প্রয়োজন। মাথা ঘুরছে তার, এবং একমাত্র নিকোটিনই তাকে আরাম দিতে পারে। যেখানেই হোক একটা সিগারেট খুঁজে পেতে হবে তাকে। তার হাতে এক ঘণ্টা সময় আছে এবং মঠ থেকে বেরোনোর সিদ্ধান্ত নিলো সে। দেবখণ্ডের ভেতর দিয়ে সোজা বাইরের অংশে রওয়ানা দিলো সে। পথে পুরোহিতজি আর ন্যায়নার সাথে দেখা হলে মাথা নাড়লো। 'একটু ঘাটের (জেটি) দিকে যাবো, পুরোহিতজি,' কেবল এটুকুই বলতে পারলো সে।

বিদ্যুতের কেন বিরতি প্রয়োজন সেটা বোঝার মতো জ্ঞান পুরোহিতজির আছে। সে যা শুনেছে সেটা হজম করার জন্য সময় প্রয়োজন। কারণ তার জন্য অপেক্ষমান অন্ধকার ষড়যন্ত্র আর তীব্র দ্বন্দ্বের এটা কেবল শুরু।

দুপুর হয়ে গেছে। গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার জন্য একটা রিকশা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো বিদ্যুৎ। পূজনীয় নদীর ঘাটগুলোও একেকটা বিশ্বের বিস্ময়। পৃথিবীর কোথাও যদি নানান জাতি, বর্ণের, আকারের এবং রঙের এত বৈচিত্র্য থেকে থাকে সেটা হলো কাশীতে গঙ্গার ঘাটগুলো।

বিস্তৃত নদীতীরকে ঐতিহ্য আর প্রাচুর্য অনুসারে বেশ কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার প্রত্যেকেরই রয়েছে গর্ব করার মতো অতীত ইতিহাস। হিন্দি আর সংস্কৃতি না জানা অপরিচিত কারো এসব নাম উচ্চারণ করাটা বেশ কষ্টকর। ঘাটের নামগুলো একেকটা কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দশাশ্বমেদ ঘাট, নামটা অনুবাদ করে দিলে হয়ে যায় *দশটি উৎসর্গকৃত ঘোড়া*-র ঘাট। অমর কবি এবং *রামচরিতমানস*-এর রচয়িতা তুলসি দাসের একসময়ের বাসস্থান হলো তুলসি ঘাট। বলা হয়ে থাকে, প্রভু রামকে গণমানুষের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলো মহাকাব্য *রামচরিতমানস*। কারণ সংস্কৃতের কঠিন বলয় ভেঙে এটা রচনা করা হয়েছিলো গণমানুষের ভাষায়।

মনিকর্ণিকা ঘাট সম্ভবত সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় আর ভূতুড়ে জায়গা। এটা হিন্দুদের ব্যস্ততম শ্মশানঘাট। বলা হয়ে থাকে যে দশ সহস্র বছরেরও বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এখানে চিতার আগুন জ্বলছে। মনিকর্ণিকা ঘাটে এক মুহূর্তের জন্যও মরা পোড়ানো বন্ধ থাকেনি। বলা হয়ে থাকে, প্রভু বিষ্ণুর কানের

দুল থেকে একটা রত্ন খসে পড়েছিলো এখানে, যার ফলে এখানে সৃষ্টি হয়েছিলো পবিত্রতম পারাপারের সেতু।

লোকে লোকারণ্য দশাশ্বমেদ ঘাটের কাছাকাছি এসে রিকশা থেকে নেমে পড়লো বিদ্যুৎ। রিকশাওয়ালার হাতে একটা একশো রুপির নোট ধরিয়ে দিলো সে, অল্প দূরত্বের নিয়মিত ভাড়ার প্রায় চারগুণের অধিক। আশেপাশের অনেগুলো অভিজাত দোকানের একটা থেকে সবচেয়ে ভালো ব্র্যান্ডের এক প্যাকেট সিগারেট কিনলো সে। তারপর কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে ঘাটের আরো নিচে নেমে গেল। গঙ্গা মাইয়ার উদ্দেশে একটু প্রার্থনা করে নিলো সে। স্থানীয় লোকজন ভালোবেসে গঙ্গাকে এ নামেই ডাকে। এখানে কী জানি কিছু একটা আছে, যা ভারতীয়দেরকে এই নদীর সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে গভীর আর অবিচ্ছেদ্য এক বাঁধনে।

॥ ৯ ॥

সিঁড়িতে বসে পড়লো বিদ্যুৎ, পূর্ণ জৌলুস নিয়ে বয়ে চলা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে। স্বর্গীয় দৃশ্য। শেষবার যখন বিদ্যুৎ এখানে এসেছিলো, তার থেকে প্রায় কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। ঘাটটা কেবল আরো পরিষ্কার আর পরিপাটি হয়েছে। আবার সে প্রত্যক্ষ করছে, বছরের পর বছর ধরে প্রায় শৈশব থেকে যা তার আক্ষেপ হয়েছিলো এতদিন। সে প্রত্যক্ষ করছে মানুষের পাহাড় সমান বিশ্বাস আর প্রশ্নাতীত ভক্তি। বৃদ্ধ মহিলারা আসছেন, এত বৃদ্ধ যে বিশ্বাস হতে চায় না। ছেঁচড়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামছে তাদের কম্পমান হাতের আঙুল দিয়ে পবিত্র পানিটাকে একবার স্পর্শ করার জন্য। তরুণী মায়েরা তাদের নবজাতকদের নিয়ে এসেছেন কপালে পবিত্র পানির ছোঁয়া দিতে। তারপর আছেন প্রিয়জন হারানো মানুষেরা। প্রয়াত ভালোবাসার মানুষটার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য পবিত্র জলে একবার ডুব দিতে চান তারা। ঘাটে উপস্থিত প্রতিটা মুখে একনিষ্ঠ নিবেদন। গঙ্গা সত্যিই অমৃতসুধা, মুছে দেয় লক্ষ জনমের পাপ।

সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে বিদ্যুৎ বুঝতে পারলো সেটা ধরানোর মতো কিছু নেই তার কাছে। কী করবে কিছু বুঝে ওঠার আগেই রুপালি একটা লাইটার জ্বলে উঠলো তার জন্য। বিদ্যুৎ তাকিয়ে দেখলো, দামি লাইটারটা পকেটে ভরতে ভরতে হ্যাংলা, পাতলা, সুদর্শন এক যুবক তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'যদি কিছু মনে না করেন...আমি কি এখানে বসতে পারি?' নিষ্পাপ হেসে পরিষ্কার ইংরেজিতে জানতে চাইলো তরুণ।

'অবশ্যই,' আমন্ত্রণ জানিয়ে বললো বিদ্যুৎ।

বিদ্যুতের পাশে বসে পড়লো তরুণ, নিজেও একটা সিগারেট টানছে। কয়েক মিনিট কোনো কথা না বলে প্রমত্ত গঙ্গার মন্ত্রমুগ্ধকর আর প্রবল স্রোতের দিকে

তাকিয়ে বসে রইলো তারা। বিদ্যুৎ লক্ষ করলো, পাশে বসা তরুণ তারই বয়সি, ভদ্র এবং বালকসুলভ চেহারার। যেন কেউ হ্যারি পটারকে তুলে এনে কৈশোরের সারল্য সহকারে বড় বানিয়ে দিয়েছে।

একটা সিগারেট শেষ করে আরেকটা বের করলো বিদ্যুৎ। তার মুক্তি প্রয়োজন, মাথার চিন্তার জট থেকে মুক্তি। তার প্রতিবেশী আবারও দ্রুত লাইটার বের করে তার দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরিয়ে দিলো। লাইটারটা নিজের নীল জিন্সের পকেটে ফেরত রাখতে রাখতে থেমে গেল সে, গুঁজে দিলো বিদ্যুতের হাতের ভেতরে।

'আপনি যেভাবে সিখারেট খাচ্ছেন, আমার চেয়ে আপনার এটা বেশি দরকার,' অপূর্বভাবে হেসে বললো আগন্তুক।

উচ্চ স্বরে হেসে উঠলো বিদ্যুৎ। পাশে বসা লাজুক তবে বুদ্ধিমান তরুণ মুগ্ধ করেছে তাকে। দশাশ্বমেদ ঘাটে সন্ধ্যার মৃদু বাতাস যখন তাদের মুখ আর চুলে পরশ বুলিয়ে যাচ্ছিলো, বিদ্যুৎ নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের পরিচয় দিলো। 'হাই, আমি বিদ্যুৎ। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

বিদ্যুতের বাড়ানো হাতটা আঁকড়ে ধরলো সুদর্শন তরুণ, হেসে প্রতিউত্তর দিলো, 'হাই, আমি রুমি। রুমি পেরেরা।'

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ

প্রলয়

'সবচেয়ে শক্তিশালী ধুতুরা (শয়তানের আপেল), মুক্তোর গুঁড়ো আর বাংলা মদে মাতাল করে দাও ওকে,' অর্ধ-মাতাল কিন্তু পাগল করা সৌন্দর্যের নয়নতারাকে উদ্দেশ্য করে বললো প্রিয়ংবদা। 'সবচেয়ে বড় কথা, তোমার শরীরের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করো তাকে।'

রাজকীয় ভঙ্গিতে এবং মোমের পুতুলের মতো মাথা নাড়লো নয়নতারা। সে আসলে নিজের মধ্যে নেই। প্রকৃতপক্ষে, হাজার বছর পরে এ ধরনের অবস্থাকে সিজোফ্রেনিয়া নামে অভিহিত করা হবে।

১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হরপ্পার বিশাল বিস্তৃত ভূখণ্ডে নয়নতারার এই অবস্থাকে গান, শা আর এপ-এর শব-সাধনার ফলাফল বলে মনে করা হতো। ক্রোধান্বিত এক ডাকিনী (অকালে মারা যাওয়া মৃত নারীর আত্মা) ভর করেছে নয়নতারার উপর, যাকে কখনোই পরাজিত করা সম্ভব না।

হরপ্পার শেষ প্রান্তে পরিত্যক্ত শ্মশানে শুরু হয়েছে ভয়াবহ এক আনুষ্ঠানিকতা। মায়া-মন্ত্র আর প্রেতাত্মাদের সাধক গান, শা আর এপ শব-সাধনার প্রস্তুতি শুরু

করে দিয়েছে। শহরের মরাখোলা থেকে সদ্যোমৃত একটা লাশ নিয়ে এসেছে প্রিয়ংবদার দেহরক্ষীদের সর্দার। ফর্সা-সুন্দর যুবতী এক নারীর লাশ। বয়স সম্ভবত ত্রিশ বছর।

দীর্ঘ সাত মাস ভ্রমণ শেষে বিশাল হরপ্পা নগরীতে এসে পৌঁছেছে তিন অশুভ মেসোপটেমিয়ান জাদুকর। শহরের সবচেয়ে ক্ষমতাবান নারী প্রিয়ংবদার আমন্ত্রণে এখানে এসেছে তারা। কালো জাদুর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ জাদুকর হিসেবে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের নাম। প্রিয়ংবদা জানতো হরপ্পা বা আশেপাশের রাজ্যের কেউ মহান বিভাষণ পূজারিকে আক্রমণ করতে সাহস করবে না। আর সেজন্যই দূরদেশ থেকে মায়া জাদুতে পারদর্শী লোক খুঁজে ভাড়া করে এনেছে সে।

উলঙ্গ মৃত নারীর দেহটা পবিত্র আগুনের সামনে লম্বালম্বিভাকে শুইয়ে দিলো শা। মাটির একটা পাত্র থেকে মানুষের রক্ত ঢেলে শব-সাধনার জায়গাটা ভিজিয়ে দিলো এপ। সাধনার অগ্নিকুণ্ড ঘিরে ঘুরছে সে। সবচেয়ে নেশাকর মদভরতি পাত্রে ভেজানো সবচেয়ে শক্তিশালী নরমুণ্ডুটা বের করে সেখানে রাখলো গান। তারপর মাটির সানকিতে করে পাঁচটা ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর পচা মাংস নিয়ে পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখলো। দৃশ্যপট প্রস্তুত।

মন্ত্রপাঠ শুরু হলো। লোমহর্ষক এই তন্ত্রানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য মরা পোড়ানোর স্বর্গীয় দেবী শ্মশানতারাকে সন্তুষ্ট করা। কিন্তু ভয়ংকর হলেও শ্মশানতারা অপদেবী নন। তাই এই তিন পশুসম মানুষের ডাকে সাড়া দিলেন না তিনি। কেবল সত্যিকারের তান্ত্রিকদের জন্য তার আশীর্বাদ সংরক্ষিত থাকে। তবে ভোরের ঠিক আগের অন্ধকার, অশুভ সময়ে এই ভয়ংকর মন্ত্রপাঠ বেশ কয়েকটা ডাকিনী বা অতৃপ্ত মৃত নারীর আত্মাকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো। সুন্দরী নারীর মৃতদেহে ভর করার সিদ্ধান্ত নিলো এক শক্তিশালী ডাকিনী।

॥ ৯ ॥

পৈশাচিত আনন্দে চোখবিহীন কোটরের গর্ত দিয়ে একে অপরের দিকে তাকালো গান, এপ ও শা। তারা অনুভব করলো মৃতদেহটা কেঁপে উঠলো এবং তারপর অশরীরী কণ্ঠে গোঙাতে শুরু করলো। লাশের ভেতরে প্রবেশ করছে ডাকিনী। প্রকৃতির নিয়মের বাইরে কাজটা করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে তার। কেবল মৃতদেহে প্রবেশ করতে পারলেই সে কোনো জীবন্ত মানুষের শরীরে ভর করতে পারবে। এবার যেমন সে নয়নতারার শরীর দখল করবে।

এখন শোয়া থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে যুবতী মহিলা। খিস্তি করছে আর গোঙাচ্ছে বিরামহীনভাবে। মানুষের হাড় গলায় চেপে ধরে তাকে মাটির সাথে

গেঁথে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে শা। পৈশাচিক মন্ত্রপাট চলছে। ধীরে ধীরে তবে নিশ্চিতভাবে জীবন্মৃত দেহটায় প্রবেশ করছে ডাকিনী।

জাদুকর তিনজন এখন জানে যে সুন্দরী নয়নতারার আত্মা চুরি করে তার দেহে প্রবেশের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। এই প্রথমবার কেউ সাফল্যের সাথে শেষ করতে পারলো নিষিদ্ধ শব-সাধনা।

তিন শয়তান এখন নিশ্চিত যে হরপ্পার শীর্ষ পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ পেতে যাচ্ছে তারা। যা তাদের করে দেবে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষদের একজন। তেমনটিই কথা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে।

তবে এই হতভাগারা জানতো না যে তাদের কালো জাদুর চেয়ে ভয়ংকর কালো প্রিয়ংবদার হৃদয়।

॥ ৯ ॥

হরপ্পার মোহময়ী নর্তকী অনিন্দ্য সুন্দরী নয়নতারা মারা গেছে। যদিও তার নশ্বর দেহটা এখনো আছে জীবিত মানুষের মতো।

শব-সাধনার তন্ত্রবিদ্যায় প্রথম আক্রান্ত হয় মানুষের আত্মা। নয়নতারা কোনো দুষ্ট আত্মা নয়, বছরের পর বছর ধরে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখ-যন্ত্রণা সয়ে তার বিবেচনাবোধ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। যার ফলে নশ্বর দেহে প্রবেশ করে সহজেই তার আত্মার দখল নিতে সক্ষম হলো ডাকিনী। হরপ্পা এবং কাশীর লোকসংস্কৃতিতে নয়নতারার এই অবস্থাকে বর্ণনা করা হয়েছে ধুতুরার শক্তিশালী মিশ্রণের ফলাফল হিসেবে। তবে কেউ জানে না আসলে কী ঘটেছিলো।

আগের চেয়ে বেশি কামাতুর ভঙ্গিতে সাজুগুজু করছে এখন নয়নতারা। যে ডাকিনী তার দেহে ভর করেছে, এসব ছলাকলা সম্পর্কে বেশ ভালোই জানা আছে তার। অশরীরী জগতে বেশ নামডাক রয়েছে। সে জানে দৈহিক কামনার প্রতি মানুষ কতটা দুর্বল। নয়নতারার এই হঠাৎ পরিবর্তিত রূপ দেখে প্রিয়ংবদার দেহরক্ষীরাও হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। মনে মনে কৌতুক বোধ করে ডাকিনী; হরপ্পার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষটার উপর কী ভয়ংকর প্রভাবই না ফেলতে যাচ্ছে সে।

নয়নতারা জানে, মাত্র একজন মানুষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে হবে তাকে–পুরো রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষটাকে। বিভাষণ পূজারির জন্য বিশদ পরিকল্পনা আঁটলো সে। ঘটেইনি এমন একটা যৌন নিপীড়নের অভিযোগে বিচার প্রার্থনা করলো সে। শহরের হাকিমের দরবারে একটা অভিযোগ দায়ের করলো সে; মানু পূজারি নামে এক তরুণ নাকি তাকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। অনুগত ভৃত্যরা তার পক্ষ হয়ে সাক্ষ্য দিলো। শহর জুড়ে গুজব ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগলো না। নারী সুরক্ষার ব্যাপারে হরপ্পায় কঠোর আইন রয়েছে। এ

ধরনের অভিযোগ তাই উপেক্ষা করার প্রশ্ন আসে না। ডাকিনী জানতো বিভাষণ পূজারির কোথায় আঘাত হানতে হবে। সে জানতো তার দুর্বলতার জায়গা কোনটা।

॥ ৯ ॥

শহরের আদালত থেকে আসা পরোয়ানা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিলো না সাঞ্জনার। বিভাষণ পূজারি তার পাশেই বসে ছিলো। চোখ বন্ধ করে মালা জপছেন। একই কক্ষের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে মানু। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আর হতবুদ্ধি হলেও প্রশ্নাতীতভাবে তাকে নীতিবান মনে হচ্ছে। সে জানে কোথাও একটা ভুল হচ্ছে।

'আমরা এখন কী করবো, বিভাষণ?' উদ্বিগ্নভাবে জানতে চাইলো সাঞ্জনা। স্বামীর মুখের নির্লিপ্ত ভাব তার হতাশা আর রাগ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। ছেলের শান্ত, সমাহিত ভঙ্গিও ভালো লাগছে না তার। *তারা কি জানে না হরপ্পায় আদালতের পরোয়ানা মানে জনসম্মুখে বিচার?*

চোখ খুলে ছেলের দিকে ফিরলেন বিভাষণ।

'মানু, এই প্রশ্নটা করছি বলে আমাকে ক্ষমা করিস, বাবা। আমি জানি এমন একটা জঘন্য প্রশ্ন করে আমি তোর উপর চরম অন্যায় করছি। তবে প্রয়োজনের খাতিরে এটা আমাকে করতেই হবে,' বলে চললেন তিনি। 'তুই কি নয়নতারার বাড়িতে গিয়েছিলি?'

অবিচল দাঁড়িয়ে প্রিয় বাবার কথা শুনছে মানু। সময় দিচ্ছে তাকে শেষ করার। তরুণ মানু কিংবা তার বাবা কেউই তখন জানতো না যে একদিন মানু কেবল আর্যব্রত নয়, পুরো মানবজাতির ভাগ্য বদলে দেবে।

'না, বাবা।'

'আমার কলিজার টুকরা, তোকে ধন্যবাদ। এ ধরনের বিব্রতকর প্রশ্নের জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিস।'

'আপনি কেবল আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া, আপনার কাছে অন্য কিছু আশা করিনি আমি,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বললো মানু।

হাসলেন বিভাষণ পূজারি। নিজের আসন ছেড়ে উঠে কয়েক পা হেঁটে গিয়ে ছেলেকে আলিঙ্গন করলেন। একজন স্নেহশীল বাবা আর বিশ্বস্ত ছেলের গভীর আবেগী আলিঙ্গন দেখে কিছুটা স্বস্তি বোধ করলো সাঞ্জনা। তবে স্বামী আর ছেলের মতো ততটা নিশ্চিন্ত তিনি বোধ করছে না। তার মনে পড়ে যাচ্ছে কেবল হরপ্পার নির্মম জনতার আদালতের কথা।

মহানগরী হরপ্পায় বর্বর কোনো আইন যদি থেকে থাকে, সেটা হলো জনসম্মুখে অপরাধীর বিচার। সবকিছু আধুনিক বৈদিক জীবন ব্যবস্থা অনুসারে পরিচালিত হলেও হরপ্পার বিচার ব্যবস্থা আর বন্দিশালায় এখনো সভ্যতার ছোঁয়া লাগেনি। একমাত্র এসব জিনিসকেই ভয় সাঞ্জনার। আর তা-ই কিনা কড়া নাড়ছে তার দরজায়?

'আচ্ছা, তোমরা দুজনে এখন কী করবে বলে ভাবছো?' সাঞ্জনার কণ্ঠে ভয়।

সাঞ্জনার তাকানো দেখে বিভাষণ এবং মানু উভয়েই হাসিতে ফেটে পড়লো। ভয় পাচ্ছে না তারা। নিজেদের অপাপবিদ্ধ চরিত্রের আভা আর হরপ্পার কঠোর অথচ নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা থেকে আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে। বিভাষণ আর চন্দ্রধর দুই বন্ধু মিলে হরপ্পার বিচার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছে। কেউ যখন গভীরভাবে কোনো কিছুর উপর বিশ্বাস করে, তাহলে সেটার মন্দ দিকগুলো চোখে পড়ে না তার। বিভাষণ আর মানু যে হুমকিকে অবলীলায় অবহেলা করে যাচ্ছিলো, একমাত্র সাঞ্জনা তা আঁচ করতে পারছিলো।

'আগামীকাল সকালে নয়নতারার সাথে দেখা করবো আমি,' পরোয়ানাটা পার্শ্ববর্তী টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে বললেন বিভাষণ।

বিভাষণ কথা শেষ করার আগেই টলে উঠলো পৃথিবী। হরপ্পা নগরীর প্রতিটা বাড়ি, মন্দির আর প্রতিটা প্রাণী কাঁপতে লাগলো। কালো মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। বজ্রপাতের শব্দে কান পাতা দায়। লাফ দিয়ে মাকে ধরে ফেললো মানু। নয়তো পার্শ্ববর্তী একটা পিলারের গায়ে ধাক্কা খেতো সে। সর্বকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূকম্পন প্রত্যক্ষ করছে সরস্বতী তীরবর্তী বিশাল সভ্যতা। এ ধরনের কোনো কিছু এর আগে কখনো দেখেনি হরপ্পাবাসী।

শেষ দেবতা এইমাত্র যে সিদ্ধান্ত নিলেন সে সম্পর্কেই কি তাকে সাবধান করে দিতে চাচ্ছেন ঈশ্বর? নয়নতারার সাথে বিভাষণের সাক্ষাতের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন তিনি? পৃথিবীর এমন কম্পন আর আকাশের এমন কানফাটানো গর্জন মানবসভ্যতার ইতিহাসে আর কখনো দেখা যাবে না। নয়নতারার শরীরে ভর করা ডাকিনী কি তবে তার অশুভ উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে?

পৃথিবীর এই বিশাল স্থানচ্যুতির কারণ কেউ অনুমান করতে পারলো না, এমনকি বিভাষণ বা চন্দ্রধরও না। মানবসভ্যতা প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছে সরস্বতী নদীর সবচেয়ে ভয়ংকরতম সুনামি।

একটা অন্ধকার সময় এগিয়ে আসার ভীতিজাগানিয়া লক্ষণ ছিলো এ সবকিছু। মনে হচ্ছিলো ঈশ্বর যেন পৃথিবীকে সবচেয়ে ভয়ংকর আর অশেষ দুঃস্বপ্নের জন্য প্রস্তুত করছেন। এটা ভবিষ্যদ্বাণীকৃত সেই প্রলয় বা মহাপ্লাবন ছাড়া আর কিছু নয়। অবশেষে সেটা আসছে।

বানারস এবং সুইস আল্পসের কোনো এক অজানা জায়গা, ২০১৭

‘ওকে হত্যা করা অসম্ভব।’

দ্বারকা শাস্ত্রীকে বেশ সতেজ দেখাচ্ছে। তবে এটা স্পষ্ট যে অসুস্থতা তাকে ধীরে ধীরে তবে নিশ্চিতভাবে মেরে ফেলছে। ক্লান্ত দেহ আর প্রজ্জ্বলিত আত্মার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ তিনি। তারচেয়ে বড় কথা হলো, তার চোখদুটো যেদিকে তাকাচ্ছে মনে হচ্ছে ভস্ম করে দেবে। অস্বাভাবিক অন্তর্ভেদী তার চোখগুলো।

ঘাটে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ শেষে ফিরে এসেছে বিদ্যুৎ। প্রপিতামহের কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো সে। এমন সময় তার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো।

‘রিয়া, বলো,’ বললো বিদ্যুৎ। তার এক্সিকিউটিভ এসিস্ট্যান্ট ফোন দিয়েছে।

‘বিদ্যুৎ, কোথায় ছিলে তুমি, হ্যাঁ? দামিনী তোমার সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করছে। আমার বিশ্বাস সে তোমাকে কমপক্ষে ডজন দুয়েক ফোন দিয়েছে।’

‘শিট!’ বিস্মিত হলো বিদ্যুৎ। ‘আমাকে মেরে ফেলবে ও।’

বিদ্যুতের পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করলো রিয়া। বিদ্যুতের জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারে সে। কোনো কিছু শুনতে না পেলেও ওর গায়ের তীব্র সুগন্ধিটা অনুভব করতে পারছিলো রিয়া। জানে আমেরিকানোর চেয়ে কাপোচিনো বেশি পছন্দ করে সে। ঠিক যেমন জানে কালারিপায়াত্তুর পরেই জুজুৎসু তার প্রিয় মার্শাল আর্ট। জানে কী খেতে পছন্দ করে সে, কী পরতে ভালোবাসে, ব্রেকফাস্টের নাস্তার ডিমটা কেমন হবে এবং কী করলে হাসিতে ফেটে পড়বে সে। বিদ্যুতের সবকিছুই জানা রিয়ার। তার খারাপ লাগে এই ভেবে যে

বিদ্যুৎ তার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। না, কথাটা পুরোপুরি ঠিক না। হ্যাঁ, তার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে বিদ্যুৎ। তবে সবকিছু না।

'ওকে বলো যে এই মুহূর্তে খুব গুরুত্বপূর্ণ একজনের সাথে রয়েছি আমি। যত দ্রুত সম্ভব আমি ওকে ফোন ব্যাক করবো।' সাথে আরো যোগ করলো, 'ওকে জানিয়ে দাও আমি ভালো আছি, আর সবকিছু ঠিক আছে।'

'তুমি এখন কার সাথে রয়েছ, বিদ্যুৎ?' জিজ্ঞেস করলো রিয়া।

একটু অবাক হলো বিদ্যুৎ। তার এ ধরনের প্রশ্ন করার কথা নয়। এবং সেটা খুব ভালো করেই জানে সে।

'তুমি তাকে চিনবে না, রিয়া,' বলে ফোনটা কেটে দিলো সে। *আমি কার সাথে রয়েছি এটা কেন জানতে চাইলো?*

তবে সাথে সাথেই ভাবনাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললো বিদ্যুৎ। এই মুহূর্তে তার হাতে অনেক কাজ।

এ ধরনের কথা শুনে অভ্যস্থ নয় মাশ্চেরা বিয়ানকা। তা সত্ত্বেও নিজের মেজাজ ধরে রাখলো সে।

'এ ধরনের কথা কীভাবে বলতে পারলে তুমি? ও শুধুই একজন মানুষ,' সুইস আল্পসের গোপন আস্তানায় নিজের অপারেশনাল বেসে বসে উন্নত প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ফোনে কথা বলছে সে।

'তুমি ঠিকই ধরেছ...মাশ্চেরা। ও শুধুই মানুষ নয়,' অপর প্রান্ত থেকে মৃদু কণ্ঠে বললো কেউ। ওটা রুমি, নিয়োগকর্তাকে সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছিলো।

'আজ তার পাশে বসেছিলাম আমি। সে...সে অন্য রকম। তাকে হত্যা করা যাবে না। তার শরীর থেকে যে ব্যাখ্যাতীত একটা শক্তি নির্গত হয় তা সবচেয়ে সেরা আততায়ীকেও অসহায় করে দেয়।'

'তুমি বলতে চাচ্ছো ও তোমাকে দুর্বল করে দিয়েছিলো, রুমি?'

'না, মাশ্চেরা।'

মুহূর্তের জন্য উভয় প্রান্তে নীরবতা নেমে এলো।

'তুমি কে সেটা ভাবো, রুমি,' নীরবতা ভাঙলো মাশ্চেরা। 'প্যারিসের দ্রুতগামী টানেলে তোমার সেই তোলপাড় ফেলে দেওয়া কাজটার কথা ভাবো। ১৯৯৭ সালের কথা সেটা। তখন তোমার বয়স কত...মাত্র ১৬?'

'হ্যাঁ, মাশ্চেরা,' রুমি জবাব দিলো। সেদিনের স্মৃতি মনে করতে চায় না সে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মুখ ছিলো রূপসী ঐ নারীর। মৃত্যু তার প্রাপ্য ছিলো না।

তবে এছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। নির্দেশ ছিলো তাকে হত্যা করতেই হবে।

'ইস্তাম্বুল, প্যারিস, দিল্লি, দামেস্ক-এর কথা ভাবো...তুমি অপ্রতিরোধ্য, রুমি। তুমি অর্ডারের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।'

মুখটা কালো হয়ে গেল রুমির। মাস্টেরার এইমাত্র বলা কথাগুলো ভালো লাগেনি তার।

'আগেও বলেছি আমি তোমার অর্ডারের সম্পদ নই, মাস্টেরা,' অসম্ভব শীতল কণ্ঠে কথাটা বললো রুমি। 'আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি, এবং আমি ঐ কাজটাই গ্রহণ করি যেটা আমি করতে পারবো। আর অর্ডারের সাথে কাজ করলেও আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে বিস্তর ফারাক।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, রুমি,' দ্রুত জবাব দিলো মাস্টেরা। 'আমি আসলে যা বলতে চেয়েছি তা হলো, অর্ডারের বেশ কিছু উপকার করেছ তুমি।'

'ঠিক তাই, মাস্টেরা,' আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে রুমির কণ্ঠ। 'আর আমি যা বলতে চেয়েছি তা হলো, আমার আগের প্রজেক্টের সাথে বিদ্যুতের কোনো মিল নেই। ও শক্তিশালী, নির্ভীক আর...'

'আর...?'

'আমি ওর চারপাশে একটা শক্তিবলয় দেখেছি,' বললো রুমি। 'তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে বছরের পর বছর ধরে আমার সাফল্যের মূল কারণ হলো আমি আমার শিকারের আসন্ন মৃত্যু আগেই জানতে পাই। আমি দেখতে পাই এটা।'

'এটা তোমার বিরল প্রতিভা, রুমি।'

'সম্ভবত। কিন্তু আমি বিদ্যুতের মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি না মাস্টেরা। ব্যাখ্যাতীত কিছু একটা সুরক্ষা দিচ্ছে তাকে।'

নীরবতাটা বেশ কিছুক্ষণ দীর্ঘ হলো এবার। তার বিখ্যাত হিটম্যানকে কখনো এমন নার্ভাস হতে দেখেনি মাস্টেরা। সে আরো বুঝতে পারলো, এর আগে এত সময় নিয়ে কখনো রুমির সাথে কথা বলা হয়নি তার। এই প্রথমবার মাস্টেরা এমন কিছু প্রত্যক্ষ করছে যা আগে কখনোই দেখেনি সে। *রুমি নিজের উপর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে!*

'কোনো কিছুই তোমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না, রুমি,' ব্যাপারটা রীতিমতো উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে নিজের স্যাটেলাইট ফোনে বললো মাস্টেরা। 'তুমি একজন শিল্পী। আর বিদ্যুৎ একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'আমার উপর তোমার বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ, মাস্টেরা। এ তোমার মহানুভবতা।'

'এখন যা করা প্রয়োজন সেটাই করো, রুমি। আমি আমার এলিট ইউনিট পাঠাচ্ছি। কেবল নিশ্চিত হওয়ার জন্য। আমি জানি ওদের কোনো প্রয়োজন নেই

তোমার। তারপরও ব্যাকআপ হিসেবে পাঠালাম। বিদ্যুৎ যেন ঐ শহর থেকে জীবিত বেরোতে না পারে।'

'পারবে না, মাস্তেরা।'

রুমি এবং মাস্তেরা উভয়েই জানতো বিদ্যুৎ কোনো সাধারণ মানুষ নয়।

বাবার দরবারে প্রবেশ করে বসার জন্য বৃদ্ধের ইশারার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যুৎ। বড় বালিশে ভর দিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছেন দ্বারকা শাস্ত্রী। চোখদুটো বন্ধ করে গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন তিনি। ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে করতে গভীর মমতায় প্রপিতামহের দিকে তাকিয়ে আছে বিদ্যুৎ। প্রায় কয়েক যুগ পর বাবার সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে সে। প্রাথমিক ভয় আর উদ্বেগ অনেকটাই কেটে গেছে। দ্বারকা শাস্ত্রীর পাহাড়সম ব্যক্তিত্বের আড়ালে গভীর মমতার বন্ধনটা এখন অনুভব করতে পারছে বিদ্যুৎ।

কয়েক মিনিট পর চোখ খুললেন মঠাধ্যক্ষ। বিদ্যুৎকে ইশারা করলেন পাশে গিয়ে বসার জন্য। পূর্বসূরিদের শ্বাসরুদ্ধকর অবিশ্বাস্য গল্পের পরবর্তী অংশটা শোনার জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বিদ্যুৎ। যদিও এ পর্যন্ত যা শুনেছে মোটামুটি ভালো একটা ধাক্কা খেয়েছে সে।

প্রপিতামহের পা ছোঁয়ার জন্য এক পা সামনে এগিয়ে গেল বিদ্যুৎ। লক্ষ লক্ষ হিন্দু পরিবারে আজও এটাই রীতি। বয়োজ্যেষ্ঠর পা স্পর্শ করাটা গভীর শ্রদ্ধা আর সম্পূর্ণ সমর্পণের প্রতীক। বিনিময়ে অজস্র আশীর্বাদ লাভ করে সে।

মাথা নিচু করে দ্বারকা শাস্ত্রীর বাঁ পায়ে আঙুল ছোঁয়ালো বিদ্যুৎ। জীর্ণ ত্বকে স্পর্শ করতেই হঠাৎ সতর্ক চোখে বিদ্যুতের দিকে ঘুরলেন বৃদ্ধ। কী হয়েছে সেটা বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করার আগেই সতর্ক অভিব্যক্তি পালটে বৃদ্ধের মুখে দেখা গেল নিখাদ ভয়ের অভিব্যক্তি।

বিদ্যুতের হাত ধরে ফেললেন বৃদ্ধ। কাঁপতে কাঁপতে তার ফাঁকে বেশ কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন।

'একটু আগে তুমি কোথায় গিয়েছিলে, বিদ্যুৎ? সত্যি করে বলো! কার সাথে দেখা করেছ তুমি? কোনো অপরিচিত লোক কি তোমার শরীর স্পর্শ করেছিলো? কার সাথে তোমার দেখা হয়েছিলো, বৎস? আমার কথার উত্তর দাও!' রাগে আর ভয়ে এখন কাঁপছেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

'আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি তার জন্য দুঃখিত, বাবা...' অনিশ্চিত কণ্ঠে জবাব দিলো বিদ্যুৎ। 'আমি...আমি কেবল দশশ্বমেদ ঘাটে গিয়েছিলাম। তাজা বাতাসে একটু নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য। আমি কারো সাথে দেখা করিনি।'

'তুমি করেছ, বোকা। তোমার মধ্যে তুমি এমন কিছু সাথে নিয়ে বেড়াচ্ছো যা মঠের সীমানার ভেতরে নিষিদ্ধ।'

দ্বারকা শাস্ত্রীর লেজারের মতো চোখদুটো সরাসরি বিদ্যুতের দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু মনে হচ্ছিলো সেগুলো যেন তার শরীর ভেদ করে ভেতরে দেখতে পাচ্ছে।

কী হচ্ছে ভেবে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে বিদ্যুৎ। তারপরই সুদর্শন তরুণের দেওয়া লাইটারটার কথা মনে পড়ে গেল তার। একটু দ্বিধা করলো সে। প্রপিতামহের সামনে ধূমপানের বিষটা প্রকাশ পেলে লজ্জার ব্যাপার হবে। তারপর ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলো সে। ধীরে ধীরে পকেট থেকে লাইটারটা বের করে আনলো।

'অপরিচিত এক লোক ঘাটে এটা দিয়েছিলো আমাকে, বাবা।'

কয়েক সেকেন্ডের জন্য জমে গেলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। তারপরই নরক ভেঙে পড়লো যেন।

বিছানার পাশে ঝুলানো একটা মোটা রশি ধরে টান দিলেন তিনি। দ্বারকা শাস্ত্রীর বাসগৃহের উপরে গম্বুজের উপর ঝুলানো বিশাল একটা ঘণ্টা বেজে উঠলো সাথে সাথে। অনুসারীদের জন্য মঠাধ্যক্ষের সতর্ক সংকেত এটা। মুহূর্তের মধ্যে ধুম করে দ্বারকা শাস্ত্রীর ঘরের দরজা খুলে গেল। বলভান্ত প্রবেশ করলো ভেতরে। হাতে ভয়ংকর দর্শন দুটো তলোয়ার। তার পেছনে একটা ডাবল ব্যারেল শটগান ঝুলছে। কোমরের বেল্টে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি। পুরোহিতজি আর তার ছেলে সনুও দৌড়ে এলেন। দ্বিতীয়জনের ত্রিশূল প্রস্তুত। জানালা দিয়ে বিদ্যুৎ দেখতে পেল হিন্দু আশ্রম প্রধানের বাসগৃহ ঘিরে ফেলেছে যোদ্ধা-সাধুগণ। সবার হাতে ছুরি আর আধুনিক সব অস্ত্রশস্ত্র। তাৎক্ষণিক নির্দেশে দেব-রাক্ষস মঠ যুদ্ধে লড়ার জন্য প্রস্তুত।

'কী হয়েছে, গুরুদেব?' মঠাধ্যক্ষকে গুরুদেব সম্বোধন করে পুরোহিতজি জানতে চাইলেন। চিতার মতো শিকারের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত বলভান্ত। বাসগৃহের প্রতিটা কোনায় চোখ বুলাচ্ছে সে।

উদ্বেগে হাঁফাচ্ছেন দ্বারকা শাস্ত্রী। তবে তার মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। চোখদুটো রক্ত লাল।

'ওরা এখানে পৌঁছে গেছে, পুরোহিত,' বললেন প্রবীণ নেতা। 'ওটা আরম্ভ হয়ে গেছে।'

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ
একজন মা কীভাবে এমনটা ঘটতে দিতে পারেন?

'গত রাতে পাঁচটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে, প্রভু,' জানালেন হরপ্পার প্রধান প্রকৌশলী।

গত রাতের ভূমিকম্প হরপ্পা নগরীর পুরো জনমনে এমনকি এর শাসকদের মনেও গভীর ভয়ের ছাপ রেখে গেছে। এমন রক্ত হিম করা গর্জন আর ভয়ংকর কাঁপুনি এর আগে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি বা শুনেনি কেউ। বিজ্ঞানের কোনো প্রাচীন শাস্ত্র বা লেখায় এমন ভয়ংকর কোনো কিছুর আভাস দেওয়া নেই। এদিকে সপ্তর্ষিগণও চলে গেছেন। তাদের পাওয়া যাবে না। বিশেষভাবে তাদের উপস্থিতির অভাব বোধ হচ্ছে। কেননা পৃথিবীর কম্পনের সাথে ব্যাখ্যাতীত আরো কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, প্রাণচঞ্চলা সরস্বতীকে নিজ তীরবর্তী লোকালয়ে পর্বত সমান উঁচু ঢেউ ছুঁড়ে দিতে দেখেছে তারা। ঢেউগুলো সাথে সাথেই পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোকে প্লাবিত করে ফেলে। সরস্বতীর এমন গর্জনও আগে কখনো শোনেনি কেউ। হরপ্পার মানুষদের জীবনদাত্রী হলো মাতৃসম এই নদী। তিনি কখনো তাদের ক্ষতি করার কথা না।

গভীর রাতে এক আলোচনা সভা ডাকা হয়েছে। মহানগরীর প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ মানুষ উপস্থিত আছেন এখানে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন বিভাষণ পূজারি আর তার ঠিক ডান পাশে বসবেন পণ্ডিত চন্দ্রধর। হরপ্পার ইতিহাসে সবচেয়ে কর্মঠ, সৎ, বস্তুনিষ্ঠ আর সফল নেতৃত্ব হলো বিভাষণ আর চন্দ্রধর যুগল। তারা দুজন আবার কুটুম্ব। বিভাষণের স্ত্রী সাঞ্জনা চন্দ্রধরের ছোট বোন। তারচেয়ে বড় কথা, তারা দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অসংখ্য মহাবিপদ থেকে হরপ্পাকে টেনে

তুলেছেন তারা। নিয়ে এসেছেন আজকের এই গৌরবময় অবস্থানে। আর যার ছত্রিশ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে বিভাষণ পূজারি হয়ার প্রধান পুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন। যা তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মহানগরীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষে পরিণত করবে।

'কত মানুষ এই জলোচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করেছে?' জানতে চাইলেন বিভাষণ পূজারি।

'প্রভু, যেহেতু এটা ঘটেছিলো প্রায় চোখের পলকে এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার আরো বেশ কয়েক ঘন্টা পরে, মাত্র কয়েকজন বণিক এটা প্রত্যক্ষ করেছে,' হয়ার প্রধান প্রকৌশলী বললো। 'পিরামিডের সমাধির দেশ থেকে বাণিজ্য সেরে বাড়ি ফিরছিলো তারা। নদীতীর থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিলো তাদের কাফেলা, এমন সময় তারা অর্ধচন্দ্রের আলোয় দৈত্যাকার ঢেউগুলো দেখতে পায়।'

'তুমি বললে ওরা কয়েক মাইল দূরে ছিলো?' অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইলেন চন্দ্রধর।

'হ্যাঁ, প্রভু। কাফেলার বণিকেরা জানিয়েছে যে ঢেউগুলো পাহাড়ের চেয়েও উঁচু ছিলো। তাদের প্রকাণ্ড ছায়ায় আকাশ ঢেকে গিয়েছিলো। প্রায় দুশো নর-নারী আর শিশুর সলিল সমাধি হয়েছে।'

প্রকৌশলী কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামলো। কবরের নীরবতা নেমে এলো কক্ষের ভেতরে।

'প্রভু, গ্রামবাসীরা খড়কুটোর মতো জলের তোড়ে ভেসে গেছে,' বলে চলেছে সে। 'স্থানীয়রা এখন *মাতা নদী*-কে ভিন্ন নামে ডাকে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। তারা তাকে *রক্তধারা* বা রক্তের নদী বলে ডাকছে।'

প্রধান প্রকৌশলীর শেষ কথাটা সবার মেরুদণ্ডে একটা শীতল শিহরন বইয়ে দিলো। উপস্থিত প্রত্যেক পুরোহিত নেতা এটা জানে যে পৃথিবীর যেকোনো নদীর চেয়ে সরস্বতীর ধারায় রয়েছে বিপুল পরিমাণ পানি। শত শত বছর ধরে এই মাতৃসম নদী তাদের দেখভাল করলেও তার অসীম শক্তি সম্পর্কে কক্ষের ভেতরে কারো মনেই কোনো সন্দেহ নেই। বণিকদের কথা অনুসারে সেই নদী যদি পর্বতসম ঢেউ ছুঁড়ে দেয় তাহলে এটা খুবই খারাপ খবর।

***

প্রকৌশলীরা সুনামির খবর দেওয়ার পর চার ঘন্টা কেটে গেছে। কয়েকজন পুরোহিত মতামত দিলেন যে পুরো ব্যাপারটাই আকস্মিক এবং এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটে না। তবে বেশিরভাগই ভিন্নমত প্রকাশ করলেন। অদ্ভুত ধরণের সংকেত ধরা পড়ছে তাদের কাছে। পুরো সমতল এবং উপত্যকা জুড়ে বাতাস

বইছে অস্বাভাবিক শক্তি নিয়ে আর অপ্রত্যাশিত গতিপথে। ভূমিকম্পের ঘণ্টাখানেক আগে, তাদের নির্ধারিত বার্ষিক পরিভ্রমণের প্রায় মাসখানেক আগেই উড়ে চলে গেছে পরিযায়ী পাখিরা। গৃহপালিত পশুপাখিরা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে, ভয় পাচ্ছে এবং তাদের ভয়ার্ত চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। লালচে বেগুনি বর্ণের ঘন মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। এমন দৃশ্য হরপ্পাবাসী পূর্বে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। অশুভ এসব সংকেত দেখে বিজ্ঞ পুরোহিতদের বুঝতে বাকি থাকলো না যে বিপদ শেষ হয়ে যায়নি। বরং আরো ভয়ংকর কিছুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে তাদের।

সভাকক্ষের বিশাল দেয়াল জুড়ে এখন ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশাল বিশাল চার্ট টানানো হয়েছে। মৃতদের সৎকার আর বন্যাকবলিত পাঁচটি গ্রামে দ্রুত ত্রাণ সহায়তা পৌঁছানোর নির্দেশনা দিয়ে প্রকৌশলী আর নগর পরিকল্পনাবিদদের সাথে এক গভীর আলোচনায় বসেছেন বিভাষণ। সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হাতে থাকা প্রতিটা সম্ভাবনা কাজে লাগাতে চান তিনি। অন্যদিকে, পঙ্কং এবং অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞান-সম্পর্কিত কাঠামো নিয়ে কাজ করছেন পণ্ডিত চন্দ্রধর। বুঝতে চেষ্টা করছেন কেন হঠাৎ করে এমনভাবে তাদের ঘিরে ধরেছে দুর্ভাগ্যের কালোমেঘ। হরপ্পার মানুষের জীবন দর্শন ছিলো টিকে থাকা এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা। তবে স্বর্গীয় সংকেতকে কখনোই অবহেলা করা যাবে না।

'পৃথিবীর স্থানচ্যুতির বিরুদ্ধে আমাদের শহর উল্লেখযোগ্যভাবে নিরাপদ, প্রভু,' সমদূত বলে উঠলেন। হরপ্পার প্রতিভাবান প্রধান প্রকৌশলীদের একজন তিনি। শুধু তাই নয়, তিনি দেবতার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। বিভাষণ পূজারির প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। 'উন্নতমানের পাকা ইট দিয়ে তৈরি আমাদের ইমারতগুলো এবং সেগুলো কদাচিৎ তিন তলার বেশি উঁচু। ভূমির নড়াচড়ার ফলে সেগুলো পড়ে যাবে না।'

'শুনে ভারমুক্ত হলাম, সমদূত। তুমি নিশ্চিত বড় বড় খাদ্য গুদাম আর তামা গলানোর কারখানাগুলো এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকরভাবে সক্ষম?' জিজ্ঞেস করলেন দেবতা।

'খাদ্য গুদাম নিয়ে চিন্তা নেই। কপার ইউনিটকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখতে বলা উচিত। কারণ কীসের বিরুদ্ধে লড়ছি আগে সেটা জানতে হবে আমাদের,' জবাব দিলো সমদূত।

'তাই হবে,' একজন পুরোহিতকে উদ্দেশ্য করে ইশারা করলেন বিভাষণ পূজারি। শহরের তামা আর ব্রোঞ্জের কাজগুলো দেখাশোনার দায়িত্ব তার। মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে তাকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা পালন করতে চলে গেল সে।

'ঠিক আছে, চলো আমরা আবার সরা মায়ের প্রসঙ্গে ফিরে যাই,' নদীর গতিপথ আঁকা একটা চার্টের দিকে চেয়ে বললেন বিভাষণ পূজারি। এখনো তিনি তাকে মা বলেই সম্বোধন করছেন। যদিও তার প্রতি বেশ বিরক্ত হয়ে আছেন দেবতা। ঘুমন্ত অবস্থায় দুশো হরপ্পাবাসীর জীবন কেড়ে নিয়েছে এই নদী। কেন সে এমন বিক্ষুব্দ হয়ে উঠেছিলো? *একজন মা কীভাবে এমনটা ঘটতে দিতে পারে?*

ইঞ্জিনিয়ারদের কিছু বলার নেই দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। মাথা নিচু করে পায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন তারা। চার্ট থেকে মুখ তুলে একে একে তাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকালেন দেবতা।

'কী হলো, সোমদত্ত? তুমি আর তোমার এই অসাধারণ দলটাকে ডাকা হয়েছে লাখো জনগণের জীবনের নিরাপত্তার জন্য। তোমাদের এই নিরবতা তো কাম্য নয়!' তীব্র স্বরে বললেন দেবতা।

'আমাদের ক্ষমা করুন, প্রভু। আমরা সত্যি সত্যি বুঝতে পারছি না সরস্বতীর আক্রমণ কীভাবে রোধ করবো। আমরা আমাদের সক্ষমতার সর্বোচ্চ হিসেব করে দেখেছি। বণিকদের বর্ণনা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, মহাপরাক্রমশালী নদীর বিরুদ্ধে তাহলে আমাদের আর করার কিছু নেই। এমন উঁচু আর শক্তিশালী ঢেউয়ের আঘাত উচ্চতর গণিতের সাহায্যেও পরিমাপ করা সম্ভব নয়।'

নিজের কানকেও বিশ্বাস হচ্ছে না বিভাষণ পূজারির। প্রকৌশলীদের উপর নির্ভর করেছিলেন তিনি একটা সমাধান পাওয়ার আশায়, সেটা যত বড় সমস্যাই হোক না কেন। আর তারা কিনা শুরুতেই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে?

'তাহলে তুমি কী বলতে চাও, সোমদত্ত? আমরা অপেক্ষা করবো আর চেয়ে চেয়ে দেখবো কীভাবে আমাদের বাড়িঘর আর মানুষজন ভেসে যায়?' রাগান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন বিভাষণ। এখন প্রায় চিৎকার করছেন তিনি।

সোমদত্ত জবাব দেওয়ার আগেই তীব্র ধাতব শব্দে চমকে গেল সবাই। শব্দের উৎস লক্ষ করে ঘুরলো প্রত্যেকে। পণ্ডিত চন্দ্রধরের হাত থেকে একটা তামার কালির পাত্র পড়ে গেছে কেবল। জ্যোতির্বিজ্ঞান-সম্পর্কিত চার্টের দিকে তাকিয়ে জমে গেছেন তিনি।

'চন্দ্রধর...' জায়গায় বসে ডাকলেন বিভাষণ।

বন্ধুর কাছ থেকে কোনো সাড়া পেলেন না তিনি।

'কী হয়েছে বন্ধু?' আবার জিজ্ঞেস করলেন দেবতা। চন্দ্রধর ফিরলেন না, কোনো জবাবও দিলেন না। সম্মোহিতের মতো *পঞ্চং*-এর দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

বিভাষণ পূজারি তার কাছে হেঁটে গেলেন। কাঁধে ধরে বন্ধুকে নিজের দিকে ফেরালেন। যা দেখলেন, অবাক হয়ে গেলেন তিনি। পণ্ডিত চন্দ্রধর ভয়ে জমে গেছেন। প্রচণ্ড ভয়ে কুঁচকে আছে তার মুখ, এমনকি পলকও ফেলছেন না তিনি।

বন্ধুকে এমন ভয় পেতে কোনোদিন দেখেননি দেবতা, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও। পণ্ডিত চন্দ্রধর যেমনি ন্যায়পরায়ণ, তেমনি নির্ভয়। ঠিক দেবতার মতো।

বন্ধুকে ঝাঁকি দিয়ে খুব শান্ত কণ্ঠে কথা বললেন বিভাষণ। 'কী হয়েছে, চন্দ্রধর? পঞ্চং-এ তুমি কী দেখতে পেয়েছ, বন্ধু?'

ধীরে ধীরে ঘুরে দেবতার দিকে তাকালেন চন্দ্রধর। ভয়ে বড় বড় হয়ে আছে তার চোখ। বিভাষণের কাঁধ ধরার জন্য কম্পমান হাতদুটোর একটা ওঠালেন তিনি, শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন। সরাসরি বন্ধুর চোখের গভীরে তাকালেন চন্দ্রধর।

'বিভাষণ...শেষের শুরু হয়ে গেছে।'

হাসার ব্যর্থচেষ্টা করে উদ্বিগ্ন বন্ধুকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন বিভাষণ। 'কিছুই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, চন্দ্রধর। অতীতে অসংখ্যবার যেমন করেছি, আমরা একসাথে আবারও ঠিক করে নেবো সব,' আশ্বাসের কণ্ঠে বললেন তিনি।

এবার বেদনাক্লিষ্ট হাসি হাসলেন চন্দ্রধর। এখন সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। কক্ষের ভেতরে পিনপতন নীরবতা। ধীরে ধীরে নিজেকে ফিরে পাচ্ছেন তিনি। দু-এক মুহূর্ত পর নিজের গলা পরিষ্কার করে নিলেন, হাতের উলটো পাশ দিয়ে চোখের অশ্রু মুছলেন। বিভাষণ পূজারির দিকে ফিরে উচ্চ স্বরে বলতে লাগলেন যাতে সবাই শুনতে পায়। 'এই চার্ট কখনোই ভুল হতে পারে না। পঞ্চং কখনোই ভুল হতে পারে না। আমি যা পড়েছি এবং যে সংকেত উদ্ধার করেছি সেটা বিশ্বাস করতে আমারই কষ্ট হচ্ছে।'

গভীর উদ্বেগ আর তীব্র মনোযোগ সহকারে শুনছে কক্ষের সবাই। পঞ্চং আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের চার্টের গুরুত্ব অসীম। আর পণ্ডিত চন্দ্রধরের সেসব বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা কিংবদন্তিতুল্য। তার ভবিষ্যদ্বাণী কখনোই মিথ্যে হয়নি।

এদিকে, খারাপ খবরটা নিয়ে আর দেরি করতে চান না চন্দ্রধর। স্বাভাবিক এবং পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন, 'ভদ্র মহোদয়গণ, চন্দ্রের এক চক্র পূর্ণ হলে হরপ্পার পতন ঘটবে। বিলীন হয়ে যাবে হরপ্পা।'

বানারস, ২০১৭
‘আমি অর্ধেক মানব, অর্ধেক ঈশ্বর।’

‘কী হয়েছে, পুরোহিতজি?’ জানতে চাইলো বিদ্যুৎ।

আশ্রমের চিকিৎসক একং রসায়নবিদ গোবর্ধনের দিকে তাকালেন পুরোহিতজি।

‘মার্কারি ফুলমিনেট,’ গোবর্ধন জানালো।

সাইবার সিকিউরিটি কোম্পানি চালালেও বিদ্যুৎ জানে কী নিয়ে কথা বলছে গোবর্ধন। তবে কোনো কথা বললো না সে।

‘হ্যান্ড গ্রেনেডসহ অন্যান্য বিস্ফোরক তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এটা।

তিনজন একে অপরের দিকে তাকালো।

গোবর্ধন বলে চলেছে, ‘ওরা তোমাকে খুন করতে চায়, বিদ্যুৎ।’

ঘারকা শাস্ত্রীর সংকেত পেয়ে কঠোর নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে মঠ। শত শত বছর ধরে এই দিনটার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। ঘাটে অপরিচিত লোকের কাছ থেকে পাওয়া বস্তুটির সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। গোবর্ধন আর সহকারীরা বেশ সর্তকতার সাথে লাইটারকে খুলে ফেলে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। সেই সাথে পুরোহিতজি এবং তার দলবল ওটার মধ্যেকার ক্ষতিকর উপস্থিতি বের করার জন্য প্রাচীন জাদুটোনা ব্যবহার করে একটা ধাতু পরীক্ষা চালিয়েছে। উভয় পরীক্ষাতে একই ফলাফল পাওয়া গেছে।

রাক্ষস দল উপস্থিত। এবং তারা বিদ্যুৎকে হত্যা করতে চায়...যেকোনো মূল্যে।

'আর দুই তিনবারের বেশি লাইটারটা ব্যবহার করলেই মারকারি ফুলমিনেট তোমার মুখে বিস্ফোরিত হতো, বিদ্যুৎ,' দেব-রাক্ষস মঠের সভাকক্ষের ভেতরে ঘোষণা করলো গোবর্ধন।

মহান দ্বারকা শাস্ত্রী সভায় সভাপতিত্ব করছেন। তার অবস্থার উন্নতি না হলেও এই মুহূর্তে হাসপাতালে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি। সভাকক্ষের ভেতরে শোনা যাচ্ছে তার ভারী আর কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার শব্দ। গলায় বাঁধা ভেষজ ঔষধের একটা ছোট্ট পুঁটলি একটু পরপর হাত দিয়ে নাকের কাছে তুলে শুঁকছেন তিনি। দীর্ঘায়ু আর উপশমকারক উপাদানের আয়ুর্বেদিক মিশ্রণ রয়েছে এই পুঁটলিতে।

কক্ষের এক প্রান্তে হোয়াইট বোর্ডের উপর পরিষ্কার এবং সহজবোধ্য একটা চিত্র এঁকেছে গোবর্ধন। তাতে লাইটারটার অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে।

'মার্কারি ফুলমিনেট খুবই ঘর্ষণ সংবেদনশীল। বলবিদ্যার নীতি অনুসারে কাজ করে এই লাইটার। দুটো ধাতুর প্রচণ্ড ঘর্ষণে তাপ উৎপাদিত হয়।'

এবার প্রত্যেকে শত্রুর এই সহজ অথচ প্রাণঘাতী চালাকিটা বুঝতে পারছে। তা সত্ত্বেও সর্বশেষ বার্তাটা প্রকাশ করলো গোবর্ধন।

'লাইটারতে যে পরিমাণ মারকারি ফুলমিনেট রয়েছে, সেটা বিস্ফোরিত হলে ড্রাইভিং হ্যালমেট পড়া থাকলেও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে একজন মানুষের মাথা।'

নীরবতা নেমে এলো কক্ষের ভেতরে। আগের মতো রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে বলভান্ত। মনে হচ্ছে তার দৃষ্টির তীব্রতায় পুড়ে যাবে সব। মনে মনে সে জানে এই দেবতা-দানব যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে সনুর। রাগে ফেটে পড়ছে তার চোখমুখ। সে তার ত্রিশূলের নিচের অংশ দিয়ে মেঝেতে মৃদু আঘাত করছে বারবার। যেন প্রস্তুতি নিচ্ছে পরিপূর্ণ যুদ্ধের।

গভীর মনোযোগে ঠান্ডা মাথায় হিসেব-নিকেষ করছেন পুরোহিতজি। ধ্যানমগ্ন সাধুর ন্যায় স্থির তার চোখ। তার দাঁতে দাঁত চাপা মুখাবয়ব আর কণ্ঠার ওঠানামা দেখে মনে হচ্ছে যেন বড় কোনো সম্মুখ সমরে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে পোড় খাওয়া কোনো যোদ্ধা।

মঠের সম্মানিত এবং গুরুত্বপূর্ণ নারী দলের নেতৃত্বে রয়েছে ন্যায়না। ওকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেকোনো সময় কান্নায় ভেঙে পড়বে সে। যদিও এভাবে ভেঙে পড়াটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। সে নিজেকে বলভাস্তের মতোই দৃঢ়চেতা মনে করে। সম্ভবত সে তা-ই। কিন্তু এটা বিদ্যুতের নিরাপত্তার প্রশ্ন।

দ্বারকা শাস্ত্রী ভীষণ অসুস্থ, ক্লান্ত এবং অবসন্ন। তার নশ্বর প্রাণ দেহ ছেড়ে যেতে আর্তি জানাচ্ছে। এক শতকের চার-তৃতীয়াংশ সময় ধরে সকল প্রকার জাগতিক, মহাজাগতিক এবং অশরীরী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এখন তার প্রতীক্ষিত উত্তরাধিকারী এসে গেছে সর্বকালের সবচেয়ে বড় এবং ভয়াবহ লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। ঘুরলেন তিনি, বজ্রকণ্ঠে ডাক দিলেন তার নাতিকে।

'বিদ্যুৎ!' সভাকক্ষ জুড়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুললো তার স্বর।

উঠে দাঁড়ালো বিদ্যুৎ। সম্মান জানিয়ে বাবার উদ্দেশে হাতজোড় করলো সে।

'উত্থিস্থা!' উভয় হাত কাঁধের ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করে বজ্রকণ্ঠে বললেন মঠাধ্যক্ষ। সংস্কৃত ভাষার এই শব্দটির একটাই অর্থ।

উঠ!

নাতিকে তিনি তার ডাকে সাড়া দিতে বলছেন।

তিনি দেবতা বিদ্যুকে বলছেন নিজেকে প্রকাশ করতে।

॥ ৯ ॥

পুণ্যবান হিন্দু সাধু আর পুরোহিতদের বিশাল জমায়েতের উদ্দেশে উঠে মুখোমুখি দাঁড়ালো বিদ্যুৎ। তাদের প্রত্যাশাপূর্ণ চোখগুলো দেখতে পাচ্ছে সে। তাদের বর্ণনাতীত–এবং সম্ভবত যার যোগ্য সে নয়–সেই ভক্তি অনুভব করতে পারছে। সে জানে সারা জীবন ধরে এখানে-সেখানে যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরেছে সে, সেই মুহূর্ত সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

'আমার ধমনিতে বইছে মহান পূর্বসূরি বিভাষণ পূজারির রক্ত,' শুরু করলো বিদ্যুৎ। 'আপনাদের বিদ্যুৎ কিংবদন্তি সন্ন্যাসী-যোদ্ধা কার্তিক্যার ছেলে এবং আমার স্বর্গীয় মাতা পূজা। মহান দ্বারকা শাস্ত্রীর প্রপৌত্র হওয়ার বিরল সম্মান পেয়েছি আমি। আপনাদের সকলের, এই মঠের শতবর্ষ বা সম্ভবত হাজার হাজার বছর আগের প্রতিটা পূর্বসূরির আশীর্বাদ রয়েছে আমার উপর। যদিও আমি দেব-রাক্ষস প্রাচীন কাহিনির পুরোটা সম্পর্কে জানি না, তবুও আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি...'

বিদ্যুৎ এবং তার বলা প্রতিটা পবিত্র কথার উপর আটকে আছে সভাকক্ষের প্রতিটা নর-নারীর মনোযোগ। কান্নাভেজা চোখে বিদ্যুতের চারপাশে একটা ক্ষীণ বলয় দেখতে পাচ্ছে তারা। পৌরাণিক বিভাষণ পূজারির সত্যিকারের বংশধারা

দেখতে পাচ্ছে সবাই। এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে বিদ্যুৎই হচ্ছে সেই প্রতীক্ষিত রক্ষাকর্তা। তারা এখন জানে যে সে-ই হচ্ছে প্রত্যাশিত শেষ দেবতা।

আবেগী, দৃঢ় কণ্ঠে তবে বিনয়ের সাথে বলে চলেছে বিদ্যুৎ, 'আমাকে যারা হত্যা করতে চেষ্টা করবে, তাদের শাস্তি দেবো আমি। যারা আমার এবং এই মহান প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে, তাদের সবাইকে রুখে দেবো আমি। হে আমার শুভাকাঙ্ক্ষীগণ, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।'

গভীর মনোযোগে শুনছে শ্রোতাগণ। দ্বারকা শাস্ত্রীর দগ্ধ হৃদয়ে মলমের মতো উপশমের কাজ করছে প্রতিটা কথা। প্রপৌত্রের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন তিনি। তিনি দেখতে পাচ্ছেন নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে বিদ্যুৎ। এবার তিনি তার আত্মাকে নশ্বর দেহ আর দায়িত্বভার ছেড়ে মুক্তি দিতে পারেন।

বিদ্যুৎ তার সমাপনী বক্তব্য রাখলো।

'হে আমার পূজনীয় গুরুজন, জেনে রাখবেনঃ আমি অর্ধেক মানব, অর্ধেক ঈশ্বর।'

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ
ইট ও ব্রোঞ্জের তৈরি পর্বত

শুকনো ফলমূল আর জাফরান দুধে হালকা নাস্তা সেরে পুনরায় একত্র হলো পুরোহিত পরিষদ। তাদের প্রত্যেকেই পণ্ডিত চন্দ্রধরের ভবিষ্যদ্বাণী মেনে নিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকেই নিজে একেকজন দক্ষ জ্যোতির্বিদ। বিরতির সময়টাতে তারা ভবিষ্যদ্বাণীটা বারবার করে পরীক্ষা করেছেন। একেবারেই নির্ভুল এটা। নক্ষত্রের অবস্থান তাদের কল্পনার চেয়েও আরো অশুভ। এ ধরনের বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা লাখে একটা। কিন্তু সেটাই ঘটছে। বৈদিক জ্যোতির্বিদ্যা অনুসারে এটা একটা নিখুঁত ঝড়। পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতা হরপ্পার কোনো আশাই নেই। এর সামনে সভ্যতা বড়জোর ত্রিশ দিন টিকবে।

'সময় থাকতে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত আমাদের,' প্রকৌশলীদের একজন বললেন। পুরোহিত পরিষদের মহাদরবার কক্ষের সকলেই মাথা নেড়ে সায় দিলেন প্রস্তাবে। প্রায় কক্ষের সমান লম্বা বিশাল কাঠের টেবিলের চারপাশ ঘিরে বসে আছেন হরপ্পার সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বাকিরা দু-তিনজনের দলে ভাগ হয়ে তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। দৃশ্যটা অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক *সিনেটাস রোমানাস* বা রোমান শাসন ব্যবস্থার সিনেটের মতো লাগছে।

'আমরা পূর্ব দিকে যেতে পারি। মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং অক্ষমদের জন্য অশ্ব, গরুর গাড়ি আর হাতি ব্যবহার করা যেতে পারে। বাকিরা পায়ে হেঁটে যাবে,' প্রস্তাব করলেন একজন পরিষদ সদস্য।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ...' উপস্থিত জনতার মাঝে গুঞ্জন উঠলো।

'সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ভ্রমণ শুরু করতে হবে। বন্দিদের মৃৎ কারাবাসে রেখে যাবো আমরা,' বললো আরেকজন। 'প্লাবনের জলে ভেসে যাবে তাদের সব পাপ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ...চলো আমাদের পরিবারকে অবহিত করি আর মূল্যবান জিনিসপত্র গুছিয়ে নিই,' প্রস্থানের পক্ষে মতামত দিলো বেশ কয়েকজন। শীঘ্রই বিশৃঙ্খল এক পরিবেশের সৃষ্টি হলো দরবার কক্ষের ভেতরে। মতামত, পালটা মতামত আর চিৎকার-চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। কেউ কারো কথা শুনছে না, কারো কথা বোঝার কোনো উপায়ও নেই।

থ্যাএএএককক!

ঘ্যাঁচ করে কোনো কিছু বিঁধে যাওয়ার শব্দ শুনে নীরব হয়ে গেল সবাই। তাকিয়ে দেখলো, মহান দেবতা টেবিলের মাঝখানে কাঠের উপর বেঁধা তার চকচকে ছুরিটার উপর ঝুঁকে আছেন, নীলকান্তমণিখচিত ছুরির হাতলটা এখনো হাতে ধরা। বিতৃষ্ণ চোখে কক্ষের ভেতরের প্রতিটা মুখ পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি।

'তোমাদের ব্যাপারটা কী বলো তো?' কর্তৃত্বের সুরে গর্জন করে উঠলেন দেবতা। 'আমরা মহাপরাক্রমশালী হরপ্পাবাসী! সমগ্র আর্যব্রতের শাসক আমরা! আমরাই সুমহান বেদের রচয়িতা, দক্ষ অশ্ব চালক এবং উচ্চতর ধাতুবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি বলে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাবো আমরা?' বজ্রকণ্ঠে জানতে চাইলেন বিভাষণ পূজারি। কক্ষের দেয়ালে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুললো তার শক্তিশালী কণ্ঠস্বর।

তার কথার বিরোধিতা করা তো দূরে থাক, জবাব দেওয়ার মতো সাহস নেই উপস্থিত কারো। কোনো কথা বললো না তারা। বিভাষণ পূজারি বুঝতে পারলেন প্রভাবিত হওয়ার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে তার অনুসারীরা। সাথে সাথেই ছুরিটা তুলে চামড়ার খাপে ভরে ফেললেন তিনি। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু তবে দৃঢ় কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'আমাদের উত্তরসূরিরা বিশ্বাসও করতে পারবে না কত কষ্ট করে তিলেতিলে আমরা গড়ে তুলেছি এই সভ্যতা। এই মহান জাতির জন্য আমরা সবাই ত্যাগ স্বীকার করেছি। ইতিহাস কি মনে রাখবে যে আমরা পৃথিবীর বুক চিরে তামা এবং ব্রোঞ্জের মতো খনিজ আহরণ করেছি? গ্রহের সবচেয়ে আধুনিক নগরী নির্মাণের কৃতিত্ব কি তারা আমাদের দেবে? কেউ কি স্মরণ করবে কখনো যে আমরা হরপ্পাবাসীরাই মাটির টানের বিপরীতে গিয়ে গভীর থেকে পানি উত্তোলন করেছি? এখন একটা নদী হুমকি দিচ্ছে বলে হাজার বছর ধরে তিলেতিলে গড়ে তোলা সম্মান ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে ইঁদুরের মতো পালিয়ে যাবো আমরা?'

কক্ষের ভেতরে নীরবতা। পরিষদ সদস্য, পুরোহিত, প্রকৌশলী এবং সামরিক কমান্ডার সবাই গভীর মনোযোগে বিভাষণ পূজারির বক্তব্য শুনছে।

'আমরা সবাই একত্রে গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী। আমাদের আছে সৈন্যবাহিনী, প্রকৌশলী, জ্যোতির্বিদ, ধাতুবিদ, চিকিৎসক, অপরসায়নবিদ, স্থপতিসহ আরো অনেক পেশার প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ। একসাথে আমরা কী না করতে পারবো? হয়তো এটা একটা পরীক্ষা। হয়তো ঈশ্বর দেখতে চান আমরা যে তার করুণার যোগ্য সেটা যেন প্রমাণ করি!'

'ঈশ্বর কী চান সেটা পঞ্চং এবং নক্ষত্র থেকেই পরিষ্কার, বিভাষণ,' প্রধান পুরোহিতদের একজন বলে উঠলেন। 'এই ব্যাপারটা আমাদের চেয়ে তুমি আরো ভালো জানো, বন্ধু। নক্ষত্ররাজির এই অবস্থান অপ্রত্যাশিত। তারা চিৎকার করে ধ্বংস আর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করছে।'

'হয়তো তাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমরা এই দুর্যোগ প্রতিরোধে সক্ষম। অথবা অন্তত তার সামনে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে লড়াই করতে পারি। সিন্ধুদের হিংস্রতাকেও রুখে দিতে সক্ষম আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।'

আবার কক্ষের চারপাশে তাকালেন বিভাষণ পূজারি। ঝুলে পড়া কাঁধ আর অনিশ্চিত দৃষ্টিগুলো দেখে হতাশ হলেন তিনি। মনে হলো যেন একদল অপরিচিতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। হরপ্পার মেধাবী বীর নেতাদের মধ্যে ভীতি আর পলায়নপরতা এর আগে কখনো দেখেননি বিভাষণ। *এরাই কি সেই মানুষ যাদেরকে পৃথিবীর সেরা মনে করেন তিনি? এরাই কি তার প্রিয় নগরীর সেই পুরোহিত নেতা এবং রক্ষক?*

'তোমার হাতে কোনো পরিকল্পনা আছে, বিভাষণ?'

ঘুরলেন বিভাষণ পূজারি। বন্ধু এবং সহকারী চন্দ্রধর অবশেষে আলোচনায় যোগ দিয়েছে দেখে খুশি হলেন। এখন ভারমুক্ত লাগছে তার।

'তোমার হাতে কোনো পরিকল্পনা আছে?' পুনরায় জানতে চাইলেন পণ্ডিত চন্দ্রধর। সভার মাঝখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন তিনি।

'আছে, চন্দ্রধর,' জবাব দিলেন দেবতা। 'অন্তত যতক্ষণ উপস্থিত সম্মানিত সদস্যদের আস্থা আমার উপর রয়েছে।'

হাসলেন চন্দ্রধর। মনে হলো যেন তার দেবতা বন্ধুকে বলতে চাচ্ছেন, 'তুমি একটা মাথামোটা গর্দভ!' তবে মুখে সেরকম কিছু বললেন না।

'হে মহান দেবতা, আপনার মনের ভাবনা আমাদের খুলে বলুন। অতীতে অসংখ্যবার আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন। আপনি হরপ্পার সূর্য। আপনার প্রজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো যোগ্যতা আমাদের নেই,' শ্রদ্ধার সাথে মাথা নত করে অনেকটা আনুষ্ঠানিকভাবে বললেন চন্দ্রধর। যা সত্য তাই বললেন তিনি। জমায়েত হওয়া প্রত্যেককে তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে কার সাথে কথা বলছে তারা। কতবার যে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখ থেকে অসম্ভব বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন

বিভাষণ সে সংখ্যা অগণিত। দেবতার কাছে তাদের যে ঋণ তা ভুলে যেতে দিতে পারেন না চন্দ্রধর।

'ধন্যবাদ, পণ্ডিত চন্দ্রধর, আমার বন্ধু এবং যোগ্য সহযোগী,' সম আনুষ্ঠানিকতায় জবাব দিলেন বিভাষণ। 'আমার একটা পরিকল্পনা আছে। প্রথমে এটা শুনতে হাস্যকর মনে হলেও কথা দিচ্ছি আমি কাজে পরিণত করবো একে।'

'কিন্তু এ তো আসলেই হাস্যকর, বিভাষণ!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন চন্দ্রধর। কক্ষে উপস্থিত অন্যান্য কেউই বিভাষণের পরিকল্পনার অন্তঃসারশূন্যতা বিশ্বাস করতে পারছে না। চিৎকার-চেঁচামেচিতে হ-য-ব-র-ল এক অবস্থার সৃষ্টি হলো কক্ষ জুড়ে।

'এটা শুনতে হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই একমাত্র উপায় যা আমাদের হাতে রয়েছে। আমাকে বলো তো, বিশাল বিশাল আধুনিক শহর-নগর তৈরি করতে পারলে কেন আমাদের প্রকৌশলীরা এই স্থাপনা নির্মাণ করতে পারবে না?'

চন্দ্রধর বুঝতে পারছেন না কী বলবেন। একদিকে তিনি বিভাষণ এইমাত্র যা বললো সেটা হজম করতে চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে, তিনি কক্ষে উপস্থিত জনতার পরিহাসসূচক দৃষ্টি আর চাপাহাসি লক্ষ করছেন। তা সত্ত্বেও আলোচনা চালিয়ে গেলেন তিনি।

'তাহলে আরেকবার আমাকে ব্যাখ্যা করো তুমি আসলে কী নির্মাণ করতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ভদ্রমহোদয়গণ, কীভাবে এবং কেন নদী তার গতিপথ বদলায়?' উপস্থিত সবার উদ্দেশে সরাসরি একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে জবাব দিলেন বিভাষণ। 'বড় বড় পাহাড় বা দৈত্যাকার কোনো পাথরখণ্ড অনেক সময় কোনো শক্তিশালী নদীকে তার গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। তদুপরি, ছোট স্রোত থেকে যদি পানি তুলে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে একটা নদীর পানিও বড় বড় জল সংরক্ষণাগারে রাখা যাবে। বিজ্ঞান তাই বলে। মাত্রাটা কেবল ভিন্ন।'

ফিসফাস আর চাপা প্রতিবাদের মাত্রা আরো বেড়ে গেল।

'আজ আপনি বলছেন নদীর গতি থামিয়ে দেবেন। আগামীকাল আপনি বলবেন যে ধাতুর তৈরি বাহন আকাশে উড়বে!' ভর্ৎসনার সুরে চিৎকার করে উঠলো বুর্জুর্গ প্রকৌশলীদের একজন। মুখ লুকিয়ে রেখেছে দেবতার মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে।

'নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা গেলে বাতাস নিয়ন্ত্রণ করে গ্রামগুলোতে আলোর ব্যবস্থাও করা যাবে!' আরেকটা কণ্ঠ শোনা গেল। তার পেছন পেছন শোনা গেল চাপা হাসির শব্দ।

বিভাষণ পূজারি অবিচল। সহকর্মীদের মধ্যে নতুন করে খুঁজে পাওয়া কাপুরুষতা আর সংশয়বাদ সত্ত্বেও জানে হরপ্পাকে রক্ষা করতে পারবে সে। কক্ষে উপস্থিত প্রকৌশলী আর সামরিক কমান্ডারদের মধ্যে কিছু নতুন মুখ লক্ষ করে অবাক হলো সে। দীর্ঘদিনের পরিচিত উপস্থিত কয়েকজনের অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত দেহভঙ্গিও প্রত্যক্ষ করলো সে। তবে এই সব মনোভাব কেউ দেবতার সামনে প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছে না। তবে এ সবকিছু উপেক্ষা করলো সে। পাহাড় সমান কাজ পড়ে রয়েছে, আসলেই। তাদের এই অসদাচরণের ব্যাপারটা পরে দেখা যাবে। চিন্তার এই অগ্রগামিতার কারণেই তিনি দেবতা।

'ইট আর ব্রোঞ্জের এক পাহাড় গড়ে তুলবো আমরা এবং পালটে দেবো প্রমত্ত সরস্বতীর গতিপথ!' শেষ কথাটা বললেন বিভাষণ পূজারি।

পিনপতন নীরবতা নেমে এলো কক্ষের ভেতর। প্রস্তাবিত সহজ পরিকল্পনার উচ্চাকাঙ্খা দেখে চমকিত হলেন চন্দ্রধর আর সোমদত্ত। তখনো তারা জানতো না যে এইমাত্র পৃথিবীর প্রথম রিভার ড্যাম বা নদীবাঁধের নীলনক্সা প্রণয়ন করলেন দেবতা।

'এক হাজার অশ্ব, দুশো হাতি, চার হাজার শ্রমিক আর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্রোঞ্জ, ইট, কাঠ, তামা আর রশির যোগান দিতে হবে আমাকে। এই প্রকল্পে নেতৃত্ব দেবো আমি এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নদীতীরে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করবো। সরা মা যদি আবারও তার সন্তানদের ভাসিয়ে নিতে চায়, তাহলে তার বেদিতে আমিই হবো প্রথম বিসর্জন।' অর্ধেক কাজে বিশ্বাস করেন না দেবতা। এক মুহূর্তের জন্য তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে মহাবিশ্ব সবই শুনছে।

গুঞ্জন উঠলো কক্ষের ভেতরে। বিভাষণ পূজারি যে পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন সেটা বাতিল করে দেওয়া কঠিন। সেই সাথে এটা গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়ন করাটাও সমান উচ্চবিলাসিতা।

কয়েক মিনিট আলাপ-আলোচনা করে নিজে কাঠের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পণ্ডিত চন্দ্রধর। সবাইকে নীরব থাকতে অনুরোধ করে দুহাত উঁচু করলেন তিনি। আরো বেশ কয়েক মিনিট বিশৃঙ্খল অবস্থায় কাটানোর পর কাঙ্ক্ষিত নীরবতা এবং মনোযোগ পেলেন তিনি। হরপ্পার সম্মানিত নেতৃবৃন্দ আজ অদ্ভুত আচরণ করছেন। কোথাও গুরুতর সমস্যা হয়ে গেছে।

'ভাই ও বন্ধুগণ,' শুরু করলেন চন্দ্রধর, 'দেবতা বিভাষণ পূজারি আমাদেরকে গুরুতর বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। একবার নয়, অসংখ্যবার। আমরা কি ভুলে গেছি যে যুদ্ধবাজ সোরার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক অশ্ব নিয়ে হরপ্পায় ফিরে এসেছিলেন তিনি? আমরা কি ভুলে গেছি, যেখানে আমরা কালো জাদু চর্চাকেই ভয় পাই, সেখানে পরাজাগতিক শক্তির সহায়তায় সেই ভয়ংকর অথর্ব বেদ রচনা করেছিলেন তিনি? আমার পরিষ্কার মনে আছে কাশীর ঘাটে কীভাবে তিনি সোরার বারোজন তলোয়ার যোদ্ধার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন এবং খালি হাতে তাদের সবাইকে হত্যা করেছিলেন। তিনি সেটা করেছিলেন আমার জীবন বাঁচানোর জন্য...'

বিভাষণ পূজারির অর্জন আর অবদানের কথা স্মরণ করে কয়েক মুহূর্তের জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন চন্দ্রধর। অশ্রু সংবরণ করার জন্য মাথা নিচু করলেন তিনি। আবার যখন মাথা উঁচু করলেন, গভীর আবেগ আর দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'যদি দেবতা বলে থাকেন যে আমরা পাহাড় নির্মাণ করবো, তাহলে তাই করবো আমরা। তিনি যদি বলেন যে নদী মাতৃকার গতিপথ পালটে দিতে পারি আমরা, সেটাও পারবো। ভাই ও বন্ধুগণ, ইট-পাথরের পাহাড় গড়ে তুলবো আমরা!'

'ধরে নিন কাজটা হয়ে গেছে, মালকিন। দেবতা তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র নৃত্যরত মেয়েটাকে তার সুবিশাল বিছানায় ফেলে রাখা হবে। আর জাফরান দুধের সবগুলো চৌবাচ্চায় শা, গান এবং এপ নামে তিন শুকরের দেওয়া মিশ্রণ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আর হ্যাঁ, পরিষদের সকল সদস্য, প্রকৌশলী আর কমান্ডারগণ আক্রান্ত হয়েছিলেন।'

প্রিয়ংবদার সুরক্ষিত গোপন কক্ষে এই জঘন্য প্রতিবেদন প্রদান করছে রাঙা। তার মুখে বিকৃত, কুৎসিত ছায়া ফেলেছে কালচে লাল আকাশ। সাধারণ কেউ দেখলে ভাববে এক ধ্বংসপ্রায় মন্দিরে রাঙা বুঝি কোনো দেবী প্রতিমার পূজা করছে। কেউ জানে না যে ওটা প্রিয়ংবদার অভিশপ্ত অবয়ব।

চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে রাঙা, এমন সময় তার শেষ আদেশটি বিড়বিড় করে উঠলো শয়তানের রানি।

'রাঙা, পুরোহিত আর প্রকৌশলীদের ক্ষেত্রে যা হয়েছে, নিশ্চিত করো আগামীকাল থেকে সকল হরপ্পাবাসীর ক্ষেত্রেও যেন তাই ঘটে। প্রতিটা কূপ, জলাধার এবং শহরের প্রতিটা ঝরনা যেন শা, গান আর এপের দেওয়া শক্তিশালী মেসোপটেমিয়ান লবণ দ্বারা বিষাক্ত হয়ে যায়!'

'জো হুকুম, মালকিন,' জবাব দিলো রাঙা। সে অবাক হচ্ছে তার মালকিন আসলে হরপ্পাবাসীকে নিয়ে কী করতে চায়। বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না তাকে।

'দুই দিনের মধ্যে হরপ্পা পরিণত হবে জীবন্মৃত আর বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষের শহরে!' ফোঁসফোঁস করে উঠলো প্রিয়ংবদা।

গোয়া (১৬ শতক)
অন্ধকারতম ধর্মযুদ্ধ

হাঁ করে শ্বাস নিতে নিতে তিনি এমনভাবে দৌড়াচ্ছেন যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু পিছু তাড়া করছে তাকে। অথবা নিজের বিশ্বাসের কারণে জীবন দিতে প্রস্তুত তিনি। কঙ্কণের উপকূলবর্তী যে গ্রামে বড় হয়েছেন, সেই বুপদেবের সরু রাস্তা ধরে বাল্মীকির এমন পাগলাটে দৌড়ের কারণ দুটোই।

নির্মম পর্তুগিজ জল্লাদ ক্রিস্টোভাও আর আগস্টিনোর কাছ থেকে পালাচ্ছেন তিনি। দুর্যোগের এই রাতে পেছন পেছন আসছে তারা। কালো মুখোশধারী এই জল্লাদদের হাতে রয়েছে গিলোটিনের মতো কুড়াল। স্বয়ং মৃত্যুদূতের চেয়েও ভয়ংকর তারা। ধাতু গলিয়ে তৈরি ধারালো শ্বদন্তের মতো এই অস্ত্র ব্যবহার করতে পিছপা হয় না এই দুজন। নির্মমভাবে তাদের হতভাগা শিকারের গলা, মাথা, মুখে নেমে আসে তাদের এই অস্ত্র। কালো চামড়ার গোয়াবাসীদের তীব্র ঘৃণা করে এরা। গত কয়েক মাসে ক্রিস্টোভাও আর আগস্টিনো নিজেদেরকে মূর্তিমান শয়তান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বাল্মীকি ৩,২০০ বছরের পুরোনো এমন এক মূল্যবান গুপ্তধন বহন করে চলেছেন, যা যেকোনো মূল্যে পর্তুগিজদের হাতে পড়া থেকে রক্ষা করতে হবে। এমনকি তার কারণে যদি পুরো বুপদেব আর তার ৮০০ অধিবাসীকে পুড়ে ছাই হতে হয় তাহলেও।

বিশাল বিশাল যুদ্ধজাহাজের বহর যখন গোয়ার উপকূলে এসে নোঙর করতে শুরু করলো, ব্যাপারটার তখনই শুরু। ষোলো শতকে ইউরোপের অন্যতম ক্ষমতাশালী সম্রাটের বাহিনী এগুলো। নৌসৈন্যদের এই বিশাল দল পর্তুগালের রাজা ইমানুয়েল সেভেন-এর জন্য লড়াই করে। আর ইমানুয়েল লড়েন রোমের শাসক আর মহামানবের জন্য।

প্রাথমিক আক্রমণটা হয় গোপনে এবং মুখোশের অন্তরালে। জাহাজ ভরে ভরে সৈন্যের তুলনায় অধিক পরিমাণে সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে আসা হয় শান্ত, নিরিবিলি উপকূলে। যখন প্রার্থনাসভা আর ধর্মীয় জমায়েত দেখিয়ে গোয়ার জনগণকে বোকা বানানো হচ্ছিলো, ঠিক তখনই কাছেই কোথায় সমুদ্রে অপেক্ষা করছিলো নির্মম সৈন্যদের বিশাল বহর। যখন তারা ঈশ্বরের শান্তির বাণী শোনাতো, ঠিক তখনই দূরে কোথাও ঝলসে উঠতো পর্তুগিজ সৈন্যদের রক্তপিপাসু তলোয়ার। এক ঈশ্বরের সাথে অন্য ঈশ্বরের তুলনা করে আলোচনা করতো তারা। স্থানীয় শান্তিপ্রিয় সহজ-সরল মানুষদের কাছে যা ছিলো একেবারেই অদ্ভুত ধারণা। তারা নিজের ঈশ্বর নিয়েই সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিলো।

চাপিয়ে দেওয়া এই ভালোবাসা ছাপিয়ে ধীরে ধীরে তাদের রহস্যময় আচরণ প্রকাশ পেতে থাকে। পুরোহিত আর ধর্মপ্রচারকগণ গোয়ার প্রতিটা ভবন আর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কী যেন খুঁজে বেড়ান। তারা কেবল সেসব জায়গা পরিদর্শনই করেন না, কয়েক দিন এমনকি মাঝে মাঝে কয়েক সপ্তাহের জন্য তাঁবু গাড়েন সেখানে। কারো প্রতিবাদ করার সাহস নেই। উপকূলে নোঙর করে রাখা মারণাস্ত্র বোঝাই জাহাজগুলোকে কেউ উপেক্ষা করতে পারেন না।

একটা বিষয় পরিষ্কার। এসব পুরোহিত, এসব সন্ন্যাসী এবং সাদা জোব্বা পরা এসব মানুষেরা...এরা সবাই কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আর সেটা তারা পেতে চায় যেকোনো মূল্যে।

একটা মোড় ঘুরতেই ক্রিস্টোভাও-এর চকচকে কুড়ালের আঘাত অভিবাদন জানালো বাল্মীকিকে। বুক চিরে ভেতরে ঢুকে গেছে কুড়াল। কলকল করে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো সাথে সাথেই। নরম কাদা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লেন সাহসী হরপ্পান। বুকের ক্ষত থেকে বাধাহীনভাবে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে। আগে বাড়লো পর্তুগিজ জল্লাদ। সমাপনী আঘাত হানার জন্য তার কুড়ালটা উঁচু করলো। বাল্মীকিকে কেটে দুভাগ করে ফেলতে যাচ্ছে সে।

বৃষ্টির হিংস্রতা আরো বেড়েছে। অঝোরে ঝরে যাচ্ছে এই নিকষ কালো রাতে। বাল্মীকি দেখতে পেলেন হৃদয়হীন পশুটা আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতের ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে গেল ক্রিস্টোভাও-এর, শয়তানের থাবার মতো জ্বলজ্বল করছে তার অস্ত্র। মৃত্যুর চেয়ে আরো ভয়ংকর মনে হলো তাকে।

বাল্মীকি এত সহজে নিজেকে শেষ হতে দিতে পারেন না। নিজের জীবনের জন্য চিন্তা করেন না তিনি। পৃথিবীর সকল গুপ্তধনের চেয়ে মূল্যবান জিনিস লুকোনো আছে তার জামার নিচে। মানবজাতির জন্য এটাই একমাত্র আশা। ঈশ্বরের নামে পর্তুগিজদের এই হত্যাযজ্ঞও মানবজাতির জন্য অপেক্ষা করে থাকা নির্মম নিয়তির তুলনায় কিছুই নয়। চর্মলিখিত হস্তলিপিটাই যা একমাত্র আশা। পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে এমন একমাত্র সংকেত লুকিয়ে আছে এতে।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পেছনে সরে গেলেন বাল্মীকি। শরীরের সর্বশেষ শক্তিটুকু একত্র করলেন। একটা পাথরখণ্ডে ঠেকলো তার হাত। ওটা দ্রুত তুলে নিলেন, তারপর সেটা দিয়ে আক্রমণ করলেন ক্রিস্টোভাওকে। জায়গামতো আঘাত হানলো পাথরটা। একজন মুমূর্ষু মানুষের সবটুকু শক্তি নিয়ে পর্তুগিজের মুখটা গুঁড়ো করে দিলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো জানোয়ার ক্রিস্টোভাও। নিচের চোয়ালটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মারা গেছেন তিনি।

হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে দাঁড়ালেন বাল্মীকি। তিনি জানেন যেকোনো মুহূর্তে এসে হাজির হবে আগস্টিনো। এটাও জানেন যে তার সময় শেষ হয়ে আসছে। বুকের গভীর কাটা ক্ষত থেকে রক্ত হারানোর ফলে মাথা ঝিমঝিম করছে তার। সমগ্র গোয়াতে বিশ্বাস করার মতো একমাত্র ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে হবে এই হস্তলিপি। পর্তুগিজ হত্যাযজ্ঞের সামনে একমাত্র যে রুখে দাঁড়াতে পারে, সেই হিন্দু সাধুর হাতে এটা তুলে দিতে হবে।

এটা মহান মারকান্দেয় শাস্ত্রীর দরজায় পৌঁছে দিতে হবে তাকে।

মরিয়া হয়ে দরজায় কড়াঘাত করছে কেউ। দুর্যোগের রাতে সব শব্দ ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো বজ্রপাতের শব্দ। তারপরও দরজায় হাতুড়ি পেটানোর মতো শব্দে আকস্মিক ঘুম ভেঙে গেল মারকান্দেয় শাস্ত্রীর। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে তিনি দেখতে পেলেন তার প্রিয় বন্ধু বাল্মীকি দাঁড়িয়ে আছে। রক্তে ভিজে যাচ্ছে শরীর, মারা যাচ্ছেন তিনি।

বন্ধুকে কাঁধে তুলে কুঁড়েঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন মারকান্দেয়। একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে বন্ধুর ক্ষতটা পরীক্ষা করলেন। যা দেখলেন তাতে মাথা ঘুরে গেল

তার। কাঁধ থেকে সোজা কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে বিশাল ক্ষত। খুব বেশি সময় নেই তার বন্ধুর হাতে।

'ওরা দরজা ভেঙে এখানে চলে আসবে, মারকান্দেয়! আমাদের শিব মন্দির ধ্বংস করতে চায় তারা...' বলতে বলতে কেশে উঠলেন বাল্মীকি। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে।

'ঠিক আছে! তুমি শান্ত হও। এ নিয়ে সকালে কথা বলবো আমরা,' বন্ধুকে মিছে আশ্বাস দিলেন মারকান্দেয়। তিনি জানেন আরেকটা সকাল দেখার সৌভাগ্য হবে না বাল্মীকির।

'আমাকে ভোলানোর চেষ্টা কোরো না, মারকান্দেয়। আমরা দুজনেই জানি ততটা সময় নেই আমার হাতে।'

গোয়াতে ছোট্ট একটা সন্ন্যাসী গোত্রের নেতা মারকান্দেয় শাস্ত্রী। কিংবদন্তি অনুসারে, ঘোড়ার পিঠে চলে হাজার মাইল ভ্রমণ করে এখানে এসে পৌঁছেছিলো তার পূর্বসুরিরা। তারা কি কোনো মহাপ্লাবন এড়ানোর জন্য নাকি ভয়ংকর কোনো দুর্যোগ থেকে পালানোর জন্য এখানে এসেছিলো, সেটা কেউ বলতে পারে না। বিশ্বাস করা হয়, তারা বহন করে চলেছে অত্যন্ত গোপন কোনো রহস্য। সাথে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে এসেছিলো তারা যা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। অনেকগুলো বড় বড় শিব আর বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করে তার গোত্র। যার আশেপাশে গড়ে তোলা হয়েছিলো জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। শীঘ্রই বিশাল উপকূলবর্তী অঞ্চলের জনগণ তাদের গোত্রটিকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে শুরু করে। সময়ের স্রোতে হারিয়ে যায় তাদের ঘিরে গড়ে ওঠা প্রাচীন রহস্যের গল্পটিও। কয়েক প্রজন্ম কেটে গেছে। এখন গোয়াবাসী মারকান্দেয় শাস্ত্রীর গোত্রকে নিজেদের বংশধর হিসেবেই মেনে নিয়েছে।

॥ ৯ ॥

'আমি যখন তালা খুলে শাস্ত্রটা বের করি, তখন তারা একেবারে কাছে চলে এসেছিলো, মারকান্দেয়,' ব্যাখ্যা করলেন বাল্মীকি।

'তুমি অসীম সাহসী, বন্ধু। তোমার কথা ভুলবে না কেউ,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন মারকান্দেয়। গভীর মমতায় মুমূর্ষু বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন তিনি।

'আমার জামার নিচে লুকোনো আছে ওটা, মারকান্দেয়,' বলে চলেছেন বাল্মীকি। ব্যথাটা একেবারে অসহনীয় হয়ে গেছে। কষ্টে দুমড়ে-মুচড়ে বেঁকে যাচ্ছে তার খণ্ডিত দেহটা।

নীরবে কেঁদে চলেছেন মারকান্দেয়। বন্ধুর এমন যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না তার। বিশেষ করে যখন তিনি বুঝতে পারছেন মানবসভ্যতার বৃহত্তর কল্যাণের বেদিমূলে বাল্মীকি হচ্ছে আরো একটা বলিদান।

এখন আর কথা বলতে পারছেন না বাল্মীকি। নিঃশ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার। ধীরে ধীরে তার কাছে কালো হয়ে আসছে পৃথিবী। নশ্বর দেহ ত্যাগ করার আগে রক্তমাখা হাত তুলে মারকান্দেয় শাস্ত্রীর মুখ স্পর্শ করলেন তিনি। কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত রক্ততিলক এঁকে দিলেন। তারপর শেষ কথাটি ফিসফিস করে বললেন বাল্মীকি।

'পবিত্র প্রার্থনা গৃহের নাম করে আমাদের মন্দিরের জায়গায় বিশাল স্থাপনা তৈরি করতে চায় তারা, মারকান্দেয়। পবিত্র মেষপালকের নামে হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এই হতভাগাগুলো। অথচ তিনি তাদের ভালোবেসে জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন!'

বাল্মীকি এখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। শারীরিক ব্যথার কারণে নয়, মানুষের অবিশ্বাস্য নৃশংসতায়।

'আমাদেরকে রক্ষা করো, মারকান্দেয়। আমাদেরকে বাঁচাও। আজ রাতেই চলে যাও এখান থেকে। এক্ষুনি। পূর্ব দিকে যাও, বন্ধু, জাভা আর সুমাত্রার কাছাকাছি। হস্তলিপিটা তোমার সাথে নিয়ে যাও।'

মারকান্দেয় বুঝতে পারছেন না কী করবেন। পুরো পরিস্থিতিই একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। একদিকে যেকোনো মূল্যে হস্তলিপিটা রক্ষা করতে হবে, অন্যদিকে তিনি জানেন না কোথায় পালাবেন।

'অবশ্যই করবো, বাল্মীকি। আমি চেষ্টা করবো। তবে এত নিশ্চিত হয়ো না। কেন তোমার মনে হচ্ছে যে এই মহারক্তস্নান থেকে আমি আমাদের রক্ষা করতে পারবো?'

'কারণ...কারণ...মারকান্দেয়...' হাঁফাচ্ছে বাল্মীকি। শেষ চেষ্টা হিসেবে মাথাটা সামান্য উঁচু করলেন তিনি। চেষ্টা করছেন ফিসফিস করে কিছু বলার, কিন্তু সাথে সাথেই নির্জীব হয়ে ঢলে পড়লেন মারকান্দেয়র কোলে।

বন্ধু মারা যাওয়ার আরো অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত ফিসফিস করে বলা তার শেষ কথাগুলো কানে বাজতে লাগলো মারকান্দেয়র।

'মারকান্দেয়..তুমি অর্ধ-মানব, অর্ধ-ঈশ্বর।'

লড়াইটা সমানে সমানে ছিলো না।

কাঁধ থেকে উরু পর্যন্ত প্রায় দুর্ভেদ্য বর্ম পরে আছে আগস্টিনো। দুহাতে দুটো ভয়ংকর দর্শন বিশাল তলোয়ার প্রায় পাখির পালকের মতো দোলাচ্ছে সে। তার মাথাকে সুরক্ষা দিচ্ছে গ্রিক ধাতু দিয়ে তৈরি একটা হ্যালমেট। তার কোমরের বেল্ট থেকে বেশ কয়েকটা ধারালো ছুরি ঝুলছে। ওটাই শেষ নয়, তার লোহার গিলোটিনে এখনো লেগে আছে মানুষের মাংসের অবশেষ।

অন্যদিকে, মারকান্দেয় শাস্ত্রী খালি গায়ে খালি হাতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন প্রতিপক্ষের দিকে। নিঃসীম বারিধারা তার ভাস্কর্যের মতো দেহটা ধুয়ে দিচ্ছে, আরো পরিষ্কার করে দিচ্ছে তার লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যকে। বাল্মীকির মৃতদেহ শেষ আচার পালনের অপেক্ষায় এখন পড়ে আছে মারকান্দেয়র কুঁড়েঘরে।

নির্মম তলোয়ারগুলো নাচাতে নাচাতে খ্যাপা ষাঁড়ের মতো মারকান্দেয়র দিকে আক্রমণ হানলো আগস্টিনো। আগস্টিনোর তলোয়ার লক্ষ্যে আঘাত হানার সামান্য আগে উন্মত্ত লোকটার আঘাত এড়ানোর জন্য একপাশে সরে গেলেন তিনি। সেই সাথে সুপ্রশিক্ষিত কালারিপায়াত্তুর এক মরণ আঘাত হানলেন পর্তুগিজ বুলডগের পেটে। ঠিক যেন বাঘের থাবা। মুহূর্তের মধ্যে আগস্টিনোর পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এলো তার হাতে।

লড়াইটা সমানে সমানে ছিলো না।

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ
নয়নতারা

বিভাষণ পূজারি আর মানুর পূজনীয় এবং বিখ্যাত বাবা-ছেলে জুটি নয়নতারার আধুনিক, সমৃদ্ধ অট্টালিকার প্রাসাদোপম বারান্দায় গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেই তাদের শক্তিশালী ঘোড়ায় চড়ে বিশাল বসতবাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করেছে। তাদের সঙ্গে এসেছে একশত অশ্বারোহী সৈন্যের একটা দল।

গত রাতে পরিষদের সাথে মিটিং-এর পর থেকে ভাবনার ঝড় চলেছে বিভাষণ পূজারির মনে। বিশেষ করে চন্দ্রধরের প্রলয় সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে। অনেক আলাপ-আলোচনা আর দেবতার চাপাচাপির পর ইট-পাথর আর কাঠের এক বিশাল স্থাপনা নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মনুষ্যনির্মিত এমন একটা পাহাড় যা ক্ষিপ্ত সরস্বতী ও তার দৈত্যাকার ঢেউগুলোর গতি পরিবর্তন করে দিতে পারে। বাকি রাতটা হরপ্পার প্রকৌশলী, সামরিক কমান্ডার আর পরিষদ সদস্যদের সাথে কাটিয়েছেন বিভাষণ পূজারি। প্রকৌশল আর বৈদিক গণিতের আশ্চর্য দক্ষতায় এবং সতর্ক বিবেচনায় প্রস্তাবিত উচ্চবিলাসী পরিকল্পনার প্রথম নীলনক্সা প্রণয়ন করেন দেবতা। সোমদত্ত ও তার প্রকৌশলী দলের গবেষণার জন্য প্রকল্পের নথিগুলো রেখে আসা হয়। দুঃসাধ্য কাজটা সম্পাদনের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করতে আজ আবার পুনরায় মিলিত হবেন তারা। বিভাষণের লক্ষ্য

নয়নতারার বিরক্তিকর অভিযোগের ব্যাপারটা যত দ্রুত সম্ভব শেষ করে হরপ্পার নিরাপত্তার দায়িত্বে ফিরে যাওয়া।

রাজকীয় অভ্যর্থনা কক্ষের সৌন্দর্য দেখে মনে মনে বিমোহিত হয়ে গেলেন দেবতা। চকচকে মেঝেটা আয়নার মতো ঝকঝক করছে। ঘরের থামগুলো সবচেয়ে সুন্দর আর সূক্ষ্মভাবে কাটা পাথরের টালি দিয়ে সাজানো। কোনায় কোনায় বসানো হয়েছে কামোদ্দীপক সব ভাস্কর্য। তাজা ফুল আর অপরিচিত ভেষজের গন্ধে সুভাষিত অট্টালিকার বাতাস। চোখ ধাঁধানো ঝরনার স্বচ্ছ, টলমলে জলে চোখ আটকে যাবে যে-কারো। কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে বাদ্যযন্ত্রের মনমাতানো সুর।

তবে বাসস্থানের সৌন্দর্যের চেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেটার মালিকের অবর্ণনীয় স্বর্গীয় সৌন্দর্যে চোখ ধাঁধিয়ে গেল দেবতার। সুন্দরী নয়নতারার পাগলকরা সৌন্দর্য মুহূর্তের জন্য দেবতাকেও বিমোহিত করে দিলো।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না বিভাষণ পূজারি। নয়নতারাকে যেন স্বর্গ থেকে সোজা নেমে আসা কোনো অপ্সরা বলে মনে হচ্ছে। তার সবকিছুই নিখুঁত। হালকা বাদামি বর্ণের চুলগুলো মসৃণ ঘাড় আর কাঁধের পেছনে একটা সাধারণ খোঁপায় বাঁধা। তার ঝলমলে ত্বক দেখে মনে হচ্ছিলো এইমাত্র বুঝি গোলাপ আর জাফরান দুধে স্নান সেরে এসেছে সে। পূর্ণ ঠোঁটদুটো এমন এক স্বাভাবিক মাদকতা যা তার প্রতিটা গুণমুগ্ধকে আকর্ষণ করে। তার বড় বড় চোখদুটোয় স্বর্গীয় মাদকতা। বাঁকানো চোখের ভ্রুতে আলোর নাচন।

সহসাই মানু বুঝতে পারলো এখানে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না তার। বিশেষ করে নয়নতারা যেখানে তার অসীম সৌন্দর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। হাতজোড় করে বিভাষণ আর নয়নতারা উভয়ের উদ্দেশে মাথা নেড়ে বিদায় জানিয়ে ভবন ত্যাগ করলো সে। এর মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও বিভাষণ পূজারির উপর থেকে চোখ সরায়নি নয়নতারা।

বিভাষণ লক্ষ করলেন নির্লজ্জ কামনা নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নয়নতারা। তার কঙ্কণ পরা লতার মতো হাতদুটো কোমরে রাখা। অসম্ভব স্বচ্ছ সাদা একটা শাড়ি পরে আছে সে, যা তার সুগঠিত, তন্বী দেহাবয়বের খুব সামান্যই ঢাকতে পেরেছে। মাঝেমধ্যেই শাড়ির আঁচল বাম কাঁধ থেকে গড়িয়ে কোমরে নেমে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়ছিলো রত্নখচিত লাল অন্তর্বাস। ডান কাঁধ থেকে কণ্ঠা পর্যন্ত বাকি অংশ পূর্ণ প্রস্ফুটিত। তার সরু কোমর আর পাওলোয় কোনো বসন নেই। তার অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য আর আকর্ষণের প্রশংসা না করে পারলেন না বিভাষণ। কিন্তু প্রলুব্ধ হননি তিনি। ইন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে দেবতার।

'অভ্যর্থনা কক্ষ আপনার জন্য নয়, প্রভু,' নয়নতারা বললো। 'অনুগ্রহ করে মহান দেবতার পদ্মচরণকে আমার ব্যক্তিগত কক্ষে স্বাগত জানানোর অনুমতি দিন,' সুললিত কণ্ঠে যোগ করলো সে।

অনুরোধটা অযৌক্তিক মনে হলো বিভাষণ পূজারির নিকট। তবে বিরোধিতা করলেন না তিনি।

'আপনার অনুগ্রহ,' জবাবে বললেন তিনি।

'অনুগ্রহ করে আপনার দাসীকে নয়নতারা বলে ডাকবেন। অথবা নয়ন, ভালোবেসে শুভাকাঙ্ক্ষীরা এ নামেই ডাকে তাকে।'

'ঠিক আছে, নয়নতারা। এবার কি আমরা শহরের বিচার বিভাগ থেকে পাওয়া আদালতের সমন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি? মনে হচ্ছে কোথাও একটা ভুল হচ্ছে।'

'প্রভু, আপনার দাসী একটা ভুলের সাগর,' খিলখিলিয়ে অপূর্ব সুন্দর হেসে বললো নয়নতারা।

বিভাষণ পূজারির চোখের দিকে তাকিয়ে তাকে অনুসরণ করতে ইশারা করে ব্যক্তিগত কক্ষের দিকে হাঁটা শুরু করলো সে। ওকে অনুসরণ করলেন বিভাষণ। এই মেয়েকে তার ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। এমনকি নিজের সদানিয়ন্ত্রিত কামপ্রবৃত্তিকেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

নয়নতারার শয়ন কক্ষ যেন একটা কামস্বর্গ। তাজা ফুল, কর্পূর আর ধূপের গন্ধে সুবাসিত বাতাস। জানালা দিয়ে প্রমোদ কক্ষে প্রবেশ করা সূর্যের আলো সাদা আর ফিরোজা রঙের পর্দায় বাধা পেয়ে তৈরি করছে মায়াবী রেশমি আভা। সুগন্ধি মদের বোতলের নকশাকাটা মুখাবরণের মতো বিরল স্ফটিকের একটা ঝাড়বাতি ঝুলছে উপরে। বিশাল বিশাল সোফার উপর গাঢ় নীল পাশবালিশ। বিশাল কক্ষের শেষ প্রান্তে সূক্ষ্মভাবে তৈরি হলুদাভ ধাতব ফ্রেমের কারুকার্য। অন্য প্রান্তে দেখা যাচ্ছে কালো চাদরে ঢাকা একটা বিলাসবহুল বিছানা।

'হে মহান দেবতা, আমার সাদাসিধা প্রেমকাননে আপনাকে স্বাগত,' বিভাষণ পূজারি তার কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করতেই কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে ফিসফিস করে বললো নয়নতারা। পেছনে কক্ষের একমাত্র দরজা বন্ধ করে দিলো সে। এবার তার নেশা ধরানো চোখে দুষ্ট কটাক্ষ।

স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন বিভাষণ। চতুর মহিলার কোনো ছলাকলায় প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'কেন পরোয়ানা পাঠানো হয়েছে, নয়নতারা?' দৃঢ় কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি এবার।

বিভাষণ পূজারির শোনা সবচেয়ে মিষ্টি হাসির জলতরঙ্গে ভরে উঠলো কক্ষ। মনে হলো যেন একসাথে বেজে উঠলো হাজারো স্বর্গীয় বীণা।

এবার বিভাষণ পূজারির দিকে এগিয়ে এলো সে। একেবারে বিপজ্জনকভাবে পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। বিভাষণ পূজারির পেশিবহুল শরীরের সাথে লেগে যায় প্রায়। তার অপূর্ব অধর বিভাষণের চিবুক ছোঁয় ছোঁয়। সরাসরি তার চোখের দিকে তাকালো সে। একেবারে কাছে থেকে তার মুখটা দেখতে পাচ্ছেন এখন বিভাষণ পূজারি, অনুভব করছেন নয়নতারা শরীরের পাগলকরা ঘ্রাণ। তাকে স্বীকার করতেই হবে এ আকর্ষণ এড়ানো কঠিন। আরো শক্ত থাকতে হবে তাবে। যাই হোক না কেন, তিনি তো অর্ধেক মানুষ।

'পরোয়ানা না পাঠালে কি এই অধম দাসীকে এত কাছে আসার সুযোগ দিতেন, প্রভু?' তার সুবাসিত নিঃশ্বাসের উষ্ণ ছোঁয়া এসে লাগলো বিভাষণ পূজারির মুখে।

রেগে এক পা পিছিয়ে গেলেন বিভাষণ পূজারি। তরুণী নর্তকীর স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছেন। তিনি কিছু বলার আগেই সাদা, স্বচ্ছ পোশাকটা শরীর থেকে ফেলে দিলো নয়নতারা। মেঝেতে গলে পড়লো সেটা। প্রশিক্ষিত পায়ে এক পা এগিয়ে এলো সে নির্ভীক চিত্তে। লতার মতো হাত দিয়ে বিভাষণ পূজারির গলা জড়িয়ে তৃষ্ণার্তভাবে নিজের ঠোঁটদুটো ডুবিয়ে দিলো বিভাষণ পূজারির ঠোঁটে।

বানারস, ২০১৭
ন্যায়না

এ এক চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সাহচর্য। দেব-রাক্ষস মঠের অস্ত্রাগারের মাঝখানে বসে আছে বিদ্যুৎ। আশ্রমের আরো অনেক গোপন কামরার মতো মঠের বেজমেন্টে অবস্থিত এটাও আরেকটা কক্ষ। জায়গাটা আলো-আঁধারিময়। অনবরত ধূমপান করছে বিদ্যুৎ। আর কাউকে এখন ভয় পায় না সে। ঘাটে দেখা বালকসুলভ সুন্দর মুখটার কথা ভাবছে সে। ভাবছে কী শাস্তি দেবে তাকে।

সমগ্র অস্ত্রসম্ভার মাঝখানে রেখে বৃত্তাকারে বসে আছে তারা। ভয়ংকর যোদ্ধা বলভান্তের উপস্থাপনা এটা। মালামালের মধ্যে পুরোনো বজ্রগতির এনফিল্ড রাইফেল আর উইনচেস্টার রাইফেল আছে। আরো রয়েছে শটগান, পিস্তল আর দারুণ সব রিভলবার, কোল্ট থেকে আরম্ভ করে ব্যারেটা এবং ওয়েবলি স্কট–কী নেই ওখানে? আর রয়েছে ছড়ি–কালারিপায়াত্তু চ্যাম্পিয়নদের প্রিয় অস্ত্র।

তার সামনে থাকা অস্ত্র আর গোলাবারুদের সম্ভার দেখে হতবাক হয়ে গেছে বিদ্যুৎ। সত্যি সত্যি ছোটখাটো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত মঠ।

'আমাদের কাছে কালাশনিকভ আর চাইনিজ গ্রেনেড নেই কেন, বলভান্ত দাদা?' মজা করে জানতে চাইলো বিদ্যুৎ।

'কারণ আমরা সন্ত্রাসী নই, বিদ্যুৎ,' জবাবে জানালো বলভান্ত। 'আমরা রক্ষক, ধ্বংসকারী নই। এখানে তুমি যে অস্ত্রগুলো দেখছ তার প্রত্যেকটাই বৈধ উৎস থেকে সংগৃহীত। সরকারি লাইসেন্স আছে এবং অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে হয় কোনো ব্রিটিশ কর্মকর্তা বা ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তার কাছ থেকে সংগ্রহ করা

হয়েছে। মঠের এসব বিশ্বস্ত বন্ধুরা এই অস্ত্রগুলো আমাদের দিয়েছেন এই বিশ্বাসে যে স্থাপনার প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত হবে এগুলো, কাউকে অযথা আক্রমণ করতে নয়।'

মঠের যুদ্ধবিষয়ক অধিনায়কের কাছ থেকে দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধের এমন অসাধারণ ব্যাখ্যা পেয়ে মুগ্ধ হলো বিদ্যুৎ। তারপর আরেকটু বাজিয়ে দেখতে চাইলো সে।

'কিন্তু কী জন্যে মঠে এ ধরনের অস্ত্র প্রয়োজন, দাদা? কাদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত হচ্ছি আমরা?'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে বিদ্যুতের চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো বলভান্ত। বুঝতে পারছে না কোথা থেকে শুরু করবে।

'হাজার বছর ধরে টিকে আছে এই মঠ। টিকে আছে বহিঃআক্রমণকারী থেকে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদী অনেক রাজা বাদশাহ আর লুটেরাদের আক্রমণ প্রতিরোধ-প্রতিহত করে। এই হিংস্র, বর্বর, হৃদয়হীন বাহিনী যখন কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরসহ প্রতিটা ভবন, প্রতিটা বাড়ি ধ্বংস করে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছিলো, তখনো সগৌরবে দাঁড়িয়ে ছিলো এই মঠ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শত শত হিন্দু সন্ন্যাসী যোদ্ধা হাজার হাজার সৈন্যদের বিতাড়িত করেছেন এখান থেকে।'

সবাই এখন গভীর মনোযোগের সাথে বলভান্তের কথা শুনছে এবং সহসাই তারা বুঝতে পারলো যে দেব-রাক্ষস মঠের বয়স ১,৬০০ বছরেরও অধিক।

'আমরা এমন অনেক লড়াই লড়েছি যার কথা ইতিহাসে উল্লেখ নেই। আমাদের বিরুদ্ধে যে অবিশ্বাস্য পরিমাণে ষড়যন্ত্র হচ্ছে তা প্রতিরোধের শেষ সম্বল এই বন্দুক আর তলোয়ারগুলো। বিদ্যুৎ, তুমি দেখো এই লড়াইয়ে আমরা ভীষণ একা।'

'কী ষড়যন্ত্র, দাদা? আর একা বলতে কী বুঝিয়েছ তুমি?' বলভান্তের শেষ কথাটা শুনে বিহ্বল বোধ করছে সে।

'এটা তোমার বাবাই তোমাকে জানাবেন, বিদ্যুৎ। তিনিই ভালো জানেন কীভাবে তোমাকে এই গোপনীয় বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে হবে।'

মাথা নাড়লো বিদ্যুৎ। আরো একবার মহান দ্বারকা শাস্ত্রীর সাক্ষাৎ লাভ জরুরি হয়ে পড়েছে তার জন্য। অনেক কিছু জানার আছে। মনে হচ্ছে অনেক বিপদ সামনে।

বৃত্তাকার দলটার মধ্যে বিদ্যুতের পাশেই বসে আছে বলভান্ত। আরো আছে শাস্ত্রী এবং পূজারি রক্তের প্রতি সন্দেহাতীতভাবে অনুগত সনু। ডান পাশে বসেছে

ন্যায়না, মাঝে মাঝেই বিদ্যুতের কাঁধের সাথে নিজের কাঁধ ঘষছে। দলে পরিপক্কতা আর অভিজ্ঞতা যোগ করেছে গোবর্ধন। এখানে একমাত্র নতুন আর বহিরাগত কেবল বালা, বিদ্যুতের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহচর। চার ঘণ্টার নোটিশে সকালে দিল্লি থেকে উড়ে এসেছে সে।

'তারপর কী পরিকল্পনা করলে, ভিডিও?' বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো বালা।

তার কণ্ঠে বিদ্যুতের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ উষ্ণ সুরটা লক্ষ করে খুশি হলো সবাই। অনুভব করতে পারলো দুজনের বন্ধুত্বের গভীরতা।

'আমি ঐ বেজন্মাটাকে খুঁজে বের করে খুন করবো,' একটা ওয়ালথার পিপিকে অটোমেটিক পিস্তলে হাত বোলাতে বোলাতে জবাব দিলো বিদ্যুৎ।

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...অবশ্যই আমরা তাকে খুঁজে বের করবো। শাস্তি দেবো তাকে। কিন্তু খুন করবো কথাটার মানে কী, বন্ধু?' বললো বালা। 'আমরা কিন্তু এখন আর ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পড়ে নেই, ভাই।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসলো বিদ্যুৎ। 'আমি সেটা জানি, বালা। তুই তো জানিস আমি কী বুঝিয়েছি, ব্যাটা।'

'অবশ্যই আমরা খুন করবো,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো বলভান্ত। শত্রুকে হত্যা করবে কী করবে না এমন সিদ্ধান্তহীনতায় বিভ্রান্ত আর রাগান্বিত বোধ করছে সে। যতদূর সে জানে, সামনে কেবল লাশের খেলা।

তার উলটো পাশে বসে থাকা প্রাগৈতিহাসিক মানুষটার দিকে এবার ভালো করে তাকালো বালা। লোকটার দুপাশে ছোট ছোট তরবারি ঝুলছে। দেশের বিদ্যমান আইনের প্রতি অদ্ভুত দর্শন মানুষটার অনাস্থা দেখে হাসিতে ফেটে পড়লো সে।

'বলিন্দর স্যার...খুন করাটা আইনসিদ্ধ নয়,' আমুদে, দিল্লিওয়ালা সুরে গুহামানবকে উদ্দেশ্য করে বললো সে। তবে তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

বালার মুখে নিজের নামের বিকৃত উচ্চারণ শুনে রাগে ফুটতে লাগলো বলভান্ত। জোরে জোরে হেসে উঠলো সনু এবং প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তাকে শুধরে দিলো, 'বালা, ভাই আমার, বলিন্দর নয়...আমাদের সেনাপতির নাম বলভান্ত।'

'বলভান্ত...বলিন্দর...একই জিনিস, তাই না, স্যার?' বলভান্তের উদ্দেশে চোখ টিপলো বালা।

সবাই হেসে উঠলো। যোদ্ধা সর্দারকে শান্ত করার জন্য তার হাঁটুতে নিজের একটা হাত রাখলো বিদ্যুৎ। অপূর্ব মিষ্টি হেসে বিদ্যুতের কাঁধে মাথা রাখলো ন্যায়না। মুখটা লাল হয়ে গেছে তার। ইতোমধ্যেই বালাকে অপছন্দ করতে শুরু

করে দিয়েছে বলভাস্ত। বিপরীতে বিদ্যুতের স্বার্থে খুন করতে প্রস্তুত প্রাণীটার উপরে প্রচণ্ড আগ্রহবোধ সৃষ্টি হয়েছে বালার।

মঠের ক্যান্টিন হতে এক কাপ চা নিয়ে দ্বিতীয় তলার বারান্দায় চলে গেল বিদ্যুৎ। একটা সিগারেট ধরিয়ে দারুচিনির সুগন্ধিযুক্ত চায়ে চুমুক দিলো সে। সামনে ছড়িয়ে আছে ধুলোমলিন, কোলাহলমুখর, প্রাচীন বারানসি শহর। অসীম আঁকাবাঁকা গলির পর গলিতে ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার পরস্পর সংযুক্ত ঘরবাড়ি আর মন্দির। মার্লবোরো সিগারেটে প্রথম লম্বা টানটা দিতেই কে যেন ছোঁ মেরে ঠোঁট থেকে নিয়ে নিলো ওটা। তাকিয়ে দেখলো ন্যায়না, পরীর মতো লাগছে ওকে। তার সিগারেটটা নিয়ে মনের সুখে চোখ বন্ধ করে আরাম করে টানছে। টান শেষ না করেই তার দিকে ফিরলো সে, দুষ্টুমি করে একটা চোখ টিপে দিলো তাকে লক্ষ করে। প্রতিবাদে মৃদু ভর্ৎসনা করলো বিদ্যুৎ। মনে মনে যারপরনাই খুশি হয়েছে তাকে দেখে। সাথে সাথেই দামিনীর কথা মনে পড়ে গেল তার। ন্যায়নার প্রতি বোধ করা ভালোলাগাটা ফুঁ মেরে নিভিয়ে দিলো সাথে সাথে।

ঠোঁট থেকে সিগারেটটা সরালো ন্যায়না, সিগারেটের বাঁটে তার সুন্দর লিপস্টিকের ছাপ লেগে আছে। অনুমতি ছাড়াই দ্বিধা না করে সেটা বিদ্যুতের ঠোঁটে গুঁজে দিলো সে। সিগারেটটা ছেড়ে দিলো না। এমনকি বিদ্যুতের দিকে ফিরলোও না। আশা করছে তার আঙুলের ফাঁকে থাকা অবস্থাতেই সিগারেটে একটা টান দিক বিদ্যুৎ। দুটো বিষয় পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য এটা তার একটা অদ্ভুত তবে বেশ কার্যকর একটা পদক্ষেপ। প্রথমত, বিদ্যুতের কাছ থেকে সে শারীরিকভাবে ভীষণ আরাম বোধ করে। দ্বিতীয়ত, বিদ্যুতের অনুমতির প্রয়োজন নেই তার।

'তুমি ধূমপান করো এটা জানতাম না, ন্যায়না,' তার আঙুলের ফাঁকে থাকা অবস্থাতেই একটা লম্বা টান দিয়ে বললো বিদ্যুৎ।

'আমার সম্পর্কে কী জানো তুমি, বিদ্যুৎ?' ভ্রু উঁচিয়ে দ্রুত জানতে চাইলো সে। তাকে দেখতে দারুণ লাগছে। সেই সাথে একটু বিরক্ত সে।

কেবল হাসলো বিদ্যুৎ, তার প্রশ্ন শুনে লজ্জা পেয়েছে। ঠিকই বলেছে সে। শৈশবের বেস্ট ফ্রেন্ড হওয়ার পরেও আর কোনো যোগাযোগ রাখেনি সে। বুঝতে পারছে তার দেখা সব মেয়ের চেয়ে সুন্দরী সে। বাতাসে একগুচ্ছ চুল উড়ে এসে তার মুখের উপর পড়লো। তার চোখদুটো যেন সব সময় ছলছল করে, এমনকি হাসার সময়ও। যা দেখে ভীষণ মায়া লাগে। বিদ্যুৎ জানে শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়েছে ন্যায়না, ভীষণ বুদ্ধিমতী এবং একজন মার্শাল আর্ট শিল্পী সে। তবে

এখানে এই মুহূর্তে সে কেবলই একটা অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে, যার প্রশংসা না করে উপায় নেই তার।

'অবশ্যই না, আমার সাথে তুমি এমনটা কীভাবে করতে পারলে, বিদ্যুৎ? তোমাকে শত শত চিঠি লিখেছি আমি। অথচ তার একটারও জবাব দাওনি তুমি। বছরের পর বছর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি। একটা ফোনও দিতে পারলে না? কিংবা একটা চিরকুট?' অভিযোগের দৃষ্টিতে সোজা বিদ্যুতের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ন্যায়না।

'আসলে, আমাকে এভাবে দোষ দিও না, ন্যায়না। তুমি তো জানোই দিল্লির মেয়েরা কেমন ফ্যাশনেবল। আর তুমি...তুমি তো ছিলে একটা মটকু, নাকি ভুল বলেছি আমি?' দুষ্টুমি করে ন্যায়নার পায়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বললো বিদ্যুৎ। বুঝতে পারছে না এছাড়া কী বলবে সে।

'তুমি এত সস্তা!' কপট রাগের ভঙ্গিতে বিস্মিত হয়ে বললো ন্যায়না। সেই সাথে বিদ্যুতের বাহুর উপর ধুমাধুম মৃদু কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে দিলো সে প্রতিরোধের ভঙ্গিতে। কাঁধ থেকে খসে পড়েছে তার পাতলা নীল ওড়নাটা, তবে সেটা নিয়ে চিন্তিত মনে হলো না তাকে। লক্ষ্যই করে না। তবে সে না করলেও বিষয়টা খেয়াল করলো বিদ্যুৎ। ওড়না ছাড়া তাকে আরো আকর্ষণীয় লাগছে। রমণীয় সুন্দর মুখের আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিলো তার ঝুমকো কানের দুল। তার উন্নত, মসৃণ গ্রীবা যেন গল্পের বইয়ে পরা পাশের বাড়ির মেয়েটির বর্ণনার মতো। বিদ্যুতের মতো বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হলেও প্রাণবন্ত, কাশীর হাসিখুশি, খুনসুটিপ্রিয় মেয়েটির বয়স উনিশ বছরের একটুও বেশি বলে মনে হচ্ছিলো না।

বিদ্যুৎ এখন প্রাণ খুলে হাসছে আর ন্যায়নার এই চপলতা থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। শৈশবের মতো প্রাণবন্ত হাসিতে সে তাড়া করছে তাকে। পার্থক্যটা হলো, এখন দুজনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে একটা জৈবিক রসায়ন কাজ করছে। যদিও বিদ্যুৎ বারবার সেটা এড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

'ঠিক আছে, যথেষ্ট হয়েছে, এবার থামো,' বললো বিদ্যুৎ। তখনো হাসছে আর হাঁফাচ্ছে।

দুজনেই পাগলা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো। হাঁটুতে হাত রেখে শ্বাস নিচ্ছে আর পুরোনো বন্ধুর মতো হাসছে।

'ঠিক আছে, তাহলে সরি বলো তুমি,' দাবি করলো ন্যায়না। ভীষণ হাঁফাচ্ছে সে, এতে তাকে আরো আকর্ষণীয় লাগছে। এত কিছুর পর তার মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেছে। বিদ্যুতের সাথে সাথে হাসলেও তাকে বেশ আবেগপ্রবণ মনে হচ্ছে। তার জন্য এটা কোনো হাসি-খেলা নয়।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি দুঃখিত...হ্যাঁ! আমি দুঃখিত, ন্যায়নো...' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাতজোড় করে বললো বিদ্যুৎ। সে বুঝতেও পারেনি তাকে সে অনেক অনেক বছর আগে ভালোবেসে ডাকা ন্যায়নো নামে ডেকেছে।

জমে গেল ন্যায়না। নামটা তার কাছে কতটা বিশেষ কিছু সেটা কাউকে বোঝাতে পারবে না সে। তার নিঃসঙ্গ সময়ের সঙ্গী এই নাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে এই নামে সম্বোধন করে সে। সামান্য মাথা কাত করলো সে, এরপর এমনভাবে বিদ্যুতের চোখের দিকে তাকালো যেন তার ভালোবাসায় প্রলুব্ধ করতে চাইছে।

'বলো, আর কখনো আমাকে একা ফেলে চলে যাবে না?' মৃদু স্বরে ফিসফিস করে বললো সে। তার হাসি ধীরে ধীরে অনুনয়ে রূপ নিচ্ছে, পরিণত হচ্ছে হাসি আর কান্নার অদ্ভুত এক মিশেলে।

দু-এক মুহূর্তের জন্য বোবা হয়ে গেল বিদ্যুৎ। একবার তার ইচ্ছে করলো বাবা-মা হারা অপূর্ব সুন্দরী এই মেয়েটাকে গভীর ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে ধরতে। আরেকবার দামিনীর কথা মনে পড়ে গেল তার।

কয়েক সেকেন্ড থেমে তারপর কথা বললো সে, 'ন্যায়না, আমার প্রিয় ন্যায়না, কতটা তোমাকে...'

'শশশ...' বিদ্যুতের ঠোঁটের উপর নিজের একটা আঙুল চেপে ধরলো সে। 'ন্যায়না নয়, বিদ্যুৎ। এইমাত্র যা বলেছিলে সেই নামেই ডাকো,' তার আরো কাছে সরে এসে কানে কানে ফিসফিস করে বললো সে। পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে বিদ্যুতের চোখের গভীরে তাকিয়ে আছে ন্যায়না। তার গাল ঠেকে আছে বিদ্যুতের গালের সাথে। তার ঈষৎ হাঁ হয়ে থাকা বিদ্যুতের ঠোঁট ছোঁয় ছোঁয় প্রায়।

নিজের গালে তার উষ্ণ সুবাসিত নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পাচ্ছে বিদ্যুৎ। সে দেখতে পাচ্ছে ন্যায়নার ছলছলে চোখদুটো এই কান্নায় ভেঙে পড়লো বলে।

ও কোনো কিছু বলার আগেই দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এলো ন্যায়না। দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে তার তৃষ্ণার্ত, কোমল, নরম ঠোঁটদুটো ডুবিয়ে দিলো বিদ্যুতের ঠোঁটে।

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ
মানুষের মতো পাপ। ঈশ্বরের মতো পরিতাপ।

আগের চেয়ে আরো জোর গতিতে নিজের অশ্ব চালনা করছেন বিভাষণ পূজারি। রেগে আছেন তিনি, নিজের উপর এবং সেই সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর। জীবনে এই প্রথমবার কোনো মহিলাকে আঘাত করেছেন। জঘন্য এই কাজের জন্য নিজেকে কোনোভাবেই ক্ষমা করতে পারছেন না তিনি। মুহূর্তের রাগে অন্ধ হয়ে নিজের শক্তির কথা ভুলে গিয়েছিলেন। দেবতার হাতের একটা থাপ্পড় নয়নতারা মতো মোমের পুতুলের জন্য শাস্তি হিসেবে একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিলো। যন্ত্রণায় চিৎকার করে মেঝেতে পড়ে যায় সে, নিচের ঠোঁট থেকে কলকল করে রক্ত বেরোচ্ছিলো।

অশ্বপিঠে চড়ে বিভাষণ পূজারির পাশে পাশে চলেছে তার বুদ্ধিমান ছেলে মানু। বিখ্যাত বাবাকে নিয়ে একটু শঙ্কিত সে। নয়নতারার বাড়ির চাকরবাকর আর তার নিজস্ব দেহরক্ষীদের কয়েকজনের সাথে মানুও দেখেছে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে নয়নতারার ব্যক্তিগত কক্ষ থেকে বাবাকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে আসতে। তার একটু আগে সবাই কাউকে থাপ্পড় দেওয়ার একটা উচ্চ শব্দ শুনতে পায়। সেই সাথে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার। মনে হচ্ছিলো সে যেন যন্ত্রণায় মারা যাচ্ছে।

অভ্যর্থনা কক্ষ পেরিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়লেন দেবতা এবং কোনো কথা না বলে আঙিনা ত্যাগ করলেন। তার ছেলে আর সৈন্যদল অনুসরণ করলো তাকে। বিভাষণ পূজারির বরফসাদা জোব্বার উপরে রক্তের দাগ চোখ এড়ায়নি কারো।

'দেবতা কেবল সপ্তর্ষিদের কাছেই জবাবদিহি করেন, অন্য কারো কাছে নয়,' লাল টুপি পরা সৈন্যদের উদ্দেশে দৃঢ় কণ্ঠে বললো মানু। বুঝতে পারছে নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না সে। তবে মানু কখনোই রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো আচরণ করে না। সে এবং তার পরিবার অবর্ণনীয় অপমানের শিকার হওয়া সত্ত্বেও নিজের মেজাজ ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করলো সে।

'প্রভু, পুরোহিত পরিষদের এক সামান্য সৈনিক আমি। আমি এখানে এসেছি কেবল আমার দায়িত্ব পালন করতে,' শ্রদ্ধাভরে মাথা নিচু করে জবাব দিলো সৈন্যদলের নেতা। জানে সে পবিত্র মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে, মহাক্ষমতাধর বিভাষণ পূজারির বাসভবনে। মানু বুঝতে পারলো বদ্ধ মাতাল হয়ে আছে লোকটা, যা তাকে এমন বেপরোয়া আচরণের সাহস যোগাচ্ছে। তার বাহ্যিক শ্রদ্ধাবোধের অভিনয়ের আড়ালে অশুভ কিছু একটা আছে।

ঘটনা এমনভাবে মোড় নিচ্ছে যে তা সম্মানিত পূজারি পরিবারের ধারণার বাইরে ছিলো। বিভাষণ পূজারি আর মানু বাড়ি পৌঁছানোর কয়েক মিনিটের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হরপ্পান সৈন্যদলের পুরো এক বহর এসে উপস্থিত হলো তাদের দরজায়। তাদের লাল পাগড়ি বাতাসে উড়ছে। ঘণ্টাখানেক আগেও যা অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিলো, সেটাই ধীরে ধীরে, সতর্কভাবে পরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনার ন্যায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। সময় কীভাবে মুহূর্তের ব্যবধানে সবকিছু এলোমেলো করে দেয় সেটাই আরো একবার দেখা যাবে এখন। সমগ্র আর্যব্রতের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাবান আর পূজনীয় মানুষটার জন্য গ্রেফতারি পরোয়ানা বয়ে নিয়ে এসেছে সৈন্যদল। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বয়ং দেবতাকে কারাগারে বন্দি করার জন্য!

নিজের প্রাত্যহিক ভোজনের জন্য মাত্র বসেছেন বিভাষণ পূজারি, এমন সময় মৃদু গলা খাঁকারি দিয়ে তার মনোযোগ আকর্ষণ করলো সাঞ্জনা। সাথে সাথেই চোখ খুললেন বিভাষণ, বিরক্ত হয়েছেন। ত্রিশ বছরের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে কখনোই স্বামীর আত্মশুদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়নি সাঞ্জনা। তিনি ভালোভাবেই অবগত আছেন যে দেবতার এই অবর্ণনীয় ক্ষমতার উৎস এই উচ্চতর বেদ চর্চা আর ধ্যান। এটা তাকে গভীর প্রজ্ঞা, সীমাহীন শক্তি আর সাধারণ মানুষের উপর নিজের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। মহান সপ্তর্ষিদের নির্বাচিত একমাত্র সরাসরি প্রতিনিধি তিনি। সত্যি বলতে কী, গতকাল সকালে সপ্তর্ষিগণ বিভাষণ পূজারিকে

যে আশ্বাস দিয়েছিলেন সেটা অনেক বছর ধরেই হরপ্পা এমনকি পার্শ্ববর্তী মহেঞ্জোরোর অনেকেই আগে থেকেই বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করতেন যে একদিন না একদিন মহান সপ্তর্ষিদের সাথে সাথে একই সম্মানে অবস্থান করবেন বিভাষণ পূজারি। স্নেহময়ী সরস্বতীর আট সন্তান হিসেবে বিশ্বের মঙ্গল সাধন করবেন এবং তারা হবেন অষ্টার্ষি। কিন্তু তা হবার নয়। নক্ষত্রমণ্ডলীতে কী লেখা আছে সেটা আগেভাগে কেউই বলতে পারে না।

তাদের একজন হওয়া তো দূরের কথা, চন্দ্র একবার চক্র ঘুরে এলে সপ্তর্ষিদের অস্তিত্বই পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিতে যাচ্ছেন তিনি। সেই পবিত্র ঋষিদের, যাদেরকে তিনি হরপ্পার রক্ষাকর্তা আর নিজের স্বর্গীয় পরামর্শদাতা বলে ভাবতেন।

যে আতঙ্ক আর সহিংসতার মুখোমুখি হরপ্পাবাসী হতে যাচ্ছে তা এর আগে আর কখনো প্রত্যক্ষ করেনি পৃথিবী। তবে এখন থেকে বারবার সহ্য করতে হবে এমন হিংস্রতা আর বীভৎসতা। এক দানবের অদম্য তৃষ্ণা দমন করার জন্য বারবার নিষ্পাপ মানুষের রক্ত ঝরাবে মানুষ। কেবল একজন অত্যাচারী শাসকের অতৃপ্ত ক্ষুধা মেটানোর জন্য প্রতি যুগে যুগে শোনা যাবে লক্ষ লক্ষ নির্যাতিতের আর্তচিৎকার। আর খুব শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে এটা। প্রথমবার প্রভু নিজেই দশ মেরু দ্বীপের দানব রাজাকে উৎখাত করবেন; তারপর খড়তুতু ভাইয়েরা সিংহাসনের জন্য মহাকাব্যিক লড়াই করবে এবং পুরো একটা প্রজন্মের রক্তের বিনিময়ে বিজয় লাভ করবে। তারপর কালো প্লেগের রূপে বিরানভূমি হয়ে যাবে পৃথিবী। তারপর মধ্য পৃথিবীতে সুন্দর মেষপালক আর স্বর্গীয় যিশু, যিনি আকাশে উঠে গিয়েছিলেন, তাদের অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। তারপর আসবে চার বছরব্যাপী যুদ্ধ যা সমগ্র বিশ্বকে আক্রান্ত করবে। যুদ্ধ শেষ হবে সেদিন, যেদিন প্রতিদিন সকালে উদিত হওয়া সূর্যটা এই ভূমিতেই বিস্ফোরিত হবে। তবে তাতেই শেষ নয়। এই রক্তপাত আসলে কখনোই শেষ হওয়ার নয়।

আর এর শুরু হতে যাচ্ছে মহান দেবতা বিভাষণ পূজারির পতনের মধ্য দিয়ে। তাকে মহাবিশ্বের অন্ধকারতম অভিশাপ হিসেবে নাকি সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে এটার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিলো, অনন্ত মহাবিশ্ব সেটা কখনোই জানতে পারবে না। সহ্যক্ষমতার বাইরে তার পরীক্ষা নিতে যাচ্ছিলো মহাবিশ্ব। এবং তিনি ব্যর্থ হতে যাচ্ছেন। তিনি কেবল শত্রুদের উপর তার ভয়াবহ আক্রোশই ঢেলে দেবেন না, শুধু হরপ্পাবাসীই তার আগুনে পুড়বে না, তার সামনে যে বা যারাই আসবে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে–এমনকি সপ্তর্ষি বা সাত ঋষিগণও। তবে রাগ হলো সবচেয়ে ভয়ংকর বিষ। অন্ধ রাগে তিনি যা ভুলে গিয়েছিলেন তা হলো, সপ্তর্ষিদের বিরুদ্ধাচরণ করা মানে ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করা।

তারপরও অধপতনের আঁধার আর পরোপকারিতার আলো একই হৃদয়ের উলটো পিঠ। মহান সপ্ত ঋষিদের ধ্বংস করে দেওয়া যেমন তার নিয়তি, তেমনি সপ্তর্ষিদের পুনরায় অমর করে দেওয়াটাও তারই নিয়তি। তিনি তাদের এমনভাবে অমর করতে যাচ্ছেন যে অনন্তকালের জন্য রাতের আকাশে তারা হয়ে জ্বলজ্বল করবেন সাতজনই।

মানুষের মতো পাপ করতে যাচ্ছেন দেবতা। এবং পরিতাপ করবেন ঈশ্বরের মতোই।

বানারস ২০১৭
মানবজাতির সবচেয়ে বড় অসত্য: ২য় পর্ব

আবারও দ্বারকা শাস্ত্রীর পাশে বসতে পেরে স্বস্তি বোধ করছে বিদ্যুৎ। তার পকেটে বহিরাগত বস্তুর উপস্থিতি আঁচ করার পর বিদ্যুতের সাথে আলোচনা ভেস্তে গিয়েছিলো, সেটাও চব্বিশ ঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে প্রায়। এর মধ্যে বলভান্ত, বালা আর ন্যায়নার মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে গেছে।

'মিথ্যা যেভাবে বাজারজাত হয়, ঠিক একইভাবে সত্য কখনো বিক্রি হয় না, বিদ্যুৎ। সত্য চাপা পড়ে সবচেয়ে বেশি, সমাধিস্থ হয় সবচেয়ে গভীরে,' দ্বারকা শাস্ত্রী শুরু করলেন।

'আমি জানি আধুনিক কালের ইউরোপিয়ান আর পশ্চিমা প্রভাবিত স্কুল এবং পাঠ্যবইয়ের পাঠ্যক্রমে সুপরিকল্পিতভাবে যা গেলানো হয়েছে সেটা ভুলে যাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং সামনে এগোনোর আগে হরপ্পার আবিষ্কার ও তার পরবর্তী ইতিহাস সম্পর্কে নিচের প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করি: কখন হরপ্পা সভ্যতার অস্তিত্ব ছিলো আর এটা আবিষ্কৃত হয় কখন? আবিষ্কার করেছিলেন কে? প্রকৃতপক্ষে এটাকে কী নামে ডাকা হয়? আনুষ্ঠানিকভাবে আবিষ্কার নথিবদ্ধ হওয়ার কয়েক দশক আগে সেখানে কী ঘটেছিলো? এবং সবচেয়ে বড় কথা, তারপর এর কী হয়েছিলো?'

গভীর মনোযোগের সাথে শুনছিলো বিদ্যুৎ। অসুস্থ প্রপিতামহকে স্বতস্ফূর্তভাবে কথা বলতে দেখে আনন্দ হচ্ছিলো তার। বিদ্যুৎ জানে কত কী যে শেখার আছে! অথচ দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়।

'বাবা, আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই। তবে আমি এটা জানি যে এক বৃটিশ কর্মকর্তা ১৯২১ সালে হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। আমার মনে আছে তার নাম স্যার জন হার্বাট মার্শাল। পরের কয়েক বছরের মধ্যে মহেঞ্জোরোর মতো সাইটগুলোও খনন করা হয়...আমার যদি ভুল না হয় তাহলে সময়টা সম্ভবত ১৯৩১ সাল।'

প্রায় বিস্মৃত ইতিহাসের অধ্যায় সম্পর্কে বিদ্যুতের মৌলিক জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। তা সত্ত্বেও না হেসে পারলেন না তিনি।

'কী হয়েছে, বাবা? আমি কি ভুল কিছু বললাম?' জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ।

'না, না, না...তুমি একদম ঠিক বলেছ,' সাড়া দিলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। 'এখন আমাকে বলো, আর কী কী জানো তুমি। নাকি আমার বলা উচিত, যাকে তোমরা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা বলে ডাকো, সেটা সম্পর্কে কী কী শেখানো হয়েছে তোমাকে? আমাকে সব খুলে বলো।'

লজ্জিত বোধ করলো বিদ্যুৎ। অগাধ পড়াশোনা করা একজন মানুষ হিসেবে হরপ্পা সম্পর্কে সত্যি খুব বেশি কিছু জানে না সে। বিশেষ করে এই মহান বৃদ্ধের সাথে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার মতো বেশি কিছু জানা নেই তার। সবটুকু মনোযোগ একত্র করলো সে এবং স্মৃতির অতল থেকে যা জানে সব স্মরণ করার চেষ্টা করলো।

'আমি আগেই বলেছি, বাবা, এ ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানি না আমি। তবে যে সামান্যটুকু জানি সেটার বলার এবং আপনার সাথে ভাগ করে নেবার চেষ্টা করবো।'

'বলে যাও,' স্বভাববিরুদ্ধ ধৈর্য সহকারে বললেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

'বিশ্বাস করা হয়, সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিলো হরপ্পা সভ্যতা, যার বেশিরভাগ অংশ এখন পাকিস্তানে অবস্থিত। ধরা হয় ব্রোঞ্জ যুগে ২৬০০ থেকে ২৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলো এই সভ্যতা। খনন করা স্থানগুলোর মধ্যে হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। যদিও এ ধরনের প্রায় ১,০০০ জায়গা আবিষ্কৃত হয়েছিলো। ঐ যুগের আরো কিছু সুপরিচিত জনবসতি হলো ধোলাভিরা আর রাখিগারী। এই দুটোই আধুনিক ভারতে অবস্থিত।'

দ্বারকা শাস্ত্রী হাসছিলেন। তিনি সব সময় জানতেন বিশাল, হৃদয়হীন শহরের মানুষ হলেও সাধারণ কেউ নয় বিদ্যুৎ। হরপ্পার মতো বিস্মৃতপ্রায় অজানা একটা

বিষয় সম্পর্কে প্রপৌত্রের জ্ঞানের প্রশংসা করছেন তিনি এখন। বিশেষ করে সে যখন নয়া দিল্লির একজন তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা।

'আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে তুমি অনেক বেশি জানো, বিদ্যুৎ। এবার আরেকটু ভালো করে ভাবো, এরপর হরপ্পা সম্পর্কে তোমার শেষ বক্তব্য তুলে ধরো। এর সংস্কৃতি আর বাসিন্দাদের সম্পর্কে কী জানো তুমি? আর তার বিলীন হয়ে যাওয়া সম্পর্কেই বা কী জানা আছে তোমার?'

॥ ৯ ॥

এক ঘণ্টা কেটে গেছে। এবং সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা সম্পর্কে তার জ্ঞানের সবটুকু ঢেলে দিয়েছে বিদ্যুৎ। তার প্রিয় পাঠ্য বইয়ের পাতা থেকে স্মরণ করেছে সে। সুযোগ পেলেই পত্র-পত্রিকা আর ম্যাগাজিনে পড়া হরপ্পার জনগণ এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম, যাদের দ্রাবিড় বলে ডাকা হয়, তাদের সম্পর্কে লিখিত প্রতিটা তথ্য মনে করার চেষ্টা করলো সে।

ও দ্বারকা শাস্ত্রীকে ব্যাখ্যা করলো, হরপ্পাবাসীদের কেমন সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত ভবন ছিলো, তাদের সূক্ষ্ম পয়ঃপ্রণালি আর পোড়া লাল ইটের অত্যধিক ব্যবহার। স্বনামধন্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার খুঁড়ে পাওয়া সিল আর মৃৎশিল্প সম্পর্কে বর্ণনা করলো সে। প্রাচীন মিশর আর মেসোপটেমিয়ার মতো হরপ্পায় পাওয়া প্রাচীন মানববসতি সম্পর্কেও বললো। সেই সাথে নিজের ভান্ডারে থাকা আরেকটা তথ্যও দিলো। দ্বারকা শাস্ত্রীকে জানালো তামা এবং ব্রোঞ্জের ব্যবহার থাকলেও ঐ যুগে লোহার ব্যবহার ছিলো না।

'আসলে এটুকুই আমি জানি, বাবা। নতুন তেমন কিছু জানি না আমি,' আকণ্ঠ হেসে বললো বিদ্যুৎ। দ্বারকা শাস্ত্রীও তার সাথে হেসে উঠলেন। দেব-রাক্ষস মঠে তার বিশাল চেম্বারে বিদ্যুৎ যেন কেবলই এক ছোট্ট বালক, যে খেলা করছে তার দাদার সাথে।

দ্বারকা শাস্ত্রী গলা খাঁকাড়ি দিয়ে শুরু করতে যাবেন, তার আগেই তাকে বাধা দিলো বিদ্যুৎ।

'আরেকটা বিষয়, বাবা...খনন করার সময় তারা অনেকগুলো প্রস্তরমূর্তি পেয়েছিলো। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো কনুইভরতি চুড়ি পরা এক নৃত্যরত মেয়ে আর আপাতদৃষ্টিতে একচোখা, শ্মশ্রুমণ্ডিত এক পুরোহিত রাজা। দ্বিতীয়টি করাচির জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য রাখা আছে।

শিহরিত বোধ করছে বিদ্যুৎ। সে প্রায় প্রপিতামহের সাথে হাই-ফাইভ করার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। তবে নিজের পাণ্ডিত্যে খুশি হওয়ার আগেই সে লক্ষ

করলো ঐ সব মূর্তিকার কথা শুনে তার দাদার মুখের প্রসন্ন ভাবটা চলে গেছে। হাস্যরসে ভরা পরিবেশটা মুহূর্তেই হয়ে গেছে বিষন্ন।

'কী হলো, বাবা?' জানতে চাইলো বিদ্যুৎ। 'আমি কি ভুল কিছু বলে ফেলেছি?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। ভাঁজ পড়ে গেলেও মুখটা এখনো বেশ তাজা রয়েছে তার। অদ্ভুত সতেজ আর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

'এই মূর্তিকাগুলো ভাগ্যক্রমে কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদ আবিষ্কার করে ফেলেননি, বিদ্যুৎ,' বিষন্ন মুখে বললেন মঠাধ্যক্ষ। 'তাদের নিয়তি ছিলো এসব আবিষ্কার করার।'

এইমাত্র প্রপিতামহ যা বললেন সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে কষ্ট হচ্ছিলো বিদ্যুতের। তবে নীরব রইলো সে। দ্বারকা শাস্ত্রীকে কথার মাঝখানে বাধা দিতে চায় না। তবে বুঝতে পারছে রহস্যময় গোপন কিছু প্রকাশ পেতে যাচ্ছে এখন।

'তুমি যে ভাস্কর্য দুটোর কথা বললে সেগুলো দুজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। মানবজাতির ভাগ্যের গতিপথ বদলে দিয়েছিলেন এরা, বিদ্যুৎ।'

নিজের আসন থেকে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে বিদ্যুতের। নিজের হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনতে পেল সে। বুজুর্গ মানুষটির প্রতিটা কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করছে সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দ্বারকা শাস্ত্রী। তারপর একটা নাম উচ্চারণ করলেন, যার কথা বিদ্যুৎ আগে কখনোই শুনেনি। তবে নামটা শুনে তার মেরুদণ্ড বরাবর একটা শীতল শিহরন বয়ে গেল। যেভাবেই হোক মনে হলো ঐ নামের পেছনের নারীটাকে চেনে সে–অন্য জগৎ কিংবা অন্য সময় থেকে।

'নয়নতারা।'

কক্ষের ভেতরে নিশ্ছিদ্র নীরবতা। শীতল ঘাম ছাড়ছে তার শরীর। এই সবকিছুই অবাস্তব লাগছে।

'নয়নতারা কে? এবং...এবং...' কথাটা না জিজ্ঞেস করে পারলো না বিদ্যুৎ, 'এবং কে এই শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরোহিত-রাজা, বাবা?'

বিহ্বল দৃষ্টিতে বিদ্যুতের দিকে তাকালেন দ্বারকা শাস্ত্রী। আরো কাছে গিয়ে বসার জন্য ইশারা করলেন তাকে। সাথে সাথে আদেশ পালন করলো বিদ্যুৎ এবং বাবার বিছানার কিনারে গিয়ে বসলো। প্রপিতামহ যখন তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন, সে কেঁদেই ফেললো প্রায়।

'আমাকে বলুন, বাবা...মুখে দাগওয়ালা এই শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরুষ কে?' সাথে সাথেই জানতে চাইলো বিদ্যুৎ।

এখনো অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন দ্বারকা শাস্ত্রী এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সত্যিই জানো না, বিদ্যুৎ?'

শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলো বিদ্যুৎ।

বাম হাতটা উঁচিয়ে প্রপৌত্রের কাঁধে রাখলেন মহামানব। এরপর তিনি যা বলতে যাচ্ছেন সেটা চিরদিনের জন্য জন্য পালটে দেবে বিদ্যুতের জীবন।

'তুমি, বিদ্যুৎ। ডান চোখের উপর ক্ষতচিহ্নসংবলিত, শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরোহিত-রাজা আর কেউ নন...তুমি।'

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ
খুন

সাজনার দিকে ফিরে বিভাষণ পূজারি দেখতে পেলেন, রাগে কাঁপছে তার স্নেহময়ী সুন্দরী স্ত্রী। নয়নতারার বাসগৃহে অপ্রীতিকর ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার পরপরই বিভাষণ পূজারি সিদ্ধান্ত নিলেন যে গভীর ধ্যানে বসে মনটা শান্ত করবেন তিনি। ধ্যানে মনোযোগের এই সময়ে তিনি শুনতে পেলেন হাজারো তামা-কাঁসার বর্মের ঝনঝনানি আর কয়েকশত ঘোড়ার তার বাড়ি প্রদক্ষিণ করার গর্জন। এ ধরনের পরিস্থিতি সহ্য করে অভ্যস্থ নন বিভাষণ। প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখের ঐ ভয়ার্ত দৃষ্টি তো নয়ই। তিনি বুঝতে পারছেন অশুভ কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে। তবে যাই হোক, যারা তার এই পবিত্র বসতবাড়ি আর প্রিয় পরিবারকে এমনভাবে বিরক্ত করছে, তাদের এ দুঃসাহস তিনি কখনোই ক্ষমা করবেন না।

বিস্মিত বিভাষণ পূজারি এমন অশ্রদ্ধায় রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে প্রার্থনা কক্ষ থেকে বেরিয়ে নিজের বিশাল তবে সাদাসিধা বাসগৃহের প্রবেশপথের দিকে এগোলেন। রাগ জিনিসটা মহান দেবতার চরিত্রের সাথে বেমানান। বৈদিক ব্রতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অতি পরিচিত ধ্বংসাত্মক আবেগকে জয় করতে পেরেছেন তিনি। তবে গত চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনাপ্রবাহ সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি তা মহা পরাক্রমশালী বিভাষণ পূজারিকেও নাড়িয়ে দিয়েছে।

তিনি যখন হতভাগা আক্রমণকারীদের দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন, ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীরা তীর-ধনুক নিয়ে দেবতার বাসভবনের জানালা, দরজার মুখে, আঙিনায় এবং ছাদে অবস্থান নিলো। তাদের নয়জন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত এবং

দেবতা তাদেরকে নিজের সন্তানের মতো লালনপালন করেছেন। ওদের মানুর সাথে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন বিভাষণ পূজারি নিজে। তলোয়ার, বর্ম, কীলকসহ তার প্রিয় সব সমরাস্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন তাদেরকে। কয়েকশো বছর আগে পরশুরাম নামে এক পূজনীয় বাহাদুর সন্ন্যাসী যেসব অস্ত্রকে মার্শাল আর্টের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। বিশাল সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে বাসভবন সুরক্ষিত রাখতে এই নয়জনই যথেষ্ট। অস্ত্র তাক করে প্রস্তুত রয়েছে তারা, শুধু প্রভুর একটা নির্দেশের অপেক্ষায়।

দরজার কয়েক পা দূরে তার সুদর্শন ও নির্ভীক ছেলে মার্জিতভাবে বিভাষণ পূজারিকে থামালো। হেসে মৃদু কুর্নিশ করে বাবাকে সম্ভাষণ জানালো মানু। তার পাশে বাড়ির দুজন ভয়ংকরতম যোদ্ধা।

ছেলেকে লক্ষ করলেন বিভাষণ। একজন সাধারণ ব্রাহ্মণের মতো সাদাসিধা জীবনযাপন করে সে। তার কোমরের পাশে ঝুলছে চকচকে, লম্বা একটা তলোয়ার। তার সঙ্গীরাও একই ধরনের ভয়ংকর অস্ত্র হাতে প্রস্তুত। তবে যে জিনিসটা দেবতাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে সেটা হলো নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে সেটার উপর তার দখল অর্জন। তিনি লক্ষ করলেন মানুর আঙুলগুলো ব্যাঘ্র-নখর আকৃতিতে বাঁকা হয়ে আছে। যার আবিষ্কারক মহেঞ্জোদারোর প্রধান অপরসায়নবিদ রাখিগারী। ব্যাঘ্র-নখর হলো দীর্ঘকাল আগে বিলুপ্ত বাঁকানো দাঁতের বাঘের সংরক্ষিত নখরের উপর গলিত তামার শক্তিশালী মিশ্রণ। মুখোমুখি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাঘ্র-নখর সবচেয়ে ভয়ংকর।

卐

'মা খুব ভেঙে পড়েছেন...নয়তো প্রার্থনার সময় তিনি কখনোই আপনাকে বিরক্ত করতেন না, বাবা,' বললো মানু। 'ব্যাপারটা আমার দেখা উচিত ছিলো।' এখন সৈন্যদলের কাছ থেকে মাত্র কয়েক কদম দূরে রয়েছেন তারা। অস্ত্রের ঝনঝনানি, তলোয়ার বর্শার সাথে সৈন্যদের ঘোড়ার ডাক মিলিত হয়ে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার মতো অবস্থা। বাবা-ছেলে এতক্ষণে বুঝতে পারলো যে সৈন্যরা তাদের বাসভবনের চারপাশ ঘিরে ফেলেছে।

মানুর উপস্থিতি বিভাষণ পূজারিকে একটা অদ্ভুত স্বর্গীয় আত্মবিশ্বাসের অনুভূতি দিচ্ছে। বাড়ন্ত সন্তানের উপস্থিতি সব বাবাকেই এমন অনুভূতি দেয় কি না সেটা জানা নেই বিভাষণের। যে বিষয়টা তিনি নিশ্চিত সেটা হলো, মানু একজন অসাধারণ ছেলে। মনের গভীর থেকে কিছু একটা যেন বলে দিচ্ছে তার প্রিয়তম অসাধারণ ছেলে একদিন বড় কিছু হবে।

'আমাকে এদের সাথে কথা বলতে দিন, বাবা,' প্রবেশপথে পৌঁছে মানু বললো।

বিভাষণ পূজারিকে দেখেই বিশাল বাসভবনের প্রবেশপথে জড়ো হওয়া সৈন্যদলের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। হরপ্পার সূর্যের চোখে চোখে সরাসরি তাকানোর সাহস হলো না কারো। আলোকিত সূর্যের ন্যায় বিভাষণ পূজারির দেহভঙ্গিমা যেন হরপ্পার যা কিছু ভালো তারই প্রতিনিধিত্ব করছে। যে সৈন্যদল তাকে দেবতার ন্যায় পূজা করে, তাদেরকে দেওয়া নির্দেশ পেয়ে পুরো বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। ঈশ্বরকে বন্দি করার সাহস আছে কার?

ধ্যান কক্ষ থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ির প্রবেশপথে বাইরের বারান্দায় গিয়ে অটল পাহাড়ের মতো দাঁড়ালেন বিভাষণ পূজারি। সুগঠিত, সুঠাম দেহের নগ্ন গা ব্রাহ্মণকে দেখে ভীতিজাগানিয়া মনে হচ্ছিলো। মাথা উঁচু করে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সৈন্য দলটাকে পরীক্ষা করছিলেন তিনি। দুপাশে মানু আর তার সহযোদ্ধা দুজন। সংখ্যায় শয়ে শয়ে হওয়া সত্ত্বেও সৈন্যদল বুঝতে পারলো যে এই ছোট্ট, অসম সাহসী যোদ্ধা দলের সাথে পেরে উঠবে না তারা। মানু ও তার ভ্রাতৃগণ তাদের বীরত্ব আর দক্ষতার জন্য সুপরিচিত। তবে আসল বিপদ হলো বিভাষণ নিজে। দুঃস্বপ্ন জাগানিয়া প্রতিকূলতার মাঝেও কখনো কোনো যুদ্ধে আজও পরাজিত হননি তিনি।

'এই নির্লজ্জ অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছে কে? সামনে এসো!' সৈন্যদলের নেতাকে নিজের পরিচয় দেওয়ার হুংকার ছুঁড়লো মানু।

কোনো সাড়া নেই। সৈন্যরা কেবল একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে। আবার জিজ্ঞেস করলো মানু। এবার গলাটা আরো চড়িয়ে, যাতে সবাই শুনতে পায়।

'এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছে কে? কার এত স্পর্ধা যে দেবতার বাসভবনে সৈন্য নিয়ে প্রবেশ করে?'

কিছুক্ষণ পর হরপ্পার সেনাবাহিনীর লাল টুপি পরা, প্রকাণ্ড এবং দৈত্যাকার দর্শন এক কমান্ডারকে সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে বিভাষণ পূজারি আর মানুর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। উদ্ধত চোখে সোজা তাদের দিকে তাকিয়ে আছে সে। হরপ্পার সবচেয়ে কুখ্যাত, দুর্নীতিপরায়ণ আর নৃশংস সৈনিক কমান্ডারকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বাবা-ছেলে একইসাথে শঙ্কিত এবং ক্রোধান্বিত বোধ করলো।

এই সেই নিকৃষ্ট কমান্ডার যাকে ধর্ষণ আর বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে কঠোর কারাবাসে দণ্ডিত করেছিলেন বিভাষণ পূজারি। তারপর পণ্ডিত চন্দ্রধরের স্ত্রী প্রিয়ংবদার সরাসরি অনুরোধে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। মহেঞ্জোদারের রাজকন্যার অনুরোধ অগ্রাহ্য করা কঠিন ছিলো। তারপর থেকে প্রিয়ংবদার ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী দলের সাথে যুক্ত করা হয়েছিলো তাকে।

বজ্জাতটা আর কেউ নয়, রাঙা।

এটা কীভাবে সম্ভব? পুরোহিত পরিষদ কীভাবে আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করতে পারলো? হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন বিভাষণ পূজারি। এদের প্রত্যেককে নিজের হাতে বাছাই করেছেন দেবতা। সর্বক্ষেত্রে তার প্রতি অনুগত থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলো তারা। তবে জগতের নিয়ম সম্পর্কে বিভাষণ পূজারির জ্ঞান আছে ভালোই। তিনি জানেন বন্ধুত্ব আর সৌভাগ্য একসাথে আসে এবং একসাথে ছেড়ে যায়।

বিভাষণ পূজারির হাতে একটা লিখিত আদেশনামা হস্তান্তর করলো রাঙা। আগামীকাল সকালে পুরোহিত পরিষদের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে তাকে। হরপ্পা পরিচালনার প্রশাসনিক ও বিচারিক ক্ষমতা উভয়টি পুরোহিত পরিষদের উপর ন্যস্ত। বিস্তৃত মহানগরী, এর আশেপাশের শহর ও গ্রামে যা তাদেরকে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। কেবল প্রধান পুরোহিতের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য তারা, যে পদবির জন্য বিভাষণ পূজারিকে ইতোমধ্যে নির্বাচিত করা হয়েছে। যে সকালে দেবতার প্রধান পুরোহিতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো, সেখানে তিনি একজন অপরাধীর মতো বিচারকদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন! মরুভূমির বালিয়াড়ির চেয়েও দ্রুত পরিবর্তিত হয় ভাগ্যের চাকা।

একদিকে বিভাষণ পূজারি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এমন কিছু একটা ঘটতে পারে এবং ভাবছিলেন কোথাও হয়তো একটা ভুল হয়ে গেছে। অন্যদিকে, তাকে, তার পরিবার ও বাড়ির বাসিন্দাদের পরিবেষ্টিত করে সৈন্যদল কর্তৃক তার বাড়ি ঘেরাও দেখে গভীরভাবে শঙ্কিত বোধ করছিলেন তিনি। একটা পরিষ্কার পরিকল্পনা অনুসরণ করছে এরা।

বাবার অপমান দেকে রাগে ফুঁসছিলো মানু। পরিষদের সমন ছিঁড়ে ফেলার উদ্দেশ্যে রাঙার দিকে তেড়ে গেল সে এবং সেই সাথে যদি প্রয়োজন হয় সৈন্যদলের দলনেতাকেও। আগে বাড়তেই বিভাষণ পূজারি হাত উঁচিয়ে তাকে থামিয়ে দিলেন। ছেলের দিকে ফিরলেন বিভাষণ, শান্ত থাকতে ইশারা করলেন তাকে।

'আমি তোমার সাথে যাবো, রাঙা। তার আগে জানাও আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী,' বললেন বিভাষণ পূজারি।

'খুন,' জবাবে জানালো রাঙা।

বানারস, ২০১৭
মানবজাতির চরম অসত্য: পর্ব ৩

'যেমনটা প্রত্যাশা করেছিলাম, হরপ্পার একটা গ্রহণযোগ্য, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সুগ্রন্থিত তথ্য দিয়েছ তুমি আমাকে,' অন্নদেবী অন্নপূর্ণার নিকট সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা শেষে বললেন তিনি। বলে চলেছেন বৃদ্ধ, 'তোমাকে এবং আরো লক্ষ লক্ষ মানুষকে যা বিশ্বাস করতে এবং গ্রহণ করতে শেখানো হয়েছে, সেটাই আমাকে বললে তুমি।'

কয়েক ঘণ্টা ধরে গভীর আলোচনার পর একসাথে খেতে বসলো তারা। মহাপ্রতাপশালী দ্বারকা শাস্ত্রীর পাশে বসে আহার করা যে-কারো জন্যই এক বিরল সম্মানের ব্যাপার। জীবনের অন্য সবকিছুর মতো খাবার গ্রহণটাকেও মঠাধ্যক্ষ একটা আধ্যাত্মিক উৎসব হিসেবে দেখেন। খাবার সময় প্রাচীন আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে লিখিত প্রতিটা সুপারিশ অনুসরণ করেন তিনি এবং খাবারটা হাতেই গ্রহণ করে থাকেন।

বিহ্বল বোধ করছে বিদ্যুৎ। একদিকে প্রপিতামহের সাথে দুপুরের খাবার গ্রহণ তার কাছে গুপ্তধন পাওয়ার মতো ব্যাপার, অন্যদিকে দ্বারকা শাস্ত্রীর এইমাত্র বলা অদ্ভুত কাহিনিটা এখনো হজম করার চেষ্টা করছে সে। কে ছিলো এই নয়নতারা? কীভাবে এক পৌরাণিক কিংবদন্তি হাজার বছর টিকে থাকতে পারে? হরপ্পার মূর্তিতে পুরোহিত-রাজা আর কেউ নয়, সে নিজে–এ দ্বারা কী বুঝিয়েছেন মহামানব? তার সমস্ত মহানুভবতা, মর্যাদা আর অর্জন দেখে বুড়ো কি শেষ পর্যন্ত গুলিয়ে ফেললেন?

'আমি পাগল হয়ে যাইনি, বিদ্যুৎ,' বললেন দ্বারকা শাস্ত্রী। যেন বিদ্যুতের মনের কথা পড়তে পারছেন তিনি। কে জানে, হয়তো তাই পারছেন।

'আমি জানি তুমি নিশ্চয় ভাবছো আমি একটা আস্ত গর্দভ, বানিয়ে বানিয়ে গল্প শোনাচ্ছি। কিন্তু তুমি জানো, তোমার মতো বয়সে প্রথমবার প্রাচীন অভিশাপটার কথা শুনে আমিও একইরকম ভেবেছিলাম।'

এটা অপ্রত্যাশিত। এর চেয়ে রহস্যময় যেন কিছু হতে পারে না। অভিশাপ শব্দটা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল বিদ্যুৎ। হচ্ছেটা কী? শৈশব থেকে জানে সে একজন দেবতা। সর্বক্ষেত্রে ছেলের অতিমানবীয় সাফল্যের গর্বে উজ্জ্বল স্নেহময়ী মা এমনটাই বলেছিলেন তাকে। তার বাবা মহান কার্তিকেয় শাস্ত্রী তাকে উচ্চতর ধ্যান, বৈদিক বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা আর প্রগাঢ় সিদ্ধি শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে নিজেও অবগত ছিলো একটা গোপন, কালো রহস্য কাশিতে ওঁৎ পেতে আছে। তাই বলে অভিশাপ?

ওস্তাদজির এমন ত্বরিত সেরে ওঠা দেখে পুরোহিতজিসহ মঠের সকলেই অবাক হয়ে গেল। তিন দিন আগেও প্রায় কোমায় চলে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিলো তার। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিলো এবং বিছানা থেকে প্রায় উঠতেই পারতেন না। আর আজ কিনা তিনি বসে বসে খাবার খেতে খেতে প্রপৌত্রের সাথে খোশগল্পে মেতে উঠেছেন? প্রিয় কারো উপস্থিতির কারণে যে কেউ এভাবে সেরে উঠে সতেজ হয়ে উঠতে পারে এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। এমনকি মহান দ্বারকা শাস্ত্রীর মতো আধ্যাত্মিক ব্যক্তিও তার ব্যতিক্রম নন। ভালোবাসার শক্তির কোনো তুলনা হয় না।

বিদ্যুতের প্লেটের সব খাবারই সদ্য রান্না করা। সুগন্ধি বাসমতি চালের ভাত যেন নরম পেঁজা তুলোর মতো। টমেটো দিয়ে রান্না করা সবজির তরকারি জিভে জল এনে দেয়। আরো ছিলো পালং শাক এবং ঘরে বানানো পনির, তার সাথে উত্তর ভারতের বিশ্বখ্যাত মশুরের ডাল। প্লেটের এক কোণে রাখা আছে সুস্বাদু দই, এর সাথে পেঁয়াজ দিয়ে ধনেপাতা ভর্তা। শুকনো পাতা দিয়ে তৈরি এক পাত্রে রাখা আছে সুস্বাদু মরিচের সস। দেবতাদের জন্য মানানসই নিরামিষ আহার।

মহান আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিলো ভাত। প্রথম ধাপে এলো গরম গরম পুরি, ময়দা দিয়ে বানানো গোলাকার, ছোট্ট, ভাজা রুটি। এর স্বাদ যেন স্বর্গীয়। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আর সংযম সাধনের কারণে ব্রাহ্মণ পুরোহিত আর সন্ন্যাসীদের এই তুলতুলে খাবারটার প্রতি একধরনের দুর্বলতা রয়েছে। দ্বারকা শাস্ত্রী আর বিদ্যুৎ তার ব্যতিক্রম নয়।

এক টুকরো পুরি ছিঁড়ে পনিরের বাটিতে ডুবিয়ে নিজ হাতে বিদ্যুতের মুখে তুলে দিলেন মঠাধ্যক্ষ। বাবুর্চিগণ, পুরোহিতজি, গোবর্ধন, ন্যায়না এবং উপস্থিত সকলেই ভয়ংকর গোত্র প্রধানের স্নেহের বহিঃপ্রকাশ দেখে হতবাক হয়ে গেল। অন্যদিকে, প্রতিটা মুহূর্তে স্নেহে সিক্ত হচ্ছিলো বিদ্যুৎ। বোঝার বয়স হওয়ার পর থেকে দাদার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত ছিলো সে।

দেব-রাক্ষস মঠে বিদ্যুৎ আসার আগে কেউ জানতোই না যে দ্বারকা শাস্ত্রীরও আবেগ-অনুভূতি রয়েছে। সেটা যে আছে এখন দেখতে পাচ্ছে সবাই। সবচেয়ে ভীতিকর তান্ত্রিক, সবচেয়ে নির্মম গোত্র প্রধান, সৌরজগতের সবচেয়ে শক্তিশালী জীবাত্মা তার প্রপৌত্রকে খাইয়ে দেওয়ার সময় আবেগে ভেসে যাচ্ছিলেন।

পরিষ্কারভাবে তিনি এই মুহূর্তে একজন অর্ধ-মানব।

॥ ॥

আবার দ্বারকা শাস্ত্রীর খাসকামরায় ফিরে গেল তারা। লাঞ্চ বিরতিটা সবদিক দিয়েই একটা আশীর্বাদের মতো ছিলো। দীর্ঘদিন দূরে থাকা এবং ভবিষ্যদ্বাণীকৃত প্রপৌত্রের তারুণ্যময় সঙ্গ পেয়ে গুরুজি দৃশ্যমান মানসিক মুক্তি লাভ করেছেন। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে শোনা অবিশ্বাস্য কিংবদন্তি আর উপাখ্যানগুলো বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ বোঝার চেষ্টা করে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। সত্যিই সে জানে না কোনটা বিশ্বাস করবে আর কোনটা বাদ দেবে। সবকিছু যেন মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। খুব বেশি অবৈজ্ঞানিক, খুব বেশি ভূতুড়ে।

বিদ্যুতের মনের দ্বিধা আর অবিশ্বাস আঁচ করতে পারলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। সুদর্শন তরুণ উত্তরসূরিকে কিছুটা সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। আঙুলে জপমালা গুনতে গুনতে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলেন তিনি।

'আমাকে বলো তো, বিদ্যুৎ, তুমি কি সত্যি সত্যি মনে করো যে হরপ্পায় কোনো ঘোড়া ছিলো না?' শুরু করলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। 'অথবা ইউরোপ থেকে হাজার হাজার মাইল পুবে ভ্রমণ করে কোনো উন্নত গোষ্ঠী এই অঞ্চলে প্রাণীগুলো নিয়ে এসেছিলো?'

বসে বসে শুনছে বিদ্যুৎ। মহান প্রপিতামহের প্রতিটা বক্তব্য তার সামনে রহস্যের এক-একটা নতুন দুয়ার খুলে দিচ্ছে।

'আর প্রতিটা হরপ্পানই কালো চামড়ার কুৎসিত, অসভ্য আদিবাসী ছিলো, যারা কিনা সাদা-চামড়ার পশ্চিমা প্রভুদের দ্বারা পাপমোচনের জন্য অপেক্ষা করছিলো?'

নীরবতা আর নিস্তব্ধতা পুরো কক্ষ জুড়ে। বুড়ো যে প্রশ্নগুলো করেছেন তার প্রতিটার উত্তরে হ্যাঁ বলতে ইচ্ছে করছিলো বিদ্যুতের। সে এটাও জানে যে কেবল

রাগান্বিত হয়ে এই প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করেননি তার পরদাদা। এর গভীরে আরো কিছু রয়েছে।

'বাবা, তারা যা বলে সেটা হলো: পশ্চিম থেকে সাদা চামড়া, নীল চোখের সম্মিলিত অশ্বারোহী আক্রমণকারীরা এই অঞ্চল দখল করার আগে হরপ্পার অধিবাসীগণ সিন্ধু উপত্যকায় বসবাস করতো। মনে করা হয়, এই উচ্চশ্রেণির জাতির খাড়া নাক ছিলো এবং আধুনিক ইউরোপিয়ানদের সাথে তাদের মিল ছিলো।'

গভীর মনোযোগের সাথে শুনছেন দ্বারকা শাস্ত্রী। যদিও মনে হচ্ছিলো তার চোখদুটো ধীরে ধীরে ক্রোধে জ্বলে উঠছে।

'বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে এটাই ছিলো ইউরোপ থেকে আর্যদের আক্রমণ এবং তাদের সাথে কৃষিজমি আর পানির প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে দ্রাবিড়দের আরো দক্ষিণে বিন্ধ্যাচলের দিকে সরে যাওয়ার কারণ।'

'তাহলে সেখানে নিশ্চয় একটা বড় যুদ্ধ হয়েছিলো?' জানতে চাইলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। 'তোমার তথাকথিত সিন্ধু সভ্যতায় জনসংখ্যা ছিলো পাঁচ লক্ষেরও অধিক। এমন একটা বিশাল শহরকে অবশ্যই দীর্ঘকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়া পরাজিত করা সম্ভব নয়, ঠিক?'

'আমিও তেমন অনুমান করি, বাবা...' অনিশ্চিত সুরে জবাব দিলো বিদ্যুৎ।

'ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছিলো হরপ্পাবাসী। ওজন ও পরিমাপে তারা ছিলো নির্ভুল। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় তারা অবিষ্কার করেছিলো আধুনিক হাইড্রলিক প্রযুক্তি। বিজ্ঞানসম্মত প্রকৌশলবিদ্যা অনুসরণ করে আধুনিক নকশা ও কাঠামো অনুযায়ী আধুনিক শহর নির্মাণ করেছিলো তারা। সেই সময়েই তারা ধাতু পরিশোধন কারখান স্থাপন এবং বিশাল বিশাল গণস্থাপনা নির্মাণ করেছিলো। সুতরাং আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায়ও নিশ্চয়ই পারদর্শী ছিলো তারা। তাদের উৎখাত করাটা এত সহজ হওয়ার কথা নয়, এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবে তুমি।'

সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লো বিদ্যুৎ।

'তুমি কি জানো যে খনন করে দেখা গিয়েছিলো বিশাল বিশাল দেয়াল দিয়ে ঘিরে সুরক্ষিত ছিলো হরপ্পা সভ্যতা, যা কোনো আক্রমণকারী সৈন্যদলের জন্য প্রায় দুর্ভেদ্য? তুমি কি মনে করো এত আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন পাঁচ লক্ষাধিক অধিবাসীর বিশাল এক সভ্যতা একটা আক্রমণকারী শত্রু সৈন্যদল দেখে পালিয়ে গিয়েছিলো? অবশ্যই না। তাহলে এই অধিবাসীরা যদি আসলেই একটা লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে ব্যাপক পরিমাণে দীর্ঘ সময় ধরে সহিংস সংঘর্ষ হয়েছিলো এবং শহরগুলো অবরুদ্ধ হয়েছিলো।'

'আপনি ঠিক বলেছেন, বাবা।'

'এমনকি প্রাগৈতিহাসিক সৈন্যদলের জন্য এ ধরনের অবরোধ করাটাও অসম্ভব ছিলো। হরপ্পার প্রধান প্রধান নগরীগুলো কেবল প্রকাণ্ড দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত ছিলো না, সূক্ষ্ম পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা আর খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাও ছিলো তাদের। শহরে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করতে হলে যেকোনো সৈন্যদলকে মাসের পর মাস অবরোধ করে রাখতে হতো। আমরা অনুমান করে নিলাম আক্রমণকারীরা ঝড়ের বেগে শহরে প্রবেশ করে সৈন্যদলকে পরাস্ত করে ফেলেছিলো। সেক্ষেত্রে শিরশ্ছেদকৃত শবদেহের কঙ্কাল আর যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র খুঁজে পাওয়ার কথা ছিলো খননকারীদের। পোড়া মাটির ইট যদি হাজার হাজার বছর টিকে থাকতে পারে, তাহলে ধাতব অস্ত্র আর মনুষ্য কঙ্কাল কেন থাকবে না?'

সতর্কতার সাথে শুনছে বিদ্যুৎ।

'কিন্তু এসবের কিছুই পাওয়া যায়নি, বিদ্যুৎ। শত শত খনন ক্ষেত্রগুলোতে ব্রোঞ্জের তৈরি কিছু ভাঙা তীর-ধনুক ছাড়া যুদ্ধের নিদর্শন বা সহিংস লড়াইয়ের কোনো চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারেনি খনন দল,' বলে চলেছেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

বিদ্যুতের জন্য এটা একটা বিশাল বড় শিক্ষা। আর্যরা কীভাবে হরপ্পাবাসীদের উৎখাত করেছিলো, এ ব্যাপারে কখনোই এত গভীরভাবে চিন্তা করেনি সে আগে। বইয়ে যেভাবে পড়েছে ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করেছে সে।

'তাহলে এটা পরিষ্কার যে সেখানে যদি কোনো অস্ত্র বা সংঘাতের চিহ্ন খুঁজে না পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে সেখানে কোনো যুদ্ধ সংগঠিত হয়নি কখনো। যদি যুদ্ধ না হয়ে থাকে, তাহলে কোনো আক্রমণও হয়নি।' গণিতের অধ্যাপকরা কোনো জটিল তত্ত্বের জট খোলার সময় যেমন উচ্ছ্বাস নিয়ে বলেন, তেমনি উচ্ছ্বাসের সাথে বললেন মহান বৃদ্ধ মানুষটি।

তারপর বিদ্যুৎ সেই প্রশ্নটি করলো যা মঠাধ্যক্ষ তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করছিলেন। ও সেই প্রশ্নটি করলো, যার সঠিক উত্তর শত শত বছরের মিথ্যে প্রচারণায় হারিয়ে গিয়েছিলো। যে উত্তর পৃথিবীকে বদলে দেবে চিরতরে।

দ্বারকা শাস্ত্রী জানতেন যে কাগজের পৃষ্ঠার আড়ালে চরম অসত্য দিয়ে চাপা দেওয়া আছে হরপ্পার ইতিহাস।

'কিন্তু বাবা, যদি কোনো আগ্রাসন না-ই হয়ে থাকে, তাহলে আর্যরা কারা ছিলো?'

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ
বিকারগ্রস্ত মানুষ ও জন্তু

'সম্পূর্ণ হাস্যকর!' বিস্মিত হয়ে বললেন বিভাষণ পূজারি। পুরোহিত পরিষদের সামনে দণ্ডায়মান আছেন তিনি। বিচারসভায় পাহারা দিচ্ছে একশোরও বেশি অভিজাত সৈন্যদল।

গতকাল সৈন্যদলের বাড়ি ঘেরাও সত্ত্বেও বিভাষণ পূজারি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে নয়নতারার সাথে তার সাক্ষাতের ব্যাপারটা খুলে বললেই তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মুহূতেই খারিজ হয়ে যাবে। তাই পরদিন সকাল সকাল আদালতের সামনে উপস্থিত হন তিনি। তা সত্ত্বেও চরম সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে এমন ঘটনায় গভীর দুঃখ অনুভব করছিলেন তিনি। হরপ্পার প্রধান পুরোহিতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার বদলে এই মুহূর্তে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন অপরাধীর কাঠগড়ায়।

'পরিষদগণ, আমার সাথে তোমরা এমন সুরে কথা বলবে না,' সতর্ক করে দিলেন বিভাষণ পূজারি। পরিষদ বা অন্য কারো কর্তৃত নিজের সম্মান ভুলুণ্ঠিত হতে দিতে পারেন না তিনি। 'হ্যাঁ, আমি নয়নতারার কাছে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম কারণ সে আমার ছেলে মানুর বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলো। আমি জানতাম এটা একটা মস্ত ভুল। আর সেটা সমাধান করতে আমি তার বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'আর সেই সমাধান হলো বিখ্যাত নর্তকীকে নির্মমভাবে হত্যা করা, তাই না, দেবতা?' পরিহাসের সুরে বলে উঠলো একজন পরিষদ সদস্য।

সোজা ঐ পরিষদ সদস্যের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বিভাষণ। গতকালও তার উপস্থিতিতে জোরে হাঁচি দেওয়ার সাহস ছিলো না তার। আজ সে-ই কিনা বিভাষণ পূজারির মুখে মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে! আসলে সবাই কেমন যেন অদ্ভুত আচরণ করছে। আজ সকাল সকাল আহার সেরে নিয়েছিলেন বিভাষণ। ফলে একটু অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। সেই সাথে যোগ হয়েছে বিচারের উদ্বেগ। আসার পথে পরিচিত অনেককেই দেখেছেন এমন ভাব করছে যেন তাকে চেনে না! বিচারালয়ে আসার পথে তিনি লক্ষ করেছেন রাস্তায় রাস্তায়, অলিতে গলিতে এবং বাড়িতে বাড়িতে গালাগালি, ঝগড়া আর মারামারি করছে জনগণ! এর কোনো কিছুই সভ্য বৈদিক শহর হরপ্পার মানুষের সাথে মানানসই নয়। কিন্তু আজ যেন সবাইকে কেমন অস্থির আর আক্রমণাত্মক মনে হচ্ছে। *প্রিয় শহরে হচ্ছেটা কী এসব?*

পরিষদে সদস্যরাও আজ সকালে দেখে আসা জনগণের ব্যতিক্রম নয়। তারা আজ আক্রমণাত্মক, অধৈর্য এবং অতিরিক্ত অশ্রদ্ধাপরায়ণ। তাদের দাম্ভিকতাপূর্ণ চলাফেরা, অর্মাজিত হাসি আর বিচারসভায় কথায় কথায় পরিহাসের সুর সচরাচর উদার এবং বুদ্ধিমান পরিষদ সদস্যদের সাথে এমনকি হরপ্পার জনগণের সাথে বেমানান। বেদ ও সনাতন ধর্মের মহানুভব এবং পুণ্য তত্ত্বের শিক্ষায় বিকশিত হয়েছে এই শহর, এর সংস্কৃতি আর তার জনগণ। তবে হরপ্পার শান্তিপ্রিয় স্নেহপরায়ণ মানুষগুলোকে অচেনা মনে হচ্ছে। আজ যেন সকলের কিঞ্চিৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে গেছে। সময় যত গড়াচ্ছে তাদের সে পাগলামি যেন আরো বেড়েই চলেছে।

'শোনো, পরিষদ সদস্যগণ, গতকাল আমার বাড়ি গিয়ে রাঙা জানানোর আগ পর্যন্ত আমি জানতাম না যে নয়নতারা খুন হয়েছে,' জানালেন দেবতা। 'ঈশ্বর তার আত্মার ভালো করুক এবং পরমার্থিক পরিভ্রমণ শেষে তাকে একটি মহৎ পুনর্জনম প্রদান করুক।'

সুন্দরী নতর্কীর বিদেহী আত্মার উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা সেরে নেওয়ার সময় দেবতা অনুভব করলেন তার রাগ বাড়ছে। তার ইচ্ছে করছে বিচারিক টোলে বসে থাকা সবাইকে খুন করতে। তিনি জানেন এটা সহজেই করতে পারেন। কীভাবে করবেন তারও একটা ছক এঁকে ফেলেছেন মনে মনে। কিন্তু তিনি একজন দেবতা। বুঝতে পারলেন এটা একটা পাগলামি চিন্তা বই আর কিছু নয়, আর তাই মুহূর্তের মাঝে তিনি চিন্তা ঝেড়ে ফেললেন মন থেকে। বিভাষণ পূজারি অনুভব করলেন এটা তার সাথে যায় না। *কী হচ্ছে এসব আমার সাথে?*

বিভাষণ আঁচ করতে পারছেন কিছু একটা সম্পূর্ণ গোলমাল হয়ে গেছে আজ। অস্বাভাবিকভাবে তাকে যা ক্রোধান্বিত করে তুলেছে, অবচেতনভাবে যার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন তিনি। তিনি একজন দেবতা, নিজের শরীর, মন,

স্নায়ু এবং আত্মার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তার। কিন্তু বাকি সবাই সাধারণ মানুষ। গভীর নলকূপ আর জলাশয়ের সংক্রমিত পানি তাদেরকে পাগল করে ফেলেছে। গান, এপ এবং শার অশুভ মেসোপটেমিয়ান অপরসায়নের কাছে হার মানছে সবাই।

ধীরে ধীরে উন্মত্ত জন্তুদের শহরে পরিণত হচ্ছে তারা।

দুই ঘণ্টা হয়ে গেছে বিচার চলছে। এতক্ষণে বিভাষণ পূজারি জানতে পেরেছেন তিনি চলে আসার পরপরই তার পরিচারকরা সুন্দরী নয়নতারাকে কী অবস্থায় তার খাসকামরায় খুঁজে পায়। বিশাল বিছানায় বুকে তামার বর্শা বিদ্ধ অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায় তাকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার চারপাশ। কাঠের ব্যাকরেস্টে হেলান দিয়ে ছিলো সে। অমানুষিক শক্তি আর সীমাহীন নৃশংস একজন মানুষই কেবল এমন শক্তিশালী আঘাত হানতে পারে। তার অনন্য সুন্দর মুখটা ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে এবং চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। নয়নতারার দেহ ছেড়ে চলে গেছে ডাকিনী। আর প্রয়োজন নেই তার।

'আপনি নিজেও কি জানেন না যে ঝড়ের বেগে তার খাসকামরা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আপনার সাদা আলখাল্লায় তার রক্ত লেগে ছিলো, হে দেবতা?' আরেকজন পরিষদ সদস্য চিৎকার করে উঠলো।

নিজের দাঁতে দাঁত চাপলেন বিভাষণ পূজারি। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে রাগ। নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠে জবাব দিলেন তিনি।

'আমি তাকে কেবল একটা থাপ্পড় মেরেছিলাম। আমি স্বীকার করছি তার মতো একজন কোমল নারীর পক্ষে ওটা বেশ কঠিন আঘাত ছিলো। মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলো সে, তার নিচের ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছিলো। একজন মহিলার গায়ে হাত তোলার কারণে সাথে সাথেই অনুশোচনা হয়েছিলো আমার। রক্ত মোছার জন্য আমার আলখাল্লাটা তাকে দিয়েছিলাম। তার ফলেই এ দাগ।'

'আমি কি জানতে চাইতে পারি, মহান দেবতা অসহায় একজন নারীকে কেন শারীরিক নির্যাতন করতে গিয়েছিলেন? ' জানতে চাইলো অর্ধ-মাতাল এক পুরোহিত। তার কণ্ঠের পরিহাসের সুরটা ভালো লাগলো না বিভাষণ পূজারির।

'আমার সামনে উলঙ্গ হওয়ার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছিলো সে,' জবাবে জানালেন বিভাষণ পূজারি।

'আর...?' উদ্ধতভাবে নিজের আসন থেকে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলো একজন। আশেপাশের সঙ্গীদের উদ্দেশে চোখ টিপছে সে। বিচারক দলকে এখন একদল

কামপাগল, বিকৃতমস্তিষ্ক ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না বিভাষণ পূজারির। উদ্বিগ্ন বোধ করতে শুরু করেছেন তিনি।

'এবং সে আমার সাথে অন্তরঙ্গ শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলো,' জবাব দিলেন বিভাষণ।

'তবে থাপ্পড় নয়, একটু ভালোবেসে তার প্রতিদান দেওয়া যেত, ঈশ্বর মহোদয়। হরপ্পার সেরা মাল ছিলো নয়নতারা!' চিৎকার করে উঠলো একজন পুরোহিত সদস্য। তার কথায় উচ্ছৃঙ্খল, কুৎসিত হাসিতে ভরে উঠলো বিচার কক্ষ। নিজের চোখ আর কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বিভাষণ পূজারি। কোনো বিদেহ আত্মার উদ্দেশে এর আগে কখনো এত অশ্রদ্ধাভরে কথা বলেনি হরপ্পার কেউ। আর এই পুরোহিতগণ সবাই সৌরজগতের সবচেয়ে পবিত্র আত্মাদের ভেতর পড়ে। *কেন এরা সবাই নৃশংস, যুদ্ধবাজ, মাতাল গুন্ডা অনুসারীদের মতো আচরণ করছে?*

বিভাষণ পূজারি সিদ্ধান্তে এলেন, যত দ্রুত সম্ভব এই বিচার কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে তাকে। তাকে বাইরে গিয়ে তদন্ত করে জানতে হবে কী হয়েছে সকলের। তিনি নিশ্চিত পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে কোনো অন্ধকার, অশুভ শত্রু। প্রিয় এই নগর আর তার জনগণের খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই সমস্যার মূলে গিয়ে সমূলে উৎপাটন করতে হবে তাকে। দ্রুত বিচারসভার শুনানি শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

বানারস, ২০১৭
‘তুমি আর আমি। এখানে এবং এক্ষুনি।’

‘রুমি পেরেরাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের,’ বলে উঠলো সনু। ‘কিন্তু করবো কীভাবে? বানারস এক বিশাল শহর এবং কোথা থেকে খোঁজা শুরু করতে হবে সে ব্যাপারে কোনো সূত্র নেই আমাদের হাতে।’

নিজেকে রুমি নামে পরিচয় দেওয়া লোকটার পাশার দান উলটে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদ্যুৎ। সাথে আছে বলভান্ত, বালা আর সনু। মহামতি দ্বারকা শাস্ত্রীর আশীর্বাদ আর অনুমতি নিয়ে প্রাচীন এই বিশাল নগরীতে সবচেয়ে বড় মানব শিকারের পরিকল্পনা আঁটছে তারা। পরিকল্পনাটা সোজা। মঠের গুপ্তচরদের দ্রুত সক্রিয় করা হবে। শত বছরেরও অধিক সময়ের শ্রমসাধ্য পরিকল্পনা দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠানের এই বাহিনী মঠের একশোরও বেশি গুপ্তচর নিয়ে তৈরি। এই গোয়েন্দা বাহিনীর মাঠ কর্মীদের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র মুদি দোকানদার থেকে শুরু করে, রিকশাওয়ালা, রেস্টুরেন্টের ওয়েটার এমনকি পথশিশুও। বিচিত্র, অসংগঠিত তবে ভীষণ কার্যকর এই নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে আছে প্রতিটা গলি, প্রতিটা ঘাটে, প্রতিটা মোটেলে এবং কাশীর প্রতিটা গোপন শ্মশানে। ১,৬০০ বছর ধরে এই মঠের টিকে থাকার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এই সেনারা। অসংখ্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পবিত্র এই প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করেছে এখানকার বাসিন্দারা। এখন গোল চশমা পরা বালকসুলভ চেহারার সুদর্শন এক

তরুণকে খুঁজে বের করবে এই গুপ্তচর সৈন্যদল। প্রয়োজনে শহরের প্রতিটা অলিগলিতে চিরুনি অভিযান চালাবে তারা।

অন্যদিকে, বিদ্যুৎ ও তার নবগঠিত দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অরক্ষিত এবং নিরস্ত্র অবস্থায় কিছুক্ষণ ঘাটসমূহে ঘুরে বেড়াবে তারা। রুমি যদি এখানে বিদ্যুৎকে খুন করতে এসে থাকে, তাহলে লোভ সামলাতে পারবে না সে।

আর না হয় রুমি যে গর্তে লুকিয়ে আছে সেখান থেকে তাকে খুঁজে বের করবে তারা, খোলা যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে বের করে আনবে তাকে।

‘অবশ্যই না, ন্যায়না,’ দৃঢ় কণ্ঠে বললো বিদ্যুৎ। ‘এই শিকারে তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছো না। এই লোক পরিষ্কার পেশাদার। আর সে হয়তো একা নয়।’

‘তোমার অনুমতির ধার ধারে কে, হ্যাঁ?’ উচ্ছল ভঙ্গিতে জবাব দিলো ন্যায়না। ‘তুমি আর সব মানুষের জন্য প্রতীক্ষিত ত্রাতা এবং দেবতা হতে পারো, কিন্তু আমার কাছে তুমি কেবলই বিদ্যুৎ, বুঝেছ?’

বারান্দার ঐ চুমুটা বিদ্যুতের চাওয়ার চেয়ে কয়েক সেকেন্ড বেশি স্থায়ী হয়েছিলো। নিজের অজান্তে ন্যায়নার আবেশ জড়ানো ঠোঁটের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলো সে, তারপর কী ঘটছে সে হুঁশ ফিরতেই তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো। দামিনীকে অসম্মান করছে সে এবং এটা সে কখনোই হতে দিতে পারে না। গালে হালকা একটা চুমু দিয়ে ন্যায়নার দিকে তাকিয়ে কেবল মৃদু হেসেছিলো সে। তারপর ঐ ব্যাপার নিয়ে কেউ কথা বলেনি আর। তবে উভয়েই জানে, একসময় না একসময় মুখোমুখি হতে হবে তাদের। শীঘ্রই।

‘দেখো ন্যায়না, পাগলামি করবে না। মেয়েদের জায়গা বাইরে না।’

‘কী? কী বললে তুমি এইমাত্র?’ গভীর অসন্তোষে চেয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলো ন্যায়না। ‘তুমি এমন নারী-বৈষম্যবাদী, এ কথা আমি কোনোদিন চিন্তাও করিনি, বিদ্যুৎ!’

না, বিদ্যুৎ তেমন নয়। মেয়েদের গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মান করে সে। এমন একটা হাস্যকর মন্তব্য করে নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে তার।

‘আমি দুঃখিত, ন্যায়না। আমি আসলে এভাবে বলতে চাইনি। আমি শুধু চাইছিলাম তুমি যেন আঘাত না পাও।’

‘চেষ্টা করে দেখো, বিদ্যুৎ। চলো দুজনে লড়ি আমরা। কোনো বাধা নেই,’ শান্ত ভঙ্গিতে বললো ন্যায়না। ‘আমার মনে হয় তুমি ভুলে গেছ যে দেব-রাক্ষস মঠের মেয়েদেরও ছেলেদের মতোই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং শত শত বছর ধরে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে আসছে তারা।’

নিজের কাজের জন্য অনুশোচনা হচ্ছে বিদ্যুতের। মঠের নারীদের বীরত্ব আর ত্যাগের গল্পগুলো মনে পড়ে গেল তার। হোক পারজাগতিক সত্তা বা বায়বীয় শক্তির সাথে লড়াই অথবা কোনো বহিঃআক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়া; মঠের নারীরা কারো চেয়ে কম নয়। হিন্দু জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ এটি। এ এক মহান ধর্ম যেখানে দেবীদেরকে একইসাথে ভীষণ দয়ালু আর চরম ভয়ংকর রূপে পূজা করা হয়।

'বাদ দাও না, ন্যায়না,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কেবল এটুকুই বলতে পারলো বিদ্যুৎ। এতক্ষণে অন্যরা এসে জড়ো হয়েছে। সনু, বালা, পুরোহিতজি, বলভান্ত এবং সেই সাথে মঠের আরো কিছু নারী।

'তা তো হবে না, মি. শাস্ত্রী। আমি আপনাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করছি। এখানে এবং এক্ষুনি। আপনি এবং আমি।'

এখন বেশ আমোদ পাচ্ছে বিদ্যুৎ। এটা পরিষ্কার যে তার সম্পর্কে ন্যায়নার কোনো ধারণাই নেই। সেই সাথে সে লক্ষ করলো ভারতীয় নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে নেই ন্যায়না। গোল, নিচু গলাওয়ালা আঁটোসাঁটো কালো স্পোর্টস টি-শার্ট, আর্মি ক্যামোফ্লজ প্যান্ট আর ট্র্যাকিং বুট পরে আছে সে। চুলগুলো শক্ত করে খোঁপায় বাঁধা। কোমরে একটা মোটা বেল্ট। এই বেশে তাকে ভীষণ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। বিদ্যুতের মনে হলো জেমস বন্ড সিনেমার কোনো অসাধারণ নারীকে দেখছে সে।

'ন্যায়না, অন্য কারো চেয়ে কালারিপায়াত্তু ভালো পারি আমি। জুজুৎসু এবং ক্রভ মাগার একজন অ্যাডভান্সড প্র্যাকটিশনার আমি। তোমার অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি কুং ফু-র উচ্চতর ডিগ্রি ব্ল্যাক বেল্টও রয়েছে আমার। বালা, ওকে বল না, ভাই...' দুজনের ঝগড়া উপভোগরত বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বললো বিদ্যুৎ।

অবিচল ভঙ্গিতে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ন্যায়না। সে স্বাভাবিকভাবে একবার বিদ্যুৎ এবং তারপর মাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো। 'তুমি আর আমি। এখানে এবং এক্ষুনি,' আবারও বললো সে।

বলভান্ত, সনু, পুরোহিতজি এবং গোবর্ধন এখন মজা পাচ্ছে। ন্যায়না একজন দক্ষ যোদ্ধা, তবে সেই সাথে তারা এও জানে যে বিদ্যুতের সামনে সে কিছুই না। এমন না যে তারা বিদ্যুৎকে লড়তে দেখেছে। এমনকি প্রশিক্ষণ নিতেও দেখেনি তাকে। যেভাবেই হোক বিদ্যুতের দক্ষতার উপর তাদের অবিচল আস্থা রয়েছে। ওরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। শাস্ত্রী বংশ লতিকা বহন করছে স্বর্গীয় সব গুণ, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বিভাষণ পূজারি এবং ২০১৭ সালে বিদ্যুৎ। উভয়েই সত্যিকারের দেবতা। তাদের মধ্যে বাস করেন প্রকৃত ঈশ্বর।

'ঠিক আছে, চলো এক কাজ করা যাক। তুমি বালার সাথে লড়ো। যদি ওকে হারাতে পারো, তখন আমার সাথে লড়বে। যদি না পারো, তাহলে আমার সাথে

লড়ার কোনো সুযোগ নেই তোমার,' প্রস্তাব দিলো বিদ্যুৎ। হাসিতে ফেটে পড়ার অবস্থা হয়েছে এখন তার।

বিদ্যুতের এমন ব্যবহার ন্যায়নাকে আরো রাগিয়ে দিলো।

'কী বাজে বকছিস, বিদ্যুৎ!' প্রতিবাদ করলো বালা। 'বাচ্চাদের মতো দুষ্টুমি বাদ দিয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবা উচিত আমাদের।'

ন্যায়না এবং বিদ্যুৎ এখনো একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে। বিদ্যুতের চোখে প্রশংসা, ন্যায়নার চোখে রাগ।

'এসো, বালা,' বিদ্যুতের দিকে তাকিয়েই বললো ন্যায়না।

'এসব একদম ভালো লাগছে না আমার,' বিরক্তিতে দুহাত উপরে ছুঁড়ে বিস্মিত হয়ে বললো প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা। 'আমি গেলাম এখান থেকে।'

চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলো সে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলো, শতাব্দী এক্সপ্রেস যেন তার পেছন দিকে আঘাত করলো। লাথি বসিয়েছে ন্যায়না। লড়াই করতে প্রস্তুত সে। ঘুরে বালা তাকে যুদ্ধংদেহী অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। এক পা বাতাসে ভাসিয়ে মুহূর্তে আরেকটা লাঠি ছুঁড়ে দিতে প্রস্তুত সে। হাতদুটো মুষ্ঠিবদ্ধ। বালাকে বিনা লড়াইয়ে চলে যেতে দেবে না সে।□

ব্যথায় মাথা ভনভন করছে বালার। 'ওয়াও...এর আগে কোনো মহিলাকে এত শক্তি নিয়ে আঘাত হানতে দেখিনি আমি,' বললো সে। 'আরে ধুর, কোনো পুরুষকেও এমন শক্তিতে আঘাত হানতে দেখিনি আমি!' আবার বললো বিস্মিত বালা। ব্যথা কমানোর জন্য নিজের পেছন দিকটা ডলছে সে।

'তাহলে এসো, আমার সাথে লড়ো,' বললো ন্যায়না। ভীষণ মনোযোগে লড়াইয়ের জন্য তৈরি সে।

'দেখো ন্যায়না, এটা আমার পক্ষে সম্ভব না,' বালা বললো। সে বিশ্বাস করতে পারছে না কী ঘটছে। সেই ব্যথাটা ধীরে ধীরে রাগিয়ে দিচ্ছে তাকে।

'বালা, যতক্ষণ না তুমি পালটা আঘাত হানছো, ততক্ষণ আঘাত করতে থাকবো আমি,' বললো ন্যায়না। সে পিছু হটতে রাজি নয়। ভীষণ মনঃকষ্ট পেয়েছে সে। তার বিদ্যুৎ কিনা তারই সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে!

বিদ্যুতের দিকে তাকালো বালা। মাথা নেড়ে ইশারায় তাকে লড়তে বললো সে।

পরনের সোয়েটারটা খুলে ছুঁড়ে ফেললো বালা। আঁটোসাঁটো টি-শার্টের নিচে উঁকি দিচ্ছে কিলবিল করা পেশি। দর্শকসারিতে থাকা কয়েকজন তরুণী মেয়ের প্রশংসা কুড়ালো তা। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো সে। তারপর কিক-বক্সারের মতো অবস্থান নিলো।

আবার আঘাত হানলো ন্যায়না, এবার আগের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে। লাথির আঘাত থেকে মুখ রক্ষায় উঁচিয়ে ধরা বালার মুঠোয় আঘাত করলো ন্যায়নার

শক্তিশালী লাথি। সাথে সাথে মুঠো খুলে তার পা ধরে ফেললো বালা। সে একজন প্রশিক্ষিত যোদ্ধা, অসুরের শক্তি গায়ে। পায়ে মোচড় দিয়ে ন্যায়নাকে মাটিতে ফেলে পরাজয় মানতে বাধ্য করবে সে। যেই সে তার পা ঘুরিয়েছে, নড়াচড়াটাকে নিজের অনুকূলে কাজে লাগালো সে। বাতাসে ঘুরে অপর পা দিয়ে তীর্যক আঘাত হানলো বালার মাথার উপর।

এটা এখন আর কোনো খেলা নয়।

হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করলো বিদ্যুৎ। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো বালা। নাক থেকে রক্ত ঝরছে তার। বাতাসে হাত-পা ছুঁড়ে দ্রুত কিকবক্সিং ভঙ্গিতে অবস্থান নিলো সে। এখন সে সম্পূর্ণ মনোযোগী।

বালার মুখে আঘাত করার জন্য আগে বাড়লো ন্যায়না। তার মুঠো ফাঁকি দিয়ে সরে গেল বালা। প্রতি-আক্রমণে কনুইয়ের আঘাত হানলো তার কাঁধে। আঘাতটা মারাত্মক। প্রায় কয়েক ফুট দূরে উড়ে গেল ন্যায়না। ঘাসের উপর গিয়ে পড়লো। বালার অমানুষিক শক্তি সাধারণ কথা নয়।

দ্রুতই মারমুখী ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো দুজনে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্লাডিয়েটরদের মতো বৃত্তাকারে ঘুরছে। প্রতিপক্ষকে আঘাত করার জন্য খুঁজছে মোক্ষম সুযোগ। এতক্ষণে এটাকে সমানে সমান লড়াই বলে মনে হচ্ছে। দর্শকসারিতে মঠের সদস্যরা 'ন্যায়না! ন্যায়না!' শ্লোগান দিচ্ছে। সে তাদেরই একজন, তাদের একান্ত আপন ভয়ডরহীন যোদ্ধা।

ন্যায়না আর বালা যখন সিংহের মতো একে অপরের দিকে আঘাত হানতে এগিয়ে যাচ্ছিলো, বিদ্যুৎ সামনে এগিয়ে গিয়ে ন্যায়নার বাহু ধরে ফেললো। অন্য হাত ঠেকিয়ে আছে বালার বিশাল বুকে।

'যথেষ্ট হয়েছে!' চিৎকার করলো সে।

॥ ॥

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। উভয় যুদ্ধশিবির শান্ত হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

ন্যায়নার দিকে চোখ টিপলো বালা। প্রশস্ত হাসিতে প্রতিউত্তর দিলো সে।

'দোস্ত ন্যায়না, তুমি একটা বাঘিনী,' হাতজোড় করে বললো বালা।

'তুমিও কম কোথায়, বালা। আমার তীর্যক লাথি খেয়ে এর আগে উঠে দাঁড়াতে পারেনি কেউ,' ভয়ংকর সেই আঘাতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললো ন্যায়না।

হাত ভাঁজ করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যুৎ। এইমাত্র দেখা ঘটনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে এখনো। ন্যায়নার মার্শাল আর্ট দক্ষতা নিয়ে বিদ্যুতের অবাক ভাব দেখে হাসছেন পুরোহিতজি। নিজের সাগরেদের দক্ষতা দেখে বুক ফুলে গেছে

বলভাস্তের, উচ্চ প্রশিক্ষিত সাবেক সামরিক যোদ্ধাকে রক্তের স্বাদ পাইয়ে দিয়েছে সে।

'আমি আঘাত পেতে পারি এ নিয়ে এখনো চিন্তিত, প্রিয়ে?' বিদ্যুতের দিকে ঘুরে জানতে চাইলো ন্যায়না। তার ঠোঁটদুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। স্বপ্নময় চোখের তারায় আলোর নাচন।

'হে ঈশ্বর, না! তুমি আমাদের সাথে আসতে পারো। সবদিক দিয়ে তুমি আমাকে নেতৃত্ব দিতে পারো, প্রিয় দুর্গা!' খুশিতে হেসে উঠে প্রশংসার সুরে বললো বিদ্যুৎ।

ন্যায়নাকে সে দানব অসুরের বধকারী দুর্গা বলে সম্বোধন করেছে।

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ

পতিত দেবতা

'কারণ তার দেহে ওটা নয়নতারা ছিলো না! ওটা ছিলো একটা ডাকিনী। নয়নতারার নিঃশ্বাসে তার ভেতরে শক্তিশালী এবং ভয়ংকর অশুভ আত্মার উপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম আমি,' বিভাষণ পূজারি ব্যাখ্যা করলেন।

বিচারকরা এতক্ষণে তাদের বিচারবুদ্ধির বাইরে চলে গেছে। তারা রাগে গড়গড় করছেন, অকারণে টেবিল থাপড়াচ্ছেন, বিষাক্ত পানীয়ের প্রভাবে একে অপরের উদ্দেশে খিস্তি ঝাড়ছেন। কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন আর মার্জিত ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত সৈন্যরাও আজ চিল্লাচিল্লি আর রাস্তার গুন্ডাদের মতো একে অপরের সাথে ধাক্কাধাক্কি করছে।

এসব বিশৃঙ্খলার মাঝেও হঠাৎ বিভাষণ পূজারির চোখে এমন কিছু একটা ধরা পড়লো যে চমকে উঠলেন তিনি। বিচার বই! একজন পরিষদ সদস্য পাগলের মতো আদেশের পবিত্র বইয়ে কিছু একটা লিখে চলেছে। ভীষণ পূজনীয় এই বইয়ে লিপিবদ্ধ কোনো আদেশ এক সপ্তাহের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। এই আইনটা বিভাষণ পূজারি নিজে জারি করেছিলেন। লিখিত আদেশকে আইনে পরিণত করতে এখন মাত্র একটা সিলমোহরের প্রয়োজন। *এক শিংওয়ালা ষাঁড়।*

'ঐ পারিষদকে থামাও!' চিৎকার করে উঠলেন বিভাষণ পূজারি। ভয়ার্ত চোখে তিনি তাকিয়ে দেখছেন যে শুনানি শেষ হওয়ার আগেই সেটা বইয়ে লেখা হয়ে যাচ্ছে। কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

'ঐ বইয়ে লেখা বন্ধ কর, মাথা মোটা গর্দভ!' আবারও চিৎকার করলেন বিভাষণ পূজারি। কোনো সাড়া নেই। পলকহীন চোখে উন্মত্ত পরিষদ সদস্য এখন ক্ষিপ্ত গতিতে লিখছেন, বিকৃত ঘৃণায় কুঁকড়ে আছে তার মুখ।

যথেষ্ট হয়েছে। এই পাগলামির হ্রাস টানার সিদ্ধান্ত নিলেন বিভাষণ পূজারি। বিচারকদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। দৌড়াতে শুরু করেছেন। ভুল কিছু লিপিবদ্ধ হওয়ার আগেই বিচারকের টেবিল উলটে বইটা ছিনিয়ে নিতে চান তিনি। একজনের পর একজন করে প্রায় দশজন সৈন্য তাকে থামানোর চেষ্টা করলো। ইচ্ছে করলে মুহূর্তেই তাদের পিষে ফেলতে পারতেন বিভাষণ পূজারি, কিন্তু চারপাশে এত উন্মত্ততা সত্ত্বেও তারা তার নিজের লোক। তিনি তাদের ক্ষতি করতে পারেন না। তার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া ধারালো অস্ত্র ফাঁকি দিয়ে লাফিয়ে চলেছেন বিভাষণ। প্রতি-আক্রমণ না করে দক্ষতার সাথে প্রতিটা আঘাত এড়িয়ে স্বপ্নের মতো ছুটে চলেছেন তিনি। স্বাভাবিক অবস্থায় পরিষদের পুরোহিতগণ, যারা একসাথে ডজনখানেক সমস্যা মোকাবেলা করতে সিদ্ধহস্ত, এই মুহূর্তে মাটির পুতুলের মতো নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে আছেন। থাকুক। দেবতা তাদের কোনো ক্ষতি করবেন না। তার কেবল বিচার বইটা চাই।

শেষ লাফটা দেওয়ার আগে বিভাষণের চোখের কোণে কিছু একটা ধরা পড়লো যেন। সাঞ্জনা! মাতাল এক সেনা অফিসার এইমাত্র তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে ঠেলে বিচার কক্ষে নিয়ে এসেছে। সাঞ্জনার চুলের মুঠি ধরে আছে সে!

দেবতার চোখে এখন আগুন ঝরছে। যে আগুনে পুড়ে যেতে পারে মাউন্ট সুমেরু। ঘুরলো সে, এগোচ্ছে অপরিণামদর্শী মাতাল সেনা কর্মকর্তার দিকে। তার গর্ব, তার আত্মা, তার প্রতিজ্ঞা...তার সমগ্র পৃথিবী সাঞ্জনা। এবার আর ক্ষমা করবেন না দেবতা।

বেরোনোর পথ উদ্দেশ্য করে এগোলেন তিনি। যেখানে সাঞ্জনাকে চেপে ধরে আছে মাতাল সেনা কর্মকর্তা। কাছাকাছি দাঁড়ানো এক সৈন্যের কোমর থেকে ছুরিটা বের করে নিলেন বিভাষণ। চোখের পলকে নির্ভুল নিশানায় ছুঁড়ে দিলেন; নিখুঁত লক্ষ্যে আঘাত হানলো ছুরিটা। গর্দভ সেনা কর্মকর্তার কণ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। বোকাটা ভেবেছিলো দেবতার স্ত্রীকে অসম্মান করে পার পেয়ে যাবে সে। দুভাগ হয়ে যাওয়া গলার ক্ষত থেকে কলকল করে রক্ত বেরোচ্ছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিভাষণ পূজারির কোলে ঢলে পড়লো সাঞ্জনা। প্রিয়তমা স্ত্রীকে কোনো সান্ত্বনার বাণী শোনানোর আগেই মাথার পেছনে তীব্র আঘাত অনুভব করলেন দেবতা। তার পক্ষেও ব্যথাটা ছিলো অসহনীয়। অনুভব করলেন সারা পৃথিবীটা

তার মনে হলো মাথার খুলিটা যেন দুভাগ হয়ে গেছে। মাথার পেছনের যন্ত্রণাটা এমনকি একজন ঈশ্বরকেও নিষ্ক্রিয় করে দিতে সক্ষম। দর্শকদের পরিহাস আর সৈন্যদের চিৎকার শুনতে পেলেন তিনি। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, ঝাপসা চোখে তাকাচ্ছেন চারপাশে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সাঞ্জনা আর অজ্ঞান হওয়ার আগ মুহূর্তের ভয়ংকর মুহূর্তের কথা। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো এ সবই বুঝি একটা দুঃস্বপ্ন। তবে তা নয়। কুৎসিত এক অধ্যায় উন্মোচিত হচ্ছে বাস্তবতায়।

তীব্র ব্যথা উপেক্ষা করে চোখ খুলে প্রিয়তমা স্ত্রীকে খুঁজতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন তার হাতগুলো মুক্ত নয়। কবজিতে তীক্ষ্ণ ব্যথা টের পেলেন তিনি। হাতগুলো পেছন থেকে বাঁধা। কয়েদিদের মতো সাধারণ পাটের রশি দিয়ে নয়। লড়াইয়ের পশু বাঁধার তামার শেকল দিয়ে তাকে বাঁধা হয়েছে। তারা জানতো সাধারণ রশির বাঁধনে হরপ্পার সূর্যকে আটকে রাখা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে চোখ খুললেন দেবতা, ডজনখানেক চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে। গম্বুজওয়ালা ছাদ দেখে বুঝতে পারলেন এখনো বিচার কক্ষে রয়েছেন তিনি।

'সাঞ্জনা...' যন্ত্রণাক্লিষ্ট কণ্ঠে ডাকলেন তিনি, কাশছেন। ঠোঁটদুটো পুড়ে যাচ্ছে তার। বুঝতে পারলেন দীর্ঘক্ষণ যাবৎ অজ্ঞান ছিলেন তিনি। প্রতিউত্তরে কেবল শত শত মানুষের ব্যঙ্গাত্মক হাসির শব্দ শুনতে পেলেন। এই মুহূর্তে তার অসম সাহসী ছেলের ভীষণ অভাব বোধ করছেন বিভাষণ। ও থাকলে একহাতেই এই সবগুলোকে খতম করে দিতো।

'সাঞ্জনা...' আবার চিৎকার করলেন তিনি। চারপাশে কেবলই হাসির শব্দ।

'সাঞ্জনাআআআআ...' নিজের শরীরের সবটুকু শক্তি একত্র করে চিৎকার করলেন তিনি। ভেসে এলো আরো অধিক হাসির শব্দ।

পতিত দেবতার চোখের কোনা বেয়ে অশ্রু নামছে এখন। তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না কীভাবে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় ভাগ্য এমন দুর্ভাগ্যে মোড় নিতে পারে। হরপ্পার পরম পূজনীয় দেবতা থেকে সাধারণ অপরাধীর চেয়ে আরো নিচে পতিত হয়েছেন তিনি। সারা জীবন তিনি ভাগ্যে বিশ্বাস করে এসেছেন। কিন্তু ভাগ্যই কি শেষ পর্যন্ত সর্বময় নিয়ন্ত্রক?

তারপর তিনি অনুভব করলেন ঘাড়ের পেছন থেকে কেউ ঠেলছে তাকে। ভীষণ শক্তিশালী দৈত্যাকার হাতে মেঝে থেকে উপরে তুলছে কেউ, ঠিক যেমনভাবে সদ্য শিকার করা খরগোশকে নিজের বিজয় ট্রফির মতো উঁচিয়ে ধরে কোনো শিকারি প্রাণী। চেতনা ফিরে পাচ্ছেন বিভাষণ পূজারি। সেই সাথে লড়ছেন তীব্র ব্যথার বিরুদ্ধে। আবারও শত্রুর মুখটা দেখতে পেলেন তিনি। এবারো রাত্তা। মনে মনে ঈশ্বরের নামে একটা শপথ নিলেন দেবতা। মরার আগে রাত্তাকে নিজ হাতে খুন করবেন তিনি। কোনো কারণে যদি ব্যর্থ হন, বাবার প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে তার ছেলে মানু।

'মৃৎ কারাবাস!' আনন্দ চিত্তে ঘোষণা করলো মাতাল পুরোহিত।

তীব্র করতালিতে তাকে সমর্থন জানালো জনতা। বিচার কক্ষে উপস্থিত প্রতিটা পুরোহিত সদস্য, প্রতিটা সেনা কর্মকর্তা, প্রতিটা সৈন্য এবং প্রতিটা নাগরিক যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সেই ভয়াবহ ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করার। অবচেতনভাবে বিচার কক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন বিভাষণ; হাতদুটো শক্ত করে পেছনে বাঁধা, রক্তাক্ত এবং তৃষ্ণার্ত। তিনি জানেন যুক্তি দেখিয়ে লাভ নেই। শয়তানের দল জমায়েত হয়েছে এখানে।

মৃৎ কারাবাসে বন্দি হওয়াটা যেকোনো মানুষের জন্য চরম দুঃস্বপ্নের চেয়েও ভয়ংকর। রক্ত, যন্ত্রণা, বন্দিত্ব, ক্ষুধা আর নির্যাতনের উৎকট দুর্গন্ধময়, শীতল, স্যাঁতস্যাঁতে, অন্ধকার নরক এটা। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই নির্মাণ করা হয়েছিলো ভূগর্ভস্থ এই কারাগার। হরপ্পার শান্তিপ্রিয় সমাজে অপরাধের সংখ্যা খুবই কম। মহানগরীর শ্রেণিবৈষম্যহীন, আধ্যাত্মিক এবং শিক্ষিত জনগণের অপরাধ সংগঠনের প্রয়োজন হয় না। তথাপি গঠনমূলক সমাজ ব্যবস্থায় অপরাধীর শাস্তি বিধানের জন্য একটা কার্যকর বিচারিক অবকাঠামোও থাকবে। মৃৎ কারাবাস নির্মিত হয়েছিলো একটা মাত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। প্রতিরোধ।

হরপ্পার সমাজ ব্যবস্থা সাম্যবাদে বিশ্বাসী। সবার জন্য সম্পদ, সব নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা, সবার জন্য শিক্ষা এবং সবচেয়ে দরিদ্র নাগরিকের জন্যও যেখানে থাকবে আবাসন ব্যবস্থা। যদিও এই সমঅধিকারের নীতি কারাগারের জন্য প্রযোজ্য নয়। মৃতের অন্ধকূপ কেবলই শাস্তিস্বরূপ বন্দিত্ব নয়। এটা সম্পূর্ণরূপে কারারোধ আর নির্বাসন। মৃত্যুকূপে পাঠানো আত্মাগুলোকে হরপ্পার সমাজ থেকে চিরতরে মুছে দেওয়া হয়। এমনকি চিকিৎসা সেবা বা ঔষধও পৌঁছায় না এসব হতভাগাদের কাছে। এটা হরপ্পার সর্বোচ্চ শাস্তির নিজস্ব ব্যবস্থা। যাদের মৃৎ কারাবাসে প্রেরণ করা হয়, আর কখনোই ফিরে আসে না তারা।

'বিভাষণ পূজারি নামের এই লোকটির অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে...এবং তাকে মৃৎ কারাবাসে প্রেরণ করা হবে,' মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে জড়ানো কণ্ঠে ঘোষণা করলো এক পরিষদ সদস্য। মুখের কোনা বেয়ে অর্ধেক পানীয় তার সাদা সুতির আলখাল্লার উপর পড়লো।

অন্যরা ব্যাপারটায় বেশ মজা পেল এবং যার যার মদের গ্লাস উঠিয়ে চুমুক দিলো। এতক্ষণে বিভাষণ পূজারির আর কোনো সন্দেহ নেই যে এসব উন্মাদের সাথে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। তিনি এটাও নিশ্চিত যে তার সহকর্মীরা শক্তিশালী বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। তাকে পালাতে হবে। তাকে একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে। যদি সমগ্র শহরও বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে থাকে, তারপরও একটা-না-একটা সূত্র থাকবেই। খাদ্যভান্ডার? তেমন মনে হয় না। অসংখ্য উৎস থেকে যেমন সরবরাহ আসে, তেমনি বিতরণ ব্যবস্থাও বহুমুখী। মাংস? জল? না। সব উৎসই কঠোর পাহারাধীন।

অসম্ভব মনে হচ্ছে সবকিছু। ভাবনা ঝেড়ে ফেললেন বিভাষণ পূজারি।

তবে কি হরপ্পার জনগণ সব সময়ই এমন ছিলো? প্রশ্নাতীত ক্ষমতার আসনে ছিলো বলেই কি দেবতার উপর এতদিন করুণা দেখিয়েছে তারা?

আর ভাবতে পারেন না তিনি। অবিরাম রক্তপাত আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা আঘাত হানলো দেবতার উপর। আরো একবার জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি।

বানারস, ২০১৭
‘সহস্র বছর ধরে লড়ছি আমরা।’

‘ব্রাহ্মিণাবাদ?’ বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলো বিদ্যুৎ। ‘আপনি ঠিক বলছেন?’

শেষ বাক্যটি বলে ফেলার জন্য সাথে সাথেই অনুশোচনা হলো তার। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো মহাপরাক্রমশালী মঠাধ্যক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে সে। এবার সে আরো সম্ভ্রমের সাথে প্রশ্ন করলো। ‘বাবা, আপনি বলতে চাচ্ছেন হরপ্পার আদি এবং আসল নাম ছিলো ব্রাহ্মিণাবাদ?’

‘হ্যাঁ, পুত্র। ইংরেজিতে অনুবাদ করলে হবে *ব্রাহ্মণদের শহর*।’

হতবিহ্বল দেখাচ্ছে বিদ্যুৎকে। এই তথ্য কীভাবে হজম করবে বুঝতে পারছে না সে। প্রপৌত্রের মুখাবয়বে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ছায়া লক্ষ্য করলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। সময় হয়েছে পুরো সত্যটা বিদ্যুৎকে জানিয়ে দেওয়ার।

‘ব্রাহ্মিণাবাদের পরিবর্তে ব্রিটিশ কর্মকর্তারা কেন হরপ্পা নামটা বেছে নিলেন, সবাই অনুমান করতে পারবে যেহেতু এটা প্রকৃতপক্ষে স্থানীয়দের কাছে পরিচিত ছিলো,’ ব্যাখ্যা করছেন গুরুজি। ‘তাছাড়া তুমি বলেছ যে জন হার্বার্ট ১৯২১ সালে হরপ্পা আবিষ্কার করেছিলেন। এটাই সর্বজনবিদিত এবং সূক্ষ্মভাবে প্রচারিত তত্ত্ব। কিন্তু তুমি কি জানো মার্শাল তার খননকার্য শুরু করারও আট দশক আগে চার্লস ম্যাশন নামে আরো একজন ইংরেজ ভদ্রলোক প্রকৃতপক্ষে হরপ্পা আবিষ্কার করেছিলেন? এমনকি তিনি *ন্যারেটিভ অব ভ্যারিয়াস জার্নিস ইন বেলুচিস্তান*,

আফগানিস্তান অ্যান্ড পাঞ্জাব নামক তার লেখায়ও এটা বর্ণনা করে গেছেন। তাহলে পরিষ্কারভাবে ১৮৪২ সালে প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তারই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশরাজ হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের উপস্থিতি আবিষ্কার করে। কেন তারা আট দশক পর ১৯২২ সালে খনন অভিযান পরিচালনা করে? প্রায় একশো বছর ধরে তারা তাহলে কী করছিলো?

মগ্ন হয়ে প্রপিতামহের কথা শুনছিলো বিদ্যুৎ। স্কুল এবং কলেজে সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে পড়ার সময় সে কখনো কল্পনা করেনি ভারতীয় ইতিহাসে এই প্রাচীন সভ্যতা এত গুরুত্বপূর্ণ।

'এটাই শেষ নয়, বিদ্যুৎ। চার্লস ম্যাশনের পর এবং স্যার জন হার্বাটের পূর্বে আরো একটি ব্রিটিশ মিশন এই প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসস্তূপে পৌঁছেছিলো। তিনি ছিলেন জেনারেল আলেকজান্ডার কানিংহাম নামে একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা। তার সাথে ছিলেন জন ব্রান্টন এবং উইলিয়াম ব্রান্টন নামে দুজন প্রকৌশলী। ১৮৫৬ সালে হরপ্পা পরিদর্শন করেন তার। ১৮৫৭ সালে মহান সিপাহি বিদ্রোহ বা অনেকের মতে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের মাত্র এক দিন আগে। কল্পনা করো এই ইংরেজ ভদ্রলোকেরা কী করেছিলেন,' বিদ্যুতের দিকে আমুদে ভঙ্গিতে চেয়ে বললেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

'কী, বাবা?' জানতে চাইলো বিদ্যুৎ।

'অপ্রত্যাশিতভাবে পৃথিবীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলোর একটি খুঁজে পেয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ব্রিটিশরাজের শিক্ষিত, সভ্য আর প্রাণচঞ্চল কমকর্তাগণ কী করতে পারে বলে তুমি আশা করো?'

'আমি আশা করতাম তারা ঐতিহ্যটা সংরক্ষণ করবে, সতর্কভাবে খননকার্য পরিচালনা করবে এবং পৃথিবীতে মানুষের উত্তরাধিকারীদের একটা উপহার দিয়ে যাবে,' চাঁছাছোলা কণ্ঠে বললো বিদ্যুৎ।

'ঠিক। কিন্তু আমি যদি বলি এমন কিছুই করেনি ব্রিটিশরা? আমি যদি বলি চার্লস ম্যাশনের আবিষ্কারের চৌদ্দ বছর পরে জেনারেল কানিংহাম আর দুই ব্রান্টন ভাই পুরো ব্রাহ্মিণাবাদ শহরটাকে উড়িয়ে দেন এবং সেখানকার ভাঙা ইটের খোয়া রেলওয়ে লাইনের নিচে ব্যবহার করেন?' সোজা বিদ্যুতের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন গুরুজি।

'কী বলছেন আপনি, বাবা? এ তো অবিশ্বাস্য!' বিস্মিত হয়ে বললো বিদ্যুৎ।

'হ্যাঁ, বাছা। মানবসভ্যতার ইতিহাসের একটা পুরো অধ্যায় মুছে দেওয়ার এর চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে? প্রাচীন শহর ব্রাহ্মিণাবাদ, যা হরপ্পা

সভ্যতার প্রথম আবিষ্কৃত শহর, হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারোর নিকটবর্তী সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রতিবেশী...এই পুরো শহর এখন করাচি আর লাহোরের মধ্যবর্তী রেলওয়ে লাইনের নিচে সমাধিস্থ হয়ে শুয়ে আছে।'□

'কেউ প্রতিবাদ করলো না কেন? কেন এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোনো আলোচনা করা হয় না?' জিজ্ঞেস করলো হতভম্ব বিদ্যুৎ। 'তারচেয়ে বড় প্রশ্ন, ব্রিটিশ কর্মকর্তারা কেন এমন একটা বিশ্ব সম্পদকে ধ্বংস করে দিলো? এর ফলে তাদের লাভটাই বা কী হলো?'□

বিদ্যুতের কোনো ধারণা নেই যে কয়েক শতাব্দী এবং মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অন্ধকার ষড়যন্ত্র যা কেবল বিস্মৃতপ্রায় মানুষ সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

'ব্রাহ্মিণাবাদ ধ্বংস করে তাদের কী লাভ হয়েছিলো জিজ্ঞেস করার চেয়ে ভালো হয় যদি প্রশ্ন করা হয়, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হতে দিলে তাদের কী ক্ষতি হতো,' বললেন বৃদ্ধ মঠাধ্যক্ষ।

'একবার ভাবো তো, বিদ্যুৎ, আমাদের বেশ অনেকগুলি ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে সরস্বতী নদীতীরে বসে কঠোর সাধনা আর পবিত্র ধর্মীয় আচার পালন করছেন সন্ন্যাসী আর ঋষিগণ। মনে করা হয়ে থাকে এই বিশাল নদীর উপনদী হলো সিন্ধু বা ইন্দাস। বৈদিক তত্ত্ব অনুসারে, শক্তিশালী এই নদীতীর ঘেঁষে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলো অসংখ্য রাজ্য। তবে আমাদের কোনো ইতিহাসের বইয়ে সেসবের উল্লেখ নেই। মানলাম পৃথিবী থেকে সরস্বতী বিলীন হয়ে গেছে। তাই বলে বই-পুস্তক আর লেখা থেকেও হারিয়ে যাবে? প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, স্মৃতিস্তম্ভ আর কিংবদন্তি আবিষ্কারের জন্য বিশ্বজুড়ে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে। তাহলে সরস্বতীকে কেন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হলো?' বলে চললেন দ্বারকা শাস্ত্রী। 'এটা কি কেবলই কাকতাল?'

একটু থেমে আবার বললেন, 'হরপ্পার পেছনের সত্যকে মুছে দিতে চায় যে শক্তি, সেই একই শক্তি চায় বিশ্ব ভুলে যাক সরস্বতীর কথা।'

'নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বলছি, বাবা, বৈজ্ঞানিক কোনো প্রমাণাদি না থাকার কারণেও তো এমন হতে পারে?' সোজাসাপটাভাবে বললো বিদ্যুৎ। সে আরো অধিক থেকে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠছিলো। একটা সম্ভাবনাও বাদ দিতে চায় না সে।

'এটা একদম সত্য নয়, বিদ্যুৎ। ১৯১০ সালে সুপরিচিত ইতিহাসবিদ মিচেল দানিনো তার *দ্য লস্ট রিভার* বইয়ে লিখেছেন যে গাগর-হাকরার শুকিয়ে যাওয়া গতিপথই প্রকৃতপক্ষে সরস্বতী নদী। এই সরস্বতী নদী পুরো হরপ্পা সভ্যতার সময় এবং ব্রোঞ্জ যুগেও টিকে ছিলো। সম্প্রতি হরিয়ানা সরকার যমুনানগর জেলার মোস্তফাবাদের তেহসিকে সরস্বতী নগর হিসেবে নামকরণ করেছেন। যেখানে

একটা ভূগর্ভস্থ প্রবাহ আবিষ্কৃত হয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানী এবং প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে, এটাই রূপকথার সেই সরস্বতী নদী।'

'এ তো বিস্ময়কর, বাবা! কেউ হয়তো ভাবতে পারে এই পদক্ষেপগুলো কেন এখন নেওয়া হচ্ছে। দুইশ বছর ধরে আমরা এতদিন কী করেছি?' বিস্মিত হলো বিদ্যুৎ।

দ্বারকা শাস্ত্রী হাসলেন। বিদ্যুৎ লক্ষ করলো তার হাসিতে একইসাথে মিশে আছে পরিহাস আর বিষন্নতা।

'দুই শতাব্দী নয়, বিদ্যুৎ। হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে লড়াই করছি আমরা,' জবাব দিলেন গুরুজি।

॥ ॐ ॥

আরো এক ঘণ্টা ধরে বিভাষণ পূজারি, সপ্তর্ষি, প্রিয়ংবদা আর মানু সম্পর্কে পুনরায় বর্ণনা করলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। হরপ্পার রহস্যময় আরো কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরও আলোকপাত করলেন তিনি। এর সবকিছুই একটা পরিষ্কার পরিসমাপ্তি ইঙ্গিত করছে। কতিপয় ভীষণ ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালী শক্তি প্রাচীন সভ্যতার অপরিসীম গুরুত্ব এবং সত্যটা লুকাতে চায়। সবশেষে বিদ্যুৎকে ১৮৫৬ সালের ব্রাহ্মিণাবাদের গল্পটা বললেন গুরুজি।

মঠপ্রধানের দরজায় করাঘাত করলো কেউ। 'হুমম...' অনুমতি দিলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। দ্বিধান্বিতভাবে ভেতরে প্রবেশ করলো সনু। মঠাধ্যক্ষের সামনে তাকে পরিষ্কার অসহায় লাগছে। তবে তার মুখে রহস্যময় একটা হাসি ঝুলছে, যা চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে।

হাতজোড় করে মাথা নুইয়ে গুরুজিকে সম্মান প্রদর্শন করলো সে। বিদ্যুতের দিকে ফিরে ঘোষণা করলো সে, 'বিদ্যুৎ দাদা, তোমার একজন দর্শনার্থী এসেছেন।' বিদ্যুৎ লক্ষ করলো সনুর মুখ লাল হয়ে গেছে এবং হাসি চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সে।

'দর্শনার্থী? আমার দর্শনার্থী আসবে কোথা থেকে? বালা ছাড়া আর কেউ জানেই না আমি এখানে আছি,' জবাবে বললো বিদ্যুৎ। প্রপিতামহের সাথে গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলো সে এবং চায় না কেউ বিরক্ত করুক। আরো অনেক কিছুই শেখার এবং জানার আছে। বিভাষণ পূজারির বেদনাদায়ক মর্মস্পর্শী কাহিনি আর হরপ্পার শেষ সময়ের গল্প কেবল মাঝপথে। বিদ্যুৎ জানে না এর সাথে কী সম্পর্ক তার। আর্য আক্রমণের পেছনের রহস্য এখনো পুরোপুরি উন্মোচিত হয়নি। কেন সরস্বতী সভ্যতার নাম সিন্ধু সভ্যতা হয়ে গেল এবং কেনই বা ব্রিটিশ কর্মকর্তারা আবিষ্কারকে ধ্বংস করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করলো তা এখনো আলোচনা করা বাকি।

সর্বোপরি, বিদ্যুৎ এখনো হজম করার চেষ্টা করছে পুরোহিত রাজার মুর্তিটা তারই বলতে প্রপিতামহ কী বুঝিয়েছেন। এই মুহূর্তে কোনো দর্শনার্থীকে সময় দেওয়ার জন্য উঠতে চায় না সে।

'কে এসেছে, সনু?' ঈষৎ বিরক্তির সুরে জানতে চাইলো বিদ্যুৎ। সনু জবাব দেওয়ার আগেই দ্বারকা শাস্ত্রী তার একটা হাত রাখলেন বিদ্যুতের কাঁধে। স্নেহভরা হাসিতে বললেন, 'যাও, বিদ্যুৎ। গুরুত্বপূর্ণ একজন দর্শনার্থী এসেছেন।' মহান মঠাধ্যক্ষ প্রতিটা উপস্থিতি টের পান, দেব-রাক্ষস মঠের প্রতিটা নতুন তরঙ্গ বুঝতে পারেন।

'আপনি যা বলবেন, বাবা। তবে শীঘ্রই আপনার কাছে আরো সময় চাইবো আমি,' বলে প্রপিতামহের পা স্পর্শ করলো বিদ্যুৎ। অস্ফুটে আশীর্বাদ করলেন বৃদ্ধ, জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী আশীর্বাদ।

॥ ৯ ॥

'কে এসেছে রে, সনু?' আবারও জানতে চাইলো বিদ্যুৎ। কে এসেছে এটা বলতে গিয়ে সনু লজ্জা পাচ্ছে দেখে মজা পাচ্ছিলো বিদ্যুৎ। চাপা হাস্যরত বন্ধুকে পাশে নিয়ে পরদাদার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সে। মঠের বহিরাংশে অবস্থিত অভ্যর্থনা কক্ষের দিকে পা চালালো। তবে সে পর্যন্ত যেতে হলো না তাকে। আশ্রমের বাগানের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে তার অতিথি।

দীর্ঘ ভ্রমণক্লান্তি শেষেও দামিনীকে অপূর্ব সুন্দরী লাগছে।

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ

মহেঞ্জোদারোর রাজকন্যা

‘কিন্তু আমি তো রাজা হতে চাই না, ভ্রষ্ট মেয়েমানুষ! পবিত্র সিলমোহর চুরি করার সাহস তুমি পেলে কোথায়?’ চিৎকার করলেন পণ্ডিত চন্দ্রধর। তার কথায় কান না দিয়ে অলসভাবে হেঁটে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল প্রিয়ংবদা। পরাজয় আর রাগে কাঁপছেন চন্দ্রধর। যদিও এসব তার কাছে নতুন কিছু নয়।

চন্দ্রধর ভালো মানুষ। সম্ভবত পৃথিবীতে যে কয়জন ভালো মানুষ এসেছেন তাদের অন্যতম। তিনি একজন পুরোহিত, যোদ্ধা, সাধু, রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত, সামরিক জেনারেল, স্থপতি এবং সেই সাথে একজন দক্ষ জ্যোতির্বিদ। অসংখ্য যুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেছেন তিনি। নগর পরিকল্পনা আর মহানগরী নির্মাণ করেছেন। হরপ্পার সংবিধানের যৌথ রচয়িতা, এমনকি বেদ রচনাতেও অবদান রয়েছে তার। দেবতা বিভাষণ পূজারির পর আর্যব্রত জুড়ে তিনিই সবচেয়ে পূজনীয় মানুষ। সবাই পণ্ডিত চন্দ্রধরকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে।

ব্যতিক্রম কেবল তার স্ত্রী। প্রিয়ংবদা তাকে একজন দাসের চেয়ে বেশি মূল্য দেয় না। তেজস্বী এবং মেধাবী চন্দ্রধর, সমগ্র পৃথিবীকে মুগ্ধ করেছেন এবং দাপিয়ে বেড়ান যিনি, নিজ বাড়িতে একটা খেলনা পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়। মেয়েদেরকে একটা গোপন অস্ত্র দান করেছেন ঈশ্বর, যা পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সেটা ভালো কাজে ব্যবহৃত হবে নাকি মন্দ কাজে, তা নির্ভর করে নারী কীভাবে তার ক্ষমতার ব্যবহার করে তার উপর। সমগ্র সৃষ্টির পেছনে রয়েছে নারী।

আবার সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুলোর মূলেও রয়েছে নারী। পুরুষ নারীর হাতের খেলনা ছাড়া আর কিছুই না।

চন্দ্রধর জানেন না এখন কী করবেন তিনি। সবকিছু এইমাত্র খুলে বলেছে তার স্ত্রী; গান, এপ এবং শা-র শব-সাধনা, নয়নতারার শরীরে পিশাচের ভর করা, ভুয়া পরোয়ানা, নির্মম খুন, মেসোপটেমিয়ান অপরসায়নবিদদের দিয়ে হরপ্পার পানির উৎস বিষাক্ত করা–সব। নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না চন্দ্রধর। নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্য কেউ যে এতটা রাক্ষসী হতে পারে এটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। নিজেকে পাপী মনে হচ্ছিলো তার। বুকটা ফেটে যাচ্ছিলো কষ্টে। বোন সাঞ্জনার কথা মনে পড়তেই হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলেন, মানসিক যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে কাঁদছেন এখন।

ঝটিকাসংকুল বিবাহিত জীবন স্বামী-স্ত্রীর। বিশাল মনের বুদ্ধিমান, সক্ষম পুরুষ চন্দ্রধর। কিন্তু স্ত্রীকে তিনি এতটাই ভালোবাসেন যে তার কাছে এলে বিচারবুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায় তার। অবিশ্বাস্য সুন্দরী সে। বেড়ে উঠেছে মহেঞ্জোদারোর রাজকন্যা হিসেবে। যেহেতু হরপ্পা এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন নগরীতে কোনো রাজা ছিলো না, মহেঞ্জোদারোর প্রধান পুরোহিতের মেয়েকে আর্যব্রত জুড়ে রাজকন্যা হিসেবেই জানতো সবাই। নিজেকে সবার সেরা মনে করতো। সে চাইতো সবাই যেন তাকে সব সময় সেরা ভাবে। কষ্টের ব্যাপার হলো, বিয়ের কয়েক মাসের মাথায় চন্দ্রধর আবিষ্কার করলেন যে একজন প্রধান পুরোহিতের কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তার হৃদয়টা সর্পের। এই অন্ধকার ব্যক্তিত্বকে আরো খারাপ করে দেয় তার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা। ঘৃণা, প্রতিহিংসা আর লোভের প্রতিমূর্তি যেন সে। তাছাড়া, মানসিকভাবে চরম হিংস্র আর নির্মম এই নারী। নিজের গায়ে ফুলের আঘাতটি লাগতে না দিলেও অন্যদেরকে অমানুষিক নির্যাতন করতে পিছপা হয় না কখনো। তারপরও তার প্রেমে সর্বদা হাবুডুবু খান চন্দ্রধর।

বিভাষণ পূজারির উত্থান সর্বদাই ছিলো স্বামী-স্ত্রীর মতপার্থক্যের বিষয়। চন্দ্রধর জানেন বিভাষণ পূজারি হলেন অসাধারণ মানুষ, একজন দেবতা। অন্যদিকে, তিনি কেবল সাধারণ মানব। তিনি যা দেখেছেন প্রিয়ংবদা তা দেখেনি। যুদ্ধরত বিভাষণ পূজারিকে দেখেছেন তিনি এবং জানেন স্বর্গীয় ক্ষমতা না থাকলে এমন লড়তে পারে না কেউ। শত শত পশ্চিমা উপজাতি সৈন্যের বিপক্ষে লড়ে একহাতে তাদের পরাজিত করেছেন তিনি। লড়েছেন ভয়ংকর দানবের বিরুদ্ধে। একবার তো একটি মাত্র আঘাতেই ঘোড়সওয়ারসহ বিশাল এক ঘোড়াকে ভূপাতিত করেছিলেন। ধনুক থেকে মাইলখানেক দূরে তীর ছুঁড়ে নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারেন তিনি। রামদার একটি মাত্র আঘাতে কেটে ফেলতে পারেন বিশাল বিশাল গাছ। তবে শারীরিক সক্ষমতার চেয়ে দেবতার আধ্যাত্মিক ক্ষমতাই চন্দ্রধরকে মুগ্ধ

করেছিলো বেশি, এবং সেই থেকে তার নিবেদিত বন্ধু আর অনুসারীদের একজন তিনি।

যদিও হরপ্পার সকল পুরোহিতই বৈদিক চিন্তাভাবনা আর তত্ত্বের ব্যবহারে দক্ষ, তথাপি বিভাষণের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার ধারেকাছেও নেই কেউ। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে সৃষ্টির সময়কার প্রাগৈতিহাসিক ঋষিদের রক্ত বইছে তার শরীরে। এবং বিভাষণ পূজারি তার এই সুনামকে মাথায় রেখেই জীবনযাপন করেন। আটটি সিদ্ধির সবগুলোই আয়ত্ব করেছেন তিনি। এর ফলে অগ্নি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জখম, অপরসায়ন, জীর্ণতা, মধ্যাকর্ষণ আর মায়া জাদু থেকে অসাধারণ প্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করেন বিভাষণ। তাছাড়া, তিনি একজন দক্ষ তান্ত্রিক। আর এই ক্ষমতা তিনি জনগণ ও সমাজের কল্যাণে কাজে লাগান। স্থান আর কালের বাধা অতিক্রম করে দেখতে পান তিনি। পারেন অতীত ও ভবিষ্যৎ দেখতে। কঠোর সংযম আর হৃদয়ের বিশালতা তাকে মহান সপ্তর্ষিদের কাছেও প্রিয় করেছে।

এ সবকিছুর পরেও প্রিয়ংবদার তাকে বিভাষণ পূজারির সাথে প্রতিযোগিতা করতে বলাটা হাস্যকর মনে হলো। রাজ্যের রানি হওয়ার ভাবনায় অন্ধ হয়ে গেছে সে। কেন সে বোঝে না? মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে? তিনি এটাও জানেন, কেবল মানুষ হিসেবেও বিভাষণ পূজারি তার চেয়ে যোজন যোজন ব্যবধানে এগিয়ে।

নিজের খাসকামরায় আছে প্রিয়ংবদা। দুধ আর গোলাপজলে স্নান করছে। বিভাষণ পূজারির পরিবারের দুর্দশা, নয়নতারার নির্মম হত্যা, হরপ্পার হাজার হাজার নর-নারী আর শিশুর মস্তিষ্ক বিকৃতিতে কিছু যায় আসে না মহেঞ্জোদারোর রাজকন্যার। প্রায় আধডজন পরিচারিকা গোসল করাচ্ছে তাকে আর সে গুনগুন করছে তার প্রিয় গান্ধর্ব।

ঘোষণা না দিয়েই ভেতরে প্রবেশ করলেন চন্দ্রধর। তার চোখগুলো রক্তবর্ণ এবং রাগে ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে তার। পরিচারিকাগণ সাথে সাথেই প্রভু-পত্নিকে একা রেখে কুর্নিশ করে কক্ষ ছেড়ে চলে গেল।

'কী ব্যাপার, পণ্ডিত চন্দ্রধর? এই অধম স্ত্রীকে উলঙ্গ দেখার জন্য আমার খাসকামরায় দৌড়ে আসার প্রয়োজন ছিলো না তোমার।' করতল দিয়ে নিজের স্তন ঢাকার অভিনয় করতে করতে রসিকতা করলো প্রিয়ংবদা। স্বামীর রাগকে কোনো পাত্তা দিলো না সে। প্রলুব্ধ করতে জুড়ি নেই তার। সৌন্দর্য আর যৌনতা তার কার্যকর অস্ত্র।

'এ হতে দেবো না আমি। পার্শ্ববর্তী সব প্রদেশ থেকে চিকিৎসক, আয়ুর্বেদাচার্য আর অপরসায়নবিদ নিয়ে আসতে যাচ্ছি আমি। প্রথমে পানি বিষমুক্ত করে তারপর জনগণকে সুস্থ করে তুলবো আমরা।'

নীরবে স্বামীর কথা শুনছিলো প্রিয়ংবদা। এর আগেও বহুবার এমন ঝড় সামলেছে সে। হ্যাঁ, এটা বিশেষ চ্যালেঞ্জিং। তবে সে জানে শেষ পর্যন্ত তারই জয় হবে।

'একইসাথে, পরিষদের সভাও ডাকবো আমি। আমার বন্ধু বিভাষণ পূজারির বিরুদ্ধে উত্থাপিত সব অভিযোগ বাতিল করবো। তার জন্য তারা আমাকে যে শাস্তি দেয় দিক। ওটা আমার প্রাপ্য। আমার মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছ তুমি, শয়তান মেয়েলোক! ভয় পাও না যে স্বর্গ থেকে একজন দেখছে এসব?'

মৎস্যকন্যার মতো সৌন্দর্য নিয়ে গোলাপ-দুধের মিশ্রণ থেকে উঠে এলো সে। নগ্ন, ভেজা শরীর থেকে মুক্তোর মতো ঝরছে জলকণা। চন্দ্রধরের কাছে এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে। নরম, কোমল চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছে তার গলা আর কাঁধ। চন্দ্রধরের কানে ফিসফিস করলো সে, 'স্বর্গ কি এখন এই মুহূর্তে এখানে নেমে আসেনি, প্রভু?' ধীরে ধীরে নিচে নামছে তার হাত। চন্দ্রধরের বস্ত্রহরণ করতে উদ্যত হলো সে। কোমরে ধরে ধাক্কা দিয়ে তাকে দূরে ঠেলে দিলেন চন্দ্রধর।

আচ্ছা, তাহলে এভাবে হবে না, ভাবলো প্রিয়ংবদা।

বানারস, ২০১৭
দামিনী

বিদ্যুতের বিশ্বাসই হচ্ছে না দেব-রাক্ষস মঠে দামিনীকে দেখছে সে। আঁটোসাঁটো জিন্সের উপর সাদা স্লিভলেস টি-শার্টে দারুণ লাগছে তাকে। উপরে সুতির চেক শার্ট কোমরের কাছে গিঁট দেওয়া। চোখে কালো রোদচশমার সাথে কানে বিশাল ঝুমকো পড়েছে সে। চুলগুলো টানটান করে মাথার পেছনে বাঁধা। এই সাধারণ সাজসজ্জায় অসাধারণ লাগছে ওকে।

সাথে সাথেই বিদ্যুৎ বুঝতে পারলো কেন সনু লাজে মরে যাচ্ছিলো। মঠের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের তুলনায় বেশ খোলামেলা দামিনীর পোশাক-আশাক। অবশ্য, তাতে কিছু যায় আসে না, ওকে দেখে খুশিই হয়েছে বিদ্যুত।

বিদ্যুৎকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বাচ্চাদের মতো খুশিতে নেচে উঠলো দামিনী। ব্যাকপ্যাক ফেলে সুদর্শন প্রেমিকের উদ্দেশে দৌড় দিলো সে। একলাফে তাকে সোজা বিদ্যুতের কোলে উঠে পড়তে দেখে মঠের বাসিন্দাদের চোখ প্রায় কপালে উঠে গেল। আনন্দে হাসছে সবাই। সম্মোহিতের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে প্রেমিক যুগলকে দেখছে তরুণ সনু। তার যদি দামিনীর মতো একটা বান্ধবী থাকতো! কী দারুণ ব্যাপারই না হতো তাহলে! নিজেকে তিরস্কার করলো সে। দামিনী দেবতার অর্ধাঙ্গী, সুতরাং সেও তার শ্রদ্ধার পাত্রী।

বিদ্যুতের কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়ার মতো জোরে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলো দামিনী। নির্মল আনন্দে হেসে তার গালে চুমু খেলো বিদ্যুৎ। যদিও মাত্র দু-তিন দিন একে অপরকে দেখেনি তারা, তারপরও পরস্পরকে কাছে পেয়ে ভারমুক্ত হলো যেন তারা।

'তুমি এ জায়গা কীভাবে খুঁজে পেলে, দামিনী? তুমি কীভাবে জানলে যে আমি এখানে আছি?' আলতো করে দামিনীকে নামিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ। সে লক্ষ করলো, মঠের বাসিন্দাদের মধ্যে লাজুক হাসি আর চোরা দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে।

'তুমি তো জানোই আমি কতটা কাজের কাজি...তাছাড়া, আমি সাংবাদিক না!' নাটকীয় ভঙ্গিতে আঙুলে শিস দিয়ে জবাব দিলো দামিনী। বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ দামিনী একমাত্র এই একজন মানুষের সাথে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবনাগুলো ভাগ করে নিতে পারে। তার কাছে এলেই পাগলামি করতে ইচ্ছে করে তার। কারণ মানুষটা বিদ্যুৎ।

'আসলেই কীভাবে পেলে দামিনী? আমাকে জিজ্ঞেস না করে বালা অবশ্যই তোমাকে বলবে না, এটা নিশ্চিত,' আবারও জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ। এখনো বিস্ময় কাটেনি তার।

'বাদ দাও তো...বাচ্চাদের মতো কোরো না। হ্যাঁ, আমি রিয়াকে ফোন করেছিলাম...সে-ই জানিয়েছে যে তুমি বারানসিতে আছো।'

'আরে! কিন্তু রিয়া তো এ জায়গা চেনে না!' বললো বিদ্যুৎ।

'হ্যাঁ, তবে যে ক্যাব কোম্পানি তোমাকে ট্যাক্সি পাঠিয়েছিলো তাদের চেনে সে। আর ক্যাব কোম্পানি জানে ঐ দিন কোন ড্রাইভার নিয়ে এসেছিলো তোমাকে। সহজ ব্যাপার!' কিছুটা আত্মতুষ্টি নিয়ে বললো দামিনী।

'পরশ পান্ডে!' বিস্মিত হলো বিদ্যুৎ। বিমান বন্দর থেকে তাকে নিয়ে আসা অদ্ভুত মজার মানুষটার কথা মনে পড়লো তার।

ইতোমধ্যে দামিনীর ব্যাগ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সনু। সে যখন একটা ঝাঁকি দিয়ে ব্যাগটা কাঁধে নিচ্ছিলো, দামিনী লক্ষ করলো কতটা লাজুক তরুণ সে। তার চোখেমুখের ভালোমানুষি ভাবটাও লক্ষ করলো। ওকে একটু জ্বালাবে বলে ঠিক করলো দামিনী।

'বিদ্যুৎ, তোমাদের আশ্রমে তো সুদর্শন পুরুষের অভাব নেই,' চোখে অতিরিক্ত প্রশংসা নিয়ে সনুর দিকে তাকিয়ে বললো সে। দামিনীর চোখে চোখে তাকাতে পারছে না সনু। তার বুকের ভেতর কলিজাটা যেন লাফাচ্ছে। 'দিল্লির মেয়েরা তোমাকে দেখলে পাগল হয়ে যাবে,' দামিনী বলে চলেছে। অকুতোভয় বীর সনু, যে কিনা মঠের মহাপ্রবেশ দ্বারে বিদ্যুৎকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলো, এই মুহূর্তে

তাকে একটা খেলনা পুতুল ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না। সে প্রায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে, দুর্বল হাঁটুদুটোতে কোনো শক্তি নেই।

'যথেষ্ট হয়েছে, দামিনী,' হেসে বাধা দিলো বিদ্যুৎ। 'যেখানেই যাবে সেখানেই মেয়েদের পাগল করার ক্ষমতা আছে সনুর,' এক হাতে লাজে রাঙা বন্ধুর গলা জড়িয়ে বললো সে। সস্নেহে সনুর গাল টিপে দিলো দামিনী। প্রাণবন্ত ব্যবহার আর ভালোবাসা দিয়ে সে কেবল সনুর মন জয় করে নেয়নি, আশেপাশের সকলের মন জয় করে নিয়েছে সে।

অথবা *প্রায়* সকলের। নিজের কক্ষের জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ন্যায়না। তার চোখগুলো জ্বলছে। কী ঘটছে প্রত্যক্ষ করছে সে।

দামিনীর সোনার হৃদয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই মুহূর্তে কাশীতে যে অশুভ আর কালো শক্তির খেলা চলছে, তার সাথে দামিনীর নিষ্পাপ, ভালোমানুষি শক্তির কোনো মিল নেই।

বিদ্যুৎ আর সনু যখন দামিনীকে নিয়ে অতিথি কক্ষের দিকে এগোচ্ছিলো, পতিমধ্যে পুরোহিতজি তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। দামিনীর কানে কানে পুরোহিতজির পরিচয় জানিয়ে দিলো বিদ্যুৎ। মাথা নত করে পুরোহিতজির পা স্পর্শ করলো বিদ্যুৎ। তিনি আশীর্বাদ করলেন তাকে। দামিনী ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে ওকে অনুসরণ করলো।

'না, না...বেটি, মেয়েরা কারো পা স্পর্শ করে না,' দামিনীকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন তিনি।

'কিন্তু কেন, পুরোহিতজি? বিদ্যুৎ যদি আপনার পা স্পর্শ করে আশীর্বাদ নিতে পারে তাহলে আমি কেন সে সুযোগ পাবো না?' মৃদু হেসে শ্রদ্ধাভরে জানতে চাইলো দামিনী। তাদের অজ পাড়াগাঁয়ের সামান্য ঐতিহ্যের প্রতি শহরের তীক্ষ্ণ মেধাবী মেয়েটির ভক্তি দেখে পুরোহিতজি এবং সনু উভয়েই মুগ্ধ হলো।

'আমার আশীর্বাদ তোমার জন্য সবর্দাই থাকবে বেটি। কিন্তু সনাতন এবং হিন্দু ধর্মমতে নারী হলো দেবীর প্রতিরূপ। আর দেবী কারো কাছে মাথা নোয়ান না। আমরা তার কাছে মাথা নত করি,' বললেন বৃদ্ধ পুরোহিত।

'অবিবাহিত মেয়েরা কারো পা স্পর্শ করে না। এমনকি তাদের বাবা-মায়েরটাও না। আমি তো এমনটা জানি, পুরোহিতজি,' বললো বিদ্যুৎ। 'কিন্তু তাহলে বিবাহিত নারীদের কেন বড়দের পা স্পর্শ করতে দেখা যায়?'

'প্রথমত, এ ধরনের কোনো নিয়ম নেই। হিন্দু ধর্ম ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। পা স্পর্শ করাটা প্রতীকি ব্যাপার। এটা কেবল বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা

জ্ঞাপনের একটা মাধ্যম। ঠিক যেমন পশ্চিমারা হাতের উপর চুমু খায় তেমন। যদি কোনো নারী বয়োজ্যেষ্ঠ কারো পা স্পর্শ করতে চায়, এটা তার ইচ্ছে। যদি সে এই প্রথা অনুসরণ না করতে চায়, এটাও তেমনি সম্পূর্ণ তার ইচ্ছে। ইচ্ছের এই স্বাধীনতাই কি আমাদের প্রাচীন ধর্মটাকে আলাদা করেনি, বিদ্যুৎ?' গর্বিত হেসে জিজ্ঞেস করলেন পুরোহিতজি।

'অবশ্যই, পুরোহিতজি,' শ্রদ্ধাভরে একমত প্রকাশ করলো দামিনী। 'তাহলে বিবাহিত আর অবিবাহিতের মধ্যে এই পার্থক্য কেন? কেন বিবাহিত নারীদের বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে মাথা নত করতে দেওয়া হচ্ছে আর কেনই বা অবিবাহিতদের নিষেধ করা হচ্ছে?'

হাসলেন পুরোহিতজি। আশীর্বাদ দেওয়ার ভঙ্গিতে একটা হাত দামিনীর মাথায় স্পর্শ করলেন। 'কারো বিয়ের সাথে দায়িত্ব আর সহযোগিতার ব্যাপারটাও আসে, বাছা। বিয়ের পর মেয়েরা তাদের স্বামীদের ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে। ঠিক যেভাবে তারা অন্যান্য দায়িত্বগুলো ভাগ করে নেয়। তারপরও এখানো কোনো বল প্রয়োগের ব্যাপার নেই। আমি যেমনটি বলেছিলাম, আমাদের ধর্ম পুরুষের আরো অনেক উপরে স্থান দিয়েছে নারীদের।'

'এটা আপনি কীভাবে বলেন, পুরোহিতজি? প্রথার নামে এখনো কি নারীরা অবদমিত হচ্ছে না?' জিজ্ঞেস করলো দামিনী। তার মনের মধ্যে থাকা সন্দেহগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারে এমন একজনকে পেয়ে রোমাঞ্চিত হলো সে। আলোচনাটা উপভোগ করছিলো বিদ্যুৎ। প্রকৃতপক্ষে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে সে-ই এটা আরম্ভ করেছিলো। দামিনী মনেপ্রাণে নিবেদিতপ্রাণ হিন্দু। তারপরও তার মনের মধ্যে থাকা সন্দেহ আর অবিশ্বাসগুলো দূর করার জন্য পুরোহিতজির চেয়ে ভালো কাউকে পাবে না সে।

দামিনীকে বাগানের পাশে একটা বেঞ্চের উপর বসার আমন্ত্রণ জানালেন পুরোহিতজি। দামিনীর ব্যাগ অতিথি কক্ষে নিয়ে গিয়ে তার থাকার বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সনু। পুরোহিতজি আর দামিনী মগ্ন হয়ে গভীর মমতা আর আগ্রহ নিয়ে আলাপ করে চলেছে বেঞ্চে বসে। নিঃশব্দে পাশে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ শুনছে তাদের আলোচনা।

'ধর্ম হলো মহান পরিষ্কারক, বেটি। আবার যে সকল আবর্জনা পরিষ্কার করতে চায়, তার কাছেই ধর্ম অসহায়,' পুরোহিতজি বললেন। 'আমাকে বলো তো, তুমি যদি এক টুকরো তুষারশুভ্র মসলিন দিয়ে পাতিলের কালো তলা পরিষ্কার করতে যাও, তাহলে কী ঘটবে?'

'কাপড়টাই নোংরা হয়ে যাবে, পুরোহিতজি,' দামিনী জবাব দিলো।

'ঠিক তাই। ধর্মের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সৃষ্টির শুরু থেকে এটা কালিমাবিহীন। তবে সময়ের আবর্তে অসৎ মানুষের পাল্লায় পড়ে এটা কলঙ্কিত

হয়েছে ধর্ম। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এবং রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ইচ্ছেমতো ভুল ব্যাখ্যা করেছে। নারীদের শোষণ করা হিন্দু ধর্মে একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। এই ব্যাপারটাই দেখো, ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক জীবনে প্রিয় সবকিছুকে আমরা দেবী বলে পূজা করি। দেবতা বলে নয়। মা লক্ষ্মীর মাধ্যমে ধনসম্পদের পূজা করা হয়, কালির মধ্য দিয়ে বীরত্ব, মা অন্নপূর্ণার মাধ্যমে ভরণ-পোষণের পূজা করা হয় আর মা সরস্বতীর মাধ্যমে করা হয় জ্ঞান আর শিক্ষার পূজা। শুধু কি তাই, দৈনন্দিন ভালো থাকার জন্য সাহস প্রার্থনা করা হয় যথাক্রমে মা সীতা আর মা দুর্গার কাছে।'

সতর্কভাবে শুনছিলো দামিনী। পুরোহিতজি যা বলেছেন তার অনেক কিছুই জানে সে, তবে তার বিশ্বাস আর সততা অনবদ্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এমন আলোচনা শুনতে পারে। পুরোহিতজিকে বেশ ছন্দে মনে হচ্ছে। তিনি চাচ্ছিলেন প্রতিটা পার্থক্য সতর্কতার সাথে বুঝে নিক দামিনী।

'এখানেই শেষ নয়। কোনো ধর্মে কি দেখেছ স্ত্রী ছাড়া ঈশ্বর অপূর্ণ? সম্ভবত না। কেবল সনাতন ধর্মেই প্রভু রামের সাথে তার স্ত্রী মা সীতাকেও পূজা করা হয়। প্রিয়তমা রাধাকে ছাড়া কৃষ্ণের পূজা করি না আমরা, পার্বতী ব্যতীত প্রভু শিবের পূজাও না। তাহলে সুস্থ মস্তিষ্কে কীভাবে একজন বলতে পারে যে সীমাহীন শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে হিন্দু ধর্মে?'

সমঅধিকার সম্পর্কে পুরোহিতজির ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হলো দামিনী। উল্লিখিত দেব-দেবী সম্পর্কে জানা আছে তার। তবে পুরোহিতজি তাদের সম্পর্কে এমন কিছু তুলে ধরেছেন যা সে জানতো না। প্রায় সব ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করেছে সে। সব ধর্মেই পুরুষ ঈশ্বরের আধিপত্যকারী। হিন্দুত্ববাদই কেবল ব্যতিক্রম।

'আর ভুলে যেও না, দামিনী, হিন্দু ধর্ম কেবল নারীদের জন্য সমঅধিকার নিশ্চিতই করেনি, পুরুষকেও তাদের আজ্ঞাবহ করেছে। যাতে তারা নারীদের পাশে থেকে তাদের সুরক্ষা দিতে পারে। একনিষ্ঠ স্ত্রী সতীর আত্মত্যাগের প্রতিশোধ নিতেই প্রভু শিব তার তাণ্ডব-নৃত্য রূপ ধারণ করেছিলেন। প্রিয়তমা স্ত্রী সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাক্ষসরাজ রাবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রভু রাম। দামিনী বেটি, আমাদের ধর্মের কেন্দ্রে নারী রূপে, দেবী রূপে এবং শক্তি রূপে রয়েছে নারীরা।'

দামিনীর হৃদয় ছুঁয়ে গেল কথাগুলো। বুঝতে পারছে মিডিয়ার ফাঁদা গল্প আর মিথ্যে প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়েছিলো সে। গভীরে গিয়ে উপলব্ধি না করেই মহান ধর্মকে দোষারোপ করছিলো এতদিন। পুরোহিতজি যা বর্ণনা করেছেন তার প্রায় সবকিছুই জানে সে, তবে তিনি যেভাবে উপস্থাপন করেছেন এভাবে কখনোই উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি। মিছেই সে এই মহান ধর্মটাকে দোষারোপ করছিলো

এতক্ষণ। অন্যান্য ধর্মে যেখানে জোর করে দখল করে রক্তপাতের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানে এই ধর্ম সম্ভবত জ্ঞানের এক বাতিঘর।

'হিন্দুত্ববাদের জন্ম হয়েছে হাজার হাজার বছর আগে যখন কোনো পরিচিত ধর্ম ছিলো না, বেটি। আমরা কারো সাথে প্রতিযোগিতায় যাইনি। আমরা কোনো সুদূরে গিয়ে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিনি। ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করার জন্য কারো মাথায় তরবারি ধরিনি আমরা। কারণ আমাদের কোনো আমার বা তোমার প্রভু নেই। সব ঈশ্বরই আমাদের ঈশ্বর, মহাশক্তিশালী একজন। এবং দশ হাজার বছর পরেও আমরা আজও আছি, এখানেই আছি,' মৃদু হেসে শেষ করলেন পুরোহিতজি। ব্যাপারটা নিয়ে পরিষ্কার আবেগতাড়িত তিনি।

এখানে পৃথিবীর অন্যতম প্রাগৈতিহাসিক নগরে দেব-রাক্ষস মঠের কেন্দ্রে বসে দামিনী একটা দিক প্রত্যক্ষ করলো যা সে আগে কখনো করেনি। সনাতন বা হিন্দু ধর্ম কোনো রায় দেয়নি, কোনো শর্ত আরোপ করেনি। কাউকে বলেনি কী পড়বে বা কখন প্রার্থনা করবে। এটা তথাকথিত কিছু পবিত্র মানুষের দ্বারা রচিত ভয়ংকর কোনো সামরিক আইন নয়। এ এক মহিমান্বিত জীবন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা প্রত্যেকের একান্ত নিজস্ব।

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ

হরপ্পার প্রথম রাজা

বাড়ি থেকে বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছিলেন চন্দ্রধর। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তলোয়ারটা খাপে পুরে নিলেন। এখন সময় অন্ধকার। তিনি জানেন না তার জন্য বা অন্যদের জন্য সামনে কী অপেক্ষা করে আছে। নিজের কোনো দেহরক্ষীর উপর ভরসা করতে পারছেন না তিনি। তারা সকলেই উন্মাদের মতো ব্যবহার করছে। বিষাক্ত পানিতে হরপ্পায় একমাত্র প্রিয়ংবদা, তার বিশ্বস্ত সব পরিচারিকা, ধূর্ত রাঙা আর তার বাছাইকৃত সাগরেদদের কোনো ক্ষতি হয়নি। আর অবশ্যই পণ্ডিত চন্দ্রধর, যাকে নির্মম ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিষাক্ত পানীয় থেকে দূরে রেখেছেন তার স্ত্রী। আসন্ন পরিস্থিতিতে তাকে পুরোপুরি সুস্থ চায় সে।

চন্দ্রধর বেরোবেন, এমন সময় প্রিয়ংবদা কক্ষে প্রবেশ করলো। এবার ভিন্ন রূপে। বিষন্ন তবু আকর্ষণীয়।

'আমি ভুলটা কী করেছি, চন্দ্র?' অমানুষের মতো জানতে চাইলো সে।

চন্দ্রধর বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি কী শুনেছেন। পরিষ্কার অবিশ্বাস নিয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন তিনি। 'তুমি সত্যিই মনে করো যে যা করেছ তা ভুল নয়, প্রিয়ংবদা?'

'ঠিক আছে, আমি জানি যে একজন মহিলা তার জীবন হারিয়েছে। কিন্তু তোমার নেতৃত্বে এই মহান রাজ্যের একটা ভালো ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য এ ত্যাগটুকু কি আমরা মেনে নিতে পারি না?'

'হরপ্পা কোনো একক রাজ্য নয়, প্রিয়ংবদা!' চিৎকার করে উঠলেন চন্দ্রধর।

'শীঘ্রই তাই হবে, চন্দ্র। তুমি দেখতে পাচ্ছো না? তুমি হবে হরপ্পার প্রথম রাজা।' স্বামীর আরো কাছে হেঁটে গেল প্রিয়ংবদা। প্রলুব্ধকর উচ্চবিলাসী চোখে তার মুখের দিকে তাকালো। 'আর আমি হবো তোমার রানি! আমরা আমাদের নিজের মতো করে এই সমৃদ্ধ অঞ্চল শাসন করবো। তারপর আমাদের সন্তানেরা, এবং তারপর তাদের সন্তানেরা...'

'আমাদের কোনো সন্তান নেই, প্রিয়ংবদা!' চিৎকার করে তাকে বাধা দিলেন চন্দ্রধর। নীরবতা নেমে এলো কক্ষের ভেতরে।

প্রিয়ংবদার মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেছে। মনে হয় যেন গোখরা সাপে কামড়েছে।

'চোখ খুলে বাস্তবতাটাকে স্বীকার করো, প্রিয়তমা। আমরা নিঃসন্তান এবং ভাগ্যকে আমাদের মেনে নিতেই হবে!' গভীর মমতায় বললেন চন্দ্রধর। সম্পূর্ণ সচেতন যে তিনি স্ত্রীর সবচেয়ে ভয়ংকর ক্ষতে আঘাত দিয়েছেন।

প্রিয়ংবদা এখন ঘৃণায় কাঁপছে। চোখ থেকে ঝরছে বিষাক্ত অশ্রু।

তাকে ধরতে চেষ্টা করলেন চন্দ্রধর। তবে সে দূরে সরে গেল। তিনি দেখতে পাচ্ছেন তার স্ত্রী আবারও ডাইনিতে পরিণত হচ্ছে। যতবারই তাকে তার নিষ্ফল গর্ভের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়, ততবার সে আরো হিংস্র দানবে পরিণত হয়।

'আমি ওর ছেলেকে খুন করবো!' চিৎকার করলো প্রিয়ংবদা। 'একটা ছেলে আছে বলে ঐ ডাইনি সাঞ্জনা মনে করে সে রানি হবে? আমি ওদের দুজনকেই খুন করবো।'

চন্দ্রধর বুঝতে পারছেন তিনি বিশাল বড় ভুল করে ফেলেছেন। স্ত্রীর ভেতরের অশুভ শক্তিকে তিনি বড় অসময়ে জাগিয়ে তুলেছেন। তার ঘৃণা আর রাগ সামলানোটা বেশ কঠিন হবে এখন।

'আমার বোন আর ভাগ্নে সম্পর্কে কথা বলছো তুমি, প্রিয়ংবদা। সাবধান!'

চন্দ্রধরের দিকে ছুটে এলো প্রিয়ংবদা। লম্বা, ধারালো নখরে খামচে ধরলো তার মুখ আর বুক। 'তুমিও আমাকে তোমার রানি হবার যোগ্য মনে করো না কারণ আমি তোমাকে কোনো উত্তরাধিকারী দিতে পারিনি, তাই না, পণ্ডিত চন্দ্রধর?'

'কথা সত্যি না, প্রিয়ংবদা। তুমি জানো, পৃথিবীর যে-কারো এবং যেকোনো কিছুর চেয়ে তোমাকে অধিক ভালোবাসি আমি,' বললেন চন্দ্রধর।

'তাহলে আমি যা বলছি তা করো। বিচার বইতে সিলমোহরটা মেরে দাও। দেবতাকে মরতে দাও কুকুরের মতো!' প্রলাপের মতো বলে চলেছে প্রিয়ংবদা।

'তুমি ভালো করেই জানো আমি তা করতে পারবো না। বিভাষণ পূজারি নির্দোষ। সে আমার বন্ধু এবং আমার বোন জামাই। আর আমি কীভাবে ভুলে

যাবো যে সে আমার জীবন রক্ষা করেছিলো? বিতাষণ পূজারির উপহার দেওয়া জীবন নিয়ে আমি এখানে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।'

পেছনে মাথা হেলিয়ে পাগলের মতো হাসতে লাগলো প্রিয়ংবদা। তার মাথাটা এপাশ থেকে ওপাশে দুলছে। হঠাৎ থেমে গেল সে এবং স্বামীর উদ্দেশে গর্জন করে উঠলো, 'তুমি এত নির্বোধ, বুড়ো ভাম! দেবতা তোমাকে রক্ষা করেছিলেন বাকি জীবনটা গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য।'

'খুন করো তাকে,' এখন সে ফিসফিস করছে, যেন কেউ শুনে ফেলবে। 'মেরে ফেলো ঐ দেবতাকে। তার সুদর্শন ছেলেটাকেও মারো। মারো তার স্ত্রীকে। আমাকে এই রাজ্যের রানি করো।' তার ভূতগ্রস্ত অভিব্যক্তি এমন যেন সে কোনো মহান পরিকল্পনা এইমাত্র প্রকাশ করলো।

কক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন চন্দ্রধর। তিনি জানেন এই অবস্থায় স্ত্রীর সাথে কথা বলে কোনো লাভ নেই। তার নির্মম পরিকল্পনায় তিনি যতটা রাগান্বিত, তার মনের গভীরে থাকা যন্ত্রণায় ততটাই সমব্যথী তিনি। তাকে নিঃসন্তান দেখাটা চন্দ্রধরের জীবনের সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা প্রশমিত করতে গিয়ে প্রিয়ংবদার অনেক অন্যায় আচরণকে প্রশয় দিয়েছেন তিনি। মাঝে মাঝে তিনি বুঝতে পারেন না যে সীমারেখাটা কোথায় টানতে হবে। ঘোড়া আরোহণ করতে যাবেন, এমন সময় অন্তঃপুর থেকে একজন পরিচারিকা দৌড়ে এলো।

'প্রভু, দয়া করে থামুন। দয়া করে থামুন!' আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে চিৎকার করে এতটুকুই কেবল বলতে পারছে সে।

'শান্ত হও। আমাকে বলো কী হয়েছে!' বললেন চন্দ্রধর।

'মালকিন প্রিয়ংবদা...তিনি...তিনি...'

পরিচারিকা কথা শেষ করার আগেই খাসকামরার দিকে রওয়ানা দিয়েছেন চন্দ্রধর। তিনি জানেন কী ঘটেছে। এই প্রথমবারই এমন হলো তা নয়।

শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন, জানালায় হেলান দিয়ে বসে আছে প্রিয়ংবদা, চুলগুলো এলোমেলো। উর্ধাঙ্গের বস্ত্র মাটিতে লুটাচ্ছে। অক্ষিকোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ এবং অশ্রু গড়াচ্ছে গন্ডদেশ বেয়ে। তার হাতের কবজি কাটা। এক পুকুর রক্তের উপর বসে আছে সে।

'এ কী করেছ তুমি, প্রিয়তমা?' চিৎকার করে উঠলেন চন্দ্রধর। নিজের অঙ্গবস্ত্রম ছিড়ে প্রিয়তমা স্ত্রীর রক্তাক্ত কবজি ব্যান্ডেজ করে দিলেন তিনি।

'বেঁধো না, পণ্ডিত চন্দ্রধর,' মৃদু কণ্ঠে বলে উঠলো প্রিয়ংবদা। 'আমি আবার কেটে ফেলবো ওগুলো। আমার যদি সন্তান না হয়...আমার স্বামীকে যদি একজন রাজা হিসেবে না দেখতে পারি...তাহলে বেঁচে থেকে কী লাভ?'

তার ক্রন্দনরত মুখ আর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে বিবর্ণ দেহাবয়বের দিকে তাকালেন চন্দ্রধর। তিনি জানেন এবারকার মতো যদিও তার রক্ত বন্ধ করতে

সক্ষম হন, আবারও একই কাজ করবে প্রিয়ংবদা। একরোখা সে এবং এটা তার মোক্ষম অস্ত্র। তিনি আর কোনো পথ খোলা দেখতে পাচ্ছেন না।

'বেছে নেওয়ার সময় হয়েছে, চন্দ্র,' দুর্বল হেসে বললো প্রিয়ংবদা। 'ওরা নাকি আমি?'

চন্দ্রধর ধীরে ধীরে প্রিয়তমা স্ত্রীর কোলে মাথা রাখলেন। সারা মুখে রক্ত লেগে গেলেও তার রক্তাক্ত হাতে উপর্যুপরি চুমু খেয়ে যাচ্ছেন তিনি। ব্যথা আর অসহায়ত্বের অশ্রুতে ভরে উঠেছে তার চোখও।

'তুমি, প্রিয়ংবদা...আমি তোমাকেই বেছে নিলাম।'

বানারস, ২০১৭

অর্ধাঙ্গী

মঠের কাছেই একটা সাশ্রয়ী তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তিব্বতি ফুড জয়েন্টে বসে আছে বিদ্যুৎ আর দামিনী। এটা ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলোর একটি। বৈশ্বিক আধ্যাত্মবাদীদের স্বর্গ। সেই সাথে রসনা আর পানীয় প্রিয়দের উৎসবস্থল।

রুমি পেরেরা নামে পরিচয় দেওয়া লোকটির অতি সূক্ষ্ম গুপ্তহত্যা প্রচেষ্টার পর দেবতাকে আশ্রমের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

তবে বিদ্যুৎকে বাইরে যেতেই হবে। অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও। রুমি এবং তার সাথে যেই থাকুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রার প্রতি-আক্রমণ হানার আগে দামিনীকে সবকিছু খুলে বলতে হবে। তার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অদ্ভুত কিন্তু চরম বাস্তবতা সম্পর্কে খুলে বলতে হবে তাকে। সেই সাথে অবশ্যই তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও।

ঠান্ডা বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে দামিনীর অসন্তোষ সত্ত্বেও আবারও সিগারেট ধরিয়েছে বিদ্যুৎ। দুই টেবিল পরেই বালার সাথে বসে আছে সনু। তার হাতে বিয়ারের দ্বিতীয় গ্লাস। সে গোপনে বালার কাছে স্বীকার করেছে যে এর আগে কোনোদিন মদ্যপান করেনি। তবে জিনিসটা একটু চেখে দেখতে চায়। সনু যতটা না অকুতোভয় সন্ন্যাসী-যোদ্ধা, ততটাই সে যুবক ছেলে যে কিনা জীবনে কিছু উদ্ভট কাজ করে দেখতে চায়। প্রচুর মদ্যপান করলেও প্রাক্তন সামরিক সদস্য বালা শারীরিকভাবে সানন্দে অনুরোধ রক্ষা করলো। একটু পরপর ঘুরে সনুর দিকে ফিরে

হাসছে বা চোখ টিপছে বিদ্যুৎ। আশ্রমের তরুণ তুর্কিকে অন্তত একটা নিয়ম ভঙ্গ করতে দেখে খুশি হলো সে! সেই সাথে এটাও জানে যে বালা সাথে থাকায় তার কোনো চিন্তা নেই। সনুকে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে দেবে না তার প্রাক্তন সৈনিক বন্ধুটি। নতুন পাওয়া স্বাধীনতাটি প্রাণভরে উপভোগ করছে সনু। তবে নিজের দায়িত্বের কথা একটুও ভুলে যায়নি সে। একটু পরপর তার হাত চলে যাচ্ছে কোমরে গোঁজা ভয়ংকর কোল্ট .৩৮০ মাসট্যাং-এর কাছে।

সনু ছাড়াও আশ্রমের আরো চারজন যোদ্ধা ছায়ার মতো বিদ্যুৎ আর দামিনীর দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করছে। বিদ্যুতের ক্ষতি করতে চায় এমন কোনো কিছুর সামান্য আভাস পেলেও শত্রুকে কোনো সুযোগ দেবে না তারা। যত বড় শক্তিই হোক না কেন, দেবতার ক্ষতি করার আগেই থামিয়ে দেবে তাকে।

'তোমার ডিম সামগুলো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, সুইটি,' বললো বিদ্যুৎ। 'এগুলো তো তোমার প্রিয় খাবার, বাবু। আর জায়গাটাও ঠিক যেন তিব্বত।'

বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে আছে দামিনী। তার বিশ্বাস হচ্ছে না এত কিছু ব্যাখ্যা করার পর বিদ্যুৎ বাষ্পায়িত চিকেন ডিম সাম নিয়ে কথা বলছে এখন। এখন আর তার কথা শুনছে না সে। হয় তার বয়ফ্রেন্ড পাগল হয়ে গেছে নয়তো অশুভ কিছু একটা নিজেকে মেলে ধরছে। কে এই বিভাষণ পূজারি? কেনই বা তাকে এত পরিচিত মনে হচ্ছে? রহস্যময় নামগুলো শুনে কেন কান্না পাচ্ছে তার? চন্দ্রধর নামটাও বিরক্ত করছে তাকে। জেনারেল আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম কে ছিলেন? ব্রাহ্মিণাবাদ ধ্বংসকারী ব্রান্টন ভ্রাতৃদ্বয় ব্রিটিশ দুজন কে? জায়গাটার নামই বা ব্রাহ্মিণাবাদ কেন? রেললাইনের নিচে বসানোর জন্য প্রাগৈতিহাসিক একটা শহরের ধ্বংসাবশেষ উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা কী সত্যি সত্যি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ব্রিটিশরাজ জানতো না? সবচেয়ে ভয়ংকর হলো, পুরোহিত রাজার মূর্তি সম্পর্কে বিদ্যুৎকে বলার সময় মহান দ্বারকা শাস্ত্রী কী বুঝিয়েছেন? দামিনী সব সময় জানতো যে তার বয়ফ্রেন্ডের মধ্যে রহস্যময় এবং অসাধারণ কিছু একটা রয়েছে। তবে সেটা যে এতটা জটিল আর অবাস্তব কিছু একটায় রূপ নেবে, সে ব্যাপারে কোনো ধারণা ছিলো না তার।

'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না...' দীর্ঘ বিরতির পর বললো দামিনী। 'আমি অন্য কোনো কিছু জানতে চাওয়ার আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও। তোমার পরদাদা কি সত্যি সত্যি জাদুটোনা করতে পারেন, অশরীরী আত্মাদের হাজির করতে পারেন এবং ভূত-প্রেত তাড়াতে পারেন?'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসলো বিদ্যুৎ। 'আমরা এখানকার সবাই এ সবকিছু করতে পারি।'

হতবাক হয়ে গেল দামিনী। ও কী বললো এইমাত্র? আর যে নির্বিকার ভঙ্গিতে সে কথাগুলো বললো সেটা তো আরো বেশি বিস্ময়কর।

'দুঃখিত...এইমাত্র আমি যা শুনলাম সে কথাগুলো কি তুমিই বলেছ? আমি বলতে চাচ্ছি...তুমিও কি *আমরা সবাই*-এর অন্তর্ভুক্ত?' জানতে চাইলো দামিনী। জাদুটোনা, ভূত-প্রেত, অশরীরী আত্মা আর পাতাল সম্পর্কে বিদ্যুতের এমন সহজ কথাবার্তায় বেশ মজা পাচ্ছে সে। বিয়ারের ক্যানটা তুলে পরীক্ষা করে দেখলো কোন ব্র্যান্ডের এটা। আশা করছে অ্যালকোহলের প্রভাবে এমন কথাবার্তা বলছে সে। তার ক্ষমতাবান সুপরিচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা কোম্পানির প্রধান বন্ধুটি এখন একজন রহস্যময় জাদুকরের মতো কথা বলছে।

বিয়ারের চতুর্থ পাঁইট তুলে নিয়ে লম্বা এক চুমুকে অর্ধেক খালি করে ফেললো সে। তার উলটো পাশে সামনে বসে আছে দামিনী। বিদ্যুতের মদ্যপান আর ধূমপান নিয়ে উদ্বিগ্ন। তাকে বাধা দিলো না সে। জানে দৃঢ়চেতা ঐ মুখের আড়ালে তার স্নায়ুগুলোও উত্তেজিত হয়ে আছে। অন্ততপক্ষে গত দুদিন ধরে এতকিছু উদ্‌ঘাটনের পর। ব্যাপারটা সে অবচেতন মনে পছন্দও করে। মাতাল হলে বিদ্যুৎ যেন এক কামুক জাদুকর হয়ে যায়। সে সত্যিই দেবতা নাকি অন্য কিছু, জানা নেই তার। বুঝতে পারছে আপনমনে হাসছে সে। এক মুহূর্তের জন্য ভাবনাগুলো ঝেড়ে ফেললো সে। এই ছেলেটাকে সে চায়। সারা জীবনের জন্য।

স্বপ্নরাজ্য থেকে ফিরে দামিনী বুঝতে পারলো সমস্যাটা আসলেই জটিল।

'আসলে কেন ব্রান্টন ভ্রাতৃদ্বয় কেন ব্রাহ্মিণাবাদ ধ্বংস করেছিলেন, বিদ্যুৎ?' জিজ্ঞেস করলো দামিনী।

'ব্যাপারটা সহজ, দামিনী। একটা প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার চিহ্ন মুছে ফেলতে চাইছিলো তারা,' জবাবে বললো বিদ্যুৎ। 'নুড়িপাথর হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে তারা নিশ্চিত করেছিলো আর কোনোদিন যেন এটা আবিষ্কৃত না হয়। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, দামিনী? কিছু একটা খুঁজছিলো তারা! যখন সেটা খুঁজে পেল না, তারা নিশ্চিত করলো সেটা যেন আর কারো হাতে না পড়ে।'

'ওয়াও!' ঢোক গিললো দামিনী। 'সবকিছুই কেমন যেন পাগলামি মনে হচ্ছে।'

'সত্যকে মুছে ফেলার জন্য গৃহিত পদক্ষেপগুলোর একটা মাত্র। তুমি কি জানো জন আর উইলিয়াম ব্রান্টন যখন লাহোর আর করাচির রেলওয়ে লাইনের নিচে শহরের ইটগুলো বিছিয়ে দিচ্ছিলো, সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল আলেকজান্ডার কানিংহাম–যার জন্য পরবর্তীতে তাকে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব নর্থ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জেনারেল পদে পুরস্কৃত করা হয়?'

'বলো কী! যে নীরবে একটা প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে প্রত্যক্ষ করলো, তাকেই কিনা তেমন সেই বিভাগের প্রধান বানানো হলো?'

'কীভাবে বুঝলে তিনি শুধুই একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, দামিনী? কীভাবে আমরা বুঝবো যে ১৮৫৬ সালে ব্রাহ্মিণাবাদে তিনি কেবল *দেখেননি*, সবকিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যাপারে তদারকিও করেছিলেন। আর ঠিক এ জন্যই তাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে,' জবাব দিলো বিদ্যুৎ।

দামিনী শুনছে। তার মুখটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে।

'এর অর্ধ শতাব্দী পরে হরপ্পার শহরগুলিকে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিলো। দুই প্রজন্ম হয়ে গেল ব্রাহ্মিণাবাদের কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে। তারপর শুরু হলো নতুন এক অভিযান। ১৯২১ সালে তাকে নতুনভাবে নামকরণ করা হলো।'

'কিন্তু কী এমন সত্য যা তারা মাটিচাপা দিতে চেয়েছিলো?' জানতে চাইলো দামিনী।

হাসলো বিদ্যুৎ। তুমি এখনো বুঝতে পারোনি, দামিনী?' জিজ্ঞেস করলো সে।

তার অসাধারণ বুদ্ধিমতী বান্ধবীটি মাথা নাড়লো।

'উপমহাদেশে তাদের রাজকীয় আগ্রাসনকে বৈধ করার জন্য। ব্রিটিশদের প্রমাণ করা দরকার ছিলো যে ভারতীয়রা নিচু জাতি–সংকর বর্ণের আধা উপজাতি ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিম থেকে আগত নীল চোখের, সাদা চামড়ার উন্নত জাতি এসে তাদের শুদ্ধ এবং সভ্য করেছিলো। ভারতীয়দের চেতনা পঙ্গু করে দিতে এটা ছিলো একটা নিখুঁত মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। এবং সেই সাথে ওরা ভারতীয়দের এটাও বিশ্বাস করাতে চাইছিলো যে পশ্চিমা সাদাদের আধিপত্য ছিলো অবধারিত এবং স্বর্গীয়।'

'আমি পুরোপুরি বুঝতে পারিনি, বিদ্যুৎ,' জানালো দামিনী। এখন সে বিদ্যুতের প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে।

'তুমি কি মনে করো যে মাত্র অল্প কয়েক হাজার ব্রিটিশ অফিসার আর সৈন্য মিলে কোটি মানুষের পুরো উপমহাদেশকে বিজয় করে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলো? তোমার কি মনে হয় এর কারণ কেবলই সামরিক শক্তি?' জানতে চাইলো বিদ্যুৎ।

'সামরিক শক্তি, উন্নত অর্থনৈতিক শক্তি, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, সুশৃঙ্খল আমলাতন্ত্র...' কাঁধ ঝাকিয়ে দ্রুত যোগ করলো দামিনী।

'হ্যাঁ, দামিনী, এই সুবিধাগুলো তারা ভোগ করেছে। তবে এর কোনোটাই সুনির্দিষ্ট ভাগ্য নিয়ন্ত্রক ছিলো না। তাদের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র ছিলো অন্য কিছু। এটা ছিলো মনস্তাত্ত্বিক সাম্রাজ্যবাদ। তারা কেবল ভারতের ভূমি, সম্পদ আর রাজনীতিকেই দমন করেনি। ভারতীয়দের আত্মবিশ্বাস গুঁড়িয়ে দিয়ে নতি স্বীকার করতে বাধ্য করে তারা। *কুকুর এবং ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নেই*–এ ধরনের

সাইনবোর্ড বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও ব্রিটিশ ক্লাব আর অফিসারদের মেসের বাইরে হরহামেশাই দেখা যেত। এ সবকিছুর উদ্দেশ্য কী, দামিনী? সাইনবোর্ড টানিয়ে কি তারা সত্যি সত্যি কুকুরকে দূরে রাখতে চেয়েছিলো? নাকি ভারতীয়দের মনস্তত্ত্বে এটা ছিলো তাদের সুচিন্তিত আঘাত?' জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ।

গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে দামিনী। দিঘল কালো, সুন্দর চুলে আনমনে খেলা করে চলেছে তার আঙুল।

'ব্রিটিশরা জানতো কেবল বন্দুকের জোরে তিনশো মিলিয়ন মানুষকে দাস বানিয়ে রাখতে পারবে না। এটা করার একটা পথই খোলা ছিলো, আর সেটা হলো তাদের মনোবল গুঁড়িয়ে দেওয়া। আর এই পরিকল্পিত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিলো ব্রাহ্মিণাবাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে। তবে এ-ই শেষ নয়, দামিনী। ভারতের উপরে ব্রিটিশ আধিপত্যের চেয়েও আরো অন্ধকার এই ষড়যন্ত্র।'

আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটের দিকে মনোযোগ নেই বিদ্যুতের। গভীর ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। এটা জ্বালানোর পর আর কোনো টান দেয়নি সে। দামিনী নার্ভাস বোধ করছে। তাকে জানতে হবে এর সাথে বিদ্যুতের সম্পর্ক কোথায়।

'ষড়যন্ত্র বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছো, বিদ্যুৎ? অনুগ্রহ করে একটু ব্যাখ্যা সহকারে ব্যাপারটা পরিষ্কার করো,' অনুনয়ের সুরে বললো দামিনী।

'এ সবকিছুর শুরু হয়েছিলো এক হাজার পাঁচশত বছর আগে। কন্সট্যান্টিনোপলের এক মধ্যযুগীয় শহরে। একটা নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসের লোকজন নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলো যে সবাইকে শাসন করবে তারা...চিরকাল ধরে।'

আবারও কথা বলার আগে কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামলো বিদ্যুৎ। সম্মোহিতের মতো মনে হচ্ছে তাকে। যেন অন্য কোনো জগৎ, অন্য কোনো অতীত সময় থেকে কথা বলছে ও।

'আর তারপর মৃতপ্রায় সপ্তর্ষিদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সব ঘটনা ঘটতে লাগলো,' বললো সে।

॥ ॥

বিয়ারে এক চুমুক দিলো বিদ্যুৎ। গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখতে গিয়ে লক্ষ করলো দামিনী কেমন যেন চুপসে গেছে। সাথে সাথেই সে বুঝতে পারলো এক দিনের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে।

'চলো যাওয়া যাক। ইতোমধ্যে অনেক দেরি করে ফেলেছি আমরা,' দামিনীকে বললো সে। একজন ওয়েটারকে ইশারা করলো বিল নিয়ে যেতে। সনু আর বালার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো যে যাওয়ার সময় হয়েছে।

'নাআআআআ...' প্রতিবাদ করলো দামিনী। 'এখন তুমি কীভাবে থেমে যাওয়ার কথা ভাবছো, বিদ্যুৎ? আমি সবকিছু জানতে চাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ...তোমাকে তো সবকিছু জানতে হবেই, দামিনী,' জবাবে বললো বিদ্যুৎ। 'তবে সবচেয়ে ভালো হয় তুমি যদি বাকিটুকু সরাসরি বাবার কাছ থেকে শোনো।'

'বাবা? তুমি বলতে চাচ্ছো মহান দ্বারকা শাস্ত্রীজি?' মঠাধ্যক্ষের কথা শুনে পরিষ্কার সমীহের সুরে জিজ্ঞেস করলো দামিনী।

'হ্যাঁ, দামিনী,' আকণ্ঠ হেসে জবাব দিলো বিদ্যুৎ।

'না...না...তার সাথে দেখা করতে ভয় লাগে আমার। আর...তুমি আসলেই তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে আমার?' চোখ বড় বড় করে জানতে চাইলো দামিনী। মনে মনে উৎফুল্ল বোধ করছে এই ভেবে যে বিদ্যুৎ তার একমাত্র পরিবারের সদস্যের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেবে।

'তিনি তোমার কথা জানতে চেয়েছেন। তিনি আমাকে আমার অর্ধাঙ্গীকে সাথে করে নিয়ে যেতে বলেছেন,' জবাবে জানালো বিদ্যুৎ। দামিনীর চোখের গভীরে তাকিয়ে পাগল করা হাসি হাসলো সে।

দামিনীর চোখ জলে ভরে এলো। একটু পর বিদ্যুতের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলো সে। 'আই লাভ ইউ, বিদ্যুৎ।'

'আই লাভ ইউ ঠু, দামিনী।'

একে অপরের হাত ধরে সেখানে বসে রইলো তারা। হারিয়ে গেছে দুজন দুজনায়।

স্বর্গীয় একটা বা দুটো মিনিট কেটে গেল। অবশেষে একজন ওয়েটার এসে বাধ সাধলো। বিলের স্লিপ এনে বিদ্যুতের সামনে টেবিলে রাখলো সে। দুজনে হেসে উঠলো একসাথে।

'দেরি হয়ে গেছে। চলো এবার বেরোনো যাক,' দুহাজার রুপি বিল পরিশোধ করে বললো বিদ্যুৎ। কিছু একটা চোখে পড়লো তার।

খাবারের বিলটার সাথে আরো একটা চিরকুট রয়েছে। গোটা গোটা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা একটা নোট।

আগামীকাল সন্ধ্যা ৭:০০ টা, গঙ্গা আরতি।

আপনার বিশ্বস্ত,

রুমি

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ

মৃত্যুকূপ

তীব্র দুর্গন্ধে জেগে উঠলেন বিভাষণ পূজারি। চোখ খুলে কেবল রুক্ষ, কালো পাথরের দেয়ালের উপর থেকে আসা মৃদু আলোর রেখা দেখতে পেলেন তিনি। তার মাথার ক্ষতটা এখনো তাজা এবং খালি পিঠের নিচে ঠান্ডা আর ভেজা দেয়ালের অস্তিত্ব টের পেলেন তিনি। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন তিনি। কটু দুর্গন্ধময় বাতাসটা অসহ্য।

উঠে বসে চারপাশে তাকিয়ে কোথায় আছেন বুঝতে পারলেন না তিনি। তার দৃষ্টি এখনো ঝাপসা হয়ে আছে। ঠোঁটদুটো যেন ক্যাকটাসের কাঁটায় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে সারা দিন ধরে কোনো পানি পান করেননি তিনি। ঘুরতেই দেখতে পেলেন যে জায়গাটায় তাকে আটকে রাখা হয়েছে একটা ভারী কাঠের দরজা দিয়ে বন্ধ সেটা। নিজের রক্ত শুকিয়ে তার কানগুলো বন্ধ হয়ে আছে। তারপর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের দূরবর্তী চিৎকারের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। জায়গাটার নারকীয় গন্ধে বমি আসতে চাইছে তার।

ধীরে ধীরে চেতনা আর স্মৃতি ফিরে পাচ্ছেন দেবতা। বুঝতে পারলেন ভেজা, পিচ্ছিল মাটিতে পড়ে আছে তার হাতদুটো। তাদের একটা উঠিয়ে দেখতে পেলেন বাদামি ময়লায় ভরে আছে হাতের তালু। পুরু, দুর্ভেদ্য দেয়াল ভেদ করে ভেসে আসছে মানুষের আর্তচিৎকার। বিভাষণ পূজারি বুঝতে পারলেন বাতাসে ভেসে থাকা কটু গন্ধের চেয়ে আরো নোংরা কিছুতে ঠেকে আছে তার হাত।

আশপাশটা আরো ভালোভাবে দেখার জন্য মাথা ঝাঁকালেন দেবতা। দুর্গন্ধময় বাতাসে অসুস্থ বোধ করছেন তিনি। চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি চিনতে পারলেন গর্তটা মানুষের পচা মাংস, রক্ত আর ঘামের ভয়ংকর মিশ্রণ। বুঝতে পেরে সাথে সাথে বমি হয়ে গেল তার। পেটের ভেতর থেকে কেবল রক্ত বেরিয়ে এলো বমির সাথে। প্রায় দুই দিন হয়ে গেল কিছু খাননি বা পান করেননি তিনি। লক্ষ করলেন তিনি যেখানে বসে আছেন সে জায়গায় বইছে মানব রক্ত আর বিষ্ঠা। সাথে সাথেই বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মনে পড়ে গেল কোথায় আছেন। তবে এটা বিশ্বাস করতে চাইলেন না তিনি। পাগলের মতো উঠে ভারী দরজাটা খোলার চেষ্টা করলেন তিনি। বন্ধ সেটা। দেয়ালের উপরে টিমটিম করে জ্বলতে থাকা প্রদীপ থেকে কেবল সামান্য আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বিভাষণ পূজারি উঠে দেখলেন একটা চৌকির সমান মাটির কুঠুরিতে আবদ্ধ হয়ে আছেন তিনি। মৃত্যু আর ক্ষতের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। বাসিন্দাদের চিৎকার আর গোঙানির শব্দ যেন শেষ হওয়ার নয়।

শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বিভাষণ পূজারির। এখন রীতিমতো ঠান্ডায় কাঁপছেন তিনি। মাথা তুলে দাঁড়াবার উপায় নেই। দাঁড়াতে গেলেই নিচু ছাদে ঠেকে যাচ্ছে মাথা। দুর্গন্ধময় গর্ত, কুচকুচে কালো দেয়াল, শীতল অন্ধকার, আর হাড় হিম করা আর্তচিৎকার...সবকিছু দেবতাকে বলে দিচ্ছিলো তিনি কোথায় আছেন।

এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না বিভাষণ পূজারি। তার সমস্ত শক্তি, সাহস আর আধ্যাত্মিক গভীরতা সত্ত্বেও পৃথিবীর ভয়ংকরতম কারাবাস কোনোমতেই মেনে নিতে পারছিলেন না দেবতা। তিনি কিনা মৃত কারাবাসের মৃত্যুকূপে পড়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন!

॥ ❀ ॥

নিজের চোখে মৃৎ কারাবাসের অবস্থা দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না সোমদত্ত। প্রিয়ংবদা এবং তার সহকারী রাঙার অজান্তেই বিষাক্ত পানীয় এড়িয়ে গেছেন প্রধান প্রকৌশলী। যে রাতে রাঙা আর তার লোকজন পাহারায় থেকে শহরের জলাধার আর পুকুরগুলোর পানি বিষাক্ত করে দিয়েছিলো, তখন সরস্বতীর তীরে একটা প্রকল্প পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সোমদত্ত। তিনি এবং তার গুটি কয়েক বিশ্বস্ত লোক শহরে ফিরে আসার পর সবকিছু অচেনা মনে হচ্ছিলো তাদের কাছে। তারা যেন ফিরে এসেছেন কোনো বিকৃত মস্তিষ্কের বাসিন্দাদের শহরে।

অবিশ্বাস আর মনঃকষ্ট নিয়ে বিভাষণ পূজারির বিচারের কথা শুনেছিলেন তিনি। সোমদত্তের দৃঢ় বিশ্বাস সুষ্ঠুভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারলে যেকোনো হরপ্পাবাসী বুঝতে পারবে যে বিভাষণ পূজারিকে ফাঁসানো হচ্ছে। এটার প্রতিকার

করার চিন্তা করলেন তিনি। তবে তার আগে দেবতার সাথে দেখা করে তাকে জানতে হবে কী হচ্ছে আসলে।

মৃৎ কারাবাসে দর্শনার্থী যাওয়ার অনুমতি নেই। কবরস্থানেও আত্মীয়-স্বজনেরা মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনার জন্য যেতে পারে। তবে মৃত্যুকূপে নয়। মৃত্যুকূপ হলো কৃষ্ণগহ্বর যেখান থেকে কিছু ফিরে আসে না। এ এক নরক যেখানে প্রবেশকারীকে সব আশা বিসর্জন দিতে হয়।

ষোলো ঘণ্টা আগে শহরে ফিরে আসার পর মৃৎ কারাবাসের অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামছে সোমদত্ত। কারাগারের ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত বন্দির সাথে সংক্ষিপ্ত দেখা করার অনুমতি আদায়ে সফল হয়েছেন তিনি।

দেবতার কুঠুরিতে পৌঁছানোর আগেই তিনবার বমি করলেন সোমদত্ত। মানুষের কল্পনার চেয়েও জঘন্য কারাগারের বাতাস। বমি করার সাথে সাথে কাঁদছেনও তিনি। সৌম্য, শান্ত, মহানুভব, সাদা আলখাল্লা পরা বিভাষণ পূজারির এত যন্ত্রণাময় বন্দিত্ব সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি। তিনি আরো বুঝতে পারলেন যে কখনো কখনো ক্ষমতাবান আর সম্পদশালী মানুষও চরম দুর্ভাগ্যবান মানুষের চেয়ে ভয়ংকর অবস্থায় পতিত হন। আর এই মৃত্যুকূপের ক্ষেত্রে বন্দির দেহ নর্দমার ময়লায় পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত এখানে পচতে হয়। তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন, কাউকে এমন নির্দয় শাস্তি দেওয়ার অধিকার কোনো মানুষের রয়েছে কি না।

মাতাল রক্ষী বিভাষণ পূজারির কারাগারের তালা খুলে দিতেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির দেখা পেলেন সোমদত্ত। এমনকি এই করুণ, অমানবিক অবস্থায়ও পা আড়াআড়ি করে গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে আছেন দেবতা। সোমদত্ত আর সহ্য করতে পারলেন না, হরপ্পার রক্ষাকর্তা মহান বিভাষণ পূজারির পায়ে পড়ে গেলেন।

'সোমদত্ত...বন্ধু আমার...সোমদত্ত...' সোমদত্তের হাত নিজের হাতে আঁকড়ে ধরে কপালে ঠেকিয়ে বললেন দেবতা, আকুল হয়ে কাঁদছেন। মহানুভব বন্ধুর মুখটা দেখে নিজের আনন্দ ধরে রাখতে পারছেন না তিনি। গত দুদিনে তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন বন্ধুবান্ধবের মুখ দেখতে কেমন। যাদের বন্ধু বলে ধরে নিয়েছিলেন, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনের সময় তারাই তাকে আর তার পরিবারকে ত্যাগ করেছে। হতবিহ্বল হয়ে গেছেন প্রকৌশলী। প্রতিটা উৎসবে অনন্য পোশাকে সজ্জিত যে মানুষটার শরীর থেকে চন্দনের সুবাস ছড়ায়, তিনি আজ পুতি দুর্গন্ধময় নোংরা প্রকোষ্ঠে রক্তাক্ত, আহত আর পরাজিত অবস্থায় বসে আছেন।

'হে প্রভু, হে আমার সূর্য, হচ্ছেটা কী এসব?' নিজের এবং গুরুর অশ্রু মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলেন সোমদত্ত। 'দ্রুত কিছু একটা করতে হবে আমাদেরকে।'

'আমরা তাই করবো, সোমদত্ত...তাই করবো আমরা,' জবাবে বললেন দেবতা। 'তবে তার আগে বলো, আমার সাঞ্জনা কোথায়? কোথায় আমার মানু?'

'তারা নিরাপদে আছেন, হে দেবতা...অন্তত্তপক্ষে এখনকার জন্য,' জানালেন সোমদত্ত। 'বিচারালয়ে এক সাহসী আক্রমণ চালিয়ে মানু আর তার নয় সহযোগী সাঞ্জনাকে উদ্ধার করে। তিনি এখন নিরাপদে আছেন এবং তারা সবাই আত্মগোপনে রয়েছেন। তারা আপনাকেও ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলো, তবে ঐ মুহূর্তে বিচার কক্ষ গিজগিজ করছিলো নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যে। তারা আপনার কাছে যেতে পারেনি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বিভাষণ পূজারি। তার প্রিয়তমা স্ত্রী আর সন্তান নিরাপদ। এখন হাজারবার মরতেও আপত্তি নেই তার।

সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার কথা বললেন বিভাষণ পূজারি। তার কণ্ঠে এখন ক্ষীণ আশার আভাস। পালটা লড়াই করতে প্রস্তুত দেবতা!

'তাহলে এখন কী করবো আমরা, সোমদত্ত?' জানতে চাইলেন বিভাষণ।

'প্রভু, আমি শুনেছি মৃৎ কারাবাসে এক অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে মানু। তবে হে মহান দেবতা, তার কোনো আশা নেই। মৃত্যুকূপ পাহারারত তিন শতাধিক সুশিক্ষিত যোদ্ধার সামনে তাদের দশজনের ঐ দল দাঁড়াতেই পারবে না।'

ক্লান্ত হাসলেন বিভাষণ পূজারি। সোমদত্ত যতটা কঠিন বলে বর্ণনা করেছে তিনি তা মনে করেন না। একজন সাধারণ মানুষ একবার শ্বাস নেওয়ার আগে চল্লিশটা তীর ছুঁড়তে পারে মানু আর তার পরিবারের নয়জন রত্ন। তলোয়ার যুদ্ধে তারা একেকজন বিশজন প্রতিপক্ষকে কতল করতে সক্ষম। যদি ওরা দশজন এই মৃত্যুকূপে আক্রমণ করে তাহলে জেতার সম্ভাবনা আধাআধি।

যাই হোক, প্রিয় মানু আর অসাধারণ নয়জনকে নিয়ে জুয়া খেলতে চান না বিভাষণ। তিনি নিশ্চিত যে অনাগত দিনগুলোতে তার আর তার পরিবারের জন্য অনেক লড়াই বাকি। কোনোদিন কখনো কেউ যা করতে পারেনি, মৃত্যুকূপ থেকে পালানোর সেই উপায় খুঁজছেন বিভাষণ পূজারি।

বিশ্বাসঘাতক

তিব্বতি রেস্টুরেন্টের মাতাল মালিকের কাছে কোনো তথ্য নেই চিরকুটটা বিদ্যুতের কাছে কীভাবে পৌঁছালো বা কে রেখে এলো। ময়লা ক্যাপ আর ইউনিফর্ম পরা ওয়েটারদেরও কমবেশি একইরকম লাগছে। এমনকি বালার জ্যাকেটের নিচ থেকে একটা রিভলভারের মাজল দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার পরও মনে হলো কেউ কিছু জানে না। সমীহ জাগানিয়া দেব-রাক্ষস মঠের দর্শনার্থীদের সাথে তর্কে যাওয়ার সাহস হলো না তাদের কারো। রুমি হয়তো রেস্টুরেন্টের অতিথিদের মাঝেই ছিলো, কেউ লক্ষ করেনি। নয়তো সে ছদ্মবেশ নেওয়ায় অতীব পটু।

সনু আর তার দুজন সঙ্গীকে বিদ্যুৎ নির্দেশ দিলো দামিনীকে নিরাপত্তা দিয়ে মঠে পৌঁছে দেওয়ার। দামিনী প্রতিবাদ করলো। যদিও তাতে কোনো কাজ হলো না। অতিমানবিক সক্ষমতাসম্পন্ন একজন দক্ষ আততায়ীর নখদর্পণে থাকা চরম অনিরাপদ একটা জায়গায় তাকে আর এক মুহূর্ত থাকতে দিতে চায় না বিদ্যুৎ। প্রতি পদক্ষেপে দামিনীকে তাদের তিনজনের নিরাপত্তা বলয়ের মাঝখানে রেখে নিজেদের হ্যান্ডগান বের করে নিয়ে সনু আর তার সঙ্গীরা দ্রুত আশ্রমের উদ্দেশে রওয়ানা হলো।

সোয়া নয়টা বাজলো ঘড়িতে। অন্ধকার হয়ে গেছে। দুপাশের খোলা বাজারের ছোট্ট ছোট্ট রেস্টুরেন্টগুলো এখনো হাজার হাজার পর্যটকে গিজগিজ করছে। রাস্তাগুলোও লোকে লোকারণ্য। কী নেই এখানে? জাপানি সুশি থেকে ভারতীয় মসলা, দোসা সব ধরনের খাবারের পসরা সাজিয়ে বসে আছে

রেস্টুরেন্টগুলো। সব জাতি, বর্ণ আর গোত্রের দেশি-বিদেশি পর্যটকের এমন ভিড়ে একজন ভয়ংকর পেশাদার অনুসরণকারীকে খুঁজে বের করা আর খড়ের গাদায় একটা সুঁই খুঁজে বের করা একই কথা। আর অবশ্যই সে এখন তাদের উপর লক্ষ রাখছে। এমনকি মঠের ভীষণ কার্যকর গুপ্তচর সেনাদেরও ধোঁকা খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে আততায়ী। বিদ্যুতের কল্পনারও অধিক বিপজ্জনক সে...এবং অবশ্যই তাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে।

মঠে ফিরে দামিনীকে চুমু খেয়ে শুভরাত্রি জানালো বিদ্যুৎ। মঠের রীতি অনুযায়ী, এক কক্ষে রাত কাটানোটা বিচক্ষণ কাজ হবে না। একটা বিষয়ে বিদ্যুৎ নিশ্চিত, আর সেটা হলো সবচেয়ে নিরাপদতম স্থানে রয়েছে দামিনী। দেব-রাক্ষস মঠের চৌহদ্দির ভেতরে প্রবেশের সাহস করবে না কেউ। এমনকি এই বিস্ময়কর আততায়ীও নয়।

'এখন কী হবে, বিদ্যুৎ?' বিদ্যুৎ চলে আসবে এমন সময় জিজ্ঞেস করলো দামিনী।

'ঐ লোক আমাকে আগামীকাল গঙ্গা আরতির সময় দেখা করতে অনুরোধ করেছে। তার সে অনুরোধ কীভাবে উপেক্ষা করবো আমি? বিশেষ করে প্রথম দেখায় তার দেওয়া এমন মূল্যবান উপহার পাওয়ার পর,' জবাব দিলো বিদ্যুৎ। পরিষ্কার রাগে পুড়ছে সে। যখন দামিনীর সাথে ছিলো, ঐ সময়টায় বিদ্যুতের কাছে এসে বড় ভুল করেছে রুমি। যে ভুল কখনো বিদ্যুৎ ক্ষমা করবে না।

'তোমাকে গঙ্গা আরতিতে কেন ডাকলো সে, বিদ্যুৎ? এর বিশেষত্ব কী?'

'দশশ্বমেদ ঘাটে সন্ধ্যা ৬:৪৫-এ অনুষ্ঠিত হয় গঙ্গা আরতি। জায়গাটা ঐ সময় লোকে লোকারণ্য থাকে। এখানেই প্রথমবার রুমির সাথে দেখা হয়েছিলো আমার। পার্থক্যটা হলো, পবিত্র আরতি বা সমবেত প্রার্থনার এই সময়টাতে পবিত্র নদীতীরে হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালানো হয়। জনসমুদ্রে পরিণত হয় দশশ্বমেদ ঘাট। গঙ্গা আরতি এক পরাবাস্তব অভিজ্ঞতা। যেখানে প্রভু শিব, মা গঙ্গা, সূর্য আর অগ্নির পূজা করা হয়। পবিত্র এই আচার পালন করতে ভক্তের ঢল নামে সেখানে।'

কয়েক সেকেন্ড থামলো বিদ্যুৎ এবং তারপর আবারও বললো, 'এককথায় আগামীকাল সেখানে প্রায় বিশ হাজার মানুষ জড়ো হবে।'

সব যোদ্ধা জড়ো হয়েছে একসাথে। বলভান্ত রাগে ফুঁসছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে তার। বিশাল কাঁধদুটো যান্ত্রিক পিষ্টনের মতো ফুলে আছে। বিদ্যুৎকে মঠের বাইরে যেতে দিয়ে নিজের উপর রেগে আছে সে। দক্ষ এই আততায়ী সম্পর্কে বালাও এখন পুরোপুরি সচেতন। মুখ ধুয়ে এখন বানারসের বিখ্যাত পান চিবোচ্ছে সনু। কাউকে বলেনি যে আজ বিয়ার পান করেছে সে। গোবর্ধন আর পুরোহিতজিও উপস্থিত আছেন। তাদের সাথে মাত্রই যোগ দিয়েছে বিদ্যুৎ।

'গুপ্তচর সেনারা কেন তাকে খুঁজে বের করতে পারলো না?' গর্জন করে উঠলো বলভান্ত। প্রাচীন গোয়েন্দা এই নেটওয়ার্কের দলনেতা সে। এর ব্যর্থতা মানে তার নিজের ব্যর্থতা। 'প্রতিটা মোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট আর দোকান আমাদের পর্যবেক্ষণে। প্রায় তিন শতাধিক রিকশাওয়ালা আর দুশো অটো চালক আমাদের নেটওয়ার্কের অংশ। কেবলই এ-ই নয়, প্রতিটা সমাধিক্ষেত্র আর তান্ত্রিক আশ্রমে নজরদারি রয়েছে আমাদের! আমাদের মুঠো এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই এই বদমাশের। পুরো একটা গুপ্ত সেনাবাহিনীর সামনে একটা মানুষ দাঁড়াতে পারে?'

ঠিকই বলেছে বলভান্ত। বিদ্যুতের বর্ণনামতে রুমি বানারসের কেউ নয়। তার ভাষা, তার পোশাক-পরিচ্ছদ এবং তার আচরণ...সবকিছু নির্দেশ করে যে সে একজন বহিরাগত। দেব-রাক্ষস মঠের মতোই প্রাচীন একটা সংগঠনের নেটওয়ার্ককে কীভাবে একজন মানুষ হারিয়ে দিতে পারে যে কিনা নিজেও ঐ শহরে একজন নবাগত?

'যদি-না...' বিড়বিড় করলো বালা।

'যদি-না কী, বালা?' জানতে চাইলো বিদ্যুৎ।

'যদি-না বানারসে তার সঙ্গী থাকে, বিদ্যুৎ। নির্বোধের মতো কেন আমরা ভাবছি যে সে একজন নিঃসঙ্গ নেকড়ে? হয়তো সে তা নয়। হতে পারে বারানসির গভীরে শেকড় গেড়ে থাকা একটা সংগঠনের পুরো সহায়তা পাচ্ছে সে। আমরা যদি তার পিছু নেই, তাহলে এই সম্ভাবনাগুলো মাথায় রাখা ভালো।'

বালার কথায় হুঁশ ফিরলো উপস্থিত সকলের। বিশেষ করে বিদ্যুতের। বুঝতে পারলো বালা সঠিক কথাই বলেছে। *এই সামান্য ব্যাপারটা তার মাথায় এলো না কেন?*

'একা নয় সে,' বললো বিদ্যুৎ। তার কথায় সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

'এখনই কোনো সিদ্ধান্তে আসাটা ঠিক হবে না, ভিডিও...' বালা বলতে শুরু করেছিলো, কিন্তু বিদ্যুৎ বাধা দেওয়ায় থেমে যেতে হলো তাকে।

'ও একা নয়!' পুনরায় বললো বিদ্যুৎ। এবার আরো দৃঢ় কণ্ঠে। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে সে। 'কী বোকা আমরা...' বিড়বিড় করে বললো সে। তারপরই হাসিতে ফেটে পড়লো।

'হে ঈশ্বর...কী বোকামিটাই না করেছি আমরা!' উচ্চ স্বরে বলে উঠলো বিদ্যুৎ। হাসি থামাতে পারছে না সে। অন্যরা পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় করলো। বুঝতে পারছে না কেন এত মজা পাচ্ছে বিদ্যুৎ।

'দুঃখিত...সকলের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি আমি...আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে এটা আগে লক্ষ করিনি কেউ,' বললো সে। ধীরে ধীরে সিরিয়াস হয়ে উঠছে সে।

'কী দেখিনি, দাদা?' জানতে চাইলো সনু।

'এটা একদম সোজা, সনু। রুমি আজ আমার কাছে এসেছিলো, অথবা বলতে পারি রুমি আমার কাছাকাছি ছিলো আজ। যেখানে বাইরে যাওয়াটা ছিলো একেবারেই অপরিকল্পিত, সে কীভাবে জানলো যে আমি আজ সেখানে যাবো?' ব্যাখ্যা করলো বিদ্যুৎ।

দেবতার শেষ কথাটা শুনে জমে গেল বালা, গোবর্ধন আর পুরোহিতজি। *এত পরিষ্কার একটা বিষয় কীভাবে চোখ এড়িয়ে গেল তাদের?*

সনুর হতবিহ্বল অবস্থা এখনো কাটেনি। 'কী বলতে চাও তুমি, বিদ্যুৎ দাদা?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'রুমি হয়তো মঠের কাছাকাছি সুবিধাজনক কোনো জায়গায় অপেক্ষা করছিলো, এবং তারপর অনুসরণ করে তোমাকে।'

'ঠিক বলেছ তুমি, সনু। তোমার তত্ত্বের সাথে দুটো ব্যাপার জড়িত। প্রথমত, আমরা জানি সশস্ত্র বিশাল বাহিনী এই আশ্রমের সুরক্ষা দিচ্ছে। ধরা না পড়ে কোনো সুবিধামতো জায়গায় লুকিয়ে তিন দিন অপেক্ষা করাটা যে-কারো জন্য অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, পুরো প্রস্তুতি নিয়ে সে প্রতিবার আমার সাথে দেখা করেছে। প্রথমবার তার সাথে একটা সূক্ষ্ম বিস্ফোরক ডিভাইস প্রস্তুত করা ছিলো। দ্বিতীয়বার সে ছিলো নিখুঁত ছদ্মবেশে বা অনুপ্রবেশকারী রেস্টুরেন্ট কর্মী হিসেবে। তুমি যা বলছো তা হতে পারে, তবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন।'

বিদ্যুৎ যা বলছে বুঝতে পারছে সনু। নিজের ভাবনাটা জোর কণ্ঠে প্রকাশ করলো সে, 'তার মানে রুমি জানতো তুমি কখন কোথায় থাকবে?'

'হ্যাঁ,' গর্জন করে উঠলো বলভান্ত। তার চোখদুটো রাগে জ্বলছে। 'আমাদের মাঝে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে!'

নিজের কক্ষের দিকে হেঁটে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। রাতটা বেশ ঠান্ডা। বিশাল লন, ঝরনা আর মৃদু আলোয় মঠের ভেতরটা বেশ সুন্দর লাগছে। দীর্ঘ এবং ঘটনাবহুল একটা দিনের পর কয়েক ঘণ্টা বিছানায় কাটাতে চায় সে এখন। জানে ঘুমানো বেশ কঠিন হবে। বিপজ্জনক একটা দিন অপেক্ষা করছে পরদিন। *রুমির জন্য বিপজ্জনক।*

'এই!'

বিদ্যুৎ ঘুরে তাকিয়ে দেখলো, দূরে করিডরে একটা পিলারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ন্যায়না।

'ওহ, ন্যায়না। এত রাতে এখানে কী করছো তুমি? এখন তো মধ্যরাত পেরিয়েছে,' বললো বিদ্যুৎ।

কথা বললো না ন্যায়না। কেবল একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো বিদ্যুতের দিকে। বিদ্যুৎ লক্ষ করলো, উজ্জ্বল দোপাট্টার সাথে ধবধবে সাদা সালোয়ার কামিজ পরেছে সে। তার চুলগুলো দুভাগ করে পাঞ্জাবি ভঙ্গিতে বিনুনি করে বাঁধা। তার সুন্দর কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটা টিপ। তার বড় বড় সুন্দর চোখদুটোও মাশকারা দিয়ে সাজিয়েছে সে। কানে দুলছে বাহারি ঝুমকো।

'কীইইইই...?' ছোট্ট সবুজ জায়গাটা ঘুরে তার কাছে যেতে যেতে উৎফুল্ল কণ্ঠে জানতে চাইলো বিদ্যুৎ। 'তুমি কি কেবল তাকিয়েই থাকবে?'

'নাহ। আমার তো মনে হয় না আমার তাকিয়ে থাকার অধিকার আছে। আছে, বিদ্যুৎ?' ভুবনভোলানো হাসি হেসে জানতে চাইলো সে। পরিষ্কারভাবে বেদনা আড়াল করছে তার হাসিমুখ। বিদ্যুৎ জানে সে কী বোঝাতে চাচ্ছে। তা সত্ত্বেও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো সে। এছাড়া আর কিইবা করতে পারে সে?

'আহা, বাদ দাও তো, ন্যায়না। চলো আমার সাথে হাঁটবে,' তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে আলতো করে তাকে নিজের পাশে টেনে নিলো সে। অলসভাবে বিদ্যুতের কক্ষের দিকে হাঁটতে লাগলো তারা। চঞ্চলা, চপলা ন্যায়না তার স্বভাববিরুদ্ধ নীরব আজ সন্ধ্যায়।

'তুমি কি কোনো কারণে বিরক্ত, ন্যায়না?' জানতে চাইলো বিদ্যুৎ। জানে প্রসঙ্গটা সারাজীবন এড়িয়ে যেতে পারবে না সে। শৈশবের বন্ধু হিসেবে ন্যায়না তার খুবই প্রিয় একজন।

'কেন? কোনো কিছু কি আমাকে বিরক্ত করার কথা, হে মহান দেবতা?' বিদ্যুতের প্রশ্ন বুঝতে পারেনি এমন ভঙ্গিতে জবাব দিলো ন্যায়না।

'অবশ্যই না। এমনিতে যতটা কথা বলো তুমি, তার চেয়ে কম কথা বলছো তো তাই,' ঘুরে ন্যায়নার দিকে তাকিয়ে বললো সে। সাড়া দিলো না ন্যায়না। সোজা সামনের পথের দিকে তাকিয়ে আছে সে। শীতের এই সন্ধ্যায় হাতদুটো ওড়নার নিচে ঢেকে রেখেছে সে। দামিনীর উপস্থিতির কারণে যদি দুজনের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি না হতো, তাহলে নিখুঁত রোমান্টিক জুটি হতো এটা।

মহান দ্বারকা শাস্ত্রীজির বাসভনের কাছেই একটা গেস্ট রুমে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে বিদ্যুতের। এই মুহূর্তে তারই দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সে আর ন্যায়না। বিদ্যুৎ লক্ষ না করে পারলো না যে এই চাঁদনি রাতে কী অপূর্ব সুন্দরই না লাগছে ন্যায়নাকে।

'শুভ রাত্রি, ন্যায়না,' বললো সে। 'আমাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

'কোন সমস্যা নেই, বিদ্যুৎ। শুভ রাত্রি।'

ঘুরে নিজের ঘরের দিকে রওয়ানা দিলো ন্যায়না। তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার একটা অদম্য ইচ্ছে হলো বিদ্যুতের। হাজার হোক, অর্ধ-মানব তো সে।

দরজা খুলতে যাবে, এমন সময় ন্যায়নার কণ্ঠ শুনতে পেল আবারও।

'বিদ্যুৎ...?'

দেবতা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো, কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে ন্যায়না।

'কিছু বলবে, ন্যায়না?'

'তুমি কি জানো...অন্তত আমার একটা চিঠির উত্তর দেওয়া উচিত ছিলো তোমার। দামিনীর কথা আমাকে জানানো উচিত ছিলো। ও কিন্তু দারুণ সুন্দরী!' বলতে বলতে কেঁপে গেল ন্যায়নার কণ্ঠ। ঝাপসা হয়ে এসেছে চোখও। যদিও তার মুখে এখনো হাসি লেগে আছে।

বিদ্যুৎ বুঝতে পারছে না কী বলবে। স্বর্গের অপ্সরাদের চেয়েও বেশি কাঙ্ক্ষিত মনে হচ্ছে ন্যায়নাকে। মনের গহীনে এক মুহূর্তের জন্য তার ইচ্ছে হলো ন্যায়নাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসতে। প্রশ্নাতীত ভালোবাসা আর অনুপম সৌন্দর্যের কাছে সবচেয়ে নীতিবান মানুষটিও দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার সেই সাথে বিদ্যুৎ কেবলই একজন মানুষ নয়। সে পৃথিবীর শেষ দেবতা। প্রলোভনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো সে, মনের গভীরে দামিনীর ছবিটা কল্পনা করলো। দুর্বল কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যাবার পর নিজেকে ফিরে পেল বিদ্যুৎ। তা সত্ত্বেও ন্যায়নাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলো। এখনো সে তাকে প্রিয় বন্ধু হিসেবে সত্যি সত্যি ভালোবাসে।

'ন্যায়না...আমার ন্যায়না...' তীব্র আবেগের সাথে বলে উঠলো সে। তার মাথাটা একপাশে বেঁকে গেছে।

'তুমি যদি সেটা করতে...তাহলে আমি তোমার জন্য ২৬ বছর ৯ মাস ১৮ দিন অপেক্ষা করে থাকতাম না, বিদ্যুৎ,' ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো ন্যায়না। তারপর ঘুরে চলে গেল।

ঝড় বইছে বিদ্যুতের মনে। ন্যায়নার প্রস্থানরত অবয়বের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে, তারপর নিজের কক্ষে প্রবেশ করলো। তার পেছন পেছন গিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার একটা তীব্র ইচ্ছে বহুকষ্টে দমন করতে হলো ওকে। পুরো পরিস্থিতির সাথে সম্পূর্ণ বেমানান কী যেন একটা ভীষণ বিরক্ত করছে তাকে। সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হলেও তার মনে হলো ওড়নার নিচে একটা ভারী ইলেকট্রনিক যন্ত্র ছিলো ন্যায়নার হাতে। এটা কোনো সেলফোন ছিলো না। এমনকি সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্যও নয় জিনিসটা। ডিজিটাল এবং টেলিকম সিকিউরিটি কেন্দ্রিক একটা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান চালায় বিদ্যুৎ। জিনিসটা তার চেনা।

অন্ধকারে বিদ্যুৎ যেটুকু বুঝতে পারলো, শালের নিচে যে জিনিসটা ন্যায়না হাতে ধরে ছিলো সেটা ছিলো একটা অ্যাডভান্সড ইরিডিয়াম ৯৫৫৫ স্যাটেলাইট ফোন।

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ
বিশ্বাসঘাতকতার খঞ্জর

'এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু চন্দ্রধর কোথায়? আমাকে উদ্ধার করতে এলো না কেন সে?' জানতে চাইলেন বিভাষণ পূজারি। 'বিচার কক্ষেও উপস্থিত ছিলো না সে।'

সোমদত্ত নীরব। প্রত্যাশা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন বিভাষণ পূজারি। এই নরক থেকে তাকে যদি কেউ উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে সেটা হলো তার সহচর, তার স্ত্রীর ভাই এবং প্রিয় বন্ধু...চন্দ্রধর। দেবতা নিশ্চিত তাকে রক্ষা করার জন্য কোনো উপায় বাকি রাখবে না চন্দ্রধর। এমনকি যদি পৃথিবীর কোনো শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয়, তাও করবে সে।

কোনো কথা বললেন না প্রধান প্রকৌশলী। বিভাষণ পূজারির উদ্বেগ বাড়ছে। দ্রুত পালটা আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে সোমদত্তের কাঁধের উপর নিজের নোংরা হাতটা রাখলেন তিনি এবং বললেন, 'বিশ্বাস করো, সোমদত্ত, এ সবকিছুর পেছনে কে আছে সেটা খুঁজে বের করতে কয়েক ঘণ্টার বেশি লাগবে না চন্দ্রধরের। বদমাশ রাঙা এর সাথে জড়িত হলেও এমন একটা জটিল পরিকল্পনা সাজানোর মতো বুদ্ধিমত্তা এবং সক্ষমতা নেই তার। একটা শক্তিশালী অশুভ শক্তি এখানে পর্দার আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে।'

বন্ধু সোমদত্তকে নীরবে ফোঁপাতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন বিভাষণ পূজারি। হৃদয়টা মোচড় দিয়ে উঠলো। তার প্রিয় বন্ধু চন্দ্রধরের কোনো বিপদ হয়নি তো?

'কথা বলো, সোমদত্ত! কী হয়েছে? ওরা কী চন্দ্রধরকেও আটক করেছে?'

নিজেকে সামলে মাথা তুলে দাঁড়ালেন চন্দ্রধর। 'না, প্রভু, পণ্ডিত চন্দ্রধর বহাল তবিয়তে আছেন।'

'তাহলে তার সাথে যোগাযোগ করলে না কেন তুমি? তোমার সক্ষমতা নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নেই, তবে চন্দ্রধর এক্ষেত্রে ভীষণ সাহায্য করতে পারতো। সে একইসাথে পুরোহিত পরিষদ এবং সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারতো।'

'ইতোমধ্যে পরিষদ আর সেনাবাহিনীর উপর নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি, প্রভু,' শীতল কণ্ঠে জবাব দিলেন সোমদত্ত।

বিভাষণ পূজারি ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন। সোমদত্ত যে তার বিশ্বস্ত সহযোগী এবং অংশীদার চন্দ্রধরের সাহায্য প্রার্থনায় ইতিবাচক সাড়া দেয়নি, তা দেখে হতাশ হলেন তিনি।

'দেখো সোমদত্ত, আমার মনে হয় তুমি বুঝতে পারছো না। পণ্ডিত চন্দ্রধর আমার ভাইয়ের মতো। সে নিজের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়বে আমাকে এবং আমার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য।'

আর সহ্য করতে পারলেন না সোমদত্ত। 'বন্ধ করুন এসব, হে মহান দেবতা!' বিভাষণ পূজারিকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

বিভাষণ লক্ষ করলেন, ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে সোমদত্তের। তাকে একইসাথে বিমর্ষ এবং রাগান্বিত মনে হচ্ছে।

এক মুহূর্ত পরে সামনে ঝুঁকলেন সোমদত্ত। স্নেহভরে নিজের হাতদুটো দেবতার রক্তাক্ত কাঁধের উপর রাখলেন। তারপর সোজা বিভাষণ পূজারির চোখে চোখে তাকিয়ে কোমল স্বরে বললেন, 'আপনি সত্যি সত্যি জানেন না, তাই না?' মৃদু স্বরে জানতে চাইলেন প্রকৌশলী। নিজের আবেগ লুকাতে পরিষ্কার হিমশিম খাচ্ছেন। চোখে অশ্রুর বন্যা নেমেছে তার।

অশুভ কিছু একটা এখন আন্দাজ করতে পারছেন বিভাষণ পূজারি। চন্দ্রধর যদি বেঁচেই থাকে এবং পরিষদ আর সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণও যদি তার হাতে থাকে, তাহলে সোমদত্তের পরিবর্তে সে কেন এখানে আসেনি?

'তুমি যা জানো আমাকে বলো, বন্ধু,' কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে জানতে চাইলেন দেবতা।

মৃদু মাথা নাড়লেন সোমদত্ত এবং বললেন, 'হে প্রভু, কে আপনার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়েছে বলে মনে করেন আপনি?'

শূন্যদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন বিভাষণ পূজারি। কল্পনাও করেননি কী শুনতে যাচ্ছেন তিনি।

'আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে পাপী সাব্যস্ত করার মতো এমন জঘন্যতম আদেশ দিতে পুরোহিত পরিষদকে কে প্রভাবিত করেছে বলে মনে করেন আপনি?'

'কে, সোমদত্ত? হেঁয়ালি বাদ দিয়ে বলো আমাকে!' মিনতি করলেন বিভাষণ পূজারি।

সোমদত্ত কথা বলতে চেষ্টা করলেন। এমন সময় একটি রক্ত হিম করা চিৎকারে চমকে গেলেন তিনি। মৃত্যুকূপের পুরো দেয়াল ভেদ করে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তীব্র যন্ত্রণাময় সে চিৎকার। মানুষের সহ্যের অতীত তীব্র নির্যাতন করা হচ্ছে কাউকে।

নির্যাতিতের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশে বিভাষণ পূজারি এবং সোমদত্ত দুজনেই বিড়বিড় করে একটা আরোগ্যমন্ত্র জপ করলেন।

'নিজেকে শক্ত করুন, প্রভু। জীবন্ত এই নরকে আপনাকে কারারুদ্ধ করার জন্য যিনি পবিত্র সিলমোহরের অপব্যবহার করেছেন, এখন আমি তার নাম প্রকাশ করবো,' বললেন সোমদত্ত।

নামটা উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই তার। আদালতের রায়ের উপর অনুমোদনসূচক সিলমোহর মারার ক্ষমতা কেবল দুজন মানুষেরই রয়েছে সমগ্র হরপ্পায়। তাদের একজন মৃৎ কারাবাসের পাতালে অন্ধকার গহ্বরে বন্দি। তিনি হলেন বিভাষণ পূজারি নিজে। আর অন্যজন হলেন সেই মানুষ যাকে মনপ্রাণ উজাড় করে বিশ্বাস করেন দেবতা। যে মানুষটার জীবন তিনি নিজে রক্ষা করেছিলেন। হরপ্পার রত্ন, যার বোনকে তিনি বিয়ে করেছেন।

'চন্দ্রধর!' অবিশ্বাসে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'এ হতে পারে না। তুমি আমার সাথে মিথ্যে বলছো, পতিত বদমাশ!' সোমদত্তের উদ্দেশে গর্জন করে উঠলেন তিনি। 'আমার চারপাশে যে বিশ্বাসঘাতকতার জাল ছড়িয়ে আছে, তুমিও তার অংশ। বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

সোমদত্ত প্রতিবাদ করলেন না। মহৎপ্রাণ দেবতার কাছ থেকে এই প্রতিক্রিয়াই আশা করেছিলেন তিনি। এবং তিনি এটাও জানেন যে তাকে পুরো সত্যটা অবমুক্ত করতে হবে, সেটা যত তিক্তই হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

'চন্দ্রধরই আপনাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছে। আপনার ছেলে মানু আর সরলমনা সাঞ্জনার জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। আপনার যাবতীয় ধনসম্পদ আর জমি বাজেয়াপ্ত করতে নগর পরিষদকে প্ররোচিত করেছে এই চন্দ্রধর। আপনার গৃহকর্মীদেরকে আপনার অপরাধের সহযোগী ঘোষণা করে সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।'

অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন বিভাষণ পূজারি। প্রতারণার একটা ভোঁতা তীর তার হৃদয়টা এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে। তার অস্তিত্বের গভীরে সেঁধিয়ে আছে এক বিশ্বাসঘাতকতার ছুরি। তাকে এখন একটা জীবন্ত লাশ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। মধ্য বয়সেও যে দেবতাকে প্রাণচঞ্চল তরুণের মতো দেখাতো, হঠাৎ করেই তাকে এখন ভীষণ বুড়ো মনে হচ্ছে।

দুই হাঁটুর মাঝখানে মুখ লুকিয়ে আকুল হয়ে কাঁদছেন এখন বিভাষণ পূজারি। গত কয়েক ঘণ্টায় তিনি এত কেঁদেছেন যে মনে হচ্ছে তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। তীব্র কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর। দেবতা একজন অসাধারণ শক্ত মনের মানুষ। তার ভালোবাসার মতো তার কান্নাও নিখাদ।

বিভাষণ পূজারির দুঃস্বপ্ন এখনো শেষ হয়ে যায়নি। সোমদত্ত নিজের মনকে শক্ত করে নিলেন এবং চূড়ান্ত দুঃসংবাদটি বলতে শুরু করলেন।

'আরো দুঃসংবাদ আছে, হে দেবতা। এমন বিধ্বংসী খবর বয়ে নিয়ে আসার জন্য ক্ষমা করবেন আমাকে,' বললেন সোমদত্ত। প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থা হয়েছে তার। বিভাষণ পূজারি নড়লেন না বা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। যদিও তার তীব্র কান্না এখন প্রায় থেমে গেছে।

বলে চললেন প্রকৌশলী, 'মানু, সাঞ্জনা আর আপনার নয়জন যোদ্ধাকে ধরে হত্যা করার জন্য শুরু হয়েছে বিশাল এক মানব শিকার। অধিকন্তু, পরিষদকে দিয়ে একটা ডিক্রি পাশ করিয়ে নিয়েছেন চন্দ্রধর। তিনি নিজেকে হরপ্পার সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং তার স্ত্রী প্রিয়ংবদাকে ঘোষণা করেছেন রাজরানি হিসেবে। আমাদের প্রিয় মহানগরীর জনতার শাসনকে তিনি সমাপ্ত করতে যাচ্ছেন। সেই শহর যাকে আপনি এত নিখুঁতভাবে নির্মাণ করেছিলেন, হে দেবতা।'

বিভাষণ পূজারির কাছ থেকে একটা হিংস্র প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করেছিলেন সোমদত্ত। তবে তেমন কিছুই হলো না। দুই হাঁটুর মাঝখানে মুখ লুকিয়ে আগের ভঙ্গিতেই বসে আছেন বিভাষণ পূজারি।

'আরো একটা বিষয় রয়েছে, প্রিয় দেবতা,' বলে চলেছেন সোমদত্ত। 'আগামীকাল সকালে আপনাকে জনগণের সামনে উপস্থাপনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন চন্দ্রধর। তিনি বলেছেন এটা একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে।'

তিনি জানেন যে প্রতিটা শব্দ শুনছেন দেবতা। খারাপ খবরের শেষাংশটুকু বর্ণনা করে চলেছেন তিনি।

'আগামীকাল সকালে মহাস্নান কক্ষে বিশাল গণভোজন আর শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে হরপ্পার নাগরিকদের জন্য। আপনি জানেন যে আমাদের মহাস্নানাগার মহেঞ্জোদারোর চেয়ে বিশগুণ বড়। পনেরো হাজার দর্শকের বসার বিশাল একটা জায়গা করার জন্য গত রাত থেকে কাজ শুরু করছে তারা।'

এখনো বিভাষণ পূজারির কোনো সাড়া নেই।

সোমদত্ত মাথাটা পেছনে এলিয়ে দিয়ে দুঃখে আর্তনাদ করে উঠলেন। পৃথিবীটা ঘুরছে তার। বিশ্বাসই হচ্ছে না মাত্র কয়েক ঘন্টা এবং দিনের ব্যবধানে তার সুখী, সমৃদ্ধ হরপ্পা এমন চরম দুঃস্বপ্নে রূপ নিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড পর সোজা হয়ে বসলেন তিনি, এরপর সেই ভয়ংকর কথাটা বললেন। সামনে ঝুঁকে দেবতার মুখের কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে এমনভাবে কথাগুলো বললেন যেন প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করা গভীর পাপ।

'আগামীকাল সকালে ওরা আপনাকে নির্মম নির্যাতন করবে। হে মহৎ দেবতা, সমগ্র হরপ্পাবাসী দেখবে।'

বানারস, ২০১৭
মহান বৈদিক সভ্যতা

মহান মঠাধ্যক্ষ মহাপ্রতাপশালী দ্বারকা শাস্ত্রীর সাথে আসন্ন দেখা করা নিয়ে ভীষণ নার্ভাস হয়ে আছে দামিনী। এক উভয় সংকটে পড়েছে সে। একদিকে জগতের সবচেয়ে ক্ষমতাবান রহস্যময় সাধু ব্যক্তির সাথে দেখা করতে হবে বলে উদ্বিগ্ন সে, অন্যদিকে বায়োজ্যেষ্ঠ এই ব্যক্তিটি তার শ্বশুরকুলের একমাত্র স্বজন। তাই কী পড়বে, কী বলবে বা কখন চুপ থাকবে এ নিয়ে ভীষণ দোটানায় পড়ে গেছে দামিনী।

দামিনী এবং বিদ্যুৎ উভয়েই জানে যে আজকের দিনটা নিত্যদিনের মতো নয়। সন্ধ্যায় রুমি পেরেরার সাথে দেবতার সাক্ষাতের বিষয়টা প্রতি সেকেন্ডে তাদের মনে আশঙ্কার ছায়া তৈরি করছে। বিদ্যুতের নিরাপত্তার ব্যাপারে ভীষণ সচেতন দামিনী। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ জানতে চায় রুমি কেন তাকে খুন করতে চায়। কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এই ভয়ংকর গুপ্তঘাতককে পেছন থেকে সাহায্য করছে সেটা জানতে আগ্রহী সে। প্রপিতামহের সাথে আজ সকালে আসন্ন দেখা করার সময়টাতে এই পরিকল্পনার অন্তত কিছু অংশ আবিষ্কার করতে চায় সে।

আশ্রমের সবাই তাকে রানির মতো সম্মান দিচ্ছে, ব্যাপারটা বেশ ভালো লাগলো দামিনীর। বারানসির ফ্লাইটে বসে সে ভাবছিলো মঠ হয়তো দম বন্ধ করা অন্ধকার কোনো ঘিঞ্জি জায়গা। যেখানে কঠোর নিয়মকানুন আর বিরক্তিকর সব লোকজনে ভরা। এখানে পৌঁছে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখে আনন্দের সীমা রইলো

না তার। এখানে প্রবেশ করলে মঠটাকে সত্যি সত্যি ভীতিকর আর দুর্গের মতো মনে হতে পারে কারো, ভেতরের জীবনযাত্রা আর মানুষগুলো ইতিবাচকভাবে দ্যুতিমান। ঘুম থেকে উঠতেই সুরেলা কণ্ঠের পবিত্র মন্ত্রপাঠ স্বাগত জানালো তাকে, যা এর আগে কখনো দেখেনি সে। উন্নত হার্বাল চা পরিবেশন করা হলো তাকে। কী সুমধুর ঘ্রাণ! চা পান করে শরীরটা আশ্চর্য রকম চাঙা হয়ে গেল তার। এর পরপরই সূর্যের আলোয় আলোকিত বারান্দায় বসে প্রাণবন্ত, হাসিখুশি প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কঠোর যোগ ব্যায়াম করতে হলো তাকে।

তাকে ঠিক রাজকুমারীর মতো গরম গরম নাস্তা পরিবেশন করা হলো দেখে অবাক হলো দামিনী। তাজা ফলের সালাদ আর নিজস্ব খামারের দুধে ঘরে বানানো দইয়ের সাথে সুস্বাদু ভারতীয় আলু পরোটা ও পোহা মটর। তার সাথে কর্নফ্লেক্স আর সিম ভাজি। দেব-রাক্ষস মঠ, এর প্রশিক্ষকগণ, এখানকার কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা এবং এখানকার স্থাপনা কোনোভাবেই পশ্চিমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনার চেয়ে কম নয়। পার্থক্যটা হলো, এখানে প্রগাঢ় আধ্যাত্মিকতা, যুদ্ধবিদ্যা আর তন্ত্রমন্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা এই সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যক্রম।

দুজনে মিলে মহান দ্বারকা শাস্ত্রীর বিশাল বাসগৃহের দিকে হেঁটে যেতে যেতে হাসি পাচ্ছিলো বিদ্যুতের। একটা বেনারসি শাড়ি পরার চেষ্টা করেছে দামিনী। পুরোহিতজির সহৃদয়বান স্ত্রী আজ সকালেই স্নেহের নিদর্শন হিসেবে এটা উপহার দিয়েছেন তাকে। দীপ্তপদে সগৌরবে মঠাধ্যক্ষের বাসগৃহের দিকে হাঁটা শুরু করার ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে দামিনীর মনে হলো কোথাও একটা বড় ধরনের গন্ডগোল হয়ে গেছে এবং তার অসুবিধাজনক পোশাকটা যেকোনো সময় নিজে নিজে খুলে পড়ে যেতে পারে। কোনো ঝামেলা ছাড়াই মহান বৃদ্ধের ঘরের দুয়ারে পৌঁছে যেতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সে।

সত্য সমাগত। তাকে এখন মধ্যযুগীয় দর্শন গৃহটায় প্রবেশ করতে হবে। মুখোমুখি হতে হবে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ হিসেবে মনে করা তার বয়ফ্রেন্ডের কিংবদন্তির সাথে।

'আচ্ছা, বিদ্যুৎ...তুমি প্রস্তুত আছো তো?' একটা গভীর শ্বাস নিয়ে নার্ভাসভাবে জিজ্ঞেস করলো দামিনী। ভালোমানুষের মতো মাথা নাড়লো বিদ্যুৎ। কোনোমতে হাসি চেপে রেখেছে সে। সে জানে অযথাই ভয় পাচ্ছে দামিনী। সে জানে তার বাবা একজন ত্রিকালদর্শী। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের সময় এবং স্থানের সব ক্ষেত্র সম্পর্কে অবগত তিনি। সে জানে মুহূর্তেই দামিনীর ভালোমানুষ

মনের খোঁজ পেয়ে যাবেন তিনি। বিদ্যুৎ যা জানে না তা হলো, ইতোমধ্যেই দামিনী সম্পর্কে সব জানেন মহাপরাক্রমশালী দ্বারকা শাস্ত্রী।

আর দামিনী সম্পর্কে বিদ্যুৎ যা জানে তার চেয়ে অনেক বেশি জানেন তিনি।

প্রপিতামহের দরজায় করাঘাত করলেন দেবতা। পরিচিত 'হুমম...' শব্দে অভ্যর্থনা জানানো হলো তাকে। বিদ্যুৎ দামিনীকে ইশারা করলো তাকে অনুসরণ করতে।

সবচেয়ে শক্তিশালী মানবাত্মার বাসগৃহে প্রবেশ করেই দামিনী অনুভব করতে পারলো, গুরুজি ছাড়াও কক্ষের ভেতরে অনেক কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে। অশরীরী আত্মাদের হিসহিস শব্দ অনুভব করতে পারছিলো সে। যেভাবেই হোক সে বুঝতে পারলো দ্বারকা শাস্ত্রী, বিদ্যুৎ আর সে ছাড়াও কক্ষে অন্য কারো উপস্থিতি রয়েছে। এসব তীব্র অনুভবগুলো উপেক্ষা করতে চাইলো সে। ঈশ্বরের দোহাই, শ্বশুরের সাথে দেখা করতে এসেছে সে!

আবারও নিজের বিশাল বিছানার উপরে হেলান দিয়ে শুলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। এক ডজন বালিশ আর পাশবালিশ দিয়ে রাজকীয় শরীরটাকে উঁচু করে রাখা হয়েছে। অসাধারণ মানুষটাকে একনজর দেখেই সম্মোহিত হয়ে গেল দামিনী। তার ঢেউ খেলানো সাদা চুল, যুদ্ধক্লান্ত মুখ আর রাজকীয় উপস্থিতি তাকে এতটাই বিমুগ্ধ করে দিলো যে শরীরটা অসাড় হয়ে গেল।

'প্রণাম, বাবা,' ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে বিনয়ী আর শ্রদ্ধার সম্বোধনে ডাকলো বিদ্যুৎ।

'*ইয়াসাসভি ভাবা...*' জবাব দিলেন গুরুজি। *তোমার মঙ্গল হোক* বলে আশীর্বাদ করেছেন মঠাধ্যক্ষ।

'বাবা, আমার সাথে দামিনী রয়েছে,' জানালো বিদ্যুৎ, ভীষণ লজ্জিত বোধ করছে। 'আমি জানি সে মঠে প্রবেশ করার সাথে সাথেই তার সম্পর্কে সবকিছু জেনে গেছেন আপনি।'

এটা তার জন্য একটা সংকেত বলে মনে হলো দামিনীর। এবার তার ধারণা ঠিক হলো।

'প্রণাম, বাবা,' শ্রদ্ধার ভঙ্গিতে হাতজোড় করে বললো সে।

চোখ খুলে দামিনীর দিকে তাকালেন দ্বারকা শাস্ত্রী। মুহূর্তের মধ্যে কঠোর চোখদুটোতে প্রগাঢ় স্নেহ ভরে উঠলো। বিড়বিড় করে কিছু একটা বললেন তিনি, যা বিদ্যুৎ বা দামিনী কেউই বুঝতে পারলো না।

হাসলেন গুরুজি এবং স্নেহমাখা কণ্ঠে দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন।

'স্বাগত, সাঞ্জনা।'

মণিমুক্তাখচিত হারটা জ্বলজ্বল করছে। মহান দ্বারকা শাস্ত্রী বিদ্যুৎকে তার পুরোনো মেহগনি কাঠের সিন্দুক খোলার নির্দেশ দিলেন। ভেতর থেকে সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত চন্দনকাঠের একটি বাক্স বের করে আনতে দেখে বোবা হয়ে গেল দামিনী। মণিমুক্তাখচিত সোনার হারটি তার দেখা সবচেয়ে দামি এবং সুন্দর গহনা। প্রাচীনকালের কোনো রানির সেকেলে কোনো গুপ্তধনের মতো দেখাচ্ছিলো ওটাকে।

'বাবা...বিদ্যুৎ...এত দামি একটা জিনিস আমি কীভাবে নিতে পারি...' দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলে পরামর্শের জন্য বিদ্যুতের দিকে তাকালো সে। বিদ্যুৎ হেসে ওটা রেখে দিতে বললো তাকে। এটা এক মহান বৃদ্ধের স্নেহের নিদর্শন।

'আমি খুশি যে তোমরা দুজনেই এখানে আছো,' কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর বললেন মঠাধ্যক্ষ। 'অন্য কোনো কিছু নিয়ে কথা বলার আগে বিদ্যুৎ আমাকে বলো তো, তুমি কি ঐ আততায়ীর পছন্দমতো সময় আর স্থানে দেখা করতে চাও? সে কিন্তু পুরোপুরি প্রস্তুত থাকবে।'

গত সন্ধ্যার ঘটনা সম্পর্কে গুরুজিকে অবহিত করেছেন পুরোহিতজি। দ্বারকা শাস্ত্রী সাবধান হলেও উদ্বিগ্ন নন। তিনি জানেন তার প্রপৌত্র কোনো সাধারণ মানুষ নয়। বিদ্যুৎ বারানসিতে পা রাখার সাথে সাথেই তিনি বুঝতে পেরেছেন চূড়ান্ত মোকাবেলার সময় আসন্ন–দেবতা, দানব, ভালোমন্দ, রুমি আর বিদ্যুতের মধ্যে একটা সংঘর্ষ। সাড়ে তিন হাজার বছর আগেই এটা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। সময় হয়েছে এখন। গুরুজি জানেন রুমির সাথে লড়াই কেবল একটা শুরু।

'হ্যাঁ, বাবা, আমি ওর সাথে দেখা করে চিরদিনের জন্য সব মিটিয়ে দেবো। গঙ্গা আরতি পবিত্র সময়। অশুভ শক্তিকে দূর করবো আমরা,' জবাব দিলো বিদ্যুৎ।

গর্বভরে হাসলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। হাত উঁচু করে আশীর্বাদ করলেন বিদ্যুৎকে।

'কিন্তু বাবা, বিদ্যুৎ...এখনো অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর অজানা,' মৃদু স্বরে বললো দামিনী। 'আমি বুঝতে পারছি যে মানসিক উপনিবেশবাদের বড় পরিকল্পনা হিসেবে ব্রাহ্মিণাবাদের সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না ব্রাহ্মিণাবাদ ধ্বংস অথবা হরপ্পা বা সরস্বতী সভ্যতা সম্পর্কে মিথ্যাচার কীভাবে এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে পারে।'

বিদ্যুতের দিকে ফিরলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। 'তুমিই বা কেন এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছো না?'

'ঠিক যেমনটি গত সন্ধ্যায় আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করেছিলাম, দামিনী, এক সম্প্রদায়ের উপর আরেক সম্প্রদায়ের পুরোপুরি কর্তৃত্ব করার জন্য প্রয়োজন হয় শাসকের প্রতি শাসিতের প্রশ্নাতিত আনুগত্য। এটা তখনই সম্ভব হয় যখন প্রজন্মের পর প্রজন্ম সমগ্র মানুষকে বিশ্বাস করানো হয় যে শাসকের শাসক হওয়ার নৈতিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার রয়েছে।'

এক মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ দেখলো দামিনী তার কথা শুনছে কি না। হ্যাঁ, শুনছে সে।

ওদের পরিকল্পনা ছিলো এমন একটা অতীতের বীজ বপন করতে হবে যেখানে পশ্চিমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হবে। ভারতীয়রা পশ্চিমাদের চেয়ে সর্বদাই নিকৃষ্ট–এটা প্রচার করতে এই পরিকল্পনাটা বিস্ময়করভাবে কাজে লাগে। এমনকি হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকেই পশ্চিম থেকে আগতরা উন্নয়ন আর সমৃদ্ধি বয়ে এনেছিলো। সাম্রাজ্যবাদীদের পুরো পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে যদি তারা যাদের শোষণ করছে তারা সত্যটা জানতে পারে। জানতে পারে যে যখন তাদের বর্তমান শাসকগণ যখন পশুর চামড়া পরে গুহায় বাস করছিলো তখন তারাই প্রতিষ্ঠা করেছিলো বিশাল সভ্যতা, চোখ ধাঁধানো নগর আর আধুনিক বাণিজ্য!'

'এবং হরপ্পা ঠিক তাই করতো! এটা ভারতীয়দেরকে তাদের মহান অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতো। এটা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতো যে তাদেরই পূর্বপুরুষরা পৃথিবীতে সভ্যতার সূচনা করেছিলো!' পুরো ব্যাপারটা ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে বিস্মিত হচ্ছিলো দামিনী।

মাথা নাড়লেন দ্বারকা শাস্ত্রী। 'এখানে আরো অনেক কিছুই রয়েছে, বেটি। তুমি কি জানো খননের সময় অসংখ্য হাভান কুণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছিলো? এর মানে হলো, হরপ্পাবাসী যে ঈশ্বরের পূজা করতো তারা আসলে পশুপতি এবং শক্তি, যাদের অপর নাম প্রভু শিব আর মা দুর্গা? কতবার তুমি পড়েছ যে হরপ্পার খনন প্রকল্পগুলিতে যোগ সাধনার চিত্রসংবলিত শত শত মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছিলো?'

'সত্যি বলছি বাবা, এ ব্যাপারে আমি বিশদ কিছু পড়িনি,' জবাবে জানালো দামিনী। 'আসলে খুব কমসংখ্যক মানুষই হয়তো পড়েছে।'

'দামিনী, বৈদিক আচারাদির জন্য হাভান কুণ্ড অবশ্যই প্রয়োজন। এমনকি আজও ভারত আর নেপাল জুড়ে হিন্দুরা পশুপতি আর শক্তির পূজা করে। হরপ্পায় যদি যোগ সাধনার চর্চা হয়ে থাকে, এর মানে কী?' আগ্রহভরে জানতে চাইলেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

'এর মানে হলো, প্রমত্ত সরস্বতীর তীরে এক বিশাল বৈদিক বসতি ছাড়া হরপ্পা আর কিছুই নয়...' সত্যটা অনুধাবন করতে করতে বললো দামিনী।

হরপ্পার পেছনের সত্যটা অবশেষে দামিনী বুঝতে পেরেছে দেখে দ্বারকা শাস্ত্রী এবং বিদ্যুৎ উভয়েই সন্তুষ্ট হলো।

'তাহলে তুমি দেখতেই পাচ্ছো, দামিনী, ব্রাহ্মিণাবাদকে গুঁড়িয়ে দেওয়া, অর্ধ শতাব্দীকাল খনন করতে উপেক্ষা করা, অর্ধসত্য প্রচার করা এবং হরপ্পা সভ্যতার গৌরব আর অর্জন সম্পর্কে সত্য লুকোনো, সবই ছিলো ইতিহাসের পাতা থেকে একটা যুগকে মুছে দেওয়ার জোর প্রচেষ্টা। সাদা চামড়ার লোকেরা খাইবার পাস দিয়ে অশ্ব চালিয়ে প্রবেশ করছে, এমন চিত্র পুরো উপমহাদেশ জুড়ে প্রচার করা হয়। ভারতকে তার প্রাচীন গৌরব থেকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশলই ছিলো হরপ্পা। ভারতীয়রা হয়তো কখনোই জানতে পারতো না যে তারাই পৃথিবীতে সভ্যতার সূচনা করেছিলো!'

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো দামিনী। সে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি যে হরপ্পার মতো অস্পষ্ট একটা বিষয় নিয়ে এমন গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। চা পরিবেশন করা হলো। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলো তিনজন। সত্যটা হজম করতে বেশ কিছুক্ষণ সময় দরকার দামিনীর।

হঠাৎ করে দ্বারকা শাস্ত্রীর দিকে ফিরলো দামিনী। জরুরি কণ্ঠে জানতে চাইলো, 'বাবা, তাহলে আক্রমণকারী আর্যগণ কারা?'

বিদ্যুতের দিকে তাকালেন দ্বারকা শাস্ত্রী। পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসলো তারা।

'প্রিয় দামিনী,' তার দিকে ঝুঁকলো বিদ্যুৎ। 'আর্য-আক্রমণকারী বলতে কেউ ছিলোই না।'

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ

প্রতিশোধ

বেশ কয়েক মিনিট যাবৎ নড়াচড়া বা কথা বললেন না দেবতা। ভয়ংকর সত্যটা হজম করার সময় দিলেন সোমদত্ত যাতে তিনি গভীর ক্ষতটার পরিচর্যা করতে পারেন। ভয় পেলেন প্রকৌশলী। তার দেখা করার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এগিয়ে গিয়ে দেবতাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে যাবেন, এমন সময় কথা বলে উঠলেন বিভাষণ পূজারি। মুখটা তখনো হাঁটুর মাঝখানে গোঁজা।

'পর্বত...উন্মত্ত সরস্বতীর গতিধারা পালটে দেওয়ার জন্য ইট আর ব্রোঞ্জের যে পর্বত তৈরি করার কথা ছিলো তার কী অবস্থা?'

'যুদ্ধের গুরুত্ব দিয়ে ঐ পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন চন্দ্রধর। মুহূর্তের মধ্যে অন্যান্য প্রকৌশলীদের জড়ো করে আপনার পরিকল্পনা এবং নকশা অনুসারে পর্বত তৈরিতে লেগে গেছেন তিনি। বিশাল কর্মযজ্ঞ। হাজার হাজার নর-নারী, পশু আর দাস ব্যবহৃত হচ্ছে এ কাজে।'

বিভাষণ পূজারি হঠাৎ মাথা তুলে তাকালেন। যা দেখলেন তাতে একটা হার্টবিট মিস করলেন প্রধান প্রকৌশলী।

বর্তমানে হরপ্পার মাতাল, বিকৃত মস্তিষ্ক বাসিন্দাদের চেয়ে বেশি উন্মত্ত মনে হচ্ছে দেবতাকে। কারা প্রকোষ্ঠের অন্ধকারে সোমদত্ত কেবল দেখতে পেলেন অন্ধকারে চিতার চোখের মতো জ্বলছে বিভাষণ পূজারির চোখ। সেই চেনা মুখ, চেনা মানুষ, তবে বিভাষণ পূজারি এখন সম্পূর্ণ অন্য কোনো প্রাণী। তার নিজের আত্মাই কি অন্ধকারতম কোনো কিছুতে রূপান্তরিত হয়েছে নাকি অশরীরী জগৎ

থেকে তিনি কোনো অশুভ আত্মাকে হাজির করেছেন, সোমদত্ত বলতে পারবে না। তবে নিশ্চিতভাবে বিভাষণ পূজারি তার নিজের মধ্যে নেই।

‘উউউররররআআআআআগগহহহহ!’ ভূতগ্রস্ত দেবতা এমন ভয়ংকরভাবে চিৎকার করে উঠলেন যে অল্প কিছুক্ষণের জন্য মৃৎ কারাবাসের সব চিৎকার-গোঙানি থেমে গেল। মৃত্যু কারাগারের সব অধিবাসী তাদের সম্মিলিত যন্ত্রণার চেয়ে আরো অধিকতর যন্ত্রণাক্লিষ্ট কারো উপস্থিতি অনুভব করতে পারলো। বন্দি দুর্ভাগাদের অন্তরাত্মা চিরে খানখান করে দিলো বিভাষণ পূজারির অবর্ণনীয় কষ্ট। তারা নিজেদের কষ্ট ভুলে অচেনা এক বন্দির জন্য বিলাপ করতে লাগলো।

‘আআআররররগগগহহহহ....আআআআররররগগগহহহহ...ননননআআআররগগহহহহ...’

বিভাষণ পূজারি চিৎকার করেই চলেছেন। চোখদুটো উলটে গেছে, থাবায় রূপান্তরিত হচ্ছে প্রসারিত হাতের মুষ্টি। যেন ভয়ংকর কোনো পিশাচ ভর করেছে তার উপর। সোমদত্ত ভয়ে ভয়ে দেখলেন, ঘুরে দেয়ালের একটা চোখা পাথরের সাথে নিজের কপাল ঠেকতে শুরু করেছেন দেবতা। লাফ দিয়ে সামনে গিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে সরিয়ে আনলেন সোমদত্ত। ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। দেবতার রক্তে ইতোমধ্যে রঞ্জিত হয়ে গেছে দেয়াল এবং আবারও তার চোখ এবং মুখমণ্ডল ভেসে যাচ্ছে পুণ্য রক্তস্রোতে।

অনেক কষ্টে দেবতাকে ধরে নোংরা মেঝের উপর বসালেন সোমদত্ত। নিজের বন্ধু এবং এখন পর্যন্ত হরপ্পার সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষটাকে ধরে ভয় পেলেন সোমদত্ত। বরফের মতো ঠান্ডা বিভাষণ পূজারির শরীর। কিছু অশরীরী মন্ত্র জপ করে চলেছেন তিনি। যেন ফুলের কুঁড়িতে গুনগুন করে চলেছে একটা ভ্রমর। কারো সাহায্য চাওয়ার কথা ভাবলেন প্রকৌশলী। যে ঐশ্বরিক গুণের জন্য দেবতাকে শ্রদ্ধা করতেন তিনি, বিভাষণ পূজারি কি অবশেষে সেটা হারিয়ে ফেলেছেন?

‘আমার বুদ্ধি লোপ পায়নি, সোমদত্ত,’ হিসহিস করে বলে উঠলেন দেবতা। যেন সোমদত্তের মনের কথা পড়তে পেরেছেন তিনি। হয়তো তাই পেরেছেন। ‘অনুগ্রহ করে এক মুহূর্তের জন্য তোমার ছোরাটা আমাকে ধার দেবে?’

‘মহাস্নান ঘাট থেকে আমরা আগামীকাল আপনাকে উদ্ধার করবো, প্রভু,’ সোমদত্ত বললেন। ‘সেজন্য যদি আমাদের শরীরের শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দিতে হয় তবুও।’

‘অনুগ্রহ করে এক মুহূর্তের জন্য তোমার ছোরাটা আমাকে ধার দেবে, সোমদত্ত?’ পীড়াপীড়ি করলেন বিভাষণ পূজারি। যেন তার প্রকৌশলী বন্ধু এইমাত্র যা বলেছে সেটা শুনতে পাননি তিনি।

'হে মহান দেবতা, আপনার স্ত্রী আর ছেলের জন্য উদ্বিগ্ন হবেন না। তারা আমাদের কাছে আপনার মতোই পূজনীয়। আমরা তাদের কোনো ক্ষতি হতে দেবো না,' পাশে বসে নিজের অঙ্গবস্ত্রম দিয়ে দেবতার মুখটা পরিষ্কার করে দিতে দিতে বললেন সোমদত্ত।

'তোমার ছোরাটা আমাকে ধার দেবে, সোমদত্ত?' পুনরায় বললেন বিভাষণ। তিনি থামছেনই না।

খাপ থেকে নিজের চকচকে ছোরাটা বের করলেন সোমদত্ত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা নিবেদনের মতো হাঁটু গেড়ে বসে দুহাতে দেবতার পানে ছোরাটা বাড়িয়ে ধরলেন তিনি।

'কী করছেন আপনি, প্রভু?' বিস্মিত হলেন প্রকৌশলী। নিজের কবজি চিরে ফেললেন বিভাষণ পূজারি। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোলো। সোমদত্ত মনে যতটা আঘাত পেলেন, তার চেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। গত এক দিনে দেবতা যে পরিমাণ রক্ত হারিয়েছেন, এটা মারাত্মক হতে পারে।

'উদ্বিগ্ন হয়ো না, সোমদত্ত,' বললেন দেবতা। 'তোমার কি জানা নেই আগুন, পানি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আঘাত, অপরসায়ন, অসুস্থতা, মহাকর্ষ আর জাদুবিদ্যা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না?'

'কিন্তু প্রভু...'

'তোমার অবশ্যই এখন চলে যাওয়া উচিত,' তার কথার মাঝখানে বাধা দিলেন দেবতা। 'আগামীকাল সকালে তীরন্দাজ আর অশ্বারোহীদের প্রস্তুত রেখো। তারা যখন আমাকে এখান থেকে মহাস্নান ঘাটে নিয়ে যাবে, তাদের আটকে রেখো। বাকিটা আমিই সামলাবো।'

দেবতার কথা মানতে হবে সোমদত্তকে। তবে দেবতাকে তার দিক থেকে পেছন ফিরে বসতে দেখে ভয় পেলেন তিনি। কারা প্রকোষ্ঠের পাথরের দেয়ালে নিজের রক্ত দিয়ে কিছু লিখছেন দেবতা। যদিও শান্ত এবং ধীর-স্থির ভঙ্গিতে দেয়ালে লিখে চলেছেন বিভাষণ পূজারি, সোমদত্ত লক্ষ করলেন দেবতার হাত কাঁপছে।

'প্রহরী!'

এক মুহূর্তের জন্যও না ফিরে কারাগারের নিরাপত্তা রক্ষীদের ডাকলেন বিভাষণ পূজারি। মুহূর্তের মধ্যে কারা প্রকোষ্ঠের দিকে মাতাল নিরাপত্তা রক্ষীদের ছুটে আসার শব্দ পেলেন সোমদত্ত। কারা প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে যাওয়ার আগ মুহূর্তে মাথা ঘুরিয়ে সোমদত্তের দিকে তাকালেন বিভাষণ পূজারি। ফিসফিস করে

বললেন, 'আগামীকালের জন্য কথাটা মনে রেখো, বন্ধু। তীরন্দাজ আর অশ্বারোহী যোদ্ধাদের তৈরি রেখো। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ধার অভিযান চালাবো আমরা।' হাসার চেষ্টা করলেন তিনি।

ছোট্ট কুপির টিমটিমে আলোয় বিভাষণ পূজারির মুখের একপাশটা দেখতে পেলেন সোমদত্ত। সে এক ভয়ংকর দৃশ্য। একদা যে মুখ প্রেম-ভালোবাসা, মায়া-মমতা আর ঐশ্বরিক আভায় জ্বলজ্বল করতো, সে মুখ এখন রক্ত, ঘাম, ব্যথা আর ঘৃণায় দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ প্রতিভার অধিকারী প্রকৌশলীকে কে যেন বলে দিলো, ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ বাঁধতে যাচ্ছে আর্যব্রত জুড়ে। এত সহজে হারিয়ে দেওয়া যাবে না দেবতাকে।

সোমদত্ত বিদায় নিলেন। মাতাল নিরাপত্তা রক্ষীরা কারাকক্ষ বন্ধ করার জন্য বিশাল দরজায় ঠেলা দিলো। রক্তে রঞ্জিত দেয়ালে একটা শব্দ লেখা আছে। দরজা বন্ধ হওয়ার সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় আগে একনজর লেখাটা দেখতে পেলেন সোমদত্ত।

মহান দেবতার কারাগার কক্ষ রঞ্জিত হয়ে আছে তারই নিজের রক্তে। তাতে লেখা আছে একটা মাত্র শব্দ।

প্রতিশোধ!

শেষ সপ্তর্ষি

'আর্য শব্দটা এসেছে সংস্কৃত থেকে। এর মানে হলো উচ্চবংশীয়। প্রাচীনকালে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষকে আর্যব্রত বা উচ্চবংশীয়দের আবাসস্থল বলা হতো। আর্যদের আবাসস্থল বলতে এটা কোনো বিশেষ ধর্মকে বোঝানো হয়নি,' বিষয়টা পরিষ্কার করলেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

'সুতরাং, তুমি বলতে পারো আর্যব্রত বা প্রাচীন উত্তর ভারতে যেসব মানুষ বাস করতো তাদেরকে আর্য বা আরিয়ান বলে। বিশাল বিশাল নগরী, বন্দর তৈরি করেছিলো তারাই। তারাই ধাতুর ব্যবহার আবিষ্কার করেছিলো এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন করেছিলো। পশ্চিম থেকে আগত খাড়া নাক আর নীল চোখওয়ালা অশ্বারোহীদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কল্পনা...একটা মিথ্যা প্রপাগান্ডা, যা এমনভাবে ছড়ানো হয়েছে যে এটাকে প্রায় সত্য বলে মনে হয়,' সাথে যোগ করলো বিদ্যুৎ।

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো দামিনী। এখনো আচ্ছন্নের মতো হয়ে আছে সে। তবে হরপ্পা রহস্যের শেষ প্রান্ত আবিষ্কার করতে পেরে খুশি সে।

'এ সবকিছুই কেমন যেন অবাস্তব। তুমি জানো, বিদ্যুৎ, আমরা আমাদের মহান জাতি আর পূর্বসূরি ভারতীয়দের নিকট ঋণী। আমাদের অবশ্যই এই বিষয়টা সবার সাথে শেয়ার করতে হবে!' বলে উঠলো আনন্দিত এবং উদ্দীপ্ত দামিনী। প্রত্যাশা নিয়ে বিদ্যুৎ আর গুরুজির দিকে তাকিয়ে আছে সে।

বিদ্যুৎ আর দ্বারকা শাস্ত্রী দৃষ্টিবিনিময় করলো। 'বিষয়টা ততটা সহজ নয়, দামিনী,' বললো বিদ্যুৎ। 'তুমি যা আজ আবিষ্কার করলে এবং বাবার কাছ থেকে

যা আমি গতকাল শুনেছি, তা কেবল বিশাল আইসবার্গের একটা ছোট্ট টুকরো মাত্র। কেবল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর ভারতীয়দের পদাবনত করার মধ্যেই এই ষড়যন্ত্র সীমাবদ্ধ নয়। এটা তার চেয়ে আরো গভীর এবং আরো অশুভ। এর সাথে পুরো পৃথিবী, সমগ্র মানবজাতি জড়িয়ে আছে।

‘আমাদের বংশের রক্ত অভিশপ্ত,’ বললেন মহান দ্বারকা শাস্ত্রী।

বিদ্যুৎ এবং দামিনীর কাছে এটা খুব একটা গুরুত্ব পেল না। তারা যেন কোনো থ্রিলার মুভি দেখছিলো। উভয়েই জানে এ সবই বাস্তব।

‘বিদ্যুৎ, তুমি অবশ্যই আমাদের শ্রেষ্ঠতম পূর্বপুরুষ দেবতা বিভাষণ পূজারির বেদনাদায়ক, করুণ কিংবদন্তি সম্পর্কে দামিনীকে বলবে,’ বলে চলেছেন দ্বারকা শাস্ত্রী। ‘তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সপ্তর্ষিদের অভিশাপ সম্পর্কে জানতে হবে তোমাদের।’

মন্ত্রমুগ্ধের মতো গুরুজির দিকে তাকিয়ে রইলো দর্শক দুজনে।

‘বিভাষণ পূজারি, পণ্ডিত চন্দ্রধর, প্রিয়ংবদা, সাঞ্জনা, সরা মা, মানু এবং হরপ্পার চূড়ান্ত পতনের সম্পূর্ণ কাহিনি বর্ণনা করতে বহুদিন লাগবে আমার। সরস্বতী নদীর প্রলয়ংকরী মহাপ্লাবনের পরে যেসব ঘটনা ঘটেছিলো সেটাও বলবো আমি তোমাকে, এবং বলবো কীভাবে এই ঘটনাসমূহ মানবজাতির ভাগ্যরেখাকে চিরতরে বদলে দিয়েছিলো। তবে আজ আমাদের সে সময় নেই। আমাদের দুয়ারে কড়া নাড়ছে শত্রু,’ বললেন দ্বারকা শাস্ত্রী। বিদ্যুৎ আর দামিনী অনুমান করে নিলো তিনি রুমির সাথে শো-ডাউনের কথা বলছেন। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি।

এতক্ষণ মহান দ্বারকা শাস্ত্রী যা বলেছেন তার মধ্যে সাঞ্জনা নামটা মনে গেঁথে রয়েছে দামিনীর। তার কক্ষে প্রবেশকালে এই নাম ধরেই তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন গুরুজি। তখন সে এটাকে বুড়ো মানুষের স্মৃতিভ্রম বলে ধরে নিয়েছিলো। কিন্তু এখন আবারও ঐ নামটা উচ্চারণ করেছেন তিনি এবং তাও আবার নির্মম একটা কাহিনির সূত্র ধরে।

দামিনী যখন একটা নাম নিয়ে ভেবে মরছিলো, বিদ্যুতের মনে তখন ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। সে দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর চেষ্টা করছিলো। প্রপিতামহ যখন দামিনীকে সাঞ্জনা বলে সম্বোধন করেন, এটা তাকে বজ্রের মতো আঘাত করে। শেষ দেবতা এবং দেব-রাক্ষস মঠের বংশলতিকা অনুসারে ছবিটা এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে বিদ্যুৎ। সে এখন জানে কেন দ্বারকা শাস্ত্রী বলেছিলেন হরপ্পার শ্মশ্রুমণ্ডিত পুরোহিত রাজার মূর্তিটা আর কেউ নয়, বিদ্যুৎ নিজে।

নীরবে প্রপৌত্রের চিন্তিত মুখ পর্যবেক্ষণ করছেন মঠাধ্যক্ষ। তিনি জানেন বিদ্যুৎ ধরে ফেলেছে। ভগবত গীতা থেকে একটা শ্লোক পাঠ করলেন গুরুজি:

ভাসামজী জিরনানি যথা ভিহায়া
নবাণী গ্রন্থি নারো পারানি
তথা সারিরানি ভিহায়া জিরনানি
আনয়ানি সময়াতি নবানি দেহি

তার দিকে না তাকিয়ে দামিনীর জন্য অনুবাদ করে দিলো বিদ্যুৎ।

'মানুষ যেমন পুরোনোটাকে ফেলে দিয়ে নতুন পোশাক পরে, ঠিক সেইভাবে আত্মাও পুরোনো দেহ ছেড়ে নতুন নশ্বর দেহকে গ্রহণ করে।'

দামিনী বুঝতে পারছিলো না কী ঘটছে। তবে বিদ্যুতের মনটা আলোকিত হয়ে গেছে।

পুনর্জন্ম, ভাবলো সে। *পুনরুত্থান।*

॥ঌ॥

প্রপিতামহের দিকে চেয়ে ঈষৎ মাথা নাড়লো বিদ্যুৎ। তিনি সাথে সাথেই বুঝতে পারলেন সে কী বলতে চাচ্ছে। সবকিছুর জন্য দামিনী এখনো প্রস্তুত নয়। সহস্রাব্দ আগে অনেক দূরের কোনো ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্দ ভূমিতে তারা তিনজন আগেও মিলিত হয়েছিলো, এই তথ্য হজম করতে পারবে না দামিনী।

'বাবা, সপ্তর্ষিদের অভিশাপ আর ষড়যন্ত্রের জাল সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন,' শুরু করলো বিদ্যুৎ। 'কন্সট্যান্টিনোপলে কী ঘটেছিলো সেটা বলুন আমাদেরকে।' সমগ্র মানবজাতি এবং তাদের পবিত্র বংশধারা কীসে অভিশপ্ত হয়েছিলো সেটা জানার আগ্রহের সাথে সাঞ্জনা আর দামিনীর সম্পর্কের আলোচনার মোড় ঘোরাতে চাইছিলো সে। কোনো একদিন তাকে এ বিষয়ে বলবে সে। তবে সেটা আজ নয়।

মঠাধ্যক্ষ সাড়া দেওয়ার আগেই দরজায় টোকা পড়লো। বলভান্ত এসেছে। শ্রদ্ধাভরে হাতজোড় করে গুরুজিকে সম্মান জানালো সে।

'কী ব্যাপার, বলভান্ত?' জানতে চাইলেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

'গুরুদেব, অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা চাইছি। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ হলো। বিদ্যুৎকে আমার সাথে যেতে হবে যাতে সন্ধ্যার মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে পারি আমরা। মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি আছে এখন। ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত হবে না,' হাতজোড় করেই জবাব দিলো বলভান্ত।

দ্বারকা শাস্ত্রীকে ঈশ্বরের ন্যায় পূজা করে সে এবং যতক্ষণ গুপ্তঘাতক রুমি বারানসিতে আছে, বলভান্ত এটাকে নিজের লড়াই মনে করে। শতবর্ষ ধরে তার পূর্বপুরুষগণ শাস্ত্রী বংশকে রক্ষা করে আসছে।

'ধন্যবাদ, বলভান্ত দাদা। অনুগ্রহ করে আমাকে আরেকটু সময় দাও। বাবা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলতে যাচ্ছেন, যেখানে রুমি সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে পারবো,' দ্বারকা শাস্ত্রীর বদলে জবাব দিলো বিদ্যুৎ। প্রপিতামহের প্রতি আরো বেশি আকর্ষণ বোধ করছে সে। এটুকু স্বাধীনতা সে নিতেই পারে।

'কিন্তু বিদ্যুৎ...'

'আর মাত্র একটি ঘণ্টা, দাদা। তারপর আমরা প্রস্তুতি শুরু করবো,' অনুনয় করলো বিদ্যুৎ।

'তুমি যেহেতু বলছো, বিদ্যুৎ। তবে মনে রেখো, এক ঘণ্টা মাত্র।'

মঠাধ্যক্ষকে কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল বলভান্ত।

॥ ৯৯ ॥

'৩১২ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতাশালী রোমান রাজা কন্সস্ট্যানটাইন খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ধর্মের জনপ্রিয়তার কারণে তিনি এটা গ্রহণ করেন নাকি তার শক্তিশালী প্রভাবে ধর্মটা আরো ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছিলো তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই: বৌদ্ধধর্মের জন্য মহান অশোকা যা করেছিলেন, খ্রিষ্টধর্মের জন্য কন্সট্যানটাইনও তাই করেছিলেন। ধর্মযাজকদের পেছনে তিনি তার সর্বময় ক্ষমতা একীভূত করেছিলেন,' বর্ণনা করে চলেছেন গুরুজি। 'ভবিষ্যদ্বাণীতে যা বলা হয়েছিলো ঠিক তাই তাই ঘটতে লাগলো।'

রোমান রাজা, খ্রিষ্টধর্মের প্রসার এবং এখন পর্যন্ত হরপ্পার সাথে সম্পর্কহীন ঘটনাবলী সম্পর্কে মহান দ্বারকা শাস্ত্রীর বক্তব্য শুনে হতবাক হয়ে গেল দামিনী ও বিদ্যুৎ।

'যাই হোক, কন্সট্যানটাইন-এর সময় সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি, গিয়েছিলো ৪৪৫ খ্রিষ্টাব্দে। সম্রাট ভেলেনটিনিয়ান খ্রিষ্টধর্মকে রাজকীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন তখন। রাজনীতির এই খেলা, প্রতারণা এবং তদপরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরের নামে যে রক্তপাত হয় তার সবই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা ছিলো।'

মাথা কাজ করছে না বিদ্যুৎ ও দামিনীর। তাদের কোনো ধারণা নেই কেন দ্বারকা শাস্ত্রী কন্সট্যানটাইন আর ভেলেন্টিনিয়ান সম্পর্কে বলছেন, যখন তাদের সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তা হরপ্পা আর তাদের পিছু ধাওয়াকারী আততায়ী সম্পর্কে।

'আমি জানি তোমাদের সব চিন্তা এবং উদ্বেগ হরপ্পা আর আততায়ীকে ঘিরে,' বললেন দ্বারকা শাস্ত্রী। যেন তিনি তাদের মনের কথা পড়তে পারছেন। সম্ভবত

তিনি তা পারেনও। 'তবে আমি যা বলছি সেটাও শতবর্ষ ধরে আবর্তিত আরো বড় বিশ্বাসঘাতকতা, ক্ষমতা আর ঘৃণার মতোই সমান বাস্তব।'

'প্লিজ, বলে যান, বাবা,' বলে উঠলো বিদ্যুৎ। মঠাধ্যক্ষকে বাধা দিতে চায় না সে।

'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের দ্বার হরপ্পার গৌরব আর সত্যকে ধামাচাপা দেওয়াটা আরো ভয়ংকর রোগের ছোট্ট একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যা একদিন অপ্রতিরোধ্য রক্তপাতের সূচনা করবে কেবল এক জাতির উপর অন্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য। এবং শান্তি আর প্রেমের ধর্ম খ্রিষ্টধর্মের এখানে কিছু করার নেই। এটা তো ঈশ্বরের দয়ালু সন্তান ইয়াসু বা জেসাস-এর ধর্ম। যিনি প্রেম ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুর কথা বলেননি কখনো। আমি কোনো ধর্মকে নিয়ে বলছি না। বলছি মানুষের জঘন্য অনাচার নিয়ে। শয়তানরা কখনো কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী হয় না। সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণেই এদের জন্ম হয়। ক্রুসেডের সময় খ্রিষ্টধর্মই পবিত্র যুদ্ধ শুরু করেছিলো। এখন করছে অন্য কোনো ধর্ম। আগামীকাল আবার করবে অন্য কেউ। খুনে প্রতিহিংসা এক ধর্মবিশ্বাস থেকে অন্য ধর্মবিশ্বাসে ছড়িয়েই যাবে। আর তারা সকলেই এই হত্যাযজ্ঞকে ঈশ্বরের নামে চালিয়ে দেবে। নিজের স্বজাতির উপর ভাবনাতীত গণহত্যা চালাবে এরা ঈশ্বরের বাণীর বিকৃত বর্ণনা করে। আর সপ্তর্ষিরা সম্ভবত মানবজাতিকে এই অভিশাপটাই দিয়ে গেছেন।

দ্বারকা শাস্ত্রীর উন্মোচিত নতুন নতুন তথ্য হজম করতে গিয়ে বিদ্যুৎ আর দামিনীর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। দামিনীর মনে হলো যেন তার মাথাটা বিস্ফোরিত হবে। তার ইচ্ছে করছিলো মঠাধ্যক্ষের বিশাল বাসভবন থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

দ্বারকা শাস্ত্রীও বুঝতে পারছিলেন তার প্রিয় সন্তানেরা তথ্য হজম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবে তার সামনে কোনো পথ খোলা নেই। ভবিষ্যদ্বাণীকৃত ত্রাতা বিদ্যুৎ। সুতরাং, ভারটা তাকে বহন করতেই হবে।

'প্রিয় দামিনী ও বিদ্যুৎ, বাকিটা আমি তোমাদেরকে পরে বলবো। এখন আমি কেবল একটা বিষয় তোমাদের দুজনের সাথে শেয়ার করতে চাই।'

'অনুগ্রহ করে বলে যান, বাবা,' বললো বিদ্যুৎ। কয়েক দিন লাগলেও সে একটানা বসে থাকতে পারবে এই কক্ষে। কিন্তু দামিনী এসব হজম করতে পারছে না। তাকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

'প্রকৃতপক্ষে অশুভ অভিশাপ ছিলো দুটি, বিদ্যুৎ,' বলে চলেছেন গুরুজি। 'দুজন করে মুমূর্ষু সাধু এক-একটা করে অভিশাপ দিয়েছিলেন। তারা ছিলেন পঞ্চম এবং ষষ্ঠ সপ্তর্ষি। তাদের একটা ছিলো বিভাষণ পূজারির বংশধর আর সমগ্র মানবজাতির জন্য। যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি,' বললেন গুরুজি।

সবকিছু ভীষণ দ্রুত ঘটে যাচ্ছিলো। এমনকি বিদ্যুতের জন্যও। সপ্তর্ষি কারা ছিলেন? কেন তারা মারা যাচ্ছিলেন? কী কারণে তারা এমন ভয়ংকর অভিশাপ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন? আর এর সাথে সবকিছু কীভাবে সম্পৃক্ত?

আবারও দরজায় করাঘাত পড়লো। এবার বেশ জরুরি ভঙ্গিতে করাঘাত করছে কেউ। দ্বারকা শাস্ত্রীর অনুমতিক্রমে বলভান্ত প্রবেশ করলো। ওকে বিরক্ত দেখাচ্ছে।

'বিদ্যুৎ, আমাদেরকে এখনই যেতে হবে,' জানালো বলভান্ত। সময় নষ্ট করার কোনো মুডে নেই সে। সামনে একটা লড়াই অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। কোনোভাবেই অপ্রস্তুত অবস্থায় এতে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি নয় যুদ্ধের সেনাপতি।

॥ ॐ ॥

দ্বারকা শাস্ত্রীকে কুর্নিশ করলো দামিনী। পিতৃস্নেহে হাসলেন তিনি। উভয়ের চোখই আর্দ্র হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎকে অস্থির লাগছে। আরো জানতে চায় সে। শেষ একটা প্রশ্ন করার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

'বাবা, ফিরে এসে বাকি গল্পটুকু শুনবো আমি। এই মুহূর্তে আমার একটা মাত্র প্রশ্ন আছে–কে এই রুমি পেরেরা আর কেনই বা সে আমাকে হত্যা করতে চায়?'

দ্বারকা শাস্ত্রী মাথা নাড়লেন এবং তারপর উত্তর দিলেন, 'মনে রেখো, বিদ্যুৎ, অন্ধকারে ওঁৎ পেতে আছে আরো প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী শক্তি। তারা চায় না মানবজাতির উপর যে অভিশাপ আছে সেটা শেষ হোক। এই বিদ্বেষপরায়ণ উদ্দেশ্যের সাথে রক্তাক্ত বিভেদরেখা আর উন্মত্ত হত্যাযজ্ঞ ভীষণ মানিয়ে যায়। এই দানবের সাথেই আমরা লড়াই করছি আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মর্ত্যে ও শূন্যে রক্ষা করে চলেছি গোপন সত্যকে। হরপ্পা থেকে কাশী, কাশী থেকে গোয়া, কলকাতা, দিল্লি, রোম, ভ্যাটিকান, সিরিয়া এবং তার বাহিরে। ক্ষমতার লোভে এই অন্ধকার শক্তি সবকিছু করতে পারে। তারা যার নাম দিয়েছে নিউ অর্ডার, তা প্রতিষ্ঠার নামে সৃষ্টিকর্তার নাম ব্যবহার করতে চায় তারা।

গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে বিদ্যুৎ।

'ওরাই পাঠিয়েছে তাকে,' বললেন মঠাধ্যক্ষ। দানব বাহিনীর সৈন্যদলের প্রথম সৈন্যটি হলো রুমি পেরেরা যাদেরকে তোমার নির্মূল করতে হবে।'

॥ ॐ ॥

মহামতি বৃদ্ধের পা স্পর্শ করে কক্ষ ত্যাগ করলো তারা। অদ্ভুত আবেগ খেলা করছে দামিনীর ভেতরে। বিদ্যুতের প্রপিতামহের সাথে দেখা করে তার স্নেহ অর্জন করতে পেরে একদিকে আনন্দিত বোধ করছিলো দামিনী, অন্যদিকে যা শুনেছে তাতে ভয় পাচ্ছে সে। রুমি পেরেরার নামটা পাগল বানিয়ে ফেলছে তাকে। বিদ্যুৎ তার জীবনীশক্তি। তাকে হারাতে চায় না সে।

দামিনীর উদ্বেগ আঁচ করতে পারে বিদ্যুৎ। এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো সে। 'প্রিয়তমা, আগামীকাল আমি তোমাকে সারনাথে নিয়ে যাবো,' উজ্জ্বল হেসে বললো সে। 'আমি তোমাকে দেখাবো কোথায় বসে ভক্তদের প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন বুদ্ধ।'

থেমে ঘুরে দাঁড়ালো দামিনী। 'তুমি তো জানো আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না, বিদ্যুৎ। প্রতিজ্ঞা করো নিজের প্রতি খেয়াল রাখবে তুমি,' অনুনয় করলো সে। কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রায়।

দুহাতে চিবুকটা তুলে ধরে তার চোখের দিকে তাকিয়ে গভীর মমতায় বললো সে, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, দামিনী। আমার কোনো ক্ষতি হবে না। তোমার কি মনে নেই, আমি অর্ধ-মানব, অর্ধ-দেবতা।'

নিজের কক্ষে ফিরে গেছে দামিনী। যোদ্ধাদেরকে অস্ত্রাগারে ডেকে পাঠিয়েছে বলভান্ত। এই ফাঁকে সামান্য সময় চুরি করে দ্বারকা শাস্ত্রীর বাস ভবনের দিকে দৌড়ালো বিদ্যুৎ।

অপেক্ষা করছিলেন মহামতি বৃদ্ধ। আগের জায়গাতেই বসে আছেন তিনি, একচুলও নড়েননি।

'প্রণাম, বাবা। না বলে দৌড়ে প্রবেশ করায় মার্জনা করবেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিলো আরো কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন আপনি।'

'হ্যাঁ, তাই চাচ্ছিলাম, বিদ্যুৎ,' বিমর্ষ কণ্ঠে জবাব দিলেন গুরুজি। 'আর সেটা হলো, আজ রাতে কেউ একজন তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, বাবা।'

'তোমার চারপাশে আমি কালো শক্তির উপস্থিতি আঁচ করতে পারছি,' বলে চলেছেন দ্বারকা শাস্ত্রী। 'রুমি একা নয়।'

দাঁত কিড়মিড় করলো বিদ্যুৎ। ন্যায়নার হাতের স্যাটেলাইট ফোনটার কথা মাথা থেকে সরাতে পারছে না সে। কার সাথে কথা বলছিলো মেয়েটা? যদিও গুরুজিকে বিষয়টা জানাতে চায় না সে। দ্বারকা শাস্ত্রীর পরিবারের একজনের মতো শৈশব থেকে দেব-রাক্ষস মঠে বেড়ে উঠেছে ন্যায়না।

'আমি সতর্ক থাকবো, বাবা। আপনার আশীর্বাদ সাথে থাকলে কেউ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

আবারও প্রপিতামহের পা স্পর্শ করে বিদায় চাইলো সে। দরজার কাছে পৌঁছে দিনের শেষ প্রশ্নটা করার জন্য ঘুরলো সে।

'বাবা, এখন আমি বুঝতে পারছি কেন আপনি বলেছিলেন যে মূর্তিকার পুরোহিত রাজা আর কেউ নয়, আমি। আমি নিশ্চিত এটা আসলে বিভাষণ পূজারি। প্রায় তিন হাজার সাতশত বছর পরে মহান দেবতা আমার মধ্য দিয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে, আপনার বিদ্যুৎ হিসেবে। দামিনীর ব্যাপারেও একই কথা খাটে। পুণ্যবতী সাঞ্জনার পুনর্জন্ম সে। আমি দেখতে পাচ্ছি কীভাবে হাজার বছরের কর্মের ঋণ আর বন্ধন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এবং নির্বাচিত একজন হতে পেরে নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে করছি।'

অশ্রু সংবরণ করে প্রপৌত্রের দিকে তাকালেন দ্বারকা শাস্ত্রী। কালো মন্দিরের গোপন রহস্য পাহারা দিতে গিয়ে পুরো জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। এবং প্রায় তিন দশক ধরে অপেক্ষা করছেন বিদ্যুৎ এসে নিজের আসন গ্রহণ করবে বলে। অবশেষে সেই দিন উপস্থিত হয়েছে।

'কিন্তু বাবা, আমি যদি বিভাষণ পূজারি আর দামিনী সাঞ্জনা হয়, তাহলে আপনি কে?' চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ।

হাসলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। এক মুহূর্ত পর জবাব দিলেন, 'আমি হচ্ছি শেষ সপ্তর্ষি।'

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ

মধ্যরাতের অভিযান

'আজ রাতেই কারাগারে আক্রমণ করবো আমরা,' ক্যাম্পফায়ারের চারপাশে পায়চারি করতে করতে বললো মানু। হরপ্পার নগরদুয়ার হতে বিশ মাইল দূরে রয়েছে তারা। ক্যাম্প ফায়ারের মৃদু আলোয় উড়ছে সূর্যখচিত পতাকা, যা বিভাষণ পূজারির প্রতিনিধিত্ব করে।

মৃৎ কারাবাস থেকে ফিরে মানু, সাঞ্জনা আর তাদের গুটিকয়েক সঙ্গীকে খুঁজে বের করেন সোমদত্ত আর তার সহযোগীরা। প্রকৌশলীর বিশ্বস্ত সৈন্যরা, মানু আর তার নয় সহযোদ্ধা এবং সোমদত্ত নিজেসহ মোট ছত্রিশজন যোদ্ধা। যদিও বিভাষণ পূজারির কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আগামীকাল সকালে দিনের আলোয় উদ্ধার অভিযান চালাবেন, সোমদত্ত নিশ্চিত ছিলেন না যে কাজটা কীভাবে করবেন। পূর্বের দিনের চেয়ে আরো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে হরপ্পার সৈন্য, পুরোহিত আর জনগণ। নিরামিষাশী নগরবাসী ঘোড়া হত্যা করে কাঁচা মাংস ভক্ষণ করছে। সোমরস দিয়ে বাচ্চাদেরকে মাতাল বানাচ্ছে স্বয়ং তাদের মায়েরা। জুয়া আর পতিতাবৃত্তির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে মন্দিরগুলো। অস্ত্রাগার লুট করা হয়েছে এবং হাভানকুণ্ডগুলো অপবিত্র করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো স্বর্গীয় দুধ হিসেবে পুষ্টি প্রদানকারী পূজনীয় গো-মাতাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। মানু এবং সোমদত্ত উভয়েই নিশ্চিত যে হরপ্পা মহানগরীর পতন আসন্ন।

'পাগলামি কোরো না, মানু,' ধর্মপিতার ন্যায় কর্তৃত্বের সুরে বললেন সোমদত্ত। ভারিক্ক করলেও বাচ্চা ছেলেটাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারেন না তিনি। তার পুণ্যবান বাবার সাথে কিছু আগে সন্ধ্যার সময় দেখা করেছেন তিনি। প্রত্যক্ষ করেছেন তার বর্ণনাতীত কষ্ট আর অপমান। নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও সাঞ্জনা আর মানুকে রক্ষা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি। একজন জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা করার ভাগ্য কজন মানুষেরই বা হয়?

'আমরা ওদের সামলাতে পারবো, কাকা,' জবাবে বললো মানু। 'কারাগারের চারপাশে পাহারা দিচ্ছে তিনশত রক্ষী। তাদের সকলেই দিবাস্বপ্ন দেখছে। রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে তাদের সবগুলোকে শেষ করে দেওয়া সম্ভব। আমাদের হাতে আর কয়েক ঘন্টা মাত্র সময় আছে। আক্রমণ করার অনুমতি দিন আমাদের!' পীড়াপীড়ি করলো মানু।

গভীর মনোযোগে একটা পাথরের উপর নিজের লম্বা তামার তলোয়ারখানা ধার দিচ্ছিলেন সোমদত্ত। থামলেন তিনি। তলোয়ারের ফলাটা এক মুহূর্ত পরীক্ষা করে একপাশে নামিয়ে রাখলেন। আরো কাজ করতে হবে এটা নিয়ে।

'যা মনে হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্ভেদ্য কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আমি একমত যে সৈন্যরা মাতাল হয়ে আছে, কিন্তু আজ সন্ধ্যার সময় খুব কাছে থেকে এদের দেখেছি আমি। মাদকের প্রভাবে আজ রাতে হয়তো বা তাদের ক্ষিপ্রতা কম থাকবে, কিন্তু তারা ব্যথা, যন্ত্রণা এবং ভয়ের উর্ধ্বে। এ ধরনের বাহিনীকে তুমি হারাতে পারবে না, মানু। তারা এখন আর মানুষ নয়। তারা এখন রাক্ষসে পরিণত হয়েছে।'

'কিন্তু কাকা...' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলো মানু।

'যথেষ্ট হয়েছে, মানু,' একটা স্পষ্ট তবে সুমধুর নারী কণ্ঠ বলে উঠলো। তাঁবুর ভেতর থেকে কথা বলছে সাঞ্জনা। পুরো আলোচনা শুনছিলো সে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বামীর বিশ্বস্ত বন্ধুর পরামর্শের সাথে একমত হওয়ার। সোমদত্তের কাছ থেকেই প্রিয়তম স্বামীর শেষ খবর পেয়েছে সাঞ্জনা। ওটাই তার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান।

'যদি সোমদত্ত বলেন যে আমাদের আগামীকাল আক্রমণ করা উচিত, তার প্রজ্ঞার উপর ভরসা রাখা উচিত আমাদের,' বললো সাঞ্জনা।

সাঞ্জনার কথা দেবতার কথা বলে বিবেচিত হলো। অনেক সময় তার চেয়েও বেশি। স্বর্ণহৃদয় তার। দুর্ভাগ্যবশত, এই মুহূর্তে হরপ্পায় যে বিদঘুটে কালো শক্তি খেলা করছে, তার সাথে সাঞ্জনার পবিত্রতা আর নৈতিকতার শক্তির কোনো মিল নেই।

এক প্লেট ভাত নিয়ে বসলো মানু। বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় ঘোড়ার পিঠে কাটিয়ে ভীষণ ক্লান্ত সে। আগামীকাল সকালে আসন্ন লড়াইয়ের আগে সামান্য বিশ্রাম আর এই খাবারটুকু দরকার তার। পশুসম হরপ্পার সৈন্যদের কাছ থেকে প্রিয় বাবাকে ছিনিয়ে আনতে হবে তাকে।

সদ্য রান্না করা ভাতের একটা লোকমা মুখে দিতে দিতে ক্যাম্প ফায়ারের কাছে বসা সোমদত্তের এক সৈন্যের দিকে বালকসুলভ কৌতূহলে তাকালো সে। প্রতিউত্তরে হাসলো সৈন্যটি। স্বয়ং দেবতার কুলতিলকের অভিবাদন পেয়ে আনন্দিত বোধ করলো সৈন্য। মানু চোখ সরিয়ে নেয়নি, তার আগেই একটা প্রাণঘাতী তীর এসে সোজা মাথায় বিঁধলো হাস্যরত সৈন্যটির। মুহূর্তের মধ্যে সেখানে ধাতব বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পিশাচের মতো চিৎকার-চেঁচামেচি করতে করতে চারশত সৈন্য নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে রাঙা। মানু ও সোমদত্তের তাঁবুর চারপাশ থেকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলেছে আক্রমণকারীরা, এবং বৃষ্টির মতো তীর ছুঁড়ছে তারা।

সোমদত্তের সৈন্যরা একটার পর একটা পড়তে লাগলো। তাঁবুর মাঝখানে রণ-প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়ালো মানু আর তার নয় সঙ্গী। বর্ম তৈরি করে ধনুক হাতে তৈরি সবাই। তাদের দশজনের প্রত্যেকে বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে দশ দিকে তাকিয়ে আছে।

মানুর সহযোদ্ধাদের মধ্যে থাকা পাঁচজন মেয়ে আক্রমণকারীদের দিকে একঝাঁক তীর ছুঁড়ে দিলো। ছেলে পাঁচজন একটা বর্ম তৈরি করে তাদের দিকে ছুটে আসা তীরগুলোকে প্রতিহত করতে লাগলো। পাঁচজন তীরন্দাজের প্রতিজন একসাথে চারটা করে তীর ছুঁড়ছে। তাদের প্রতিটা তীর লক্ষ্যে আঘাত হানছে। তাদের দশজন যোদ্ধা মিলে যেন একটা সত্তা। তাদের শৌর্যময় প্রতি-আক্রমণে রাঙার সৈন্যরা দলে দলে মারা পড়তে লাগলো। এই সুযোগে সোমদত্ত আর তার যোদ্ধারা আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে গেছে।

মানু এবং সোমদত্ত উভয়েই বুঝতে পারছে তীর ধনুকের এই যুদ্ধ শীঘ্রই মুখোমুখি লড়াইয়ে রূপ নেবে। কাতারে কাতারে সৈন্য হারানোর পরও চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে রাঙার সৈন্যরা। দশজনের তুলনায় তারা এখনো বিশাল, সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বৃত্ত ভেঙে পাথরের স্তূপটার দিকে এগিয়ে গেল মানু যেখানে তার মা লুকিয়ে আছে। ছুটে আসা তীর ফাঁকি দিয়ে সাঞ্জনা যেখানে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সেখানে উঁকি দিলো সে।

'আমি ঠিক আছি...আমি ঠিক আছি...যাও, বাবা, লড়ো গিয়ে,' মানু তার কাছে পৌঁছাতেই বলে উঠলো সাঞ্জনা।

'আমি তোমাকে এখানে ফেলে যেতে পারি না, মা,' জবাবে বলে উঠলো মানু। 'আমি এখানে থেকে তোমাকে আহত হতে দিতে পারি না।'

'মানু, আজ রাতে যদি তুমি শত্রুদেরকে তোমার বীরত্ব না দেখাতে পারো তাহলে আমরা সবাই আহত হবো। তুমি কে এটা স্মরণ রেখো, পুত্র। স্মরণ রেখো তোমার সম্ভ্রান্ত পিতার কথা!' গর্বিত হেসে সরাসরি পুত্রের চোখের পানে তাকিয়ে বললো সাঞ্জনা।

'কিন্তু ওরা যে অসংখ্য, মা। আমরা হয়তো ওদের পরাজিত করতে পারবো না!'

'আমাদের কি আর কোনো উপায় আছে, মানু?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো সাঞ্জনা। সামনে ঝুঁকে পুত্রের কপালে চুমু খেল সে। 'এবার যাও। তোমার যা করণীয় তাই করো। এটা আমার আদেশ।'

'তোমার আদেশ শিরোধার্য, মা। তুমি এখানেই থাকো। আমাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ো না। কথা দিচ্ছি...আমি তোমার জন্য ফিরে আসবো। তোমার জন্য ফিরে আসবো আমি,' নিজের তলোয়ারটা বের করতে করতে বললো মানু। তারপর ছুটে গেল লড়াইয়ের প্রান্তরে।

মাকে কথা দিয়েছে সে। এ কথা রক্ষার জন্য তার সামনে যত বাধাই আসুক উপড়ে ফেলবে মানু।

বানারস, ২০১৭
সংকট মোচন

গর্জে উঠলো মোটর সাইকেলগুলো। সনুর পেছনের সিটে আরোহণ করেছে বিদ্যুৎ। ন্যায়না বসেছে বালার পেছনে। যোদ্ধা বলভান্ত চড়েছে তার নিজের বাইকে। শক্তিশালী এনফিল্ড বুলেট ইঞ্জিনের গর্জন পেছনে ফেলে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে দেব-রাক্ষস মঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেল তাদের পাঁচজনের দলটা। বাছাইকৃত আটজন সেরা যোদ্ধার একটা দল ঘণ্টাখানেক আগেই মঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে গুপ্তচর সেনা সক্রিয় করা হয়েছে। অথচ রুমির কোনো দেখা নেই। তবে অস্বাভাবিক কিছু একটা চোখে পড়েছে তাদের। পেশিবহুল, সৈন্যদের মতো দেখতে প্রায় পনেরোজন বিদেশি ভারী ব্যাগ কাঁধে শহরের সাতটা আলাদা হোটেলে চেক ইন করেছে। সাধারণ চোখে এসব বিশালদেহী পর্যটকদের আলাদা করতে পারবে না কেউ। কারণ তারা বারানসিতে এসেছে আলাদা আলাদা সময়ে এবং অবস্থান নিয়েছে সস্তা লজ থেকে চোখ ধাঁধানো পাঁচ তারকা হোটেলে। তবে গুপ্তচর সেনারা সাধারণ কেউ নয়। তারা কেবল অস্বাভাবিক পর্যটকই চিহ্নিত করেনি, ওরা যে আলাদা আলাদা বাহনে করে আজ সন্ধ্যায় বেরিয়ে গেছে, সেটাও জানিয়ে দিয়েছে মঠকে। যদিও তারা আলাদাভাবে ভ্রমণ করছিলো, তাদের প্রত্যেকের গন্তব্য ছিলো একই–দশশ্বমেদ ঘাট।

দলটা গেট পেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় পুরোহিতজির মনে হলো, শিকারিকে শিকার করার জন্য বিদ্যুৎকে নদীতীরে পাঠাতে একটুও দ্বিধাবোধ করেননি মহান

গুরু দ্বারকা শাস্ত্রী। প্রপৌত্রের ভালোমন্দের জন্য প্রচণ্ড চিন্তিত হলেও নিজের বংশের রক্তের উপর অগাধ বিশ্বাস রয়েছে তার। দুদিন আগে সন্ধ্যায় বিদ্যুৎকে জেগে উঠে কথা বলতে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। মানুষের সক্ষমতা বিচারে সিদ্ধহস্ত দ্বারকা শাস্ত্রী। বিদ্যুতের একটা কেশ স্পর্শ করতে হলেও অসাধারণ কোনো মায়াখেল দেখাতে হবে শয়তানগুলোকে।

পুরোহিতজির স্পষ্ট নির্দেশনা অনুসারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য ছোট্ট একটা ঘোরপথ ধরে সংকট মোচন মন্দিরের দিকে চললো দলটা। আক্ষরিক অর্থে সংকট মোচন শব্দের অর্থ হলো 'দুর্দশা বিনাশকারী' বা 'বিপদ থেকে মুক্তিদাতা'। আশি ঘাট থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত এই মন্দির। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে মহাকবি তুলসি দাস এর প্রতিষ্ঠাতা, যিনি ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেছিলেন। শক্তিশালী হিন্দু দেবতা হনুমানের মন্দির এটি। অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরের স্বরূপ। যার মূর্তি আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলো। মহান শক্তিধর বানর দেবতা হনুমানদের পবিত্র আশ্রয় এই অভয়াশ্রম।

উজ্জ্বল কমলা রঙের এবং অদ্ভুতভাবে বিকৃত প্রভু হনুমানের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যুৎ। ভক্তদের ভিড়ে গিজগিজ করছে পবিত্র মন্দিরের আঙিনা। বিখ্যাত বিসান কা লাড্ডু (ময়দা আর ঘন চিনির সিরাপ দিয়ে বানানো মিষ্টি) হচ্ছে প্রভুর সবচেয়ে জনপ্রিয় ভোগ বা প্রসাদ। এখানে এসে সব গোত্র, শ্রেণির মানুষ একসাথে মিশে যাচ্ছে। হতদরিদ্র মানুষের সাথে এক কাতারে মিলে যাচ্ছে উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত। বিলাসবহুল গাড়ি থেকে নেমে আসা ঝলমলে যুবতীরা অসহায় প্রতিবন্ধীদের জড়িয়ে ধরে সাহায্য করছে অবলীলায়। মন্দির প্রাঙ্গণে ধনী-দরিদ্র, সুশ্রী-কুশ্রীর বলে কোনো পার্থক্য নেই। সংকট মোচন এক মহা বৈষম্য লাঘবকারী। সবাই এখানে ফকির। সবাই কিছু না কিছু চাইতে এসেছে।

একপাশে হনুমানের নিজের আবক্ষ মূর্তি। অন্যপাশে এই মহাবিশ্বের লক্ষ লক্ষ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মহান দেবতা প্রভু রামের বিখ্যাত মন্দির। হনুমানের মূর্তির সামনে বিমোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বিদ্যুৎ। মহান দেবতার কী যেন তাকে আকর্ষণ করছে। তার চারপাশে শত-সহস্র মানুষের স্রোতের মধ্য থেকে ব্যাখ্যাতীত কী এক শক্তি যেন তার ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলো। হনুমানের মূর্তির সামনে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলো সে। এখানে উপস্থিত প্রতিটা ভক্ত যেন তার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিচ্ছে। এ এক পরাবাস্তবতা। হনুমানের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত হয়ে হাঁটু গেড়ে পড়ে যাওয়ার আগে বেশ কিছুক্ষণ ঐ শক্তি আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো বিদ্যুৎ। তার সাথে যেন কথা বলছেন ঈশ্বর। অথবা এমনটাই যেন মনে হলো শেষ দেবতার।

এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ প্রভু রামের দরবারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রিয়তমা স্ত্রী সীতা, অনুগত ভাই লক্ষ্মণ, ভারত আর শত্রুঘ্ন আর হনুমান রামের

পায়ের নিচে বসে আছে। রামকে নিঃশর্ত ভালোবাসে যারা তাদের জন্য এ দৃশ্য হয়তো খুব বেশি কিছু নয়। তবে রামের লক্ষ লক্ষ পূজারির কাছে তিনি সৃষ্টির বিস্ময়, পরোপকারিতা, আশা-ভরসা আর ভালোবাসার এক প্রতিমূর্তি।

কপালে স্পর্শ করে প্রভু রামের দরবারে পা রাখলো বিদ্যুৎ। কোনো কিছু চাইলো না সে। কখনোই চায় না। সে জানে তার অস্তিত্বেও প্রতিটা মুহূর্ত দেখছেন প্রভু। সে কেবল বিড়বিড় করে বললো, 'আমাকে সাহায্য করো, রাম। রাক্ষসরাজ রাবনকে পরাস্ত করার সময় যে বীরত্ব আর পৌরুষ পৃথিবীকে দেখিয়েছিলে তুমি, আমাকেও তাই দিয়ে আশীর্বাদ করো।'

বিদ্যুৎ উঠে দাঁড়িয়ে চোখ খুললো। দেখলো গেরুয়া পরা অশীতিপর বৃদ্ধ এক পুরোহিত অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। পুরোহিতের দিকে ঘুরে হাতজোড় করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলো সে। হাত উঁচু করে আশীর্বাদ করার সময় কেবল একটা শব্দ উচ্চারণ করলো পুরোহিত।

উত্থিস্থা।

মানে, উঠে দাঁড়াও।

॥ ॐ ॥

পরিকল্পনাটা সহজ। ঘাটের কাছাকাছি এসে দল থেকে আলাদা হয়ে যাবে বিদ্যুৎ। নদীতীরে হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট খাবে এবং মোবাইলে কথা বলতে বলতে রুমির জন্য অপেক্ষা করবে। এই সময় তার কমব্যাট টিম চারপাশে গভীরভাবে লক্ষ রাখবে। তারা প্রত্যেকেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিদ্যুতের কাছে চলে আসার মতো দূরত্বে অবস্থান করছে। রুমি যদি তার উপর লক্ষ রাখে, তাহলে অবশ্যই আসবে সে।

সনু, ন্যায়না, বালা, বলভান্ত আর তার যোদ্ধারা সাথে আসুক এমনটা আসলে চায়নি বিদ্যুৎ। সে চায়নি ওরা তার সাথে এসে বিপদে পড়ুক। একা একাই রুমির মুখোমুখি হতে চেয়েছিলো সে। তবে তার এই পরামর্শ সাথে সাথেই বাতিল করে দেয় সঙ্গীরা। তাই তো তাদের দেবতার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে তারা।

দশশ্বমেদ ঘাটের বিশাল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখলো ভিড় বাড়ছে। দেখতে দেখতে বালার মোবাইলে ফোন করলো সে। মাত্র বিশ ফুট দূরে থাকলেও সে বুঝতে পারলো দূরত্ব বজায় রেখেই কথা বলতে চায় বিদ্যুৎ।

'হ্যাঁ, ভিডিও?' সাড়া দিলো বালা।

'ছোট্ট একটা ব্যাপার, বালা,' বললো বিদ্যুৎ। 'জানি শুনতে অস্বাভাবিক লাগবে। তবুও বলি, ন্যায়নার উপর লক্ষ রাখবি। পারবি না?'

এক মুহূর্তের জন্য হতবিহ্বল হয়ে গেল বালা। 'কী বলছিস? ন্যায়না? তুই কি আমার সাথে মজা করছিস?'

'আমি যা বলছি তাই কর,' অনুরোধ করে ফোনটা কেটে দিলো বিদ্যুৎ।

আস্তে আস্তে ঘাটে ভিড় বাড়ছে, আর চারদিকে আলো জ্বলে উঠছে। ঘাটের উপরে সারি সারি ফুল, গাঁদাফুলের মালা, প্রদীপ, মিষ্টান্ন আর হরেক জিনিসের ছোট ছোট দোকান। যুবক আর বৃদ্ধের একটা বিশাল পুরোহিত দল গঙ্গা আরতি প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। নদীতীরে এবং নদীর উপরে নৌকাভ্রমণ উপভোগ করতে থাকা দর্শনার্থীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে জ্বলজ্বলে কালো আয়নার মতো গঙ্গার পানিতে প্রদীপের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। বর্ণিল উৎসবের মতো মুখরিত হয়ে আছে জায়গাটা।

ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে শত শত মানুষের আসা-যাওয়ার মাঝে একটা বালকসুলভ সুদর্শন মুখ নজরে পড়লো বিদ্যুতের।

দূরে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে হাসছে রুমি।

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ
মানু

সোমদত্ত ঠিকই বলেছিলেন। হরপ্পার মাতাল সৈন্যরা ব্যথা ও ভয়ের উর্ধ্বে। এমনকি তাদের মধ্যে যারা অসংখ্যবার তীরবিদ্ধ হয়েছে, তারাও উন্মত্ত ভূতের মতো লড়াই করছে। সোমদত্ত আর মানু উভয়ের কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার; এই শয়তানগুলো পিছু হটবে না। একেবারে শেষ ব্যক্তিটিকেও হত্যা করতে হবে মানুকে। কিন্তু কীভাবে? তারা যে অসংখ্য।

যুদ্ধ গড়াতে লাগলো। তাদের ছোট্ট দলটি শত্রুদের অনেক বেশি সৈন্য নিধন করছে। এখন যা হচ্ছে সেটা কেবল নির্মম বর্বরতা। তলোয়ারের আঘাতে গলা কেটে ফেলা হচ্ছে, ছুরির আঘাতে মুখ চিরে যাচ্ছে, চোখ উপড়ে ফেলা হচ্ছে এবং বুক চিরে কলিজা বের করে আনা হচ্ছে।

সহসাই ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। কানফাটানো শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে। তীব্র বাতাস আর ভারী বর্ষণে ভেসে যাচ্ছে মধ্যরাতের এই বর্বরতা। লড়াইয়ের ঠিক কেন্দ্রস্থলে লড়তে লড়তে হঠাৎ মানুর চোখে পড়লো পনেরো-বিশজনের একটা শত্রু সৈন্যদল ঘিরে ফেলেছে সোমদত্তকে। বাবার একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধুটির কোনো ক্ষতি হতে দিতে পারে না সে। সামনে যে-ই আসছে শিরশ্ছেদ করে বা কতল করে সোমদত্তের দিকে এগোতে লাগলো মানু। বিকট রণহুংকারে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো সোমদত্তকে ঘিরে থাকা সৈন্যদের উপর। মুহূর্তেই সব সৈন্য তার দিকে ঘুরে গেল। বিদ্যুতের গতিতে তলোয়ার চালাতে লাগলো মানু। ঝরনার মতো রক্ত ছিটকে পড়লো চারপাশে। সিংহ যেভাবে ভেড়ার পালের উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ে শিকার করে, মানুও সেভাবে বিকৃতমস্তিষ্ক শয়তানদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাতে লাগলো।

'যথেষ্ট হয়েছে!' একটা কানফাটানো গর্জন ভেসে এলো। মানুর দিকে তাকিয়ে আছে রাঙা। 'দেবতাপুত্র, লড়তে চাস তো নিজের সমকক্ষ কারো সাথে লড়!' সবাইকে শুনিয়ে চ্যালেঞ্জ জানালো রাঙা। উভয় পাশে অশুভদর্শন কাঁটাওয়ালা বিশাল বর্শা তার হাতে। ভারী অস্ত্রটা কাঁধের উপর তুলে অবলীলায় ঘোরাচ্ছে সে। সাত হাতেরও বেশি লম্বা আর দূরপ্রাচ্যের এক শিংওয়ালা গন্ডারদের মতো বিশালদেহী রাঙাকে একটা রক্তপিপাসু দানবের মতো লাগছে।

'আমি তোর অপেক্ষাতেই ছিলাম, ধূর্ত কমান্ডার!' অবজ্ঞাভরে জবাব দিলো মানু। 'আমি শুনেছি তুই নাকি আদালত কক্ষে কাপুরুষের মতো মহাপরাক্রমশালী বিভাষণ পূজারিকে পেছন থেকে আঘাত করেছিলি। আজ তোর হিসেব চুকানোর দিন, রাঙা।'

এই মুহূর্তে মানু আর রাঙা সতর্কতার সাথে পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসছে। প্রস্তুতি নিচ্ছে মরণপণ লড়াইয়ের। উভয়েই জানে আজ একজনের মৃত্যু হবে এখানে।

॥ঞ॥

সব লড়াই থেমে গেছে। যোদ্ধারা সবাই নিজেদের যুদ্ধ ভুলে হিংস্র দানব রাঙা আর তরুণ সাধক মানুর মধ্যকার মহাকাব্যিক লড়াই দেখার জন্য জড়ো হয়েছে। ধূর্ত কমান্ডার এবং প্রিয়ংবদার প্রধান ভৃত্য তার অস্ত্র হিসেবে একটা দুই ফলাযুক্ত বর্শা বেছে নিয়েছে। মানুর হাতে দুটো ভারী, খাটো আকারের তলোয়ার। অস্ত্র দুটো সে এমনভাবে ঘোরাচ্ছে যেন সেগুলো খড়ের তৈরি। উভয় যোদ্ধাই এখন একটা বৃত্তাকারে ঘুরছে। প্রথম সুযোগেই প্রতিপক্ষকে আঘাত করার জন্য অপেক্ষা করছে। বিদ্যুৎ চমকের সাথে সাথে হচ্ছে ভয়ংকর শব্দে বজ্রপাত। সেই সাথে বিরামহীনভাবে ভারী বর্ষণ।

রাঙাই আক্রমণ করলো প্রথমে। মানুকে বিভ্রান্ত করার জন্য একপাশে সরে গেল সে। তারপর হঠাৎ করেই লাফ দিয়ে অন্যপাশে সরে গিয়ে শক্তিশালী বর্শা দিয়ে নির্মম আঘাত হানলো মানুর উপর। বিদ্যুৎ গতিতে পুরো শরীরটাকে ভাঁজ করে বর্শাটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেল তরুণ যোদ্ধা। একইসাথে সাবলিলভাবে রাঙার কোমরে ঠিক বর্মের নিচে আঘাত হেনে দু-ফাঁক করে দিলো। ব্যথায় চিৎকার করে উঠলো দলনেতা। লড়াইয়ের মুহূর্তখানেকের মধ্যেই বিশালাকার দানবের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করলো মানু। রাঙাকে দিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাবে

সে এবার। তার প্রাণপ্রিয়, মহৎপ্রাণ বাবার উপর এই লোকটার নির্মম অত্যাচারের ছবি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না মানু। একে এবার শাস্তি দেবে সে।

বৃত্তাকারে ঘুরে এসে আবার তার বিশাল অস্ত্র নিয়ে আঘাত হানলো রাঙা। ছুটে আসা দানবটার দিকে দৌড়ে গেল মানু। রাঙা আঘাত হানার এক মুহূর্ত আগে নরম কাদায় শরীরটা ছেড়ে দিয়ে পিছলে রাঙাকে পেরিয়ে গেল সে। শত্রু কমান্ডারের উরুতে একটা গভীর, লম্বা ক্ষত করে দিয়েছে তলোয়ারের আঘাতে। তীব্র ব্যথায় গগনবিদারী চিৎকার করে উঠলো কুলাঙ্গারটা। হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে যেতে রাঙা তার কলুষিত অন্তরে অনুভব করলো, তরুণ যোদ্ধা পুরোহিতকে খাটো করে দেখেছিলো সে।

এবার মানুর পালা। তীব্র বজ্রগর্জন আর ছুরির ফলার মতো বৃষ্টির মধ্যে অবিশ্বাস্য আত্মবিশ্বাসের সাথে আগে বাড়লো সে। তলোয়ার দুটো ঘোরালো রাঙার বুক লক্ষ্য করে। দু-ফাঁক করে দিলো। দৈত্যটা পুরোপুরি কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। ফুটোওয়ালা বালতির ন্যায় কলকলিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো তার বুক থেকে।

শিকারির উপর শেষ ঠোক্কর দেওয়ার আগে ঈগল যেভাবে চক্কর খায়, মানু সেভাবে চক্কর খাচ্ছে রাঙার চারপাশে। ইশ, তার বাবা-মা যদি এই দৃশ্যটা দেখতে পেত! তারা যদি দেখতো যে কী অবলীলায় সে শত্রুকে পরাভূত করে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পর মানু সিদ্ধান্ত নিলো মরণ আঘাত হানার। এগিয়ে গিয়ে রাঙার মস্তকাবরণে আঘাত হানলো সে। পাষণ্ডটার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা পেছনে ধাক্কা দিলো। চারপাশে তাকালো মানু। লক্ষ করলো সবাই তার কীর্তি প্রত্যক্ষ করছে কি না। এমন এক পরিবার থেকে এসেছে সে যারা সব সময় সংঘর্ষ পরিহার করে ভালোবাসার পথ বেছে নিয়েছে। তবে এখন সময় বদলে গেছে। পৃথিবীর শেষ দেবতার বিরুদ্ধে পাপ করেছে রাঙা। সুতরাং, মানু তাকে ক্ষমা করতে পারে না।

পাষণ্ডটার গলা কেটে ফেলবে মানু, এমন সময় দুহাত জোড় করে প্রাণভিক্ষা চাইলো রাঙা।

দলনেতার আহত মুখে ঝাপটা মারছে বৃষ্টির ফোঁটা। যদিও রাঙা চোখ খুলে রাখতে পারছিলো না, তারপরেও মানু বুঝতে পারলো করুণা ভিক্ষা চাইছে সে।

'দয়া!' বেইমান রাঙার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো মানু। ভয়ে কাঁপছে রাঙা।

'দয়া করুন, হে মহান মানু পূজারি,' আবারও বললো সে।

নরম হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না মানুর অভিব্যক্তিতে। তার বাবাকে যে লোকটা আঘাত করার দুঃসাহস দেখিয়েছে এবং ষড়যন্ত্র করে মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করেছে, তাকে শাস্তি দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সে। প্রাণভিক্ষার আবেদনে কর্ণপাত না করে ছুরিটা ওর গলায় বসিয়ে দিতে চাইলো সে।

'দয়া করুন, হে দেবতা বিভাষণ পূজারির সন্তান! একজন নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে নিজের বাপের নাম ডুবাবেন না,' প্রার্থনা জানালো অসৎ দুর্বৃত্ত।

বাবার নাম শুনে পিছিয়ে এলো মানু। *যত পাপীই হোক, তার বাবা কি একজন পরাজিত এবং নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করতেন?*

না।

সোমদত্তের দিকে তাকালো মানু। প্রধান পুরোহিত নিজেও একজন উচ্চ মূল্যবোধ আর ন্যায়পরায়ণ মানুষ। মাথা নাড়লো সে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক নারীর নগ্ন লালসার বিষে সবকিছু বিষাক্ত হওয়ার আগে এই অনবদ্য নৈতিকতা ছিলো হরপ্পাবাসীর দৈনন্দিন জীবনের অংশ। ভালোবাসা, সমবেদনা আর ক্ষমা ছিলো হরপ্পার জনগণের মূল নীতি।

বিপক্ষ দলপতির চুল ছেড়ে দিলো মানু। তাকে টেনে সোজা করলো সে। মাথাটা পেছনে ঠেলে বৃষ্টিতে মুখটা ধুয়ে যেতে দিলো। যদিও সে দেখতে পাচ্ছিলো হরপ্পার মাতাল সৈন্যরা তখনো ঘৃণায় চিৎকার করছে, তবুও নিজের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিলো সে। আশা করছে উন্মত্ত সৈন্যরা তার এই মহত্ত্বের প্রশংসা করবে। সোমদত্তের দিকে হাঁটা ধরলো মানু। মায়ের সাথে কথা বলতে চাইছিলো সে। চাইছিলো তাকে নিয়ে জীবন্ত এই লাশেদের ভেতর থেকে বেরিয়ে যেতে। সোমদত্তের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে। দেখতে পেল তার দয়া আর মহানুভবতায় প্রশংসা সহকারে হাসছেন বাবার বন্ধু। সোমদত্তের কাছ থেকে আর মাত্র কয়েক পা দূরে আছে সে, এমন সময় প্রকৌশলীর অভিব্যক্তিতে নিখাদ ভয়ের ছাপ দেখতে পেল মানু। এই অল্প সময়ের মধ্যে কেবল তার আঙুল উঁচু করে মানুর দিকে তাকাতে পারলেন সোমদত্ত। কিন্তু দেবতার ছেলে কোনো সাধারণ যোদ্ধা নয়। মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে সে বুঝতে পারলো সোমদত্ত তার দিকে তাকিয়ে নেই। তিনি তাকিয়ে আছেন তার পেছনে কারো দিকে।

সাঁই করে ঘুরে শরীরটা নিজের অর্ধেক উচ্চতায় ভাঁজ করে ফেললো মানু। তবে দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। ভারী রামদা দিয়ে তার পেছনটায় কোপ বসিয়ে দিয়েছে রাঙা। যন্ত্রণায় কেঁপে উঠলো মানু। বিশালদেহী শত্রু আবারও আঘাত হানার আগে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো সে। নতুন উদ্যমে আক্রমণ করছে এখন জানোয়ারটা।

দক্ষতার সাথে একপাশে সরে গিয়ে উন্মত্ত লোকটার আক্রমণ এড়িয়ে গেল মানু। সেই সাথে প্রিয়ংবদার পাগলা কুত্তার পেটের উপর বাঘের থাবার মতো কালারিপায়াত্তুর সুদক্ষ আঘাত হানলো। মানুর আঙুলগুলো প্রাণঘাতী ব্যাঘ্র-নখরে সুসজ্জিত। যা ভবিষ্যতে কোনো একদিন উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করবে তারই এক সক্ষম বংশধর। মুহূর্তের মধ্যে রাঙার পেট চিরে হৃৎপিণ্ডসহ নাড়িভুঁড়ি বের করে নিয়ে এলো সে।

লড়াইটা সমানে সমানে ছিলো না।

দলনেতাকে হারিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে হরপ্পার সৈন্যরা। তাদের রক্ততৃষ্ণা বা শত্রুতা যদিও একটুও কমেনি, তবু ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগলো তারা। মানু আর সোমদত্তের সঙ্গী অল্প কয়েকজন সৈন্য আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। একজন যোদ্ধা এবং সাধুর কাছ থেকে প্রত্যাশিত সবকটি গুণই প্রদর্শন করেছে মানু; বীরত্ব, দক্ষতা, নির্ভীকতা, আত্মসংবরণ আর সবচেয়ে বড় কথা...ক্ষমা।

আনন্দটা স্থায়ী হলো না। যখন মানু, সোমদত্ত আর তাদের সঙ্গীরা ভাবলো চরম খারাপ সময়টা কেটে গেছে, তখনই তারা দূরে হরপ্পা সৈন্যদের রণহুংকার শুনতে পেল। তাদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে বিশাল সৈন্যবহর। রাঙা আর তার দলের সহায়তার জন্য ব্যাকআপ দল পৌঁছে গেছে। নিজেদের মধ্যে হতাশ দৃষ্টিবিনিময় করলো তারা। *হাজার সৈন্যের হরপ্পা সৈন্যদলের সাথে মাত্র পঁচিশ জনের ছো□ দল নিয়ে লড়বে তারা?*

কী করবে তা বুঝে ওঠার আগেই মানু শুনতে পেল ওর নাম ধরে চিৎকার করছে তারা; ওর অসাধারণ নয়জনের একজন হলো এই ছেলেটা। ভয়ে কাঁপছে সে। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে জমে গেল মানু। সাঞ্জনা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেই পাথরসারির কাছে পৌঁছে গেছে সৈন্যরা।

মরণপণ লড়াইয়ের মাঝখানে থেকে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়েছিলো মানু।

দেবতার উত্থান

রুমির পিছু ধাওয়া করতে যাবে সে, এমন সময় রক্ত হিম করা একটা চিৎকার শুনতে পেল বিদ্যুৎ। এটা একটা রণহুংকার। এই মুহূর্তে লোকে লোকারণ্য ঘাটে বিদ্যুৎ দেখতে পেল বিশাল তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে জনতার দিকে ছুটে যাচ্ছে বলভান্ত আর সনু। রুমিকে ধাওয়া করবে নাকি ওদের সাহায্য করবে, এমন দোনোমনা করতে করতে বিদ্যুৎ তাকিয়ে দেখলো রুমি চলে গেছে।

সঙ্গীদের যেদিকে দৌড়াতে দেখেছে সেদিকে ছুটলো বিদ্যুৎ। তখনই দেখতে পেল কী তার দলকে কাজে নামতে বাধ্য করেছে। কালো পোশাক পরা একদল ভয়ংকর দর্শন সশস্ত্র লোক সোজা বিদ্যুতের দিকে এগিয়ে আসছে। তাৎক্ষণিকভাবে দেবতা বুঝতে পারলেন, এটা হলো সেই দল যাদের সম্পর্কে গুপ্তচর সেনা সতর্ক করে দিয়েছিলো তাকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এরা কোনো সাধারণ স্ট্রিট ফাইটার নয়। সকলেই তারা পেশিবহুল, প্রশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল। কমান্ডো স্টাইলে এগিয়ে আসছে তারা। একপলক তাকিয়ে তাদের সম্পর্কে ধারণা হয়ে গেল বিদ্যুতের। বিদ্যুৎ নিশ্চিত বলতে পারবে না, তবে তারা সম্ভবত ইরান বা রাশিয়ার প্রাক্তন সৈন্য। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত সে। আর সেটা হলো, শত্রুকে খাটো করে দেখছিলো সে। কেবল এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ দেখতে পাচ্ছে ওরা আসলে কারা। ভাড়াটে সৈন্য।

সহসাই সনুর জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করলো বিদ্যুৎ। বলভান্ত সম্পূর্ণ যোদ্ধা হলেও এই ভাড়াটে সৈন্যরা সনুর আয়ত্বের বাইরে। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কালো পোশাক

পরা লোকগুলোর দিকে এগোলো বিদ্যুৎ। সনু বা মঠের কেউ আহত হওয়ার আগেই তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে তাকে। বালাকে লড়াইয়ের মাঠে এগিয়ে আসতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো বিদ্যুৎ। তার পাশে দাঁড়িয়ে এই প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের সাথে লড়ার দক্ষতা কারো থাকলে তা একমাত্র বালা আর বলভান্তেরই রয়েছে। আর মঠে যা দেখেছে, তাতে সম্ভবত ন্যায়নার রয়েছে এদের সাথে লড়ার দক্ষতা।

অস্ত্রের ঝনঝনানি আর মানুষের সংঘর্ষের শব্দ ছাপিয়ে অদূরে শুরু হয়ে গেছে গঙ্গা আরতি। উভয় পক্ষই জানে অযাচিত এবং তাৎক্ষণিকভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করবে বন্দুকের গুলি। তাই তলোয়ার, রামদা আর মিলিটারি গ্রেড ছুরির উপরই ভরসা করছে তারা। অন্ততপক্ষে এই মুহূর্তের জন্য। পুরোহিত আর ভক্তদের উচ্চ স্বরে মন্ত্র আর শঙ্খের শব্দে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। হাজার হাজার ভক্ত এসে উপস্থিত হয়েছে দশশ্বমেদ ঘাটে। হাতজোড় করে এবং চোখ বন্ধ করে ভক্তি নিবেদন করছে তারা। পুরোহিতদের হাতে ঝুলছে শত শত বিশাল প্রদীপ এবং সে প্রদীপের আলো পবিত্র নদীর জলে সৃষ্টি করছে রহস্যময় ছায়া। মনে হচ্ছে পুরো ঘাট, পবিত্র নদী, হাজার হাজার পুণ্যার্থী এবং পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠ, সবকিছু যেন আজ রাতে অশুভকে দূর করতে একসাথে মিলিত হয়েছে।

সংখ্যায় ওরা পনেরোজন। তাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আসন্ন বিপদগুলো ভেবে দেখলো বিদ্যুৎ। একজন ভাড়াটে সৈন্যের বুকের খাঁচায় আঘাত হেনেছে সনু। অন্যজনের গায়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে বলভান্তের আঘাতে। এই মুহূর্তে দুজনের সাথে যোদ্ধা-রাজকুমারীর ন্যায় লড়ছে ন্যায়না। *কার দলে সে?* ভিড়ের মধ্যেও বজ্রের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। লড়াইয়ের মাঝখানে গিয়ে দুজন সৈন্যের মুখে লাথি বসালো। লক্ষ করলো, আশ্রমের দুজন যোদ্ধা আক্রমণকারীদের কমান্ডো নাইফের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। পিস্তলের বাঁটের আঘাতে সনুও ভীষণ আহত হয়েছে মুখে। তার নিচের ঠোঁট ফেটে গেছে। লড়াইয়ের স্থলে পৌঁছে গেছে বালাও।

'বালা...আমাদের যোদ্ধা আর সনুকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা,' নির্দেশনা দিলো বিদ্যুৎ। পনেরোজন মার্সেনারির বারোজন ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলছে তাকে।

'আমরা তোমার পাশে দাঁড়িয়ে লড়বো,' রাগত কণ্ঠে জবাব দিলো বলভান্ত। খ্যাপা ষাঁড়ের মতো লাগছে তাকে। একটা পুরো সৈন্যবহরকে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। বিদ্যুৎকে একা ফেলে যেতে রাজি নয় বলভান্ত। কালো পোশাক পরা এই লোকগুলো তার মুখোমুখি হওয়া প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের মধ্যে সেরা এবং সংখ্যায় তারা অনেক বেশি। বিদ্যুতের জেতার কোনো সুযোগ নেই।

'আমি যা বলেছি তাই করো,' নির্দেশ দিলো বিদ্যুৎ। হঠাৎ মঠাধ্যক্ষের কর্তৃত্ব শোনা গেল তার কণ্ঠে। তাদের অনুরোধ করছে না সে। শাস্ত্রী বংশের উত্তরাধিকারী হিসেবে একটা আদেশ জারি করেছে এইমাত্র।

সনু আর আহত দুজন যোদ্ধাকে পাশে টেনে নিলো বালা। বলভান্ত আর ন্যায়না তাদের আহত সঙ্গীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বিদ্যুতের সাথে ভয়ংকর বারোজন শত্রুর মোকাবেলা দেখার জন্য প্রস্তুত।

সবদিক থেকে বিদ্যুৎকে ঘিরে ফেলেছে মার্সেনারিরা। তারপরও বিদ্যুতের মনোযোগ এত একনিষ্ঠ যে মনে হচ্ছিলো সে চোখ খোলা রেখে ধ্যান করছে। প্রাক্তন বারো কমান্ডো তাদের ভয়ংকর মিলিটারি নাইফ আর খাটো রামদা বের করে নিলো। বিদ্যুৎ নিরস্ত্র। কালো পোশাকে আচ্ছাদিত মানুষগুলোর মধ্যে কোনো উত্তেজনা বা তাড়াহুড়ো দেখা গেল না। প্রশিক্ষিত সৈন্যের নির্ভুল পদক্ষেপে নড়াচড়া করছে তারা।

তাদের একজন বিদ্যুতের কাছে এগিয়ে এলো রামদা হাতে। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ঘুরলো বিদ্যুৎ। প্রচণ্ড লাথি হানলো আক্রমণকারীর চোয়ালে। আঘাতটা এতই শক্তিশালী ছিলো যে যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠে সাথে সাথেই পড়ে গেল সে। মুহূর্তের জন্য বাকি শত্রুরা ভয়ে পাথরের মতো জমে গেল। এত অবলীলায় আর পরিষ্কারভাবে তাদের এলিট স্কোয়াডের কোনো টিমম্যাটকে এভাবে উড়িয়ে দিতে এর আগে কাউকে কখনো দেখেনি তারা। তাদের আরো দুজন এগিয়ে এসে আক্রমণ করলো বিদ্যুৎকে। এবার সমন্বয় করে দুপাশ থেকে ধরতে চাইছে তাদের শিকারকে। দক্ষ পালটা আক্রমণের চালে একজন আক্রমণকারীর বাহুতে বাধা দিলো বিদ্যুৎ। চোখের পলকে তার কনুইয়ের মোচড়ে লোকটা হাত ভেঙে দু-টুকরো করে ফেললো। একই সময়ে অপর আক্রমণকারী ফুসফুসের উপরে লাথি খেয়ে শেষবারের মতো শ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁসফাঁস করছে। আক্রমণকারীদের তিনজন সদস্য এখন মাটিতে পড়ে মরণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। অথচ লড়াই শুরু হয়েছে আধা মিনিটও হয়নি। অসংখ্য নির্মম যুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা থাকার পরও বিদ্যুতের মতো এমন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়নি কোনোদিন তারা।

অবিশ্বাস্য চোখে তার এই কীর্তি প্রত্যক্ষ করছে সঙ্গীরা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কার্যত বারো শত্রুর মধ্যে তিনজনকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বিদ্যুৎ। এই একপেশে লড়াই দেখে খুশি হচ্ছিলো বলভান্ত। এক্সপ্রেস ট্রেনের চেয়েও বেশি গতিতে চলছে ন্যায়নার হার্টবিট। একইসাথে সে ভীষণ উদ্বিগ্ন আর আকর্ষণ বোধ করছে। সনু তো উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠতে চাইছিলো। মঠের যোদ্ধারা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে। পুণ্যার্থী আর পূজারিরা এখন চারপাশে জড়ো হতে শুরু করেছে। একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। কোনো পুলিশি ঝামেলা চায় না বিদ্যুৎ। দ্রুত শেষ করতে হবে তাকে।

উচ্চতর কালারিপায়াত্তুর ঢঙে পিছলে যেতে যেতে নিজের লম্বা, বাদামি চুলগুলো ঘাড়ের পেছনে খাটো করে পনিটেইল করে বেঁধে নিলো বিদ্যুৎ। বাম হাঁটুতে ভর দিয়ে খুব নিচু হয়ে ডান পা একপাশে সোজা করে এগিয়ে যাচ্ছে সে। চিতার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো সে শত্রুদের উপর। বিধ্বংসী গতিতে সমানে প্রাণঘাতী লাথি আর ঘুসি মারছে সে। বলভান্ত আর ন্যায়না তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষ করলো যে শুরুতে ঐতিহ্যবাহী কালারিপায়াত্তু ঢঙে শুরু করলেও এর সাথে জাপানি জুজুৎসু আর ইসরায়েলি ক্রাভ মাগার সংমিশ্রণে আঘাত হানছে বিদ্যুৎ। যে মার্শাল আর্ট বিদ্যুৎ প্রদর্শন করছে তা কেবল অভাবনীয়ই নয়, অবিশ্বাস্যও বটে। এমন কৌশলে লড়াই করছে যে তাকে হারানো অসম্ভব।

বুকে একটা অগভীর ছুরির আঁচড় ছাড়া আর কোনো আঘাত পায়নি বিদ্যুৎ। শত্রুদের জন্য এ এক বিস্ময়। বিদ্যুৎ দেখতে পেল বাচ্চা মেয়েদের খেলনা পুতুলের মতো চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে আর গোঙাচ্ছে মার্সেনারিরা। এমন সময় একজন আক্রমণকারী একটা ব্যারেটা ৯২ এফএস পিস্তল হাতে উঠে দাঁড়ালো। ট্রিগার টানার আগেই বুলডোজারের মতো তার পাঁজরের হাড় গুঁড়িয়ে দিলো বলভান্ত। তিন মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে লড়াই শেষ হয়ে গেছে। যাতে দেবতার নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে। সময়মতো সাহায্যের জন্য সেনাপতিকে মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানালো সে। নিঃশ্বাস ফেলে নিজের চুলের বাঁধন আলগা করলো বিদ্যুৎ। চুলে হাত বোলাতে বোলাতে আকাশের পানে তাকিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা সেরে নিলো। তারপর বালাকে ইশারা করলো আহত মার্সেনারিদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে। চরম শত্রুর জন্য ভাবার মতো বিশাল হৃদয় কেবল বিদ্যুতের মতো মানুষেরই থাকে। নদীতীরে প্রচণ্ড বাতাস বইছে। মন্ত্রপাঠ আর করতালের শব্দ চূড়ায় পৌঁছেছে।

দেব-রাক্ষস মঠের সদস্যরা দেখতে পেল একজন মহামানব, বিস্ময়কর যোদ্ধা এবং একজন অসাধারণ নেতা পতিত শত্রুদের মাঝখানে স্বগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। তার জ্বলজ্বলে উপস্থিতির সামনে অন্য সবাইকে ম্লান দেখাচ্ছে। দশশ্বমেদ ঘাটের বিজলি বাতির আলোয় বিদ্যুতের মুখটা জ্বলজ্বল করতে দেখতে পেল তারা। চাঁদনি রাতের পবিত্র বাতাসে তার চুলগুলো উড়ছে। তারা সবাই মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো।

নিঃসন্দেহে বিদ্যুৎ হচ্ছে সেই ত্রাতা, যার জন্য হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করেছিলো তারা।

ও-ই শেষ দেবতা।

বিদ্যুতের দিকে দৌড়ে গেল বলভান্ত এবং দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাকে প্রায় কোলে তুলে ফেললো। একইসাথে হেসে উঠলো এবং চোখ টিপলো বিদ্যুৎ। বুকের ক্ষত থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে এখন। চেক শার্ট ভিজে যাচ্ছে রক্তে। আহত অবস্থায় যেখানে শুয়ে আছে সেখান থেকে হাততালি দিয়ে উঠলো সনু। তার ঠোঁটের ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত বেরোচ্ছে। বিদ্যুতের কাছে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো ন্যায়না। কোনো সাড়া পেল না সে। দূরে বলভান্তের দিকে তাকিয়ে আছে বিদ্যুৎ। এটা কোনো ব্যাপার না। বিদ্যুতের কোনো ক্ষতি হয়নি দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো ন্যায়না।

'আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে বলভান্ত দাদা এবং যতটা সম্ভব দ্রুত এই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। চলো আমরা এই ভাড়াটে খুনিদের থেকে দূরে ঘাটের নিচের অংশ চলে যাই,' বলভান্তকে বললো বিদ্যুৎ। 'এখনো রুমি ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে কাছেপিঠেই কোথাও। আর ঐ কাপুরুষ কখনোই সামনে দিয়ে আক্রমণ করবে না।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো বলভান্ত। 'আমরা তাই করবো। চলো সনুসহ অন্যান্য আহত যোদ্ধাদের মঠে পাঠানোর ব্যবস্থাও করি আমরা।'

'সেটাই ভালো হবে...'

কথা শেষ করতে পারলো না বিদ্যুৎ, তার আগেই একটা রক্ত হিম করা চিৎকার শুনতে পেল সে। ঘুরে তাকিয়ে দেখলো সনুর উপরে ঝুঁকে আছে ন্যায়না; নিজের রক্তের সাগরে সাঁতার কাটছে ছেলেটা। এই ভিড়ে গোলমালের মধ্যে কোনো এক দক্ষ আততায়ী ওর গলা কেটে দিয়েছে, যে কাটাদাগের দৈর্ঘ্য মাত্র এক সেন্টিমিটারের মতো। তবে এই ক্ষত নিশ্চিতভাবে মানুষটাকে মেরে ফেলবে। মারা যাবে, তবে ধীরে ধীরে আর অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সয়ে।

বলভান্ত আর বিদ্যুৎ দৌড়ে গেল সনুর দিকে। তারা আতঙ্কিত চোখে চেয়ে দেখলো অল্পবয়সি ছেলেটা শ্বাস নেওয়ার জন্য কী নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে। কোন মুখে পুরোহিতজির মুখোমুখি হবে তারা? ভীষণ কাঁদছে ন্যায়না। তার চোখে আতঙ্ক। যথেষ্ট হয়েছে। বিদ্যুৎ আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। ন্যায়নার চুল ধরে প্রচণ্ড জোরে টান দিলো সে। জীবনে কোনোদিন মেয়েদের আঘাত করেনি দেবতা। ন্যায়নার মতো কোনো খুনি ডাইনিরও কোনোদিন মুখোমুখি হয়নি সে। প্রপিতামহ তাকে কাছের মানুষের বেইমানি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সে নিশ্চিত ন্যায়না তার সাথে বেইমানি করেছে। বেইমানি করেছে পুরো আশ্রমের সাথে।

'এটা কেন করলে তুমি, ন্যায়না?' নিজের স্বভাববিরুদ্ধভাবে হিসহিস করে উঠলো বিদ্যুৎ।

'কী করছো তুমি, বিদ্যুৎ?' প্রতিবাদ করলো ন্যায়না। 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? সনু আমার ভাইয়ের মতো!'

বিদ্যুতের কর্মকাণ্ড দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলো বলভান্ত। 'না, বিদ্যুৎ, ন্যায়না কোনোদিন আমাদের সাথে প্রতারণা করবে না। ও আমাদেরই একজন।' বলতে বলতে বিদ্যুতের কবজি ধরে ন্যায়নাকে মুক্ত করার চেষ্টা করলো সে।

'তুমি কিছুই জানো না, বলভান্ত দাদা! ও দামিনীকে ঘৃণা করে। আমাদের ক্ষতি করতে চায় সে। সে যদি আমাদের শত্রুদের হয়ে কাজ না-ই করে থাকে, তাহলে কেন সে মধ্যরাতে স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে ঘোরাফেরা করে? ও-ই আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে শত্রুদের জানিয়ে দিয়েছে!' জবাবে বললো বিদ্যুৎ। রাগে আর ঘৃণায় তার মুখটা ঘেমে গেছে।

হাল ছেড়ে দিয়েছে ন্যায়না। এখন কেবল সে বিদ্যুতের হাত ধরে মুঠোটা হালকা করার চেষ্টা করছে যাতে ব্যথা কম লাগে। অসহায় চোখে আর ভগ্ন হৃদয়ে বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। এ হৃদয় আর কোনোদিন জোড়া লাগবে না।

'পাগলামি কোরো না, বিদ্যুৎ। আমিই ওকে একটা ইরিডিয়াম ৯৫৫৫ ফোন দিয়েছিলাম। ব্ল্যাক টেম্পল বা কালো মন্দিরের রক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য!' চিৎকার করে বললো বলভান্ত।

বলভান্তের কথা জায়গামতো আঘাত করলো। হঠাৎ প্রচণ্ড অপরাধ বোধ করলো বিদ্যুৎ। ন্যায়নার সুন্দর হালকা লালচে চুল ছেড়ে দিলো সে। বুঝতে পারলো বিশাল বড় ভুল করে ফেলেছে। 'আমি খুব দুঃখিত, ন্যায়না...' শেষ করতে পারলো না সে। কানফাটানো তীব্র শব্দে তার কথা চাপা পড়ে গেল।

একইসাথে বাম কাঁধে জ্বলে যাওয়ার মতো প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলো সে। ঘুরলো বিদ্যুৎ। কয়েক ফুট দুরে একটা ওয়েবলি স্কট রিভলভারের মাজল থেকে তখনো ধোঁয়া বের হচ্ছে।

ওকে পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছে তারই সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু বালা।

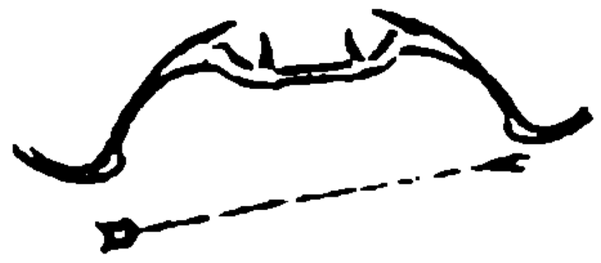

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ
দেবতার উত্তরাধিকারী

তারাকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে দেখে জমে গেল মানু। মুখটা খোলা, শ্বাস নিতে চেষ্টা করছে। সমস্ত শরীর বেয়ে নেমে যাচ্ছে শীতল ঘাম। তরবারির কোপে শরীরের পেছনে জখমের ব্যথার কথা ভুলে গেল সে। জন্মের পর থেকে এই দিনটাকেই সবচেয়ে বেশি ভয় করে আসছিলো সে।

সামনেই মাটিতে পড়ে আছে সাঞ্জনা। একটা তামার তীর বিঁধে আছে তার বুকের গভীরে। পরনের পোশাক রক্তে ভিজে যাওয়া সত্ত্বেও তাকে ভীষণ শান্ত আর স্থির মনে হচ্ছে। দেবতার ঐশ্বরিক ক্ষমতার পেছনে অর্ধেক শক্তি ছিলো তার স্ত্রী। তার কম্পমান আঙুল মানুর দিকে তাক করা। কাঁদছে সে, তবে চোখে ঝরে পড়ছে ভালোবাসা। এমনকি এই মুহূর্তেও তার মুখে লেগে আছে প্রশান্তির একটা কোমল হাসি।

'মা!' চিৎকার করে কাদায় লাফিয়ে পড়ে মুমূর্ষু মাকে জড়িয়ে ধরলো মানু।

'মা, আমি দুঃখিত...আমি দুঃখিত...মা, আমি দুঃখিত...' ফোঁপাচ্ছে মানু। এমনভাবে মাকে জড়িয়ে ধরেছে যেন তার আত্মাকে মায়ের দেহ ছেড়ে বেরোতে দেবে না।

অসাড় হাতে ছেলের গালে আদর করে দিলো সাঞ্জনা। 'আমার যাবার সময় হয়েছে, বাবা। তবে এই তৃপ্তি নিয়ে যাচ্ছি যে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষটার স্ত্রী

আর মহৎপ্রাণ একটি ছেলের মা। ইতিহাস কোনোদিনই আমাকে ভুলে যাবে না।' বাক্যটা শেষ করে রক্তবমি করলো সে।

'না, মা...এক্ষুনি আমরা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবো। আর তোমাকে একজন আয়ুর্বেদাচার্যের কাছে নিয়ে যাবো আমি। তুমি ঠিক হয়ে যাবে, মা। তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারো না, মা!' এই মুহূর্তে আহত এবং রক্তাক্ত মানু আকুল হয়ে কাঁদছে। 'কীভাবে আমি বাবার মুখোমুখি হবো, মা? কী জবাব দেবো তাকে? আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না, মা...' ভেঙে পড়লো মানু। বেশিরভাগ ছেলেই তাদের মাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তবে সাঞ্জনার জন্য মানুর ভালোবাসা সীমাহীন। মা তার অস্তিত্ব। মা তার কাছে ঈশ্বর।

'এই কথাটা মনে রেখো, বাবা...পৃথিবীর শেষ দেবতার উত্তরাধিকারী তুমি। বৃহৎ উদ্দেশ্যে তোমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। সেটা পূরণ করো। সে যাই হোক...নিজের নিয়তিকে খুঁজে নাও।' সাঞ্জনার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিলো। শেষ কথাটি উচ্চারণ করলো সে। 'তোমার বাবা, আমার বিভাষণকে বোলো...দেখা হবে পরপারে।'

ছেলের কোলে ঢলে পড়লো সাঞ্জনা। সেই সাথে মানুর পৃথিবীর আলোও যেন চিরতরে নিভে গেল।

'আপনাকে অবশ্যই এখন চলে যেতে হবে, মানু!' চিৎকার করলো তারা। সে সহ অসাধারণ নয়জনের দলের আরো দুই সদস্য বর্ম তৈরি করে ধেয়ে আসা তীরের বৃষ্টি থেকে তাকে আর সাঞ্জনাকে রক্ষা করছিলো। তবে এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে হরপ্পার উন্মত্ত সৈন্যরা যেকোনো মুহূর্তে তাদের পরাজিত করে ফেলবে।

মানু যেতে অস্বীকার করছে। প্রাণহীন মায়ের লাশটা কোলে নিয়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে সে।

আর অপেক্ষা করতে পারে না তারা। সে জানে দেবতার বংশকে টিকিয়ে রাখার একটাই আশা আছে, আর তা হলো এই দুঃস্বপ্ন থেকে মানুর পলায়ন। ঢালের আড়ালে নিচু হয়ে মানুর একটা হাত ধরলো সে।

'উঠুন, হে দেবতাপুত্র! আপনার মৃত্যুর সময় হয়নি। অন্তত আজ না!'

ধীরে ধীরে তার দিকে ফিরলো মানু। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে সে। মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলো সে ফিরে আসবে তাকে নিয়ে যেতে। তার মা অবশ্যই অপেক্ষা করতো। সে কথা দিয়েছিলো যে! নিজেকে কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারবে না মানু। আজ যদি ওরা তার গর্দান কেটে নিতো, তাতেও সে কিছু মনে করতো না। মা ছাড়া যে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই বৃথা।

মানুকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার জন্য একটা ঝাঁকি দিলো তারা। যেই না সে একটু ঝুঁকেছে, একটা তীর এসে সোজা তারার কাঁধে বিঁধলো। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে মানুর পাশে মাটিতে পড়ে গেল সে। তারাকে পড়ে যেতে এবং যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখে বাস্তবে ফিরে এলো মানু।

'দৌড়ান, মানু...সময় থাকতে পালান...' অনুরোধ করলো তারা। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নিজের তীরটা ঠিক করে নিলো সে। 'আপনি দেবতার একমাত্র ছেলে মানু। সমগ্র মানবজাতির জন্য আপনার বেঁচে থাকাটা জরুরি।'

মানু কিছু বলে ওঠার আগেই দৌড়ে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন সোমদত্ত। ভয়ে আর ক্লান্তিতে হাঁফাচ্ছেন তিনি।

'তুমি এখন চলে যাও, মানু!' দেবতার ছেলেকে নিজের ছেলের মতো নির্দেশ দিলেন। 'আমরা আর খুব বেশিক্ষণ তাদের আটকে রাখতে পারবো না।'

বন্ধুদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়ে যেতে পারে না মানু। পরম মমতায় মায়ের মৃতদেহটা মাটিতে নামিয়ে রাখলো। চোখ থেকে অঝোরে ঝরছে অশ্রু। ঝুঁকে মায়ের গালে চুমু খেল সে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের তলোয়ারটা তুলে নিলো।

'আমি আপনাদেরকে এখানে ফেলে পালিয়ে যাবো না, কাকা,' বললো সে। 'আমরা একসাথে লড়বো, একসাথে মরবো।'

'তোমার বাবার কী হবে, মানু? তুমি কি চাও তিনি বীভৎস কারা প্রকোষ্ঠে পচে মরুক?' রাগত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন সোমদত্ত। 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না এখানে থাকলে মারা যাবে তুমি? শয়তানগুলো তোমার মায়ের শেষকৃত্যটুকুও করতে দেবে না। এটুকু তোমার কাছে তার পাওনা, মানু...তোমার বাবা-মায়ের পাওনা।'

মানু বুঝতে পারছিলো না কী করবে। তবে প্রাণপ্রিয় বাবা আর পরলোকগত মায়ের প্রতি তার দায়িত্ব সবকিছুর উর্ধ্বে।

এখন সোমদত্তের বাকি সৈন্যদের সাথে লড়ছে হরপ্পার সৈন্যরা। মানুর যোদ্ধাদের তীরবৃষ্টিতে গতি কিছুটা কমে গেছে। তবে এটা যথেষ্ট নয়। মিনিটখানেকের মধ্যে সোমদত্ত, মানু, তারা আর তাদের সহযোদ্ধারা হরপ্পার নৃশংস সৈন্যসমুদ্রে চাপা পড়বে।

'এখুনি রওয়ানা হও, মানু। তোমার মাকে সাথে নাও। পূর্ব দিকে এগিয়ে যাও আর কালো মন্দির খুঁজে বের করো। সেখানে গেলে সাহায্য পাবে তুমি,' হরপ্পার এক মাতাল সৈন্যের ছুরিকাঘাতের জবাব দিতে দিতে বললেন সোমদত্ত।

মানুর জন্য একটা ঘোড়া তৈরি করে রেখেছে তারা। দুজন সহযোদ্ধা শ্রদ্ধাভরে সাঞ্জনার মৃতদেহটা উপরে তুলে দিলো।

নিজের বিশ্বস্ত অনুসারীদের দিকে একবার তাকালো মানু। ঘোড়ায় আরোহণ করার আগে তার শেষ কথাগুলো বললো সে। 'হে প্রিয়জনেরা আমার, আমি তোমাদের মাঝে ফিরে আসবো। আর এবার আমি আর ওয়াদা ভঙ্গ করবো না। তবে যাবার আগে তোমাদের বন্ধু এবং মহান দেবতার পুত্র হিসেবে আমি তোমাদেরকে একটা শেষ নির্দেশনা দিয়ে যেতে চাই।'

অনুসারীরা একযোগে মাথা নাড়লো।

'কী সেই নির্দেশ, হে নির্ভীক মানু?' জিজ্ঞেস করলেন সোমদত্ত।

অশ্রু সংবরণ করার জন্য মুখ ঢাকলো মানু। তারপর সে ঠিক একজন সমরাধিনায়কের নিজের সৈন্যদলকে নির্দেশনা দেওয়ার মতো করে বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, 'আমি নির্দেশ দিচ্ছি তোমার সবাই এই লড়াই থেকে বেঁচে ফিরবে! আজ রাতে আমি তোমাদের সবাইকে নিজের জান বাঁচানোর নির্দেশ দিচ্ছি!'

তার যোদ্ধারা কান্নায় ভেঙে পড়লো। দাঁত কামড়ে আবারও মাথা নাড়লো। তারপর প্রত্যেকের স্ব-স্ব অবস্থানে চলে গেল। এই পরীক্ষাক্ষেত্রে তলোয়ার হাতে বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা যোগালো মানুর কথাগুলো।

ঘোড়ায় উঠে বসে সাঞ্জনার মৃতদেহটা পরম মমতায় কোলে তুলে নিলো মানু। বিদায়ের আগে শেষ নির্দেশনা দিলেন সোমদত্ত। 'পৃথিবীতে কোনো জায়গা যদি তোমাকে নিরাপত্তা দিতে পারে সেটা হলো কালো মন্দির, মানু। আজ রাত এবং আগামীকাল উদ্ধার অভিযান পর্যন্ত যদি আমরা বেঁচে থাকতে পারি, তাহলে আজ থেকে এক পক্ষকাল পরে সপ্তর্ষিদের পর্বতে দেখা হবে আমাদের। আশা করছি তখন দেবতা আমাদের সঙ্গে থাকবেন!'

'হ্যাঁ, কাকু। আর সবকিছুর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ,' শত্রুর বিপরীত দিকে ঘোড়া দাবানোর আগে বললো মানু।

তবে কোনো কিছুই যেন সে রাতে পুণ্যবান দেবতার পরিবারের অনুকূলে যাচ্ছিলো না। মানুর ঘোড়া তখনো পূর্ণ গতিতে ছোটা আরম্ভ করেনি, এমন সময় একজন হরপ্পান সেনাধিনায়ক তাকে দেখে ফেললো।

'ঐ দেখ বিভাষণ পূজারির ছেলে যায়!' চিৎকার করে উঠলো সে। মানুকে দেখিয়ে তার সৈন্যদের নির্দেশ দিলো সে, 'তীরন্দাজগণ...ওকে শুইয়ে দাও!'

সোমদত্ত, তারা আর ওদের অবশিষ্ট সৈন্যরা হরপ্পান তীরন্দাজদের দলটার দিকে ছুটে গেল। তীর ছোঁড়া থেকে বিরত রাখতে হবে সৈন্যদের। তবে তীরন্দাজরা অনেক দূরে চলে গেছে। তা দেখে ক্ষুব্ধ সাপের গতিতে ছুটে গেল তারা। তবে দেরি হয়ে গেছে তার। আকাশ কালো করে ছুটে যাচ্ছে অসংখ্য তীর।

এবং তার মধ্যে তিনটা গিয়ে লক্ষ্যে আঘাত হানলো।

শেষ যে দৃশ্যটা আহত তারা আর সোমদত্ত দেখতে পেলেন তা হলো, মায়ের মৃতদেহটা কোলে নিয়ে ঝাপসা বৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে মানু। পিঠে আর ঘাড়ে বিঁধে আছে তিনটে বিষাক্ত তীর। রামদার আঘাতে হওয়া ক্ষত থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে। তারার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। এমন ভয়ংকর আঘাতে কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না। কষ্টে চোখ বন্ধ করে দেবতার শেষ বংশধরকে বিদায় জানালেন সোমদত্ত।

'বিভাষণ পূজারির বংশলতিকার এখানেই সমাপ্তি। পৃথিবীতে আর কোনোদিন দেবতা ফিরে আসবেন না,' বিড়বিড় করে বললেন সোমদত্ত।

সে ভাবতেই পারেনি যে তার কথাগুলো ভুল প্রমাণিত হবে কোনো একদিন।

বানারস, ২০১৭

তান্ত্রিকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানার আগে বালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ব্যালেন্স নষ্ট করে দিলো ন্যায়না। চকচকে ওয়েবলি স্কট রিভলবারটা পড়ে গেল বালার হাত থেকে। এখন লড়াইটা দুজনের মধ্যে, যে লোকটা দেবতার সাথে বেইমানি করেছে আর যে নারী সারা জীবন ধরে তাকে ভালোবেসে গেছে। এই লড়াই থামার নয়। এর অবশ্যই একটা পরিণতি আসবে।

বিদ্যুতকে জড়িয়ে ধরে আছে বলভান্ত। ঘটনার পরিক্রমায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে সে মনে। প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে দেবতার। তার কাঁধের ভেতরে ঢুকে বসে আছে একটা বুলেট। দেব-রাক্ষস মঠের সমর নায়ককে এখন সনুর সাথে দ্বারকা শাস্ত্রীর প্রপৌত্রকেও বাঁচাতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ন্যায়নাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন নয় সে। ও নিজ হাতে দীক্ষা দিয়েছে তাকে। জানে বালা এখানেই শেষ আজ। দেবতার সাথে বেইমানি করে পার পেয়ে যেতে পারবে না সে।

অসহ্য ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎ। রক্ত হারিয়ে মাথা ঝিমঝিম করছে তার। শারীরিক কষ্টের চেয়ে বেশি যে ব্যাপারটা মেরে ফেলছে ওকে তা হলো, সারা জীবন ধরে বিশ্বাস করে আসা একজনের গুলি খেয়েছে সে। এখন সে

পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছে সবকিছু। আজ দুপুরেই তার প্রপিতামহ একটা কলুষিত আত্মার উপস্থিতির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলো তাকে। কীভাবে তা ন্যায়না হতে পারে? জন্মের পর থেকে মঠে আছে ন্যায়না। সে বিশ্বাসঘাতক হলে আরো অনেক আগেই মহান দ্বারকা শাস্ত্রী তা জানতে পারতেন। কেন তিনি এখনই কেবল কলুষিত আত্মার উপস্থিতি টের পাচ্ছেন? ঐ কলুষিত আত্মা বালার!

মহান মঠাধ্যক্ষ যে অশুভ উপস্থিতি মঠে উপস্থিত হয়েছে বলে টের পাচ্ছিলেন সেটা বসবাস করছিলো প্রতিহিংসাপরায়ণ বালাকৃষ্ণানের হৃদয়ের গভীরে। শুধু রুমিকেই প্রেরণ করেনি রোমের অর্ডার।

'সনুকে আর তোমাকে দ্রুত গোবর্ধনের কাছে নিয়ে যেতে হবে আমাকে, বিদ্যুৎ,' মঠের যোদ্ধাদের সাথে সনুকে তুলে ধরতে ধরতে বললো সে। ক্ষতটা বেঁধে দেওয়ার জন্য তাকে ইশারা করলো বিদ্যুৎ। 'না, বিদ্যুৎ,' প্রতিবাদ করলো বলভান্ত। 'তোমাকে একজন ডাক্তার দেখাতে হবে। ভগবানের দোহাই, তোমার শরীরের ভেতরে একটা বুলেট ঢুকে আছে।'

॥ঞ্চ॥

টান দিয়ে একটা গেঁটো-ছুরি বের করে আনলো বালা। তার কর্ডোরয় প্যান্টের নিচে বাম পায়ের মুজোর ভেতরে লুকোনো ছিলো এটা। ডান হাতের মধ্যমা আর তর্জনীর মধ্যে ধরলো সে ওটা। এখন থেকে তার হাতের প্রতিটা আঘাত একেকটা মারাত্মক ছুরিকাঘাত হবে। তারপরও পিছু হটলো না ন্যায়না, বরং সে-ই প্রথম আঘাত হানলো। একটা সাবলিল তালে বালার চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরতে আরম্ভ করলো সে এবং আচমকা লাফিয়ে উঠে একটা শক্তিশালী ঘুসি বসালো বালার নিচের চোয়ালে। প্রাণঘাতী ছুরি হাতে পশুর মতো ছুটে এলো বালা। তবে ন্যায়নাকে সম্পূর্ণ মিস করলো সে। ঐ মুহূর্তে কনুই দিয়ে মেরুদণ্ডে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিলো ন্যায়না। শুরুটা তার জন্য খারাপভাবে হলেও অভিজ্ঞ যোদ্ধা সহজেই হার মানতে নারাজ।

হাতের উপর ভর দিয়ে ঘুরলো বালা। বিদ্যুৎ গতিতে ন্যায়নার ডান পায়ে হাঁটুর উপরে আঘাত হানলো সে। গেঁটো-ছুরির আঘাতে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হলো রাজকীয়, ভয়ংকর ন্যায়নার অঙ্গে। তারপর ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো মাথা দিয়ে ন্যায়নার পেটে আঘাত করলো সে। বালার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ঘাটের শক্ত কংক্রিটের উপর পড়লো মেয়েটা। ঠিক যখন বালা মনে মনে ভাবছে এবার তাকে খুন করবে, এমন সময় জিমন্যাস্টদের মতো দুপায়ে লাফিয়ে উঠে স্প্রিং-এর মতো ঘুরলো ন্যায়না। একই ক্ষিপ্রতায় একটা ঘুসি বসিয়ে দিলো বালার ঠোঁটের নিচে। আঘাতটা ভয়ংকর ছিলো। শ্বাস নিতে পারছে না বালা। অসহ্য যন্ত্রণায়

ঠোঁটটা চেপে ধরলো সে। একইসাথে ন্যায়না একটা প্রাণঘাতী আপারকাট বসালো বালার গালে। এর ফলে মাথাটা পেছনে ঝুলে পড়লো বালার এবং হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে। এখানেই সমাপ্তি।

তবে দেব-রাক্ষস মঠের যোদ্ধা রাজকুমারীর কাজ তখনো শেষ হয়নি। আহত বাঘিনীর মতো ক্ষেপে আছে সে। একপাশে সরে গিয়ে রক্তাক্ত পা দিয়ে বালার ঠোঁটের উপর মরণ লাথি বসালো সে। তার ঘাড় ভেঙে ফেলতে যাচ্ছে সে।

'যথেষ্ট হয়েছে, ন্যায়না!' চিৎকার করে উঠলো বিদ্যুৎ।

ওর কথা শুনতে পেল না ন্যায়না। বালার গলার উপর তার হাতের চাপ আরো দৃঢ় হচ্ছে। আর বালার চোখদুটো যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

দৌড়ে গিয়ে বাহুতে ধরে টেনে ন্যায়নাকে সরিয়ে আনলো বিদ্যুৎ। 'না, ন্যায়না। আমরা খুনি নই। তাছাড়া, রুমির সাথে বোঝাপড়া শেষে আমি আমার বিশ্বস্ত বন্ধুকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই,' বললো বিদ্যুৎ। একসময়ের প্রাণের দোস্ত বিশ্বাসঘাতকটার দিকে তাকাচ্ছে না সে।

ধীরে ধীরে হাতের চাপ হালকা করলো ন্যায়না।

'ওকে মঠে নিয়ে যাও, বলভান্ত দাদা,' নির্দেশনা দিলো বিদ্যুৎ। পায়ের চাপ আলগা করে কাঁধের উপর একটা লাথি মেরে বালাকে মাটিতে ফেলে দিলো ন্যায়না। হাঁটু গেড়ে বসে বালার বিধ্বস্ত মুখের দিকে তাকালো বিদ্যুৎ। অবিশ্বাসে মাথা নাড়লো সে। তারপর প্রশ্নটা করলো, যে প্রশ্নটা এতক্ষণ তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিলো। 'কেন, বালা?' জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ। 'আমরা তো ভাইয়ের মতো ছিলাম। কেন?'

'কারণ যুদ্ধ আর ভালোবাসায় সবই ঠিক, বিদ্যুৎ,' জবাব দিলো বালা। মুখটা রক্তাক্ত হলেও চোখদুটো ঘৃণায় জ্বলছে তার। 'তোর কোনো ধারণাই নেই...যুদ্ধ তো কেবল শুরু হয়েছে। নতুন ওয়ার্ল্ড অর্ডার চলে এসেছে, হে দেবতা। এমনকি তুইও এটা থামাতে পারবি না!'

ঘাটে এই মুহূর্তে একাই রয়েছে বিদ্যুৎ। ধীরে ধীরে ভিড় পাতলা হতে শুরু করেছে। ব্ল্যাক স্কোয়াডের সদস্যরা যেখানে শুয়ে কাতরাচ্ছে, সাংবাদিক আর গোয়েন্দারা এসে পৌঁছেছে সেখানে। বিদ্যুৎ আর তার লোকজন সেখান থেকে সরে গেছে। পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্স এসে আহতদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ শুনে আশ্বস্ত হলো যে সনুর অবস্থা এখন স্থিতিশীল। দেবতা মঠের সকলকে অনুরোধ করেছে আশ্রমের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে। জেরা করার জন্য বালাকেও নিয়ে

যাওয়া হয়েছে। তাকে মঠের আটকথানায় রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। কারা তাদের বিরুদ্ধে সামনে এবং পেছন থেকে এমন অশুভ আক্রমণ পরিচালনা করছে, সেটা জানার জন্য এই মুহূর্তে সে-ই তাদের হাতে একমাত্র সূত্র।

মার্সেনারিদের সামনে দিয়ে সর্বাত্মক আক্রমণটা যেমন হওয়ার কথা তেমনি ভয়াবহ ছিলো, কিন্তু বালার গোপন বিশ্বাসঘাতকতার সাথে এর কোনো তুলনা হয় না। এ থেকেই বোঝা যায় বিদ্যুতের কাজ, বাড়ি আর দৈনন্দিন জীবনের গভীরে কতটা অনুপ্রবেশ করেছে শত্রুরা। এমন জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতায় ভীষণ আতঙ্কিত বোধ করছে সে। জানে না কাকে বিশ্বাস করবে এখন। কবে থেকে বালা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে শুরু করেছে? যাদেরকে সে অর্ডার নামে ডেকেছে, তারাই কি ওকে সযত্নে, সূক্ষ্মভাবে অনুপ্রবেশ করিয়েছে? তারা কি বছরের পর বছর ধরে ওকে পর্যবেক্ষণ আর অনুসরণ করছে? যদি তাই করে থাকে, তাহলে কেন তারা আরো আগেই ওকে হত্যা করেনি? যেমনটা মহান দ্বারকা শাস্ত্রী তাকে সাবধান করেছিলেন, বিদ্যুতের কাছে এটা এখন পরিষ্কার যে খুব ক্ষমতাশালী একটা শক্তি তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে।

মানসিক ঘোর আর গভীর যন্ত্রণার মধ্যেও চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিদ্যুতের চোখ। যতদূর দেখা যায়, দশশ্বমেদ ঘাটের প্রতিটা কোনা খুঁটিয়ে দেখছে সে। সে জানে রুমি তার উপর লক্ষ রাখছে এবং আজ রাতে ঐ আততায়ীকে জনমের মতো শেষ না করে ঘাট ছেড়ে যাচ্ছে না বিদ্যুৎ।

চোখাচোখি হলো তাদের। ঠিক যেন শিকার আর শিকারি পরস্পরের খোঁজ করছে। নিয়মটাই কেবল যা অপরিষ্কার; শিকারি কে আর শিকারই বা কে? জিন্সের পকেটে হাত দিয়ে শান্তভাবে একটা পুরোনো মন্দিরের কোনায় দাঁড়িয়ে ঘটনাপ্রবাহ দেখছিলো রুমি। তবে এই মুহূর্তে হাসছে না সে।

ভয় আর রাগে জ্বলছে তার বালকসুলভ চোখদুটো।

ঘাটের নির্জন অংশের দিকে দৌড়ালো বিদ্যুৎ, যেখানে একটা প্রাচীন মন্দিরের থামের আড়ালে লুকিয়ে আছে রুমি। আরো একবার অদৃশ্য হয়ে গেছে গুপ্তঘাতক। মন্দিরের চারপাশ ঘুরে এলো বিদ্যুৎ, কিন্তু রুমির টিকিটির দেখা নেই। যেখানে গঙ্গা আরতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সে অংশের তুলনায় ঘাটের এই অংশটা বেশ নির্জন। গঙ্গা এখন মাত্র বিশ ফুট দূরে। দূরে মনিকর্ণিকা ঘাটে চিতার আলো মিটমিট করে জ্বলছে। বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মানবজীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের কথা। বেশ কিছু তান্ত্রিক আর অঘোরীদের (বলা হয়ে থাকে যে সিদ্ধি লাভের জন্য এরা মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণ করে) দল নদীতীরে বসে তাদের অতিপ্রাকৃত যজ্ঞ আরম্ভ করে

দিয়েছে। চাপা কণ্ঠে তাদের মন্ত্রপাঠ আশেপাশের পরিবেশকে আরো ভীতিজাগানিয়া আর রহস্যময় করে তুলেছে।

পুরো এলাকাটা খোঁজার সিদ্ধান্ত নিলো বিদ্যুৎ। সে জানে রুমি তার উপর লক্ষ রাখছে এবং পেছন থেকে আক্রমণ করতে পছন্দ করা একজন আততায়ীর কাছ থেকে খুব বেশি আত্মসম্মান বা সাহস আশা করে না সে। সময়ের সাথে সাথে দেবতাকে আরো দুর্বল করে দিচ্ছিলো তার শরীরের আঘাতগুলো। তবুও পবিত্র নদীর সমান্তরালে এক প্রাচীন মন্দির থেকে অন্য ঘাটে দৌড়ে চলেছে সে। দশশ্বমেদ ঘাট পেছনে ফেলে বহমান গঙ্গার একেবারে কিনারে এক দুর্গের কাছে চলে এসেছে সে। গঙ্গার জলে মৃদু সোডিয়াম বাষ্পের নিচে জ্বলজ্বলে কমলা রঙের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

'হ্যালো, বিদ্যুৎ,' দুর্গের সামনের দেয়ালের আড়াল থেকে চটপটে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো।

কণ্ঠটার উৎস খুঁজে বের করতে দু-এক সেকেন্ড লাগলো বিদ্যুতের। হ্যাঁ, এটাই রুমি।

আততায়ীর অবয়বটা লক্ষ করে এগোতে শুরু করেছে সে, এমন সময় দুটো চাপা শব্দ আর উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি অভিবাদন জানালো তাকে।

একজন দক্ষ শার্প শুটারের ন্যায় ওয়ালথার পিপিকে পিস্তল দিয়ে বিদ্যুৎকে গুলে করেছে রুমি। মাজলের সাথে স্পেকটার-২২ সাইলেন্সার লাগানো থাকায় গুলির শব্দটা শুনতে পায়নি অন্য কেউ।

ভয়ার্ত চোখে রুমি তাকিয়ে দেখলো, তা সত্ত্বেও এগিয়ে আসছে বিদ্যুৎ। ও দ্রুত নিজেকে সরিয়ে নেওয়ায় বুলিটটা তাকে মিস করে গেছে। কিন্তু পরেরটা ঠিকই জায়গা খুঁজে পেল এবং সোজা বিদ্যুতের পেটে এসে আঘাত করলো। বুকের উপর ছুরির ক্ষত ছাড়াও আজ রাতে দ্বিতীয়বারের মতো গুলি খেলো সে। এত বেশি মারাত্মক জখম আর এত অনিয়ন্ত্রিত রক্তপাত এমনকি একজন দেবতার জন্যও প্রাণঘাতী হতে পারে। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শরীরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে সে এখন।

আরেকবার গুলি করার আগেই দক্ষ তবে শারীরিকভাবে দুর্বল আততায়ীর মাথাটা গুঁড়িয়ে দিলো বিদ্যুৎ। বিস্ফোরক, ডেটোনেটর, মার্সেনারি, অনুপ্রবেশকারী আর সাইলেন্সার পিস্তল ছাড়া রুমি একজন লিকলিকে, দুর্বল হতচ্ছাড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রচণ্ড জোরে রুমির গালে ঘুসি বসালো বিদ্যুৎ। গভীর কাটা ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার সাথে তার চশমাটা উড়ে গেল রাতের অন্ধকারে। তারপর আততায়ীর ঊর্ধ্ব পটে শক্তিশালী আঘাত হানলো বিদ্যুৎ। সাথে সাথেই রক্তবমি করে দিলো রুমি।

হলো একপেশে শাস্তি, এবং এখন আর কোনো দয়া দেখাচ্ছে না বিদ্যুৎ।

'দাঁড়াও!' চিৎকার করে উঠলো রুমি। 'বিদ্যুৎ, প্লিজ, দাঁড়াও...প্লিজ...' অনুনয় করলো সে।

বিদ্যুৎ ভয় পাচ্ছিলো যেকোনো মুহূর্তে পড়ে যাবে সে। রুমির সর্বশেষ গুলি তার পেট ফুটো করে দিয়েছে। সেখান থেকে কলকল করে রক্ত বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। ধূর্ত আততায়ী কী বলতে চায় সেটা শোনার জন্য এক মুহূর্ত থামলো বিদ্যুৎ।

'আমাকে মেরে ফেললে কী লাভ হবে, দেবতা?' জড়ানো কণ্ঠে বললো রুমি। করুণা ভিক্ষা করে হাতজোড় করলো সে। 'তুমি যা জানতে চাও, আমি সব বলতে পারি।'

ডান হাতে লৌহমুষ্ঠিতে রুমির কলার ধরে শুনছে বিদ্যুৎ।

'আমি দুর্বল মানুষ, বিদ্যুৎ। আমার হিমোফেলিয়া আছে...আমার...আমার রক্ত...জমাট বাঁধে না। দয়া করে আর মেরো না আমাকে,' মিনতি করলো রুমি। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না বিদ্যুৎ। কঠোর এবং নির্মম খুনিটা ভয়ে কাঁপছে আর ভেজা কুকুরছানার মতো দয়া ভিক্ষা চাইছে। নিজের রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে রুমির মুখ। এমনকি একটু পরপর কাশির সাথে রক্ত বেরোচ্ছে তার। দুর্বল আততায়ীর জন্য বিদ্যুতের আঘাত ছিলো অসহনীয়।

মুঠো আলগা করলো বিদ্যুৎ। মাথা ঝিমঝিম করছে তার এবং যত দ্রুত সম্ভব গোবর্ধন-এর কাছে পৌঁছাতে চায় সে। জানে দ্রুত চিকিৎসা না করালে খুব বেশিক্ষণ টিকবে না সে।

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ তোমাকে, বিদ্যুৎ...' বিড়বিড় করলো রুমি। বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করার পর কোনো বাচ্চাকে বাবা বকা দিলে ঠিক যেভাবে কাঁদে। বজ্জাতটার জন্য প্রায় করুণাবোধ হচ্ছিলো বিদ্যুতের।

রুমিকে ধাতস্থ হওয়ার সুযোগ দিয়ে একটু নিঃশ্বাস ফেলছিলো বিদ্যুৎ। এই সুযোগে বুনো বেড়ালের মতো ছুটে এলো রুমি। ক্লান্ত এবং আহত বিদ্যুৎ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এলো একটা চকচকে সার্জিক্যাল নাইফ। ছুরিটা বুলেটের গতিতে বিদ্যুতের গলার উদ্দেশে চালালো সে। তবে এইবার প্রতিপক্ষ ট্রেনের সেই বিশালদেহী লোকটা বা তরুণ সনু নয়। এবার তার প্রতিপক্ষ দেবতা স্বয়ং। বিদ্যুৎ গতিতে সাড়া দিয়ে তার আক্রমণ রুখে দিলো বিদ্যুৎ। গলা থেকে একচুল দূরত্বে এসে থেমে গেছে সার্জিক্যাল নাইফ। রুমির মুখের অভিব্যক্তি বদলে গেছে। গালাগাল করছে সে। শরীরটা মুচড়ে এমন করছে যেন তার উপর শয়তান ভর করেছে। এটাই তার আসল চেহারা। রুমির কবজিটা প্রচণ্ড জোরে মুচড়ে দিলো সে। হাত থেকে পড়ে গেল সার্জিক্যাল নাইফ। ব্যথায় চক্কর দিয়ে উঠলো আততায়ীর মাথা।

'এটা সনুর জন্য,' দাঁত কিড়মিড় করে চিবিয়ে বলে উঠলো বিদ্যুৎ। আরো শক্ত করে ধরলো সে। মুক্ত অন্য হাত দিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় আঘাত করে খারাপভাবে মুচড়ে যাওয়া রুমির হাত কাঁধ থেকে বিচ্যুত করে দিলো। এখন কাঁধ থেকে ঝুলছে রুমির হাত। ঘাটের সিঁড়িতে পড়ে গেল সে। কাতরাচ্ছে ব্যথায়।

কলার ধরে রুমিকে টেনে তুললো বিদ্যুৎ। ঠেলে নিয়ে চললো দশাশ্বমেদ ঘাটের দিকে। এই নির্দয়, বিবেকহীন গুপ্তঘাতককে খুন করার যথেষ্ট কারণ থাকলেও উলটো সিদ্ধান্ত নিলো সে। ভালো আর মন্দের মাঝে সর্বদাই একটা পার্থক্য থাকে। সব সময়। আর এ জন্যই আজও টিকে আছে পৃথিবী।

'কী...কী করবে আমাকে নিয়ে, হে মহান দেবতা?' ভগ্ন কণ্ঠে অনেক কষ্টে বললো রুমি। কোনো উত্তর দিলো না বিদ্যুৎ।

'তুমি কি জানো কেন মাশ্চেরা বিয়ানকা তোমাকে খুন করতে চায়, বিদ্যুৎ?' বলে উঠলো রুমি। 'কারণ পনেরোশো বছর ধরে যা সুপ্ত অবস্থায় আছে সেটা উলট-পালট করার কোনো অধিকার নেই তোমার।'

রুমিকে ঠেলতে ঠেলতে হাঁটছে বিদ্যুৎ। কোনো উত্তর না দিলেও মনোযোগ দিয়ে শুনছে সে।

'এমনকি তুমি কি জানো কেন তিন দশক পর আজ এখানে বানারসে এসেছ তুমি? কেন তারা আরো অনেক বছর আগেই হত্যা করেনি তোমাকে? হে দেবতা, এর কারণ আজ থেকে এগারো দিন পর একটা প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতে যাচ্ছে। সেই ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ হতে রাতের আকাশে নক্ষত্ররাজি আর গ্রহসমূহের পাশাপাশি অবস্থানে আসার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমাকে একটা কারণে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে বিদ্যুৎ। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, সেটা সম্পর্কে তুমি জানোই না!' হাসার চেষ্টা করলো রুমি। থুতুর সাথে আরো রক্ত ফেললো, তারপর যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠলো আরেকবার।

'আমি তোমাকে লড়তে দেখেছি আজ। ওদের বিশ্বাস সত্য। তুমি সত্যি সত্যি একজন দেবতা। কিন্তু তারপরও তাদের সাথে লড়াই করে পারবে না তুমি, হে মহান দেবতা। ওদের ক্ষমতা আর প্রাচুর্য তোমার কল্পনার বাইরে। এই ফরমান বদলে দেবে পৃথিবীকে। তুমি ওদের রুখতে পারবে না!' যন্ত্রণায় প্রলাপ বকার মতো বলে চলেছে রুমি।

বিদ্যুৎকে থামতে হলো। ক্ষতের যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে পড়েছে। মোবাইল ফোন বের করে বলভান্তের নাম্বারে ফোন দিলো সে। বিদ্যুতের কথা শুনে আশ্বস্ত বোধ করলো বলভান্ত। বিদ্যুৎ জানালো যেখানে অঘোরী তান্ত্রিকেরা রাতের সাধনা করে, সেখানকার এক জেটি থেকে তাদের তুলে নিতে। এটা মাত্র কয়েক পা দূরে। বন্দিকে সাথে নিয়ে সেখানেই অপেক্ষা করবে বিদ্যুৎ।

'ওরা আসছে, বিদ্যুৎ। ওরা তোমার জন্য আসছে। ওরা আসছে কালো মন্দিরের জন্য,' ফিসফিস করলো রুমি।

খুনিটাকে তান্ত্রিকদের ঘাটের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকলো বিদ্যুৎ। হঠাৎ অনুভব করলো, বন্য খিঁচুনিতে ভেঙে পড়ছে রুমি। তীব্রভাবে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে তার শরীর। জবাই করা পশুর মতো যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মাটিতে পড়ে গেল সে। বিদ্যুৎ তার দিকে ফিরে দেখতে পেল, গাঢ় হলুদ ফেনা বেরোচ্ছে রুমির মুখ থেকে। তার চোখদুটো উলটে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

আর এভাবেই শেষ হলো রুমির অধ্যায়। তান্ত্রিক ঘাটে একটা পটাসিয়াম সায়ানাইড ক্যাপসুল খেয়ে নিয়েছিলো সে। এ-ই ছিলো এক গুপ্তঘাতকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে বসলো বিদ্যুৎ। একটু দূরেই পড়ে আছে রুমির দুমড়ানো-মোচড়ানো মৃতদেহ। দুজন অঘোরী লোলুপ দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে আছে। বলভান্ত আবার ফোন দিয়েছিলো তাকে। পুনরায় আশ্বস্ত করে বলেছে যে কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে। সেই সাথে তার জন্য জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছে ওরা।

রাত আরো অন্ধকার হয়েছে। ঘাট, বজরা, দোকানপাট আর নৌকার বাতিগুলো কমে আসছে। গাঁদাফুল আর অর্চনার সুগন্ধিযুক্ত বাতাসের একটা ঝাপটা এসে বিদ্যুতের চোখেমুখে লাগলো। চলার পথে পুরোনো ঘাটগুলোকে চুমু দিয়ে তার প্রিয় পবিত্র গতিপথে বয়ে চলেছে গঙ্গা। আজ রাতে অশুভের সাথে লড়াইয়ে জিততে গঙ্গা আরতি আসলেই আশীর্বাদ করেছে দেবতাকে।

রাতের গঙ্গার পানে তাকিয়ে আছে বিদ্যুৎ। মৃদুমন্দ বাতাসে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে তার স্নায়ুগুলো। নতুন ডিক্রি বা ওয়ান্ড অর্ডার আসলে কী তা জানা নেই তার। জানা নেই কী তাদের অশুভ পরিকল্পনা। এমনকি রুমির উল্লিখিত এই মাশ্চেরা বিয়ানকাই বা কে সেটাও জানা নেই। কালো মন্দিরে কী রহস্য লুকিয়ে আছে? তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে সামনের দিনগুলোতে আরো লম্বা, আরো কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে তার জন্য। তবে একটা ব্যাপারে দেবতা নিশ্চিত। অশুভ শক্তি যত ধূর্ত আর ভয়ংকরই হোক না কেন, শুভ শক্তির ভালোবাসা আর শ্রেষ্ঠত্বকে কোনোদিন পরাজিত করতে পারবে না।

শত হলেও প্রভু শিবের নিজের শহর এই কাশী।

হরপ্পা, ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ
মহা রক্তস্নান

দশজন বিশালদেহী কারারক্ষী হরপ্পার মহা স্নানক্ষেত্রের রুক্ষ মেঝে থেকে টেনে তুলে আনলো বিভাষণ পূজারিকে। ভয়ংকর মৃৎ কারাবাস বা মৃতের অন্ধকূপের পুরোটা পথ তাকে টেনে নিয়ে যেতে প্রস্তুত। নগর পরিকল্পনা করার সময় থেকেই হরপ্পার ঐতিহ্য এই মহা স্নানক্ষেত্র। পণ্ডিত চন্দ্রধরকে বিয়ে করার পূর্বে প্রিয়ংবদার নিজ বাড়ি মহেঞ্জোদারোও ছিলো একটি শক্তিশালী অঙ্গরাজ্য। তা সত্ত্বেও সমগ্র আর্যব্রত জুড়ে হরপ্পার মহা স্নানক্ষেত্র ছিলো সবচেয়ে বড় গণস্নানাগার আর জমায়েতস্থল। মহেঞ্জোদারোর মহা স্নানক্ষেত্রের চেয়ে এটা ছিলো প্রায় বিশগুণেরও বেশি বড়।

আজ সেই গণগোসলখানা এবং মিলনমেলাকে একটা নির্যাতনকেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছে ভয়ংকর সুন্দরী প্রিয়ংবদা। আর এ উপলক্ষ্যে সকল হরপ্পাবাসীকে দাওয়াত করা হয়েছে আজ।

ঘাম, রক্ত আর অশ্রুর ঘন আস্তরণে মাখামাখি হয়ে আছেন শেষ দেবতা। এমন নির্মমতার কথা কোনোদিন কল্পনাও করেননি তিনি। নিরবচ্ছিন্নভাবে দয়া প্রার্থনা করে চলেছেন বিভাষণ। এমনকি পাশ দিয়ে যাওয়া সাধারণ মানুষদের কাছেও হাতজোড় করে অনুনয় করে চলেছেন। প্রিয় সাঞ্জনা আর মানুকে রক্ষা করার জন্য যেকোনো কিছু করতে পারেন তিনি। ভারী একটা কাষ্ঠদণ্ড বেঁধে দেওয়া হয়েছে তার কাঁধে। ওটার ওজনের ভারে কুঁকড়ে যাচ্ছেন তিনি। অসহনীয় ভারী জিনিসটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাবুক পেটাও করা হচ্ছে তাকে। প্রায় এক ডজন

মোটা মোটা রশি আর শেকল দিয়ে নির্মমভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে বিভাষণকে। দেখে মনে হচ্ছে তার মাথা থেকে পা অব্দি পেঁচিয়ে আছে কমপক্ষে শখানেক গোখরা সাপ। তারপরও কেউ কর্ণপাত করলো না। যন্ত্রণাই কেবল শেষ নয়, হরপ্পার জনগণের পৈশাচিক আনন্দের উৎসে পরিণত হয়েছেন তিনি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক নির্যাতন, গণপাথর নিক্ষেপ, থুতু নিক্ষেপ আর উল্লাসের পর বিভাষণ পূজারি এখন নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরেছেন। একটার পর একটা লাথি-গুঁতো আর পাথর বৃষ্টির পর দয়া প্রার্থনা এখন অবিশ্বাস থেকে হতাশায় রূপ নিয়েছে। অবশেষে তা পৈশাচিক ঘৃণায় রূপ নিলো। দয়া ভিক্ষা বাদ দিলেন বিভাষণ। হাতদুটো অবমুক্ত করে কাঁটাওয়ালা লোহার শেকল আঁকড়ে ধরলেন তিনি। জখমে জর্জরিত পাদুটো সিঁধিয়ে দিলেন কাদার আরো গভীরে। তারপর পালটা চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। মরা পশুর মতো এতক্ষণ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো দৈত্যাকার দশজন রক্ষী।

বিভাষণ পূজারি এখন তাদের সকলকে নিজের দিকে টানছেন। ভারসাম্য হারাতে শুরু করেছে তারা। তাদের খাঁজওয়ালা জুতো শুকনো মাটিতেও পিছলে যেতে শুরু করেছে। পুরো তামাশা নিস্তব্ধ, নীরব হয়ে থেমে গেছে এখন।

অবশেষে প্রতিরোধ করছেন দেবতা।

কয়েক ঘণ্টা আগেও যে মানুষটিকে অবলীলায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো, তার অবিশ্বাস্য শক্তি দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল দশজন রক্ষী। বিশটি অশ্বের সমান শক্তিতে শেকল আর রশি টানছেন বিভাষণ পূজারি। রক্ষীরা তাদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করলো, সেই সাথে আরো জনবল চেয়ে পাঠালো। নবাগত সৈন্যদের কেউ কেউ হাত লাগালো রশিতে এবং বাকিরা লাঠিসোটা আর ধাতব দণ্ড দিয়ে পেটাতে লাগলো বিভাষণের হাঁটুর উপরে। কোনো লাভ হলো না। ছিন্নভিন্ন আর মুমূর্ষু হলেও বিভাষণ পূজারি এই মুহূর্তে অদম্য। শত অশ্বের সমান শক্তি প্রদর্শন করছেন তিনি এখন। তাকে থামানো যাবে না।

এমন সময় একটা শক্ত দণ্ড দিয়ে তার মাথার পেছনে আঘাত হানলো একজন রক্ষী। আগে থেকেই রক্তে রঞ্জিত মাথাটা ছুরি দিয়ে দুভাগ করার মতো দু-ফাঁক হয়ে গেল। যন্ত্রণায় কাতরে উঠে পড়ে গেলেন বিভাষণ পূজারি। সাথে সাথেই সবাই হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার উপর। লাঠিসোটা আর ধাতব দণ্ড দিয়ে পশুর মতো পেটাতে লাগলো তাকে।

॥ ৬৫ ॥

নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না চন্দ্রধর। তিনি জানেন যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জঘন্যতম পাপ কাজে অংশ নিয়েছেন তিনি। তিনি এটাও জানেন যে এই

ঘৃণ্য কাজের জন্য ঈশ্বর কোনোদিন তাকে ক্ষমা করবেন না। যেকোনো উপায়ে তাকে এটা বন্ধ করতে হবে। প্রিয়ংবদার দিকে না তাকিয়ে পরিষদের মণ্ডপ ছেড়ে তার পুরোনো বন্ধু এবং প্রিয় বোন জামাইয়ের দিকে দৌড়ে গেলেন। ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের শরীর দিয়ে দেবতাকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেন তিনি। ধেয়ে আসা প্রচণ্ড আঘাতগুলো সম্পর্কে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই তার। মাতাল সৈন্যরা ব্যাপারটা লক্ষ করে সাথে সাথেই পিছিয়ে গেল।

হরপ্পার প্রথম রাজা তাদের হৃদয়হীন আক্রমণের নিচে শুয়ে আছে!

বিভাষণ পূজারিকে দেখে প্রাণহীন মনে হচ্ছে। নিজের অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না আর চন্দ্রধর। বন্ধুর রক্তাক্ত মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলেন তিনি, এবং দৃশ্যত মৃতপ্রায় বন্ধুর কানে কানে কেবল তিনটে শব্দ উচ্চারণ করতে সমর্থ হলেন তিনি।

'ক্ষমা করো, বিভাষণ...'

তার আলখাল্লার ভেতর থেকে ঝাঁঝালো সিরকাপূর্ণ একটা চামড়ার থলে বের করে আনলেন। মুখ খুলে দেবতার ঠোঁটে চেপে ধরলেন সেটা। 'এটা পান করে নাও, বিভাষণ,' ফিসফিস করলেন চন্দ্রধর। 'এই অভিশপ্ত দিনে এর বেশি সাহায্য আমি করতে পারলাম না, বন্ধু। এই সিরকা পান করে নাও, সব শেষ হয়ে যাবে। তোমাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ঠেলাগাড়িভরতি ঘৃতকুমারী আর গন্ধরস নিয়ে যাচ্ছে আমার লোকেরা। তোমার জেগে ওঠার অপেক্ষায় রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে একটা গুহা প্রস্তুত করে রাখা আছে।'

ভূতগ্রস্ত মানুষের ন্যায় হঠাৎ চোখ খুললেন বিভাষণ পূজারি। ভাঙা দাঁত, ভাঙা হাড়, রক্ত আর কাদায় মুখ ভরতি হয়ে থাকায় পরিষ্কারভাবে কথা বলতে পারছেন না তিনি। তবে তার চোখগুলো অশ্রু আর ব্যথায় পূর্ণ হয়ে আছে। প্রতিহিংসাপরায়ণ পশুর মতো জ্বলছে সেগুলো।

'এক্ষুনি চলে যাও, পণ্ডিত চন্দ্রধর। প্রিয়জন আর এই ভূতুড়ে শহরকে বিদায় জানানোর শেষ একটা সুযোগ দিলাম আমি তোমাকে।'

বিভাষণ পূজারির সত্যিকারের ক্ষমতা সম্পর্কে যদি কেউ জেনে থাকে সে হলো চন্দ্রধর। বিভাষণ পূজারির চোখে এমন উন্মত্ত দৃষ্টি এর আগে কোনোদিন দেখেননি তিনি। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন হরপ্পাবাসীর ধ্বংস খুব কাছেই। তিনি কেবল বিড়বিড় করে এটুকু বলার সাহস পেলেন, 'এটা কোরো না, বিভাষণ। আমাকে শাস্তি দাও। প্রিয়ংবদাকে শাস্তি দাও। কিন্তু বাকিদেরকে মাফ করে দাও।'

চন্দ্রধরের আর্জিতে কোনো গুরুত্ব দিলেন না বিভাষণ পূজারি। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন তিনি। সাথে সাথে চোখেমুখে আর ঘাড়ে আরো আঘাত করা হলো তাকে। শুনতে পেলেন নিজের কণ্ঠার হাড় মটমট করে ভাঙছে। এবং

একজন রক্ষী একটা বর্শা এনে তার পাঁজরে সেঁধিয়ে দিলো। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেও শরীর থেকে আর রক্ত ঝরতে নিষেধ করলেন তিনি। যা বেরোলো তা হলো সরস্বতী নদীর বর্ণহীন গাঢ় অশ্রু। ব্যথাটা অসহ্য। তা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন বিভাষণ পূজারি। সময় হয়ে গেছে। চন্দ্রধর চিৎকার করে রক্ষীদের নির্দেশ দিলেন তাদের নির্মমতা থামাতে। পিনপতন নিরবতা নেমে এলো সেখানে।

অনেক কষ্টে নিজেকে দাঁড় করালেন দেবতা। তার রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে চারপাশের মাটি। এমনকি পুরোপুরি দাঁড়ানোর আগেই তার শরীর কাঁপতে শুরু করলো। উন্মত্ত দর্শকেরা অবিশ্বাসভরা চোখে তাকিয়ে দেখলো পৈশাচিকভাবে হাসতে শুরু করেছেন বিভাষণ পূজারি। উঠে দাঁড়িয়ে পুরো স্নানঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। এক মুহূর্ত পর প্রিয়ংবদার চোখে চোখ পড়লো তার। তার কাঁধে এখনো বাঁধা রয়েছে ভারী কাষ্ঠদণ্ড। ভবিষ্যদ্বাণী করার ভঙ্গিতে হাতদুটো প্রসারিত করে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। যন্ত্রণাময় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'সকলেই শুনে রাখো! শুনে রাখো, হে পাপীদের শহর! আমি বিভাষণ পূজারি, বিধ্বংসী প্রতিহিংসা নিয়ে আবার ফিরে আসবো। এই মহানগরীর সেবায় আমার পুরোটা জীবন উৎসর্গ করেছিলাম আমি। আর আজ তোমরা আমাকে মৃত পশুর মতো পাথর নিক্ষেপ করলে!'

উচ্চ শব্দে কাঁদতে শুরু করলেন বিভাষণ। কোনোভাবেই কান্না থামাতে পারছেন না তিনি। তার বিশ্বাসই হচ্ছে না এ সবকিছু তার সাথে ঘটছে। শেষ কথাটি বলার সময়ও একটা পাথর উড়ে এসে বাম চোখ গুঁড়িয়ে দিলো তার। রক্তের বন্যা নামলো তার মুখমণ্ডল জুড়ে।

'আআআররররগগগহহহ...' আবার চিৎকার করে উঠলেন বিভাষণ। তীব্র যন্ত্রণায় বিরামহীন কেঁদে চলেছেন। এখন প্রায় যায় যায় অবস্থা তার। এমন নারকীয় নির্যাতনের পর কেবল সাঞ্জনা আর মানুর চিন্তাই বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে। শরীরে আর কোনো সাড়া নেই তার। তারপরও কেবল দেবতা বলে নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন তিনি।

সানন্দে উল্লাস করে উঠলো দশ সহস্র জনতা। রক্তস্নাত এই ভোরে হরপ্পাবাসীদের এই আচরণ একসময়ের ন্যায়নিষ্ঠ হরপ্পাবাসীর তুলনায় সম্পূর্ণ বেমানান। শান্ত আর ধর্মভীরু হরপ্পাবাসীরা সকলেই মৃগী রোগীর মতো অসংলগ্ন আচরণ করছে। তাদের ভেতরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে পশুত্ব, প্রতিহিংসা আর দানব। সকলে মিলে প্রত্যক্ষ করছে আর উপভোগ করছে হরপ্পার দীর্ঘকায় মানুষটির অমানুষিক যন্ত্রণা।

অসহায় পশুর মতো মহা স্নানাগারের কাদার মধ্যে দেবতার দেহটাকে চেপে রেখেছে শেকলগুলো। এমতাবস্থায় শরীরের শেষ শক্তিবিন্দু একত্র করে সবাইকে শুনিয়ে সর্বশেষ ভয়ংকর সতর্কবাণীটি উচ্চারণ করলেন বিভাষণ পূজারি।

'আমার কথাগুলো মনে রেখো, নির্দয় হরপ্পাবাসী! আজ তোমরা সকলে মিলে যে নির্মম আচরণ করলে, আমার প্রতিশোধও হবে ঠিক তেমনি নির্মম আর নৃশংস! আমাকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের মধ্য থেকে এগিয়ে আসেনি কোনো স্নেহময়ী মা। আমার সুরক্ষায় হাত তোলেনি কোনো সন্তান। আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি কোনো দয়ালু ভাই। এমনকি কোনো শিশুও সামান্য চোখের পানি ফেলেনি। তা-ই হবে! তা-ই হবে! প্রতিটা সন্তান, প্রতিটা মা আর হরপ্পার প্রতিটা শিশু ঠিক সেভাবে ভুগবে, যেভাবে ভুগছে আজ আমার পুণ্যবান স্ত্রী আর প্রিয় পুত্র। হে সরস্বতীর নাদান সন্তানেরা, হে সপ্তর্ষিদের বজ্জাত ভেড়ার পাল, তোমরা নির্মমভাবে ধ্বংস হবে!'

ভারী কাষ্ঠদণ্ড আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত জড়ানো শেকল আর রশি নিয়েই এবার উঠে দাঁড়ালেন বিভাষণ পূজারি। রক্ত আর মাংসের বীভৎস বস্তুতে পরিণত হয়েছে তার চোখদুটো। তার ধড়ে কেবল চামড়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কান্নার দমকে কেঁপে উঠছে তার রক্তাক্ত বুক। পিচ্ছিল কাদা, ঘাম আর নিজের রক্তে মুখ থুবড়ে পড়লেন তিনি। দশ কারারক্ষীর সম্মিলিত টানের বিপরীতে উভয় হাত উঁচু করলেন দেবতা। তার হাতের মাংসপেশিগুলো যেন ফেটে পড়বে। তার বুকের পেশিগুলো লোহার তারের মতো লম্বা হয়ে গেছে। নিজের ভেতরের সবটুকু শারীরিক আর আধ্যাত্মিক শক্তি একত্র করলেন তিনি। একসময়ের দীপ্তিময় দেবতার মতো দেখতে মানুষটিকে এখন শয়তানের চেয়ে অশুভ আর অভিশপ্ত মনে হচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে হরপ্পাবাসীদের উদ্দেশে নিজের সর্বশেষ রক্তহিম করা বার্তাটি দিলেন তিনি।

'শুনে রাখ, যারা ইতোমধ্যে মরে গেছিস! শোন, সমবেত মৃত দেহরা! শোন, বোকার দল! আমি অর্ধ-মানব, অর্ধ-দেবতা!'

২০১৭, দিল্লি

মুমূর্ষ পিতৃপুরুষ ডেকে পাঠালেন বিদ্যুৎকে। দেবরক্ষা মঠের সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোত্রপধান বা দেবতা-দানবের বংশধর, বহন করে চলেছেন এক গোপন রহস্য। তাদের বংশের রক্ত বহন করে চলেছে এক প্রাচীন অভিশাপ যা মানবসভ্যতার জন্য এক ভয়ংকর মহামারী হয়ে নিয়ে যাবে সহিংস বিলুপ্তির পথে।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ সাল, হরপ্পা

প্রমত্তা স্বরসতী নদীতীরে অবস্থিত এক সমৃদ্ধশালী জমকালো শহর হরপ্পা। শেষ দেবতার উপর ভর করে বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধকার, তান্ত্রিক যাদুবিদ্যা এবং রক্তপাত-উন্মোচিত করে দেয় তার ধ্বংসের পথ।

২০১৭, প্যারিস

কেঁপে উঠল বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতাশালী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি। ইউরোপের ভয়ংকর ক্রাইম লর্ডের সাথে প্যারিসে দেখা হলো রহস্যময় এক মানুষের। নৃশংস এক গুপ্তঘাতক চড়েছে ট্রেনে, চরম ভয়ংকর কিছু ঘটার অপেক্ষা করছে রোম শহর। ফিরে এসেছেন পূর্বঅনুমিত দেবতা।

বানারস, হরপ্পা আর রোমের মাঝে যোগসূত্রটা কোথায়? কী সেই প্রাচীন অভিশাপ? আর কে সে দেবতাই বা কে? বিশাল হিন্দুকুশ উপত্যকার পতনের পেছনের কারণ খুঁজে বের করতে হলে পড়তে হবে সহিংসতা আর শঠতা, দেবতা আর মানুষের ভালোবাসা এবং উচ্চাকাঙ্খার এই আখ্যান।

হরপ্পা ট্রিলজির দ্বিতীয় বই

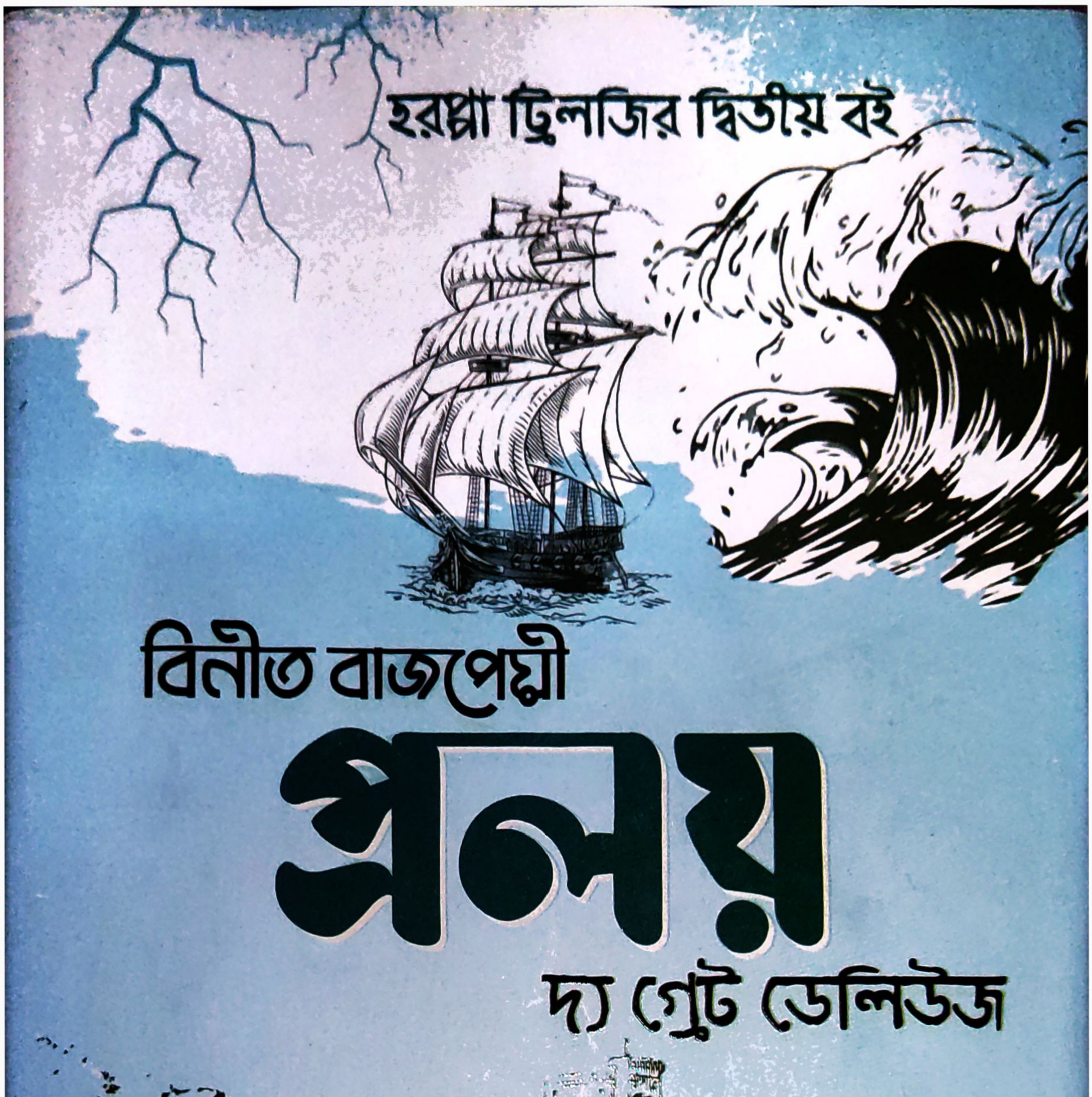

বিনীত বাজপেয়ী

প্রলয়

দ্য গ্রেট ডেলিউজ

অনুবাদ: জুবায়ের আহাম্মেদ

বিনীত বাজপেয়ী, জন্ম তার ভারতের উত্তর প্রদেশে। পড়াশোনা অর্থনীতি বিষয়ে। পরে স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন ব্যবস্থাপনায়। লেখক হয়ে ওঠার আগে বিনীত বাজপেয়ী ছিলেন আর দশজন পুরোদস্তুর ভারতীয় ব্যবসায়ীর মতোই। এক বছরের কর্মজীবন শেষেই প্রতিষ্ঠা করেন নিজের কোম্পানি 'ম্যাগনন সল্যুশন্স'। ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিটি ২০১২ সাল নাগাদ ভারতের অন্যতম বৃহৎ ডিজিটাল এজেন্সি হিসেবে পরিচিতি পায়। পরবর্তীতে তিনি TBWA গ্রুপের সিইও হিসেবে নিযুক্ত হন। ২০১৬ সালে নিজের দ্বিতীয় কোম্পানি ট্যালেনট্রেক এর যাত্রা শুরু করেন বিনীত বাজপেয়ী।

লেখক হিসেবে তার যাত্রা শুরু হয় আত্মউন্নয়নমূলক বই দিয়ে। তার প্রথম ফিকশনাল উপন্যাস "হরপ্পা; কার্স অভ দ্য ব্লাড রিভার" প্রকাশ হয় ২০১৭ সালে। ২০১৮ সালেই আসে এর দ্বিতীয় পর্ব "প্রলয়; দ্য গ্রেট ডেলিউজ"।

কর্মজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে একাধিকবার সেরা উদ্যোক্তার পুরস্কারও পেয়েছেন এই গুণী লেখক।

প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন

প্রলয়

দ্য গ্রেট ডেলিউজ

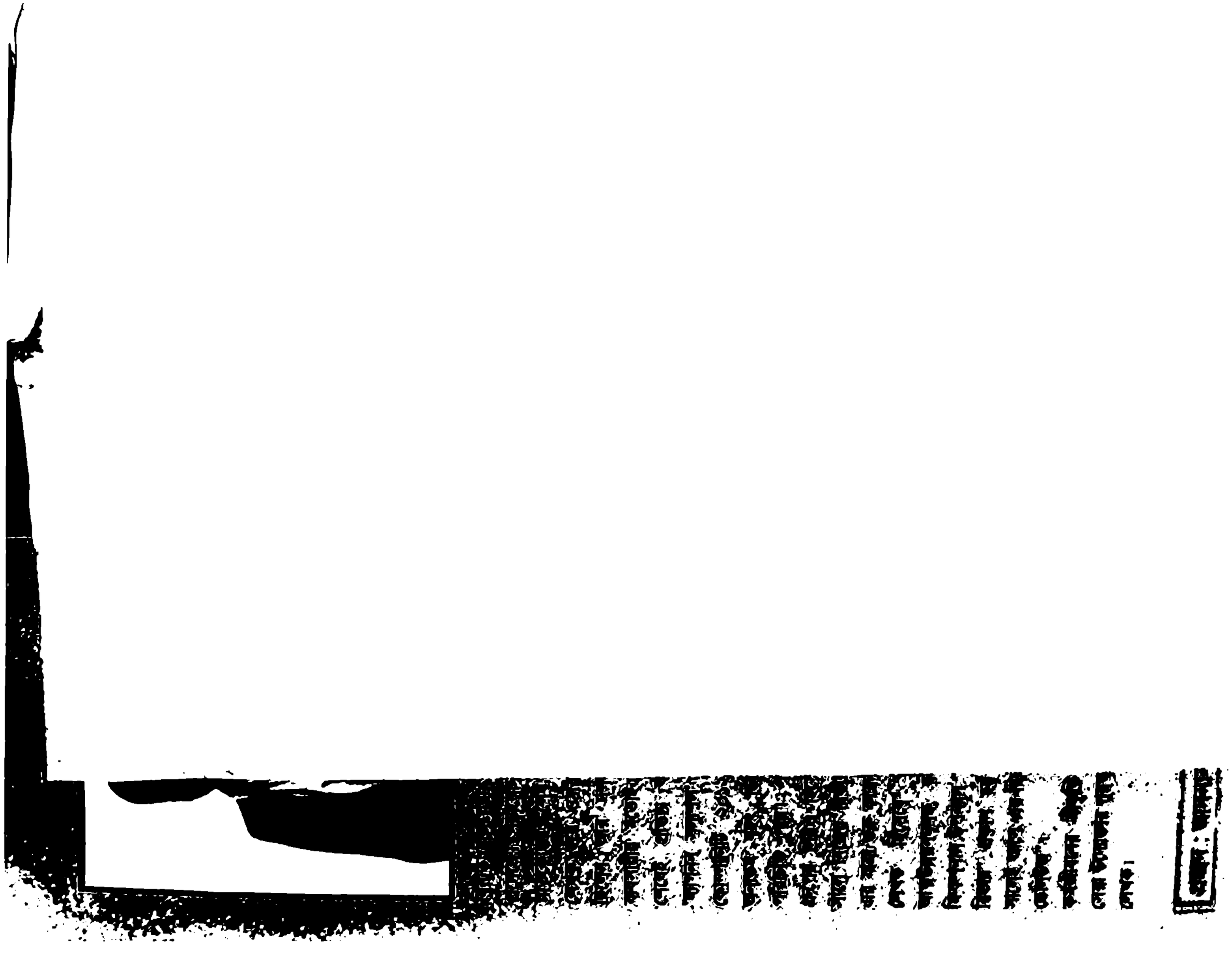

প্রলয়
দ্য গ্রেট ডেলিউজ

বিনীত বাজপেয়ী

অনুবাদ : জুবায়েদ আহাম্মেদ

সম্পাদনা : আশরাফুল সুমন

নয়া উদ্যোগ
বাংলাবাজার, ঢাকা

লেখকের উৎসর্গ

বৈদিকা, অদিতি এবং বন্দিতা

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০২৩
প্রকাশক
সাকায়েত খন্দকার
নয়া উদ্যোগ
৩৮/এ হাজী এন আলী টাওয়ার (২য় তলা)
মোঃ ০১৫৬৭ ৯০২৬০১
E-mail: nayaudyogdhaka@gmail.com

© নয়া উদ্যোগ

প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন
অক্ষর বিন্যাস : আপন কম্পিউটার
মুদ্রণ : আমানত প্রিন্টার্স

অনলাইনে বই পেতে যোগযোগ করুন
রেইনবো বুকস
কলকাতায় অনলাইনে পেতে যোগাযোগ করুন
বইবাংলা

মূল্য : ৪৬০.০০ টাকা মাত্র

ISNB : 978-984-96993-2-3

Pralay : The Great Deluge by Vineet Bajpai
Translated by : Jubayer Ahammad
Published by Naya Udyog, 38/A Haji N Ali Tower (2nd Floor)
Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : Book Fair 2023

Price : 460.00 Taka Only

U. S.A. Distributor ▣ Muktadhara
37-69,74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N. Y. 11372

Kolkata Distributor ▣ Boibangla
Stall No. 17 Block 2, Surya Sen Street Colleg Square South, Kolkata-700012
Phone No. + 917908071765

পূর্বে যা ঘটেছিলো

হরপ্পা

খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

হরপ্পার দেবতা, যাকে দীর্ঘদিন যাবৎ হরপ্পার সূর্য হিসেবে সম্মান করা হতো, সেই মহান বিভাষণ পূজারিকে প্রচণ্ড বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করা হয়। তারই বিশ্বস্ত বন্ধু এবং শ্যালক, জ্ঞানী পণ্ডিত চন্দ্রধর নিজের সুন্দরী স্ত্রী, মহেঞ্জোদারোর রানি প্রিয়ংবদার প্রতি অন্ধ আকর্ষণের কারণে তার অনৈতিক কাজে সহযোগিতা করে। মেসোপটেমিয়া থেকে আসা তিনজন অন্ধ কালো জাদুকর–গান, শা এবং এপকে হরপ্পায় আমন্ত্রণ করে প্রিয়ংবদা আর তার কুটিল পরামর্শদাতা রাঙা। কালো জাদুকরের দল তাদের বানানো বিশেষ বিষাক্ত তরল পদার্থ শহরের পানির উৎসের সাথে মিশিয়ে দেয়। যার ফলে পুরো এলাকার মানুষ উন্মত্ত আর হিংস্র হয়ে ওঠে।

এতসব গোলমালের মাঝেই হরপ্পার সবচেয়ে বিখ্যাত বাইজি নাচিয়ে নয়নতারাকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগে জড়িয়ে পড়েন বিভাষণ পূজারি। হরপ্পার দেবতাকে শাস্তি হিসেবে বন্দি করে রাখা হয় মৃৎ-কারাবাসে (মাটির নিচের এক অন্ধকূপ)। তার নির্ভীক সন্তান যুবক মানু যোগ দেয় হরপ্পার প্রধান প্রকৌশলী এবং বিভাষণ পূজারির শেষ মিত্র পণ্ডিত সোমদত্তের সাথে। পরের যুদ্ধেই মানু কুটিল রাঙাকে এক নাটকীয় মুখোমুখি লড়াইয়ে হত্যা করে। সেই একই সময়ে, জ্ঞানের নদী হিসেবে পরিচিত সরস্বতীতে অস্বাভাবিক এবং ভয়ানক এক বন্যা দেখা দেয়। ভয়াবহ সেই বন্যা পুরো হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসের হুমকি হয়ে উঠেছিলো। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিলো, মহাপ্রলয় আসন্ন। দেবতার দয়ালু স্ত্রী, মানুর মা সানজানাই হয়ে ওঠে হরপ্পার ক্রুদ্ধ সৈনিকদের মূল লক্ষ্য। ছেলের কোলে মাথা রেখে যুদ্ধের ময়দানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সোমদত্ত আর তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, সুন্দরী তারার নির্দেশে মানু নিজের মায়ের দেহ কোলে নিয়ে কুয়াশার মাঝে মিলিয়ে যায়। কিন্তু যদিও সে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে ধোঁয়াশার মাঝে মিলিয়ে গেছিলো, কিন্তু শত্রুর বিষমাখা তীর সুদর্শন এই যুবকের ঘাড় আর পিঠে আঘাত করে।

অনুবাদকের উৎসর্গ

আসমা-উল-হুসনা মিম, ফাহমিদা নিঝুম, জেবুন্নেসা বিনতে জামান সিসিলি।

আমার ত্রিরত্ন বান্ধবীরা! এই বইটার যখন কাজ শেষ করছি, তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন প্রায় শেষ। তোরা তিনজনই ক্যাম্পাসে, কুমিল্লায় রয়ে যাবি। আমিই একলা হবো।

তোদের প্রতি কৃতজ্ঞতা! তোরা না হলে যে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনটাই অপরিণত রয়ে যেত। জীবনের স্রোত কাকে কই নেবে জানি না। আমাদের চারজনকে যেন সে একসাথেই রাখে।

মাধ্যমে–মাচ্চেরা বিয়ানকা। রেগ তার বড়কর্তা থেকে একটা চিরকুট মাচ্চেরাকে দিতে এসেছে। ঐ চিরকুটে কেবল পাঁচটা শব্দ লেখা: 'হতচ্ছাড়া আর্য ছেলেটাকে খুন করো!' মাচ্চেরা কিংবা সাদা মুখোশ ইউরোপের সবচেয়ে সাহসী ক্রাইম লর্ড। তারপর রুমি পেরেরা নামের নিষ্পাপ চেহারার কিন্তু দুর্ধর্ষ এক আততায়ী পা রাখলো বানারসে।

এদিকে হরপ্পার সেই ভয়ানক গল্পটা বিদ্যুতের কাছে বর্ণনা করলেন মহান দ্বারকা শাস্ত্রী। সেই সাথে জানালেন ভারতীয়দের কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া এক মহিমান্বিত শহরের ধ্বংস হওয়ার পেছনে লুকিয়ে থাকা গভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, কীভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হারিয়ে যাওয়া সেই সভ্যতার অবশিষ্ট সব মূল্যবান জিনিস গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো। আর উপমহাদেশকে বঞ্চিত করেছিলো তার সত্যিকারের প্রাচীন গৌরব থেকে। তবে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত যে জিনিসটি তিনি জানিয়েছিলেন তা হলো, বিদ্যুৎ সাধারণ কেউ নয়, বরং সে-ই বিভাষণ পূজারি। ৩৭০০ বছর পর তার পুনর্জন্ম হয়েছে নিজের চূড়ান্ত সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য।

দ্রুত একের পর এক ঘটনা ঘটতে শুরু করে। যার মাঝে ছিলো বিদ্যুতের জীবনে ঘটে যাওয়া এক দুঃসাহী কিন্তু ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এক নাটকীয় মুহূর্তে ন্যায়না আহত বিদ্যুতের ঠোঁটে চুমু খায়। মঠে দামিনীর আচমকা প্রবেশ ঘটে। আর দশাশ্বমেদ ঘাটে শেষ এক লড়াইয়ের উদ্দেশে সর্বশেষ দেবতাকে রুমি উন্মুক্ত আহ্বান জানায়। সন্দেহের মাঝে থাকলেও ন্যায়নার সাহায্য নিয়ে বিদ্যুৎ মুখোমুখি হয় সেই ভাড়াটে খুনি রুমির বিরুদ্ধে। বিদ্যুৎ একাই রুমিকে পরাস্ত করেছিলো। তবে এর আগেই তাকে গুলি করে বসে তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু বালা। বালাকে আটক করা হয়। তারপর দেবতা বিদ্যুৎ রাতের বানারস শহরের অন্ধকার ঘাটে রুমির পেছনে ধাওয়া করে। চতুর সেই আততায়ী বিদ্যুতের হাতে ধরা পড়ে, তবে সাথে সাথেই পটাশিয়াম সায়ানাইডে কামড় বসায়। নিজের অন্তিম মুহূর্তে সে বিদ্যুৎকে জানিয়ে যায় 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' নামের এক জোটের কথা। ওরা আসছে বিদ্যুৎকে খুন করতে। সেই সাথে পুরো মানব জাতিকে।

হরপ্পার দেবতাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো গ্রেট বাথ অব হরপ্পায়। পশুর মতো নির্যাতন চালানো হলো তার উপর। ক্ষ্যাপা সৈন্যদের হাতে সে এখন পুরোপুরি পরাজিত। তার দিকে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছে। রেখে আসা হয়েছে একসময়ের মহিমান্বিত শহরের ক্ষিপ্ত জনতার মাঝে। দেবতা, হরপ্পার সূর্য নামে যিনি পরিচিত, সেই বিভাষণ পূজারি শপথ নিলেন প্রতিশোধের। একসময় যিনি পরিচিত ছিলেন তার উদারতা আর দেবতাতুল্য চেহারার জন্য। তাকে এখন দেখতে স্বয়ং অসুরের চেয়ে হিংস্র লাগছে। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে হরপ্পার জনতার উদ্দেশে নিজের শেষ ভয়ানক কথাগুলো উচ্চারণ করলেন, 'শোনো, তোমরা যারা ইতোমধ্যেই মারা গেছ! শুনে নাও, হে মৃতের দল! শোনো বোকারা! আমি অর্ধেক মানব, অর্ধেক ঈশ্বর!'

বানারস, ২০১৭
বর্তমান

প্রাচীন বানারস শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত দেব-রাক্ষস মঠের (ঈশ্বর-অসুর বংশ) ১০৮ বছর বয়সি রহস্যময় নেতা দ্বারকা শাস্ত্রী। বর্তমানে শয্যাশায়ী অবস্থায়। নিজের সবচেয়ে সফল, অস্বাভাবিক সুদর্শন এবং অসম্ভব চতুর প্রপৌত্র বিদ্যুৎকে মঠে ডেকে পাঠালেন তিনি। গুরগাঁও থেকে রওয়ানা দেওয়ার আগে বিদ্যুৎ তার প্রেমিকা দামিনী আর কাছের বন্ধু বালাকে জানিয়ে দেয়, জন্মসূত্রে তার দেহে দেবতাদের এক প্রাচীন এবং রহস্যময় বংশের রক্ত বইছে। বানারস পৌঁছেই বিদ্যুৎ বুঝতে পারলো, দীর্ঘদিন যাবৎ তার এই আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলো সবাই। মঠের পুরোহিত, সেই সাথে নিরাপত্তা প্রধান বলভান্ত আর বংশের চিকিৎসক গোবর্ধনের মতো চেনা মানুষ ছাড়াও আরেকজনের সাথে দেখা হলো বিদ্যুতের। তার ছেলেবেলার বন্ধু ন্যায়না। সময়ের সাথে ন্যায়না অবর্ণনীয় এক সুন্দরী নারী হয়ে উঠেছে। তার প্রতি এক দুর্বোধ্য আর অবাধ্য আকর্ষণ বোধ করছিলো বিদ্যুৎ।

মহান মঠাধীশ দ্বারকা শাস্ত্রী বিদ্যুৎকে জানিয়ে দিলেন, তাদের বংশ এক আদিম অভিশাপ বহন করে চলেছে। সেই সাথে এও জানিয়ে দিলো, বিদ্যুৎই শেষ দেবতা, ভবিষ্যদ্বাণী করে যাওয়া রক্ষাকর্তা। আর তা কেবল নিজের বংশের জন্য, মঠের জন্য কিংবা বানারসের জন্য না, বরং সে পুরো মানব জাতির রক্ষাকর্তা। বিদ্যুৎ যখন বানারসে পা রেখেছে, ঠিক একই সময়ে রেগ মারিয়ানি নামের আরেক রহস্যময় ব্যক্তি প্যারিসে অন্য এক বৈঠকে বসেছে। এমন একজনের সাথে বৈঠক, যাকে সে নাম দিয়ে চেনে না, চেনে তার পদবির

দশাবতার

দশাবতার মূলত বিপদরক্ষার দেবতা শ্রী বিষ্ণুর দশ ঐশ্বরিক অবতারকে নির্দেশ করে। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, শ্রী বিষ্ণু বারবার এই পৃথিবীতে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন অবতার হিসেবে নেমে এসেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিলো, সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং মন্দের উপর ভালোর বিজয় নিশ্চিত করা।

মৎস্যঃ সেই মহান মাছ যা সকল সৃষ্টিকে উদ্ধার করেছিলো।

কুরমাঃ সেই কচ্ছপ যে কিনা অমরত্বের অমৃতসুধা পেতে সাগর চষে বেড়িয়েছিলো।

বরাহঃ যে বুনো শূকর পৃথিবীকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছিলো।

নৃসিংহঃ সেই অর্ধ-মানব–অর্ধ-জানোয়ার যে ভয়ানক এক শয়তানকে বধ করেছিলো।

বামনঃ সেই বামন যে দুই পৃথিবীকে পুনরুদ্ধার করেছিলো।

পরশুরামঃ মৃত্যুঞ্জয়ী সাধক, স্বৈরশাসকের দমনকারী।

রামঃ অযোধ্যার রাজপুত্র, আদর্শ পুরুষ।

কৃষ্ণঃ যোদ্ধা, প্রেমিক, সংগীতজ্ঞ, রাষ্ট্রনায়ক, স্রষ্টা, রক্ষক এবং ধ্বংসকারী।

বুদ্ধঃ অসাধারণ জ্ঞানী এক পুরুষ।

কল্কিঃ শেষ অবতার, উজ্জ্বল তলোয়ারের বাহক, যার অপেক্ষা করছে শুভ শক্তি...যাকে ভয় করে মন্দ শক্তির বাহকরা...

ভূমিকা

'ওরা সবাই মারা যাবে...' নিজেকেই বিড়বিড় করে কথাটা বললো মানু। 'আর আমি ওদের সাথেই মরবো।'

এইসব মরিয়া আত্মা, এই তরুণ নারী এবং পুরুষেরা, ছোট বাচ্চা, বৃদ্ধ আর সর্বস্বান্ত মানুষের দল, এই পুরো জনতা, যাদের আমি আজীবন রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তারা প্রত্যেকেই পিঁপড়ার মতো চুরমার হয়ে যাবে।

এই প্রথমবারের মতো মানু তার সাহসী অভিযানের ভয়ানক পরিণতিটা বুঝতে পারছে। এই ভয়াবহ সত্যের মুখোমুখি হওয়ার আগ পর্যন্ত রহস্যময় সাগর-উপজাতির গুরুর দেওয়া উদ্ভট ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রতি পুরোপুরি নিমগ্ন ছিলো সে।

সামনের দৃশ্য দেখে প্রায় বিধ্বস্ত আর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া এই দলের আবেগী যুবক নেতা মানু পুরোপুরি জমে গেল। সে দেখতে পেল, বিশাল জাহাজটি প্রায় বিশ হাজার পাটের আঁশ আর গাছের লতার ক্ষমতার বাইরে গিয়ে প্রায় কাত হয়ে আছে। নদীগর্ভ থেকে উঠে আসা ভয়ানক আর বিধ্বংসী ঢেউ মানব ইতিহাসে বানানো সবচেয়ে বড় জাহাজটার গায়ে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে। বিশাল এই বন্যায় ডুবে যাওয়ার মুখে আছে জাহাজটা।

এই ঘাতক প্রলয় কি জানে, কতগুলো প্রাণ এই শেষ তরীটা বহন করতে সক্ষম?

* * * * *

সর্বশেষ আর সর্ববিধ্বংসী বন্যা যে ধেয়ে আসছে এটা বুঝতে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না। অন্ধকার, বেগুনি-লাল মেঘ দেখে মনে হচ্ছিলো, কোনো পাগলাটে স্বর্গীয় চিত্রশিল্পী পুরো পৃথিবীর আকাশকে মলিন লাল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। ইন্দ্রের বজ্রপাতের পাগল করা ধ্বনি আর অস্বাভাবিক হারে নেমে আসা ঝড়-বৃষ্টি মিলে পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংস, মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে। আকাশ থেকে বাঘের থাবার মতো বৃষ্টি এসে নামছে বড় বড় ফোঁটায়। মানু আর নিবেদিতপ্রাণ সেনাদের উপর বৃষ্টির পানি অনেকটা তীরের ফলার তীক্ষ্ণ আঘাতের মতো করে বিদ্ধ হচ্ছে। প্রতিটা বৃষ্টির ফোঁটা মানু-শিষ্য বা মনুষ্যের চামড়ায় আঘাত করছে অদৃশ্য বর্শার মতো। এই বীরপুরুষ এবং নারীর সেনাদল ভয়ানক পানির বিরুদ্ধে যে তরীকে ধরে রাখতে বা ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইছে, সেটা আদতে অতটাও সাধারণ কোনো তরী ছিলো না।

এটাই ছিলো শেষ তরী। এটা নিছক বন্দরের শেষ তরী না। কিংবা দ্রুততার দিক বিবেচনায় শেষ জাহাজও না। এই পরিস্থিতিতে ছেড়ে যাওয়া শেষ তরী কিংবা এই রাতে কোনো নাবিকের ছেড়ে দেওয়া শেষ জাহাজ নয়।

বিশাল এই তরীর আকারের সাপেক্ষেই এটা শেষ তরী। এটা সেই জাহাজ, যেটায় স্বয়ং পৃথিবী আশ্রয় নিতে যাচ্ছে। সেই সাথে থাকছে তার ভেতরে থাকা সমস্ত কিছু।

এ ছিলো মহান যোদ্ধা, ধর্মগুরু, সাধু, দার্শনিক এবং রাজা মানুর নিজস্ব মুক্তির উপায়।

এ ছিলো তার জাহাজ।

মানুর জাহাজ।

* * * * *

একটা জাহাজের বিরুদ্ধে এক হাজার নরনারীর এই নির্ভয় লড়ে যাওয়া, যেই জাহাজের আকার এতই বড়, স্বয়ং দেবতারাও যা কল্পনা করতে পারেন না। এই জাহাজ এমনই এক দর্শনীয় বস্তু, যা পৃথিবী আগে কখনোই দেখেনি। আর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এমনটা আর কখনোই দেখাও যাবে না। বিশাল এই জাহাজের আকার পুরো একটা জাঁকজমকপূর্ণ শহরের সমান। কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য মানব জাতি যতখানি অনুভব করতে পারে তার চেয়েও অনেক মহান।

এটা একটা পথ। সময় চলমান রাখার একমাত্র সেতুবন্ধন। এক ধ্বংস হতে যাওয়া প্রাচীন পৃথিবী আর পুনরায় জেগে ওঠার নতুন ভোরের সংযোগ। ভালো আর মন্দের মাঝে প্রকৃতির চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব আর মানুষের বেঁচে থাকার প্রচেষ্টার মাঝে এ এক চরম প্রতিযোগিতার রূপ ধারণ করেছে। মানব জাতি কোনো প্রকার লড়াই ছাড়া ধ্বংস হতে পারে না–এমন এক লড়াই যা স্বর্গ নিজেও মনে রাখবে। কিন্তু এমন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার পরেও অনেক কিছুই হারিয়ে যাবে। কালের পরিক্রমায় মানব জাতির অর্জিত অসংখ্য মূল্যবান আর অপূরণীয় জ্ঞান এই দরজার মতো জিনিসটার মধ্য দিয়ে ভিন্ন জগতে যেতে পারবে না। যদিও বা সবকিছুই মূলত এই পৃথিবীর মাঝেই নতুন করে উন্মুক্ত হবে। প্রাচীন আলকেমি, চিকিৎসা, নভোবিদ্যা, জাদুবিদ্যা, স্থাপত্য আর আধ্যাত্মিকতা–সবই চিরদিনের জন্য বিলীন হতে যাচ্ছে। মহাপ্রলয়ের ফলে সবই কিছুক্ষণের মাঝে ডুবতে চলেছে অতল সাগরের তলদেশে।

কিন্তু তারপরেও আর্যাবর্ত যেমনটা জানতো, এই জাহাজই জীবনের শেষ আশা। মানুষ যেমনটা ঈশ্বরের বিভিন্ন অন্তর্নিহিত পরিকল্পনা, যেমন তারকা,

গ্যালাক্সি কিংবা নক্ষত্র দেখে অবাক হয়ে যায়, মানে যা কিছুকে ঈশ্বরের অসীম কর্মক্ষমতার চিহ্নরূপে দেখা হয়, তার মধ্যে নিশ্চিতভাবেই সেরা সৃষ্টি মানবজনম। মহৎ, প্রাণবন্ত জীবন। যে প্রাণ ব্যথা অনুভব করে, জন্ম দেয়, কাঁদে আর বাধাহীন ভালোবাসতে পারে। এমন প্রাণ যা স্বয়ং ঈশ্বরেরই দর্পণস্বরূপ। আর এই সৃষ্টিকেই সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

সবার আগে।

* * * * *

জট-পাকানো, মোটা, ভেজা দড়ি আর লতাগুলো এখন মানুর সেনাদলের বাহু, ঘাড় আর পেশিতে কেটে বসছে। দড়ির উপর চেপে বসেছে প্রচণ্ড চাপ। ভাসমান একটা শহরকে বহন করার মতো বিশাল তরী তাদের আঙুল ভেঙে দিচ্ছে, কাঁধের হাড়গুলো সরে যাচ্ছে। যেন ছিঁড়ে ফেলছে বাহু আর হাতের পেশিগুলোকে। প্রতিপক্ষের অকল্পনীয় ওজনের বিরুদ্ধে নারী, পুরুষ, শিশু সকলেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সমানভাবে। ওরা প্রত্যেকেই ক্ষণস্থায়ী রক্ত আর হাড়ে গড়া মানুষ, অন্য দিকে এই তরীটা বানানো হয়েছে ভারী কাঠ, সংকর করা তামা আর শক্ত পাথর দিয়ে। এ এতই বিশাল যে পানিতে দাঁড়িয়ে যারা দড়ি টানছে, তারাও সরাসরি বিদঘুটে আকাশের দিকে তাকিয়ে এই বিশাল জাহাজের মাস্তুলের দেখা পাচ্ছে না।

তরীটা সুমেরু পর্বতের চেয়েও উঁচু, আর দশরাজ্য বা দশ রাজার ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধ যে মাঠে হয়েছিলো তার চেয়েও বেশি চওড়া।

মানু ক্রমশ আরো মরিয়া হয়ে উঠছিলো। একটা বাঁকা ঝিনুকের শঙ্খ বের করে আনলো সে। যখন খুবই বাজে পরিস্থিতির মাঝে পড়ে যাবে, তখন সংকেত হিসেবে ব্যবহার করতে ওটা দেওয়া হয়েছিলো। আর সেই সময়টা চলে এসেছে। তার ভক্তদের আসন্ন, যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর চেয়ে খারাপ আর কিছুই হতে পারে না। চামড়ায় বানানো কবজি-বন্ধনীতে মুখ মুছে একবার জোরে শ্বাস নিলো সে, এরপর শঙ্খে ফুঁ দিলো। একটা ভয়ানক এবং মাথা খারাপ করে দেওয়া তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এলো, যেন ঝড়ো আকাশটাকে পুরোপুরি বিভক্ত করে দেবে।

ভয়ানক একটা খাদের উপর একাকী দাঁড়িয়ে আছে মানু। রক্তলাল আকাশের নিচে ওটাকে দেখতে কয়লার মতোই কালো দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড বেগে নেমে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে মানু তার হাতের তালু দুই চোখের উপর দিয়ে রেখেছে। দূরের কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একেকটা মুহূর্ত যাচ্ছে, আর তার হতাশা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

পরাজয়ের কান্না চেপে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। আরো একবার বাঁকা শঙ্খটায় নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে ফুঁ দিলো। শঙ্খের সেই আওয়াজটা যেন কোনো ক্রুদ্ধ ড্রাগনের চিৎকার। আর মানুর হাজার দশেক প্রজার কানের পর্দায় সেটা সুঁইয়ের মতো আঘাত করলো।

মানু দুই চোখ কুঁচকে আকাশ থেকে নেমে আসা তীরের ফলার মতো বৃষ্টি থেকে বাঁচার চেষ্টা করলো। পাহাড়সম উঁচু স্রোতের পেছনে দেখার চেষ্টা করছে সে। তার আশা, যাকে প্রকৃত রক্ষাকর্তা ভেবেছিলো, তার নিশ্চল অবয়ব দেখতে পাবে।

কিছুই দেখতে পায়নি সে।

* * * * *

'ম...ৎস্য!' চিৎকার করলো মানু। এখন সে প্রশস্ত খাদের কিনারায় মোহাচ্ছন্নের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে। এ ছিলো তার পরিদর্শনের জায়গা, একই সাথে তার অধীন বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য অনেকটা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের মতো। তার ক্লান্ত, ভীত আর আশাবাদী চোখ দূর দিগন্তের বিধ্বংসী প্রলয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। বৃষ্টির ফোঁটা তার সুন্দর তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত মুখে এসে পড়ছে। সম্ভবত সে কাঁদতে শুরু করেছে। তার ভয়, সে হয়তো নিজের উচ্চভিলাসী কাজে ব্যর্থ হবে। একটা দোদুল্যমান চিন্তায় মনে হচ্ছিলো, এই অতিপ্রাকৃত টাইফুনের সাথে লড়াই চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

তবে কি নিজের প্রাণপ্রিয় বাবা মহান বিভাষণ পূজারির বাইরে একমাত্র যাকে সে বিশ্বাস করেছিলো, সে-ই তার সাথে প্রতারণা করেছে? তার বন্ধু, উপদেশদাতা, পরামর্শদাতা, নিরাময়দাতা...তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

তার প্রিয় মৎস্য কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

'মঅঅঅৎস্যঅঅঅঅ...আআআআহ!' শাস্তি নেমে আসা আকাশটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করলো মানু। তার দুই হাত প্রসারিত, ফুসফুস বিস্ফোরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত, যেন স্বর্গকে সে নিজের মরিয়া চিৎকার শোনাতে চায়।

আর তারপরে সে দেখলো ওটা। এই সর্বনাশা বন্যায়, সাগরের নির্মম ঢেউয়ের মাঝে দাঁড়ানো অবস্থায় ওটাকে দেখলো সে।

লোক-নাস, সমুদ্রের সবচেয়ে বড় দানব, যাকে বহু দূরের স্রোতের উপর মাথা বের করে রাখার কারণে পরাক্রমশালী স্রষ্টা ব্রহ্মার মতো মনে হয়। মানু এই প্রথম এই দানবাকৃতির জন্তুর আবছা অবয়ব দেখতে পেল।

আর তিনি ওখানেই নির্ভয়ে দাঁড়ানো, হাইড্রার জ্বলজ্বলে চোখের মাঝখানে।

মৎস্য।

রোমের কাছাকাছি কোথাও, ২০১৭
‘তোমার বিশ্বাস ওটা আসলেই সে?’

নিজের একমাত্র উপরস্থ কর্মকর্তার নিয়মিত আয়োজনে যেতে দেরি করে ফেলেছে সে। রোমের কাছাকাছি অঞ্চলে বেড়ে ওঠা বিগ ম্যান আজ সকাল থেকেই অস্বাভাবিক রকমের উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। এক ঘণ্টা আগে যে ফোনকল সে পেয়েছে, এরপর থেকেই তার মাথায় জট পাকিয়ে আছে। ঠোঁটের কাছে চায়ের কাপ ওঠানোর সময়েও হাত কাঁপছিলো তার।

পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী কজন পাদ্রির একজন হিসেবে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে সম্মানিত এই মানুষটি। একই সাথে আমাদের চেনা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ধনভান্ডারের তত্ত্বাবধায়ক। গ্রহের সবচেয়ে ক্ষমতাবান নারী-পুরুষের কাছে সে অর্ধেক মানব অর্ধেক ঈশ্বরের মতোই আধ্যাত্মিক একজন। সে এমন একজন, যে শুধু একজন ব্যক্তি বা সমাজের অবস্থা পরিবর্তন করে না, বরং পুরো মহাদেশেরই গতিপথ বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তার একটা টেক্সট মেসেজেই আণবিক বোমা ছাড়া হতে পারে কিংবা থেমে যেতে পারে দশক ধরে চলতে থাকা কোনো রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ।

যতটা ধারণা করা যায়, সে অনুযায়ী বিগ ম্যান মানুষটি মোটেও সাধারণ কেউ ছিলো না। খুব সুকৌশলে নিজেদের আত্মগোপনে রাখে এমন কয়েকজন মানুষের মাঝে সে একজন। কিন্তু এরপরেও অসীম ক্ষমতা, অবিসংবাদিত নেতৃত্ব এবং বৈশ্বিক ক্ষমতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন এই মানুষটি। কিন্তু এত কিছুর পরেও অর্ধেক পৃথিবী দূরে থাকা ৩৪ বছর বয়সি এক লোক এই মানুষকে চাপের মাঝে ফেলে দিয়েছে।

সত্যিকার অর্থেই চাপে ফেলেছে।

এরকম ঠান্ডা স্নায়ুচাপের সাথে বড় আকারের এই মানুষটি অভ্যস্ত না। একটু আগে ভদ্রভাবে তার কাছে আসা অধস্তন যাজকের দিকে রাগী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। বয়সে ছোট এই যাজক এসেছিলো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটির নিয়মিত সাক্ষাতের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে। ইতোমধ্যেই সে বেরিয়ে এসেছে তার সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত প্রাসাদের বারান্দায়। নিচে জড়ো হওয়া হাজারো মানুষের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় চলছে। নিজের ভেতরের অস্থিরতা কাটাতে বড় আকারের মানুষটার আপাতত কিছুটা ধূমপান করা দরকার।

প্রায় ১৬০০ বছরের প্রাচীন আর অদ্ভুত সব ভবিষ্যদ্বাণীর পর, বিগ ম্যানের ভাষায়, সেই ধার্মিক দেবদূত সম্ভবত এসে গেছে। আর এটা বিগ ম্যানের স্বর্ণপ্রাসাদ যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার জন্য খুবই খারাপ একটা সংবাদ।

আমাকে অবশ্যই রেগকে কল দিতে হবে।

* * * * *

'শুভ সকাল, প্রভু,' অপর পাশ থেকে একটা নম্র ইতালিয়ান কণ্ঠ বললো। 'আমাকে আপনার ফোনে দেওয়ার দরকার ছিলো না, স্যার। আমিই আপনার কাছে চলে আসছি।' রেগ মারিয়ানির কলারের নিচে ততক্ষণে ঘাম জমেছে।

বিগ ম্যানকে রেগের মতো কাছ থেকে খুব কমসংখ্যক মানুষই চেনে। এ কারণেই সে জানতো, সে এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাবান এবং বিপজ্জনক ধর্মীয় নেতার সাথে কথা বলছে।

'তোমার কাজ শেষ, রেগ?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো বিগ ম্যান।

'না...না, প্রভু, শেষ হয়নি।'

'তাহলে তোমার এই সাক্ষাতের কারণ কী, বৎস?'

এক মুহূর্তের জন্য সেখানে নীরবতা নেমে এলো।

'আপনি যেমনটা বলবেন, স্যার,' গলা পরিষ্কার করে পালটা জবাব দিলো রেগ। এই মুহূর্তে অসীম ক্ষমতাধর ঐ রাজপ্রাসাদে নিতান্তই একজন অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি সে।

'রেগ, আমার আশীর্বাদের জন্য তখনই এসো, যখন তোমার হাতে যে কঠিন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা শেষ করতে পারবে।'

'তাই হবে, প্রভু।'

বিগ ম্যান যেমন কণ্ঠে কথাগুলো বলেছিলো, রেগ তার সাথে একই সাথে পরিচিত এবং ভীত। এই শান্ত নির্মম কণ্ঠের মাধ্যমে কেমন করে নিষ্ঠুর আর হিংস্র সব আদেশ দেওয়া হয়, তা ভালোই জানা আছে রেগের।

'মাচ্চেরা বিয়ানকাকে আমার কথা মনে করিয়ে দিও, ঠিক আছে, রেগ? তাকে স্মরণ করে দিও, তার অস্তিত্ব এখন পুরোপুরি তার জন্য আমার করা প্রার্থনার উপর নির্ভর করে আছে।'

'আমি তাই করবো, প্রভু।'

'এও বলে দিও, তার সব অপকর্ম প্রভু আড়াল করে রেখেছেন কারণ সে এর চেয়েও বড় কাজের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেছিলো। সে যদি ঐ চূড়ান্ত আদেশের বেলায় ব্যর্থ হয়, তবে এই পৃথিবীতে তার কোনো ঠাঁই হবে না।'

কথাটা শুনে জমে গেল রেগ। কেবল বিগ ম্যানই ইউরোপের সবচেয়ে ভয়ংকর মাফিয়া দলের সদস্যের প্রতি এমন ভাবলেশহীন হুমকি দিতে সক্ষম।

লাইন কেটে দেওয়ার ক্লিক শব্দটা শুনে স্বস্তি পেল রেগ। বিগ ম্যানকে যারা হতাশ করেছে, তেমন কয়েকজনকে কী নৃশংস পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিলো সেটা সে নিজ চোখেই দেখেছে। যদিও তাদেরকে খুব ক্ষমতাধর মানুষ বলে মনে করা হতো। যদিও রেগ দীর্ঘদিন ধরেই সেই সম্মানিত ব্যক্তিকে সেবা দিয়ে এসেছে, তবে এখনো রেগ তার সামনে প্রথম দিনের মতোই অসহায় বোধ করে।

স্বস্তির একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলার আগেই তার ফোনটায় আবারো রিং বাজলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভয় জেগে উঠলো রেগের ভেতর; আবারো বিগ ম্যান। তবে এবার সে আর ঠান্ডা কণ্ঠের হিসেবি মানুষ না। তার কণ্ঠে যেন অনিশ্চয়তা, গলা কাঁপছে।

'আমাকে বলো, রেগ, তোমার কি মনে হয় ওটা সত্যিই সে? তোমার কি সত্যিই মনে হয়, এই ছেলেটাই ভবিষ্যদ্বাণীর সেই দেবদূত?'

আবারো সেখানে কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো। বিগ ম্যানকে কোনো প্রকার অস্বস্তিতে না ফেলে সত্যটা বলার উপায় ভালোই জানা আছে রেগের।

'হ্যাঁ, প্রভু। আমার বিশ্বাস, এটাই সে।' যে সত্যটা বিগ ম্যান শোনার জন্য সাহস করেছে, তার উপর জোর দেওয়ার আগে রেগ একটু থামলো। 'দেবতা ফিরে এসেছে।'

হরপ্পা, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
রক্তবৃষ্টি

হরপ্পান সৈন্যবাহিনীর সেরা দুইশো অশ্বারোহী সৈন্য প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলছে। সুচের মাথার মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছে সামনের দিকে থাকা পঞ্চাশজন সেনা। তলোয়ারবাহী পঞ্চাশজন সেনা আছে পেছন দিকের প্রহরী হিসেবে। আর ঘোড়ার পিঠে বাকি একশো তীরন্দাজ দুই পাশ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের মাঝখানে চাকা লাগানো একটা ভারী খাঁচা গড়িয়ে গড়িয়ে একই গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ওটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ষোলোটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়া। খুবই শক্ত ধরনের কাঠের নিরেট অংশ আর মোটা তামার পাতের দুর্ভেদ্য এই খাঁচা বিশেষভাবে বানানো হয়েছিলো একসাথে কয়েকটা সিংহকে আটকে রাখার জন্যে। তবে এই মুহূর্তে তেমন বড় ধরনের কোনো বিড়াল গোত্রের প্রাণী এখানে নেই। বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে মূল্যবান এই বন্দি অনেক বেশিই বর্বর।

ঘোড়ার পিঠে থাকা এই উত্তেজিত সেনাদল দেখতে বেশ ভয়ানক। হরপ্পার সেনাদলটি পুরোপুরি উন্মত্ত আর তাদের রক্তপিপাসা একেবারেই তুঙ্গে। চোখগুলো বড় আর লাল, পলক যেন পড়ছেই না। মুখের সামনে ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো লালার ফেনা জমে আছে। চলতে চলতে সেই মুখ থেকে বুনো জন্তুর

মতো গরগর শব্দ বেরিয়ে আসছে। শব্দগুলো একসাথে মিলেমিশে ঘোড়ার পায়ের ধুলো থেকে জমে ওঠা লাল আভাকে আরো বেশি ভয়ানক করে তুলছে।

পূর্ণ সশস্ত্র অবস্থায় সজ্জিত এসব হরপ্পান যোদ্ধাদের প্রত্যেকের কোমরেই তলোয়ার বাঁধা আছে। প্রচণ্ড ভারী এসব তলোয়ার মানুষের হাড় পর্যন্ত কেটে ফেলতে সক্ষম। সম্মুখ সারিতে থাকা প্রহরীরা চলতে চলতে তাদের বিশাল বর্শাগুলোকে মাথার উপর ক্রমাগত চক্রাকারে ঘোরাচ্ছে। দূর থেকে আসা একশো গন্ডারকেও অনায়াসে কুপোকাত করতে পারবে ওরা। তীরন্দাজ দলের তীরগুলো হরপ্পার সমর-বিজ্ঞানীদের তৈরি করা নীল বিষে ডুবিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই দলটা তৈরি হয়েছে একেবারে সেরা সব হরপ্পান সৈনিকদের নিয়ে, যাদেরকে রানি নিজ হাতে বাছাই করে নিয়েছিলেন। প্রচণ্ড শক্তিশালী এই বন্দিকে মৃৎ-কারাবাসে (অন্ধ মৃত্যুকূপ) পাঠানোর ক্ষেত্রে তিনি কোনো ফাঁকফোকর রাখতে নারাজ। এই শেষবার। একবার সেখানে পৌঁছানো গেলে সে আর কখনোই জীবিত ফিরে আসতে পারবে না।

কিন্তু প্রিয়ংবদা ঠিক একই রকমের পূর্বনির্ধারিত মোহের মাঝে ডুবে ছিলো, যা সবচেয়ে উচ্চাভিলাসী সব রাজাদের ভাগ্যে অভিশাপ নিয়ে এসেছে। যেখানে স্বয়ং ঈশ্বররাই সূর্যকে বন্দি হিসেবে ধরে রাখতে পারেননি, সে কীভাবে পারবে?

* * * * *

তার শরীর থেকে মাথাটা দ্রুতবেগে উড়ে গিয়ে লাল ধুলোর মাঝে অনেকখানি দূরে গিয়ে পড়লো। আচমকাই উদিত হয়েছিলো সেই তীর, একেবারেই অব্যর্থ তার লক্ষ্য। প্রায় সাথে সাথেই সম্মুখ সারির প্রহরীদের নেতার মাথাবিহীন দেহটা ঘুরে তার সঙ্গীর পাশে পড়ে গেল। কেটে যাওয়া ঘাড় থেকে ছোট ঝরনাধারার মতো করে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

মুহূর্তের মধ্যেই আরেকটা মাথা ছিটকে গেল, তারপর আরো একটা। আরো একটা। বিস্মিত আর ভীত সেনাদলটা সহসাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো। তাদের বড় বড় চোখ এদিক ওদিকে কেবল সেই অদৃশ্য আক্রমণকারীকে খুঁজছে। এক দক্ষ তীরন্দাজ এই সশস্ত্র দলের উপর আচমকা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেন মুরগির ঘরে ঢুকে পড়া কোনো শিকারি বিড়াল সে।

হরপ্পান সেনাদলের সবচেয়ে দক্ষ সেনা হওয়া সত্ত্বেও এসব ক্ষ্যাপাটে যোদ্ধাদের কেউই পূজারি পরিবারের একান্ত নিজস্ব হত্যাকারীর সামনে বিন্দুমাত্র সুবিধা করতে পারেনি।

পূজারি পরিবারে আশ্রিত, মানুষ সবচেয়ে কাছের বন্ধু। আর তার শ্রে সেনাপতি। সুন্দরী। অকুতোভয়।

তারা।

* * * * *

যেহেতু ওরা প্রত্যেকেই হরপ্পা শহরের মূল পানি উৎসে দুষ্ট জাদুকর গান, ম আর এপের মেশানো কালো বিষের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত, তাই শুধু একজ তীরন্দাজের হাতেই এই অশ্বারোহী বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়বে, এমনটা বলা চলে না। তীরন্দাজ ব্যক্তি যতই দক্ষ হোক না কেন, যদিও এবার তীরন্দাজ একজ নারী। যুদ্ধের পোশাক পরা একশত দক্ষ আর হিংস্র তীরন্দাজের দল জায়গাট বুঝে ফেললো, যেখান থেকে অজ্ঞাত আততায়ী তাদের উপর আক্রমণ করছে নিজেদের দলের শৃঙ্খলা ধরে রেখে দক্ষ দলটা ঘোড়ার স্ট্র্যাপে দাঁড়িয়ে সেদিকে টানা তীর ছুঁড়ছে। যেন আক্রমণকারীর উপর তীরের এক বন্যা বইয়ে দেবে। তারার সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিলো না। তাকে একটা বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিতেই হতো।

কিন্তু ততক্ষণে আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। মহান দেবতা বিভাষণ পূজারিকে উদ্ধারের ভয়ানক উদ্ধার অভিযান শুরু হলো এইমাত্র।

* * * * *

'যেমনটা আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম, আমাদের প্রথম কাজ হবে দেবতাকে মুক্ত করা,' মূল লড়াইয়ে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে নিজের বাকি থাকা মুষ্টিমেয় যোদ্ধাকে মনে করিয়ে দিলেন সোমদত্ত। 'একবার যদি তিনি মুক্ত হয়ে যান, ওরকম নৃশংস সেনাদের একজনও টিকে থাকতে পারবে না। দেবতা একাই তাদের সবাইকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারবেন।'

'কিন্তু প্রভু, আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন...দেবতাকে দেখে এখন খুবলে নেওয়া এক টুকরো মাংসপিণ্ডের চেয়ে বেশি কিছু মনে হচ্ছে না,' বিস্ময়ের সাথে বললো এক কমবয়সি সেনা।

কাঠের চাকার উপরে বিশাল মঞ্চে রাখা তামার খাঁচার ভেতরে দেবতাকে ওরা দেখতে পাচ্ছে। খাঁচার মেঝেতে নিষ্প্রাণ পড়ে আছেন দেবতা বিভাষণ পূজারি। প্রতিবার রাস্তার দুলুনির সাথে সাথে তার শরীর বারবার ওঠানামা করছে।

একসময়ের উজ্জ্বল শরীরে কোনো চামড়াই আর নেই। তার কারাগারের কাঠের দেয়ালে রক্তের দাগ লেগে আছে। যেন নিছকই কাঁচা মাংসের একটা পিণ্ড।

'ভরসা রাখো, বন্ধুরা। আমি মহান বিভাষণ পূজারিকে এর চেয়েও বাজে পরিস্থিতিতে পড়তে দেখেছি,' জবাব দিলেন সোমদত্ত। 'যদিও আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, তার বর্তমান অবস্থা হয়তো মানুষের সহ্যক্ষমতা কিংবা কল্পনার বাইরে, কিন্তু তার অসীম ক্ষমতার উপরেই আমি আমার বিশ্বাস রাখছি। তিনি নিজে না চাইলে তাকে কখনোই হারানো সম্ভব না। তাকে কখনোই হত্যা করা সম্ভব না, যদি তিনি নিজে তেমন সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকেন। তিনি কখনোই হারতে পারেন না, যদি-না তার পছন্দের প্রতিপক্ষ এই কাজ না করে।'

তার অনুসারীরা কেবল শুনে যাচ্ছে। তিনি জানতেন তার হাতে খুব বেশি খুব একটা সময় নেই। তাদের প্রতিশ্রুত এই অভিযান শেষ করতে হাতে খুব কম সময় আছে–আর সোমদত্ত এ নিয়েও সতর্ক ছিলেন।

'হরপ্পার সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধারা, আমি তোমাদের কাছ থেকে যা চাই তা হলো, তোমরা দেবতাকে আটকে রাখা এই বিশাল খাঁচাটা খোলার ব্যবস্থা করবে। তাকে আটকে রাখা শিকল ভেঙে দেবে। তাতেই দেবতা জেগে উঠবেন। আমাদের সবাইকে স্বাধীন করবেন। সেই সাথে সমগ্র হরপ্পাকে।'

* * * * *

হরপ্পান সৈন্যরা এখন বিভাষণ পূজারিকে বহন করা কাঠের গাড়ি ঘিরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। নিজেদের কৌশলগত অবস্থান থেকে এসে যুক্ত হয়েছে তারার সেনাদলও। আর সবাই মিলে হরপ্পান সেনাদের উপর রীতিমতো ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে শুরু করেছে। তারার প্রাথমিক আক্রমণের মুহূর্তের মাঝেই প্রায় চব্বিশজন বিভ্রান্ত অশ্বারোহী সেনার মাথা কাটা পড়েছে কিংবা তীরের নির্মম আঘাতে বুক চিরে গেছে। তাদের চাপা ক্ষোভ বাড়ছে। যদিও তাদের কার্যকারিতা ধীরে ধীরে কমে আসতে শুরু করেছে।

নিজেদের দিক আর সব রকমের লক্ষ্য হারিয়ে, সেই সাথে অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণ আর চারপাশের মানুষ-ঘোড়ার উষ্ণ রক্তের মাঝে এসব সেনারা তখন নিজেদের মাঝেই আছড়ে পড়তে শুরু করেছে। ঘোড়সওয়ারদের একজন টাল সামলাতে না পেরে আরেক ঘোড়ার স্ট্র্যাপে নিজের পা আটকিয়ে ফেললো। এমনভাবে ছিটকে গেল, যেন গুলতি থেকে ছোঁড়া পাথর। পর মুহূর্তেই সে চাপা পড়লো পেছনের আরোহীর মাংস আর হাড়ের নিচে। অন্য একজন নিজের

ভেতরের মানসিক স্থিরতার সবটা হারিয়ে একেবারেই কাছাকাছি চলে আসা নিজের দলের আরেক সৈন্যের ঘাড়ে বর্শা ঢুকিয়ে দিলো। দক্ষ তীরন্দাজ দলটা তাদের মূল লক্ষ্যে সফল। হরপ্পান সেনাদলের মধ্যে ভয় আর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

আর যে সেনাবাহিনীকে অজেয় বলে ভাবা হচ্ছিলো, তারা এখন পালাবার চেষ্টা করছে।

* * * * *

যুদ্ধে এটাই তাদের মোক্ষম সুযোগ বুঝতে পেরে সোমদত্তের দলের পনেরোজন যোদ্ধা হরপ্পান সেনাদের মাঝে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে, অনেকটা একপাল ভেড়ার মাঝে কিছু নেকড়ের মতো করে। তলোয়ার ঘুরছে, কাটছে আর স্বেচ্ছায় মাথা কাটা পড়ছে। সোমদত্তের কমবয়সি যোদ্ধারা খাঁচার দিকে যেতে যেতে ক্রমাগত যুদ্ধ করছে। সেই খাঁচা যেখানে তাদের প্রাণপ্রিয় দেবতাকে আটকে রাখা হয়েছে।

তারার তীরন্দাজরা এবার নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে ভেজা লাল মাটির যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সঙ্গীদের সাহায্য করতে এগিয়ে গেল।

কিন্তু কাজটা অতটাও সহজ ছিলো না। এই সাহসী এবং অনেকটা একপাক্ষিক উদ্ধার অভিযানের মাঝেই জ্যেষ্ঠ এক হরপ্পান কমান্ডার নিজের সেনাদের ফিরে আসার ডাক দিলো। বিশালাকায় মানুষটার মুখে লাল-কালো রং, উজ্জ্বল দুই চোখে একই সাথে ফুটে উঠেছে তার ক্ষ্যাপাটে আর ক্রুদ্ধ মনোভাব।

'পালটা আক্রমণ...!' নিজের বিশৃঙ্খল সেনাদের দিকে তাকিয়ে কর্কশ আর ভয়াবহ এক চিৎকার দিলো সে। হাতলটা ধরে তার বিশাল বর্শাটা ক্রমাগত ঘোরাচ্ছে। কোনো আক্রমণকারীর পক্ষেই এখন তার দিকে আসার সুযোগ নেই, এমনকি দূর থেকেও না। 'পালটা আক্রমণ করো! কাপুরুষের দল!' সে তখন এগিয়ে যাচ্ছে চাকাওয়ালা খাঁচার দিকে। তার কিছু সাহসী সেনা এবার ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো। নতুন করে খুনে নেশায় দলনেতার নির্দেশ মান্য করতে এগিয়ে গেল তারা।

এই মুহূর্তে এ এক উন্মুক্ত যুদ্ধ।

* * * * *

দূর থেকেই সোমদত্ত এই ভয়ানক আর উন্মুক্ত আদেশ শুনতে পেলেন। তার নিজের দুই কমবয়সি সেনা এখন খাঁচার খুব কাছাকাছি চলে গেছে, দেবতাকে মুক্ত করার জন্য আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত বাকি। কিন্তু সেই দানবীয় হরপ্পান সেনাপতি এখন যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝবরাবর এগিয়ে যাচ্ছে। সোমদত্ত জানেন তার

সাহসী যোদ্ধারা এই অভিজ্ঞ যোদ্ধা এবং তার দক্ষ সেনাদলের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারবে না। তিনি নিজেও এতটা দূরে যে ওখানে যোগ দেওয়া সম্ভব না। নিজের সেরা অস্ত্রের উপর এবার বাজি ধরলেন তিনি।

'তারাআআআআআ.....!' চিৎকার করলেন সোমদত্ত।

ঘোড়ার উপরের আসন থেকে পিছু হটে একটা বর্শাকে ফাঁকি দিলো তারা, ঠিক ঐ একই সময়ে বাম হাতে থাকা ছুরি দিয়ে এক আক্রমণকারীর পেটে ঢুকিয়ে দিলো। তার ডান হাতে যুদ্ধের কুড়াল। তারা সব্যসাচী, দুই হাত দিয়েই সমানভাবে যুদ্ধ করতে পারদর্শী। ঐ সময়টায় তার মনে হচ্ছিলো একটা লাল মেঘ যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে এসেছে। এমন একটা সময়ের মাঝেও সে সোমদত্তের দিকে তাকিয়ে তার নজর অনুসরণ করলো। তারা সাথে সাথেই বুঝতে পারলো, হরপ্পান প্রধান স্থপতি কোন দিকে তাকানোর কথা বলছেন। এই দানবীয় কমান্ডার আর তার দলকে থামানো দরকার।

ক্ষ্যাপাটে সেই কমান্ডারকে আটকাতে সবচেয়ে ছোট পথটাই বেছে নিয়েছে তারা। এমনকি যদিও এর জন্য তাকে শত্রুপক্ষ আর রক্তের বাধা পার করতে হয়েছে। একজন দক্ষ অশ্বারোহী আর স্বয়ং বিভাষণ পূজারির ছাত্রী হিসেবে স্বর্ণ তারা ছিলো রীতিমতো যুদ্ধের এক জাদুকর। পানিতে যেমন হাঙর নিজের পথ করে নেয়, অনেকটা সেভাবেই শত্রুর মাঝ দিয়ে নিজের পথ বের করে নিয়েছিলো সে।

'ইইইয়্যাআআআআআহহ...' ঘোড়ার জিনে প্রথমবার উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চিৎকার করলো তারা, আর তার পরেই বিশালদেহী হরপ্পান সেনাপতিকে ধাক্কা দিলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য তারার মনে হলো সে বাতাসে উড়ছে। তার লম্বা কুঠার শিকারের গলা বরাবর ঢুকে যেতে প্রস্তুত, তার সুন্দর, রক্তে ভেজা চুল যেন বাঁকানো শরীরের পেছনে ঢেউ খেলছে।

কিন্তু এই শত্রুপক্ষ তাদের বাকিদের চেয়ে শক্তিশালী আর অনেক বেশি দক্ষ। বিশাল সেনাপতি ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে তার পেশিবহুল পা দিয়ে তারার পাঁজরের উপর প্রচণ্ড জোরে লাথি দিলো। শূন্যে ভেসে গেল তারা, আছড়ে পড়লো মাটিতে। হতভম্ব তারার এখন শ্বাস নেওয়ার মতো অবস্থাও নেই।

মুখে যোদ্ধাদের লাল-কালো রং করা এই দানবাকৃতির মানুষটা এখন রীতিমতো রাগে কাঁপছে। বাতাসে ভাসতে থাকা রক্তের গন্ধ, চারপাশে ক্ষতবিক্ষত সৈনিকদের আর্তচিৎকার আর মৃত মানুষ–সবকিছু তাকে আরো বেশি উন্মত্ত করে তুলছে, সেই সাথে আরো বেশি পাশবিক হয়ে উঠেছে সে। শিরস্ত্রাণটা খুলে ফেলেছে সে, খুলে ফেলেছে শরীরের বর্মটাও, যেন নিজের বিশাল পেশিবহুল শরীর দেখাতে চাইছে। আক্ষরিক অর্থেই সে ছিলো যমদূত।

নির্মমভাবে নিজের মুখে থাবা বসালো সে, গবলিনের মতো গর্জন করে শিকল আর কাঁটাযুক্ত গোলক বসানো এক গদা তুলে নিলো। তারার মাথা গুঁড়িয়ে দিতে নৃশংসভাবে ঘোরালো ওটা।

আঘাত থেকে বাঁচতে লাল মাটিতেই গড়িয়ে সরে গেল তারা। কাঁটা-বসানো ঐ গোলকটা তার মাথা থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে গিয়ে পড়েছে। রক্তে ভেজা মাটিতে কাটাগুলো গেঁথে গেছে। ওটাকে আবার উঠিয়ে আনতে কিছুটা সময় লাগলো তার। আর এটাই তারার মতো বাঘিনীর পালটা আক্রমণ করার জন্য যথেষ্ট ছিলো। মুখের উপর হাত ঘুরিয়ে চুলের ভেতর থেকে উজ্জ্বল দুটো সুঁই বের করে আনলো সে। খুনে এই সুঁই দুটো আগেই বিষে ডোবানো হয়েছিলো। দানবকৃতির মানুষটার দিকে এগিয়ে গেল সে, তবে তার আগেই লোকটার শক্তিশালী বাহু বেরিয়ে এসে তারার গলা চেপে ধরেছে। তার বাহু বেশ লম্বা আর শক্ত তামার বর্মে ঢাকা। তারা প্রচণ্ড চেষ্টা আর ছটফট করেও কোনোভাবেই তার শরীরের কোনো মাংসের নাগাল পাচ্ছে না। তার মুঠি ক্রমশ আরো শক্ত হচ্ছে আর তারা টের পাচ্ছে, তার জীবন ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সে যখন এসব ভাবছে, তখনই এমন কিছু ঘটলো যা সে কল্পনাও করেনি।

* * * * *

কোনো এক প্রবল যন্ত্রণায় দানবটার মুখ হাঁ হয়ে গেল, যেন দমবন্ধ হয়ে আসায় মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে চাইছে। প্রচণ্ড অবিশ্বাসের সাথে তারা দেখতে পেল, রক্তাক্ত একটা মানুষের থাবা আর তারপর আস্ত একটা মানুষের বাহু বিশালাকার সেনাপতির নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে তার চোখের সামনে বেরিয়ে আসছে। কেউ একজন কেবল নিজের খালি হাতে এই পাগলাটে দানবের শরীরে থাবা বসিয়ে পুরোটা বের করে এনেছে। বলা চলে, একেবারেই ছিঁড়ে ফেলেছে।

ধীরে ধীরে আলগা হয়ে আসছে তারার গলায় চেপে বসা দানবটার মুঠি। খুব আবছাভাবে তারা দেখতে পাচ্ছে কে এই বিভৎস খুন করেছে। তার পুরো হাতের অর্ধেকটাই এখন পর্যন্ত মৃত হরপ্পান সেনাপতির নাড়িভুঁড়ির ভেতরে। তারা বা যুদ্ধক্ষেত্রে বাকি যারা ছিলো তাদের চোখে এটাই সবচেয়ে নারকীয় হত্যাকাণ্ড।

পুরোপুরি রক্তে ভেজা একজন মানুষ, এতই শুকনো যে চেনা মুশকিল। উত্তাপে গলে গেছে তার এক চোখ, আর অন্য চোখটা অনেকটা আদিম ব্রহ্ম-রাক্ষসের মতো জ্বলজ্বল করছে। সে যে আসলে কে ছিলো তা চিনতেই তারার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো।

চাকাযুক্ত খাঁচাটার দিকে নজর গেল তার।

ওটার মোটা দরজাটা প্রচণ্ডভাবে বাঁকানো, অনেকখানি খোলা। বিশালাকার তালাটা অসংখ্য টুকরায় ভেঙে পড়ে আছে।

বিভাষণ পূজারি আর দেবতা নয়। এমনকি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত অন্ধকার রাক্ষসের চেয়েও ভয়ানক আর পৈশাচিক হয়ে উঠেছেন তিনি।

সেনাপতির এমন বিদঘুটে অবস্থা দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকলেও নৃশংসভাবে মৃত সেই লোকের এক অনুসারী ধারালো চাপাতি নিয়ে তেড়ে গেল বিভাষণ পূজারির দিকে। নিজের অসাধারণ যুদ্ধবিদ্যার কল্যাণে খুব সহজেই বিভাষণ এড়িয়ে গেলেন সেটা। আক্রমণকারীর হাত চেপে ধরে নিজের কনুই দিয়ে মুখ বরাবর প্রচণ্ড জোরে এক আঘাত করলেন। মুহূর্তেই মুখের হাড় গুঁড়িয়ে গেল তার। মাটিতে পড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে সেই হরপ্পান সৈনিক। কিন্তু তাকে এখনো পুরোপুরি বধ করা হয়নি। খুব ধীরে ধীরে বিভাষণ পূজারি তার হাঁটু দিয়ে সৈনিকের পিঠে চাপ দিতে শুরু করেছেন। এরপর তার চাপাতি নিয়ে দক্ষ চিকিৎসকের মতো করে কপালের একপাশ থেকে অন্য পাশ কেটে ফেললেন। চাপা পড়া সৈনিকটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। গভীর ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে আসা রক্তের কারণে তার ভ্রু এখন পুরোপুরি ভেজা। আর এরপরেই সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে বিভাষণ পূজারি সৈনিকের চুল ধরে কাঁধ থেকে পুরো মাথা টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ভুগে মারা যাওয়ার আগে শরীরটা কুঁকড়ে গেছে তার। তার এই কুঁকড়ে যাওয়া কোনো রোগের কারণে না, বরং যে অসহ্য ব্যথা সে ভোগ করছিলো তারই ফল।

মুহূর্তেই মধ্যেই তারা বুঝতে পারলো, এইমাত্র সবাই মিলে যা করেছে সেটার জন্য তার অনুশোচনা হচ্ছে। দ্রুত একবার সোমদত্তের দিকে তাকালো সে। আর মনে হলো, দুজনেই ঠিক একই কথা ভাবছে।

যার কখনোই মুক্ত হওয়ার কথা ছিলো না, সে-ই মুক্ত হয়েছে।

হরপ্পার সূর্য চিরতরে ডুবে গেল।

বানারস ২০১৭

মৃত্যুঞ্জয়

রাতের বানারস শহরের ভিড়-লাগা রাস্তায় প্রবল গতিতে বিপজ্জনকভাবে ছুটে যাচ্ছে দেব-রাক্ষস মঠের সাদা মাহিন্দ্রা এসইউভি। মঠের প্রধান সমরবিদ বলভান্ত নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে, সময় খুব দ্রুতই পার হয়ে যাচ্ছে।

রাতের এই সময়ে এসেও লেন আর রাস্তার ধারের দোকানগুলো পুরোদমে ব্যস্ত। ভিড় এতই বেশি, একটা সাইকেলও এর মাঝে স্বচ্ছন্দে জায়গা করে নিতে পারবে না। এটাই চিরায়ত বানারস, অলস ভঙ্গিতে যার চলাচল। তবে এই শহর আর তার মানুষেরা এই অ্যাম্বুলেন্সে রূপ নেওয়া জিপের জন্য জায়গা করে দিতে কোনো সমস্যাই অনুভব করছে না। কেউই জানতো না, এই দুলতে থাকা প্রচণ্ড গতির গাড়ির ভেতরে কে আছে, তবে ভাব দেখে মনে হলো সবাই সেটা জানে।

গাড়ির ভেতরে আছে বিদ্যুৎ।

* * * * *

দুশ্চিন্তায় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকা ন্যায়নার কোলে তার মাথা। খানিক পরপরই কাশছে বিদ্যুৎ, আর সেই কাশির সাথে বেরিয়ে আসছে রক্ত। দুইটা বুলেট আর বুকের মাংস চিরে ফেলা গভীর ক্ষত, সেই সাথে ঘণ্টা ধরে চলা তীব্র লড়াই–সব মিলিয়ে আঘাতগুলো এই কিংবদন্তিতুল্য মানুষের জন্যেও মারাত্মক হুমকি।

বিদ্যুৎ; ভবিষ্যদ্বাণী করে যাওয়া সেই রক্ষক, সবশেষ দেবতা...ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে।

* * * * *

'আরো দ্রুত চালাও!' বিদ্যুতের শ্বাসপ্রশ্বাস অনিয়মিত হয়ে পড়ছে দেখেই পেছন থেকে চিৎকার করলো ন্যায়না। ঘাটে তাকে খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত মঠের কেউই এই ব্যাপারে জানতো না যে বিদ্যুৎ আততায়ী রুমির বুলেটে আহত হয়েছে। মঠের চিকিৎসক গোবর্ধন, সনুসহ মঠের অন্যান্য যোদ্ধাদের দিকে সময় দেওয়ার জন্যে পেছনে রয়ে গেছিলো। আর এটাই ছিলো বড় এক ভুল। বিদ্যুৎ এখন প্রতিবার শ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁসফাঁস করছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বেঁচে থাকার জন্য রীতিমতো লড়াই করতে হচ্ছে তাকে। নিজের হাতে সাবধানতার সাথে বিদ্যুতের মাথাটা ধরে রেখেছে ন্যায়না। ভেজা চোখ আর নারীর ভালোবাসার প্রবল অনুভূতি নিয়ে বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। ন্যায়না তাকে আরো একবার হারাতে পারবে না।

'আমরা তাকে বাঁচাতে পারবো না,' বলভান্ত আর ন্যায়নার সাথে জিপে থাকা মঠের আরেক যোদ্ধা বিড়বিড় করে বললো কথাটা।

'না। আমরা সেটা হতে দেবো না!' ব্যাকুল আর রাগান্বিত ন্যায়না প্রচণ্ড জোরে ফিরিয়ে দিলো কথাটাকে। 'ও বিদ্যুৎ! তোমার কি সেটা মনে নেই? সে মরতে পারে না!'

গাড়ির ভেতরে থাকা সবাই জানে, ন্যায়না যা বলছে তা ভুল। বিদ্যুৎ তার শেষ নিঃশ্বাসটুকু নিচ্ছে এখন। দ্রুত মোবাইল বের করে দেব-রাক্ষস মঠের দৈব চিকিৎসক গোবর্ধনকে ফোন করলো ন্যায়না।

'গোবর্ধন দাদা, মঠ থেকে আমরা এখনো কয়েক মিনিট দূরে আছি। কিন্তু বিদ্যুতের মনে হয় না ততটা সময় আছে। সে মারা যাচ্ছে, দাদা...সে দ্রুতই মারা যাবে!' ন্যায়না এখন ক্রমাগত কান্না করছে, তবুও কোনোভাবে কথাগুলো বলা শেষ করলো।

'ওকে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে, ন্যায়না। শান্ত থাকো আর তাকে যত দ্রুত পারো এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করো,' শান্ত কিন্তু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে উত্তর দিলো গোবর্ধন। সে জানতো পরিস্থিতি এখন কেমন।

'কিন্তু ততক্ষণ সে বাঁচবে না, দাদা!' ফোনের ওপাশ থেকে চিৎকার করলো ন্যায়না। প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় তার এখন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

গোবর্ধন তখনো শান্ত রইলো। 'তার অবস্থা এখন কেমন, সেটা আমাকে বলো, ন্যায়না।'

বলভান্ত একবার পেছনে ন্যায়নার দিকে তাকালো, জিপটা এখন মানুষের ভিড়ের মাঝে কিছুটা ধীর গতিতে এগোচ্ছে।

'ন্যায়না, তুমি ওকে যতখানি ভালোবাসো, আমরা সবাই ঠিক তেমনটাই ভালোবাসি। আমরা প্রত্যেকেই জানি, বিদ্যুৎই সেই প্রতিশ্রুত রক্ষক। সেটা কেবল মঠের জন্য না কিংবা শুধু বানারসের জন্য না...বরং পুরো মানব জাতির জন্য।'

ন্যায়না শুনেই যাচ্ছিলো। *আমার মতো করে বিদ্যুৎকে আর কেউ ভালোবাসতে পারে না।*

বলভান্ত তখনো বলে যাচ্ছে, 'গোবর্ধন কী বলছে সেটা কেবল শুনে যাও, আর নিজের সবটা দিয়ে চেষ্টা করে যাও।'

সুন্দরী আর সাহসী ন্যায়না মাথা নাড়লো। সে জানতো তার আশা হারানো যাবে না। অন্তত এই সময়ে না।

গোবর্ধন আবারো করলো প্রশ্নটা, 'তার এখন অবস্থা কী, ন্যায়না?'

ন্যায়না চোখ মুছে ভালোভাবে বিদ্যুতের দিকে নজর দিলো।

'দাদা, ও বাতাসের জন্য মুখ হাঁ করে আছে। পুরো শরীর প্রচণ্ড জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।'

'ওর কপালে পানি দিতে থাকো,' পালটা জবাব দিলো গোবর্ধন। 'আমি তোমাকে যেভাবে বলেছিলাম, ঠিক সেভাবেই ওকে ট্রানেক্সামিক এসিডের আরেকটা ইনজেকশন দাও। কোনোভাবেই যেন সে পুরোপুরি অজ্ঞান না হয়ে পড়ে। ওর সাথে কথা বলো, যা কিছু হোক। আর কী?'

'ওর ঠোঁট শুকনো আর সে...'

এক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো।

'হ্যাঁ ন্যায়না, কী? বলো...' তাগাদা দিলো গোবর্ধন।

'ও...ও কিছু একটা বিড়বিড় করছে, গোবর্ধন দাদা,' কয়েকটা উদ্বিগ্ন মুহূর্তের পর উত্তর দিলো ন্যায়না।

'বিড়বিড় করে কী বলছে? সে কী বলছে সেটা তোমাকে অবশ্যই শুনতে হবে!'

ন্যায়না ঝুঁকে গিয়ে কাঁপতে থাকা বিদ্যুতের ঠোঁটের কাছে নিজের কান রাখলো। সে ঠিক বুঝতে পারছে না ও কী বলছে।

'আমি...আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' কিছুটা জোর দিয়ে বললো মেয়েটা। নিশ্চিত হতে চাইলো গোবর্ধন আর জিপে থাকা অন্য সবাই যেন কথাটা শুনতে পায়।

'সে কী বলছে, ন্যায়না?' জানতে চাইলো বলভান্ত। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে এখন ভয় পাচ্ছে। ওরা বর্তমানে মঠ থেকে পাঁচ মিনিট দূরে আছে। কিন্তু এই রাস্তাটাই এখন অনন্ত মনে হচ্ছে।

ন্যায়না ঝুঁকে গিয়ে কানটা পাতলো। শেষ পর্যন্ত বিদ্যুতের বিড়বিড় করতে থাকা কয়েকটা শব্দ সে বুঝতে পারলো।

'ত্রায়ামবাকাম...পুশতিবর্ধানাম...মামরিতাত...'

কয়েক সেকেন্ড দ্বিধায় থাকার পর সে বলভান্তের দিকে তাকালো। তার সারা মুখে বিস্ময়ের ছাপ। এমন বড় ধরনের শারীরিক অসুস্থতা আর আধচেতন অবস্থায় কীভাবে কারো পক্ষে এমন করা সম্ভব?

'ন্যায়না আমাদেরকে ওটা বলতেই হবে...বিদ্যুৎ এখন কী বিড়বিড় করছে?' তাগাদা দিলো গোবর্ধন।

কিন্তু ন্যায়নার উত্তর দিতে এক কি দুই সেকেন্ড সময় লাগলো।

'দাদা...' অবশেষে বললো ন্যায়না।

বলভান্ত, ফোনের ওপাশে থাকা গোবর্ধন আর মঠের বাকি যোদ্ধারা প্রত্যেকেই গভীর মনোযোগের সাথে কথাগুলো শুনছিলো।

'গোবর্ধন দাদা...কথাটা তোমার বিশ্বাস হবে না,' ন্যায়না বলে গেল। 'বিদ্যুৎ একনাগাড়ে সর্বশক্তিমান মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে।'

কথা শুনে ওরা সবাই জমে গেল। একজন মানুষ কীভাবে নিজের মৃত্যুশয্যায় অচেতন হওয়ার আগ মুহূর্তে এমন শক্তিশালী কিছু পড়ার ক্ষমতা রাখে?

বিশ্বাস করা হয় যে মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র মৃত্যুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরী মন্ত্র। এই মন্ত্র ইয়ামা বা মৃত্যুর দেবতার বিরুদ্ধে সর্বশক্তিমান শিবের উচ্চারিত মন্ত্র ছিলো।

মৃত্যুর একেবারে আগ মুহূর্তেও দেবতা তার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন এই শহরের সরু রাস্তায় দাঁড়িয়ে, এই পৃথিবী আর তার পরের জগতের সন্ধিক্ষণে এসে বিদ্যুৎ স্বয়ং কাশীর দেবতাকে ডেকে যাচ্ছে। সে শিবকে সাহায্যের আহ্বান জানাচ্ছে।

বিদ্যুৎ না মরার সংকল্প নিয়েছে।

অন্তত আজকের দিনে।

'এইসব পানির ফোঁটার জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী'

শকুন সব সময়ই তার শিকারের চারপাশে চক্কর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওরা আগে থেকেই বুঝতে পারে, সামনে দারুণ একটা খাবার অপেক্ষা করছে।

প্রায় আটাশ ঘণ্টা ধরে কোনো প্রকার খাবার ছাড়া আর অল্প কিছুটা পানি নিয়ে ভয়াবহ জখম হওয়া তরুণটি তার ঘোড়ায় চড়ছে। তার গভীর ক্ষতগুলোতে পুঁজ জমা হতে শুরু করেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে সে একবারেই মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে চলে গেছে। তার মুখ শুকনো আর ঠোঁট শুকিয়ে ফেটে যাওয়ার উপক্রম। তার এতক্ষণ বেঁচে থাকারই কথা না।

কিন্তু কিছু একটা এখনো তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

মানু তার মৃত মায়ের শেষকৃত্য সম্পাদন না করে মরতে রাজি না। এতটা সময় ধারে তাকে নিজের কোলে ধরে রেখেছে সে। নিজের প্রাণপ্রিয় মায়ের কাছে এটা মানুর দায় হিসেবে রয়ে গেছে। সানজানার কাছে মানুর এটা ঋণ হয়ে থাকবে।

* * * * *

পূর্ব দিকে যেও...কালো মন্দিরের খোঁজ কোরো...

নিজের বাবার বিশ্বস্ত বন্ধু সোমদত্তের মুখ থেকে সবশেষে এই কথাগুলো শুনেছিলো মানু। এরপর থেকেই পূর্ব দিকে এগিয়েছে সে। সারা দিন, সারা রাত। কিন্তু কোনো গ্রাম বা কুঁড়েঘরে থামার মতো ঝুঁকি নেয়নি। সে কারো সাহায্য করা কিংবা দিক বলে দেওয়ার জন্য বলতে পারতো না। জানা হরপ্পার নতুন রানি প্রিয়ংবদা তার জন্য বড় আকারের পরোয়ানা জারি পারে।

কিন্তু এখন এই ছুটে চলা হতাশায় রূপ নিচ্ছে। মানু জানতো, সে কিংবা তার বাহন এই জন্তুটা, কেউই এতখানি ক্লান্তি নিয়ে আর চলতে পারবে না। তার মায়ের সুন্দর দেহটা নিজের মরণশীল আর স্বাভাবিক দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ করছে। 'পূর্ব দিকে যাও...' খুবই অস্পষ্ট এক আদেশ। যদিও মানু জানতো জ্ঞানী সোমদত্ত কোনো প্রকার উদ্দেশ্য ছাড়া তাকে এমন একটা পরামর্শ দেবেন না। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই উপদেশের কোনো সুফল তার সামনে আসেনি। না কোনো কালো মন্দির, না সাহায্য, না কোনো প্রকার আশা।

মানু এখন রক্ত আর ধুলোয় মাখা হতাশার এক জ্বলজ্যান্ত নিদর্শন। চামড়ার ফ্লাস্কটা বের করে আনলো সে। শেষ কয়েক ফোঁটা পানি তাতে বাকি আছে, ওটা দিয়ে কেবল ঠোঁটটাই শেষবারের মতো ভেজানো সম্ভব। তার আশা, এই কয়েক বিন্দু পানি তাকে আরো কয়েক ঘণ্টা টিকিয়ে রাখবে।

শকুনদের আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে।

* * * * *

যত দূর চোখ যায় পুরোটাই শুকনো, অনুর্বর ভূমি। আশপাশের কয়েক মাইলের মাঝে মানুই একমাত্র মানুষ। সমতল ভূমির উপর দিয়ে একটানা বয়ে যাচ্ছে উষ্ণ আর ধুলোময় বাতাস। মানু তার আঙুলের মাথা ভিজিয়ে আলতোভাবে সেটা তার মায়ের চোখ, ঠোঁট আর কপালে ঘষে দিলো। ঠিক তেমন ভালোবাসা দিয়ে, যেমনটা একজন মা তার নবজাতক শিশুর জন্য প্রকাশ করে। একেবারেই শেষ হয়ে আসা পানপাত্রটা সে যখনই নিজের তৃষ্ণার্ত মুখে পুরোপুরি ঢেলে দিতে যাবে, তখনই দিগন্তে কিছু একটা খেয়াল করলো মানু। দেখতে অনেকটা ছোট এক ধূসর বিন্দুর মতো, কিন্তু মানুর মনে হলো সে একটা মানুষের অবয়ব দেখতে পাচ্ছে। এই শুকনো জমিতে নিস্প্রাণ শুয়ে আছে।

ক্লান্ত ঘোড়াকে ধাক্কা দিয়ে অনেক দূরের ঐ আপাতদৃষ্টিতে প্রাণহীন শরীরের দিকে এগিয়ে গেল যুবক সাধক-যোদ্ধা। একদিন আগেই হরপ্পা শহরের শেষ প্রান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে সে তার মাকে হারিয়েছে। সে আর কাউকেই মরতে দিতে রাজি না।

মানু নিশ্চিত ছিলো, পচন-ধরা ক্ষত আর পানিশূন্যতার কারণে তার এই মুহূর্তে দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে। অবয়বটার কাছাকাছি যেতেই নিজের চোখ ডললো সে। এখন যা দেখতে পাচ্ছে তা মানুষ কম আর মাছের বড় আকারের আঁশের মতো

লাগছে। বিগত ত্রিশ ঘণ্টা ধরে চলমান এই ভয়ানক যাত্রাপথের যতখানিই মানুর নজরে এসেছে, আশেপাশে কোথাও কোনো জলাশয় দেখতে পায়নি। এরকম বড় একটা মাছ কীভাবে এত দূরের ভূমিতে চলে এলো?

কিন্তু মাছটার কারো কাছাকাছি যেতেই মানু চমকে উঠলো। এটা আসলে একজন মানুষ, অচেতন পড়ে আছে। গায়ে এক অদ্ভুত জামা, যার কারণে তাকে মাছের মতো মনে হয়। তার পুরো শরীর মাছের শুকনো আঁশে তৈরি একটা চাদরে মোড়ানো। পরনের অপরিচিত সব গহনা মাছের কাঁটা আর শামুকের খোলসে বানানো। আর শুধু পোশাক বা অলংকার না, বেশ খানিকটা দূর থেকেই তার শরীর হতে ভেসে আসা সাগরের গন্ধ পাওয়া যায়।

* * * * *

মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এই মৎস্য-মানব, দেখতে প্রাণহীন। মানু খেয়াল করেছে তার শরীরে একটা নীলচে ভাব আছে। এর অর্থ তাকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে। অথবা সে অনেক আগেই মারা গেছে।

মানুর প্রাথমিক তাগাদা ছিলো নিজের যাত্রা চালিয়ে যাওয়া। তার দুশ্চিন্তা করার মতো যথেষ্ট রসদ এরই মাঝে আছে। সে অনেক কষ্টে একটা মূল্যবান দেহ বহন করছে, যার সৎকার করা দরকার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটা দেহ হিসেবে হয়তো সে নিজেও হয়তো এই তালিকায় যোগ দেবে। তৃতীয় আরেকটা দেহ বহনের ঝামেলা সে নিতে পারবে না।

কিন্তু তবুও সে মানু। মহান বিভাষণ পূজারির সন্তান। মানুষ কিংবা লাশ, সে কাউকে অবজ্ঞাভরে পেছনে ফেলে রেখে যেতে পারে না।

যখনই মানু নিজের ভেতরে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবছে, তখনই মাছের মতো চাদর গায়ে দেওয়া মানুষটা নড়ে উঠলো। সে জীবিত! নিজের মাকে খুব যত্ন নিয়ে ঘোড়ার পিঠে রেখে সাথে সাথেই নিচে নেমে এলো মানু। নিচু হয়ে ধীরে ধীরে মানুষটাকে উলটে দিলো। অবচেতন মানুষটার রোদেপোড়া, ধুলোমাখা চেহারার দিকে প্রথম নজর দেওয়ার পর চোখ ফেরাতে পারেনি মানু। এমনকি মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেও সে ছিলো মানুর দেখা সবচেয়ে অনিন্দ্য সুদর্শন মুখ। এই মানুষটার মধ্যে এমন অসাধারণ কিছু আছে যা মানু আর কারো সাথে তুলনা করতে পারবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বুঝতে পারলো তার গভীর ক্ষতগুলোয় ব্যথা কিছুটা যেন কমে আসছে। তার ভেতরে একটা নির্মল প্রশান্তি

কাজ করছে। খুব পরিচিত একটা শান্তির ভাব অনুভব করলো সে, যা সপ্তর্ষির পা স্পর্শ করে টের পেয়েছিলো। তবে এবার অনুভূতিটা আরো বেশি প্রবল। আরো বেশি পবিত্র।

মানু তখনো ঘোরের মধ্যেই ছিলো, তবে সে এটুকু বুঝতে পারছিলো, তাকে খুব দ্রুতই কিছু একটা করতে হবে যাতে সে মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এই মৎস্য-মানবের নীলচে শরীরে কোনো প্রকার আঘাতের চিহ্ন নেই। বোঝাই যাচ্ছে সে পানিশূন্যতায় ভুগছে। মানু তার পানপাত্রের অল্প কয়েক ফোঁটা পানি নিয়ে চাদরের একটা কোনা ভেজালো। এরপর সেই ভেজা কাপড় চেপে ধরলো মানুষটার শুকনো ঠোঁটে।

'পানি...' খানিক চেতনা ফিরে পেতেই বিড়বিড় করে কথাটা বললো মৎস্য-মানব।

'দয়া করো...পানি...!' মানু উত্তর দেওয়ার আগেই আবার বললো সে।

মানুকে এখন যেকোনো একটা পথ বেছে নিতে হবে। হয় সে নিজে পানপাত্রে বাকি থাকা শেষ কয়েক বিন্দু পানি পান করবে, আর আগামী কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকবে। আশা করা যায়, এর মাঝে সে অধরা কালো মন্দিরের খোঁজও পেয়ে যাবে। অথবা সে এই মৃতপ্রায় মানুষটাকে সেই পানি দিয়ে বাঁচিয়ে তুলবে। তবে এর মানে হলো নিজের জন্য সাক্ষাৎ মৃত্যু ডেকে আনা।

এক মুহূর্ত না ভেবে সানজানা আর বিভাষণ পূজারির ছেলে মানুষটার মাথা তুলে ধরে শেষ কয়েক ফোঁটা পানি এই মৎস্য-মানবের মুখে তুলে দিলো।

* * * * *

সানজানার কপাল স্পর্শ করে আদুরে বাবার মতো টোকা দিলো নীলচে মানুষটা।

মানু হতভম্ব হয়ে তার ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এই মৎস্য-মানব চোখ মেলে হাসার সাথে সাথে মানুর পুরো জীবনটাই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠলো। প্রিয় বাবার সাথে শৈশবের হাসিখুশি দিনগুলো, তার পরম ভালোবাসার মায়ের সাথে খেলা করার সময়গুলো, তারার সাথে কাটানো সুন্দর সময়গুলো, দুষ্ট রাঙার সাথে তার যুদ্ধ...সবকিছু। আরো অনেক কিছুই। তার মনে হলো এমন জায়গা আর সময় থেকে স্মৃতি ফিরে আসছে যেগুলো সে চিনতেই পারছে না। সম্ভবত সেগুলো তার বিগত জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা।

মানু অনুভব করলো তার সমস্ত ব্যথা, পিপাসা, ক্ষুধা, উদ্বেগ...সবই এই নীলচে চামড়ার মানুষটা তার মুখের দিকে তাকানোর পরপরই এককথায় উবে গেছে।

কে সে?

এই মৎস্য-মানব খুব অল্প পরিমাণ পানি গ্রহণের পরেই অস্বাভাবিকভাবে নিজের সমস্ত শক্তি ফিরে পেয়েছে। কোনো কথা না বলেই সে উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে যায় সানজানার পড়ে থাকা দেহের দিকে। সে সানজানার দিকে এতটা মমতাভরে তাকিয়ে আছে যে মানু কয়েক ঘণ্টা ধরে চেপে রাখা কান্না আর দমিয়ে রাখতে পারেনি। লোকটা সানজানার কপাল খুব আলতোভাবে স্পর্শ করে কয়েকবার টোকা দিলো। মানু বলতে পারবে না সে যা দেখছে তা কি দিবাস্বপ্ন নাকি বাস্তবেই ঘটছে। কিন্তু প্রতিবার টোকার পরেই মানু দেখতে পেল তার মায়ের পচন-ধরা শরীরটা ধীরে ধীরে সেই অবস্থায় ফিরে আসছে যেমনটা ঠিক তার মৃত্যুর আগ মুহূর্তে ছিলো। তার মুখের মুচকি হাসি ফিরে এসেছে, শরীরে আবার ঔজ্জ্বল্য দেখা দিচ্ছে আর শরীর থেকে হালকা সুঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। মানু তার মায়ের শরীরে মিশে থাকা ঘ্রাণটা চিনতে পারছে এখন।

'এখন তিনি শেষকৃত্যের জন্য তৈরি,' মানুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্নেহমাখা ভরাট কণ্ঠে বললো সেই মৎস্য-মানব।

মানু প্রচণ্ড আবেগে খুশি হয়ে গেল। এখন সে নিশ্চিত, ইনি কোনো সাধারণ মানুষ নন। একবার মাত্র নজর দিয়ে তিনি মানুকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ করে দিয়েছেন। আর হাতের তালু দিয়ে কয়েকটা আঘাতে তার প্রিয় মায়ের মৃতদেহ থেকে সব ধরনের পচন দূর করে দিয়েছেন। মানু অন্তত এটাই অনুভব করেছে আর দেখেছে। এগুলো কি সত্যিই ঘটেছে নাকি সবকিছুই নিছক এক ক্লান্ত, পিপাসার্ত যুবকের ভ্রম, কে জানে?

* * * * *

'কে আপনি?' মৎস্য-মানবকে প্রশ্ন করলো মানু। সুন্দর, লম্বা বাদামি চুল তার ঈশ্বরের মতো অবয়বকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছে।

হাসলো মানুষটা। আর প্রায় সাথে সাথেই মানু বুঝতে পারলো, চারপাশের শক্তিশালী গরম বাতাস এখন ঝিরঝিরে ঠান্ডা বাতাসে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তার চারপাশের উত্তপ্ত মাটি এখন চমৎকার মেঘে ঢাকা পড়েছে। আবহাওয়ার এই আকস্মিক পরিবর্তনে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই মানু নিজের মুখে হালকা বৃষ্টির পানি অনুভব করলো।

ও জানতো এই নীলচে মানুষটাই এই সবকিছু ঘটাচ্ছে। মানু তার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, মানুষটা মেঘাচ্ছন্ন দিগন্তের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

'এই যে রহস্যময়। কে আপনি?' লোকটার প্রতি চিৎকার করে বললো মানু।

হাঁটা না থামিয়েই মাছের মতো চাদর গায়ে দেওয়া লোকটা মানুর দিকে ফিরে তাকিয়ে একটা হাসি দিলো।

'মহান দেবতা, মনে রেখো, তোমাকে অবশ্যই কালো মন্দিরে পৌঁছাতে হবে। উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ করে এগোতে থাকো। আর তাতেই তুমি এর সন্ধান পাবে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলো লোকটা।

কালো মন্দিরের কথা সে কীভাবে জানে? আমি তাকে কোনো কিছুই বলিনি।

'কিন্তু তুমি কে, আর্য?'

'ওহে রাজা, আমাকে আর্য বলে ডেকো না। আমি তোমার কাছে ঋণী। এই কয়েক ফোঁটা পানির জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী। এখন থেকে সময়ের শেষ পর্যন্ত আমি তোমার বন্ধু। আর আমার একটা নাম আছে।'

'সেই নামটা কী, প্রিয় বন্ধু?' লোকটা দূরে চলে যাচ্ছে দেখে আরো জোরে চিৎকার করলো মানু।

নীল মানুষটা একটু ঘুরলো, মানুর দিকে তাকিয়ে হাসলো, তারপর অল্প করে হাত নাড়িয়ে চিৎকার করে উত্তর দিলো মানুর কথার।

'এই অঞ্চলের সবাই আমাকে যে নামে ডাকে, তুমি সে নামেই ডাকতে পারো। তুমি আমাকে মৎস্য নামে ডাকতে পারো।'

বানারস, ২০১৭

শুভ ও অশুভের যুদ্ধ

বিদ্যুতের বিছানার পাশের চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছে দামিনী।

দুই রাত আগে অনেকটা কোমায় থাকা অবস্থায় বিদ্যুৎকে মঠে নিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিলো। গোবর্ধন এরপর থেকে কোনো চেষ্টাই বাকি রাখেনি। তার দেবতাকে বিপদমুক্ত করতে ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে চলেছে। এমনকি সে বিখ্যাত সার্জন এবং মঠের বন্ধু ডাক্তার শশী দীক্ষিতকেও ডেকে এনেছে। আয়ুর্বেদ, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভক্তি ও ভালোবাসাময় প্রার্থনা আর শক্তিশালী যজ্ঞের এক সম্মিলিত চেষ্টার ফলে দেবতা এখনো বেঁচে আছে।

ডাক্তার দীক্ষিত আর মহান দ্বারকা শাস্ত্রীর ফিসফিস আলাপে জেগে উঠলো সে।

'দ্বারকা শাস্ত্রীজি, অনেক বড় বাঁচা বেঁচে গেলাম। বিদ্যুৎ এই বীভৎস আক্রমণ থেকে এ যাত্রায় সেরে উঠবে,' বললেন ডা. দীক্ষিত। 'আসলে...সত্যি বলতে...আমি কিছুটা অবাকই হয়েছি।'

সুন্দর চোখজোড়া বন্ধ করে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রার্থনা করলো দামিনী। তার বিদ্যুৎ তাকে ছেড়ে যাচ্ছে না।

'আপনাকে কোনো কিছু বিব্রত করছে, ডাক্তার সাহেব?' জানতে চাইলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। তিনি সম্ভবত জানতেন ডাক্তারের মনে কী চলছে। কিন্তু সব সময় যেমন হয়, তিনি সুযোগ দিলেন তাকে কথা বলার।

'গুরুজি, বিদ্যুতের সেরে ওঠাটা অস্বাভাবিক। আমার পঁচিশ বছরের সার্জন জীবনে আমি কখনোই কাউকে এত দ্রুত সেরে উঠতে দেখিনি।'

দ্বারকা শাস্ত্রী শুনেই যাচ্ছেন, তার চোখেমুখে একটা ম্লান হাসি, যে হাসি প্রায় বোঝা যায় না বললেই চলে।

'অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে তার টিস্যু সেরে উঠছে। ভেষজ বা অ্যালোপ্যাথিক, দুই রকমের ওষুধেই সে আশ্চর্য রকম সাড়া দিচ্ছে। যদিও

আমি দেখতে পাচ্ছি সে খুবই স্বাস্থ্যবান যুবক, তার শরীর এতখানি প্রাণশক্তি নিয়ে যুদ্ধ করে চলেছে যা আমি আগে কখনোই দেখিনি। মনে হচ্ছে, সে যেন কোনো সুপারহিউম্যান।'

'সে আসলেই তাই,' দ্বারকা শাস্ত্রী শান্তভাবে বললেন।

'সত্যিই তাই,' খুশি মনে ফিসফিসিয়ে কথাটা বললো দামিনী। 'আমার বিদ্যুৎ সুপার হিউম্যান।'

* * * * *

'বিদ্যুৎ! তুমি কি জানো তোমার প্রপিতামহ কেন আর কীভাবে এত বাজেভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন?' প্রিয় দেবতার দায়িত্ব নিয়ে একটা কমলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে জিজ্ঞেস করলেন পুরোহিতজি।

পুরোহিতজির ছেলে, সনু, সেও ভালোভাবে সেরে উঠছে। সে কেবল নিজের স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে তাই না, নির্মল রসিকতার বোধও ফিরে আসছে। এটাই সম্মানিত পুরোহিত মশাইকে শাস্ত্রীর উত্তরাধিকারীর দিকে মনোযোগের ব্যাপারে সাহায্য করছে।

'না, পুরোহিতজি,' উত্তর দিলো বিদ্যুৎ। 'আমি ভেবেছিলাম বার্ধক্যজনিত রোগ তাকে পেয়ে বসেছে। সর্বশক্তিমান তাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন, কিন্তু তার বয়স এখনই শত বছরের উপরে।'

বিদ্যুৎ দ্রুত নিজেকে ফিরে পাচ্ছে। এখনো হাসপাতালের বিছানায় থাকলেও সে পুরোপুরি সজাগ আর নিজস্ব সতর্ক ভাবও ফিরে আসছে।

'বিদ্যুৎ, যখনই তুমি যথেষ্ট সুস্থ বোধ করবে, তোমার উচিত আমাদের মহান গুরু, মহান দ্বারকা শাস্ত্রীজির সাথে বেশি করে সময় কাটানো। তোমাদের দুজনেরই অনেক কিছু বলার আছে।

'বাবার সাথে থাকার চেয়ে অন্য কোনো কিছুতেই আমার খুব বেশি চাওয়া নেই, পুরোহিতজি,' জবাব দিলো বিদ্যুৎ। 'কিন্তু তিনি অনেক কঠিন প্রকৃতির মানুষ, এটা তো মানবেন? তিনি নিজের মতো করে কথা বলে যান। একটা নির্দিষ্ট সময়ে তিনি ঠিক যতখানি চান, ঠিক ততখানিই প্রকাশ করেন। তাকে কেউ তাগাদা দিতে পারে না। অন্তত আমি না।'

'একমাত্র তুমিই আছো যে নিজের ইচ্ছামতো তাকে কোনো কাজ করাতে পারে, বিদ্যুৎ,' ক্লান্তির হাসি দিয়ে কথাটা বললেন পুরোহিতজি। 'অন্তত, তাকে

স্বীকার করতে হয়েছে যে তোমাকে রক্ষা করতে তাকে শুভ-অশুভের ভয়ানক যুদ্ধে লড়তে হয়েছে।'

যা শুনেছে তা হজম করতে বিদ্যুতের কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো।

'দুঃখিত...আপনি কি শুভ-অশুভের যুদ্ধের কথা বললেন, পুরোহিতজি?'

পুরোহিতজি একটা প্লেটে কমলাগুলো সুন্দর করে সাজালেন। 'হ্যাঁ, বিদ্যুৎ। তোমার প্রপিতামহ কোনো স্বাভাবিক অসুস্থতা বা সাধারণ বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগেননি,' সত্যটা প্রকাশ করলেন পুরোহিত। 'বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কালো জাদুকরের সাথে লড়তে গিয়ে তিনি প্রায় মারাই যাচ্ছিলেন। অর্ধ-পৃথিবী দূর থেকে খুবই ভয়ানক আর প্রতিষ্ঠিত জাদুবিদ্যা অনুশীলনকারী কেউ অন্য জগত থেকে খুবই অসামান্য শক্তিশালী জিনিস তোমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলো। তখন তুমি গুরগাঁওয়ে ছিলে, বিদ্যুৎ। এসব দুষ্ট আত্মা হয়তো তোমাকে মেরে ফেলতো আর তোমার আত্মাকে অন্ধকার জগতে টেনে নিয়ে যেত। যা আমাদের মহান দীক্ষাগুরুর জন্য সম্ভব হয়নি। দ্বারকা শাস্ত্রীজি তোমাকে এই দূরপাল্লার অশুভ আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি তোমাকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবনটাই প্রায় হারাতে যাচ্ছিলেন।'

বিদ্যুৎ যতখানি অবাক হয়েছে, ঠিক ততটাই রেগেও গেছে। সে জানতো, তার গুরুগম্ভীর প্রপিতামহ যতই নিজেকে আলাদা রাখার চেষ্টা করুক না কেন, বাস্তবে তাকে খুবই ভালোবাসেন। কিন্তু বিদ্যুৎ এখন পর্যন্ত এটা জানতো না যে দেব-রাক্ষস মঠের সর্বোচ্চ গুরু প্রায় জীবন-মরণ লড়াইয়ে নেমেছিলেন শুধু তাকে রক্ষা করার জন্যে।

'এসব কিছু কে করছে, পুরোহিতজি?' জানতে চাইলো উদ্বিগ্ন বিদ্যুৎ। 'কে আমাকে খুন করতে চাইছে? সেদিন আমি দশাশ্বমেদ ঘাট ছেড়ে আসার আগে বাবা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নামে কিছু একটার কথা বলছিলেন। ওটা আসলে কী, আর কেনই বা ওরা আমাদের প্রতিপক্ষ?'

'এই *কেন* বলে যে প্রশ্নটা তুমি করলে, সেটা বেশ জটিল এক প্রশ্ন, বিদ্যুৎ। কেবল তোমার প্রপিতামহই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন, এবং তারই মূলত দেওয়া উচিত। তবে আমি তোমাকে এটা বলতে পারি, এই অশুভ যুদ্ধের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কে ছিলো।'

'আচ্ছা?' পুরোহিতজি যেন কথা চালিয়ে যেন সেদিকে জোর দিলো বিদ্যুৎ।

পুরোহিতজি বিদ্যুতের চোখের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলতে শুরু করলেন। 'এই পৃথিবীতে এযাবৎকালের সবচেয়ে দক্ষ তান্ত্রিকের একজন দ্বারকা শাস্ত্রীজি।

ভেবে দেখো, তাকে পুরোপুরি পরাস্ত করতে একজন প্রতিপক্ষের কেমন অবস্থা হতে পারে। ওটা কোনো সাধারণ আত্মা ছিলো না। ছিলো এক আধ্যাত্মিক দেবতা আর আমাদের মঠাধীশের মতোই গুণে আর ঐশ্বরিক ক্ষমতায় অদ্বিতীয় ব্যক্তি।'

বিদ্যুৎ প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে শুনে যাচ্ছে। পুরোহিতজি থামলেন না।

'সে এক ভয়ংকর রাত। আমাদের গুরুদেব দ্বারকা শাস্ত্রীজি সন্ধ্যা থেকেই বিচলিত ছিলেন। কারণ আমরা খেয়াল করেছিলাম সন্ধ্যা থেকেই মঠের উপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছিলো। আমাদের মাঝে কেউই কোনো অশুভ কিছু আঁচ করতে পারিনি। কিন্তু যখনই বাতাসের বেগ বাড়তে শুরু করে, আমাদের মঠাধীশ সাথে সাথেই সন্দেহ করেছিলেন যে এটা নিছক প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। গ্রহের অবস্থান অনুযায়ী তিনি আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিলেন তোমাকে আক্রমণ করার এটাই সবচেয়ে মোক্ষম সময়। এমন একজন মানুষ যার প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে ভালো দক্ষতা আছে, সে তোমাকে অসাড় করে দেওয়ার জন্য এই উপযুক্ত সময়টা বেছে নিয়েছিলো।'

পুরোহিতজি এখন সেই অশুভ রাতের একের পর এক আঘাতের কথা স্মরণ করে শূন্যতার মাঝে ডুবে যাচ্ছেন।

'ধীরে ধীরে চাঁদের রং ভৌতিক লাল হতে শুরু করে। ভয়ংকর সেই বাতাস রূপ নিলো চোখধাঁধানো ধুলো ঝড়ে। রক্তিম কালো আকাশে প্রায় হাজার দশেক পাখি এত জোরে চিৎকার শুরু করে দিলো, মনে হচ্ছিলো শখানেক অশুভ ডাইনি যেন একই সাথে কাঁদছে আর উচ্চ স্বরে হাসছে। রাত যতই গাঢ় হচ্ছে, কুকুরগুলো যেন ততই নেকড়ের মতো করে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। আর তারপরই আমরা ওটা শুনতে পেলাম। বানারসের চারপাশ ঘিরে রাখা রক্ষক মন্দিরের ঘণ্টাগুলো দূর থেকে একসাথে বেজে উঠলো। ঐসব প্রাচীন মন্দিরের আধ্যাত্মিক সাধুরা কোনো এক হুমকির ব্যাপারে সতর্ক হয়ে উঠলেন, ঠিক যেমনটা সতর্ক হয়ে পড়েন স্বয়ং দ্বারকা শাস্ত্রীজি। তাদের রক্ষাকর্তার কাছে সংকেত পাঠাতে তারা তাদের মন্দিরের ঘণ্টার দড়ি টেনে দিয়েছিলো ততক্ষণে। যদিও ততক্ষণে প্রত্যেকেই তাদের পবিত্র আত্মাদের সম্মিলিত বাহিনীকে ফিরিয়ে এনেছে। বানারসের চারপাশে বৃত্তাকারে পবিত্র স্থাপনা এবং দেব-রাক্ষস মঠ যে সবচেয়ে ঘোরতর সময়কে কেন্দ্র করে বানানো হয়েছিলো, সেই সময়টা চলে এসেছে। এটা সেই সময়, যখন প্রাচীন এই শহরের আকাশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অশুভ যুদ্ধের মঞ্চ হয়ে উঠেছিলো। যাদের ঘৃণা করা হয়েছে আর শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করেছে, সেটা অবশেষে ফিরে এসেছে।'

* * * * *

বিদ্যুৎ তার সারা শরীরে একটা ঠান্ডা ঘামের স্পর্শ অনুভব করতে পারছে। কিন্তু সে আকস্মিক কোনো প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে পুরোহিতের কথা থামাতে চায়নি। প্রশ্নগুলো সব নিজের কাছেই রেখে চুপচাপ সবটা শুনে গেল।

'কিছুক্ষণের মধ্যেই মহান মঠাধীশ তার বড় কুঁড়েঘর দিকে এগিয়ে গেলেন। ততক্ষণে তিনি অথর্ব বেদের অন্ধকার সময় এবং অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ থেকে আক্রমণের মন্ত্র উচ্চারণ করা শুরু করে দিয়েছেন। সম্ভবত তিনি তার নিজস্ব স্বর্গীয় বাহিনীকে ডাকছিলেন। মহাগুরুর নিজের মনটা ছিলো তার সবচেয়ে শক্তিশালী সঙ্গীদের আস্তানা, আর তিনি নিজের জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় তাদের সবার সাহায্য কামনা করছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে তিনি দেরি করে ফেলেছেন। আধ্যাত্মিক সেই দুর্গে প্রবেশের আগেই আকাশ থেকে এক লাল বজ্রপাত এসে সরাসরি তাকে আঘাত করে বসে। আকাশ থেকে যেন অনেকগুলো নরকের আগুনই নেমে এসেছিলো। এক মুহূর্তের জন্য আমরা সবাই জমে গেলাম। কারণ সবাই নিশ্চিত ছিলাম, আমরা এইমাত্র আমাদের প্রিয় নেতার শেষটুকু দেখে ফেলেছি। কিন্তু কী আশ্চর্য...ধোঁয়া সরে যেতেই আমরা সবাই শক্তিমান দ্বারকা শাস্ত্রীকে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে যাই। তার পা পিলারের মতো শক্ত আর লম্বা সাদা চুলের গোছা বাতাসে উড়ছে। বিশাল ত্রিশূল অপার্থিব আক্রমণের চিহ্নস্বরূপ কমলা রং ধারণ করে জ্বলছে। আর তারপরেই ভয়ানক যুদ্ধটা শুরু হলো।'

সিন্ধুর তীরে, হরপ্পার পশ্চিমে, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

অসুর

রাতের অন্ধকারে তার ঘোড়া ঝড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে গেল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তুলসি, লোহাবান (মৃহ) আর অন্যান্য ভেষজ আয়ুর্বেদিক মাখানো, কেবল তার একটা চোখ কালো অন্ধকারে প্রাগৈতিহাসিক নেকড়ের মতো জ্বলজ্বল করছে।

তার কোমরের বেল্ট থেকে একটা বিশাল তরবারি ঝুলছে। তার একান্ত নিজস্ব, অত্যন্ত ভয়ানক তলোয়ার–রত্ন-মরু। তার জিনে একশত তীর বাঁধা আর একটা শক্তিশালী ধনুক তার পুরো শরীর জুড়ে ঝুলছে। তার নষ্ট চোখটা চামড়ার ঢাকনায় ঢেকে রাখা। এই মুহূর্তে এই বিস্তীর্ণ সমভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হিংস্র বাতাস থেকে যেন খালি কোটরকে রক্ষা করা যায়।

বিভাষণ পূজারি তার একসময়ের শপথ করা শত্রুর তাঁবুর দিকে এগোচ্ছেন। যাচ্ছেন রাক্ষসরাজ সুরার কাছে।

* * * * *

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না সুরা। যার নাম প্রহরীরা উচ্চারণ করেছে, তাকে সে একই সাথে সমীহ আর ভয় করতো।

এটা কীভাবে হতে পারে?

'তুমি নিশ্চিত? তুমি নিশ্চিত এটাই দর্শনার্থীর নাম?' সুরা আবারো জানতে চাইলো।

সৈন্যটি এবার বিচলিত হয়ে পড়লো। এই বিশাল সেনাদলের সবাই একটা নিয়ম জানতো, তা হলো মহান সুরাকে কখনো রাগানো যাবে না। কখনোই না।

সুরার সাথে যারাই আলাপ করেছে, তাদের বেশিরভাগই যা বুঝতে পারেনি তা হলো, কীভাবে এত ছোট আকারের একজন মানুষ এই অবর্ণনীয় আধিপত্য করতে পারে। তার ত্বক ফর্সা ছিলো, কিন্তু তার পোড়া শত্রুদের ছাইয়ে তা চিরতরে কালো হয়ে যায়। জানামতে, কখনোই পুরোপুরি সশস্ত্র না হয়ে ঘুমাতে না যাওয়া মানুষটি তার রোজকার প্রয়োজনীয় পানীয় পান করতো একটা ধার-চিতার খুলিতে করে, যাকে সে খালি হাতে হত্যা করেছিলো। সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গ উপভোগের জন্য সে পরিচিত, বিশেষ করে পরাজিত শত্রুদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে, তবে সে কখনোই জোর করে কোনো মহিলাকে নিয়ে যায়নি। সে অপেক্ষা করতো যতক্ষণ না তারা নিজেরা ধরনা দেয়, বা আরো স্পষ্ট করে বললে, তার অপ্রতিরোধ্য পুরুষত্বের প্রতি আত্মসমর্পণ করার ভান শুরু করে। তাদের মাঝে যারা ধরনা দেয়নি, তাদেরকে জনসম্মুখে নেকড়ের মুখে তুলে দেওয়া হতো। এটাই তাকে বিধবাদের পরের যে দলকে সে দাবি করতো, তাদের কাছে আরো বেশি অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিলো। তার অনুগত বর্বর সেনাদের মাংসের জন্য সে প্রতিদিনই এক বিশাল জন্তুর মাথা কাটতো। তাদের কেউই সকালের নাশতা করতো না, যদি-না সেটা তাদের প্রভুর বলিদানের তলোয়ার হয়ে না আসতো। তার আদালতের একটা সহজ নিয়ম ছিলো। যেকোনো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির জন্য একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকতো। তাকে স্বয়ং রাজার সাথে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু হেরে যাওয়ার অর্থ এমন এক মৃত্যুদণ্ড যা শুনে পরের প্রজন্মও ভয় পাবে।

সে এমন একজন মানুষ যে যদি কঠোরভাবে তাকায়, তবে নাকি মানুষের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে চলে আসে। সুরা তার নিজের লোকদের কাছে ছিলো ঈশ্বর। আর তার রাজত্বের পূর্ব দিকের সবার কাছে সে ছিলো রাক্ষস।

* * * * *

এই কিংবদন্তি রাক্ষসরাজ মহেঞ্জোদারো শহরে জীবন শুরু করেছিলো সাধারণ এক মুচির পুত্র হিসেবে। জুতা সেলাইয়ে ভুল করায় তার বাবাকে লাথি মারার অপরাধে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পা অবলীলায় কেটে নিয়েছিলো সে। এরপর সুরা তার সাত বিশ্বস্ত বন্ধুর দল নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যায়। ভেবেছিলো, শহর ছেড়ে যাওয়ার পরেই বিষয়টার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। যখন তার বাবা-মাকে মৃৎ-কারাবাসে নেওয়ার কথা তার কানে পৌঁছায়, সুরা জানতো তারা আর কখনো

জীবিত ফিরে আসবে না। আর এও জানতো, এই ভয়ানক অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য সে খুবই দুর্বল।

প্রতিশোধের শপথ নিয়েছিলো সে। তবে তা শুধু যে শহরটা তার এবং তার বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছিলো তাদের বিরুদ্ধে না, বরং পুরো আর্যাবর্তের বিরুদ্ধে। সুরা প্রতিজ্ঞা করছিলো, সে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রচলিত রীতিকে ধ্বংস করবে। তার সাথে যোগ দিলো তার সাত সঙ্গী। মাস আর বছর পেরিয়ে গেল, সুরা সাধারণ একজন রাস্তার দস্যু থেকে পাহাড়ের ভয়ানক যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। তার ছোট দল এখন একটা সেনাদলে পরিণত হয়েছে, আর তারপর ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে একটা জাতি। তার সেনাবাহিনী পুরো বিশ্বের সবচেয়ে নিষ্ঠুর আর অজেয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আর, উজ্জ্বল হরপ্পান জীবনধারার বিপরীতে, সুরার সেনাদল হয়ে উঠেছে এই বর্বোরোচিত শক্তি। কেবল পুরুষদেরকেই আটক করার একমাত্র কারণ, প্রতিদিন একজন করে জীবিত পুড়িয়ে ফেলা হতো, আর সেই মৃত শত্রুর ছাই দিয়ে রোজকার আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হতো। হিন্দুকুশ অঞ্চলের প্রতিটি ধূলিকণার রাজা এই সুরা ছিলো এক জীবন্ত কিংবদন্তি।

আর্যাবর্তের নিয়মিত জীবনধারার বিপরীতে এক নতুন জীবনধারা প্রতিষ্ঠিত করতে, সুরা তার বিশাল বাহিনীকে একটা প্রতিশ্রুতি করতে বাধ্য করেছিলো। তারা কখনোই আর্যাবর্তের আসল নাম উচ্চারণ করবে না। তাদের উত্তরাধিকারীদের মাঝেও উচ্চারিত প্রতিটি শব্দেই ঘৃণার প্রকাশ করতো। তারা অপভাষায় কথা বলে, অ-ভাষা। জ্ঞানের চূড়ান্ত রূপ আর স্রষ্টা ব্রহ্মাকে তারা ডাকতো অ-ব্রহ্মা নামে। যদিও তারা তাকে বাকি আর্যাবর্তের মতোই সর্বোচ্চ দেবতা হিসেবে পূজা করতো, তবে কখনোই হরপ্পান নামে সম্বোধন করতো না। তাদের ঈশ্বর ছিলেন অ-ব্রহ্মা।

একই ঈশ্বর এখন দুই ভিন্ন নামে, দুই ভিন্ন জাতির কাছে উপাস্য। কিন্তু তিনি ছিলেন একক। সব সময়েই একক ছিলেন। সর্বদাই একক থাকবেন।

আর এই অ-ভাষায় যতই দিন গড়িয়েছে আর কিংবদন্তি ছড়িয়ে পড়েছে, সুরা আর তার অনুসারীদের দলটা নিজেদের নাম বদল করেছে। নিজেদের অনুসারীদের কাছে ঈশ্বরের মতো উপাস্য আর পার্শ্ববর্তী জাতের কাছের শয়তানের মতোই ঘৃণ্য...

ওরা এখন...অসুর।

* * * * *

'জি হ্যাঁ, প্রভু। এই নামটিই তিনি আপনার কাছে জানাতে বলেছেন,' বললো সেই প্রহরী। একবারের জন্যেও নিজের চোখ তুলে শক্তিশালী রাজার দিকে তাকায়নি সে। 'আর মহামান্য, আমাকে অবশ্যই এও জানাতে হচ্ছে...তাকে নির্মমভাবে বিকৃত করা হয়েছে।'

সুরার জ্বলজ্বলে চোখের নজর এখন মাটির এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যাচ্ছে। সিংহাসনের পাশের টেবিলে মাথার খুলি দিয়ে বানানো পানপাত্রটি রাখলো সে। বন্ধু ও সেনাপতি প্রচণ্ডের দিকে তাকালো সে। বড় তাঁবুর ভেতরে আগত অতিথির নাম শুনেই তার উটের পায়ের রোস্ট খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছিলো।

'এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে মেরে ফেলো, সুরা,' পরামর্শ দিলো প্রচণ্ড। 'শেষবার যখন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিলো, তখন কী করেছিলো, তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই...'

কেবল প্রচণ্ডই মহান রাজা সুরাকে নাম ধরে ডাকতে পারে। আর কেবল প্রচণ্ডই তাকে অপমানজনক হারের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নিতে পারে।

'আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রচণ্ড,' তাকে থামিয়ে দিলো সুরা। 'আমার মনে আছে, সে তার অল্প কজন সেনা নিয়ে আমাদের পুরো সেনাদল গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো। মনে আছে, সে আমার সেরা ঘোড়াটা নিয়ে পাহাড় থেকে দূরে চলে গেছিলো। আমার মনে আছে, সে তার তলোয়ার দিয়ে আমাদের দুজনকেই পরাজিত করেছিলো।'

সুরা তার মাথার খুলিতে বানানো বিশেষ পাত্র থেকে আরেক ঢোক নেশাজাতীয় পানি পান করলো।

'কিন্তু আমার এও মনে আছে, সে আমার সন্তানের জীবন বাঁচিয়েছিলো,' সুরা আবার বলতে শুরু করলো। 'আমার এও মনে আছে, সে আমাদের নারীদের স্পর্শ করেনি। তাদের সাথে পরম শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করেছিলো সে।'

প্রচণ্ড নীরবে শুনছিলো। অস্বীকার করার উপায় নেই। সে জানতো, সুরা ঠিকই বলছে।

'বিদ্যুৎ, তুমি জানো ব্রহ্ম-রাক্ষস কী?' জানতে চাইলেন পুরোহিতজি।

'আমি পুরোপুরি নিশ্চিত না, পুরোহিতজি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এটা একটা অতিপ্রাকৃত বিষয়। যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য শত শত বছর ধরে যা অভিশপ্ত বলে বিবেচিত,' জবাব দিলো বিদ্যুৎ।

'কাছাকাছি গেছ। ব্রহ্ম-রাক্ষস এমনই এক অবিশ্বাস্য অস্তিত্ব যা এই জগতেরও না, অন্য জগতেরও না। ব্রহ্ম-রাক্ষস পুরোপুরি মৃত না, আবার পুরোপুরি জাগ্রতও না। সে অন্ধকার পৃথিবীর অধিবাসী না, আবার এই নশ্বর জগতেরও কেউ না। এটা এক অভিশপ্ত, গোপন আত্মার অস্থায়ী অবস্থা, যে কিনা তার প্রগাঢ় জ্ঞান আর বুদ্ধির পরেও জীবদ্দশায় ভয়াবহ পাপ করেছিলো। এক ভয়ানক, অশরীরী অবস্থায় তাকে যন্ত্রণাভোগের জন্য আটকে রাখা হয়েছে।'

এই কথাগুলো উচ্চারণ করতে করতেই পুরোহিতজি জানালা দিয়ে বাইরের কিছু একটার দিকে তাকালেন। বিদ্যুৎ বুঝতে পারলো, তিনি মহান মঠাধীশের ঘরটার দিকে তাকিয়ে আছেন।

কাঠনির্মিত ঐ রহস্যময় কুঁড়েঘরের দিকে তাকিয়ে নিজের কথা চালিয়ে গেলেন পুরোহিতজি।

'জানো বিদ্যুৎ, আমাদের মহান গুরুর ঘরটায় সত্যিই একজন ব্রহ্ম-রাক্ষস বাস করছে। আমি তাকে ঐ রাতে দেখেছি। বহু বছর ধরেই আমরা তার উপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু সেই রাতে দ্বারকা শাস্ত্রীজি তার নিজের সাহায্যের জন্য সেই অপার্থিব সত্তাকে মুক্ত করে ডেকে এনেছিলেন। আমি...দেখেছি তাকে...' এই পর্যায়ে এসে পুরোহিজি কিছুটা অসাড় হয়ে পড়লেন।

পুরোহিতজির কাঁধে হাত রাখলো বিদ্যুৎ, চেষ্টা করলো এই বৃদ্ধ পুরোহিতকে কিছুটা শান্ত করতে। পুরোহিতজি সাথে সাথেই তার এই আচরণে

সায় দিলেন। বিদ্যুতের হাত চাপড়ে দিয়ে একটা ম্লান কিন্তু আশাব্যঞ্জক হাসি দিলেন।

গলা পরিষ্কার করে গ্লাস থেকে এক চুমুক পানি খেয়ে আবার নতুন করে স্থির হয়ে কথা শুরু করলেন। বিদ্যুতের সবটা জানা প্রয়োজন।

'তার কুটির থেকে ভেসে আসছিলো শত শত জাদুকরের মন্ত্র পড়ার শব্দ, একসাথে যা বেশ ভয়ানক ছিলো। মঠে যারা ছিলাম, তাদের প্রত্যেকের জন্যই গুরুদেবকে তার ঘরে একাকী ঢুকতে দেখার সময়টা ছিলো আতঙ্কের,' পুরোহিতজি বলে গেলেন একটানা।

'আমরা দেখলাম, দ্বারকা শাস্ত্রীজি একাই তার কুঁড়েঘরটায় প্রবেশ করেছেন। তবে মুহূর্তের মধ্যেই পুরো জায়গাটা এক অদ্ভুত, অস্বাভাবিক আলোয় ভরে গেল। মনে হলো, শখানেক পূজার আগুন একসাথে ধরানো হয়েছে। আর তারপরেই একটা বিশাল আলোর ঝলক দেখিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল পুরো বানারস শহর। প্রতিটি লাইট বাল্ব, প্রতিটা স্ট্রিট ল্যাম্প, সব রকমের টিভি...শুধু তাই কেন, প্রতিটা চুলার আগুন পর্যন্ত দমকা কালো হাওয়ায় নিভে গেল। যেন এক অশুভ, ঐশ্বরিক জিন আশপাশের দশ মাইলের মাঝে থাকা সব আলোর উৎস নিভিয়ে দিয়েছে। এরপর সেখানে কেবল দুটো জিনিসই চোখে ভাসছিলো–গুরুমশাইয়ের ঘর থেকে আসা তন্ত্র আগুনের ভয়-ধরানো আভা আর আকাশ থেকে বজ্র-বৃষ্টির সময় ধেয়ে আসা লাল রঙের বজ্রপাত রেখা।'

মঠের সেবাঘরটায় এক লম্বা নীরবতা নেমে এলো। বিদ্যুৎ চমকে গেছে। পুরোহিতজি হারিয়ে গেছেন সেই ভূতুড়ে রাতের ভয়-ধরানো স্মৃতির মাঝে। মঠের এক সেবিকা বিদ্যুতের খাবার নিয়ে ঘরটায় প্রবেশ করলো। কিন্তু ভদ্রভাবে এবং জোরালো ইশারায় মাথা নাড়িয়ে সেটা ফেরত পাঠালো দেবতা।

'কিন্তু পুরোহিতজি, ওরা যদি আমার পেছনেই আসবে, তাহলে সবকিছু কেন এখানে, এই বানারসেই শুরু হলো? আমি তো অনেক দূরে ছিলাম তখন!'

'দূর থেকে আধ্যাত্মিক আক্রমণ করা বেশ পুরাতন আর প্রচলিত এক আক্রমণ পদ্ধতি, বিদ্যুৎ। পশ্চিমা ধর্মগুরুদের বেশ কিছু কিংবদন্তি আছে এ নিয়ে, বিশেষ করে পোপ দ্বাদশ পায়াসের কথা বলা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে চরম অবস্থায় তিনি এটা আর কারো না, স্বয়ং হিটলারের উপর প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি এই কথা বিশ্বাস করেছিলেন যে হিটলার ছিলো শয়তানের শরীরিরূপ, এজন্য দূর থেকেই তারা তার উপর চরম আক্রমণ করে। কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না এর ফলাফল ঠিক কী হয়েছিলো, কেবল

এই প্রথায় অংশ নেওয়া ভ্যাটিকানের এক উচ্চপদস্থ যাজক প্রায় মরতে বসেছিলেন। তারা বলেছিলো, হিটলারের ভেতরে থাকা শয়তান এতই শক্তিশালী যে তাকে হটানো অসম্ভব ছিলো।'

'ওয়াও! স্বয়ং হিটলার! কেউ কি এমনটা কল্পনাও করতে পেরেছিলো কখনো?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল বিদ্যুৎ।

'হিটলার, বিশ্বযুদ্ধ আর চার্চসংক্রান্ত বেশ কিছু নথিপত্রে এর উল্লেখ আছে। পরবর্তীতে ভ্যাটিকানের বেশ কিছু এক্সোর্সিস্ট, যাদের মাঝে গ্যাব্রিয়েল আমোর্থও আছেন, তারা বলেন, দূর থেকে করা এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে কারণ যার উপর আক্রমণ করা হয়, সেই মূল ব্যক্তি দ্বাদশ পায়াসের সামনে ছিলেন না। তবে এটা অবশ্য একটা পশ্চিমা নীতি। আমাদের প্রাচীন কালো জাদুবিদ্যায় এমন কোনো বাধা নেই।'

'এসবই দারুণ উপভোগ্য আর ভয় ধরিয়ে দেওয়ার মতোই, পুরোহিতজি। কিন্তু আমরা প্রশ্নটা এখনো রয়েই গেছে। আপনি যদি বলেই থাকেন এই আক্রমণ আমার উপর হয়েছে, তাহলে সবকিছু কেন এই বানারসে হলো? কেন আমি যেখানে ছিলাম, সেই গুরগাঁওয়ে হয়নি? আর আমি যখন আমার প্রপিতামহের তুলনায় একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলাম, আমাকে সহজেই এই তান্ত্রিক যুদ্ধে হারানো সম্ভব ছিলো।'

বিদ্যুতের শেষ কথাটায় একমত হয়ে জোরে মাথা নাড়লেন পুরোহিতজি।

'হ্যাঁ। তুমি ওদের সাথে প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যেতে পারতে, তবে ওদেরকে হারাতে পারতে না। দ্বারকা শাস্ত্রীজি কে সেটা মাথায় রেখো। তুমি একজন যোগ্য তান্ত্রিক সে নিয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমার প্রপিতামহের তুলনায় তুমি কিছুই না। তার চেয়ে বড় কথা, আমাদের মঠাধীশ এই লড়াই একা লড়েননি। তার সাথে বানারসের শখানেক নামকরা তান্ত্রিক আর ঋষি ছিলেন। যারা তাদের আধ্যাত্মিক ভূগর্ভস্থ আসন, মন্দির, ঘর, ঘাট আর শ্মশান থেকে যোগ দিয়েছিলেন। এটা ছিলো শুভ আর অশুভের মাঝে প্রবাদতুল্য যুদ্ধের এক শক্তিশালী নমুনা। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের পুরো জীবনের অভিজ্ঞতার আলো দ্বারকা শাস্ত্রীজিকে দান করেছিলেন। তারা সবাই জানতেন, মানব জাতি এই যুদ্ধের হারের বোঝা বহন করতে সক্ষম হবে না।'

বিদ্যুৎ এখন সেই রাতের বিপজ্জনক রাতটা কল্পনা করতে পারছে। এই দেব-রাক্ষস মঠ আর তার মহান গুরু দ্বারকা শাস্ত্রীর কুঁড়েঘর হয়ে উঠেছিলো আধ্যাত্মিক প্রতি-আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু। একই সাথে প্রাচীন এই শহরের বিভিন্ন

প্রান্ত থেকে শত শত তন্ত্রসাধকরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অনুশীলন করে আসা মন্ত্রের সাহায্যে এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। কালো আকাশের পুরোটা জুড়ে ঈশ্বরের কণ্ঠ যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

বিশ বা তার চেয়েও বেশি প্রজন্ম ধরে বানারসের পুরোহিত সমাজ এই কালো রাতের জন্য অপেক্ষা করেছেন। তারা জানতেন, এই নির্মম যুদ্ধে হয়তো তাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু তবুও তারা জড়ো হয়েছিলেন, নির্ভয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। কয়েকশো বছর আগেই সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছেন তারা। একসময় তারা বিবেচিত হতেন নৈতিক জীবনযাপনের প্রহরী বা পবিত্র শিক্ষক হিসেবে, যাদের অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং রাজারাও সিংহাসন ছেড়ে দিতেন। এইসব সাধু আর ঋষীরা এখন আর দারিদ্র্যসীমায় বাস করা জীর্ণ-শীর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক ছাড়া আর কিছুই না। বস্তুবাদী, পশ্চিমা আর শ্রদ্ধা-ভক্তিহীন সমাজ এসব গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবকদের গৃহ-প্রবেশ, জন্ম এবং মৃত্যুর মতো ঘটনার আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এসব অপ্রত্যাশিত প্রয়োজনে তাদের নিমন্ত্রণ জানানো হয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করার জন্য। শহুরে হিন্দু পরিবারগুলোতে এগুলো এখন সাধারণ রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আজকের এই দিনে এসেও যে ঈশ্বরের সহকারী এসব মানুষ অশুভ বিদ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সে নিয়ে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। সেই ভয়াল রাতে তারা নিজেদের জীবন বাজি রাখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু তারা সবাই কী রক্ষা করতে চেয়েছিলেন?

'গুরুদেব যতক্ষণে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো তিনিই নিজেই এক দানব। তাকে দেখতে স্বাভাবিকের চেয়েও বড় লাগছিলো আর হাঁটছিলেন পুরোপুরি জম্বিদের মতো। তার চুলের গোছা বাতাসে উড়ছিলো সাদা সাপের মতো। তবে সবচেয়ে বেশি...সবচেয়ে বেশি যেটা আমাদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলো তা হলো, তার চোখ থেকে নীলচে রঙের বিষাক্ত আলো ঠিকরে পড়ছিলো। আমরা জানতাম আমরা আমাদের মহান গুরুর দিকে তাকিয়ে নেই। এটা তার ভেতরের অন্য এক সত্তা।'

'কে ছিলো ওটা, পুরোহিতজি?' শান্তভাবে জানতে চাইলো বিদ্যুৎ। তার মুখ পুরোপুরি শুকনো।

'ওটা আমাদের গুরুর ভেতরে স্থান নেওয়া এক ব্রহ্ম-রাক্ষস ছিলো, বিদ্যুৎ। আর সে নিজের ইচ্ছায় গুরুদেবের শরীরে আসেনি। খুবই অস্বাভাবিক রকমের শক্তিশালী দুই অশুভ, প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মার আক্রমণের বিরুদ্ধে শেষ অস্ত্র হিসেবে দ্বারকা শাস্ত্রীজি তাকে নিজের শরীরে ডেকে এনেছিলেন।'

ঘরটায় একটা লম্বা নীরবতা নেমে এলো। শেষ পর্যন্ত পুরোহিতজিই মুখ খুললেন। 'আচমকা আকাশ পরিষ্কার হওয়া আর দ্বারকা শাস্ত্রীজির মাটিতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ার আগে আমরা তার ত্রিশূল ওঠানোর শব্দ শুনেছিলাম। তার জ্বলজ্বলে নীল চোখ রক্তলাল হয়ে যায়। এই দুই লাইন তিনি চিৎকার করে বলেন...'

পুরোহিতজি এখন প্রাণবন্ত, চেষ্টা করছেন জমানোর শেষ মুহূর্তটা আবার তৈরি করতে। তার চোখে ভয় স্পষ্ট, দুই হাত উপরে উঠিয়ে মাথাটা খানিক পেছনে নিলেন, আর এমন কিছু শব্দ চিৎকার করে বললেন যে ভাষায় বিদ্যুৎ আগে কখনোই তাকে কথা বলতে শোনেনি।

'ইউ ও বাণি দা সিদাদে সাগ্রাদা, আগোসতিনহো!
ইউ ও বাণো দেসসা তেররা সাগ্রাদা, ক্রিস্তোভাও!'

বিদ্যুৎ এই লাইনগুলোর কোনো অর্থ বুঝতে পারলো না, কিন্তু সে জানতো এটা অশুভ কোনো বার্তা। আর তার মনে হলো, এটা হয়তো পর্তুগিজ ভাষা হবে।

'এই লাইনগুলোর অর্থ কী, পুরোহিতজি?' জানতে চাইলো বিদ্যুৎ, এখন দুশ্চিন্তায় তার মাথা প্রায় ঘুরছে।

পুরোজিতজি নির্বিকারভাবে উত্তর দিলেন, 'বিদ্যুৎ, এর মানে দাঁড়ায় অনেকটা এমন:

'আমি তোমাকে এই পবিত্র শহর থেকে তাড়িয়ে দেবো, আগোসতিনহো!
আমি এই পুণ্যভূমি থেকে তোমাকে দূর করবো, ক্রিস্তোভাও!'

ষোড়শ শতকের গোয়া ইনকুইজিশনের পর্তুগিজ দস্যুরা ফিরে এসেছে। দুই নৃশংস জল্লাদ, যারা বিদ্যুৎ আর দ্বারকা শাস্ত্রীর পূর্বপুরুষ, মহান মার্কন্ডেয় শাস্ত্রীকে খুন করেছিলো, তাদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

সত্যি বলতে, তারা কখনো পুরোপুরি ফিরে যায়নি।

বিথিনিয়ান শহর (আধুনিক তুরস্ক), ৩২৫ খ্রিস্টাব্দ
দ্য কাউন্সিল অব নিসিয়া

বাঁধায় হুড দেওয়া যাজকটা ফিসফিস করে বললো, 'নন *লেসিয়ারে* কোয়েস্তো আকাদা, ইম্পিরেটোরে! এমনটা যেন না ঘটে, *সম্রাট!*'

পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাজার জমকালো *ঘোড়ার পাশে হাঁটতে* হাঁটতে অদ্বৈত শাস্ত্রী মিনতি করে বললেন কথাটা। তিনি জানতেন *এইমাত্র শেষ* হওয়া তিনশো খ্রিষ্টান যাজকের মূল বৈঠকে যেসব *দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে* পারে, তা এই সর্বশক্তিমান রাজা পুরোপুরি বুঝে উঠতে *পারেননি।*

'তোমাকে আটক করার আগেই বরং এখান থেকে দূর হও,' *মজা করেই* কথাটা বললেন সম্রাট। তিনি কিছু সময় আগেই জয় করে আসা *রাজ্যটায়* জনসাধারণের উল্লাসের দিকে ইঙ্গিত করলেন। মানুষের *অস্থিরতা আর পশুর* মতো মানসিকতা দেখে তিনি না হেসে পারলেন না।

তারা একজন মাত্র শাসকের অধীনে থাকার জন্যই জন্মেছে। *একটা মাত্র* আইনের অধীনে। একক আদেশের অধীনে।

অদ্বৈত ছিলেন বন্ধুর মতো, আর এমন একজন যাকে সম্রাট *খুবই সমাদর* করেন। 'আমার তাঁবুতে এসে আমার সাথে দেখা কোরো, *হে অধৈর্য বালক,*'

মুখে বাঁকা হাসি এনে কমবয়সি বন্ধুর উদ্দেশে বললেন কথাটা। তারা এখন হিন্দুকুশ পর্বতমালার বহু দূরের সমতল ভূমিতে আছে। সম্রাটকে দেখে সমীহ জাগানো মনে হয়।

কনস্ট্যান্টিন দ্য গ্রেট আসলেই সময়ের চেয়ে বেশ এগিয়ে থাকা একজন মানুষ ছিলেন।

* * * * *

তার দৃষ্টিতে সন্দেহের ছিটেফোঁটা নেই, যেন তাকে পৃথিবীতে পাঠানোই হয়েছে শাসন করার জন্য। নিজের অলংকৃত চেয়ারের পায়ার উপর পা তুলে বসে আছেন কনস্ট্যান্টিন, এখনো তার সোনালি বর্মে সজ্জিত। তার শক্তিশালী চোয়াল, তীক্ষ্ণ নাক আর কোঁকড়ানো চুল দেখে মনে হয়, যেন মেসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার আবার জন্ম নিয়েছেন।

সম্ভবত তিনি তাই ছিলেন।

রাজকীয় আসনে প্রবেশ করলেন অদ্বৈত। কনস্ট্যান্টিনের রাজকীয় এই অস্থায়ী আবাসের সাজসজ্জা ছিলো কল্পনাতীত। চুনি, হীরা আর পান্নাখচিত এই তাঁবু এক অর্থে সম্পদ আর ক্ষমতার একটা ছাতা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের শক্তিশালী হাতে স্বর্ণের কাপভরতি মদ নিয়ে সেখানে বসে আছেন কনস্ট্যান্টিন। তিনি ছিলেন জন্মগত এক শক্তি।

অদ্বৈতকে স্বাগত জানাতে উঠে দাঁড়ালেন সম্রাট, সেই সাথে উঠে দাঁড়ালো তার পুরো রাজসভাসদ। কারো দিকে না তাকিয়েই দুই আঙুলের ছোট্ট ইশারায় তাদের সবাইকে বসার ইঙ্গিত দিলেন তিনি। তার রাজসভার লোকেরা জানতো, কনস্ট্যান্টিন নিয়মিত তার বিশাল এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের জাদুকর, যাজক, বড় বড় যোদ্ধা, জলদস্যু আর জ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তবে তারা সবাই অবাক হলো, যখন দেখতে পেল এই মহান দিগ্‌বিজয়ী মানুষটি এই রহস্যময় যুবককে বহু দিনের চেনা বন্ধুর মতো করে জড়িয়ে ধরেছেন।

রাজা আর হুড-পরা এই দর্শনার্থীর আন্তরিকতা বুঝতে পেরে রাজসভার পানীয় পরিবেশনকারী অতিথির উদ্দেশে চমৎকার মদভরতি সোনালি কাপ নিয়ে এগিয়ে গেল। ঠিক এই পানীয়টাই কনস্ট্যান্টিন আর তার রাজসভার সবাই উপভোগ করছিলো।

'আমার এই শক্তিশালী কিন্তু হতাশ বন্ধুটি কোনো প্রকার মদ পান করে না,' পানীয় পরিবেশনকারীকে পেছনে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে কৌতুকমাখা হাসি

দিয়ে কথাটা বললেন কনস্ট্যান্টিন। নিজের প্রতিটা পদক্ষেপেই তিনি নিরেট ক্ষমতার প্রদর্শনী করে চলেন।

'আর সে মাংসও খায় না!' রাজসভার দিকে ঘুরে সম্রাট তার কথা চালিয়ে গেলেন। 'তবে আমি তোমাদের নিশ্চিত করতে পারি সে আগুয়ান এক ষাঁড়কে কেবল শিং ধরে পেছনে ঠেলতে সক্ষম, সেই সাথে দুই মাইল দূর থেকেও ঠিক লক্ষ্যে তীর ছুঁড়তে সিদ্ধহস্ত।'

এবার তিনি অদ্বৈতের দিকে ফিরলেন। দুই হাত তার বন্ধুর কাঁধে রাখা। কনস্ট্যান্টিন বলে চললেন, 'আরেকটা বিষয়। আমাদের আর যে-কারো তুলনায় সে ঈশ্বরের অনেক কাছাকাছি থাকে।' রাজার নম্র কণ্ঠে তখন শ্রদ্ধা আর মমতা মিশে আছে।

'মহান কনস্ট্যান্টিন, আপনি অনেক দয়ালু আর মহান,' মহান শাসকের প্রতি সম্মান দেখিয়ে মাথার উপরের কাপড় সরিয়ে নিতে নিতে বললেন সেই অতিথি। তাঁবুর ভেতরে থাকা সবাইকে দুটো বিষয় একেবারে অবাক করে দিলো; তরুণ অতিথির অস্বাভাবিক সুদর্শন মুখশ্রী আর মহান কনস্ট্যান্টিনকে তিনি যেভাবে নাম ধরে ডাকার সাহস করলেন তা।

* * * * *

তারা এখন রাজার ব্যক্তিগত কুটিরে আছে। যে বিষয়টি নিয়ে দুজন কথা বলছে, সেটা পুরো পৃথিবীর ভাগ্যকে আজীবনের জন্য পরিবর্তন করে দিতে চলেছে।

কনস্ট্যান্টিন তার বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের খ্রিষ্টান যাজকদের এক মিলনমেলা হিসেবে কাউন্সিল অব নিসিয়ার ডাক দিয়েছিলেন। ধর্মীয় বিবাদ এবং নৃশংসতা বিগত তিনশো বছর ধরে রোমান সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে চলেছে। বিভিন্ন দল আর ধর্মপ্রচারকদের উপর নির্মম আগ্রাসন খ্রিষ্টান ধর্মকেই কেবল শক্তিশালী করেছে। সম্রাট তার উপনিবেশগুলোকে আরো দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে একের পর এক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। আর এখন সকল ধর্মের বৈসাদৃশ্য দূর করতে তিনি দৃঢ়সংকল্প। যার শুরুটা করেছেন স্বয়ং খ্রিষ্টান ধর্মের মাঝেই বিভিন্ন বিরোধী পক্ষের মধ্যে। প্রসঙ্গটা যখন বিশ্বাস এবং দর্শনের, তখন তিনি সবাইকে একই পাতায় আনতে চেয়েছেন।

কিন্তু কনস্ট্যান্টিনের আরো গভীর পরিকল্পনা রয়েছে। মূল কাউন্সিল আরেকটা বন্ধ দরজার ভেতরে থাকা অন্য একটা ছোট দলকে কেবল অনুসরণ করেছে। এখানেই কনস্ট্যান্টিন তার পরিকল্পনা নিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের যাজক.

সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ আর উপদেষ্টার সাথে আলাপ করছেন। এ এমন এক বৈশ্বিক পরিকল্পনা যা যখন তিনি থাকবেন না তখনকার সময়ও টিকে থাকবে।

তিনি বিশ্বকে এমন এক নিরাপদ অবস্থায় রেখে যেতে চান, যা অনন্তকাল পর্যন্ত এক সরকারি এবং সামাজিক নিয়ম জারি করবে বলেই তার বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস এবং মতামতের ভিন্নতাই মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। কয়েক দশকের যুদ্ধ, রক্তক্ষয় আর বিজয় অর্জন শেষে বিভিন্ন সংস্কৃতি আর সভ্যতার মানুষকে শাসন করে আর মানুষের সহজাত হিংসাত্মক ধারাকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার পর কনস্ট্যান্টিন একটা শক্ত মতবাদ দাঁড় করালেন। এই পৃথিবীর আসলে একক শক্তি, মানে অদ্বিতীয় এক শক্তিশালী ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত হওয়া দরকার। যা সকল সীমানা অতিক্রম করবে, সেই সাথে বিতর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট ঈশ্বর আর লোভী ব্যক্তিদের থেকে দূরে রাখবে। এর সবই এক মহান এবং স্থায়ী শাসনের অধীনে পরিচালিত হবে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার।

* * * * *

'কিন্তু এটাই এই সমাবেশের মূল লক্ষ্য না, মহান রাজা!' জোর দিলেন অদ্বৈত। 'আপনি আমাকে এটা বলে ডেকে পাঠিয়েছেন যে পুরোহিত দলগুলোকে একত্র করার ক্ষেত্রে আপনাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাকে প্রয়োজন।'

'তো অদ্বৈত, তোমার মনে হয় আমি এই মহান উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা তোমাকে অন্য কারো মাধ্যমে জানাবো?' উত্তর দিলেন কনস্ট্যান্টিন। তিনি হাতির দাঁত এবং স্বর্ণে নির্মিত স্তম্ভের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো। হীরাখচিত এক খালি কাপ হাতের আঙুলে ঘোরাচ্ছেন।

শ্বাস ছাড়লেন অদ্বৈত। 'আমাকে আবার বলুন, মহারাজ, আপনার মহান পরিকল্পনা কী ফলাফল নিয়ে আসবে?'

এক কি দুই সেকেন্ডের মতো চুপ রইলেন কনস্ট্যান্টিন, কিন্তু তার চোখেমুখে এক গভীর আশাব্যঞ্জক ভাব ফুটে উঠেছে। হাতের কাপটা একপাশে সরিয়ে রেখে অদ্বৈতের মুখোমুখি বসতে চাকচিক্যময় একটা টুল নিয়ে এলেন।

'বন্ধু আমার, তুমি কি দেখছো না, মানুষ এখন একে অন্যকে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি হত্যা করছে? একে অন্যকে ঘৃণা করা বা খুন করার জন্য মানুষের নৃশংসতা প্রতিদিনই নতুন নতুন কোনো এক অজুহাত খুঁজে নেয়। তারা

ঈশ্বরের নামে পরস্পরকে খুন করে, খুন করে বিশ্বাসের নামে, দেশপ্রেম আর ধর্মবিশ্বাসের নামে, ভূমি আর সম্পদের নামে...এসব কিছু আসলে এসব উচ্চাভিলাসী, অসৎ মানুষের অতৃপ্ত রক্তপিপাসাকেই পূর্ণ করে। লাখ লাখ নিষ্পাপ মানুষের রক্ত ঝরে কেবল একজনের সিংহাসনের আরোহণের নেশায়।'

'মহারাজ, আপনি নিজেও কি বছরের পর বছর যুদ্ধ করে, পরাজিত করে, হাজারো মানুষকে হত্যা করে আজকের এই পর্যায়ে আসেননি?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন অদ্বৈত। তিনি কনস্ট্যান্টিনকে সম্মান করেন। কিন্তু এমন এক রাজাকে সাধারণ মানুষের অনৈতিক আচরণ নিয়ে নীতিকথা বলতে দিতে রাজি না, যে কিনা নিজেই তরবারির সাহায্যে শাসন করে।

'আমি জানতাম তুমি এই দিকে ইঙ্গিত করবে,' কোনোরকম বিরক্তির ভাব না এনেই কথাটা বললেন কনস্ট্যান্টিন। 'হ্যাঁ, আমি বছরের পর বছর ধরে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের বিনাশ করে দিয়েছি। যে কারণে হিংস্রতা এবং দখল করার অসাড়তা অন্য কারো চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশি পরিষ্কার। আর আমাকে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে, যেন এই পৃথিবীকে এমন এক অবস্থায় রেখে যেতে পারি, যেটা আমি জন্মের পর যেমন পেয়েছিলাম, তার থেকেও উত্তম। আমরা যদি সবকিছু যেমন আছে, ঠিক তেমনই চলতে দেই, তবে সেই দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন নিজেদের হাতেই আমরা আমাদের ধ্বংস দেখতে পাবো। আর আমি, প্রথম কনস্ট্যান্টিন, এটা হতে দেবো না।'

'আপনার পরিকল্পনা মহৎ, মহারাজ। কিন্তু আপনি যেসব আদেশ জারি করতে চেয়েছেন, সেটা লক্ষ্য অর্জনের পথ না। মানুষ কোনো ভেড়া না। তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া সম্ভব না। আপনি তাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আপনি দমন করতে পারবেন না।'

'অবশ্যই পারবো!' জোর দিয়ে বললেন কনস্ট্যান্টিন। তার মাঝে অস্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসের ছাপ দেখা যাচ্ছে। 'তুমি কি দেখলে না, হাজারো মানুষ আমার উপর ফুল ছিটিয়ে দিচ্ছে? এরা তো সেই মানুষ, যাদের শহর বা বাড়ি আমি কদিন আগেই জ্বালিয়ে দিয়েছি। আর আজ, তারা আমাকে দেখে মাথা নত করে। তারা আমাকে ঘিরে উৎসব করে। অদ্বৈত, তুমি কি বুঝতে পারছো না যে মানুষ পরিবর্তিত হয়, তাদেরকে শাসন করা যায়?'

সম্রাট উঠে দাঁড়ালেন, গভীর চিন্তা আর উত্তেজনায় পুরো তাঁবু জুড়ে দ্রুত হাঁটাচলা করছেন। অদ্বৈত খেয়াল করলেন, কনস্ট্যান্টিন তার শক্তিশালী মুষ্টি দিয়ে তলোয়ারের হাতল চেপে ধরেছেন। দিগ্‌বিজয়ী এই সম্রাটের মন এখন অশান্ত। কয়েক মুহূর্ত পর সম্রাট আবারো আর্যাবর্ত থেকে আগত এই যোদ্ধা-যাজকের মুখোমুখি হয়ে বসে পড়লেন।

'কল্পনা করে দেখো, অদ্বৈত...যুদ্ধ ছাড়া একটা পৃথিবী। কোনোরকম সহিংসতা ছাড়াই একটা পৃথিবী। এক বৈশ্বিক, একক ধর্মবিশ্বাস, ধর্মের দাসত্ব থেকে যা পুরোপুরি মুক্ত, রাষ্ট্রগুলোর বিভাজন থেকে যা পুরোপুরি স্বাধীন...'

সম্রাটের চোখ এখন অদ্বৈতের চেয়েও দূরে কোথাও। ওটা এক দার্শনিকের চোখ, যিনি বিশ্বাস করেন তিনি পুরো বিশ্বকে পরিবর্তন করতে সক্ষম।

কিন্তু সত্যিটা হলো, এইবার সম্রাট একটা ভুল করতে যাচ্ছেন। খুব বড় রকমের এক ভুল।

* * * * *

রাজকীয় তাঁবুতে ভোরের প্রথম আলো অদ্বৈতকে বাড়ির ফেরার লম্বা পথের কথা মনে করিয়ে দিলো। পুরো একটা রাত তর্ক করার পর অদ্বৈত নিশ্চিত হলেন, মানব জাতির জন্য কনস্ট্যান্টিনের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কোনোভাবেই আটকানো সম্ভব না। যে মানুষ এটা চিন্তা করে, সে ঈশ্বরের মতোই সর্বশক্তিমান হতে শুরু করেছে। তাকে থামানো অসম্ভব।

'আপনার পরিকল্পনা অতি বিপজ্জনক। এটা খুব অল্প কিছু মানুষের হাতে অসামান্য ক্ষমতা প্রদান করবে। আর তারা যদি অসৎ হয়, তবে পৃথিবীতে সবচেয়ে মন্দ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে।'

সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন কনস্ট্যান্টিন। তিনি তার বন্ধুর দিকে এগিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত রাখলেন।

'এজন্যই আমি তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি, আমার প্রিয় বন্ধু। যদি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার তার মহান উদ্দেশ্য থেকে সরে যায়, তবে তোমার জাতিই একমাত্র তা ঠেকাতে সক্ষম। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তোমরাই হবে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান গোপনীয়তার রক্ষক। আমি জানি, তুমি এই আদেশ রক্ষা করতে পারবে।'

অদ্বৈত মহান রাজাকে বিদায় জানালেন। যখনই সম্রাটের তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাবেন, তখনই আবার ফিরে তাকালেন তিনি।

'সম্রাট, আপনি পৃথিবীর অল্প কিছু মানুষের একজন, যারা কালো মন্দিরের রহস্য নিয়ে জানে। আপনি জানেন, এটা ঠিক কী রক্ষা করে। তাহলে কেন?'

'হ্যাঁ, আমি জানি,' কনস্ট্যান্টিন উত্তর দিলেন। 'এজন্যই একজন নিবেদিত সেবকের যা দরকার তা আমি করতে যাচ্ছি।'

হরপ্পার পূর্বে, খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

মা...

মৎস্য-মানব, যে নিজেকে মৎস্য বলে পরিচয় দিলো, তার দেওয়া নির্দেশ মেনেই মানু পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করে। প্রচণ্ড ভালোবাসা আর যত্ন নিয়ে আগলে রাখা তার মায়ের দেহটা তখনো সাথেই ছিলো। মানু বুঝতে পারছে, এই অদ্ভুত, স্বর্গীয় মানুষের উপস্থিতিতে সে ঠিক ততটাই সতেজ অনুভব করছে, যেমনটা ঠান্ডা ঝরনার পানিতে গোসলের পর অনুভব করা যায়।

ও আজ অন্তত মরবে না।

আর তার অর্থ, প্রতিশোধ নেওয়ার আরো একটা সুযোগ সে পাবে। বর্তমান দায়িত্ববোধের ভাবনা মাথা থেকে না সরিয়েই মানু তার প্রতিশোধের স্পৃহা নিজের ভেতরে জিইয়ে রেখেছে।

আমি পণ্ডিত চন্দ্রধর আর প্রিয়ংবদাকে ঠিক সেভাবে হত্যা করবো, ঠিক যেভাবে আমি ঐ অসৎ রাঙাকে খুন করেছিলাম।

* * * * *

আবারো ঘন্টার পর ঘণ্টা ঘোড়ায় চড়তে শুরু করেছে সে। চারপাশের ধুলোময় প্রান্তরের মাঝে কোনো কিছু না পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কেবল পার্থক্য, এবার সে কোনো প্রকার হতাশার আশেপাশেও নেই। কিছু একটা তাকে বলছে, যদি মৎস্য তাকে কোনো দিক বলে থাকি, সেটা অবশ্যই সঠিক হবে।

আরো একটা ঘণ্টা কেটে গেল। দিগন্তে ধূসর পাহাড়ের ঝাপসা রেখা দেখতে পাচ্ছে মানু। দূরত্বটা কয়েক মাইলের বেশি হবে না। পাহাড়ের মানে হতে পারে খাবার, পানি আর সর্বোপরি...মন্দির।

উঁচু পাহাড়ের যতই কাছে যাচ্ছে, ততই মানু বুঝতে শুরু করেছে এই ভূমিতে সে যতখানি উঁচু ঢিবি খুঁজে পাবে ভেবেছিলো, আদতে ঢিবিগুলো তার চেয়েও উঁচু। এই পাহাড়ের যা উচ্চতা, তাতে সে যেখান থেকে লক্ষ করেছে, তারও আগে পর্বতশ্রেণি নজরে আসার কথা ছিলো। সে বুঝতে পারলো, সতেজ, অস্বাভাবিক বৃষ্টিই পাহাড়কে তার নজরে নিয়ে এসেছে। সাধারণ কোনো দিনে এই অর্ধ-বালুময় জমিতে, যেখানে বৃষ্টি রীতিমতো দুর্লভ, সেখানে এই পর্বতশ্রেণি প্রায় অদৃশ্যই থেকে যেত। ধুলোর কুয়াশা আর উত্তপ্ত পৃথিবী থেকে উঠে আসা তাপ পর্বতশ্রেণিকে এক প্রাকৃতিক পর্দার আড়ালে ঢেকে রেখেছে।

দূর থেকে মানু দেখতে পেল, নারী আর পুরুষের একটা দল ঠিক তার দিকেই এগিয়ে আসছে। ওরা আরো কাছে এগিয়ে এলে মানু চারজনকে দেখতে পেল। এরা ছোট একটা বিছানা নিয়ে আসছে, যা সাধারণত মৃতদের জন্য ব্যবহৃত হয়।

তাদের প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র আছে। নারী-পুরুষ প্রত্যেককে দেখেই মনে হয় তারা খুবই সুঠাম দেহের আর যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাদের ঘোড়ায় চড়া আর পেশিবহুল শরীর দেখেই মানু তা বুঝতে পারছে। এরপরেও তাদের তামাটে, উজ্জ্বল মুখের মাঝে সারল্য আর মমতার ছাপ পাওয়া যায়।

মানুষগুলো আসলে কে?

মানুর দ্রুত গতির ঘোড়া এখন ধীরকদমে চলছে। সে দেখলো, কালো আলখাল্লা-পরা এসব মানুষ ধীরে ধীরে তাকে ঘিরে ফেলেছে। ওদের নিয়ে কোনো ভয় পাচ্ছে না সে। এক দক্ষ যোদ্ধা হিসেবে মানুর মাঝে একজন সৈনিকের সহজাত মনমানসিকতা ছিলো। সে বেশ দূর থেকেই প্রতিকূলতা অনুভব করতে পারে। এখানে সে তা দেখতে পাচ্ছে না।

অবিকল তার মায়ের মতোই সুন্দর মুখের এক বৃদ্ধা তার দিকে এগিয়ে এলেন। তার চুল তুষারের মতো সাদা, নীল চোখ, খাড়া নাক আর আচরণে অস্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসের ছাপ। পরনের ঢেউ-খেলানো কালো আলখাল্লা বৃষ্টিভেজা বাতাসে উড়ছে। বয়স সম্ভবত আশি বছরের কাছাকাছি হবে বা তারও বেশি। কিন্তু তিনি এমনভাবে হাঁটছিলেন আর কথা বলছিলেন যেন বয়সটা তার অর্ধেক।

'স্বাগত, মানু,' শান্ত কণ্ঠে বললেন তিনি। 'সানজানার দায়িত্ব এখন আমাদের নিতে দাও।'

নিজের অজান্তেই বিশ্বাস করা যায়, এমন একজনের সাক্ষাৎ পেয়ে মানু রীতিমতো অভিভূত হয়ে গেল। সে ক্লান্ত, আহত, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, সেই সাথে ঘৃণার আগুনে পুড়ছিলো। কৃতজ্ঞতায় মাথা নোয়াতেই কান্নায় ভেঙে পড়লো সূর্যপুত্র। ওরা তার মাকে যখন সেই ছোট বিছানায় রাখছে, তখনো সে কেঁদে চলেছে।

ঘোড়া থেকে নামলো সে, নিচু হয়ে সানজানার মুখে বারবার চুমু দিলো। 'মা। আমার মা। আমার প্রিয় মা। আমি শীঘ্রই তোমার কাছে আসবো। মা...ভয় পেও না, মা। আমি দ্রুতই তোমার সাথে যোগ দেবো, মা...মা...আমার মা...' সে বারবার এই কথাগুলোই বলে যাচ্ছিলো।

ওরা তাকে তুলে নিতেই সে বুঝতে পারলো, শেষবারের মতো সে তার মায়ের মুখ দেখছে। 'মাআআআ...!' মানু চিৎকার করে হাঁটুতে ভর করে বসে পড়লো। মুখ থুবড়ে কপাল রুক্ষ মাটি স্পর্শ করার আগ পর্যন্ত পড়তে থাকলো সে। প্রচণ্ড রাগে বারবার দুই হাত মাটিতে দিয়ে চাপড় মারছে। শেষকৃত্যের জন্য ওরা তার মাকে নিয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুর পরেও সানজানা তার ছেলের পাশ থেকে যায়নি।

কিন্তু এবার সত্যি সত্যিই তাকে চলে যেতে হচ্ছে।

* * * * *

দুই দিন আগে নিজের সৈনিকের মাথায় তীর ঢুকতে দেখার আগে সোমদত্তের তাঁবুতে খাওয়া কয়েক মুঠো ভাতের পর এবারই প্রথম খেতে বসেছে সে। মানু খুব ধীরে ধীরে হাত উপরে তুলে ভাত আর সবজি মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। টিকে থাকার জন্য যতখানি দরকার, সে কেবল অতটুকুই খাচ্ছে।

মানুর ধূসর দেয়ালের হালকা আলোর গুহাটায় প্রবেশ করলেন সাদা চুলের সেই নম্র মহিলা। দিনে যতখানি গরম ছিলো, এই শুষ্ক, পাহাড়ি এলাকা রাতের বেলায় ঠিক ততটাই ঠান্ডা। মানু একটা ছোট আগুনের পাশে নিজেকে বিশ্রাম দিচ্ছে। এই রহস্যময় এলাকার চিকিৎসক সারা দিনই সেবা করেছে তার।

মানু যে এখনো বেঁচে আছে, এটাই ছিলো আশ্চর্যের। সে যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসেছে, সেখানকার কেউই কল্পনাও করতে পারেনি, দেহের ভেতরে ঢুকে যাওয়া তিনটা তীর আর তলোয়ারের একটা মোক্ষম আঘাতের পরেও সে আরেকটা দিন দেখার জন্য বেঁচে থাকবে। মনে হচ্ছে, কোনো এক অজ্ঞাত শক্তি বিভাষণ পূজারি আর সানজানার পুত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

* * * * *

মহিলা তাকে নিজ হাতে খাইয়ে দিলেন, ঠিক যেমনটা আঠারো বছর বয়সে এসেও তার মা করতেন। তিনি তার মাথা টিপে দিলেন, সেখানে এখন কিছুটা চুল গজাতে শুরু করেছে। একজন মায়ের মতো মমতামাখা নজরে তার দিকে

তাকিয়ে আছেন ভদ্রমহিলা। মানু যখন কৃতজ্ঞতাভরে জানালো যে আপাতত তার যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়েছে, তিনি ভাতের বাটি দূরে সরিয়ে রাখলেন।

'তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার, বাবা,' যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আদুরে গলায় বললেন সেই সুন্দর চেহারার বৃদ্ধা মহিলা। 'আগামী কাল আমি তোমাকে কালো মন্দিরে নিয়ে যাবো।'

'আপনাকে ধন্যবাদ, সবকিছুর জন্যে...' বললো মানু। এর আগে সে কখনোই কারো প্রতি এতটা কৃতজ্ঞতা বোধ করেনি। তার মায়ের দাহ সনাতন ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী কঠোরভাবে আচার-অনুষ্ঠান মেনেই পালন করা হয়েছে। আর এটাই তার কাছে ছিলো মুখ্য বিষয়।

মহিলা হাসলেন। 'এখন বিশ্রাম নাও, মানু।' গুহা থেকে বের হওয়ার রাস্তার দিকে ফিরলেন তিনি।

'মা আমার...' ডাকলো মানু।

ঘুরলেন তিনি। 'বলো, বাবা?'

'আপনি আমার নাম কী করে জানেন? আর কীভাবে জানলেন যে আমার মায়ের নাম সানজানা? আমি তো আপনাকে কখনোই বলিনি,' জানতে চাইলো মানু।

শান্ত সেই ধর্মমাতা মুচকি হাসলেন।

'আমাদের বন্ধু মৎস্য আমাদের জানিয়েছে,' শান্ত স্বরে জানালেন তিনি।

মানু অবাক হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, তার সাথে দেখা হয়েছে। কিন্তু কীভাবে...তিনি কীভাবে আমার আগেই আপনার কাছে এসে পৌঁছালেন?' জানতে চাইলো সে। 'আমি চড়েছি ঘোড়ায় আর তিনি কেবল হেঁটেছেন। আমি এই ধূসর পাহাড় ধরে সোজাসুজি এগিয়েছি। তিনি কোনোভাবেই আমার আগে এখানে আসতে পারেন না!'

মহিলা হাসলেন। এরপর মানুর কাছে হেঁটে এসে আদর করে তার চিবুক ধরলেন। 'মৎস্যকে কারো কাছে পৌঁছাতে হয় না, মানু।'

'দুঃখিত, আমি বুঝতে পারিনি, মা...' মহিলার স্নিগ্ধ চেহারার দিকে তাকিয়ে বললো মানু।

স্নেহপূর্ণ হাসি দিয়ে আবারো বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন তিনি। গুহা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দরজায় এসে তিনি মানুর দিকে ফিরলেন। 'মৎস্যকে কোথাও পৌঁছাতে হয় না কারণ তিনি সবখানেই আছেন, মানু।'

বানারস, ২০১৭

সাদা আলখাল্লা-পরা সেই মানুষগুলো

আমি ওকে খুন করবো, রাগে গজরাতে গজরাতে বললো সনু।

বিদ্যুৎ ঠিক এই মুহূর্তটার অপেক্ষাই করছিলো। প্রথমে তার নিজের জীবনের জন্য লড়াই, এরপর হাসপাতালের বিছানায় পড়ে থাকা, এর মাঝেও বিদ্যুৎ কেবল ভাবছিলো তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুর জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার কথা। তার জানা দরকার, বালা কেন তার সাথে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাকে জানতে হবে, তাদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে, সেটার সাথে বালার কী সম্পর্ক।

* * * * *

ধাক্কা দিয়ে মঠের বন্দিশালার ভারী দরজাটা খুললো বলভান্ত।

বিদ্যুৎ এখনো মারাত্মক আঘাত থেকে সেরে উঠছে। ধীরে ধীরে খুঁড়িয়ে হেঁটে সে অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলো।

শব্দ করে মাথার উপরের একটা বাতির সুইচ চাপ দিলো সনু। চোখধাঁধানো সাদা আলোয় কালো ঘরটার একটা অংশ আলোকিত করলো সেই বাতিটা। উজ্জ্বল সেই বাতির নিচে একজন মানুষ বসে আছে। ধাতব চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। এই প্রতিকূল আর বন্দি অবস্থার মাঝেও তাকে দেখে মনে হলো সে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। তবে সেটা সাধারণ কোনো যোগ আসনের ভিত্তিতে না। বরং সে যেভাবে বেদির উপর দাঁড়িয়েছে...তার আঙুলগুলো সব একত্রে জড়ো করে রাখা, প্রতিটা আঙুল আরেকটার সাথে লাগানো। তার মাথা শ্রদ্ধা জানানোর ভঙ্গিতে নামানো।

বিদ্যুৎ এর আগে কখনো এমনটা দেখেনি। যে কয়টা বছর তারা দুজন ভাইয়ের মতো একে অন্যের মিশেছে, আনন্দ করেছে, সে কখনোই বালাকে ধ্যান করতে দেখেনি।

কে এই মানুষটা?

'আমি ওর মুখটাকে একদম ভর্তা বানিয়ে দেবো!' বন্দি মানুষটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো সনু। কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেল সে। আচমকা বালা তার জ্বলজ্বলে চোখ খুলে সনুর দিকে তাকালো। কমবয়সি ছেলের উৎসাহে ভাটা ফেলার জন্য অতটুকুই যথেষ্ট ছিলো। একটা বন্দি বাঘের 'আমি তোমাকে দেখছি' মনোভাবের নজরের চেয়ে হিমশীতল অনুভূতি খুব কমই আছে।

বিদ্যুৎ বালার দিকে এগিয়ে গেল। লোহার টেবিলের বিপরীতে থাকা চেয়ারটায় বসলো সে। দুই পুরাতন বন্ধু, দুই ভাইয়ের মতো যারা একে অন্যের সাথে থাকতো, যেই জুটিকে দেখে মনে হতো, তারা পুরো পৃথিবী জয় করতে পারবে, সেই দুজন এখন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে।

* * * * *

'কেন, বালা?' প্রশ্ন করলো বিদ্যুৎ। বালা কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিদ্যুতের ন্যায়পরায়ণ চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো, আর তারপরেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। এটা সেই পরিচিত, প্রাণবন্ত হাসি যেটা বিদ্যুৎ বিগত বছরগুলোতে খুবই ভালোবাসতো। কেবল এবার এ এক অস্বস্তিকর হাসি হিসেবে ধরা দিলো ওর কাছে।

নিজেকে গুছিয়ে নিতে বালার প্রায় এক মিনিট সময় লাগলো। সে যেমন বিভ্রান্তিকর আচরণ করছিলো, তাতে মনে হচ্ছিলো সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে, যদিও এটা পুরোপুরি অপ্রীতিকর। অথবা, সম্ভবত, তার আসল চরিত্র এমনই ছিলো।

'কেন, বালা? তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে কেন?' আবার জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ। এমন পাগলামি আচরণে একেবারেই অপ্রস্তুত না সে।

'কী বললে? তুমি কি এইমাত্র বললে যে আমি তোমাকে খুন করতে চেয়েছি?' কিছুটা তুচ্ছ করেই বললো বালা। বিস্ময়ে তার ভ্রু উঁচু হয়ে আছে।

বিদ্যুৎ নীরব রইলো। সে জানতো, ওকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে।

'তুমি কে, বিদ্যুৎ? তুমি কি ঈশ্বর? নাকি তুমি দেবতা? তুমি কি নিষ্পাপ বাচ্চা নাকি দুষ্ট জাদুকর?' নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে হিসহিস করে বললো বালা। ঘাটে ন্যায়না যখন তাকে হারিয়ে দিয়েছিলো, তখন তার চোখে যে ঠান্ডা প্রতিহিংসা দেখেছিলো, সেই দৃষ্টি আবাব ফিরে এসেছে।

'আমি তোমাকে খুন করতে চেয়েছি, বিদ্যুৎ? আমি খুন করতে চেয়েছি? একজন দক্ষ তীরন্দাজ, যে কিনা দুইশো মিটার দূর থেকে একটা কবুতর শিকার করতে পারে, এক মাইল দূর থেকে শত্রুর মাথা খুঁজে নিতে সক্ষম, একজন নির্ভুল লক্ষ্যভেদী, যে কখনোই লক্ষ্যচ্যুত হয়নি, সে কিনা তোমাকে ৮ ফুট দূর থেকে মিস করে গেল? আর তুমি বলতে চাইছো, আমি তোমাকে খুন করতে চেয়েছি?'

কথাটা সে ভুল বলেনি। আর বিদ্যুৎ এটা জানতো। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে লক্ষ্য মিস করার মতো মানুষ বালা না। সে একজন প্রশিক্ষিত কমান্ডো, এমন এক স্তরের যার শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা হয় না। প্রায় সাথে সাথেই বিদ্যুতের এক বিস্ময়কর উপলব্ধি হলো। বালা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যুৎকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

'কেবল আমিই না,' গর্জে উঠলো বালা, 'রুমি পর্যন্ত তোমাকে সেই প্রতিশ্রুত সময়ের আগে খুন করতো না। ঐ জিপ্সো লাইটারে সে ঠিক ততখানি পারদ জ্বালানি দিয়েছিলো, যতটায় তোমাকে আহত করা যায়। ভাড়াটে খুনির দল তোমার অঙ্গহানি ঘটাতে চেয়েছিলো, যদিও তারা তা পারেনি, তবে তাদের উপরেও কঠোর নির্দেশনা ছিলো যে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, হে দেবতা! এবার আমাকে খানিক রাম দাও, ভিডিও...'

বন্দির মুখ থেকে এমন উদ্ভট আবদারে অন্ধকার ঘরে থাকা সব মঠ সদস্য ক্ষেপে গেছে।

'আমাকে খানিক রাম দাও আর হাতটা খুলে দাও, বন্ধু,' অনুরোধ করলো বালা। 'তুমি জানো, আমি তোমার সামনে পাত্তাই পাবো না, এমনকি তুমি এখন যেমন ভঙ্গুর অবস্থায় আছো, তা সত্ত্বেও।

বিদ্যুৎ খুব দুর্বল একটা হাসি দিলো। বালা হাসলো আবারো। 'আরে বন্ধু। তুমি জানো আমার পান করা দরকার।'

বিদ্যুৎ সনুর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। তরুণ ছেলেটি প্রতিবাদে গোঁ গোঁ শব্দ করলো, এরপরেই বন্দির দিকে তাকিয়ে না-সূচক নজরে তাকালো। কিন্তু দেবতার আদেশ পালন করতে সাথে সাথেই বেরিয়ে গেল সে।

* * * * *

এক মিনিটের মধ্যেই দুইবার রাম শেষ করেছে বালা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিজের জন্য তৃতীয়বার রাম ঢাললো সে।

'আমি ওদেরকে কোনোভাবেই তোমাকে মারতে দিতাম না, ভিডিও,' বললো বালা। 'এটাই ছিলো আমার পূর্বশর্ত।' সে সরাসরি বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে এমন সহজাত আন্তরিকতা, যেটাকে বিদ্যুৎ তার জীবন দিয়ে বিশ্বাস করতো। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে এসবের।

'আরে থামো, বালা!' রাগে ফেটে পড়লো বিদ্যুৎ। 'তুমি জানতে পুরোটা সময় ধরে কী কী চলছিলো! জানতে একজন দক্ষ আততায়ী আমার পিছু নিয়েছে। তুমি জানতে সেদিন ঘাটে প্রশিক্ষিত সব ভাড়াটে খুনিরা ছিলো। তুমি জানতে আমার জীবিত অবস্থায় বানারস ছাড়া সম্ভব ছিলো না!'

'না! আমি জানতাম না!' বালা পালটা চিৎকার করলো। 'কোনো সন্দেহ নেই যে রুমিকে পাঠানো হয়েছিলো তোমাকে খুন করার জন্য, কিন্তু সেটা এখনই না। আমি ভাড়াটেদের বলেছিলাম তোমাকে পরাস্ত করে আটক করতে। ওরা আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলো যে তুমি এই যাত্রায় বেঁচে যাবে। প্রতিশ্রুত সময়টা পর্যন্ত তোমার বেঁচে থাকার কথা ছিলো।'

বিদ্যুৎ দেখতে পাচ্ছিলো, উপরের গরম, সাদা আলোর নিচে বালার চোখ ভিজতে শুরু করেছে।

'আমি তোমাকে গুলি করেছি কারণ আমার সামনে আর কোনো উপায় ছিলো না, বিদ্যুৎ। তোমাকে থামানো অসম্ভব, আর তুমি নিজেও তা জানো। বারোজনের বেশি প্রশিক্ষিত খুনিকে তুমি মিনিটের মাঝেই গুঁড়িয়ে দিয়েছিলে। আমার কাছে আর কী করার ছিলো? ওরা দেখছিলো...'

মৃদু আলোর ঘরটায় নীরবতা নেমে এলো। ওখানে এখন মিলিটারি গ্রেড ডার্ক রামের কড়া ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে।

অবশেষে বিদ্যুৎ মুখ খুললো। 'বালা, এই *ওরা* আসলে কারা, যাদের কথা তুমি বলে যাচ্ছো? কাদের হয়ে কাজ করছো তুমি?'

বালা বিদ্যুতের দিকে তাকালো। দেবতা বিদ্যুৎ তার সদ্য হারানো বন্ধুর চোখে চাপা আনন্দ আর জাগতিক ভয় দেখতে পেল।

'তুমি সত্যিই কিছু জানো না, তাই না? বিদ্যুৎ?' প্রশ্ন করলো বালা। তার সাহসী চোখজোড়া এখন ভয়ে বড় হয়ে আছে।

'তুমি আমাকে নিয়ে কিছুই জানো না, বিদ্যুৎ,' পঞ্চমবারের মতো গ্লাস খালি করে বললো বালা। বিদ্যুৎ বালার ইচ্ছাপূরণের সুযোগটা দিচ্ছে। কারণ সে চায় বালা ঝেড়ে কাশুক।

'আমি তোমাকে অনেক দিন ধরেই চিনি, বালা। তুমি আমার পরিবারের মতোই ছিলে,' দেবতা উত্তর দিলো।

'ধুর বোকা! তুমি তো এটাই জানো না আমি কোথা থেকে এসেছি। আমি তোমার মতো শক্তিশালী কোনো আধ্যাত্মিক, ঐশ্বরিক পরিবারে জন্মাইনি। আমি জন্মেছি এক পরিচয়হীন পরিবারে।'

বিদ্যুৎ শুনে যাচ্ছে। ঠিক যেমনটা নীরবে শুনে যাচ্ছে বলভান্ত আর গোবর্ধন।

'নারিকেল পাড়ার জন্য গাছে উঠতো। এটাই আমার বাবার পেশা ছিলো। কেরালার প্রত্যন্ত একটা গ্রামের গরিব, ক্ষুধায় কাতর, অসহায়, নারিকেল গাছবাওয়া মানুষ। আমরা আদিবাসী ছিলাম, বিদ্যুৎ। প্রকৃতির মাঝে যা আছে তাতেই বাঁচার চেষ্টা করতাম, বা বলা চলে, তাতেই মরে পড়ে থাকতাম...'

গ্লাসে আরেকটা বড় চুমুক দিলো বালা। এরপর আবার বলতে শুরু করলো। 'বেশিরভাগ রাতেই আমরা পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাতে যেতাম। অথবা স্থানীয় কিছু ডালবীজ সারা রাত ভিজিয়ে রেখে সেই বিরক্তিকর পানিটা পান করতাম। আমাদের এমন সব কাপড় ছিলো, যা দিয়ে কেবল আমার মায়ের সম্ভ্রমটাই ঢাকা সম্ভব ছিলো। ঘরটা ছিলো শতচ্ছিন্ন এক কুঁড়ে। আর মাংস চুরি করতে হতো মৃত পশুর কঙ্কাল থেকে। এ এমন এক দারিদ্র্য যা কল্পনারও বাইরে। এ এক অর্ধমানবীয় অস্তিত্ব। আমরা কোনো প্রার্থনার ঘরে ঢুকতে পারতাম না। আমাদেরকে এমনকি শ্মশানে মরা পোড়াবার ঘর থেকেও তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা যখন অসুস্থ হয়ে পড়তাম, তখন আমাদের জন্য কোনো ঔষধও ছিলো না। আমার ছোট বোন ডিপথেরিয়ায় কাদায় গড়াগড়ি করতে করতে আমার চোখের সামনে মারা গেছে। আর তখন কেউই আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। আমরা বাঁচা-মরা ছিলো পশুর চেয়েও জঘন্য।'

কারাগার ঘরটা একেবারেই চুপচাপ। নিজের গ্লাসের দিকে একদৃষ্টে গভীরভাবে তাকিয়ে আছে বালা, যেন সে সবগুলো ভয়ানক মুহূর্ত আবার মনে করছে। চরম দারিদ্র্য আর অপূরণীয় ক্ষতির গভীর ক্ষতগুলো কেবল লুকিয়েই রাখা যায়। কিন্তু কখনোই পুরোপুরি মুছে ফেলা যায় না।

'আর তারপর একদিন ওরা এলো। সাদা আলখাল্লা-পরা সেই মানুষগুলো সরাসরি এলো আমাদের তুচ্ছ কুঁড়েঘরে, এমনভাবে আমাদের জড়িয়ে ধরলো যা আমাদের আগে কেউ করেনি। ওরা আমাদের খাইয়েছে, পরিয়েছে, পরিষ্কার করে দিয়েছে। তোমার কোনো ধারণা আছে, বিদ্যুৎ, যখন তোমার চারপাশের পৃথিবী তোমাকে কেবল অপমান আর ক্ষুধার মধ্যে রাখে, এরমন সময় যদি কেউ একজন তোমাকে গ্রহণযোগ্যতা আর আশা দেয়, তখন ঠিক কেমন বোধ হয়? অবশ্যই এসব ধারণা তোমার নেই! তুমি এমনকি এও জানো না, একটানা তিন দিন ক্ষুধার্ত থাকার অনুভূতিটা কেমন হয়। তুমি এসবের কী বুঝবে?'

বিদ্যুৎ বুঝতে পারছিলো না তার কেমন আচরণ করা উচিত। বালা ঠিকই বলেছে। বিভিন্ন সময় বালা নিজে যতখানি বলেছে, তার বাইরে বিদ্যুৎ আসলে বালার শৈশব নিয়ে কিছুই জানতো না। বিদ্যুতের কোনো ধারণাই ছিলো না যে তার এই বন্ধু থেকে শত্রু হয়ে যাওয়া মানুষটার অতীত এতটা ভয়ানক।

'আমি এসব জানতাম না, বালা। আর আমি কেবল কল্পনাই করতে পারছি, তুমি ঠিক কেমন যন্ত্রণা ভোগ করে এসেছ। কিন্তু তুমি কেন খুনি আর ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যুক্ত হবে, এর কোনো ব্যাখ্যা পেলাম না।'

'কারণ অন্তত একবারের জন্য হলেও আমি জয়ীদের দলে থাকতে চেয়েছিলাম!' টেবিলে শক্তিশালী ঘুসি বসিয়ে চিৎকার করে উঠলো বালা। 'তুমি বুঝতে পারছো না, হারামি ঈশ্বর! অন্তত একবারের জন্য আমি জিততে চেয়েছি, হতচ্ছাড়া!'

সাবেক এই সেনাসদস্য এখন রাগ আর আবেগে ফোঁসফোঁস করছে।

'যেদিন ওরা আমার মা-বাবা আর আমাকে তাদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেল, সেদিন ওরা আমাকে বললো, ঈশ্বর আমাকেও ভালোবাসেন। সেই মুহূর্তে ওরা আমাদের নাম পরিবর্তন করলো আর তাদের সমাজে আমাদের স্বাগত জানালো। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাদের জন্য আমি যেকোনো কিছুই করতে রাজি। তাদের জন্য বাঁচতে আর মরতে রাজি। কোনো সংশয় ছাড়াই। কেবল ওরাই আমার ভেতরের প্রতিভা শনাক্ত করতে পেরেছিলো। যদি এই *প্রতিভা* মানে আমার দ্বারা পরিচালনা করা ওদের নৃশংস অভিযানগুলোর কথাও বোঝায়, এরপরেও। আমি ওদের মাঝেই বেড়ে উঠেছি, ওদের ভেতর থাকা বৃহত্তর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথাও আন্দাজ করতে পেরেছি বহু আগেই। কিন্তু এরপরেও আমি কখনোই নিজের শপথ ভাঙিনি।'

* * * * *

আচমকা ঘরের ভেতর দৌড়ে প্রবেশ করে সনু। হাঁফাচ্ছে সে। দেখে মনে হলো নার্ভাস।

'বিদ্যুৎ দাদা, আমাদের বেরোতে হবে। এখনই। মহান গুরুজি আমাদের সবাইকে পূর্ণশক্তি নিয়ে মঠের বাইরের দিকে যেতে বলেছেন।'

পুরোটা সময় কোনার দিকে দাঁড়িয়ে থাকা বলভান্ত সনুর দিকে ঘুরে তাকালো। 'কী হয়েছে বাবার?'

সনুকে দেখে মনে হচ্ছিলো সে যেকোনো মুহূর্তে চরম দুশ্চিন্তার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়বে। ঐ মুহূর্তে তার প্রচুর ঘাম হচ্ছিলো।

'সে চলে এসেছে, বলভান্ত দাদা...' চোখে পড়ার মতো ঢোক গিলে বললো সনু।

প্রচণ্ড শব্দে আর চাপা গর্জনে তাদের পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠলে বলভান্ত আর গোবর্ধন একবার দৃষ্টিবিনিময় করলো। এর পরেই দূরে আকাশ কাঁপিয়ে ছন্দের তালে তালে এক ধাতব ধ্বনি তাদের কানে এলো।

ঢক! ঢক!

ঠং! ঠং!

ঢক! ঢক!

ঠং! ঠং!

বিদ্যুৎ পুরোপুরি হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বলভান্ত আর সনুর দিকে তাকালো সে। ঠিক সেই মুহূর্তে বালা বুনো আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। 'সে এসে পড়েছে! সে এসে পড়েছে!' প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে বারবার কথাগুলো বলে গেল সে।

ঢক! ঢক! ঠং! ঠং!

ঢক! ঢক! ঠং! ঠং!

ধীরে ধীরে বাড়ছে শব্দটা, সেই সাথে বিদ্যুৎ দেখতে পেল বলভান্ত আর সনুর মুখ ভয়ে আর রাগে কুঁচকে গেছে। সে বুঝতে পারছিলো, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। যদি তার প্রপিতামহ সত্যিই নিজের সব জাগতিক আর আধ্যাত্মিক সেনাদলকে মঠের বাইরে মন্দিরে ডেকে থাকেন, তাহলে কিছু একটায় নিশ্চয়ই গন্ডগোল আছে।

'কী হচ্ছে, বলভান্ত দাদা?' বাইরের প্রচণ্ড ভারী আর শক্তিশালী শব্দের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে বললো বিদ্যুৎ।

দ্রুত বিদ্যুৎকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল বলভান্ত। নিজের পায়ে কষ্ট করে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই বিদ্যুৎ খেয়াল করলো, বালা আবারো সম্মোহিত অবস্থায় ফিরে গেছে। জ্বলজ্বলে আলোর নিচে তার টাক মাথা ঘামছে আর চোখদুটো সম্পূর্ণ উলটে গেছে। তাতে সাদার খুব হালকা একটা আভা দেখা যাচ্ছে। তাকে শয়তানের পূজারি এক গবলিনের মতো লাগছে এখন।

* * * * *

'এটা সে-ই, বিদ্যুৎ। পুরো বানারসের সবচেয়ে ভয়ানক সৃষ্টি। সত্যি বলতে, সবচেয়ে ভয়ংকর শয়তান যে এখনো রয়ে গেছে।'

সনু আবার বালার হাত বেঁধে দিলো। আর মহান মঠাধীশের সাথে যোগ দিতে ফিরে যাওয়ার সময় বিদ্যুৎ আবারো তাকালো বলভান্তের দিকে।

'কে এটা, বলভান্ত দাদা? এমন ভয় আর সমীহ নিয়ে আপনি কার কথা বলতে চাইছেন?'

বলভান্ত বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে এক বাক্যে পুরোটা ব্যাখ্যা করলো, 'এটা সে-ই, যাকে দ্বারকা শাস্ত্রীজি পৃথিবীর শেষ রাক্ষস বলে বিশ্বাস করেন।'

বলভান্ত যা কিছু উচ্চারণ করছে, তা হজম করার জন্য নিজেকে শক্ত করে নিয়েছে বিদ্যুৎ। সে নিজের ব্যাপারে *শেষ দেবতা* কথাটা শুনেছে। কিন্তু এই শেষ রাক্ষসটা কে?

'ছয়শত ছেষট্টি ক্ষ্যাপাটে অনুসারী নিয়ে এসেছে সে,' বলভান্ত বলে যাচ্ছে। 'এ স্বয়ং শ্মশানের অধিপতি ছাড়া আর কেউ না; মৃতদের দেবতা, মহাতান্ত্রিক, ত্রিজাত কাপালিক।'

সিন্ধুর তীরে, হরপ্পার পশ্চিমে, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

প্রতিটি পুত্রের মৃত্যু

আরেকবার ভাবুন, হে মহান অ-দেবতা, আবারো প্রশ্ন করলো সুরা। 'আপনি কি নিশ্চিত, এমনটাই চান?'

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত,' কঠোর আর কুৎসিত এক কণ্ঠে জবাবটা এলো। 'আমি ইট আর তামায় তৈরি পাহাড়ের মানচিত্র নিজ হাতে এঁকেছি। নির্মাণ পরিকল্পনায় সামান্য পরিবর্তন আনলে সরস্বতীর পথ পুরোপুরি বদলে যাবে। আর মহিমান্বিত এই হরপ্পা শহরের নাম চিরতরে মুছে যাবে। পৃথিবী এর সব পাপী বাসিন্দাকে সরিয়ে পরিশুদ্ধ হবে।'

এখন পর্যন্ত যা কিছু শুনেছে, তা নিয়ে প্রচণ্ডের সংশয় আছে। তাদের সবচেয়ে ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বী, হরপ্পান সেনাদলের সবচেয়ে উঁচু কমান্ডার, প্রায় ঐশ্বরিক ক্ষমতার মানুষ, যিনি কিনা তাদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছে, তিনি এখন তাদেরই তাঁবুতে বসে এমন একটা বিষয়ে সাহায্য চাইছে যেটা পরবর্তীতে কিংবদন্তি আর লোককথার মাঝে ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস কাজ বলে বর্ণনা করা হবে। একমাত্র যে বিষয়টা তাকে বিভাষণ পূজারির বর্ণনা করা ঘটনাগুলো বিশ্বাস করতে বাধ্য করছে তা হলো তার এই অতিমানবীয় অবস্থা। কোনো সাধারণ মানুষ শরীরের উপর এমন নৃশংস অত্যাচার সহ্য করতে পারবে না।

'এমন এক পরিস্থিতিতে হয়তো আমরা আপনাকে সাহায্য করতে রাজি হবো, সেই সাথে আমাদের সেনাদল এবং জানোয়ারদের আপনার কাছে হস্তান্তর করবো। এরপর কী? আমাদের এতে কী যায় আসে?' পালটা জিজ্ঞেস করলো প্রচণ্ড। 'এক বিশাল শ্মশানের মাঝে আমাদের কী কাজ?'

বিভাষণ পূজারি স্পষ্ট অবজ্ঞার দৃষ্টিতে প্রচণ্ডের দিকে তাকালেন। মানুষটা একসময় হরপ্পার সূর্য বলে পরিচিতি ছিলেন। তিনি নিচু স্তরের কারো সাথে তর্ক করে অভ্যস্ত না। সুরা এই চাপা উত্তেজনা ধরতে পারছে। এক মুহূর্ত দেরি না করে সে হস্তক্ষেপ করলো।

'শ্রদ্ধেয় অ-বিভাষণ পূজারি। প্রচণ্ড আসলে যা জানতে চেয়েছে, তা হলো, একবার যখন সমস্ত আর্যাবর্ত মহাপ্লাবনে ভেসে যাবে, আমার শাসন করার জন্য আর কিইবা বাকি থাকবে? কোনো প্রাণী বা উদ্দেশ্য ছাড়া একটা রাজ্যের কিইবা দরকার?'

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত এই দেবতা বেশ কিছুক্ষণের জন্য চুপ রইলেন। এরপর খুব কৌশলে আর পরিষ্কারভাবে জবাব দিলেন। তিনি জানতেন অসুর আসলে কী শুনতে চাইছে।

'তুমি একে প্রাণহীন একটা রাজ্য বলতে পারো, আবার তুমি নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর ভূমির একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবেও দেখতে পারো। এমন এক ভূমি যেখানে তুমি যেমন চাও, ঠিক তেমন মানুষে পরিপূর্ণ করবে, তুমি নিজে যেমন চাও, ঠিক তেমন করে শহরগুলো গড়ে উঠবে আর তোমার নির্দেশেই পরিচালিত হবে। সুরা, তুমি কি সারা জীবন ঠিক এটাই প্রত্যাশা করোনি?'

অসুর-রাজ এই কথাগুলোতে বেশ সন্তুষ্ট। সে সত্যিকার অর্থে এমনটাই আজীবন চেয়েছে।

* * * * *

আগুনে ঝলসানো ছাগলের হাড় থেকে মাংস খেয়েছেন তিনি, সেই সাথে খুব দ্রুত কয়েকবার গ্লাস ভরতি করে অসুরের কালো পানীয় পান করলেন। নিজের জীবনে বিভাষণ পূজারি এর আগে কখনোই মাংসের স্বাদ নেননি কিংবা কোনো প্রকার নেশাদ্রব্য স্পর্শ করেননি। কিন্তু এখন সব রকম চেষ্টা করছেন নিজের পরিচয় ভুলে যেতে। ধীরে ধীরে নিজের ভেতরের দেবতাকে খুন করছেন তিনি, বড় করছেন ভেতরের পশুটাকে।

'আপনার কাছে আমাদের আরো একটা জিনিস চাইবার আছে, হে অ-দেবতা,' সাবধানতার সাথে বললো প্রচণ্ড। তারা একই সাথে মাংস আর পানীয় দিয়ে খাওয়াদাওয়া শেষ করেছে।

আহত চোখ দিয়ে সুরা আর তার সামরিক প্রধানের দিকে তাকালেন বিভাষণ। 'তোমরা তো নিজেদের মতো করে সবকিছু পাচ্ছোই। ভূখণ্ড, নদী, ধ্বংসাবশেষ, রত্নভান্ডার...এর বেশি আর কী চাইতে পারো তোমরা?'

'অ-সপ্তর্ষি,' আচমকা বলে বসলো সুরা। সে পবিত্র সাতজন জ্ঞানী ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করছে।

আর তারপর সে এমন একটা কথা বললো যা বিভাষণ পূজারি কখনোই শুনবেন না বলে আশা করছিলেন।

'আমরা অ-সপ্তর্ষিদের মাথা চাই।'

* * * * *

'আমাদের বিজয় কখনোই পরিপূর্ণ হবে না, যদি অ-সপ্তর্ষিরা বাকি হরপ্পান নাগরিকদের মতো একই ভাগ্যবরণ না করে,' হতভম্ব বিভাষণ পূজারিকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করলো সুরা।

'এটা হতে পারে না,' জবাব দিলেন আহত দেবতা। 'তুমি তোমার রাজ্য বুঝে পাবে। তোমার রাজ্য পুরো আর্যাবর্ত জুড়ে বিস্তৃত থাকবে। তুমি তোমার চেনা পৃথিবীর প্রায় পুরোটা শাসন করবে, সুরা। সপ্তর্ষিকে তার মতো থাকতে দাও।'

'আমরা দুজনেই জানি, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ চতুর ঋষিরা বেঁচে আছে, হরপ্পার উপর আমার শাসন পুরোপুরি নিশ্চিত না। ওসব ঋষিরা নদীকে আদেশ করে, বাতাসকে আদেশ করে, পশুদের সাথে কথা বলে এমনকি পাহাড়ও তাদের ইচ্ছাতেই গুঁড়িয়ে যায়। না, অ-বিভাষণ, আমাদেরকে তাদের হত্যা করতেই হবে।'

'যথেষ্ট হয়েছে, সুরা! এমন একটা সিদ্ধান্ত আমি যুক্ত করতে চাই না। সপ্তর্ষিরা কোনো যোদ্ধা না। ওরা তোমার বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারবে না। তারা সাধারণ সাধক, যাদের কিনা এই বস্তুবাদী জগত নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই। আর তার চেয়ে বড় কথা, তারা সরস্বতীর সেই প্রবাদতুল্য সন্তান। ভগবান জানেন, আমরা যদি তাদের কোনো ক্ষতি করতে চাই, তাহলে পুরো আর্যাবর্তের উপর কী ভয়ানক আঘাত আসবে,' খুব ইতিবাচক আর যৌক্তিকভাবে কথাগুলো বললেন বিভাষণ পূজারি। সত্যিটা হলো, মন থেকেই বিভাষণ পূজারি সপ্তর্ষিদের ভালোবাসতেন। ওনারাই তার সাথে সৃষ্টিকর্তার যোগাযোগের শেষ যোগসূত্র।

প্রচণ্ড জানে তার রাজা চায় সে-ই এখন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করুক। আর তাই সে তার মূল চাল দিলো।

'আপনি কেন তাদের রক্ষায় এত উতলা হচ্ছেন, মহান অ-দেবতা? ওরা আপনার জন্য এর আগে কী করেছে?' কিছুটা উপহাস করেই কথাটা বললো অসুর সেনাপ্রধান।

'সাবধান, প্রচণ্ড,' নিজের প্লেট থেকে চোখ না তুলেই উত্তর দিলেন বিভাষণ।

'না, সত্যিই, ওরা আপনাকে কতখানি ভালোবাসে? ওরা যদি আপনার সাথে থাকতো, তবে কি আপনি এই নাজুক অবস্থায় থাকতেন? অ-সপ্তর্ষিরা যদি বিন্দুমাত্র পরোয়া করতো, তবে কি আপনার পরিবার কুকুরের মতো মরে পড়ে থাকতো?'

প্রচণ্ড তার বাক্য শেষ করার আগেই দেবতা রাজকীয় খাবার টেবিলে ঘুসি বাগিয়ে তার বিশাল ছোরা বের করে সুরার সেনাপ্রধানের গলা বরাবর ধরলেন। তার ছুরির নীলরঙা নীলকান্তমণির হাতলটা নিজের রক্তের কারণে স্থায়ীভাবে ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে।

'সপ্তর্ষিদের নিয়ে কোনো কথা না! আমার পরিবার নিয়েও কোনো কথা না!' হুমকির সুরে প্রচণ্ডের কানে হিসহিসিয়ে কথাগুলো বললেন বিভাষণ পূজারি।

* * * * *

'হে মহান অ-দেবতা, আমি ক্ষমা চাইছি। প্রচণ্ড বোকামি করেছে,' শান্ত কণ্ঠে বললো সুরা, একই সাথে আলতোভাবে বিভাষণ পূজারির বাহু ধরে ধীরে ধীরে তা প্রচণ্ডের গলার কাছ থেকে সরিয়ে নিলো।

আমি সব সময়ই জানতাম, এ কোনো সাধারণ মানুষ না। এই দেখো, তাকে ঘিরে আমার হাজারো সেনা উপস্থিত, তবুও সে সিংহের মতোই নির্ভীক আছে!

সবাই আবারো নিজ আসনে বসে পড়লো। আর বিভাষণ পূজারি তার শক্তিশালী ছোরাটা খাপে ঢুকিয়ে রাখলেন। নক্ষত্রকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেনি প্রচণ্ড। সে জানতো, তার কুখ্যাত সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তার কেবল আর এক ইঞ্চিই বাকি ছিলো।

'আমাদের পরামর্শটা অন্যভাবে নেবেন না, হরপ্পার অ-সূর্য মহোদয়,' অতিথির পানপাত্রে আরো পানীয় ঢালতে ঢালতে বললো সুরা।

সে যখন দেখলো বিভাষণ পূজারির রাগ দৃশ্যত কিছুটা কমে এসেছে, সুরা তার পরের দান দিলো। সে জানতো, দেবতা এই মুহূর্তে দুর্বল। এই পৃথিবী একজন ভগ্নহৃদয় আর পরাজিত মানুষকে শোষণ করার কোনো সুযোগই

হাতছাড়া করে না। ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া হৃদয় থেকে জীবন আর আশার শেষ বিন্দুটাও বের করে আনে। আর সফলতার উচ্চাশার নির্মম প্রাসাদে একের পর এক ইটের গাঁথুনি দিয়ে যায়। কিন্তু সুরা একটা ভুল করতে যাচ্ছিলো। হ্যাঁ, বিভাষণ পূজারির মন ভেঙে গেছে। কিন্তু হারের মুখ থেকে তিনি এখনো অনেক অনেক দূরে আছেন।

* * * * *

'আমরা যেমনটা শুনেছি, অ-সপ্তর্ষিরা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। তারা মেঘদের বৃষ্টির আদেশ করতে পারে, পড়তে পারে মানুষের মনও,' কৌতূহলী ভঙ্গিতে বললো সুরা। এখন পর্যন্ত সে নিশ্চিত করেছে দেবতা এরই মাঝে অনেকবার তার অতিমাত্রায় বিষাক্ত পানীয় পান করেছে। 'এ কারণেই আমরা যা বলতে চাইছি তা হলো, আমরা এটা ভেবেই আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারছি না যে ওরা কেন আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, হে শক্তিমান অ-দেবতা...'

বিভাষণের মনে এমন প্রশ্ন এবারই প্রথম আসেনি। নিজের অর্ধহৃদয়কে বোঝানোর জন্য তিনি প্রতিবারই এই বলে চিন্তাটা দূর করেছিলেন যে হয়তো সপ্তর্ষির কোনো কারণ ছিলো। কিন্তু প্রতিবারই এই প্রশ্ন তাকে আঘাত করতে ফিরে এসেছে। আর এখন সুরা সেই বোধ জাগিয়ে তুলছে।

'আপনাকে যখন খুনি সাব্যস্ত করা হয়েছিলো; তখন তারা আপনার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেনি। আপনি যখন মৃৎ-কারাবাসে ছিলেন, তখন তারা কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করেনি, এমনকি যখন আদালতে আপনাকে আক্রমণ করা হয়, তখনো তারা আপনাকে এড়িয়ে গেছে,' একটানে কথাগুলো বলে গেল সুরা। সে এখন অনেকটাই নিশ্চিত যে এই স্লো পয়জনিং কাজ করতে শুরু করেছে।

আর্যাবর্তের শেষ দেবতা খাওয়া থামিয়ে দিয়েছেন। দামি খাবার টেবিলের অনেক কাছাকাছি নুয়ে এসেছে তার মাথা, হাতের মুঠি ক্রমশ শক্ত হচ্ছে। সুরার বলা বিষের মতো কথাগুলো প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেছে।

'সে যাই হোক; তারা কেন আপনার প্রাণপ্রিয় পরিবারকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি, বিশেষ করে আপনি যখন তাদের সাথে ছিলেন না? আমি যতখানি শুনেছি, তারা সকল রাজত্বের সময় উপলব্ধি করতে পারে। তাদের কাছ থেকে কোনো কিছুই লুকানো সম্ভব না,' কথাগুলো যোগ করলো প্রচণ্ড। এবার বেশ সতর্কভাবেই বলেছে সে।

'আর আপনার স্ত্রী, হে দেবতা... আমরা তার ধর্মভক্তি নিয়ে এত শুনেছি যে একমাত্র তাকেই আমরা আমাদের অ-ভাষা থেকে মুক্তি দিয়েছি। তিনিই একমাত্র যাকে আমরা তার আসল নামে ডেকে থাকি। সানজানা।'

অসুর রাজের কাছে মিথ্যাটা আরো সহজ হয়ে এলো।

'বিষাক্ত তীরের আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে। তার মতো একজন ধার্মিক আর নিবেদিতপ্রাণ মহিলার এমন এক পরিণতি হওয়ার কথা না,' ক্রন্দনরত দেবতার কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করলো সুরা।

প্রচণ্ড আর সুরা যা কিছু বলছে তার সাথে একমত না হয়ে উপায় ছিলো না বিভাষণ পূজারির। সাহায্যের জন্য যে সাতজনকে পাবে বলে ভেবেছিলেন, তাদের উপর তিনি নিজের রাগ আর ক্ষোভ ধরে রাখতে পারেননি। তার দুই হাতের মুঠি এখন একটা আরেকটার উপর রাখা, দেবতার মাথা সেখানে ঠেকানো। একটানা কেঁদেই চলেছেন। তার এখন বিশ্বাস হচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছেন তিনি। যাদের সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন, ভালোবাসতেন, তাদের দ্বারাই প্রতারিত হয়েছেন।

'আর আমরা শুনেছি, আপনার ছেলে, সুদর্শন পুরুষ মানু, বীরের মতো লড়াই করেছে,' অনেকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাটা বললো প্রচণ্ড। তার চোখ এখন এক জন্তুর মতো জ্বলজ্বল করছে যে জানে তার শিকার কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

'আপনি বলছিলেন, তিনটা তীর তাকে বিদ্ধ করেছে...তিনটা তীর!' অবাক হয়ে বললো সুরা। 'কেমন সাহসী যুবক ছেলে! পালানোর সময় ঘোড়া থেকে পড়ে মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে সে নিশ্চয়ই আপনার কথা স্মরণ করছিলো। হরঞ্জার সবকটা ছেলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত!'

ঘৃণায় এখন রীতিমতো কাঁপছেন বিভাষণ পূজারি। তার চিরসঙ্গী, তার স্ত্রী, এক যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে, অথচ তার কখনোই সেখানে থাকার কথা না। তার ছেলে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় যখন রওয়ানা দেয় তা এতই শুরুতর ছিলো যে বিভাষণের বন্ধু সোমদত্ত কান্না করে সমবেদনা জানিয়েছিলেন। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তার পুরো জীবন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়।

আমার পৃথিবী যখন শেষ হয়ে আসছিলো, তখন সপ্তর্ষিরা কোথায় ছিলো?

বানারস, ২০১৭
ত্রিজাত কাপালিক

দেখে মনে হচ্ছে এ সাক্ষাৎ শয়তানেরই সেনাদল। দেব-রাক্ষস
খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার থেকে রাক্ষস খাদের শেষ ইঞ্চি পর্যন্ত ঝাঁকে ক
কাপালিকের অঘোরী তান্ত্রিকরা ভিড় করে আছে। স্থানীয় প্রশাসন, পু
সাধারণ মানুষ সবাই ত্রিজাত আর তার ভয়ানক দলটা যেখানে
করেছিলো সেই রাস্তাটা খালি করে দিয়েছে। পুরো পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে-
থাকা অল্প কিছু শহরে আইন প্রয়োগকারীরা ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দ
মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে যায়। কিছু ক্ষেত্রে বড় রাজনৈতিক শক্তির নির্দে
এমনটা ঘটানো হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা প্রকৃত শ্রদ্ধার ফলাফল।

পশুর চামড়া ছাড়া পরনে আর কিছুই নেই। লম্বা চুলগুলো জট-ধরা। অনেক দিন ধরে দূষিত আর রক্তাক্ত জীবনযাপনের কারণে চুলের রং বদলে কমলা-বাদামি বর্ণ ধারণ করেছে। কয়েক দশকের ক্রমাগত আফিম আর চরসের প্রভাবে ভয়ানক মহাতান্ত্রিকের ৬৬৬ অনুসারীর প্রত্যেকের চোখই রক্তলাল। তামাক ও পান ক্রমাগত চিবানোর কারণে তাদের মুখ গাঢ় লাল হয়ে আছে, দেখে মনে হচ্ছে রক্তপান করে এসেছে। তাদের মাঝে এক-তৃতীয়াংশের বেশি সদস্যের হাতে বড় বর্শা আর ত্রিশূল ধরা আর শক্ত চামড়ায় বানানো বর্ম।

তাদের অলংকার মানুষ আর পশুর হাড়ে তৈরি। তবে সবচেয়ে জঘন্য ছিলো, তাদের প্রত্যেকেই মনে হলো এক আদিম আর দুর্বোধ্য মন্ত্রের অধীনে রয়েছে।

ত্রিজাতের সেনাদলের সাধারণ দৃষ্টিই রক্ত জমাট করে দিতে পারে, সে যতই সাহসী পুরুষ হোক না কেন।

* * * * *

অঘোরাকে বলা হয় তন্ত্রের উন্নত আর সম্মানিত অবস্থা। ভগবান রুদ্রের কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই সাধনা এর আদি উৎপত্তিস্থলের সন্ধান করে। এর অনুশীলনকারীদের বিশ্বাস, এ এক অসীম আধ্যাত্মিক শক্তি, এমনকি জ্ঞানার্জনেরই এক সংক্ষিপ্ত পথ, যা হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার জগতে গভীরভাবে গেঁথে আছে। জটিল সব প্রথা কিংবা অন্য জগতের প্রেতাত্মাদের সাথে যোগাযোগ ছাড়াও এতে এমন মরনাতদন্ত পরীক্ষণ আছে যা তাদের রহস্যময় জগতের সাথে যুক্ত নয় এমন কাউকে পেলেই বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। নিজেদের নরখাদকে পরিণত করেছিলো অঘোরীরা, এমনকি এমন সব অলৌকিক লক্ষ্য অর্জন করার জন্য মৃতদেহের সাথে সঙ্গমও করেছিলো যেগুলো কেবল তারাই বুঝতে পারবে। এত কিছুর পরেও লক্ষ লক্ষ ভারতীয় দূর থেকে এই সম্প্রদায়কে সম্মান করে থাকে।

যাই হোক, অন্য আর সব ক্ষমতার মতোই, অঘোরীদের প্রাপ্ত জ্ঞানে বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে। একবার এক অঘোরী তান্ত্রিক সর্বোচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি আত্মা এবং অন্য জগতের প্রাণের উপর সীমাহীন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম ছিলেন, যারা তাকে পরবর্তীতে দাসের মতো সেবা করেছিলো। পিশাচ, চুড়েল আর ডাকিনীর বেশ ধরা রাগী আত্মারা একজন শত্রুকে সবচেয়ে অনায়াসে আর নির্মমভাবে হত্যা করতে সক্ষম। এ কারণেই অঘোরীরা বিবেকহীন সব রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, চলচ্চিত্র তারকা কিংবা অন্যান্য ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে এক অমূল্য সঙ্গী।

ত্রিজাত কাপালিক ছিলো অঘোরী তান্ত্রিকদের নেতা, যে কিনা জাগতিক সম্পত্তি আর প্রভাব বিস্তারের নেশায় ঈশ্বরের পথ ভুলে গেছে। জানা যায়, সে এতই শক্তিশালী ছিলো যে শ্মশানে তার এক পা পড়লেই তা প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো–যদিও কেউই এই শেষের কথাটার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। তার শাস্তিমূলক সাধনা বা প্রায়শ্চিত্ত তাকে হিমালয়ের প্রচণ্ড ঠান্ডা গুহা থেকে বাংলা আর আসামের অন্ধকার তান্ত্রিক মঠে নিয়ে গেছিলো। সে মাসের পর

মাস বিভিন্ন শ্মশান ঘাটে সময় কাটিয়েছে, অস্বস্তিকর সব স্বরভঙ্গির সাহায্যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছে আর অন্য জগত থেকে ডাক দিয়েছে মৃতদের। কয়েক দশক পর ত্রিজাত বা 'তিন গোছা জটাধারী চুলের ব্যক্তি' হয়ে ওঠে ত্রিজাত কাপালিক। তার নামের শেষাংশটি এসেছে মানুষের খুলি বা কপাল থেকে, যা সে সব সময় তার ত্রিশূলের ডগায় বেঁধে রাখে। ভারতীয় নদীগুলোর তীরে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় তার ভীত অনুসারীরাই সবচেয়ে বড় আর দাম্ভিকতাপূর্ণ তাঁবু স্থাপন করে। আর বহু বছর আগে এরকমই এক মেলায় রহস্যময় এক ইতালিয়ান ত্রিজাতের সাথে সাক্ষাতে এগিয়ে আসে।

সমসাময়িক তান্ত্রিক, যাজক আর সাধারণ সাধুদের কাছে ভয়ংকর ত্রিজাত কাপালিক খুব শীঘ্রই বেশ কিছু ডাকনাম জুটিয়ে ফেলে। যার মাঝে আছে মশান-রাজ বা শ্মশানের রাজা। তার অনুসারীরা প্রচার করে, ত্রিজাতের এমনই বিশাল অতিপ্রাকৃতিক সেনাদল আছে যে সে সত্যিকার অর্থেই মৃতদের কাছে পূজনীয়। এটাই তাকে 'মৃতক-নাথ' বা মৃতদের দেবতা উপাধি এনে দিয়েছে।

আর তারপরেও মশান-রাজ, মৃতক-নাথ, মহাতান্ত্রিক ত্রিজাত কাপালিক পৃথিবীতে একজন মানুষকে ভয় পেত।

সে ভয় পেত এই গ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিককে। সে ভয় পেত মহান মঠাধীশ দ্বারকা শাস্ত্রীকে।

* * * * *

বিদ্যুৎ দেখতে পেল তার প্রপিতামহ রাক্ষস খাদের ঠিক মাঝখানে সোজা দাঁড়িয়ে আছেন। তার সাদা আর জাফরানি রঙের আলখাল্লা বাতাসে উড়ছে, ঘন লম্বা চুল আর রাজকীয় দৃষ্টি–দুটোই তার ডান হাতে ধরা শক্তিশালী ত্রিশূলের সাথে বরাবর মিলে যায়। হালকা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি এক পরাবাস্তব দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে, আর তাতে অদম্য মঠাধীশকে সেনাবাহিনীর বিজয়ী প্রধানের মতো দেখাচ্ছে। এই মুহূর্তে এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

বিদ্যুৎ তার বাবার কাছে পৌঁছাতে ক্রাচে ভর করে যত দ্রুত সম্ভব হাঁটতে শুরু করলো। সাধারণ কথাবার্তা থেকে মানুষ ও মন্ত্রের লড়াই–যা কিছু হোক, এখান থেকেই শুরু হতে পারে। দূর থেকে সে যখন দেখতে পেল ন্যায়না এরই মাঝে তার গ্র্যান্ডমাস্টারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কিছুটা স্বস্তি পেল সে। এখন পর্যন্ত মঠের ভারী অস্ত্রে সজ্জিত যোদ্ধারা কৌশলগতভাবে চারকোণা খাদের

চারপাশে অবস্থান নিয়েছে। আর রাইফেলধারীরা পবিত্র জায়গাটির ওয়াচটাওয়ারসহ অন্যান্য উঁচু স্থানে অবস্থান নিয়েছে। মঠের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সন্ন্যাসীরাও এখন নিজেদের করমণ্ডল (পবিত্র পানীয় রাখার পাত্র) নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছেন। বিদ্যুতের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছিলো বলভান্ত। তার প্রাথমিক আশ্চর্যান্বিত মনোভাব যুদ্ধের ময়দানের মহিমা যেন আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ঢক! ঢক!

ঠং! ঠং!

কানে তালা লাগানোর মতো প্রচণ্ড জোরে ঐ ভয়ানক, জগৎ-কাঁপানো ধাতব শব্দটা তখন পর্যন্ত বেজেই চলেছে। ওটা আসলে কী, তা বিদ্যুৎ দেখতে পাচ্ছে। ত্রিজাতের শত শত পাগলাটে শিষ্য একই তালে মাটিতে তাদের ত্রিশূলের দণ্ড দিয়ে আঘাত করছে। এর পরপরই ত্রিশূলের ধাতব তিন মাথার সাথে বর্ম দুইবার করে আঘাত করছে। এই আক্রমণাত্মক যুদ্ধধ্বনির প্রভাব ছিলো ব্যাপক।

'প্রণাম, বাবা,' প্রপিতামহের পা স্পর্শ করে বললো বিদ্যুৎ। সে এখন আসন্ন লড়াইয়ের মূল কেন্দ্রে পৌঁছে গেছে।

'ত্রিজাআআআআআত...' চিৎকার করলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। ত্রিশূল আর ঢালের শব্দ ছাপিয়ে তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। 'যথেএএএএষ্ট হয়েছে!'

মুহূর্তের মাঝেই পুরো সমাবেশ সুনশান নীরবতায় জমে গেল। এমনকি মশান-রাজের দলটাও প্রবীণ মঠাধীশের আদেশ অমান্য করার সাহস পেল না।

কয়েক সেকেন্ড পরেই, বিশাল এই জনসমাবেশের নীরবতার মাঝেই, সবাই কিছু দৃঢ় পদধ্বনি শুনতে পায়। এর সাথে ছিলো ভারী ঘুঙুরের রিনঝিন শব্দ আর হাড়ের বানানো অলংকারের ভারী শব্দ। ছাই-ঢাকা অঘোরীরা তাদের প্রভুর জন্য মাঝখানে জায়গা করে দিয়ে ধীরে ধীরে দুই দিকে সরে গেল।

আর তারপর সে এলো নিজের সমস্ত মহিমা নিয়ে।

মশান-রাজ।

ভোরে তার ঘোড়া জিন আর সব ধরনের অস্ত্রে বোঝাই করা হয়েছে। অস্ত্রগুলো সবই রহস্যময় এই পর্বতের কালো আলখাল্লা-পরা পুরুষ ও মহিলাদের কাছ থেকে ধার করা তলোয়ার, দুটো ছুরি, দুইশো তীর, একটা যুদ্ধ-কুড়াল আর দূর থেকে প্রাণঘাতী আক্রমণের জন্য বিশেষভাবে তৈরি দুইটা বর্শা। প্রচণ্ড হিংসায় সে অবাক হয়ে ভাবতে থাকলো, একসময় যা কিছু সে প্রিয় বলে ভেবে নিয়েছিলো, কীভাবে তার সবই তিনটি রক্তক্ষয়ী দিনের ব্যবধানে হারিয়ে গেল। মানু এখন তার শেষ আক্রমণের জন্য তৈরি। সে হরপ্পার দিকে যাবে; একাকী।

ও তার প্রিয় বাবাকে বাঁচাতে যাচ্ছে। তারপর মহেঞ্জোদারোর রাজকন্যাকে তার স্বামীসহ হত্যা করবে। সেই সাথে তার নিজের চাচাকে।

সাথে থাকা বর্শা দুটোয় সে দুইজনের নাম রক্ত দিয়ে খোদাই করে নিয়েছে।

প্রথমটায় হরপ্পার প্রথম রানি উচ্চাভিলাসী প্রিয়ংবদার নাম, যার কথা চিরদিনের জন্য বিস্তৃতির কালো গহ্বরে হারিয়ে যাবে। এটাই হবে তার শেষ শাস্তি।

আর আছে অত্যন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত চন্দ্রধর; এমন একজন মানুষ যাকে ইতিহাস শুধু নারীর ছলনায় ধার্মিকতা এবং বিচক্ষণতাকে আত্মাহুতি দেওয়া এক বোকা মানুষ হিসেবেই মনে রাখবে...আর একটি সভ্যতার পূর্ণ বিনষ্টের জন্য নিন্দা জানাবে।

যুবক মানু পূজারির হাত থেকে ছুঁড়ে দেওয়া বর্শা কখনোই লক্ষ্য মিস করতে পারে না।

* * * * *

'আমি কি জানতে পারি তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

কণ্ঠটা শুনে থেমে গেল মানু। সে কেবলই তার ঘোড়ায় উঠতে যাচ্ছিলো, তখনই কেউ তাকে পেছন থেকে ডাক দিলো। সে সাথে সাথেই বুঝে গেল, এই চমৎকার কথাগুলো কার। এই কণ্ঠটাই আবার শোনার জন্য তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হচ্ছিলো।

ধীরে ধীরে নিজের ঘোড়ার মুখ ঘোরালো সে। তাকে দেখতে যোদ্ধা-রাজপুত্রের মতোই লাগছে। যাকে দেখার আশায় ঘুরেছে, তার প্রতি ইতোমধ্যেই এক অদ্ভুত ভক্তিতে ভিজে গেছে মানুর চোখ।

আর সে ঠিকই অনুমান করেছিলো। ওটা তিনিই ছিলেন।

মৎস্য।

* * * * *

মানুর পুরো পানির পাত্র ঢকঢক করে শেষ করে ফেললেন তিনি।

হরপ্পার সূর্যের পুত্র অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো; তার চোখ এই মানুষটার প্রতি নিবদ্ধ হয়ে আছে, যিনি তার মাঝে মা, বাবা আর ঈশ্বরের উপস্থিতির কথা একই সাথে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। মৎস্যের সাথে মাত্র দ্বিতীয় সাক্ষাতে এসেই মানুর মনে হলো সে এমন একজনকে খুঁজে পেয়েছে যে একই সাথে বন্ধু, ভাই, শিক্ষক, আত্মবিশ্বাস, সমালোচক, দেবতা, জাদুকর, যোদ্ধা, ধর্মপ্রচারক, ত্রাতা...সবকিছুই!

মানু মৎস্যর ব্যাপারে যে ধারণা পোষণ করছিলো, পৃথিবী বা ধরিত্রী-মাতা এটা এবারই প্রথম দেখছেন না। যোগ্য ভক্ত আর তাদের ঐশ্বরিক দেবতাদের কিছু অমর গল্প পুরাণ এবং কিংবদন্তি বর্ণনায় আলোর মতো জ্বলজ্বলে হয়ে আছে। যেমন বনে বসবাসকারী এক সর্বশক্তিমান 'বানর' এবং এক নিখুঁত রাজপুত্র, যিনি ছিলেন মানব জাতির জন্য আদর্শ। সেই সাথে অসামান্য দক্ষ এক তীরন্দাজের কাহিনি, যে কিনা নিজের আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধেই নিজের স্নায়ু হারিয়ে ফেলেছিলো। আর তার আত্মাকে পুনঃজাগরণকারী, যে হাজার বছর পরে শিক্ষাগ্রহণের জন্য সত্যগুলো বলে গেছিলো। অথবা ভালোবাসার বার্তা ছড়িয়ে দিতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করা রাখালের কথা ছড়িয়ে দিতে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হওয়া ধর্মগুরুরা। কিংবা এমন এক বিশ্বাসীর কথা যে তার প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সন্তানকে উৎসর্গ করতেও রাজি ছিলো।

ঠিক এমনই শাশ্বত সব বন্ধন, যা দেখা যায় ভক্ত আর দেবতার মাঝে, দেখা যায় মানুষ আর স্বর্গীয় অনুভূতির মাঝে, উপাসক আর স্রষ্টার মাঝে—এসবই সময়ের শুরু থেকে পৃথিবী আর অন্য সব জগতে চলমান আছে।

ধীরে ধীরে নেমে এলো মানু। মৎস্য দ্বিতীয়বার তার পানি গ্রহণ করেছেন দেখে সে আশ্চর্য রকমের খুশি হয়েছে। নিজের দুই হাত একত্রে করে এই স্বর্গীয় মৎস্য মানবের প্রতি মাথা নোয়ালো সে।

'তুমি কোথায় যাচ্ছো, হে মহান রাজা?' আবারো প্রশ্ন করলেন মৎস্য।

মৎস্য তাকে যেভাবে সম্বোধন করেছেন, তাতে আরো একবার বিস্মিত হলো মানু।

'মনে হচ্ছে, আপনি অন্য কারো সাথে আমাকে গুলিয়ে ফেলছেন, হে মৎস্য,' জবাব দিলো মানু। 'আমি কোনো রাজা নই।'

'ওহ! কিন্তু তুমিই রাজা! তুমি কেবল এখনো পর্যন্ত তা জানো না।' মৎস্য তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় আবারো সেই রহস্যময় হাসি দিলেন। তিনি বলে চললেন, 'আমরা সেটাই যেটা আমাদের ভাগ্যে লেখা আছে। সেটা সকল সময়ে, সকল জগতে, এমনকি যা কিছু মানুষের কল্পনা বা ধারণার বাইরে। তুমি এরই মাঝে গ্রহের সেরা রাজা, মানু।'

কিছুটা বিরক্ত হয়ে হাসলো মানু। হয়তো বা মানু অতটাও ঐশ্বরিক না।

'আপনি যা বলছেন তা কখনোই সত্য হবে না, মৎস্য। আমি আমার বাবাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি, আমার পরিবারের প্রতিশোধ নিতে আর একজন সাধু হওয়ার উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য এই ভূমি ছেড়ে যাচ্ছি।'

'হুমম...দারুণ। আর যখন তুমি...কী যেন বললে...*সাধু* হয়ে যাবে, তখন তুমি কার অনুসন্ধান করবে?'

'আমি সর্বশক্তিমানের সন্ধান করবো। মানে স্রষ্টা, অবশ্যই...'

'তুমি আর ঈশ্বরের সন্ধান কী করছো, মানু?' মৎস্যর চোখে ছোটদের মতো দুষ্টামি আর রহস্যময় শক্তি একই সাথে ধরা পড়ছে। 'সম্ভবত তিনি নিজেই তোমাকে খুঁজছেন।'

নীল চামড়ার রহস্যময় মানুষটার বলা অস্পষ্ট কথাগুলোর অর্থ খোঁজার আপ্রাণ চেষ্টা করলো মানু। সকালের ঝিরঝিরে হাওয়া আশপাশে প্রাণের সঞ্চার করছে। মানুর পেছনে থাকা পাহাড় যেন ভোরের আকাশে গোলাপি আভার মাঝে কালো রং হয়ে পৃথিবী থেকে উঠে এসেছে।

'হে সানজানার পুত্র, কেন আমরা আমাদের কাছে যা আছে, তার মূল্যায়ন করতে পারি না? কখনো কখনো আমরা যা কিছুর পিছু নিই, সেটা আমাদের থেকে দূরে থাকে না।' পরের কথাটা বলার আগে একটু বিরতি নিলেন মৎস্য। 'হরপ্পার সূর্য মারা গেছেন।'

মৎস্যের মুখ থেকে কথাটা শোনার পরেই মানুর মুখ শুকিয়ে গেল। কিন্তু তার ভেতরের কিছু একটা তাকে এই কথা বিশ্বাস করতে বাধা দিচ্ছে।

'অসম্ভব! আমার মহান বাবা...মহাপরাক্রমশালী বিভাষণ পূজারি, তিনি মরতে পারেন না। একজন সাধারণ প্রতিপক্ষের হাতে মরতে পারেন না...কোনো প্রতিপক্ষের হাতেই না!' চিৎকার করলো মানু।

যদিও মনের গভীরে সে জানতো তার বাবার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বাধা একের পর এক জমা হচ্ছে। মানুর শেষ আশা ছিলো বিভাষণ পূজারিকে উদ্ধার করা। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তার বেরিয়ে আসার পর অনুসারীদের জেদের কারণে সোমদত্ত, তারা আর শেষ কয়েকজন মানুষের অস্তিত্ব প্রায় সংকটের মুখে পড়েছিলো। সে যতখানি জানতো, বিভাষণ পূজারিকে উদ্ধারের জন্য কেউই বাকি ছিলো না।

পুরো হরপ্পায় কোনো প্রকার বন্ধু ছাড়াই আমার বাবা মারা গেছেন।

'কীভাবে...আমার বাবা, মহান বিভাষণ পূজারি...তিনি কীভাবে মারা গেলেন?' জানতে চাইলো মানু। তার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। গত কয়েক দিনে সে এমনই সীমাহীন শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে যে তার কষ্ট এখন নির্মম আত্মায় পরিবর্তিত হয়েছে।

'হরপ্পার সূর্য নিজেই তার ক্ষতে আঘাত করেছে...আর তাতেই তার মৃত্যু হয়েছে,' উত্তর দিলেন মৎস্য।

মানু তার বাম হাঁটুতে ভর করে বসে পড়লো। ডান হাত তার ডান পায়ের উপর রেখে মাথা নিচু করে নীরবে তার প্রয়াত বাবার জন্য শোক আর কান্না করছে।

সে খেয়াল করেনি, মৎস্য একবারের জন্যেও বিভাষণ পূজারির নাম উচ্চারণ করেননি। তিনি কখনোই বলেননি, *বিভাষণ পূজারি* মারা গেছেন। তিনি মানুকে শুধু জানিয়েছেন, *হরপ্পার সূর্য* আর নেই।

তিনি ঠিকই বলেছেন।

* * * * *

কেবল মৎস্য জানতেন তিনি কী করছেন। আর অধর্মের উপরে ধর্মের বিজয়ের জন্য, অশুভের উপর শুভের বিজয়ের জন্য তিনি এই কাজ বারবার করবেন। আজকের দিনের হাজার বছর পরে এসেও তিনি এক যোদ্ধা বাবাকে বলবেন, তার একমাত্র সন্তান যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, যখন আদতে দেখা গেল শুধু একটা হাতিই মারা গেছে। আজ তিনি এক যোদ্ধা সন্তানকে জানাচ্ছেন, তার প্রিয় বাবা মারা গেছে। যদিও, বাস্তবিক অর্থে বিতাষণ পূজারির কেবল 'ধার্মিকতা' হারিয়ে গেছে।

কেবল মৎস্যই সময়ের অগ্রগামীতায় নজর রাখতে সক্ষম। তিনি এই মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির বিদ্যা সম্পর্কে জানেন। আর তা হলো, মানব জাতির সংরক্ষণ।

মানুষকে তার নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করা ছাড়াও আরো বড় স্বার্থে প্রয়োজন।

'দয়া করে ভক্ত ত্রিজাতের অভিবাদন গ্রহণ করুন, গুরুদেব!'

এই কথাগুলো যখন বলছিলো, তখন মঠাধীশের প্রতি নমস্কার প্রদর্শন করতে ত্রিজাত কাপালিক তার হাত দিয়ে একটা অর্ধবৃত্ত আঁকলো। নাটুকেপনা সব সময়ই ত্রিজাতের চিরস্থায়ী সঙ্গী, কিন্তু তা কখনোই তার শীতল মেজাজকে উগ্রতায় পরিণত করেনি।

'এখানে তোমার কী কাজ, মশান-রাজ?' প্রশ্ন করলেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

'শুধু আপনাকে দর্শনের ইচ্ছা, গুরুদেব,' ত্রিজাত কিছুটা অসৎ সুরেই বললো কথাটা। 'কিন্তু দয়া করে আমাকে ঐ নামে ডাকবেন না। আপনি যত দিন কাশীতে আছেন, আপনি ছাড়া আর কেই বা আছে অন্য ভূবনের রাজত্ব করবে?'

আচমকা ত্রিজাতের নজর গেল বিদ্যুতের প্রতি। বিদ্যুতের চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো সে। তার মাথা এখন কুটিলভাবে একদিকে বাঁকানো। এখন দেবতা পুরোপুরি মহাতান্ত্রিকের দিকে তাকাতে পারছে।

ত্রিজাত এক ভয়ানক দর্শন সৃষ্টি। খুব লম্বা না, তবুও দেখে একপ্রকার দানবই মনে হয়। তার মূল উচ্চতার সাথে আরো দশ ইঞ্চি যুক্ত হয়েছে মাথার উপরে বাদামি রঙের জটাধারী চুলের বড় আকারের কৌণিক ঝুঁটির জন্য। এটা তান্ত্রিকদের মাঝে খুবই জনপ্রিয় এক খোঁপা। বাকি চুলগুলো মোট দুইটা ভাগে ভাগ করা। এমনই লম্বা যে কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। চোখদুটো গাঢ় লাল সিঁদুরে পেস্টের মতো রং। তাতে মনে হচ্ছে, তার বাকি সাদা, ছাই বর্ণের মুখের বিপরীতে উজ্বলভাবে জ্বলজ্বল করছে। তার লম্বা দাড়িতে কিছু সাদা চুলের দেখা মেলে, যেটা ত্রিজাতের বয়সকেই নির্দেশ করে। তার পরনে মানুষের দাঁত, হাড় আর নখে বানানো কয়েকটা মালা, যা প্রাণীর হাড় আর জ্যোতিষ রত্নপাথর দিয়ে আলাদা করা। তার বৃদ্ধাঙ্গুল এবং অন্য সব আঙুলে বিশের উপর আংটি পরা; ওগুলো তার লম্বা, কালো, আগুনে পোড়া ত্রিশূলকে ধরে রেখেছে। কিন্তু ত্রিজাতের ভয়ংকর

ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে ভয়ানক দিকটি হলো তার হাতে ধরা লাঠিতে আটকে রাখা মানুষের মাথার খুলি। সেই খুলির সবকটা দাঁত অক্ষত আর সেটার মুখ খোলা, যেন ওটা অবন্যভাবে উচ্চ স্বরে হাসছে।

* * * * *

'গুরুদেব, আপনার প্রপৌত্রকে সে যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফেরত পাঠান,' ভদ্রভাবে বললো ত্রিজাত। তার অপ্রতিরোধ্য চোখ, ভয়ানকভাবে সেই নকল অসৌজন্যকে অস্বীকার করছে।

কথাগুলো শুনে জমে গেলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। তার বিশ্বাস হচ্ছে না ত্রিজাত কাপালিক বিদ্যুতের নাম উচ্চারণের সাহস করছে। মঠাধীশ কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই বলভান্ত তার চকচকে চাপাতি খানিক বের করে মহাতান্ত্রিকের দিকে এগিয়ে গেল। বিদ্যুৎ তার বাহু চেপে ধরলো, যদিও তার এমন বাধার পরেও ত্রিজাতের বাহিনী অপ্রত্যাশিতভাবে জবাব দেয়। এলোমেলো আর জটাধারী চুলের দুই ভয়ংকর-দর্শন নারী ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে এসে মৈনাক তান্ত্রিকের সামনে অবস্থান নেয়। কুৎসিত দেখতে এই দুই জমজের মুখ দেখতে লাশের মতোই রুগ্‌ণ, কিন্তু তাদের রক্তলাল চোখ উত্তেজিতভাবে বলভান্তের দিকে তাকিয়ে। যেন তাকে কিছু একটা করার জন্য হুমকি জানাচ্ছে।

বিদ্যুৎ হলফ করে বলতে পারে, এই দুজন তার দেখা সবচেয়ে ভয়ানক জীব। ত্রিজাতের পুরো দলকেই গবলিনের মতো লাগছে। তবে এই দুজনের রক্ত হিম করা উপস্থিতি বাকিদের ম্লান করে দিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে, বীভৎস চেহারার অবতার বানিয়ে ফেলার আগে তারা দুজনেই সুন্দর দুজন নারী ছিলো। ওরা বিদ্যুৎকে অতিপ্রাকৃত ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত পিশাচিনীর কথা মনে করিয়ে দিলো, যাদের নিয়ে ন্যায়না, পুরোহিতজি আর দ্বারকা শাস্ত্রী বলেছিলেন। প্রচণ্ড শব্দ করে শ্বাস নিচ্ছে ওরা, যেন কালো জাদুর অধীনে বা শক্তিশালী বিষক্রিয়ার মধ্যে আছে। চোখগুলো উলটানো আর মুখ খানিকটা খোলা। বুক আর পায়ে চামড়ার নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে ঢাকা। শরীরের বাকি অংশে শ্মশানের ছাই ঘষে দেওয়া হয়েছে। মুহূর্তের মাঝেই বিদ্যুৎ বুঝতে পারলো, তাদের বাহু আর গলায় প্যাঁচানো ট্যাটুতে গরুড় পুরানের সবচেয়ে ভয়ানক শ্লোক লেখা আছে। গরুড় পুরাণ সেই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ যেখানে মৃতদের জন্য নরকের ভয়ংকর সব শাস্তির কথা বলা আছে। দুই বিকারগ্রস্ত প্রাণীর কোমর থেকে রক্তমাখা ভোঁতা কাস্তে তখনো ঝুলছে।

* * * * *

'তোমার নোংরা মুখে আমার প্রপৌত্র বিদ্যুতের নাম উচ্চারণ করে তুমি তোমার সীমালঙ্ঘন করেছ, কাপালিক। তুমি যদি রুদ্রের উপাসক না হতে, তবে তুমিও আজকে তোমার মৃত সেনাদের দলে নাম লেখাতে।' দ্বারকা শাস্ত্রী রাগে রীতিমতো কাঁপছিলেন।

'আমায় ক্ষমা করবেন, গুরুদেব। আমি কেবল তার নিরাপত্তার জন্যই বলছিলাম। বিদ্যুৎ একজন রক্ষাকর্তা, তাই নয় কি? এই মঠের চারপাশে যে বিপদ ওঁৎ পেতে আছে, বিদ্যুতের এসবের মাঝে থাকা উচিত না।'

আরো একবার সরাসরি বিদ্যুতের দিকে তাকালো ত্রিজাত। যেন তলিয়ে দেখতে চাইছে, তাকে যেমনটা বলা হয়েছে, বিদ্যুৎ আসলেই তেমন কি না। তার সকল কালোবিদ্যা আর পাপের কারণে মশান-রাজ এমন শক্তি অর্জন করেছে যা সাধারণ মানুষের কাছে অজানা। কয়েক মুহূর্ত পর সে নজর সরিয়ে নিলো। বিদ্যুতের মুখের অস্বাভাবিক সততা আর উজ্জ্বলতা তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে।

সে বিশ্বাস করলো। বিশ্বাস করলো যে বিদ্যুৎ সম্পর্কে যা বলেছে, সে আসলেই তাই।

'চলে যাও, ত্রিজাত!' হুংকার দিলো বলভান্ত।

বলভান্তের দিকে নজর দিতেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ত্রিজাত। তার দলবল নিজেদের সহজাত আগ্রাসী উপায়ে সাড়া দিলো।

ঢক! ঢক!

ঠং! ঠং!

হঠাৎ ত্রিজাত হাসি থামিয়ে হাত উপরে তুললো। তার অনুসারীরা সাথে সাথেই তাদের প্রভুর আদেশ রক্ষা করলো। থেমে গেল বিকট শব্দের প্রতিধ্বনি।

দ্বারকা শাস্ত্রীর দিকে ফিরলো ত্রিজাত। মহান মঠাধীশ আর নিজের মাঝে কালো ত্রিশূল রাখলো। আর বের করে আনলো একটা অলক্ষুনে মাথার খুলি। দ্বারকা শাস্ত্রীর নজর বরাবর মাথার খুলিটা তুলে ধরলো। এরপর মাথা নুইয়ে বললো, 'কপাল অর্পণ গ্রহণ করুন, গুরুদেব।'

দ্বারকা শাস্ত্রী নড়লেন না।

'চলে যাও, ত্রিজাত,' এটুকুই বললেন তিনি।

ত্রিজাত কাপালিক একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উপরে তাকালো। স্পষ্টতই আঘাত পেয়েছে সে। যদিও এটা মহাতান্ত্রিকের একটা নাটুকেপনা বলা চলে।

'আপনি আমার সবচেয়ে বড় উপহার ফিরিয়ে দিচ্ছেন, গুরুদেব?' জানতে চাইলো সে। ভাবটা এমন যেন সে একই সাথে চমকিত আর হতাশ। 'আপনি আমার কপাল অর্পণ গ্রহণ করবেন না?'

'যাও।' গর্জে উঠলেন মঠাধীশ। বিদ্যুৎ তার বাবাকে জড়িয়ে ধরলো, আশা করছে কিছুটা শান্ত হবেন তিনি। সে খেয়াল করলো, ভয়ংকর ঐ দুই বোন ধীরে ধীরে অঘোরীদের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো, অন্তত এখনকার মতো।

ত্রিজাত দ্বারকা শাস্ত্রীর দিকে তাকালো। তার সারা মুখে ঘৃণা আর অবাধ্যতার লক্ষণ স্পষ্ট। দেব-রাক্ষস মঠে প্রবেশ করার পর থেকে এই প্রথম ত্রিজাত নিজের আসল রূপ দেখালো।

'কপাল অর্পণ তো আজ হবেই, প্রভু,' হিসহিস করে বললো ত্রিজাত। 'কপাল অপর্ণ তো হবেই...'

ত্রিজাত কী বলতে চাইছে, সেটা ঠিক বুঝতে পারলো না বিদ্যুৎ। এমনকি মহান দ্বারকা শাস্ত্রীও অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি জানতেন এটাকে হালকাভাবে নেওয়ার কিছু নেই। ত্রিজাতকে কখনোই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। মশান-রাজ, মহাতান্ত্রিক, ত্রিজাত কাপালিক শ্রদ্ধাভরে দ্বারকা শাস্ত্রীকে প্রণাম করে চলে গেল।

* * * * *

'আমাদের কথা বলতে হবে,' অঘোরীদের দলটা চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই বিদ্যুৎকে বললেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

'হ্যাঁ, বাবা, আমি তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আপনার কাছ থেকে জানা এবং শোনার মতো আমার অনেক কিছুই আছে।'

গোত্র প্রধান মাথা নাড়লেন। 'আজকে সন্ধ্যার পর আমার ঘরে দেখা কোরো, বাছা।'

'নিশ্চয়ই বাবা, আমি থাকবো,' উত্তর দিলো বিদ্যুৎ। 'কিন্তু আমার এখন একটা প্রশ্ন করার আছে...'

দ্বারকা শাস্ত্রী প্রশ্নটা শোনার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন।

'এই ত্রিজাত কপাল অর্পণ বা মাথার খুলি আজকেই দেওয়া হবে বলে কী বোঝাতে চাইলো?'

উত্তর দেওয়া সময় মহান মঠাধীশকে চিন্তিত মনে হলো, 'এর মানে খুব ভয়াবহ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ত্রিজাত কাপালিক খুবই বিপজ্জনক একজন ব্যক্তি। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

* * * * *

বিদ্যুৎ আর বলভান্ত সিদ্ধান্ত নিলো বালার সাথে তাদের কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার জন্য। সনুকে কারাগারের তালা খোলার জন্য আগেভাগে পাঠানো হলো। ওরা নিষ্টশব্দে ওকে অনুসরণ করে গেল কেবল। ত্রিজাত কাপালিকের সাথে এই সাক্ষাৎ সবাইকে চাপে ফেলে দিয়েছে। একমাত্র যে বিষয়ে বিদ্যুৎ স্বস্তি পাচ্ছিলো তা হলো, বালা স্বচ্ছন্দে কথা বলছে। এতসব কিছু হয়ে যাওয়ার পরেও কিছু একটায় তার মনে হচ্ছিলো, সে তার পুরোনো বন্ধুকে ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

কারাগারের করিডরে প্রবেশ করতেই তারা দেখলো সনু কাঁপছে। তাকে দেখে মনে হলো, সে এইমাত্র ভূত দেখে এসেছে। বিদ্যুৎ আর বলভান্ত কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সনু এককোনায় ছুটে গিয়ে টানা বমি করতে শুরু করলো।

কক্ষের দরজাটা অর্ধেক খোলা, মাথার উপরের অদ্ভুত আলোর আভা করিডরের একটা অংশকে আলোকিত করে তুলেছে। বিদ্যুৎ কিছুটা উদ্বেগ নিয়েই সনুর দিকে তাকিয়ে আছে। তখনই সে কাঁধে বলভান্তের টোকা অনুভব করলো। বিদ্যুৎ ঘুরতেই বলভান্ত নিঃশব্দে দরজার তালার দিকে ইঙ্গিত করলো। এটা চাবি দিয়ে খোলা হয়নি। ভাঙা অবস্থায় ঝুলে আছে।

বালা কি পালিয়ে গেল?

বিদ্যুৎ আর বলভান্ত দুজনেই এবার দৌড়ে গেল ঘরটার দিকে। ভারী ধাতব দরজাটা লাথি দিয়ে খুলে ফেললো। তার চাপাতি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত।

যা দেখলো, তাতে তাদের স্নায়ু অবশ হয়ে পড়লো।

ঘরের মেঝে আর দেয়ালে রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে যে নৃশংস ধরপাকড় হয়েছিলো, তারই একটা প্রমাণ এটা।

মাথার উপরের ঠান্ডা সাদা আলোর নিচে লোহার টেবিল থেকে মানুষের রক্ত টপটপ করে পড়ছে। সেই টেবিল, যেখানে বালা তার রামের গ্লাস রেখেছিলো। আর টেবিলের উপর যেটা পড়ে আছে, নিশ্চিতভাবেই ওটা কোনো ভোঁতা কাস্তের কাজ।

বালার কেটে ফেলা মাথা।

চোখদুটো সম্পূর্ণ উলটানো আর মুখটা ঠিক ত্রিজাতের ত্রিশূলে থাকা খুলির মতো করেই খোলা।

এবার বিদ্যুৎ বুঝলো। কথাগুলো তার মনে বাজছে।

'কপাল অর্পণ তো আজ হবেই, প্রভু...কপাল অর্পণ হবে...'

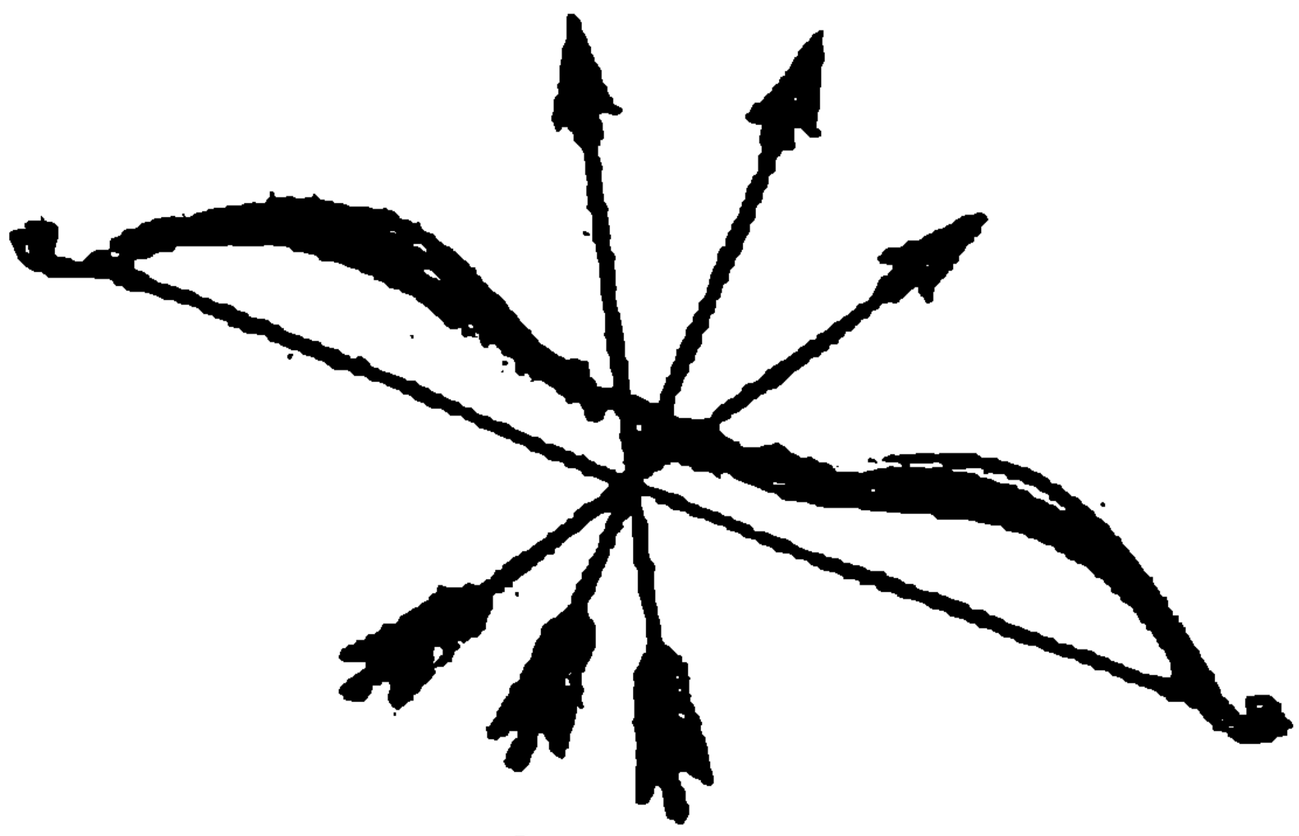

হরপ্পা, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

যুদ্ধের পাহাড়

ইট আর ব্রোঞ্জের বানানো সবচেয়ে উঁচু ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ক্ষুধার্ত শকুন তার শিকারকে যেমনভাবে দেখে, তিনিও হরপ্পান সৈন্য আর সেনাদের সেইভাবে দেখছিলেন। রাতটা অন্ধকার। আর বিভাষণ পূজারি তার প্রতিশোধ পরিকল্পনার প্রথম মৃত্যুর জন্য তৈরি। এমন মৃত্যু যা রক্তে ডুবে যাবে।

বিস্তীর্ণ হরপ্পান এলাকা জুড়ে পরিবেশের অবস্থা ভূমিতে প্রথম কম্পনের পর থেকেই দ্রুত খারাপ হচ্ছিলো। আর হিংস্র সরস্বতী নিজের সর্বোচ্চ শক্তি এই সন্দেহমুক্ত উদ্ভিদ ও লাখ লাখ মানুষের মাঝে প্রকাশ করে দিয়েছিলো। দিনটা শুরু হয়েছিলো কেবল কয়েক ঘণ্টার মাঝেই মিলিয়ে যাওয়ার জন্যে। ভয়ানক রাতটা স্বাভাবিক দৈনিক চক্রের একটা অংশকেই গ্রাস করে নিয়েছিলো। যতই সময় যাচ্ছে, ততই সরস্বতী এতটাই ফুলে ফেঁপে উঠছিলো, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এর সমুদ্রের মতো পানি দুই পাড়ের শত শত গ্রাম প্লাবিত করেছে, সেই সাথে ডুবিয়ে দিয়েছে হাজারো কৃষক পরিবার আর গবাদি পশুকেও। খুব কম মানুষই এখন একে জ্ঞানের নদী সরস্বতী বলে উল্লেখ করে। নদীটা বদলে গেছে, আর সেটাই এখন স্থায়ী। সে এখন রক্তধারা–রক্তের নদী। বজ্রপাত, প্রবল বর্ষণ আর টানা ধূলিঝড় পুরো আর্যাবর্তের জীবনধারা অচল করে দিয়েছে। প্রত্যেকেই বুঝে নিয়েছে, তাদের মাঝে কেউ একজন

ভয়াবহ পাপ করেছে। আর সেজন্যই দেবতারা তাদের সম্পূর্ণ ক্রোধ নিয়ে আঘাত করছেন। দেবতাদের অত্যাচারের দর্শক আর সহযোগী হয়ে তারা কেবল এটুকুই বুঝেছে, তারা প্রত্যেকেই অমার্জনীয় অপরাধের অপরাধী।

মেসোপটেমিয়ার কালো জাদুকর গান, শা আর এপের অপবিত্র পানীয়ের নেশার প্রভাব কাটতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও হরপ্পান নাগরিকরা নিজেদের সহজাত শান্তিপূর্ণ আর আত্মমর্যাদাবোধ ফিরে পায়নি, তবে ধীরে ধীরে গত তিন দিন ধরে গ্রাস করে রাখা নিষ্ঠুর বর্বরতা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সূর্যের কাছে নিজেদের অন্যায়ের স্বীকারোক্তির গুনগুন শব্দ শোনা যাচ্ছে। এমনকি কারো কারো চোখ থেকে অনুশোচনার কান্নাও পড়তে দেখা গেল। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। সানজানা আর বেঁচে নেই। মানুও সম্ভবত মৃত। আর সূর্য এখন তার স্বাভাবিক স্বভাবের বাইরে মৃত্যু এবং ধ্বংসের দেবতায় পরিণত হয়েছেন।

অসহায় হরপ্পাবাসীর দুর্দশা ছিলো বেশ কষ্টদায়ক। একদিকে তারা নিজেদের শেষ সময়টা দেখতে পাচ্ছে, অন্য দিকে এও বুঝতে পারছে, তাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। একদিক থেকে ওরা বুঝতে পারছে, তাদের শেষ সময় ঘনিয়ে আসছে, আর অন্যদিকে তাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই। তারা জানতো, কৃষিকাজ, মাছধরা কিংবা পানি পান করার মতো একটা জীবনদায়ী নদী ছাড়া নতুন একটা জনবসতি স্থাপন করা একেবারেই অসম্ভব। যেসব ভ্রমণকারী পূর্ব দিকে কয়েকশো যোজন পেছনে ছিলো, প্রত্যেকেই খরা আর ধুলোর গল্প নিয়ে ফিরে এসেছে। তাদের এই নৃশংস ভাগ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো অবকাশই ছিলো না। রাতভর চিৎকারের মাঝেই মায়েরা তাদের বাচ্চাকে ধরে রেখেছে। বাবারা সবাই জড়ো হয়েছিলো তাদের প্রিয়জনকে বাঁচানোর একটা উপায় খুঁজে পেতে। তবে তাদেরকে হতাশ হয়েই ফিরতে হয়েছে। হরপ্পা নগরীর প্রতিটা বাড়ি, প্রতিটা মন্দির এখন যজ্ঞ এবং প্রার্থনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে মুক্তি আর ক্ষমা ভিক্ষার আয়োজন ছিলো পুরো শহরে।

কিন্তু ঈশ্বর এতে সাড়া দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই। এই বিপথগামী মানুষগুলো তাদের সামগ্রিক উন্মাদনার মাধ্যমে তাদের সূর্যকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছিলো। আর সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সূর্যই এখন উঁচু স্থান থেকে তাদের দেখছে। আর প্রস্তুতি নিচ্ছে নিজের ক্রোধের আগুনে তাদের পুড়িয়ে মারার জন্যে।

'কমপক্ষে এক হাজার সৈন্য,' বিভাষণের উদ্দেশে বললো প্রচণ্ড। কণ্ঠের সবটুকু জোর দিয়ে কথা বলতে হচ্ছে, যেন রাতের এই প্রচণ্ড বেগের বাতাসের

মাঝেও তার কণ্ঠ শোনা যায়। 'আর এটা রাতের শিফট। দিনের বেলায় সংখ্যাটা দ্বিগুণেরও বেশি হবে।'

বিভাষণ মাথা নাড়লেন। প্রচণ্ড যে সংখ্যা নিয়ে তাকে সতর্ক করছে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই তার। তার চোখ লক্ষ্য ঠিক করে রাখছে–দুইশো মিটার নিচে নির্মাণকেন্দ্র ঘিরে হরপ্পান সেনারা কৌশলগত অবস্থান নিয়েছে। পুরো জায়গাটা শিল্পাঞ্চলের বড় বাতি আর আগুন দিয়ে আলোকিত করা। এই ঝড়ো বাতাসে টিকে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ওদের। শেষ তিন দিন ধরে মানুষের ক্ষতির চিন্তায় আঘাতের ক্ষেত্রে নিজের আসল রূপ দেখাননি। আর এই দরকষাকষিতেই সবকিছু হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। এই ভুলের আর কোনো পুনরাবৃত্তি ঘটতে দিতে চান না বিভাষণ। দেবতার যুদ্ধ ঘোষণার পুরো উত্তাপই হরপ্পান নাগরিকরা টের পাবে এবার।

'আমি বাজি করবো, খাড়া নেমে যাওয়ার সেই লম্বা লাফ,' জানালেন বিভাষণ।

কথাটা শুনে প্রচণ্ড আর তার সাথে থাকা বাকিরা খানিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইলো। পরিকল্পনা ছিলো নির্মাণসামগ্রী, যন্ত্রপাতি আর হরপ্পার নতুন রাজা পণ্ডিত চন্দ্রধরের আদেশে যারা ইট ও তামা দিয়ে এই বাঁধ নির্মাণ করছে তাদের আটক করা। এই দুর্ভাগা রাজা আসলে বিভাষণ পূজারির পরিকল্পনা অনুসরণ করে চলেছেন। মানুষের নির্মিত বাঁধ তিনি ব্যবহার করছেন ভয়াবহভাবে বাঁক নেওয়া সরস্বতীকে আটকানোর জন্য। কিন্তু নিজস্ব দক্ষ কারিগর ছাড়া একটা পরিকল্পনার কাজই বা কী?

তার নতুন সাহায্যকারীদের বিস্ময় পুরোপুরি উপেক্ষা করেই বিভাষণ বললেন, 'তোমাদের কাছে থাকা পশুর চামড়ার সবচেয়ে বড় দড়িটা আমাকে এনে দাও। আমাদের হাতে সময় খুবই কম।'

'কিন্তু অ-বিভাষণ, এই খাদ অনেক গভীর। এরকম উচ্চতা থেকে আগে কেউ বাজি করেনি। হয় দড়ির ভার নিতে না পেরে ছিঁড়ে যাবে, অথবা আপনি তীরের মতো প্রচণ্ড বেগে মাটিতে আছড়ে পড়বেন!'

বাজি কিংবা প্রতিবন্ধক লাফ হরপ্পায় খুবই প্রচলিত ছিলো, এমনকি অসুর রাজ্যেও। প্রাথমিকভাবে এটা চোরাগুপ্তা হত্যার জন্য ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এর উচ্চতা, মানে যেখান থেকে আক্রমণকারীর কোমরে চামড়ার দড়ি বেঁধে লাফ দেওয়া হতো, সেটা কখনোই একটা গাছ কিংবা তিন তলা সমান বাড়ি থেকে বেশি হতো না। বিভাষণ পূজারি যে পরিকল্পনা করছেন সেটা আগে কেউই শোনেনি আর অনেক বেশিই বিপজ্জনক।

কিন্তু এরপরেও তিনি তৈরি। একটা দড়ি, যা যত্ন নিয়ে মেপে কোমরে বেঁধেছেন, আর অন্য প্রান্ত বাঁধা হয়েছে ইট-তামায় বানানো একটা বিশাল ব্লকের সাথে। তার বাম উরুতে একটা তূণ ভরতি করে প্রাণঘাতী সব তীর রাখা। প্রতিটা তীরের মাথা আলতোভাবে তূণের সাথে আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখা হয়েছে যেন দেবতা নিজে টান না দিলে সেসব ছিটকে না যায়।

'তৃতীয় বা চতুর্থ পাক খাবার পর আমি যেই না মাটিতে পা রাখবো, তোমার পদাতিক সেনাদের আদেশ দেবে পুরো এলাকাটা ঘিরে ফেলার জন্যে। যেসব সেনারা বাধা দেবে, তাদের সেখানেই মেরে ফেলবে আর বাকিদের বেঁধে রাখা হবে। তাদেরকেও এই বিশাল প্রকল্পে কাজে লাগানো হবে।'

সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লো প্রচণ্ড আর তার দল।

বিভাষণ পূজারি সিদ্ধান্ত নিলেন ধার থেকে লাফ দেওয়ার আগে তার শত্রুপক্ষ, হরপ্পান সেনাদলের বুকের ভেতরে একটা ভয় ধরিয়ে দেবেন। পাশে থাকা অসুর সেনাদের বিস্মিত করে দিয়ে একবারে চারটা তীর বের করে আনলেন তিনি। দক্ষতার সাথে ধনুকে রাখলেন ওগুলো, লক্ষ্যস্থির করে চারটা তীরই একসাথে ছুঁড়ে দিলেন। এমনকি প্রথম ছোঁড়া তীরগুলো বাতাসে থাকতেই দেবতা আরো চারটা তীর বের করে এনে ছুঁড়ে দিলো। তারপর আবার। তার তীরের আলোর মতো গতি আর নিখুঁত নিশানা অসুর সেনা আর তাদের সেনাপতি প্রচণ্ডের জন্য প্রচণ্ড বিস্ময়কর ছিলো। মুহূর্তের মধ্যেই দেবতার তীরগুলো নিজেদের লক্ষ্যে আঘাত হানলো, আর বারোজন হরপ্পান সেনা কাটা পড়লো একসাথেই। উঁচু-নিচু জায়গায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে একসাথে পড়ে গেল ওরা।

দেবতা এবার কয়েক পা পিছু হটলেন, আর তারপরেই ধারের দিকে দৌড় শুরু করলেন। ক্ষিপ্র বাজপাখির মতো করেই নিখুঁতভাবে ঝাঁপ দিয়ে নিচের দিকে উড়ে গেল যেন। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ বলের কারণে নিচের দিকে গতি বাড়তে থাকা অবস্থাতেই তিনি আরো দুবার তীর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। আর প্রতিটা তীরই লক্ষ্যে আঘাত করেছিলো। নিজেদের সেনাদের চারদিকে ছিটকে পড়তে দেখে হরপ্পান সেনাবাহিনীতে সাথে সাথেই হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। আর আচমকাই তাদের কেউ কেউ একটা এক-চোখা ভূতকে আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখে, তবে সেটা এক নিমেষেই উধাও! এখন সব দক্ষযজ্ঞই ভেঙে পড়েছে। যেসব শ্রমিক ইট বহন করছিলো কিংবা পাথরের ব্লক টানছিলো, সবাই সবকিছু ফেলে পালাতে শুরু করেছে। দায়িত্বে থাকা হরপ্পান সেনাদের আরো বিচলিত করে দিয়ে আরো বেশ কিছু তীর কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এলো।

প্রচণ্ড সবকিছু ভয় আর-সমীহ নিয়ে দেখছিলো। এমন অনুভূতি তার আগে অন্য কারো জন্যই হয়নি। এমনকি তার সাহসী রাজা সুরার জন্যেও না।

'এক হাজারজনের বিরুদ্ধে তিনি একা, আর তারপরেও তিনিই জিততে যাচ্ছেন!' নিজেকেই বিড়বিড় করে কথাটা শোনালো প্রচণ্ড। 'আসলেই তিনি অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ঈশ্বর...'

* * * * *

সূর্য-ঘড়িটা একবার ঘুরে আসার আগেই সবকিছু শেষ হয়ে গেল। নিজের তলোয়ার ব্যবহার করে দড়ি কেটে নেওয়া বা মাটিতে নেমে আসার আগেই প্রায় একশত সেনাকে হত্যা করেন বিভাষণ পূজারি। বিশ বা তার চেয়েও বেশি সেনা তাকে ঘিরে ছিলো, তাদের সবাইকেই মুহূর্তের মাঝেই টুকরো টুকরো করে ফেলেছেন। যে ক্ষিপ্রতায় দেবতা তার তলোয়ার চালালেন, সেটা শত্রুর জন্য নিছক অস্পষ্টতা ছাড়া আর কিছুই না। তাদের সবার জীবনের শেষ দর্শন।

সুরা এবার যুদ্ধের মাঝে প্রবেশ করলো। সাথে তার সেনারাও এখন হরপ্পান প্রতিরোধকারীদের মাথা কাটছে কিংবা বেঁধে রাখায় ব্যস্ত। ছোটখাটো, একপেশে যুদ্ধে জয় চলে এলো সহজেই।

অসুর-রাজ ঘোড়া থেকে নেমে বিভাষণ পূজারির দিকে এগিয়ে গেল। তিনি এখন একটা বড় পাথরের ব্লকে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো। হাতদুটো সামনে গর্বিত ভঙ্গিতে মাটিতে পুঁতে রাখা তলোয়ারের উপর রাখা। রত্ন-মরু এখন রক্তে ভেজা।

'আপনি যেকোনো তুলনারই উর্ধ্বে, হে মহান অ-দেবতা!' বিভাষণ পূজারির প্রতি মাথা নুইয়ে বললো সুরা। এই পৃথিবীতে এর আগে অন্য কারো সামনেই সুরা মাথা নত করেনি। 'ইতিহাস কখনোই আপনাকে ভুলে যাবে না।'

'স্পষ্ট করে বললে, আমি ইতিহাসকেই মুছে দিতে চাইছি, সুরা,' উত্তর দিলেন বিভাষণ।

সুরা জানতো বিভাষণ কী বোঝাতে চাইছেন। দেবতাকেই কথা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিলো সে।

'কেউই আমাকে মনে রাখবে না। তবে তার চেয়ে বড় কথা...কেউই কোনোদিন জানবে না হরপ্পার ভাগ্যে কী ঘটেছিলো।'

* * * * *

'তো এবারের পরিকল্পনা কী?' জানতে চাইলো প্রচণ্ড। এখন তারা একটা জ্বলন্ত আগুনের সামনে জড়ো হয়েছে।

'এই প্রকল্পের প্রধান প্রকৌশলীকে আমার সামনে নিয়ে আসো,' আদেশ দিলেন বিভাষণ।

খানিক পরেই মধ্যবয়স্ক একজনকে দেবতার সামনে নিয়ে আসা হলো। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে প্রচণ্ড ভীত। সে চিনতো বিভাষণ পূজারিকে। পুরো হরপ্পাই চিনতো বিভাষণ পূজারিকে। প্রধান প্রকৌশলীর আবছাভাবে মনে পড়ছে কদিন আগেই গ্রেট বাথে হরপ্পার সূর্যকে তিনি কেবল চামড়া ঢাকা অবস্থায় বেঁচে থাকতে দেখেছিলেন। এক অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো করে দেখতে পাচ্ছেন, তিনি এই মহান ব্যক্তিকে পাথর ছুঁড়ে মারছেন। তার মনে পড়লো, মহান বিভাষণ পূজারি সাধারণ প্রাণির মতো মারা যাচ্ছেন, এমন পরিস্থিতিতে খুশিতে হাসছিলেন তিনি। আর এখন তিনি শ্রদ্ধা আর অনুতাপে পরিপূর্ণ অবস্থায় সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে। এটা এই দুর্ভাগার দোষ ছিলো না। যখন মহাবিশ্বের অদৃশ্য শক্তি মানব জাতির ভাগ্যে দুর্ভাগ্যের আঁচড় বসিয়ে দেয়, তখন অনৈতিকতার বিষ গ্রাস করে নেয় ধার্মিকদেরকেও।

বিভাষণ দেখলেন, মানুষটা ভয়ে কাঁপছে। শান্ত কণ্ঠেই তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই বিশাল প্রকল্পের উদ্দেশ্যটা কী, বলো তো, বন্ধু?'

কাঁপতে থাকা সেই মানুষটা উত্তর দিলো, 'যেন...যেন...যেন হরপ্পা থেকে রক্তধারাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায়, প্রভু।'

'দারুণ,' মন্তব্য করলেন বিভাষণ। 'পরিকল্পনায় ছোট একটা পরিবর্তন এসেছে।'

প্রধান প্রকৌশলীসহ সবাই শুনলো কথাটা।

'এই মুহূর্ত থেকে সরস্বতিকে হরপ্পা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে আমরা নিশ্চিত করবো, নদীর গতিপথ যেন এই হতশ্রী শহরের দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়।'

বানারস, ২০১৭
‘আমরাই তাকে দানব বানিয়েছি’

তাদের সামনে পিলারের মতো দেখতে সারনাথের সুন্দর ধামেক স্তূপের গম্বুজটা দাঁড়িয়ে আছে। শান্তি এবং আধ্যাত্মিকতার এক পবিত্র স্থান হওয়ার পরেও মুখোমুখি বসে থাকা দুই বিধ্বস্ত মন আর আত্মাকে কোনো প্রকার স্বস্তির সুবাতাস দিতে পারছে না এটি।

দামিনী অসহায়, ভীত আর বিচলিত বোধ করছে। নিশ্চল বসে আছে বিদ্যুৎ, মুখে যেন পাথর জমে আছে।

‘বিদ্যুৎ, আমাকে কথা দাও, রাগের মাথায় তুমি যা-তা করে বসবে না,’ জোর করে কথাটা বললো দামিনী। সে দেখতে পাচ্ছে, বিদ্যুৎ রাগে জ্বলছে।

বিদ্যুৎ জবাব দিলো না। দামিনী দেখতে পাচ্ছে প্রচণ্ড ঘৃণায় আর রাগে দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে সে। সে জানতো, দেব-রাক্ষস মঠের ভেতরে একটা নৃশংস খুন করে ত্রিজাত বিদ্যুতের উদ্দেশে একটা হুমকিই ছুঁড়ে দিয়েছে।

আর বিদ্যুৎকে ভালোভাবে বোঝার কারণে জানে, সে বিষয়টা সহজে ছেড়ে দিবে না।

* * * * *

বুদ্ধ গয়া, কুশিনগর আর লুম্বিনীর পাশাপাশি সারনাথ ছিলো সেই চার প্রাথমিক তীর্থস্থানের একটি, যা স্বয়ং বুদ্ধ উল্লেখ করে গেছিলেন। বানারস থেকে আনুমানিক ১৩ কিলোমিটার দূরের এই জায়গাতেই বুদ্ধ তার প্রথম ধর্মীয় উপদেশ দিয়েছিলেন। বিদ্যুৎ দামিনীকে কথা দিয়েছিলো এই সুন্দর ও পবিত্র স্থানে নিয়ে যাবে। তার ভয়াবহ দুঃস্বপ্নেও সে ভাবতে পারেনি, এই ভ্রমণ এমন পরিস্থিতির মাঝে হবে।

লম্বা লনের ঘাসের উপর পা ভাঁজ করে বসে আছে দুজন। হতাশ, আর দিশেহারা। বিদ্যুৎ তার বিপথগামী বন্ধুর কাটা মাথার দুই চোখের সেই রক্ত হিম করা দৃশ্যটা ভুলতে পারছে না।

কেন ওকে আমরা বেঁধে রাখলাম? বালা নিজেকে বাঁচাতে পারতো! কেন আমরা ওকে বেঁধে রাখলাম?

এই ঘটনা পুরো দেব-রাক্ষস মঠকে নাড়িয়ে দিয়েছে। মঠের শত বছরের ইতিহাসে এত কম সময়ে আর এত হিংস্রভাবে কখনোই এর নিরাপত্তা ভাঙা হয়নি। এর বাসিন্দাদের মাঝে ভয় ঢুকে গেছে, আর মহান দ্বারকা শাস্ত্রী এক গভীর, অস্বাভাবিক পাপবোধে ভুগছেন। তার হতাশা এ কারণেই যে তিনি কেবল তার মেধাবী পূর্বপুরুষদেরই হতাশ করেননি, যারা কিনা এই মঠকে লুটেরা, নৃশংস বাহিনী, ধর্মান্ধ সুলতানদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, পরিচালনা করেছেন। সেই সাথে যে আবশ্যকীয় দায়িত্ব তার উপরে ন্যস্ত ছিলো তাও করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বিদ্যুৎকে যেকোনো মূল্যেই রক্ষা করতে হবে! আর যদি মঠের নেতার চোখের সামনে বালার মাথা কেটে ফেলা হয়, তাহলে বিদ্যুৎ কি নিরাপদ?

এই ঈশ্বর-শয়তান মঠ এখন পালটা আক্রমণ করার অবস্থায় আছে। মঠাধীশের প্রথম এবং তাৎক্ষণিক আদেশ ছিলো, দামিনীকে তার গুরগাঁও শহরের বাড়ি এবং জীবনের নিরাপত্তায় ফিরে যেতে হবে। তার ভাঙা মনের প্রতিবাদ পাত্তা পায়নি কারণ বিদ্যুৎ নিজেই তার ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো। মঠের একজন দক্ষ যোদ্ধাকে দামিনীর অজান্তে আগেই গুরগাঁও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। তার কাজ, খুব কাছ থেকে কিন্তু অদৃশ্য থেকে দামিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সারনাথে তাদের এই ভ্রমণটাই বানারসে দামিনীর শেষ দিন।

অন্তত এখনকার জন্য।

* * * * *

বিদ্যুতের মনোযোগ আকর্ষণ করতে আঙুল নাড়লো দামিনী। তার সুদর্শন, উদ্বিগ্ন চেহারার দিকে ভালোবাসা নিয়ে তাকিয়ে আছে। কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের পুরো পৃথিবী একেবারেই উলট-পালট হয়ে গেছে। তার প্রচণ্ড আকর্ষণীয়, সফল আর বিখ্যাত বয়ফ্রেন্ড থেকে বিদ্যুৎ এক সপ্তাহের মাঝেই সবার পরিচিত রক্ষাকর্তা বা মেসায়া হয়ে উঠেছে। সে এমন একটা কিছু রক্ষা করতে প্রস্তুত, যেটা পুরো মানব জাতির টিকে থাকার জন্যেই ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ। খুনি, প্রেতাত্মা, তান্ত্রিক, বুলেট, গুপ্তহত্যা, আত্মা আর লুকানো শত্রু–সবার আগ্রহের কেন্দ্র ছিলো সে। সবকিছু এত দ্রুত গতিতে ঘটছিলো যে দামিনী তাতে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারেনি।

সে সবকিছু বিশ্বাসের উপরেই ছেড়ে দিয়েছে। অসীম, অনন্ত, অবর্ণনীয় যে বিশ্বাস তার একজন মানুষের প্রতি সব সময় ছিলো। তার ভালোবাসার পুরুষ।

বিদ্যুৎ।

'কিছু তো বলো, বিদ্যুৎ...কিছু অন্তত বলো...' বললো সে।

বিদ্যুৎ জানতো, এয়ারপোর্টে দামিনীকে ছেড়ে আসার আগে তার হাতে আর মাত্র এক ঘন্টা আছে। তাকে বলার মতো অনেক কিছুই জমে আছে। বিদ্যুতের মন দুঃখে, অনুশোচনা আর উদ্বেগে ভার হয়ে এলো, আর সে জানতো, কেবল দামিনীই সে যা কিছুর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারবে। একমাত্র সে-ই কেবল কান দিয়ে নয়, মন দিয়ে শোনে।

'আমরাই ওকে দানব বানিয়েছি,' সারনাথ মন্দির থেকে দূরে তাকিয়ে বললো বিদ্যুৎ।

'কী বলতে চাইছো?' প্রশ্ন করলো দামিনী।

'সে যে দানব হয়েছিলো, সেটা তাকে আমরাই বানিয়েছিলাম, দামিনী। আমি তার গল্পটা শুনেছি। তার ছেলেবেলার কুৎসিত সত্য আর আমরা তার পরিবারকে যেমন করে ব্যবহার করেছি...'

দামিনী দ্বিধায় পড়ে গেল। বিদ্যুতের সাথে বালার শেষ কথোপকথন সম্পর্কে গোপনীয়তা ছিলো, তাই সে বুঝতে পারছিলো না বিদ্যুৎ কাকে নিয়ে বা কী নিয়ে কথা বলছিলো।

বিদ্যুৎ কথা চালিয়ে গেল। দামিনীও সুযোগ দিলো। জানতো, ওর এখন নিজের ভেতরের সব কথা বলা দরকার।

'এই পৃথিবীতে আমরাই সবচেয়ে পুরাতন, সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী। সত্যি বলতে, কেবল প্রাচীনতম ধর্মের অনুসারীই না। আমরা অসাধারণ এক জাতি, এই সুন্দর উপমহাদেশের জীবনধারা। আমরা শূন্য আবিষ্কার করেছি, গণিতে পাই-এর মান নির্ণয় করেছি। আবিষ্কার করেছি মার্শাল আর্ট, সার্জারি, ঔষধ, দাবা, রাজনীতি, যোগসাধনা...আমরা সেই সময়ে মহাগ্রন্থ বেদ লিখেছি, যখন পশ্চিমারা গুহায় বাস করতো আর কাঁচা মাংসের সন্ধানে দিন পার করতো! প্রাগৈতিহাসিক আর কার্যকরী শ্রম বিভাজন ব্যবস্থা হিসেবে আমরা বর্ণ ব্যবস্থা চালু করেছি–যা একটা অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু দেখো, কীভাবে আমরা সেই সবগুলো ধর্মীয় আচারের ধারণাকে কলুষিত করেছি।'

'দুঃখিত বিদ্যুৎ, আমি বুঝতে পারছি তুমি হিন্দু ধর্ম আর সমাজে বর্ণ প্রথা নিয়ে কথা বলছো। কিন্তু এটা কীভাবে যথাযথ অথবা সুন্দর একটা প্রথা? এটা কি অসমতার সবচেয়ে জঘন্য রূপ না?'

'অবশ্যই! অবশ্যই, দামিনী...' মোহাচ্ছন্নের মতো উত্তর দিলো বিদ্যুৎ। 'কিন্তু এর শুরুটা এমন ছিলো না। তুমি যদি আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলো পড়ো, বড় চার বর্ণ–ব্রাহ্মণ (পুরোহিত এবং শিক্ষক), ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা এবং প্রহরী), বৈশ্য (বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণী) আর শূদ্র (শ্রমিক এবং কারিগর) সবাই প্রভু বিষ্ণুর একক স্বতন্ত্র দেহ থেকে উদ্ভূত বলে বিশ্বাস করা হয়। কীভাবে স্বয়ং বিষ্ণু থেকে সৃষ্ট একটা জাত, ধর্ম বা সম্প্রদায় অন্য আরেক জাতের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে?'

'আরেকটু পরিষ্কার করো, বিদ্যুৎ। আমার মনে হয়, তুমি কী বলতে চাইছো তা আমি জানি, কিন্তু তবুও আরেকটু বিশ্লেষণ করো। আর আমার কোনো ধারণাই নেই এসবের সাথে বালার কী সম্পর্ক।'

বিদ্যুৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললো। দামিনীর দিকে ঘুরে, আলতো করে তার কপালে চুমু দিলো। কেন এমন হলো সে জানে না, তবে সে দামিনীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা থেকে নিজেকে থামাতে পারলো না। দামিনী শক্ত করে তার আঙুল ধরলো, নিজের সুন্দর ভ্রুজোড়া উঁচু করে যেন আহ্বান জানালো।

* * * * *

ওরা এখন একটা বিখ্যাত মিষ্টির দোকানের দিকে হেঁটে যাচ্ছে, সারনাথ থেকে একটু দূরেই ওটা। বিদ্যুৎ ঐ দোকানের কদিন আগেই খেয়ে আসা সুস্বাদু গুলাব জামুন নিয়ে বলেছিলো, আর দামিনীও জোর করলো সে ঐ সুস্বাদু মিষ্টি খেয়ে দেখতে চায়। মিষ্টি সে খুব একটা পছন্দ করতো না, কিন্তু সে বিদ্যুৎকে কোনোভাবে ছোটখাটো কিছু ইস্যুতে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলো–এমন কিছু যা তাকে আগের সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া কালো অধ্যায় থেকে ক্ষণিকের জন্য সরিয়ে রাখবে।

বিকেলের সূর্যের আলোতে হাঁটতে হাঁটতে বিদ্যুৎ বলে গেল কথাগুলো, 'বর্ণ ব্যবস্থা কোনোভাবেই বিশেষ কাউকে সমর্থন বা জয়ী করেনি। সমাজের প্রতিটা অংশকে সম্প্রীতি আর মানুষের উন্নয়নের জন্য সমান এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হতো।'

'আচ্ছা, এটা আমার জন্য নতুন,' বললো দামিনী। 'আমি সব সময়ই ভাবতাম, ব্রাহ্মণরা বর্ণপ্রথায় সবার উপরে, এরপরেই ক্ষত্রিয় আর অন্যরা...'

বিদ্যুৎ হাসলো আর অবাক হয়ে নিজের মাথা নাড়লো। এমনকি দামিনীর মতো জানাশোনা একজনেরও এমন ভুল ধারণা আছে!

'না, দামিনী, এরকম কোনো পার্থক্য নেই। এটা নিছকই শ্রম বিভাজন বা বিশেষায়িতকরণ। দক্ষতাকে বড় আকারে সমাজের উপকারে কাজে লাগানোর জন্য। ভেবে দেখো, আমার নিজের একটা কোম্পানিতে কোন বিভাগটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? মার্কেটিং? সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং? হিউম্যান রিসোর্স? নাকি ফিন্যান্স?'

'আচ্ছা বাবা, বুঝেছি...' উত্তর দিলো দামিনী, বিদ্যুৎ যা বোঝাতে চাইছে তার পুরোটা ধরে ফেলার চেষ্টা করলো সে। 'কিন্তু তাহলে এই সাম্য এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে শোষণমূলক একটা ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হলো?'

বিদ্যুৎ দামিনীর দিকে তাকালো। তার এমন বাচ্চাসুলভ প্রশ্নে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

'ঠিক যেভাবে একজন মেষপালক, যে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলো তার ধর্মের প্রচার আর সার্বজনীন ভালোবাসার জন্য, সেটাই পরবর্তীতে সবচেয়ে নৃশংস আর অমানবিক ক্রুসেডের জন্ম দিয়েছিলো। ঠিক যেভাবে স্রষ্টার একজন মহান প্রতিনিধির ভালোবাসা আর মানবতার বাণী কিছু মানুষের হিংসা আর ঘৃণা ছড়ানোর কারণে বিকৃত হয়ে পড়েছে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না? ক্ষমতা আর সম্পদের লোভ মহান প্রাচীন দর্শনকে নিছক স্বার্থের জটিলতায় পরিণত করেছে।'

খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিলো দামিনী, বিদ্যুতের বলা প্রতিটি কথা সে গেঁথে নিচ্ছে নিজের মাঝে।

'বালা যা করেছে তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি না। কিন্তু কেন তাকে একাই দায়ী করা হবে, যেখানে সে সামাজিক অপব্যবস্থার একজন শিকার মাত্র? বর্ণ প্রথার অন্ধ প্রয়োগ এক অর্থে এক জাতের মাধ্যমে অন্য জাতকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এটা হিন্দু ধর্ম না। কখনোই ছিলো না। কোনো জাতের এই নির্মম পরাধীনতা নৈতিক এবং সামাজিক এক অধঃপতন ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা কেবল আমাদের মহান জীবন ব্যবস্থার প্রতি অপমানই না, সেই সাথে মানব জাতির জন্য এটা দুর্ভাগ্যও বয়ে আনে। বালা কেবল এই বিকৃতির শেষটা দেখেছে আর এখান থেকে বের হওয়ার একমাত্র যে পথটা সে দেখেছে, তারই অনুসরণ করেছে।

'আমি বুঝেছি, বিদ্যুৎ,' কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটার পর বললো দামিনী। 'কিন্তু তুমি কি এর পুরোটা তোমার মন থেকে বের করতে পারবে? আমি জানি কাজটা সহজ হবে না। কিন্তু এটা তোমার পেছনে ফেলে আসা জরুরি।'

থামলো বিদ্যুৎ। দামিনীর দিকে তাকালো সে।

'বিষয়টা আমার ব্যাপারে না, দামিনী। এমনকি এটা শুধু বালার ব্যাপারও না। এটা অনেক বড় একটা বিষয় যা আমরা জাতি হিসেবে, মানুষ হিসেবে মোকাবেলা করছি। আমাদের ইতিহাসের একটা লম্বা সময় আছে, যেখানে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা, শূদ্র বা অনেকে যেমন বলে, সেই দলিতদের উপর নির্যাতন করছে। সেটা অন্ধকার আর শোচনীয় এক সময় ছিলো। কিন্তু এখন কী হচ্ছে দেখো। রাজনীতিবিদরা সেই পুরাতন ক্ষত আরো বাড়াচ্ছে, সেই পালে হাওয়া দিচ্ছে। এর ফলে এখন তথাকথিত নিম্ন বর্ণের মানুষ একসাথে দল বেঁধে ভোট দিচ্ছে, তাতে করে দুর্নীতিবাজ কাউকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ তারা একটা নির্দিষ্ট জাতভুক্ত! গণতন্ত্র আমাদের এই মহান দেশটার সবকিছু বলতে পারো, তাও জাতভিত্তিক ভুলের কাছে নতি স্বীকার করছে। আজকের দিনে এসেও জাতপাতের নামে বাস পোড়ানো হচ্ছে, বিশাল মিছিল ডাকা হচ্ছে। যেখানে সব ভারতীয় নাগরিকের এখন দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টিজনিত সমস্যা কিংবা আরো সব সমস্যা দূর করার মতো চ্যালেঞ্জে মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু না! আমরা জাতি, ধর্ম, ভাষা, রাষ্ট্র আর কীসব বিষয় নিয়ে একে অন্যের সাথে লড়াই করতেই ব্যস্ত। আর যদি এটা চলতেই থাকে, তাহলে এই চিরস্থায়ী সংঘর্ষের উপজাত হিসেবে আরো অনেক বালা বেরিয়ে আসবে।'

কিছুটা দূরে সারনাথ মন্দিরের উঁচু চূড়াগুলো দেখা যাচ্ছে। বিকেলের উজ্জ্বল আকাশের মাঝে দেখতে দারুণ লাগছে। দামিনীকে দেখানোর জন্য বিদ্যুৎ সেদিকে আঙুল তুললো।

'দামিনী, আমরা সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে হাজার বছর আগে একদিন বুদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিলেন। বুদ্ধরা তাকে নিজেদের একজন হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। অন্যদিকে, হিন্দুরা তাকে ভগবান বিষ্ণুর নবম অবতার হিসেবে বিশ্বাস করে। দুই জাতই বুদ্ধকে ভালোবাসে। দুই সম্প্রদায়ই বুদ্ধকে আর তার স্বর্গীয় চিন্তাভাবনাকে লালন করে। তাতে কোনো সংগ্রাম বা সংঘর্ষ নেই। এই গ্রহণ করার মানসিকতা, এই সহাবস্থান আমাদের সবার চেয়ে আলাদা করে রেখেছে, আমাদের ঐতিহ্যকে অমর করে রেখেছে। এই অসামান্য জীবনধারাকেই আমাদের রক্ষা করতে হবে, দামিনী।'

হুমায়ার পূর্বে, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
কালো মন্দির

সে এক অসাধারণ দৃশ্য ছিলো।

হাগল চলাচলের সরু পথ আর কালো-ধূসর পাহাড়ের মাঝে সরু গিরিখাদ ধরে কয়েক ঘণ্টা চলার পর তাদের দলটা একটা খোলা জায়গায় এসে থামলো। সাপের মতো প্যাঁচানো রাস্তায় আসার পথে মানুর কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছিলো যে এই দুর্দান্ত প্রাসাদের স্থপতি কিংবা এখানকার এই কালো আলখাল্লা-পরা প্রহরীদের কেউই চায়নি সাধারণ মানুষ এর সন্ধান পাক।

পাহাড়ের সরু যে ফাটল ধরে ওদের এগোতে বলা হয়েছিলো, সেই পথ ধরে মানুর ঘোড়া বের হওয়ামাত্র সামনে যা দেখলো তাতে মানুর চোখ আটকে গেল। সামনের স্থাপনার দাপুটে ভাব দেখে তার দমবন্ধ হওয়ার দশা। পুরো সমতল জায়গা জুড়ে কালো পাহাড়ের মাঝে বিশালাকার আর জটিল নকশা খোদাই করা একটা দরজা কেটে নেওয়া হয়েছে। ওখানেই তার অবস্থান, আকাশের বুকে অনেকটা উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

কালো মন্দির।

* * * * *

বিশাল পাহাড়ের মাঝে কঠিন আর কালো পাথরে কেটে নেওয়া এই দরজা মানু আগে যা কিছু দেখেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। তার ঘোড়া লক্ষ্যহীনভাবে কালো মন্দিরের দিকে হাঁটা দিয়েছে, এমনকি মানু নিজেও এখান থেকে আসা শক্তিতে যেন সম্মোহিত বোধ করছে।

'আমার সাথে এসো, মানু,' প্রহরীদের প্রধান সেই দয়ালু মহিলা বললেন। 'তোমাকে সবচেয়ে পবিত্র মন্দিরের ভেতর নিয়ে যাবো আমি।'

ঘোড়া থেকে নেমে তাকে অনুসরণ করলো মানু। কিছু একটা তাকে এই মন্দিরের মূল ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

মন্দিরের বড় আকারের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই মানু বুঝতে পারলো, বাইরে যা দেখে এসেছে তা এই অসাধারণ মন্দিরের পুরো সৌন্দর্যের তুলনায় একটা দাগ মাত্র। তার চোখের সামনে থাকা এই স্থাপত্যের সত্যিকার বিস্ময় উপলব্ধি করতে তাকে কেবল কয়েক পা ভেতরে যেতে হয়েছে। প্রচণ্ড চমকিত হয়ে সে বুঝতে পারলো, এই মন্দিরের সেই বিশেষ কারিগররা ভেতর থেকে পুরো পাহাড়টা কেটে ফাঁকা স্থান তৈরি করে নিয়েছিলেন। মানু এখন দাঁড়িয়ে আছে তার জীবনে দেখা সবচেয়ে বড় হলঘরের দরজার মুখে। আর এটা মূলত কালো পাহাড়ের বিশাল পেটের মতো।

মন্দিরের উঁচু দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে মানু। প্রথমে মাথা, এরপর পুরো শরীর ঘুরিয়ে চারপাশের মোহনীয় দৃশ্য দেখলো সে। ছাদটা এতই উঁচুতে যে অন্ধকারেই মিলিয়ে গেছে ওটা। শত শত জ্বলন্ত মশাল দিয়ে আলোকিত মন্দিরটায় চমৎকার পিলার, তোরণ, মূর্তি আর প্রার্থনাকক্ষ খোদাই করে নেওয়া হয়েছে। একসাথে কয়েকটা সিঁড়ি অনেকটা উচ্চতায় কেটে নেওয়া হয়েছে নিরেট পাথর থেকে। হলের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের উঁচু করিডরগুলোকে যুক্ত করেছে ওগুলো।

কিন্তু মন্দিরের সবচেয়ে প্রভাবশালী আর চোখধাঁধানো সৃষ্টি ছিলো হলঘরের ঠিক মাঝে যা বসে আছে। মানু ভক্তি আর শ্রদ্ধায় দুই হাত ভাঁজ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

পাথর দিয়ে বানানো রুদ্র বা ভগবান শিবের বিশাল একটা মূর্তি এই পাথুরে মন্দিরের অনেকটা উচ্চতায় গভীর ধ্যানে বসে আছে।

* * * * *

মানু এমন বিশাল আকারের কিংবা এমন মহিমান্বিত কোনো স্থাপনার কথা আগে শোনেওনি কিংবা দেখেওনি। ঠিক সামনে থাকা রুদ্রের এমন একটা চমৎকার মূর্তির কথা সে কখনো কল্পনাই করেনি। তার কাছে এ এক অসাধারণ, চমৎকার স্বপ্নের মতো।

কাঁধে একটা হাত অনুভব করতেই সে খানিকটা ঘাবড়ে গেল।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি নিজে সৃষ্টির সাক্ষী হয়েছ,' মানু তার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই মজা করে কথাটা বললো মৎস্য।

ভালোবাসা আর ভক্তির এক অবর্ণনীয় তাগিদে মানু উঠে দাঁড়িয়ে মৎস্যর বাহুতে গিয়ে পড়লো। তার চারপাশের রহস্যময় মহিমায় সে অভিভূত। আর মৎসের বাহু মনে হলো যেন আরামদায়ক এক কুশন। রহস্যময় এই মৎস্য-মানব অবাক হয়ে গেছিলেন, কিন্তু এরপরেই আনন্দে হাসলেন, শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন বিভাষণ-সানজানার ছেলেকে। কাকে যে কার বেশি দরকার, এই মুহূর্তে সেটা বলা শক্ত। সম্ভবত দেবত্ব তার বিশ্বাসীদের চেয়ে বড় না। একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব নেই।

'এটা কোন জায়গা, হে মৎস্য?' একবার নিজেকে সংযত করে প্রশ্ন করলো মানু।

মৎস্য কয়েক পা ভেতরে গেলেন। তাদের চারপাশে ঘিরে থাকা শক্তিশালী আর রহস্যময় সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

'এটা এই পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান গোপনীয় বিষয়ের নিরাপদ আস্তানা, মানু,' বললেন তিনি। 'বিগত এক হাজার বছরে একইভাবে বানানো সপ্তম মন্দির এটা। সামনের একশো বছরে এমন আরো কিছু বানানো হবে। এখানে যে গোপন জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাকে কিছু সময় পরপর স্থানান্তর করা দরকার। যেন প্রতিশ্রুত সেই দিন আশা পর্যন্ত একে রক্ষা করা যায়।'

মানু খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিলো। তখনই সে খেয়াল করলো, মৎস্যের মতো একই রকমের মাছের চামড়ার আলখাল্লা পরে আরো কিছু নারী-পুরুষ তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যেভাবে তারা মৎস্যকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানালো, তাতে এটা স্পষ্ট, ওরা সকলেই তার শিষ্য। সবাইকে দেখে মনে হলো শান্ত আর দয়ালু, গায়ের গন্ধ সাগরের মতো। মানু হতভম্ব হয়ে গেল।

আশেপাশে একশো মাইলের মাঝে কোনো সাগর নেই!

* * * * *

'যুগের প্রতিটি চক্র শেষ হওয়ার পর সৃষ্টি তার নিজের কাজের পাশাপাশি পৃথিবীতে একমাত্র যারা স্রষ্টার অনুরূপ তাদের আচরণ পর্যালোচনা করে। এরপর আমরা যেমনটা জানি, কাজের গতিপথ নির্ধারণ করে, যা পরবর্তী জীবনের সাথে যুক্ত হয়। কখনো কখনো একটা পরিপূর্ণ শুদ্ধিকরণ দরকার হয়, যা প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির মাঝেই পরিচালনা করা হয়ে থাকে। আর অন্য কিছু ক্ষেত্রে, আংশিক শুদ্ধিকরণের দরকার হয়। ভালোর জয়ের মধ্য দিয়ে মন্দের বিনাশ। আর তখনই একজন অবতারের আবির্ভাব ঘটে।'

এখন তারা বসে আছে রুদ্রের পায়ের কাছে একটা চক্রের উপর। তারা বলতে মৎস্য, পাহাড়-প্রহরীদের প্রধান নেত্রী আর মানু। মৎস্য কালো মন্দির আর এর মাহাত্ম্য ঘিরে মানুর সব রকমের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। যদিও মৎস্য যা কিছু বলছে, মানু তা পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনছে কিন্তু সে মন্দিরের মাঝে দূরের কিছু প্রার্থনা ঘরে আবছা নীল আলোর দিকে না তাকিয়ে পারলো না। অন্য সব কক্ষের পূজার আগুনের হলদে-কমলা আলোর তুলনায় একেবারেই আলাদা এগুলো। এক, দুই...তিন...দ্রুত গুনে ফেললো সে। সব মিলিয়ে সাতটা প্রার্থনার গুহা থেকে নীল আলো আসছে, মন্দিরের দেয়ালের অনেক উঁচুতে ওসব কেটে রাখা হয়েছে আর পাথরের বাঁকানো সিঁড়ি দিয়ে সংযুক্ত সব।

'কিন্তু এই পৃথিবী আর এর বাসিন্দাদের ভাগ্য নির্ধারণের কি অধিকারের সৃষ্টিকর্তার আছে? সৃষ্টিকর্তাকে কে এই পৃথিবীর সকল প্রাণ ধ্বংস করার অধিকার প্রদান করেন আর কখন স্রষ্টা সময় বেছে নেন? আপনি যে শুদ্ধিকরণের কথা বলছেন, সেটা কী আমরা যাকে সর্বশক্তিমান হিসেবে উপাসনা করি, তার সাপেক্ষে নিষ্ঠুর এবং অশোভনীয় না?' প্রশ্ন করলো মানু।

হাসলেন মৎস্য, প্রচণ্ড স্নেহে তাকালেন মানুর দিকে। তার হাসি মানুকে মনে করিয়ে দিলো, তার বাবা শক্তিমান বিভাষণ পূজারি এভাবেই প্রচণ্ড স্নেহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

'তাহলে মানু, তুমি ব্রহ্ম-জ্ঞান বা এই বিশৃঙ্খল অবস্থার চূড়ান্ত মহাজাগতিক সত্য নিয়ে বিতর্ক বা আলোচনা করতে চাও?' বললেন মৎস্য। 'তোমার কি মনে হয় না, মহাবিশ্বের জটিলতা, ভালো এবং মন্দের নিয়ম, রনানুবন্ধন বা কর্মফলের ধারণা, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের শক্তি...সব কি একবারে জানার জন্য একটু কঠিন না?'

'জি অবশ্যই, মৎস্য। আমি বুঝতে পেরেছি ঋষি এবং মহামানবরা সবশেষ মহাজাগতিক সত্যের আলোয় নিজেদের আলোকিত করার প্রচেষ্টায় তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আর আমরা এখানেই সবকিছু আলোচনা করতে পারি না। আমি যা বলতে চাইছি, আমি গভীর জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ বেদ এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ছাত্র ছিলাম। তাদের সব জ্ঞান আর প্রতিভার বাইরে আমার সব সময়েই মেনে নিতে কষ্ট হতো যে আমরা যা জানি, তারও উপরের কোনো এক শক্তি মানব জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করে। এটা কতখানি অন্যায়?'

মানু কথাগুলো বলার পরেই সবাই চুপ হয়ে গেল। তাদের বেশিরভাগই এখন উত্তরের জন্য মৎস্যের দিকে তাকিয়ে।

'তার মানে, এখন তুমি তোমার সম্প্রদায়ের ভাগ্য নির্ধারণের বেলায় একটা ভূমিকা রাখতে চাও, মানু?' কয়েকটা মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন মৎস্য। সে এখন হাসছে না।

মানু খেয়াল করলো, মৎস্য এবারে *তোমার সম্প্রদায়* বলেছে, *আমাদের* বলেনি। যদিও সেটা নিয়ে মাথা ঘামালো না। তার এও মনে হলো, সে দেখতে পাচ্ছে, মৎস্যের শরীর স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশিই নীল আভা ছড়াচ্ছে। চিন্তাগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললো সে।

'হ্যাঁ...হ্যাঁ, আমি মনে হয় চাই যে আমার কিংবা আমার সম্প্রদায়ের জন্য যা কিছু নির্ধারিত হবে, আমি তাতে ভূমিকা রাখবো।'

মৎস্য এখন সরাসরি মানুর চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার দৃষ্টি যতটা শক্ত মনে হচ্ছে, ঠিক ততটাই যেন আনন্দিতও। মানু অনুভব করতে পারছে, এই রহস্যময় মৎস্য-মানবের আলোর দীপ্তি তার মাথা ভেদ করে বহু দূরের কোনো দিগন্তে পৌঁছে যাচ্ছে।

'তবে প্রস্তুত হও, হে বিভাষণ পূজারির পুত্র!' আচমকা গর্জে উঠলেন মৎস্য। 'তোমার সেই সুযোগ খুব বেশি দূরে নয়!'

তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। ডান হাত বাড়িয়ে সরাসরি মানুর দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি। তারপর রক্ত হিম করা শব্দগুলো চিৎকার করে বললেন, 'প্রলয়...আস্যতি...! মহাপ্রলয়...আসছে...!'

বানারস, ২০১৭

কনস্ট্যান্টিন

বিদ্যুৎ অভিযোগ করছে। তার পেছনে কারণ ছিলো। আর পৃথিবীতে এ প্রপিতামহই সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি যার সাথে সে লাজলজ্জা ভুলে রাগে গজরাতে পারে।

'বাবা, আপনি ত্রিকাল-দর্শী, স্থান আর সময়ের সব জগত দেখতে পান,' বললো বিদ্যুৎ। 'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না, আপনি এর কোনোটাই দেখতে পাননি। প্রথমত, বালা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর দ্বিতীয়ত, ঐ ত্রিজাত কাপালিক কেবল শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা দেয়নি।'

দ্বারকা শাস্ত্রীর কক্ষে বিদ্যুৎ ক্রমাগত পায়চারি করছে। মঠধীশের প্রতি তার রাগ স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছে।

'দামিনী কি দিল্লিতে নিরাপদে নামতে পেরেছে?' জানতে চাইলেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

বিরক্তি নিয়ে মঠ প্রধানের দিকে তাকালো বিদ্যুৎ।

'হ্যাঁ। নেমেছে সে।'

'হুম...'

বিদ্যুৎ এখন উত্তেজিত হয়ে উঠছে। তার প্রপিতামহ থেকে কিছু উত্তর জানা দরকার। তার খুব দ্রুত উত্তর চাই, বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর।

'বাবা, প্লিজ...আমার আপনার সাথে কথা বলার দরকার!' বিদ্যুৎ তার প্রিয় প্রপিতামহের দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

দ্বারকা শাস্ত্রী তার আঙুলে রুদ্রাক্ষ মালার পুঁতি উলটাচ্ছিলেন। তিনি এখন প্রতিদিনের মতো প্রচণ্ড শক্তিশালী এক মন্ত্র ভগবান হনুমানের প্রার্থনা, হনুমানাষ্টক উচ্চারণ করছেন। যেমনটা তিনি সব সময় তার কঠিন সময়গুলোতে করে থাকেন।

তিনি জানতেন, কিছু তথ্য প্রকাশ আর ব্যাখ্যা করা এখনো বাকি আছে।

* * * * *

'বিদ্যুৎ, ভগবান রাম কে ছিলেন?'

শাস্ত্রী বংশের বংশধর, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা, মহান বিদ্যুৎ এখন কিছুটা শান্ত হয়েছে, তুলসি চায়ে চুমুক দিচ্ছে সে। মঠে বসবাস করার কয়েকটা দিন পার হয়েছে আর এখন নিজের বাড়ির মতোই মনে হয় সবকিছু। যদিও তাকে তার একমাত্র জীবিত অভিভাবকের সাথে তারই কুটিরে থাকতে হচ্ছে।

'বাবা, আসলেই? আপনি ওখান থেকে কথাবার্তা শুরু করবেন?'

মঠাধীশ হাসলেন। বিদ্যুৎ নিজেই ছোট একটা হাসি দিলো, চেষ্টা করলো যেন মুখ থেকে চা ছিটকে না যায়। গত চব্বিশ ঘণ্টা মঠের চারপাশের বাতাসে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। শাস্ত্রী বংশের দুজন মানুষের অবসর সময় ভাগ করে নেওয়ার জন্য এই অল্প সময়টাই পাওয়া গেছে।

'না, কিন্তু আমাকে বলো, বিদ্যুৎ,' চাপ দিলেন দ্বারকা শাস্ত্রী, 'রাম কে ছিলেন?'

বিদ্যুৎ তার চায়ের কাপ সরিয়ে রাখলো।

'বাবা, আপনি সত্যিই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে ভগবান রাম কে ছিলেন? আমাকে বলছেন মর্যাদা-পুরোষোত্তম, নৈতিকতার মূর্ত-প্রতীক, মানব জাতির মডেল, পরম রাজ-ঈশ্বর রামের পরিচয় দিতে?'

'আমি তোমাকে তাকে বর্ণনা করতে বা সুনাম করতে বলছি না। আমি কেবল জানতে চাই, রাম কি মানুষ ছিলেন নাকি ঐশ্বরিক কেউ?'

'তিনি একজন অবতার ছিলেন, বাবা। মানুষের বেশে ভগবান বিষ্ণুর একজন রূপ ছিলেন। আপনি এইসব আমার চেয়ে অনেক ভালো জানেন।'

দ্বারকা শাস্ত্রী মাথা নেড়ে কথা চালিয়ে গেলেন, 'এখন আমাকে বলো, বিদ্যুৎ, রাম কি তার জীবদ্দশায় কিছু ভুল করেছিলেন? তিনি অক্ষয়, নিখুঁত আর ব্যক্তিত্বপূর্ণ...কিন্তু তিনিও কি বিচারের ক্ষেত্রে ভুল করেননি?'

'হ্যাঁ, তিনি ভুল করেছিলেন, বাবা। পৃথিবীর বুকে যারাই এসেছেন, সম্ভবত তাদের মাঝে সবচেয়ে আদর্শ পুরুষ হওয়ার পরেও তিনি কিছু ভুল করেছিলেন। কিন্তু এটাই কি একজন অবতারের আসল উদ্দেশ্য ছিলো না? পৃথিবীতে সমস্ত অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটাতে হলে সর্বশক্তিমানের কোনো মানুষের রূপ ধরার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা যদি গতানুগতিক বা ঈশ্বর-কেন্দ্রিক সবচেয়ে জনপ্রিয় চিন্তাধারার কথা বলি, ঈশ্বর তাদেরকে শুধু বজ্রপাত দিয়ে ঘায়েল করতে পারতেন। তবে বৃহত্তম উদ্দেশ্যের কথা যদি বলি, একজন অবতারের শিক্ষা আর তার মানুষের মতো সংগ্রাম পুরো মানব জাতির জন্য উদাহরণ তৈরি করে...এমনকি অবতার যখন নশ্বর পৃথিবীতে এসেছেন, তখন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কষ্ট পেয়েছেন। রাম, কৃষ্ণ কিংবা গুরু বা মেসায়া, যে ধর্মের বা যেই বিশ্বাসের হোক না কেন, তারা প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষের মতো করে জীবনে সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু এরপরেও তাদের চিরন্তন চিহ্ন রেখে গেছেন। আর এখানে এসেই পুরো আলোচনা অনেক জটিল হয়ে যায়। কারণ কিছু বিশ্বাস ইঙ্গিত করে যে এসব অবতার কিংবা স্রষ্টার প্রতিনিধির আগমনের কারণ ছিলো মানুষকে দেখানো কীভাবে তারা বেড়ে ওঠে আর নিজেরাই ঈশ্বর বনে যায়। কিন্তু যেমনটা আমি বলেছি, এখনকার সাপেক্ষে এটা অনেক বেশি জটিল আলোচনা।'

'বিশদ ব্যাখ্যার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, বিদ্যুৎ। তুমি একেবারেই সঠিক বলেছ। দেবত্ব বা আধ্যাত্মিকতায় দক্ষতা থাকা কাউকে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন কিংবা সর্বশক্তিমান করে তোলে না। রাম জানতেন সোনার হরিণের অস্তিত্ব নেই। তবু তিনি একটিকে তাড়া করেছিলেন। রাম কি দেখতে পাননি যে এই অলীক সোনার চামড়ার হরিণের নিচে আসলে একটা রাক্ষস আছে?'

বিদ্যুৎ শুনছিলো কথাগুলো। সে এখন বুঝতে পারছে বাবা কী বলতে চাইছেন।

'পূর্বনির্ধারিত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিয়তি যদি ঘটনাগুলো নির্দিষ্টভাবে বেছে নেয়, তাহলে আর কোনো কিছুই তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ভগবান রাম যদি বিচার-বিবেচনায় ভুল করেন, তাহলে এই আমি

নিছক দ্বারকা শাস্ত্রী এমন কে? আমি দুঃখিত যে আমি এসব দেখতে পাইনি, বিদ্যুৎ। আমি মন্দ কিছুর উপস্থিতি আঁচ করতে পারছিলাম। কিন্তু সবই ছিলো অদ্ভুত আবরণের নিচে ঢাকা,' গভীর দুঃখ থেকে কথাগুলো বললেন মঠের প্রধান।

বিদ্যুৎ আচমকা তার প্রপিতামহের ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেল। তিনি এরই মাঝে বিবেকের সামনে অপরাধবোধে ভুগছেন। কারণ তারই ব্যর্থতায় অন্ধকার জগত এই দেব-রাক্ষস মঠে পা রেখেছে।

* * * * *

'কনস্ট্যানটিনোপলে কী হয়েছিলো, বাবা?' প্রশ্ন করলো বিদ্যুৎ।

ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো মঠের বাগানের চারপাশে হেঁটে বেড়াবে। এছাড়াও, এটা মহান মঠ প্রধানের মঠের বাসিন্দাদের আশ্বাস দেওয়ার একটা চেষ্টা বলা যায়, বোঝাতে চাইছেন মঠে সবকিছুই খুব দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। খানিক পরপরেই মহান গোত্র প্রধানের সাথে তার শিষ্য এবং তাদের পরিবারের সাথে দেখা হচ্ছে। তাদের সাথে হাসছেন, আশীর্বাদ হিসেবে নিজের হাত ওঠাচ্ছেন। বিদ্যুৎ খেলার ছলে বাচ্চাদের তার হাতে তুলে নিয়ে তাদের আনন্দ দিয়ে হাসাচ্ছে।

'কনস্ট্যানটিনোপলে এমন কিছু প্রকাশ করা হয়েছিলো যা পুরো পৃথিবীকে চিরতরে বদলে দিয়েছিলো। আর তা একেবারেই কনস্ট্যানটিনোপলে ছিলো না। ওটা ঘটেছিলো শহরটা থেকে একশো মাইল দূরে, নিশিয়া নামে অন্য আরেকটা শহরে।'

'নিশিয়া?' ফিসফিসিয়ে বললো বিদ্যুৎ। 'আমি নিশিয়া সম্পর্কে শুনেছি, বাবা। এটা সেই শহর, যেখানে সেই চতুর্শ শতকে খ্রিষ্টান যাজকদের বিখ্যাত কাউন্সিল হয়েছিলো। সে এক ঐতিহাসিক ঘটনা, যেহেতু বিশ্বাসের অনুসারীদের মাঝে সবচেয়ে বড় কিছু বিতর্কের সমাধান হয়েছিলো ওখানে।'

বরাবরের মতোই দ্বারকা শাস্ত্রী সন্তুষ্ট হলেন।

'তুমি বেশ ভালোভাবেই পড়াশোনা করেছ, বিদ্যুৎ,' বললেন গোত্র প্রধান। 'কার্তিকেয় আর পূজা থাকলে প্রচণ্ড গর্ববোধ করতো।'

মঠাধীশ আর তার প্রপৌত্র এক মুহূর্তের জন্য কান্নাভেজা চোখে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলো। এবারই প্রথম প্রপিতামহের মুখে নিজের বাবা-মায়ের নাম শুনলো বিদ্যুৎ।

'ধন্যবাদ, বাবা। দয়া করে কথায় ফিরি...' অনুরোধ জানালো বিদ্যুৎ।

'বেশিরভাগ মানুষই নিশিয়া কাউন্সিল সম্পর্কে জানে। এ ছিলো খ্রিষ্টান যাজকদের একটা সভা। কিন্তু খুব কম লোকেই জানে, কনস্ট্যান্টিন ঠিক সেদিনই আরেকটি গোপন বৈঠক করেছিলেন। সেই গোপন আর উচ্চ পর্যায়ের দলটাকে এমন কিছু আলোচনা করার জন্য ডাকা হয়েছিলো, যা ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ আর সংঘাতহীন বিশ্বকে সংজ্ঞায়িত করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।'

বিদ্যুৎ সতর্ক হয়ে শুনলো। সাথে সাথেই অবাক হলো, কাউন্সিল অব নিশিয়ার গোপনীয় ইতিহাস নিয়ে তার গোত্র প্রধান কীভাবে জানেন। তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি।

'আর তার নেতৃস্থানীয় জেনারেল, উচ্চ পর্যায়ের যাজক, রোমান আর মিশরীয় জাদুকর আর ধনী বণিকরা বাদে আরো খুব কম লোকই জানে যে সেই গোপন সম্মেলনে বিশেষ একজন উপস্থিত ছিলেন। যাকে কনস্ট্যান্টিন সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন।'

মঠাধীশ যা বলছেন, তার সবকিছুর সাথে তাল মেলানো বিদ্যুতের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছিলো। নিশিয়া? কনস্ট্যান্টিন? একজন সম্রাটের গোপন ঘোষণা? *সবকিছু আসলে কোন দিকে যাচ্ছে? কনস্ট্যান্টিন আর তার বিশ্ব-ভাবনা কীভাবে আমার সাথে সংযুক্ত?*

দ্বারকা শাস্ত্রী বিদ্যুতের অবাক হওয়া মুখটা খেয়াল করলেন। তিনি জানতেন, এবারই শেষ দেবতা এইসব কিছু প্রথমবার শুনছে।

'প্রায় কেউই জানে না, সেদিন নিশিয়ায় উপস্থিত কনস্ট্যান্টিনের সেই বিশেষ অতিথি পূর্ব দিকের হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।'

ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে চোখ বড় বড় করে কথাগুলো শুনছিলো বিদ্যুৎ।

'সে আর কেউই না, আমাদের অসাধারণ পূর্বপুরুষ, আলখাল্লা-পরা যোদ্ধা-ঋষি অদ্বৈত শাস্ত্রী।

হরপ্পা, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
তার সবচেয়ে বড় পাপ

ন তার প্রতিশ্রুতি শেষ করার সময় এসেছে। সুরা তার কথা রেখেছে

ভাষণ পূজারিকে পাথর এবং ব্রোঞ্জের পাহাড়ের নিয়ন্ত্রণ নিতে সাহায্য করেছে। সেই সাথে তার বাহিনী এক হাজার সেনা দিয়ে পুরো নির্মাণকাজের জায়গাটা চক্রের মতো করে ঘিরে ফেলেছে, যেন পণ্ডিত চন্দ্রধর কিংবা প্রিয়ংবদা সেটা আবার জয় করতে না পারে। তার মানে এবার বিভাষণের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার পালা। সময় এসেছে তার সকল পাপের মাঝে বড় পাপ সম্পন্ন করার।

হরপ্পার তৎকালীন সূর্য একসময় যাদের দেবতার ন্যায় পূজা করতেন, সেই সপ্তর্ষির জীবন এবার সুরার কাছে এনে দেবেন।

তার প্রিয় আর সাহসী সন্তান মানু যে তখনো জীবিত তা না জানার কারণে বিভাষণ পূজারি তখন পর্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত রাগে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন। তিনি এমন নিষ্ঠুরতা আর ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে যাচ্ছেন, যা এই পৃথিবী আগে কোনোদিনই দেখেনি আর সম্ভবত পরবর্তীতে আর কোনোদিন দেখবেও না।

তিনি সরস্বতীর পুত্রদের হত্যার অনুমতি দিতে যাচ্ছেন। এমনকি তার মতো জ্ঞানী একজন ব্যক্তিও এরপর কেমন দুর্যোগ আসতে চলেছে তার পূর্বাভাস পেতে ব্যর্থ হয়েছেন।

অথবা, হয়তো তিনি জানতেন।

* * * * *

অন্ধকারের মাঝে নিজেদের চলার পথ করে নিচ্ছে ওরা। কোমর সমান ঠান্ডা ঝরনার পানির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, যেটা সপ্তর্ষিদের গোপন বাসস্থান বরাবর চলে গেছে। ওরা বলতে সুরার অভিজাত আর নিশাচর পঞ্চাশজন সেনার ছোট একটা দল। রাক্ষসরাজেরই বুদ্ধি ছিলো যে গোপন পথ ধরে সপ্তর্ষিদের ঘন বন আর গুহার দিকে ওরা এগিয়ে যাবে। বিভাষণ জানতেন, এটা তাদের এক অপচেষ্টা। ওরা এক পা দেওয়ার আগেই সপ্তর্ষিরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে। কিন্তু বিভাষণ পূজারি এও জানতেন, সপ্তর্ষিরা আসলে পালিয়ে যাওয়ার মতো না। এই পবিত্র সাতজন হয় বড় গাছের লতানো অংশগুলো নিয়ে এসে সাপে রূপান্তর করে অন্ধকারের মাঝে আক্রমণকারীদের শ্বাসরোধ করতে আদেশ দেবে, নয়তো শত শত নেকড়েকে তাদের মাংস ছিঁড়ে নেওয়ার আদেশ দেবে। বিভাষণ এসবে পাত্তা দেননি। তার অসুর বাহিনী বিশাল চিবি নির্মাণের জন্য টানা কাজ করে যাচ্ছিলো, যা সরস্বতীর প্রবল ধারাকে প্রতিহত করবে। সেই সাথে অশুভ শহর হরপ্পা এবং এর উপকণ্ঠের দিকে স্রোতের গতিপথ বদলে দেবে।

তার কাজ এরই মাঝে শেষ। এই জঘন্য কমান্ডারের কাছে তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চলেছেন। আর তারপর শেষ একটা যোগ আচারের মাধ্যমে আত্মাকে রক্ত-মাংসের জগতের বাইরে প্রেরণ করবেন।

এমনকি এখনো, শেষ কদিনে সবকিছু নিজ থেকে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরেও এই মহান দেবতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হলেন। এখন পর্যন্ত তিনি ভাবছেন, তার পরিকল্পনা সবই ঠিকঠাক কাজ করবে।

কীভাবে ঘৃণায় পূর্ণ হৃদয় আর প্রতিহিংসার বিষে পূর্ণ একটা মন সমগ্র বিশ্বকে নিজের পাশে আশা করে? যে পাপাচারী আত্মা নিরস্ত্র আর নিষ্পাপের উপর সহিংসতা শুরু করে, সে কী করে আশা করে স্রষ্টার অনুগ্রহ সে উপভোগ করবে? সহিংসদের সব সময় প্রথমে শাস্তি পেতে হয়। সবচেয়ে বেশি শাস্তি পেতে হয়।

* * * * *

ওরা এখন ঠিক সে জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে বিভাষণ পূজারির সাথে শেষবার সপ্তর্ষিদের দেখা হয়েছিলো। ঠান্ডা রাত, তবে তার শেষবার আসার সময়ে যেমন ছিলো, এবার তেমন জাদুকরী কোনো গান গাইবার মতো ঘটনা কিংবা পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে না। শীতল, অন্ধকার এক ভোর।

'খুঁজে বের করো ওদের,' আদেশ দিলো সুরা।

রাক্ষসরাজের পঞ্চাশ যোদ্ধা এবার তাদের ভয়ংকর তলোয়ার বের করে আশপাশের সব ঝোপ আর ঘন জঙ্গল পাগলের মতো কাটতে শুরু করলো। সুরা নিজেও সপ্তর্ষিদের উপস্থিতির ন্যূনতম প্রমাণের খোঁজে এদিক-ওদিক ছুটছে। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। কোথাও পাওয়া যায়নি তাদের।

ঠিক যখন সুরা, প্রচণ্ড আর তাদের লোকেরা খোঁজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাগী আর জিজ্ঞাসু চোখে বিভাষণ পূজারির দিকে তাকালো, তারা দেখতে পেল দেবতা কোনো একদিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ওরা তার নজর অনুসরণ করতেই নিজেরাও তা দেখতে পেল। ওনাদের দেখে মনে হলো যেন শূন্য থেকে আচমকা বেরিয়ে এসেছেন।

সপ্তর্ষি।

* * * * *

'ওনারা নিজেদের শরীরে নেই,' বললেন হরপ্পার সূর্য, তার চোখ এখনো দূর থেকে সপ্তর্ষিদের দেখছে।

সুরা, প্রচণ্ড আর তাদের লোকজনের কেউই বুঝতে পারলো না এইমাত্র বিভাষণ পূজারি আসলে কী বললেন। তারা যা বুঝেছে, সপ্তর্ষিরা তাদের চোখের ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। সাবধানে সামনে এগিয়ে গেল ওরা, তাদের হাতের ছুরি ঐশ্বরিক ঋষিদের বধ করার জন্য একেবারেই প্রস্তুত। উত্তেজনায় সুরার নিশ্বাস ভারী হয়ে আসছে। তার এবং তার রাজ্য যারাই শাসন করেছে, সেই পথে সবচেয়ে বড় বাধাকে সে বধ করতে চলেছে।

সপ্তর্ষিরা এখন কেবল কয়েক পা দূরে। একজন ঋষি ঠান্ডা ঝরনাধারার পাশে পদ্মাসনে বসে আছেন। অন্য একজন সম্মোহিত হয়ে বসে আছেন তাদের সামনের একটা পাথুরে ফাঁকা জায়গায়। অন্য একজন নিচু পাহাড়ের মাঝে গভীর ধ্যানে মগ্ন, আরেকজন গাছের নিচে তপস্যা করছেন। তাদের সাতজনেই একে অন্যের কয়েক পা দূরত্বের মাঝেই বসে আছেন। সবাইকে দেখে মনে হলো তারা প্রত্যেকেই শান্ত। আততায়ী এগিয়ে এলেও তাতে বিরক্ত হচ্ছেন না।

'লাভ নেই...!' সুরা আর প্রচণ্ডের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন বিভাষণ পূজারি। এখনো সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন যেখান থেকে প্রথমবার এই সাধুদের দেখতে পেয়েছিলেন।

সুরা বিরক্তি নিয়ে ঘুরলো। বিভীষণ পূজারি ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছেন।

'তাদের শরীরের ক্ষতি করে কোনো লাভ নেই, সুরা। তারা এই শরীরের ভেতর আর নেই।'

'আপনি কী নিয়ে কথা বলছেন, হে অ-দেবতা,' পালটা জবাব দিলো অসুর-রাজ। 'তারা সবাই এখানেই আছে! ওরা জীবিত...তবে বেশিক্ষণের জন্য না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি!'

রাক্ষসরাজ তার লোকদের দিকে ঘুরলো, আর এমন এক আদেশ দিলো যা তার নিত্যদিনের কাজ, কিন্তু তা বিভীষণ পূজারিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। এমন কিছু হরপ্পার দেবতা আশা করেননি।

'আগামী কাল সকালেই এদের দেহের ছাই আমার লাগবে,' সুরা তার কর্তৃত্বপূর্ণ, কর্কশ কণ্ঠে আদেশ দিলো। 'ওদের জীবিত পুড়িয়ে ফেলো!'

বানারস, ২০১৭
দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার

যখন কোনো সম্রাট খুব বেশি ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন, কিংবা সম্ভবত খুব বেশি নিজের প্রতি মুগ্ধ হয়ে পড়েন, তখন তিনি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ভাবতে শুরু করেন। মনে করতে থাকেন, সর্বশক্তিমান যা কিছু প্রয়োগ করতে চান, তার সবই ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে তারই মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। আলেকজান্ডার ঠিক তার অল্প বয়সে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন, তিনি ঐশ্বরিক। মিশরের ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস নিজের বিশাল আকারের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন, যেন তাকে ঈশ্বর হিসেবে পূজা করা হয়। আর এটাও বিশ্বাস করতেন, তিনি সূর্য দেবতা রা-এর আত্মীয়। কেন, এমনকি মুঘল রাজাদের মতো সাম্প্রতিক শাসকদের মাঝেও আমরা এই প্রবণতা দেখি। তারা নিজেদের নাম দিয়েছিলো জাঁহাপনা, যার অর্থ *বিশ্বের আশ্রয়*! মঠের চারপাশে হাঁটতে হাঁটতে ব্যাখ্যা করলেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

বিদ্যুৎ নিশ্চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে সব শুনছে...খানিক পরপর মাথাও নাড়ছে। দ্বারকা শাস্ত্রীর টানা কথার মাঝে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা তার নেই।

কনস্ট্যান্টিনও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি যুদ্ধের পর যুদ্ধ করেছেন আর বিশাল অঞ্চল জয় করেছিলেন। তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে ভাবতে শুরু করেছিলেন, এমন কেউ, যাকে ঘিরে তার বিশ্বাস ছিলো, তিনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক আচরণ অনুমান করতে পারেন। শুধু নিজের অধীনে থাকা অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যের সমন্বয়ে একটা বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছিলেন বলে তিনি ব্যাপক আকারে পুরো বিশ্বকেই এক করার কল্পনা শুরু করেছিলেন।

'ধর্মকে তিনি মানুষে মানুষে বিবাদের প্রথম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে অঞ্চল আর ভৌগোলিক এলাকাকে জোর করে একীভূত করা যায়, কিন্তু বিশ্বাস আর ধর্মের বেলায় বিষয়টা সেভাবে খাটে

না। রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ণশক্তি আর নৃশংসতার মাঝেও খ্রিষ্টান ধর্মের উত্থান নিয়ে কনস্ট্যান্টিন পুরোপুরি সজাগ ছিলেন। তাই তার সমন্বিত বিশ্বের স্বপ্ন বাস্তবায়ন তিনি ধর্ম দিয়েই শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।'

'বিষয়টা আমাকে মুঘল সম্রাট আকবরের কথা মনে করিয়ে দিলো, বাবা,' উত্তর দিলো বিদ্যুৎ। 'এমনকি আকবরও কোনো একক ধর্মের আধিপত্য বাদ দিয়ে আর প্রচলিত সব বিশ্বাসের সেরা অংশটুকু গ্রহণ করে তার বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি এবং সম্প্রীতি আনার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এমনকি, বলতে গেলে, একটা নতুন ধর্মের প্রচলন করেছিলেন, দ্বীন-ই-এলাহী বা তৌহিদ-ই-এলাহী।'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। আকবর তার নতুন তৈরি করা বিশ্বাসে মানুষকে জোর করেননি। কখনো শক্তি প্রদর্শন করেননি। কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রও না। কিন্তু কনস্ট্যান্টিনের বেলায় তেমন ছিলো না। তিনি প্রথমে নিশিয়ার দাপ্তরিক কাউন্সিলে খ্রিষ্টান ধর্মের দুই দলকে নিয়ে আসেন। এটা তার জন্য সহজ একটা কাজ ছিলো। এই কাউন্সিলের পাশাপাশি তিনি আমাদের মানব জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে উচ্চাভিলাসী আর সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রচারণা পরিচালনা করেছিলেন। তিনি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার স্থাপন করতে ভয়ানক আর অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন।'

* * * * *

ওরা এখন গোত্র প্রধানের কুটিরে ফিরে এসেছে। যদিও দেব-রাক্ষস মঠের ১০৮ বছর বয়সি বৃদ্ধ শিক্ষক এবং গোত্র প্রধান তার অসুস্থতা থেকে যথেষ্ট সেরে উঠেছেন, তবুও তিনি এখনো বেশ দুর্বল। তাদের আলোচনা আবার শুরু করার আগে তিনি নিজের সাদামাটা বিছানায় খানিক বিশ্রাম নিলেন।

'কনস্ট্যান্টিন একজন দার্শনিক ছিলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই, আর তার উদ্দেশ্যও ছিলো মহৎ। তার চেয়ে বড় কথা, বিগত কয়েকশো বছরে তিনি সেসব অল্প কজন মানুষের একজন ছিলেন যারা কালো মন্দিরের গোপনীয়তা সম্পর্কে জানতেন। তিনি নিজেকে *ঈশ্বরের সহযোগী* সম্বোধন করে সেই কাজটিই করতে চেয়েছিলেন, যাকে তার ভাষায় বলে *ঈশ্বরের কাজ*!'

দ্বারকা শাস্ত্রীর পুরো কথাটা বিদ্যুৎ শুনতে পায়নি। কালো মন্দিরের কথা উঠে আসামাত্র আবারো লাফিয়ে উঠলো সে।

'বাবা, কথা আরো এগোনোর পূর্বে আমাকে আপনার বলতে হবে কালো মন্দির আসলে কী? সেদিন ঘাটে বলভান্ত দাদা এটার নাম বলেছিলেন। বলেছিলেন, ন্যায়না কালো মন্দিরের সাথে যুক্ত থাকতে একটা স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে। এরপর রুমি পটাশিয়াম সায়ানাইডের ট্যাবলেট গিলে ফেলার আগে এটা নিয়ে কী যেন বিড়বিড় করছিলো। এখন আপনি এর রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করছেন, যা শত শত বছর ধরে লুকিয়ে আছে। কালো মন্দির কী, বাবা? এটা আমাদের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? এটা কোন গোপন জিনিসটা রক্ষা করে?'

'কালো মন্দির তার নিজের ভেতরে মানব জাতির শেষ আশাকে ধারণ করে। কিন্তু খানিক ধৈর্য ধরো, বিদ্যুৎ। আমি যদি তোমাকে না বলে থাকি, তার মানে কোনো একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। আজ থেকে মাত্র সাত দিন পরে তুমি কেবল কালো মন্দিরের রহস্যই খুঁজে পাবে না, বলতে গেলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের সবাইকে উদ্ধারের সময় আসে, তুমিই এর রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুত। কেবল এই মঠে যারা আছে তারা নয়, কিংবা এই পবিত্র কাশী নগরে যারা আছে তারাও নয়। বরং পুরো বিশ্বের সবার জন্য কথাটা প্রযোজ্য, বিদ্যুৎ।'

'তার অযৌক্তিক অতি-আত্মবিশ্বাস কিংবা সম্ভবত অহংকারের কারণে কনস্ট্যান্টিন যেটা দেখতে পাননি তা হলো, মহান দর্শন কেবল সেসব নারী এবং পুরুষই বহন করতে পারে যারা এসব বোঝা বহনের যোগ্য। নিজেই সম্পদ, ক্ষমতা আর জয়ের জন্য যে নিজের তৃপ্তি বিসর্জন দিয়েছেন, তেমন একজন হিসেবে তিনি এমন এক কাঠামো তৈরির চেষ্টা করেছেন যেটা কেবল কয়েক বছর টিকবে। তাও যদি তার নিজের বিশাল পরিকল্পনার সাথে জড়িত কেউ ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা না দেখায় আর কি। নিজ সময়ে যিনি পুরো বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ শাসন করেছেন, তিনি এক নির্বোধ আর হাস্যকর একজন রাজা!' এক নাগাড়ে বলে গেলেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

'এটা শুনতে আসলেই বাচ্চামি লাগছে, বাবা। কিন্তু তার মূল পরিকল্পনা কী ছিলো? নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কী ছিলো আসলে?' প্রশ্ন করলো বিদ্যুৎ। সে এখন ঠিক মঠাধীশের বিছানার পাশে বসে আছে।

'*ছিলো?* তুমি কি এইমাত্র *ছিলো* বললে নাকি, বিদ্যুৎ?' জানতে চাইলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। বিস্ময় আর তার প্রপৌত্রের শব্দচয়নের প্রতি খানিকটা তিরস্কারের নমুনা হিসেবে ভ্রু নাচালেন। 'পুরো বিশ্বের সবখানেই ভৌতিক ছায়ার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার, অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন তারা

অনেক বেশি শক্তিশালী। সমস্ত ইঙ্গিত কি এই কথাটাই বলছে না, বিদ্যুৎ? ঐ দুর্ভাগ্যজনক দিনটায় দশাশ্বমেদ ঘাটে রুমি পেরেরার সাথে তুমি যখন দেখা করতে গেছিলে, তখন কি আমি তোমাকে এ বিষয়ে সতর্ক করিনি?'

বিদ্যুৎ বুঝতে পারলো সে একটা ভুল করেছে। তার চেয়ে বড় কথা, সে বুঝতে পেরেছে, তার বাবা এই নাম উচ্চারণ বা বর্ণনা করার সময় কত বেশি সংবেদশীল ছিলেন। দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার।

'ক্ষমা করবেন, বাবা। আমি এটা বোঝাতে চাইনি। আমরা যেহেতু কনস্ট্যান্টিনের সময়কার কথা বলছি, আমি আসলে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি তার মূল উদ্দেশ্য কী ছিলো? সে এই আদেশের মধ্য দিয়ে আসলে কী অর্জন করতে চাইছিলো?'

দ্বারকা শাস্ত্রী মাথা নেড়ে কথা শুরু করলেন আবার।

'এ এক উদ্ভট আর আদর্শবাদী স্বপ্ন ছিলো বটে। এক নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার দিয়ে কনস্ট্যান্টিন পুরো বিশ্বকেই আবার নতুন করে গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। এবার তাতে কোনো বাধা, ঘৃণা, কোনো ফল্ট লাইন আর মানুষে মানুষে জাত, দেশ, বিশ্বাস, গায়ের রং বা অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার ভিত্তিতে কোনো যুদ্ধ থাকবে না। তিনি যে কদিন শান্তি আর মহানুভবতা উপভোগ করেছিলেন, কেবল সে কদিনই যখন মানুষ তার বিশাল সাম্রাজ্যে একই আইন, একই একই শাসন, একই সংস্কৃতি, একই অর্থনীতি আর সবচেয়ে বড় কথা, একই ধর্মের অধীনে ছিলো। ঈশ্বরের কাজ করার প্রতি তার ইচ্ছা আর তার চলে যাওয়ার পর পৃথিবীকে আরো উন্নত অবস্থায় রেখে যাওয়ার ইচ্ছা পূরণ করতে কনস্ট্যান্টিন পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনের এক সূক্ষ্ম ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এক ভ্রাতৃসংঘ, যেটা এতই শক্তিশালী হবে, যেন পুরো মানব জাতিকে কনস্ট্যান্টিনের একক বিশ্বের মহান দর্শনের দিকে টেনে আনবে–যেখানে থাকবে একটাই সরকার, একটাই অর্থনীতি, একই মুদ্রা ব্যবস্থা, একই সামরিক ব্যবস্থা, একই সংস্কৃতি আর একই ঈশ্বর!'

এটা বিদ্যুতের শোনা সবচেয়ে উদ্ভট বিশ্ব-দর্শন। এমনকি যে-কেউ এমন কিছুর চেষ্টা করবে, হয়তো তাকে পাগল হতে হবে নয়তো হতে হবে অতিমানব।

কনস্ট্যান্টিন কিছু ক্ষেত্রে দুটোই ছিলেন।

* * * * *

'এমন অসংলগ্ন কিছু মানুষ কীভাবে ভাবতে পারে, বাবা? এমনকি ভারতের মতো একটা বড় দেশকেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির জন্য একই পরিচয় ধরে রাখা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু তবুও আমরা যদি রাজনীতিকে সরিয়ে নিই, মানুষের মতো এত বৈচিত্র্যময় একটা জাতিকে কীভাবে কৃত্রিম অভিন্নতার দিকে টেনে নেওয়া হবে? স্বাধীন ইচ্ছা, চাহিদা, পছন্দ, ইচ্ছা বা আনুগত্য কীভাবে স্থায়ীভাবে আপোস করা হবে? কীভাবে মানুষের সাথে রীতিমতো ভেড়ার মতো আচরণ করা হবে?' বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ। একজন সম্রাটের শুধু তার নিজের সময়কার বিশ্ববাসীই না, বরং পরবর্তী প্রজন্মে যারা আসবে তাদেরও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করা চেষ্টা বা সাহস থাকতে পারে, এটাই তার কাছে প্রচণ্ড আপত্তিকর ছিলো।

দ্বারকা শাস্ত্রী বিদ্যুতের দিকে না তাকিয়েই ক্লান্ত হাসি দিলেন। তিনি খুশি হয়েছেন যে তার প্রপৌত্র আজকের দিন পর্যন্ত চলমান এই মধ্যযুগীয় পাগলামি নিয়ে রেগে গেছে।

'সেদিন নিশিয়ায় ভাতৃসংঘের প্রথম সদস্যদের কাছে কনস্ট্যান্টিন যে আদেশ করেছিলেন সেটা খুব সাধারণ কিছু শব্দ। নিজ হাতে প্রথম যে বিশজন ভাইকে তিনি তার নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বেছে নিয়েছিলেন, তাদেরকে সরাসরি একটা প্রাথমিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিলো–একটানা, অপ্রতিরোধ্য আর আগ্রাসী হয়ে এক-বৈশ্বিক সরকার গঠনে কাজ করে যেতে হবে।'

'মানে? এ কেমন কথা, বাবা? এক-বৈশ্বিক সরকার? কেমন পাগলাটে মানুষ হলে এরকম উদ্ভট কিছু বাস্তবায়ন করার কল্পনা করতে পারে?'

পৌত্র প্রধান বিদ্যুতের দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসলেন। কিন্তু বিদ্যুৎ তার চোখে কোনো প্রকার আনন্দের ছিটেফোঁটাও দেখতে পাচ্ছে না।

দ্বারকা শাস্ত্রী এবার বিদ্যুৎকে এমন প্রশ্ন করলেন যা বহু আগেই করার কথা।

'তুমি কি নেস্টোরিয়ান খ্রিষ্টানদের কথা শুনেছ, বিদ্যুৎ? আর নাইটস টেম্পলারদের কথা?'

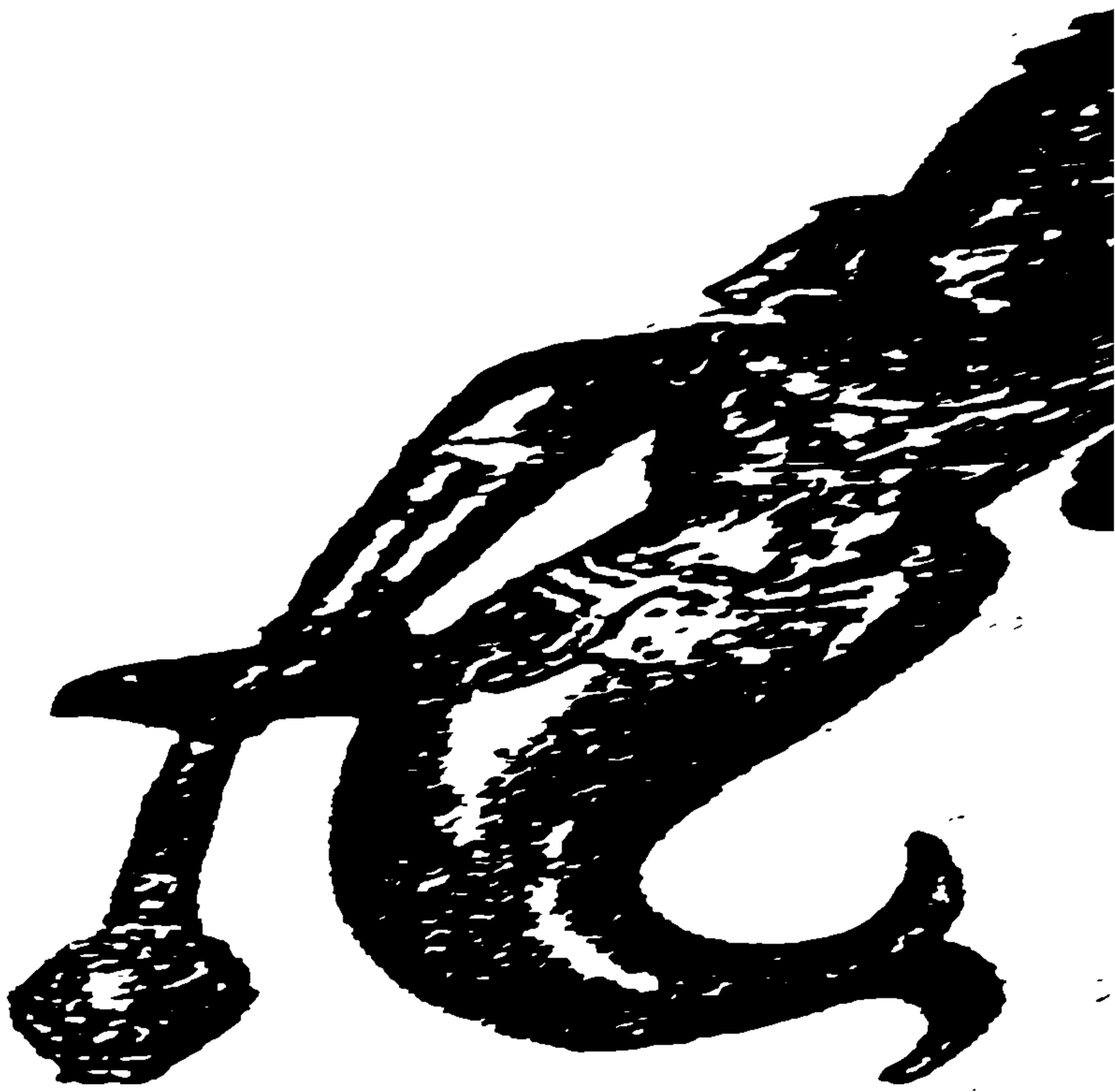

হরপ্পার পূর্বে, ১৭০০ খ্রিস্টপূর্ব

প্রলয়

'তোমার বাবা কেবল কালো মন্দিরের অস্তিত্ব বা এর অবস্থা জানতেন, এমন না, মানু। তিনি এর প্রধান রক্ষকদের মাঝে একজন।'

মানু এখন মৎস্যের সাথে বিশাল এই মন্দিরটা ঘুরে দেখছে। নীল এই মৎস্য-মানবকে মানু অল্প সময়ের মাঝে খুব ভালোবেসে ফেলেছে। কাছে অনুরোধ করা হয়েছিলো তিনি যেন বিভীষণ পূজারির সন্তানকে নিয়ে খানিক ঘুরে আসেন। অসাধারণ মন্দিরটার অনেক উপরের এক করিডর থেকে অন্য করিডরে হেঁটে যাওয়ার সময় ছোট ছোট নিজস্ব প্রার্থনা কক্ষের ভেতর গভীর ধ্যানে মগ্ন রহস্যময় সন্ন্যাসীদের দেখতে পেল সে। এমন দৃশ্য দেখার মাঝেও মানু তার মন থেকে দুটো জিনিস মুছে ফেলতে পারেনি। এক, খানিক আগে মৎস্য অস্বাভাবিক আর ভয়ানক কণ্ঠে বড় এক বন্যার কথা বলেছিলো। দুই, ফাঁকা পাহাড়ের ভেতর অনেকটা উচ্চতায় সাতটা প্রার্থনা কক্ষের ভেতর ঐশ্বরিক নীল আলোর আভা জ্বলজ্বল করছে।

'তিনি এই মন্দির নিয়ে কিছু বলেননি, হে মৎস্য,' জবাব দিলো মানু।

'মাও বলেনি।'

বাবা-মায়ের কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে মানুর একবার গলা ধরে এলো, তবে তা পাশ কাটিয়ে গেল সে।

'তবে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে আমি যখন মাকে নিয়ে ঘোড়ায় ছিলাম, সোমদত্ত কাকা চিৎকার করে কিছু একটা বলেছিলেন। আর আমি যতক্ষণই অবচেতন অবস্থায় ঘোড়ায় চড়েছি, সেটাই আমার মাথায় গেঁথে ছিলো। তিনি আমাকে বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মা কালো মন্দিরের খোঁজ পাই, আমি যেন পূর্ব দিকেই যেতে থাকি।'

মৎস্য খানিক থেমে মানুর দিকে ফিরলেন।

'তুমি জানো, এই মন্দির খুঁজে পাওয়া তোমার ভাগ্যে ছিলো? নাকি জানতে না, মানু? একইভাবে, এই মন্দিরও তোমাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত ছিলো। আর এখন থেকে, তুমিই এর প্রধান পুরোহিত আর রক্ষাকর্তা হবে।'

এসব কিছু মানুর জন্য অনেক বেশি আবেগের কারণ হয়ে উঠলো। কালো মন্দির, অতিরিক্ত ক্ষমতা, শিবের বিশাল মূর্তি, বিক্ষিপ্তভাবে খোদাই করা বড় আকারের গুহা, এক মহাপ্লাবনের ভবিষ্যদ্বাণী, উজ্জ্বল নীল গুহা...আর এখন মৎস্যের মুখ থেকে এমন এক কথা।

গভীর শ্বাস নিলো সে, কোমরের বন্ধনী খুলে তলোয়ারটা বের করে রাখলো। ওটা একপাশে সরিয়ে রেখে পাথুরে সিঁড়িতে বসে পড়লো।

নিজেকে কিছুটা সামলে যখন উপরের দিকে তাকালো, দেখলো মৎস্য খুব দুষ্টুমি-মাখা আর খুশি খুশি চোখে তাকিয়ে আছে। মৎস্য-প্রজাতির এই অবিশ্বাস্য নেতা এক নম্র কিন্তু সংক্রমক হাসিতে ফেটে পড়লো।

'কীইইই?' বিস্মিত হলো মানু, কিছুটা লজ্জাও পেয়েছে বটে। সে নিজেও এখন কিছুটা হাসছে, যদিও মৎস্য যে কীসে এত মজা পেয়েছেন তা সে জানে না।

'তুমি খুব নাটুকে...তলোয়ার সরিয়ে রাখলে...সিঁড়িতে এভাবে বসে পড়লে...হাহাহা...' মৎস্য আরো বিকট শব্দে হাসছেন। 'আর...আর...তুমি যেভাবে শ্বাস ছাড়লে সেটাও আমার খুব ভালো লেগেছে...ও ঈশ্বর!' মৎস্য এখন এত জোরে হাসছে যে পাহাড়ের এই বিশালাকার খালি জায়গায় তার হাসি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

মানু এই আনন্দের প্রতিবাদের মাঝেই আরেকটা শব্দ উচ্চারণের আগে যা দেখলো তাতে নিজের বুকের ভেতর অন্য রকম কাঁপুনি অনুভব করলো।

মৎস্যের হাসির শব্দ এই মন্দিরের প্রার্থনা ঘরের বিভিন্ন দরজা আর উঁচু দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, সেই সাথে প্রতি মুহূর্তেই যেন শব্দের জোর বাড়ছে। এক মুহূর্তের মধ্যে মানু অনুভব করলো, পুরো পাহাড়টাই যেন হাসছে। না...কেবল পুরো পাহাড়টা না, সেই সাথে পুরো মহাবিশ্ব, প্রতিটা ঝরা পাতা, প্রতিটা পাথর, প্রতিটি পাখি, প্রতিটা প্রাণি, প্রতিটা দূর্বাদল, প্রতিটা দমকা হাওয়া, প্রতিটা আলোর রেখা, প্রতিটা নবজাতক শিশু...পুরো সৃষ্টিজগৎ যেন একই সাথে মৎস্যের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা আনন্দে যোগ দিয়েছে।

এটাই।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে মৎস্যের দিকে হেঁটে গেল মানু। সে এখন চোখ মুছছে। তার আনন্দ আর হাসিঠাট্টায় চোখ ভিজে এসেছিলো। মানু তার পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

'আপনি বিষ্ণু, তাই না? আপনি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না, হে মৎস্য...!' বিস্মিত কণ্ঠে বললো মানু।

মৎস্য হাসলেন, কিন্তু তাকে দেখে মনে হলো কান্নায় ভেঙে পড়বেন। নিচু হয়ে মানুকে ধরে তুললেন তিনি।

'আপনিই বিষ্ণু...' গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে মৎস্যের চোখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললো মানু। এবারের কথাটায় প্রশ্ন ছিলো না।

'আমি বিষ্ণু নই, হে মহান রাজা,' জবাব দিলেন মৎস্য।

না। তিনি তা ছিলো না।

ঠিক যেমনটা রাম আর কৃষ্ণ ঠিক বিষ্ণু ছিলেন না।

* * * * *

'বিভাষণ পূজারি, সোমদত্ত আর এমনকি পণ্ডিত চন্দ্রধর এমন কিছু মানুষ ছিলেন, যারা কালো মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতেন,' ব্যাখ্যা করলেন মৎস্য। 'তাদের সবাই জানতেন, এই মন্দির এমন এক রহস্য লুকিয়ে রেখেছে, যা মানব জাতির ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুধু তোমার বাবা পরাক্রমশালী বিভাষণ পূজারি আর তার স্ত্রী সানজানাই আসল রহস্য সম্পর্কে জানতেন।'

মৎস্য যেভাবে প্রতিবার মানুষদের *তোমাদের মতো* বা *মানব জাতি* বলে সম্বোধন করছিলেন, সেটা মানুকে সব সময়ই বিরক্ত করছিলো। কথাগুলো

শুনতে উদ্ধত বা একপেশে মনে হয়নি। এমনি তার কথায় অবজ্ঞার ভাবটুকুও ছিলো না। তবে এমন কিছু ছিলো যার কারণে তাকে অন্য জগতের সাধু বলে মনে হচ্ছিলো।

'হে মৎস্য, এই মন্দিরে কী আছে? কেন সোমদত্তজি আমাকে এদিকে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন? তিনি কি জানতেন আপনি এখানেই আছেন? তিনি কি জানতেন কালো আলখাল্লা-পরা এই পাহাড়ের প্রহরীরা আমাকে উদ্ধার করবেন? আর আপনি যখন আচমকা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন আর একটা বিধ্বংসী প্লাবন হওয়ার ঘোষণা দিলেন, তখন আসলে কী বোঝা চেয়েছিলেন? আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি হরপ্পান জনবসতিকে প্রবল বর্ষণ গ্রাস করছে। সরস্বতীও ক্রমেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু আমরা সব সময়ই বিশ্বাস করতাম, পবিত্র সপ্তর্ষিরা তারই সন্তান, আর তিনি কখনোই এমন কিছু করবেন না যা তাদের ক্ষতির কারণ হবে। আমি এতগুলো প্রশ্নের জন্য দুঃখিত, মৎস্য, কিন্তু দয়া করে আপনার জ্ঞানগর্ভ কথার মাধ্যমে আমাকে আশীর্বাদ করুন।' মানু জানে সে নীল রঙের মৎস্য-মানবকে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেলেছে, কিন্তু তার আর কোনো উপায় ছিলো না।

মৎস্য গভীর মনোযোগ দিয়ে মানুর দিকে তাকালেন। কিন্তু উত্তর দেওয়ার আগে তিনি শামুক দিয়ে বাঁধানো একটা পাত্র কুড়িয়ে নিলেন।

'মানু, তুমি কি দয়া করে আমাকে খানিক জল এনে দিতে পারো?' মন্দিরের এককোণ থেকে বেরিয়ে আসা ঝরনাধারার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন মৎস্য। 'আমার লোকেরা তৃষ্ণার্ত।'

মানু সাথে সাথে আদেশ পালন করলো। কোনো একভাবে মৎস্যকে সেবা করার সামান্য এই সুযোগটাও তাকে অসীম আনন্দ দিলো।

* * * * *

ওরা এখন কালো মন্দিরের বাইরে ধুলোমাখা ঘাসের উপর হাঁটছে। আকাশটা অস্বাভাবিক রকমের কালো। হরপ্পান সমাজের উপর যে ক্রোধ ছিলো, সেই অন্ধকার এখন দূরদূরান্তের প্রান্তরেও ছড়িয়ে পড়ছে। মৎস্য আর মানু দুজনেই থেমে আকাশের দিকে তাকালো। উপরে তাকাতেই মনে হলো ভয়ংকর মেঘ আর বজ্রপাত থেকে বাঁচতে লাখ লাখ পাখির একটা ঝাঁক একসাথে পালিয়ে যাচ্ছে।

'সোমদত্ত এই রহস্যময় মন্দিরের পেছনের উদ্দেশ্য নিয়ে জানে না, কিন্তু সে জানতো পাহাড়ের প্রহরীরা ন্যায়ের পক্ষের সৈনিক, তারা শিব আর হরপ্পার সূর্য, মানে তোমার মহান বাবা, দুজনেরই অনুগত। সে তোমাকে এই পথে পাঠিয়েছে কারণ সে জানতো এটাই তোমার বেঁচে থাকার একমাত্র পথ ছিলো,' বললেন মৎস্য, যদিও এখনো পাখিদের অসময়ের স্থানান্তরের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

'এ মানুষগুলো আমার বাবার অনুগত? এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তার প্রভাব আমাকে কখনোই মুগ্ধ করতে তোলে না। তবুও তিনি এমনভাবে মারা গেলেন, যেখানে একজন বন্ধুও ছিলো না তার শেষ যাত্রায় কাঁধ মিলিয়ে চলার জন্য,' তিক্ত কণ্ঠে ক্ষোভ ঝাড়লো মানু।

মৎস্য ঘুরে তার হাত মানুর কাঁধে রাখলেন।

'মানু, তুমি যা কল্পনা করতে পারো, তার চেয়ে বড় প্রভাব তোমার বাবা রাখবেন। ভাগ্যের চাকা কেবল ঘুরতে শুরু করেছে। কিন্তু এখন আমাদের আরো অনেক কিছুতে চাপ প্রয়োগ করার মতো বিষয় আছে।'

'আর সেগুলো কী কী হতে পারে, হে মহান মৎস্য?'

এবার অবশ্য মৎস্য-মানব দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। দুই উঁচু পাহাড়ের মাঝ দিয়ে দূরের দিগন্তের দিকে তাকালেন তিনি।

'এক মহাপ্লাবন ধেয়ে আসছে, মানু। মানুষ জানে না, শোনেনি বা কখনো কল্পনাও করেনি, এমনই বিধ্বংসী এক প্লাবন শীঘ্রই আমাদের দিকে ধেয়ে আসবে।'

মানু খেয়াল করলো, দুশ্চিন্তায় মৎস্যের কপালে ভ্রু কুঁচকানোর ভাঁজ বসেছে। এই রহস্যময় সৃষ্টির সাথে পরিচয়ের পর থেকে এবারই প্রথম মানু দেখলো তার অপার্থিব উজ্জ্বল নীল চেহারায় দুশ্চিন্তা আর বিষাদের ছাপ পড়েছে।

'আমি জানতাম না যে আপনি একজন গণকও,' বললো মানু।

মৎস্য হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকালেন। 'আমি কোনো গণক না, মানু।'

'আপনি আসলেই গণক না? আপনি যদি জ্যোতিষীই না হবেন, তবে 'আসন্ন প্রলয় নিয়ে কী করে জানেন?'

'ওটা ব্যাপার না, মানু। যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হলো, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো কি না,' সরাসরি মানুর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন মৎস্য।

মুচকি হেসে মানু উত্তর দিলো, 'হে মৎস্য, আপনার মাঝে অবিশ্বাস করার মতো কিছুই নেই। আমরা এই মানুষদের জড়ো করবো আর উচ্চভূমির দিকে যাত্রা করবো। এই বন্যাকে পরাজিত করবো আমরা।'

মৎস্য হতাশায় মাথা নাড়লেন। মানুর এমন সাদামাটা উত্তরে তার মাঝে বিরক্তির ছাপ দেখা গেল।

'তুমি কি আমার কথা শুনতে পাওনি, মানু? পৃথিবীর কোনো পাহাড়ই এই বিশাল বন্যার পানি প্রবাহ থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট উঁচু না। এই বন্যা থেকে বাঁচা যাবে না।'

এবার নিজেও কিছুটা বিরক্ত হলো মানু। যদিও প্রকৃতি আদিম, বন্য শক্তি নিয়ে আসে, তবু কেন মানুষ আরেকটা বন্যার সামনে টিকতে পারবে না, হোক না সেটা আগের যেকোনো বন্যা থেকে অনেক বেশিই ভয়ানক? মানব জাতি সব সময় একটা উপায় বের করে নেবে।

'কিন্তু আপনি কেন এমনটা বললেন, মৎস্য? কেন আমরা এই বন্যায় টিকে থাকতে পারবো না?'

এবার মৎস্য তার ঠান্ডা মেজাজ হারিয়ে ফেললেন, আর মানুর দিকে ফিরে চিৎকার করে উঠলেন। যেন সে এই বাস্তবতা ঠিক কতটা কঠিন তা উপলব্ধি করতে পারে।

'কারণ এটা কোনো সাধারণ বন্যা না, হে সানজানার পুত্র। এটা পৃথিবী আর তার সব বাসিন্দা–হোক মানুষ, প্রাণি, উদ্ভিদ, পোকামাকড়–সবাইকে ধ্বংস করবে। কিছুই এর করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাবে না। কারণ যা ধেয়ে আসছে, সেটাই আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে চূড়ান্ত পরিণতি বলে লিখিত! যা ধেয়ে আসছে সেটা আর কিছু না, সেটা প্রলয়–পৃথিবীর ধ্বংস!'

বানারস, ২০১৭
অন্ধকার ভ্রাতৃসংঘ

গভীর রাত। ঘড়িতে সময় ১১ টা ত্রিশ মিনিট। গোত্র প্রধানের ঘুমানোর সময়ের অনেকটা পেরিয়ে গেছে। কিন্তু দ্বারকা শাস্ত্রী আর বিদ্যুতের ঘুমানোর কোনো তাড়া নেই। তারা যা নিয়ে আলোচনা করছে, তা পৃথিবীর বাকি সবকিছু থেকে বেশি গুরুত্বপর্ণ।

'কনস্ট্যান্টিন এক গোপন ভ্রাতৃসংঘকে ক্ষমতা প্রদান করলেন আর সিদ্ধান্ত নিলেন, খ্রিষ্টান ধর্মই হবে নতুন পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম। আমার মনে হয় না যে কোন বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত জয়ী হচ্ছে সেটা নিয়ে তিনি খুব বেশি ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। তার চিন্তা ছিলো যে এটাই একমাত্র বিশ্বাস, আর এটাই যথেষ্ট। যেহেতু এটা সবারই জানা, তিনি সে সময় খ্রিষ্টধর্মের একেবারে গভীরে ঢুকে পড়েছিলেন, আর তখনকার দিনে এটি এরই মাঝে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম ছিলো। তিনি তাই ওতেই বাজি রাখলেন। কিন্তু এর প্রভাব ছিলো ভয়ানক। তিনি নতুন ভ্রাতৃসংঘকে কেবল এই এক ধর্মকে সমর্থনই জানাতে বলেননি, একই সাথে তাদের হাতে থাকা সব ধরনের উপায় ব্যবহার করে একে ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি এর মানে হয় যুদ্ধ, তিনি তাদের তাই করতে বলেছিলেন। যদি এর অর্থ হয় ধর্মান্তরিত করা, তিনি তাদের মিশনারিদের এক বাহিনী তৈরি করে তাই করার নির্দেশ করেছিলেন। ধর্মটা তার কাছে ছিলো এক লোকদেখানো মুখোশ, যার পেছনে তার অনিচ্ছাকৃত দর্শন কুৎসিত আকার নিতে শুরু করে। এর ঠিক পেছনেই অনুসরণ শুরু করে রাজনীতি আর অর্থনীতি।'

'তার মানে খ্রিষ্টান ধর্ম সব সময়ই আধ্যাত্মিক ধারণার পরিবর্তে রাজনৈতিক হাতিয়ারই ছিলো, বাবা?' জানতে চাইলো বিদ্যুৎ।

'অবশ্যই না, বিদ্যুৎ। খ্রিষ্টধর্ম সব সময়ই এক গভীর চিন্তাধারা আর ঐশ্বরিক ধর্ম। আমি ওল্ড আর নিউ টেস্টামেন্ট পড়েছি। সেই সাথে সর্বকালের

সেরা গল্পগুলো-যিশু খ্রিষ্টের গল্প। ভালোবাসা, সমতা, ক্ষমা, ভক্তি আর আত্মত্যাগের বাইরে এটি আর কিছুই প্রকাশ করে না। যিশু সব কষ্ট নিজের উপর নিয়েছেন। এটা কী করে সহজাত রাজনৈতিক বা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বাস হয়? তার চেয়ে বড় কথা, খ্রিষ্টধর্ম তার উদারতা আর মমত্ববোধ অসংখ্য দাতব্য সংস্থা আর ব্যক্তির মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। অত দূরে যাচ্ছো কেন? কেবল ভারতেই বেশ কিছু খ্রিষ্টান প্রতিষ্ঠান আর ব্যক্তি আছে, যারা দরিদ্রদের উন্নতির জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, স্যানিটেশনসহ আরো অনেক কিছু নিয়ে কাজ করছে। তাই কেউ যদি পুরো ধর্মের দিকে আঙুল তোলে, তবে খুব বড় ভুল করবে।'

পূর্ণ সম্মতিতে মাথা নাড়লো বিদ্যুৎ। তার কাছে এটা দেখে ভালো লাগছিলো যে তার আপাতদৃষ্টিতে গোঁড়া ব্রাহ্মণ প্রপিতামহ অন্যান্য বিশ্বাস আর তাদের গুণাবলী নিয়ে যথেষ্ট জানেন।

'তাহলে কোথায় গিয়ে এটা পথ হারালো, বাবা? একাদশ আর ত্রয়োদশ শতকে এসে লাতিন চার্চগুলোতে নৃশংস মিলিটারি ক্রুসেড নিয়ে আমরা সবাই জানি। ক্রুসেডের পর দ্য ইনকুইজিশনের অধীনে তথাকথিত ধর্মবিরোধীদের জীবিত মেরে ফেলা ছিলো খুবই প্রচলিত এক প্রথা। সে সময়ের তথাকথিত ধর্মীয় প্রচারণার সময় যে সকল নৃশংসতা আর সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিলো তা নিয়ে পড়াশোনা করলে যে-কারোই গা শিউরে উঠবে। তাহলে এসব কেন ঘটলো, যদি খ্রিষ্টধর্ম কেবল পরোপকারি মনোভাবেরই প্রচার ঘটায়?'

'ঠিক এখানেই সবকিছু ভুল হয়, বিদ্যুৎ। মানুষের লোভ। সম্পদের লোভ আর ক্ষমতার লালসা।'

কেউ একজন দরজায় কড়া নাড়তেই কথোপকথনে বাধা পড়লো।

'হুম...' নিজের চিরায়ত ভঙ্গিমায় উত্তর দিলেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

দরজা খুলে যেতেই ন্যায়না ভেতরে এলো। বিদ্যুৎ খেয়াল করলো, এত রাতেও তাকে ডেইজি ফুলের মতোই স্নিগ্ধ লাগছে। বিদ্যুৎকে পাশ কাটিয়ে গোত্র প্রধানের বিছানার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার শরীর থেকে যেন বুনো ঘাসের গন্ধ ভেসে আসছিলো।

মঠাধীশের বেড সাইড টেবিলের উপর হলুদ-মাখা গরম দুধের একটা গ্লাস রাখলো ন্যায়না।

'ধন্যবাদ, কন্যা,' বললেন দ্বারকা শাস্ত্রী। 'কিন্তু তুমি নিজে কেন কষ্ট করতে গেলে?'

'কাজের জন্য যারা ছিলো তারা সবাই আজকের মতো ঘুমিয়ে গেছে, বাবা। আপনি অনেকক্ষণ ধরেই কিছু খাননি,' হাসিমুখে উত্তর দিলো ন্যায়না, বৃদ্ধের সাথে আদুরে কন্যার মতো করেই কথাগুলো বললো সে। দ্বারকা শাস্ত্রী তাকে বড় করেছিলেন।

বিদ্যুৎ ন্যায়নার দিক থেকে চোখ সরাতে পারেনি। সে ওকে কেবল নিজের উপর না, বরং দেব-রাক্ষস মঠ, মানে মেয়েটির নিজের বাড়ির উপরেই বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনেছিলো। আর সে এখন পর্যন্ত তাকে সরিও বলতে পারেনি।

'শুভ রাত্রি, বাবা,' বললো সে।

ন্যায়না রুম ছেড়ে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। বিদ্যুৎ খেয়াল করেছে, ন্যায়না এই রুমে তার উপস্থিতিকে গ্রাহ্যই করেনি।

ওর সাথে আমার দেখা করতে হবে। আর আমি যা করেছি, তার জন্যে ক্ষমাও চাওয়া দরকার।

আর ঈশ্বর, সে দারুণ সুন্দরী!

* * * * *

'৩২৭ খ্রিষ্টাব্দের ২২ই মে, কনস্ট্যান্টিনের মৃত্যুর ঠিক পরপরই এই গোপন ভ্রাতৃসংঘ এক ভয়ংকর দৈত্য হিসেবে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। এতে সেই সময়কার সবচেয়ে ধনী আর ক্ষমতাবান কিছু মানুষ যোগ দেন, আর এতে করে ভ্রাতৃসংঘের প্রভাব খুব দ্রুত বাড়তে থাকে। আর এর প্রেক্ষিতে আদর্শ আর লক্ষ্যেও একই হারে পতন ঘটে। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের দর্শন আর বক্তব্য তখন মানব জাতির উন্নয়ন থেকে বদলে গিয়ে হয়ে যায় ভাতৃসংঘের মতবাদের ভিত্তিতে সমগ্র মানব জাতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা। এটা খুবই ছোট একটা পরিবর্তন, যদি শাসকের দিক থেকে দেখা হয় আরকি।

'ভ্রাতৃসংঘ প্রথমেই নিজস্ব বিশ্বাসের মাঝে সকল ভিন্নমত আর বিরোধীদের ধ্বংস করে ফেলে। ৪৩১ সালে বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস ইফেসাসে (বর্তমান তুরস্কের সেলকুকের কাছে) আরো একটি পবিত্র ধর্মসভার ডাক দেন। এতে নেস্টোরিয়ান খ্রিষ্টানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়কে ধর্মবিরোধী বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কাউন্সিলে থাকা খুব অল্প কজন মানুষই জানতেন, থিওডোসিয়াস নিজেই এই গোপন ভ্রাতৃসংঘের একজন সদস্য

ছিলেন। আসলে, তিনিই ছিলেন সেই সময়ে এই সংঘের সর্বোচ্চ কমান্ডার,' একটানা বলে গেলেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

প্রপিতামহের ঐতিহাসিক দক্ষতায় মুগ্ধ হলো বিদ্যুৎ। তাছাড়া, ভাতৃসংঘের আসল সত্য আবিষ্কারের জন্য তার কৌতূহল এখন তুঙ্গে।

'বলতে থাকুন, বাবা, এরপর কী হয়েছিলো?'

গরম দুধে কয়েক চুমুক দিলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। গভীর মনোযোগে কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করে রাখলেন। এরপর আবার কথা শুরু করলেন। তিনি জানতেন, তাকে এক ঘণ্টার মাঝেই আনুমানিক পনেরোশো বছরের রক্তপাত, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, অর্থনৈতিক অপরাধ আর গণহত্যার ইতিহাস বর্ণনা করতে হবে। ক্রম ধরে রাখা কঠিন।

'যেমনটা আমি বলছিলাম, বিদ্যুৎ, ভ্রাতৃসংঘের প্রাথমিক মূল্যবোধের খুব দ্রুত ক্ষয় ঘটছিলো। এটা শীঘ্রই সবাইকে একত্র করার প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে ধর্মকে সরিয়ে ফেলে, যদিও এই মুখোশের পেছনেই তারা কয়েক শতাব্দী ধরে মানব ইতিহাসের ক্ষমার অযোগ্য পাপ করে এসেছে। এরপর থেকেই ওরা আরো সংবেদনশীল, আরো উচ্চাভিলাসী আর অনেক বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠেছে।'

'এই ভ্রাতৃসংঘকে কী বলা হতো, বাবা? বা, আমার ভুল শুধরে নিলে, ওদের কী নামে ডাকা হয়, বাবা?'

বিদ্যুৎ খুব দ্রুত শিখতে পারে।

'ভালো প্রশ্ন, বাবা বিদ্যুৎ। যখন এর শুরু হয়েছিলো, তখন কেউই জানতো না এদের কী নামে ডাকা হয়। অদ্বৈত শাস্ত্রী নিজেও মঠের কোনো নথিতে তা বর্ণনা করে যাননি। কিন্তু দ্রুতই এই গোপন সংস্থা বড় হতে থাকে, সেই সাথে আরো অনেক দেশ আর মহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। পরে যা ঘটলো, তা বেশিরভাগ ধর্মীয় সংগঠনেই ঘটে। যখন তারা তাদের প্রতিষ্ঠাতা থেকে সরে যায় আর নিজেদের একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে প্রসারিত করে।'

'ওরা বিভক্ত হয়ে গেল...' বিড়বিড় করলো বিদ্যুৎ। 'ওরা বিভক্ত হয়ে গেল, তাই না, বাবা?'

'হ্যাঁ, আবার না,' জবাব দিলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। 'সঠিক বিবরণ পাওয়া খুবই কষ্টকর, তবে প্রথম যা হলো, তারা সামরিকভাবে প্রচণ্ড শক্তিশালী হলো। এতই শক্তিশালী হলো যে পৃথিবীর কেউই ঘুরে দাঁড়াবে আর তাদের প্রশ্ন করবে, কীভাবে খ্রিষ্টের বিশ্বাস এখন বৃহৎ সেনাবাহিনীর উপর নির্দেশনা দেয়–যার শুরুটা হয় নাইটস টেম্পলার দিয়ে।'

'ওয়াও...' বিস্মিত বিদ্যুতের মুখ হাঁ হয়ে গেল। সে নাইটস টেম্পলার সম্পর্কে জানতো।

'তোমার মতোই বেশিরভাগ মানুষই নাইটস টেম্পলার নিয়ে জানে। কিন্তু খুব কম মানুষই এই দলটার শুরু থেকে এর সম্ভাব্য শেষ পর্যন্ত পুরো ইতিহাস সম্পর্কে জানে।'

'আমি তাদের সম্পর্কে সবকিছু জানতে আগ্রহী, বাবা। বিশেষ করে কারণ তারা হাজার বছর ধরে চলমান এই ষড়যন্ত্রের সাথে বিশেষভাবে জড়িত বলে মনে হচ্ছে।'

দ্বারকা শাস্ত্রী এইমাত্র যে নাইটস টেম্পলারদের সম্ভাব্য পরিণতি শব্দটা উল্লেখ করেছিলেন, সেটা বিদ্যুতের নজর এড়িয়ে যায়নি।

টেম্পলাররা কি তবে এখনো অজানা আর বিপজ্জনক কোনো আধুনিক অবতারের মাঝে টিকে আছে?

'ওরা অনেকগুলো নামেই পরিচিত ছিলো, যেমন পুওর কেলো সোলজার অব ক্রাইস্ট এন্ড অব দ্য টেম্পল অব সলোমন। সেই সাথে অর্ডার অব সলোমনস টেম্পল। তবে প্রধানত তাদের ডাকা হয় নাইটস টেম্পলার বা সংক্ষেপে: টেম্পলার্স। যখন সূচনা হয়েছিলো, এটা ক্যাথলিকদের সামরিক বাহিনী ছিলো, পরে যা ১১৩৯ সালে এসে চার্চের দাপ্তরিক আশীর্বাদ পেয়েছিলো।

'যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের কাছে এক ভয়ংকর অপ্রতিরোধ্য শক্তি বলেই পরিচিত এই টেম্পলাররা খুব দ্রুতই জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে ওঠে। তাদের সাদা টিউনিক (হাতাবিহীন ঢোলা জামা) আর পোশাক এবং ঢালে বড় আকারের লাল ক্রসের জন্য দূর থেকেই তাদের চিহ্নিত করা যেত। বিশ্বের ইতিহাসে টেম্পলাররাই ছিলো প্রথম, যেখানে সম্পূর্ণ ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রশিক্ষিত এবং স্থায়ী সেনাবাহিনী নিয়ে গর্ব করেছে। ভারী অস্ত্রে সজ্জিত এই বাহিনীকে কোনো রাজা বা রানির কাছে রিপোর্ট করতে হতো না। মোটা দাগে বলতে গেলে, তারা উচ্চ পর্যায়ের একজন যাজকের কথাই কেবল মেনে চলতো।'

'যাজক আর সৈনিকরা এই দলে যোগ দিয়েছিলো। তাহলে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ কীভাবেই বা পিছিয়ে থাকতে পারে? কনস্ট্যান্টিনের মহাপরিকল্পনা ধীরে ধীরে আকার নিতে শুরু করে এভাবেই।'

বিদ্যুৎ মাথা নেড়ে বলতে শুরু করলো, 'আপনি একেবারেই ঠিক বলেছেন, বাবা। নাইটস টেম্পলাররা ক্রুসেড বা যেমনটা সে সময়কার যাজকরা বলতে পছন্দ করতেন—*পবিত্র* যুদ্ধ-এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো। আজকের দিনে ক্রুসেডকে ব্যাখ্যাতীত বলেই ধারণা করা হয়,

কিংবা যদি শুধু ধর্মপ্রচারের দিক থেকে দেখা হয়, তাহলে বলতে হয় অদ্ভুত। কেন শান্তি আর আত্মউৎসর্গের একটা মতাদর্শ, যা কিনা যিশু নিজেই প্রচার করেছিলেন, সেটা ধীরে ধীরে রক্তপিপাসু ধর্মীয় যুদ্ধাস্ত্রে পরিণত হলো, তা বোঝা মুশকিল। খ্রিষ্টানরা, যারা নিজেরাই দীর্ঘদিন ধরে রোমান সাম্রাজ্যের নৃশংসতা আর সহিংসতার শিকার হয়েছিলো, তারাই কালের আবর্তনে আরো ভয়াবহ নির্যাতনকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।'

অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

'কথাটা শুধরে নাও, বিদ্যুৎ। খ্রিষ্টান ধর্ম বা খ্রিষ্টানরা যুদ্ধ শুরু করেনি। অল্প কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোকই সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করেছিলো। পবিত্র যুদ্ধ সম্পর্কে সব যুগেই যাজক-পুরোহিতরা আগুনে ঘি ঢেলেছে। একটা সাধারণ সত্য মনে রাখবে, বিদ্যুৎ! যেকোনো অবতার, যে কিনা যুদ্ধের কথা বলে, সে আদতে ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত মানুষই না। তুমি যে ধর্মের কথাই বিবেচনা করো না কেন, সর্বশক্তিমানের আসল উপাসক তারাই, যারা শান্তি, ভালোবাসা আর সহাবস্থানের বাণী প্রচার করে গেছেন। তারাই আসল যাজক।'

মহান মঠাধীশের বিশ্বাস আর নীতি তার প্রপৌত্রকে তখনো অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে। এই মানুষটা আর তার পূর্বপুরুষরা যে কতগুলো যুদ্ধ করে এসেছেন, তা মনে না করে পারলো না বিদ্যুৎ। আর তবুও তিনি এখানে বসে ভালোবাসা আর ভ্রাতৃত্বই ঈশ্বরের কাছে একমাত্র পথ তা নিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে কথা বলে চলেছেন। শেষ দেবতা স্মৃতিচারণ করলেন যে কীভাবে মঠ আর তাদের নেতারা এই পবিত্র মঠকে রক্ষা করার জন্য কিংবা বিভাজন আর অত্যাচার থেকে প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধ করেছেন।

'এরপর কী হলো, বাবা? টেম্পলারদের ইতিহাসের পরের অধ্যায়টা কী ছিলো? আর নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের কী হলো?' দ্বারকা শাস্ত্রীর মনোযোগ মূল প্রসঙ্গে টেনে এনে জানতে চাইলো বিদ্যুৎ।

'তাহলে আমরা এখন বিশ্বাসীদের মধ্যে এমন নেতা পেলাম যে টেম্পলারদের তলোয়ারের শক্তিতে নিজে শক্তিশালী হলো। এরপর তাই এলো যেটা যেকোনো জঘন্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করে: অর্থ!' বললেন বৃদ্ধ গ্র্যান্ডমাস্টার।

'অর্থ?' বিস্মিত হলো বিদ্যুৎ।

দ্বারকা শাস্ত্রী হেসে কথা চালিয়ে গেলেন। 'তুমি কি বিশ্বাস করবে, যদি আমি তোমাকে বলি, অর্ডার অব দ্য সলোমনস টেম্পল বা নাইটস টেম্পলাররাই ছিলো বিশ্বের প্রথম মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকিং কর্পোরেশন?'

ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক, ২০১৭

‘এমনকি মৃত্যুও সাদা মুখোশের ভয়ে ভীত’

খুব অল্প যে কজন মানুষ নিউইয়র্কের আইকনিক ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলের প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুট বুক করতে পারে, তাদের মাঝে একজন এই মানুষটি। ফ্লোরের প্রায় সব রুমই তার জন্য বুক করা হয়েছিলো। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে ভারতীয় বিপ্লবী, ঐতিহাসিক–সব গুরুত্বপূর্ণ অতিথির সাদাকালো ছবি দিয়ে পুরো করিডর সাজানো। সেই করিডরের পুরোটা জুড়েই এখন তার গানম্যানদের ছায়া।

মাশ্চেরা বিয়ানকা তার অভিজাত স্যুটের জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। বাইরে ম্যানহাটন শহরের আলো ঝলমলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটে তার প্রিয় ভারতীয় সিগারেট।

পার্থক্য কেবল আজকের দিনটা সে উপভোগ করতে পারছে না।

‘সে দেখতে খুব পরোপকারি দেবদূতের মতো, তাই না? কিন্তু সে যে চেয়ারে বসেছে, ঠিক এই অবস্থান থেকেই গত প্রায় এক হাজার বছর ধরে মানব জাতির সবচেয়ে জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।’

রেগ মারিয়ানি তার স্কচে চুমুক দিচ্ছিলো তখন। আর ভাবছিলো, কেন মাশ্চেরা এই দলটার উপর এমন ক্ষোভ প্রকাশ করছে। যদি কেউ বিগ ম্যানের বাস্তবতা আসলেই জেনে থাকে, তাহলে সেটা সে নিজেই। সে একেবারে চাক্ষুস সাক্ষী। আর সত্যি বলতে, বর্তমান প্রধানের কিছু বাড়াবাড়ির সহযোগীও।

'তো এখন কী বলতে চাও, মাস্কেরা?' সে জানতে চায়। 'তুমি-জানো সে ব্যর্থতাকে হালকাভাব নেবে না। আমার ক্ষেত্রে অন্তত না। তোমার ক্ষেত্রেও না।'

মাস্কেরার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। জ্বলন্ত সিগারেট হাতের তালুতে দুমড়ে দিয়ে রেগের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঘুরলো। তামাকের আগুনে যখন তার হাতের চামড়া ঝলসে যাচ্ছে, তখন তার চেহারায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। মিলানের রাস্তায় খুন হওয়া এক পতিতার পরিত্যক্ত সন্তান থেকে ইউরোপিয়ান মাফিয়া হওয়ার পথে জীবনে সে যা কিছু সয়ে এসেছে, তার তুলনায় এই পোড়া নিতান্তই ছেলেখেলা।

* * * * *

মানুষটাকে সে লম্বা স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে সতেরোবার আঘাত করেছিলো। প্রথম দশটা ছিলো পাকস্থলী আর ডায়াফ্রাম বরাবর। আর বাকি সাতটা ছিলো চোখ-খুলির মাঝবরাবর আর দুই উরুর মাঝে। নালায় ফেলে দেওয়ার আগে আঘাতে বিকৃত দেহের উপর থুতু ফেলেছিলো সে।

বয়স যখন তার মাত্র এগারো, তখনই মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে ফেলে সে।

বয়স কেবল ষোলো, এই বয়সেই নিরীহ দর্শন আর অনেকটা মেয়েলি স্বভাবের এই কিশোর তার পছন্দের কুখ্যাত অস্ত্রের সাহায্যে মিলানের বেশ কিছু অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব শুরু করে। যদিও সে সবচেয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখেও একাকী লড়াই করতেই পছন্দ করতো, তবে এই নির্বোধ বীরত্বই তাকে বেশ কিছু অনুসারী জুটিয়ে দিয়েছিলো। তার দল ভারী হলো। নামটাও হয়ে উঠলো আরো বেশি ভয়ংকর।

তারপর এক শীতের রাতে পুরো মিলান শহরকে অবিশ্বাস আর চমকে দিয়ে দুই পুলিশ সদস্যকে তাদের নিজেদের বিট-কারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাদের মাঝে একজনের মুখে লম্বা একটি স্ক্রু-ড্রাইভার ঢুকিয়ে খুলির পেছনে বের করে আনা হয়েছিলো। তাকে ওভাবেই গাড়ির সিটের হেডরেস্টে বিঁধে রাখা হয়েছিলো। এই দুর্ধর্ষ জোড়া খুনের ঘটনা পুরো শহর আর প্রশাসনের মাঝে ভয় ধরিয়ে দেয়।

সবুজ চোখের ছেলেটাকে মিলান শহর ছাড়তে হয়েছিলো। তবে এর আগেই তার উপর নজর পড়ে ঐশ্বর্য, রক্তপাত আর শাসকদের ছায়া পৃথিবীর একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের।

তার উপর নজর রাখছিলো কোসা-নস্ত্রা-সিসিলিয়ান মাফিয়ার সবচেয়ে ভয়ংকর সিন্ডিকেট।

তিনজন মাফিওসি ভাই তাকে ভাড়া করেছিলো, নিজেদের কোকেইন নেটওয়ার্ক জেনেভার বাইরে পরিচালনা করার জন্য। ওরা খুব বড় রকমের ভুল করে ফেলেছিলো। পনেরো বছরের মাঝে সেই সবুজ চোখের ছেলেটি কিশোর থেকে পরিণত মানুষ হয়ে উঠেছিলো, হয়ে উঠেছিলো খুব বিপজ্জনক একজন মানুষ। পরিকল্পতভাবেই সে তিন নিয়োগকারীকে সরিয়ে দেয়। লেক জেনেভার গভীর তলদেশ থেকে যাদের মৃতদেহ আর কখনোই খুঁজে পাওয়া যায়নি। ৩৫ বছর বয়সের মধ্যেই সে কেবল সিসিলিয়ান মাফিয়ারই অবিসংবাদিত নেতা হয়নি, বরং পুরো ইউরোপ জুড়ে সংগঠিত সব অপরাধেরই মূল হোতা হয়ে ওঠে।

যদিও কেউ তার আগ্রাসী প্রতিভা নিয়ে কোনো প্রকার সংশয় প্রকাশ করেনি, তবে তার এই দর্শনীয় আর দানবীয় উত্থান নিয়ে কানাঘুষা ছিলো। খুব শক্তিশালী কেউ ছায়ার আড়াল থেকে তাকে সাহায্য করছিলো। সরকার ব্যবস্থার চেয়েও শক্তিশালী কেউ, সিআইএ কিংবা এমআই ৬-এর মিলিত শক্তির চেয়েও যে ভয়ংকর। একইভাবে, কীভাবে আর কেন তার নাম মাশ্চেরা বিয়ানকা বা সাদা মুখোশ হলো, তা নিয়েও আছে অজস্র কিংবদন্তির মতো গল্প আছে। কেউ কেউ তার এই অদ্ভুত আর ভয়ংকর নামের জন্য কোকেন ব্যবসার রংকে ইঙ্গিত করে। অন্য অনেকের দাবি, সে যখন কোনো প্রকার অনুতাপ ছাড়াই একের পর এক প্রতিপক্ষকে খুন করে, সে সময়ের শান্ত-ফ্যাকাশে মুখের জন্যই তার এই নাম।

কেবল অল্প কয়েকজনই এর চেয়ে বড় পাপের কথা অনুমান করতে পেরেছে। সে আসলেই একটা মুখোশ পরে, যার উদ্দেশ্য এমন একজনকে লুকিয়ে রাখা, যে সারা বিশ্বে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। সে ছিলো ইতিহাসের সবচেয়ে কালো সংগঠনের সাদা মুখোশ।

* * * * *

রেগের কাছে হেঁটে যাওয়ার সময় মাচেরা বিয়ানকার সবুজ চোখজোড়া নির্ভয়ে জ্বলজ্বল করছিলো। একটা দামি সোফায় বসে পড়লো সে।

'তুমি জানো, রেগ, কতবার আমি আততায়ী হামলার মুখে পড়েছি?'

রেগ মাথা নাড়লো। যে রাজ্যে মাচেরা তার অবৈধ সাম্রাজ্য চালিয়েছে তা সে জানে। বন্দুকের নলের মাধ্যমেই সে শাসন করছিলো।

'একশত চার বার,' কোমল স্বরে কথা চালিয়ে গেল মাচেরা, তার মুখে চিরচেনা আত্মপ্রত্যয়ী হাসিটা ফিরে এসেছে। কিন্তু তার চোখ দিয়ে রেগের ভেতরটা দেখছিলো, যে নিজেও খুন কিংবা সহিংসতার সাথে অপরিচিত ছিলো না।

'তুমি জানো, কতবার আমাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, বুলেটের আঘাত পেয়েছি বা মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়ে ফিরে এসেছি?'

'আমরা এসব নিয়ে কেন কথা বলছি, মাচেরা?' বললো রেগ। মাচেরা তাকে নার্ভাস করে ফেলছে এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু রেগ মারিয়ানি বহু আগেই দুশ্চিন্তা জয় করতে শিখে নিয়েছে।

'সাতান্ন বার,' শান্তভাবে বললো মাচেরা। 'তাই ভেবো না, পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি আছে যা আমাকে ভয় দেখাতে পারে।'

দুই এক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে সে সামনে ঝুঁকে এসে আবার কথা বললো, এবার হুমকি দেওয়ার মতো ফিসফিস স্বরে। 'এমনকি মৃত্যুও সাদা মুখোশকে ভয় পায়, রেগ।'

হরপ্পা, খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

নীল আগুনের পূজা

বিভাষণ পূজারি সপ্তর্ষিদের মুখ আর শরীরে এক ভয়-ধরানো পরিবর্তন দেখতে পেলেন। হঠাৎ করেই তাদেরকে অনেক বেশি বয়স্ক লাগছে, যা আগে কখনোই দেখা যায়নি। সুরার জঘন্য আর রক্তপিপাসু বর্বর সেনারা যতই ঐশ্বরিক ঋষিদের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই সাতজনের বয়স ঠিক ততই অস্বাভাবিক গতিতে বেড়ে যাচ্ছে। তাদের কপাল আর গালের চামড়ায় ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। তাদের শান্ত, স্বাভাবিক আর নির্মল মুখটা এক অদ্ভুত অভিব্যক্তিতে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। প্রায় একই সাথে ধূসর হয়ে আসছে তাদের চুল। সাতজন ঋষিকে এখন দেখলে মনে হয় তাদের বয়স ১০০ বছর!

আসলেই কি এমন হচ্ছে, নাকি আমারই চোখের ভুল?

নিজের ভেতরে নৃশংসতা আর প্রচুর সাহস থাকার পরেও ঋষিদের মাঝে এমন ভয়ানক পরিবর্তন দেখে সুরার নিজের শরীর ঠান্ডা হয়ে ঘাম বেরিয়ে এলো।

তার বর্বর সৈন্যরাও সপ্তর্ষিদের ভাঁজ-পড়া মাংস খেয়াল করেছে, আর সেজন্যই থেমে গেছে ওরা। প্রচণ্ড তার রাজার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। তিনি কি হামলা বন্ধ করতে চান?

সুরার মনে হলো তার গলার কাছে কিছু একটা যেন আটকে আছে। ভয় কী সেটা সে বহু আগেই ভুলে গেছে। এক মুহূর্তের মাঝেই সে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে নতুন উদ্যমে পাগলাটে এক চিৎকার করে আদেশ দিলো। তার চেনা পৃথিবীর পুরো অংশের শাসক হওয়ার অদম্য বাসনা এখন খুব কাছে এসে তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। কোনো কিছুই এখন আর তার পথে আসতে পারবে না। কোনো কিছুই না!

'কীসে তোমাদের থামিয়ে দিলো, হে বীর অসুররা? এসব মায়াবীদের জ্বালিয়ে দাও, আর তোমাদের সম্রাট সুরাকে সন্তুষ্ট করো!'

নিজেদের রাক্ষস রাজার আক্রমণাত্মক এই আদেশে সুরার সেনারা ভয়কে গ্রাস করে আবার ঋষিদের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে।

কাঠে ধরানো এক বিশাল আগুন তৈরি করা হয়েছে। যেখানে খুব সহজেই সপ্তর্ষিদের পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হবে।

অন্যভাবে বললে, এমনটাই এই বোকারা বিশ্বাস করেছিলো।

* * * * *

'এই পাগলামি বন্ধ করো, সুরা!' অনুরোধ জানালেন বিভাষণ পূজারি। 'কিছু একটা ঠিক নেই এখানে। ওরা সপ্তর্ষি না। আমি তাদের পবিত্র উপস্থিতি আর অনুভব করতে পারছি না। ঐশ্বরিক ঐ সাতজনকে এরই মাঝে সমাধিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর তাদের আত্মা অন্য কোনো স্থানে বদলি করে ফেলা হয়েছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো না, তাদের শরীর ক্রমেই নষ্ট হয়ে আসছে আর পৃথিবীর মাটির সাথে শেষবারের মতো মিশে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে? পবিত্র সাতজনের আত্মার উপস্থিতি ছাড়া এসব নশ্বর দেহ খালি কলসির চেয়ে বেশি কিছু না।'

'হাআআআআহ!' তলোয়ার দিয়ে কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে চিৎকার করলো সুরা। 'ওরা প্রত্যেকেই আমার ঠিক সামনেই আছে! আর আমি যে অঞ্চল শাসন করতে যাচ্ছি, সেখান থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করছি না। সুরার ক্রোধের এই আগুনে তাদের অবশ্যই জীবন্ত পুড়ে মরতে হবে!'

প্রচণ্ডের সম্মুখ সারির কমান্ডার এক ঋষির চুলের দিকে হাত বাড়ালো। যেই মাত্র না সে ক্ষয়ে আসতে থাকা ঋষির চুলের মুঠি হাতে ধরলো, দূরে কীসের যেন ধসে পড়ার শব্দ হলো। একটা দমকা ঠান্ডা বাতাস পুরো জায়গায় বয়ে গেল, আর তাতে অসুরের পুরো দলটাই প্রায় জমে গেল।

উপস্থিত সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়ে সাত ঋষির প্রত্যেকেই একই সাথে চোখ খুললো। কিন্তু তাদের চোখের পাতার নিচে যা আছে, তা আদতে মানুষের চোখ না। ওখানে কেবলই উজ্জ্বল সাদা পাথর। হয় এসব ঋষির চোখের মণি তাদের মাথার ভেতরেই উলটে গেছে, অথবা হাজার বছরের পুরোনো এই সাত ঋষির মুখ থেকে এখন ভয়াবহ কোনো প্রাণঘাতী শক্তি ঠিকরে আসছে।

সুরার সেনারা যেন পাথরের মূর্তি। কারোই আর কোনো প্রকার নড়াচড়া করার শক্তি নেই। রাতের এই অন্ধকারের মাঝে কেবল সপ্তর্ষিদের কুঁকড়ে আসা

দেহগুলোকেই দেখা যাচ্ছে। দেখে এখন মনে হচ্ছে তাদের বয়স পাঁচ হাজার বছর। মাংসগুলো কুঁচকে আলগা হয়ে এসেছে, চামড়ায় অজস্র ভাঁজ, কিন্তু চোখগুলো কাফনের কাপড়ের মতোই সাদা।

সেনাপতি প্রচণ্ডের নির্দেশে সেই দলপ্রধান তার সমস্ত সাহস এক করে প্রথম ঋষিকে বিশালাকার আগুনের দিকে টেনে নিয়ে গেল। ঋষির চুল ধরে টেনে লাথি দিয়ে ফেলে দিলো জ্বলন্ত আগুনের মাঝে। যেইমাত্র সেই ধ্যানীর গায়ে আগুনের শিখা স্পর্শ করলো, সাথে সাথেই এমন কিছু ঘটলো, যা কেউ ঘটবে বলে অনুমানই করতে পারেনি।

নির্মম সেই হলুদ আগুন দর্শনীয়, উজ্জ্বল নীল আলোয় বদলে গেল। আগুনে নিক্ষিপ্ত ঋষিকে প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে।

দূরের সেই গর্জন এখন মনে হলো অনেক কাছে চলে এসেছে।

'সাআআআবধাআআন...হে হরপ্পার দেবতাআআআ...' দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা সেই নীল আগুনের মাঝ থেকেই ভূতুড়ে কণ্ঠে এক ভবিষ্যদ্বাণী ভেসে এলো। কিন্তু কথাগুলো এমনভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো, যেন পাহাড়গুলো বিষাদ আর হতাশা নিয়ে বলছে সেসব।

* * * * *

'সাবধান, বিভাষণ পূজারি...সাবধান, যার ধার্মিক আত্মা ঘৃণা আর প্রতিশোধের গভীর খাদে নিজের পথ হারিয়েছে। সাবধাআআন...'

হরপ্পার দেবতা বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সপ্তর্ষিদের মাঝে প্রথম ঋষির শেষ কথাগুলো শুনে আর তার অস্পষ্ট অবয়ব ছাই হয়ে যেতে দেখে প্রচণ্ড দুঃখে অসাড় হয়ে পড়েছেন তিনি।

তিনি প্রতিক্রিয়া জানানোর আগেই রেজিমেন্ট-কমান্ডার পরের ঋষিদের লাথি মেরে সেই নীল আগুনে ফেলে দিলো।

'বিভাষঅঅঅঅণ...! হে হতভাগা দেবতা, আমি তোমার জন্য কান্না করেছিলাম। দেখো, তুমি কেমন হয়ে উঠেছ! আমরা জ্বলছি আর তুমি নির্বিকার বসে আছো। তবে তাই হোক...তোমার বিপর্যস্ত ভাগ্য তোমার অপেক্ষায় রয়েছে...'

এমন ভয়ংকর কথার সাথে সাথেই দ্বিতীয় ঋষির শুকনো, চেনার অযোগ্য দেহটা নীল আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এক মুহূর্তের ব্যবধানে আকাশ চিরে যেন ঝড় শুরু হলো। সমস্ত আর্যাবর্তে শুরু হলো কানে তালা লাগানো ভয়ংকর বজ্রপাত। যেন মা সরস্বতী তার স্নেহের পুত্রদের হত্যা করায় প্রতিবাদ আর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বিলাপ করছেন।

রক্তের নদী এখন পুরো হরপ্পা আর সমগ্র মানব জাতির উপর সবচেয়ে নৃশংস অভিশাপ বইয়ে দিতে প্রস্তুত।

বিভাষণ পূজারি প্রচণ্ডের সেনাপ্রধানের বর্মটায় টান মেরে দশাসই সেই কমান্ডারকে পাথুরে মাটিতে ফেলে দিলেন। তিনি এই নৃশংস বর্বরতা আর চলতে দিতে পারেন না।

'হে রাক্ষসরাজ! এই ভয়ংকর রক্তের খেলা এবার বন্ধ করো!' চিৎকার করে উঠলেন দেবতা।

'আমার পথ ছেড়ে দাও, অ-দেবতা,' জবাব দিলো সুরা। উজ্জ্বল নীল আলোর কারণে তার চোখ থেকে অদ্ভুত আভা দেখা যাচ্ছে। বর্বরতা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে। কাছাকাছি উঁচু পাহাড় থেকে ভেসে আসা গর্জন, অলৌকিক ঠান্ডা বাতাস, অতিপ্রাকৃতিক আকাশ কিংবা যন্ত্রণাদায়ক বজ্রপাত...কোনো কিছুই অসুরদের অধম রাজাকে আটকে রাখতে পারেনি। এটাই তার মোক্ষম সুযোগ, আর সে তার দিকে যা কিছু ধেয়ে আসা উচিত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত–এমনকি স্বর্গের বিরুদ্ধেও।

বিভাষণ আর কিছু বলে ওঠার আগেই বুঝতে পারলেন, প্রচণ্ড তার কাঁধে হাত রেখেছে।

'আপনি আমাদের কথা দিয়েছিলেন, হে মহান অ-দেবতা,' বললো প্রচণ্ড। 'আপনি কথা দিয়েছিলেন!'

এতক্ষণে সেই কমান্ডার উঠে দাঁড়িয়ে দুজন ঋষিকে আগুনের দিকে টেনে নিয়ে এসেছে। বাকি সপ্তর্ষিরা এখন এতই কুঁজো আর এতটাই বুড়িয়ে গেছেন, তাদের দুজনের ওজন সদ্য-জন্মানো বাচ্চাদের চেয়ে বেশি হবে না। উন্মাদের মতো হাসতে হাসতেই সেই দলপ্রধান ঋষি দুজনের পবিত্র ঘাড় ধরে উপরে তুললো। এরপর খুব সহজেই ছুঁড়ে দিলো অস্বাভাবিক নীল আগুনের শিখার দিকে।

জ্বলন্ত আগুনের শিখা এখন আরো উঁচুতে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। যেন দ্রুত বাড়তে থাকা এক নীল দানব, যে তার আশপাশের সবকিছুই গ্রাস করে নিতে প্রস্তুত। অদৃশ্য জিনের ঠান্ডা নিঃশ্বাসের মতো প্রবল শিলাবৃষ্টি সাত ঋষির বাসস্থানের উপর বয়ে যেতে শুরু করলো। রাক্ষস রাজা আর পতিত

দেবতাসহ সবাই বাধ্য হলো নিজেদের চোখ ঢেকে রাখতে। বিভাষণ পূজারি বুঝতে পারছিলেন, এই অস্বাভাবিক বজ্রপাত মূলত সরস্বতীর গভীর কান্নারই ফলাফল। একটানা বইতে থাকা প্রচণ্ড বাতাসের কারণে এসব দুর্বল মানব জাতির নিজেদের দুই পায়ে দাঁড়িয়ে থাকাই কঠিন হয়ে আসছিলো। বাহু আর কনুই দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছেন হরপ্পার সূর্য। জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকাতে হিমশিম খাচ্ছেন তিনি।

নীল আগুনের ঠিক মাঝে থাকা দুই ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে আর কোনো যন্ত্রণার সাড়াশব্দ আসেনি। পাপ এবং মন্দের প্রবাদতুল্য পাত্র এখন পরিপূর্ণ, আর তাতে পাপ উপচে পড়ছে।

সময় হয়ে এসেছে।

সময় হয়ে এসেছে সেই অভিশাপের যা মানব জাতির ভাগ্যকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে দেবে।

সময় হয়ে এসেছে।

সমগ্র সৃষ্টির উপর প্রলয় আসছে।

বানারস, ২০১৭

বিদ্যুৎ

মঠের বাইরের বিস্তীর্ণ লনে হেঁটে বেড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদ্যুৎ। সকালের ঠান্ডা বাতাসে মিশে আছে মেরিগোল্ড ফুলের পবিত্র গন্ধ, পূজার ধূপকাঠি, পবিত্র শ্লোক পড়ার শব্দ, আর দূরের মন্দির থেকে ভেসে আসা সুরের মতো ঘণ্টাধ্বনি। সবকিছু মিলিয়ে দেব-রাক্ষস মঠে এই ছোট হাঁটার সময়টা দারুণ অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে। তাকে বারবারই থামতে হচ্ছিলো। কখনো মঠের বয়স্কদের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিতে, বৃদ্ধ আয়াদের চুমু দিতে, কখনো বা কমবয়সি মেয়েদের লাজুক হাসি কিংবা টেনিস বল দিয়ে ছেলেদের সাথে ক্রিকেট খেলায় বল করার জন্যে। বিদ্যুতের মনে হলো তার অসীম প্রাণবায়ু বা জীবনীশক্তি এই মঠের প্রতিটি পাথরের মাঝে মিশে আছে।

এত দিনে এটা সবার জানা হয়ে গেছে যে সে ধূমপান করে। একমাত্র তারই জনসম্মুখে ধূমপান করার অনুমতি আছে। তার পরনে সাধারণ একটা কালো রঙের স্লিভলেস জামা আর ধূসর ট্র্যাক প্যান্ট। এমন ছিমছাম পোশাকেও তাকে বেশ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিলো। তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ত্বকের কারণে পেটানো শরীর আর বাদামি রঙের চোখগুলো দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। বাতাসের কারণে খানিক পরপরই তার বাদামি চুল মুখের উপর এসে পড়ছে। ডান হাতের সবকটা আঙুল দিয়ে সেটা সরিয়ে দিচ্ছে বারবার।

বিদ্যুৎ কি বাড়াবাড়ি রকমের নিখুঁত? সম্ভবত, নাকি তার খুঁত আছে? হয়তো আছে। তবে সেগুলো খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন আর দেবতার সাথে অল্প কয়েক মুহূর্তের বেশি সেসব স্থায়ী হয়নি।

বিদ্যুৎ সব সময় তার চারপাশের মানুষের কাছ থেকে চরম মানসিক এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়া পেয়ে এসেছে। যারা তাকে বুঝতে পেরেছে, ভালোবেসেছে। আর মন থেকেই ভালোবাসতো, কোনো সংশয় ছাড়াই। এমনকি যারা তাকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতো না, সেসব মানুষও তার ঈশ্বরপ্রদত্ত সৎ প্রতিভা আর বালকসুলভ মাধুর্যের প্রশংসা করতো। সে মন্দ আচরণ পেয়েছে কেবল তাদের কাছ থেকেই, যারা তাকে দূর থেকে দেখেছে। এর কারণ এই নয় যে বিদ্যুৎ তাদের ক্ষতি করেছে। সে তাদের নিয়ে ভাবতে ভাবতে নিজেকেই অনেকখানি গ্রাস করে ফেলেছিলো। কিন্তু মাঝে মাঝে তারা তাকে অপছন্দ করতো কারণ সে দৃশ্যতই ওদের চেয়ে আলাদা ছিলো। সে অন্ধ অনুকরণ করেনি। তাকে আদর্শ কোনো ছাঁচ কেটে তৈরি করা হয়নি। সে অসাধারণ প্রতিভাবান, অতিরিক্ত রকমের স্বাধীনচেতা। সে নিপাট ভদ্রলোক, কিন্তু এমন মানুষ না যে অন্যায় দেখে পিছিয়ে যাবে। সে ধনী আর আত্মনির্ভরশীল, কিন্তু পকেটে একশো রুপি নিয়ে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের মতো আচরণ করে। পাম্পিং আয়রনের পেছনে সে যতটা সময় দিয়েছিলো, ঠিক ততটাই সময় দিয়েছিলো কর্ণাটক সংগীতের পেছনে। তবে যেটা তার অল্প কজন নিন্দুকের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিলো তা হলো, এমন দুর্দান্ত চেহারা, তার সাফল্য, ধনসম্পদ, প্রতিভা আর সৎ গুণের বাইরে সে নম্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলো। যেটা অধিকাংশ মানুষই মেনে নিতে পারেনি।

বিদ্যুতের মাঝেও কিছু ত্রুটি ছিলো। এটা কি অস্বাভাবিক যে সে একদিকে ধূমপান উপভোগ করে আর অন্য দিকে অ্যাথলেট বা মার্শাল আর্টিস্টদের ছাড়িয়ে যেতে পারে? মাঝে মাঝে তার রাগ ওঠে। এটা কি ভুল? নাকি অন্যায়? সবই কি শেষ দেবতার জন্য ভুল ছিলো?

এর সবই কি এমন কারো জন্য ভুল ছিলো যে আসলে অর্ধেক মানুষ?

* * * * *

শেষ কয়েকবার তামাক নেওয়ার কারণে গলার খুসখুসে ভাব কমাতে মাটির পাত্র বা পূর্বায় ভরতি মশলা চায়ে চুমুক দিচ্ছে সে। তখনই তার কানে এলো পায়েলের ছন্দময় শব্দ, সেই সাথে অভিজ্ঞ তবলাবাদকের তবলার ধ্বনি আর চমৎকার পুরুষ কণ্ঠের শাস্ত্রীয় সংগীত। নিজে একজন গিটারিস্ট আর প্রশিক্ষিত কণ্ঠশিল্পী হওয়ার সুবাদে বিদ্যুতের এই সুন্দর নোটগুলো শুনতে দারুণ লাগছিলো। সে সিদ্ধান্ত নিলো, এই চমৎকার সুরটা সে অনুসরণ করে যাবে।

ও জানতো এটা কীসের শব্দ। কেবল জানতো না, কে ছিলো।

সিগারেটের শেষ মাথাটা ডাস্টবিনে ফেলে কয়েকটা সিঁড়ি ভাঙতেই মার্বেল পাথরে বানানো উঁচু করিডরে এসে থামলো সে। মনে হলো, ওখানেই একটা আধ-খোলা দরজা দিয়ে এই দারুণ গানের শব্দটা ভেসে আসছে। নিঃশব্দে দরজার দিকে হেঁটে গেল সে, যেন ভেতরে শিল্পীদের কোনো অসুবিধা না হয়। সামনে গিয়ে উঁকি দিলো দরজার ভেতরে।

যা দেখলো তাতে ওর দম বন্ধ হয়ে এলো প্রায়।

উত্তর ভারতের ঐতিহ্যবাহী চুড়িদার আর কুর্তা পরে আছে ন্যায়না। সবটাই সাদা রঙের। তবলার তাল আর রুপালি চুলের বৃদ্ধ ওস্তাদের মন্ত্রমুগ্ধ রাগের সাথে তাল মিলিয়ে দারুণ ভঙ্গিতে নাচছে সে। বিদ্যুৎ সাথে সাথেই বুঝে ফেললো এই অসাধারণ নাচটা কী ছিলো।

কত্থক!

কত্থক শব্দটার আদি উৎপত্তি পাওয়া যায় বৈদিক সংস্কৃত শব্দ কথা বা গল্প থেকে। ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বের আগে আর পবিত্র মহাভারতে উল্লিখিত এই কত্থক ভারতে নাচের একটি ঐতিহ্যবাহী ধরণ বলে বিবেচ্য। এর জনপ্রিয়তার কৃতিত্ব আর্যাবর্তের প্রাচীন কবিদের, যারা বহু দূরদূরান্তে ভ্রমণ করেছে আর নিজেদের মহাকাব্যে এই সুন্দর শিল্পের বর্ণনা দিয়েছে। কত্থক বিশেষ করে অনন্য হয়ে ওঠে ভক্তি আচরণের সময়, যেখানে এটি ভগবান কৃষ্ণের গল্প বর্ণনার এক দর্শনীয় নাট্যরূপ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। কত্থকের বানারস ঘরানা এই গৌরবময় সাংস্কৃতিক রত্নভান্ডারের শীর্ষে অবস্থান করছে।

ন্যায়নার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না সে। অঙ্গভঙ্গিতে মনে হয় সে একজন দেবী, নাচের প্রতি পদক্ষেপের সাথে চারদিকে নিজের সৌন্দর্য আর অসীম রাজকীয়তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিদ্যুৎ খেয়াল করলো, নাচের সময় তার উজ্জ্বল কপালে একবিন্দু ঘাম জমেছে আর কয়েকটা চুল সুন্দর মুখটার উপর নেমে এসেছে। ভারতের ঐতিহ্যবাহী গানের সাথে সম্মোহনী নাচ করছে সে। কঠিন এই নাচও তার মুখ থেকে হাসি কেড়ে নিতে পারেনি। চোখদুটো যেন ঠিক ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করছে।

এটা কি ভুল হবে, যদি দেবতা একবারের জন্য নিষিদ্ধ ভালোবাসার কাছে আত্মসমর্পণ করে?

সে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

* * * * *

'ভিডিও!'

বিদ্যুৎ থামলো।

ত্রিজাত কাপালিকের ঐ দুর্ভাগ্যজনক আগমনের পর এই প্রথম তাকে এই অর্থহীন কিন্তু প্রিয় নামে ডাকা হয়েছে। ভিডিও! তার খুব কাছের বন্ধু ছাড়া, বিশেষ করে বালা ছাড়া কেউ তাকে কখনোই এই নামে ডাকেনি। নামটা শুনে বিদ্যুৎ বিরক্ত হলো।

পেছনে ঘুরলো সে। দেখতে পেল, কয়েক পা পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে ন্যায়না। তখনো হাঁফাচ্ছে সে। কয়েক সেকেন্ড আগের তীব্র পারফরম্যান্সের কারণে এখনো শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। বিদ্যুতের মনে হলো, সে এই অতুলনীয় সৌন্দর্যের তীব্রতায় ভেঙে পড়বে। তবে শারীরিক সৌন্দর্যের চেয়েও মূলত ন্যায়নার নিঃস্বার্থ যত্নের কাছেই হেরে গেছিলো বিদ্যুৎ। তার আশা ছিলো, তার ক্ষমা চাওয়ার আগে অনেকগুলো দিন পর্যন্ত ন্যায়না একেবারেই চুপচাপ থাকবে। বিদ্যুৎ তার সাথে ভয়ানক, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে। কিন্তু তবুও সে ওর পাশেই ছিলো–তার মুখভঙ্গি বুঝে নিতে, তার আত্মাকে শান্ত করতে। একদিকে যুদ্ধের সময় তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো দেবী কালীর প্রতিরূপ। কিন্তু যখন সে স্নিগ্ধ রূপে থাকে, বিদ্যুতের কাছে সে ছিলো অন্য যে-কারো চেয়ে অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত।

চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলো সে। এসব কিছুই তার জন্য অনেক বেশি ছিলো। একদিকে এসব তার ভালো লাগছিলো; কারণ ন্যায়না নিজের কঠোর সাধনার অনুশীলন ছেড়ে তার সাথেই দেখা করার জন্য ছুটে এসেছে। অন্য দিকে তাকে ভিডিও নামে ডাকার কারণে ঘৃণাও হচ্ছে। ঐ নাম তার জন্য মৃত। যে মানুষটা তাকে এই নামে ডাকতো সেও মারা গেছে। সেই যুবক, নিশ্চিন্ত ভিডিও যা কিছু পরোয়া করতো, তার সবটাই সেদিন মঠের বন্দিশালার ইস্পাতের টেবিলে রক্তাক্ত অবস্থায় রেখে এসেছিলো। যখন থেকে বিদ্যুৎ বানারসে পা রেখেছে, তখন থেকেই জীবন চিরতরে বদলে গেছে।

'দাঁড়াও, বিদ্যুৎ!' চিৎকার করলো ন্যায়না।

বিদ্যুৎ থামলো। সে জানতো, ন্যায়নার মুখোমুখি হওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। তার চেয়ে বড় কথা, সে জানতো, কত্থক নাচের এই অপ্সরার প্রতি তার অবর্ণনীয় চাওয়া বর্ণনা করার সময় এসেছে, যা হয়তো আরো আগেই বলা উচিত ছিলো।

* * * * *

তুলসি ঘাটের দিকে যাওয়ার পথে বিদ্যুতের কোমর আর বাহু নিজের কোমল আঙুল দিয়ে জড়িয়ে ধরলো ন্যায়না। ততক্ষণে সকাল হয়ে এসেছে আর বানারসে কোনো নারী উন্মুক্ত স্থানে একজন পুরুষের হাত ধরে থাকবে এটা মোটেও স্বাভাবিক দৃশ্য না। কিন্তু ন্যায়না গতানুগতিক ধারার কেউ না। আর বিদ্যুৎ কেবল সাধারণ পুরুষ না।

নিজের কোমরে ন্যায়নার উজ্জ্বল ত্বকের স্পর্শ অনুভব করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না বিদ্যুতের। সে একটানা হাসিঠাট্টা করেই যাচ্ছে, যেমনটা বেশিরভাগ শক্ত ধাঁচের মেয়েই করে, বিশেষত যখন তারা মনে করে তারা নিজেদের নিরাপদ স্থানে রয়েছে। তার হাসি ঘণ্টার মতো শোনাচ্ছে। চোখের দীপ্তি ছিলো একেবারেই স্পষ্ট। অবশ্য, সেটা কেবল তখনই দেখা যায়, যখন বিদ্যুৎ ঘুরে তার দিকে তাকানোর সাহস করছে।

কিছুটা মাথা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো ন্যায়না, 'এত দিন তুমি কোথায় ছিলে, বিদ্যুৎ?'

তার চোখ এখন দেবতার দিকে তাকিয়ে। এমনভাবে কথাটা বললো যে দেবতা তারই অধীনে।

কিন্তু কেউ কি কখনো দেবতাকে ধরে রাখতে পারে?

কেবল যিনি তাকে পাঠিয়েছেন, সে ব্যতীত।

* * * * *

'আমি দুঃখিত, ন্যায়না...' আচমকা কথাটা বললো বিদ্যুৎ।

তাকে দেখে মনেই হয়নি বিদ্যুৎ কী বললো তা খেয়াল করেছে। ঘাটের রৌদ্রোজ্জ্বল সিঁড়িতে হাঁটতে হাঁটতে নিজের হাসিখুশি মনে কথা চালিয়ে গেল ন্যায়না।

'আরে, আমি দুঃখিত, ন্যায়না। সত্যিই। আমি যেভাবে তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম, তখন বোকামি করেছিলাম। আমি এর জন্য নিজেই নিজের উপর বিরক্ত!'

এবার থামলো সে। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেবতার দিকে ঘুরলো। ভ্রু উপরে তুললো, যেন সে তার নিজের মানুষটির কাছে একান্ত ব্যক্তিগত অভ্যাসটা মনে করিয়ে দিতে চায়। যা ছিলো তার একান্ত অধিকার।

তাতে সফল হয়েছে সে।

'আমি দুঃখিত, ন্যায়নু...'

হরপ্পার পূর্বে, খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
ঋণ

বজ্রপাতের শব্দে জেগে উঠলো মানু। যতই সময় যাচ্ছে, পরিস্থিতি আরো বেশি খারাপ হচ্ছে। গত রাতে কালো মন্দির থেকে নেমে আসার পরই সে সিদ্ধান্ত নেয়, রাতটা কালো আলখাল্লা-পরা এসব সৈনিকদের সাথে কাটাবে, যেন সে তাদেরই একজন। ওদের মতোই মানুও মাটিতেই তার খড়ের বিছানা পেতেছিলো।

বিবর্ণ বিছানা ছেড়ে উঠে যেতেই সে লক্ষ করলো, তার বাদবাকি সঙ্গীরাও উঠে গেছে। এই গগনবিদারী শব্দের মাঝে কেউই ঘুমিয়ে থাকতে পারেনি। এতক্ষণে সূর্যের উঠে যাওয়ার কথা, এটা বুঝতেই বেশ কিছুটা সময় লাগলো সবার। কিন্তু তাদের চারপাশে এখন ভয়ংকর অন্ধকার এক রাত।

প্রলয়ের লক্ষণ আসন্ন। ঘন কালো মেঘ সকালের সূর্যকে পুরোপুরি গ্রাস করে নিয়েছে।

আর্যাবর্ত তার বাকি অল্প দিনগুলো পুরোপুরি অন্ধকারের মাঝে কাটাতে যাচ্ছে।

* * * * *

দলের আনুমানিক একশো সদস্যকে নিয়ে পথ চলছে মৎস্য। দূর থেকে তাকে এগিয়ে আসতে দেখলো মানু। মুষলধারে বৃষ্টির কারণে ঝাপসা দৃষ্টি এখন সয়ে আসতে শুরু করেছে। এর মাঝেই মানু অদ্ভুত কিছু একটা লক্ষ করলো। মৎস্য আর তার পুরো দল একই ভঙ্গিতে, একই গতিতে চলছে। আর এমনভাবে চলছে যেন তারা সবাই মিলে একটা জীব। দেখে মনে হচ্ছিলো তারা নির্ভীক, অজেয়। তাদের মাঝে কেউ কেউ বিদেশি ধাতুতে বানানো বিশাল আকারের গোল ঢাল বহন করছে। বজ্রপাতের আলো প্রতিফলিত হওয়ার সময় ঢালগুলো ড্রাগনের চোখের মতোই জ্বলজ্বল করছে। পুরো দলের সবার সামনে আছে মৎস্য, খানিক পরপর রাতের আকাশে ক্ষণিকের জন্য জ্বলে ওঠা ভয়ংকর নীল বজ্রপাতের আলোতেই কেবল তাকে দেখা যাচ্ছে।

কাছাকাছি আসার পর মৎস্য আর তার দলের সবাই একই ছন্দে ঘোড়া থেকে নেমে এলো। ডান পা ঘোড়ার মাথার অনেকটা উপর দিয়ে ঘুরিয়ে জিন থেকে নিখুঁতভাবে নেমে এলো।

সময়ের সাথে এমন তাল মেলাবার ক্ষমতা অর্জন করতে নিশ্চয়ই তাদের বছরের পর বছর প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে।

'প্রণাম মৎস্য,' স্বাগত জানালো মানু।

'প্রণাম, হে রাজা,' ভেজা চুলগুলো সুন্দর মুখটা থেকে সরিয়ে দিতে দিতে জবাব দিলেন মৎস্য। 'আমার লোকজন আর ঘোড়াগুলোর জন্য খানিক গরম জলের ব্যবস্থা করতে পারবে? ঠান্ডা আর বৃষ্টির মাঝে পুরো এক রাত তারা ভ্রমণ করে এসেছে।'

'অবশ্যই, মৎস্য,' জবাব দিলো মানু। বরাবরের মতোই যেকোনো উপায়ে মৎস্যের সেবা করতে সে আগ্রহী।

যাই হোক, তার সাথে কিছু একটা অস্বাভাবিক ঠেকছে। যতবারই মৎস্যের সাথে তার দেখা হয়েছে, ততবারই তাকে পানি সরবরাহ করতে হয়েছে। প্রথমবার কয়েক ফোঁটা, পরেরবার এক পানপাত্র ভরতি করে, এর পরেরবার একটা বালতি পূর্ণ করে আর এখন সম্ভবত কয়েকটা বড় পাত্র ভরতি করে পানি দিতে হবে। যতবার দেখা হয়েছে, মৎস্য মানুর কাছে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে পানি চেয়েছে।

মানু নিজে নিজেই হাসলো। আর অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপারটা মাথা থেকে সাথে সাথেই ঝেড়ে ফেললো।

এটা কাকতালীয় ছিলো না। এটা ঋণ, যা মৎস্য একদিন পরিশোধ করবে।

* * * * *

মানু এবং কালো আলখাল্লাধারী প্রহরীদের দেওয়া স্বস্তিদায়ক ঈষদুষ্ণ পানিতে মৎস্য আর তার লোকেরা নিজেদের পরিষ্কার করে নিলো। এরপর তারা জ্বলন্ত আগুনের পাশে গরম এক প্রাতঃরাশের জন্য বসে পড়লো।

বরাবরের মতোই মৎস্য মানুকে চমকে দিলো। কেবল এবার চমকটা ছিলো আনন্দদায়ক।

'তোমার পাশে সোমদত্তকে দরকার হবে,' মুখভরতি করে পোহা খেতে খেতে বললেন মৎস্য।

মানু খাবার চিবানো বন্ধ করে বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালেন।

'দুষ্চিত...আপনি কী বললেন? সোমদত্ত? সোমদত্তজি এখনো বেঁচে আছেন?'

সুস্বাদু খাবারের বাটিতে নজর ফেরানোর আগে এক সেকেন্ডের জন্য মৎস্য মুখ তুলে তাকালো। হেসে মাথা নাড়লো সে।

মানু খাবারের প্লেট একপাশে সরিয়ে রেখে ছোট্ট প্রার্থনার জন্য দুই হাত জড়ো করলো। খানিক পরেই সে প্রচণ্ড খুশিতে হেসে ফেললো।

'প্রশংসা দেবতাদের জন্য। দেবতাদের জন্য প্রশংসা। ধন্যবাদ মৎস্য, এই অসাধারণ সংবাদ নিয়ে আসার জন্যে। আমাকে তা আগে বলেননি কেন?'

মৎস্য এই প্রশ্নের দিলেন না। এবার তিনি খাবারের বাটিটা সরিয়ে দিলেন।

'হে সূর্যের সন্তান, তোমার আরো একজন সঙ্গীর দরকার হবে,' বললেন তিনি। রহস্য নিয়ে হাসছেন। কিন্তু জানতেন, এখন তিনি মানুকে যে তথ্য দেবেন, সেটা তার জীবনকে পুরোপুরি বদলে দেবে।

'আর কোনো মিত্র, মৎস্য?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলো মানু। অনুমান আর প্রত্যাশায় তার বুক ধুকপুক করছে। সে জানতো, ঐ দুর্ভাগ্যজনক রাতে সোমদত্তের সাথে আর কে ছিলো। যদি সোমদত্তজি জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারেন, হয়তো সেও পেরেছিলো।

'সেও পেরেছিলো, মানু,' কোমল কণ্ঠে বললেন মৎস্য। 'তারা বেরিয়ে আসতে পেরেছিলো...'

মানু জমে গেল। চোখ বন্ধ করলো সে। আনন্দের অশ্রুটা তারুণ্যময় মুখের উপর গড়িয়ে পড়ার সুযোগ দিলো।

খানিক পরে সে মৎস্যের দিকে তাকালো, এরপরেই আরো একবার হেসে ফেললো। মৎস্যও হাসিমুখে সাড়া দিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই মৎস্যের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত ধরলো মানু। হাতটায় বারবার চুমু খাচ্ছে সে।

'তারা বেঁচে আছে! বেঁচে আছে তারা! আমার তারা বেঁচে আছে, মৎস্য!' কেবল এটুকুই বলে যাচ্ছে সে।

'আচ্ছা, তাই নাকি...তোমার তারা, হুঁ?' দুষ্টুমির স্বরেই বললেন মৎস্য। 'এটা তো আমি জানতাম না!'

এই পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা মৎস্য জানতেন না।

মানু লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

মৎস্য ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন। তারপর দুজনেই সীমাহীন আনন্দের এক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মুহূর্ত ভাগাভাগি করে নিলো।

বানারস, ২০১৭

অন্ধকার ভ্রাতৃসংঘ—দ্বিতীয় পর্ব

দলটা এবার একটু বড়। গোত্র প্রধান দ্বারকা শাস্ত্রী নিজের ঘর থেকে বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহণ করতে চাইছিলেন। বিদ্যুৎ আর ন্যায়না বিখ্যাত তুলসি ঘাট থেকে তাদের আনন্দময় প্রাতঃভ্রমণ করে ফিরে আসছিলো। সেই ঘাট যার কাছে বসে ষোড়শ শতকের শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী-কবি তুলসি ভগবান রামের মহাকাব্য শ্রী রামচরিতমানস লিখেছিলেন।

ন্যায়না বিদ্যুৎকে ক্ষমা করে দিয়েছে। সে ক্ষমা না করে কীভাবে থাকবে? সে গভীরভাবে তাকে ভালোবাসে। আর বিদ্যুৎ কোন পরিস্থিতির শিকার হয়ে এমন আচরণ করেছে, তা বুঝতে পেরেছে সে। বুলেট আর রক্তের সেই বিশৃঙ্খলার মাঝে আটকা পড়ে যে-কেউই ভুল করতে পারে। দুজনেরই মনে হলো তাদের বুক থেকে যেন পাহাড় নেমে গেছে।

গতকালই মঠের বয়োজ্যেষ্ঠরা বালার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছে। সনাতন প্রথা মেনেই হরিশচন্দ্র ঘাটে তার দাহ করা হয়েছে। নির্বিকারভাবেই সবাই বুঝে নিয়েছিলো, এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে কোনো প্রকার পুলিশি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি। দেব-রাক্ষস মঠ সব সময়ই নিজের লড়াই নিজেই করে গেছে। সর্বদাই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে।

আর এখন তাদের পূর্বপ্রতিশ্রুত, প্রতীক্ষিত রক্ষক তাদের পাশে আছে। তাদের বিদ্যুৎ আছে।

* * * * *

বিশাল লনের রোদ-পড়া এককোনায় চেয়ারগুলো বসানো হয়েছে। সেই সাথে আছে চায়ের ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ সরাসরি তার প্রপিতামহের মুখোমুখি অবস্থানে বসেছে। আর বলভান্ত, পুরোহিতজি এবং ন্যায়না একটা ছোট বৃত্ত সাজিয়ে বসলো।

তাদের কথোপকথন চলতে থাকে। বিদ্যুৎ বুঝতে পারছে, তাদের আলাপে এই নতুন তিন মুখ আদতে নতুন না। তারা এমনভাবে শুনছিলো যেন দ্বারকা শাস্ত্রী যা বলছে তাতে ওরা আগে থেকেই পারদর্শী। বরং বিদ্যুৎই এই আলোচনায় নতুন।

কেন আমার বাবা কার্তিকেয় শাস্ত্রী আর প্রপিতামহ দ্বারকা শাস্ত্রী মিলে আমাকে এতগুলো বছর কাশী থেকে দূরে রেখেছিলেন?

'কোনো সন্দেহ নেই, নাইটস টেম্পলাররা যোদ্ধা বাহিনী ছিলো। তবে সংঘের সবাই যুদ্ধে অংশ নিতেন না। প্রকৃতপক্ষে টেম্পলারদের মাঝে অ-যোদ্ধাদের অনুপাত ছিলো অনেক বেশি। যতই এই দলটার সদস্য আর ক্ষমতা বাড়তে শুরু করে, এটা হয়ে ওঠে পুরো খ্রিষ্টান সমাজের সবচেয়ে পছন্দের দাতব্য সংস্থা।

'সংঘের প্রতিটা নাইট শপথ নিতো, নিজেদের জন্য কোনো সম্পত্তি কিংবা অর্থ তৈরি করবে না। টেম্পলারদের প্রাথমিক চিহ্নে দুজন নাইটকে একটি ঘোড়ায় চড়তে দেখা যেত। মূলত ভ্রাতৃসংঘের দরিদ্র্যতা ফুটিয়ে তুলতেই এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিলো।

'যাই হোক, খুব দ্রুতই টেম্পলাররা নিজেদের ভাগ্যে বড় রকমের এক উত্থান দেখতে পেল। ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেডে জেরুজালেম বিজয়ের অল্প কদিন পরেই এই ভ্রাতৃসংঘ পবিত্র সমাধিসহ ঐ পুণ্যভূমিতে আগত খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিজেদের করে নেয়। এই অসহায় তীর্থযাত্রা প্রায়ই জাফা উপকূল থেকে জেরুজালেমের ভেতরের অংশ পর্যন্ত পদে পদে ডাকাত এবং দস্যুদলের লুটপাট ও হত্যার শিকার হতো। আর এখান থেকেই টেম্পলাররা তাদের রাজসিক উত্থানের শুরু করে।'

তার উদ্দেশে বলা প্রতিটা কথা বিদ্যুৎ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে। কনস্ট্যান্টিন, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার, তার রহস্যময়, আলখাল্লা-পরা পূর্বপুরুষ অদ্বৈত শাস্ত্রী, দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস আর নাইটস টেম্পলার...

এর গন্তব্য কোথায়?

'খুব দ্রুতই সবকিছু একটা অর্থ দাঁড় করাবে, বিদ্যুৎ,' বললো দ্বারকা শাস্ত্রী, যেন তিনি বিদ্যুতের মন পড়তে পারছিলেন।

সম্ভবত আসলেও তাই।

'ক্লেয়াভক্সের সেইন্ট বার্নার্ড ছিলেন চার্চের একজন শক্তিশালী নেতা এবং ফ্রান্সের একজন মঠাধীশ। তিনিই নাইটস টেম্পলারদের অভূতপূর্ব সমর্থন প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। তাদের পক্ষ অবলম্বন করে তিনি ব্যাপক আকারে লিখতে শুরু করেন আর খুব দ্রুতই খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের রক্ষক হিসেবে তাদের পক্ষে দাপ্তরিক সমর্থন আদায় করে নেন। এটাই ছিলো তাদের পালে জোর হাওয়া।

'বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আসা অনুদান, সোনা, ভূ-সম্পত্তি এমনকি জনবলে রীতিমতো ভেসে গেল এই ভ্রাতৃসংঘ। তাদের সম্পদ এত দ্রুত বাড়তে শুরু করেছিলো যে একপর্যায়ে তারা খ্রিষ্টানদের অর্থ ব্যবস্থা এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য অর্থ লেনদেনে নোটের ইস্যু করা শুরু করে। অধিকাংশ মানুষ যেমনটা বিশ্বাস করে, ভ্রাতৃসংঘে অ-যোদ্ধা কিংবা আর্থিক কর্মকর্তার সংখ্যা যুদ্ধরত নাইটদের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ছিলো।'

বিদ্যুৎ এবার কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গেল।

'বাবা, এসবই গুরুত্বপূর্ণ আর টেম্পলারদের সম্পর্কে আমার জন্য একেবারেই নতুন সব তথ্য, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এতসব কিছু কীভাবে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সাথে সংযুক্ত...' কিছুটা বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ।

দ্বারকা শাস্ত্রী কিছু বলে ওঠার আগেই ন্যায়না কথা শুরু করলো।

'বিদ্যুৎ, তুমি দেখতে পাচ্ছো না কী হচ্ছিলো তখন? প্রথমত, একটা ধর্মের আধিপত্যকে স্বীকৃত লক্ষ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। এরপর সেই হিংসাত্মক নকশাকে ব্যাপক সামরিকীকরণের মাধ্যমে সমর্থন জানানো হয়েছে। এরপর তীর্থযাত্রীদের অসহায়ত্ব যোগ করা হয়েছিলো পাজলের শেষ টুকরো হিসেবে। এর ফলে চার্চ আর রাজার পাশাপাশি সাধারণ জনগণের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ তারা পেয়ে যায়।'

বিদ্যুৎ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো কিন্তু সবটা বুঝতে পেরেছে এমন কোনো ভাবভঙ্গি দেখায়নি।

'তুমি বুঝতে পারছো না, বিদ্যুৎ...একটা ধর্ম, একটা সেনাবাহিনী, একটা ব্যাংক...একটাই সরকার! জেনে হোক বা না জেনে, নাইট টেম্পলাররাই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সবচেয়ে বড় অস্ত্র!' বিস্মিত কণ্ঠে বললো ন্যায়না।

'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের পেছনে থাকা বিপজ্জনক এসব পুরুষ বা নারী সম্পর্কে যা জানা সবচেয়ে দরকার তা হলো, এরা কয়েক মাস বা বছর ধরে পরিকল্পনা করে না। তাদের একটা দীর্ঘমেয়াদি অস্থির বৈশ্বিক-দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যেখানে তারা এমনসব কৌশল তৈরি করে, যা বহু শতাব্দী ধরে কার্যকর করা হবে। আর এর নেতৃত্বে থাকবে এই ভ্রাতৃসংঘের পরের প্রজন্ম। তাই বলা যেতে পারে, নাইটস টেম্পলাররা ছিলো এই গোপন ভ্রাতৃসংঘের প্রথম ধাপ,' এবার ব্যাখ্যা দিলেন পুরোহিতজি।

'এক মিনিট, পুরোহিতজি। আপনার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, এসব কিছুই অনেক বড় রকমের ষড়যন্ত্র তত্ত্বের মতো লাগছে। নাইটস টেম্পলারদের ইতিহাস বেশ ভালোভাবেই সংরক্ষিত আছে। যদি ওরা গোপনে কাজ করার মতো একটা ভ্রাতৃসংঘই হবে, তাহলে কেন সারা বিশ্বে পরিচিতি পাবে?'

ক্ষণিকের জন্য নীরবতা নেমে এলো। বিদ্যুৎ তার সাথের বাকি চারজনের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের দেখে মনে হচ্ছিলো, প্রত্যেকের কাছেই এক সাগর সমান তথ্য আছে, যা ব্যাখ্যা করা খুব একটা সহজ না। অবশেষে মঠাধীশ নিজেই কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন।

'যখন থেকে কনস্ট্যান্টিন এটি চালু করেন, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাবান কিছু মানুষকে যুক্ত করেছে–ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ, বিলিয়নিয়ার উদ্যোক্তা, ড্রাগ-লর্ড, বিজ্ঞানী এবং আরো অনেকেই। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক অবস্থান ছাড়াও এদের বেশিরভাগই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, বলা চলে বিশেষ ক্ষমতার কাছাকাছি পর্যায়ের। এটা ছিলো তাদের ভ্রাতৃসংঘে দীক্ষা নেওয়ার অন্যতম এক মানদণ্ড। তুমি কি আশা করো এমন শক্তিশালী আর আগ্রাসী মানুষজন জনসম্মুখে বেরিয়ে আসবে? তারা সব সময়ই শক্তিশালী সন্দেহের উর্ধ্বে থাকা মানুষদেরকেই দুর্বল আর অসহায়ের বিপক্ষে কাজে লেগেছে। তুমি জানতেও পারবে না কে এই ভ্রাতৃসংঘের অংশ। হতে পারে কোনো বড় এক দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট, হতে পারে সিলিকন ভ্যালিতে থাকা কোনো ইন্টারনেট জগতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। হতে পারে একজন বিজ্ঞানী, যে কিনা সুইস আল্পসের গোপন ল্যাবে মানুষের জিনোম আর ক্লোনিং নিয়ে গবেষণা করছে। তারা সবখানে আছে, বিদ্যুৎ। কিন্তু তবুও তারা অদৃশ্য।'

কথাগুলো বিদ্যুৎকে হজম করার জন্য এক মিনিট সময় দিয়ে আর নিজের আরামদায়ক হার্বাল চায়ে চুমুক দেওয়ার পর মঠাধীশ আবার কথা শুরু করলেন।

'যদি নাইটস টেম্পলাররা শুধু সন্ন্যাসী যোদ্ধাদের একটা দলই হতো, তবে কেন

তাদের দীক্ষা অনুষ্ঠান একই সাথে গোপন আর এমন কিছু ছিলো যা পরবর্তীতে ব্যাপক জল্পনা আর ভয় ছড়িয়ে দিয়েছিলো? আর কেনই বা তাদেরকে শেষ পর্যন্ত ধরে নিয়ে পুরোপুরি জনসম্মুখে এসে পুড়িয়ে মারা হয়েছিলো?'

বিদ্যুৎ এই অস্বস্তিকর তথ্য নিয়ে জানতো না।

'তাদের পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো...জীবিত?'

খানিকের জন্য থামলেন দ্বারকা শাস্ত্রী, এরপর শান্তভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, তাই করা হয়েছিলো। ক্রাইডে দ্য থার্টিনে।'

হরপ্পা, খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
রক্ত-নদীর অভিশাপ

বহু বছর ধরে সপ্তর্ষিদের যে নম্র কণ্ঠের সাথে বিভাষণ পূজারি পরিচিতি ছিলেন, কণ্ঠগুলো এখন আর তেমন অবস্থায় নেই। নীল আগুনের একেবারে ভেতর থেকে দুটো ভয়ার্ত কণ্ঠ চিৎকার করছে। নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো নীলচে আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে আছেন দেবতা। তার একমাত্র চোখটা ভয় আর কীসের যেন অপেক্ষায় বড় হয়ে গেছে। যদি কেউ সত্যিকার অর্থেই জেনে থাকে সপ্তর্ষিদের ক্রোধ কী ভয়ানক বিপর্যয় ডেকে আনতে সক্ষম, সেটা ছিলেন এই হরপ্পার সূর্য।

কণ্ঠগুলোর ভয়ংকর গর্জন এখন দূরের উঁচু পাথুরে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন শোকার্ত পাহাড়ের সাথে যোগ হয়ে আরো জোরে শব্দ ভেসে আসছে। বিভাষণ পূজারি নিশ্চিত, জ্বলন্ত এই ঋষিদের প্রতিটি শব্দ এখন চারপাশের একশো মাইলের মাঝে থাকা সকল জীবই শুনতে পাবে।

'শুনে নাও, হে পতিত দেবতা...তোমার পাপ ক্ষমা করা হবে না...আর এই অশুভ, অপবিত্র কাজে তুমি যাদের সঙ্গী করে নিয়েছ...তোমার কালো হৃদয়ের জন্য অন্যরা যে শাস্তি ভোগ করবে, তারাও খুব দ্রুত সেই শাস্তি ভোগ করবে! আরেকবার চাঁদ ওঠার আগেই তোমরা প্রত্যেকেই ধুলোয় পরিণত হবে! তোমরা সবাই মারা যাবে!'

বিভাষণ পূজারির মুখ আর শরীরের উপর শিলাবৃষ্টি এসে পড়ছে, যেন স্বর্গ তার জরাজীর্ণ আত্মার উপর পাথর নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মৃত্যুর ভয় দেবতাকে দূর থেকেও বিচলিত করতে পারেনি। তিনি বাঁচলেন কি মরলেন, তা নিয়ে কোনো পরোয়াই করেন না। সানজানা আর মানুকে ছাড়া তার জীবনের আদৌ কোনো মানে নেই। শূন্যতার দিকে তাকিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছেন, শিলাগুলো যেন সাদা পাথরের আক্রমণ হয়ে তার মুখের উপর আছড়ে পড়ছে। তিনি জানতেন, পরবর্তী জীবনে তার আত্মা আধ্যাত্মিক জগতের অন্ধকার

রাজ্যে, জন্ম-মৃত্যুর এক অবিরাম চক্রে হারিয়ে যাবে। এই শেষ সময়ের কর্মগুলো মুছে দিতে তার আরো হাজারটা জীবন লাগবে।

তার প্রতিশোধের পিপাসা এখন আরো বেড়ে গেছে। যারা তাকে এই নরকের আগুনে বন্দি করেছে, তারা এখনো বেঁচে আছে, এমনকি এখনো হাসছে! তারা যা করেছে এর মূল্য তাদের দিতেই হবে।

হরপ্পাকে ধ্বংস হতেই হবে...একেবারে শেষ প্রাণটি পর্যন্ত!

* * * * *

বর্বর এই হত্যাযজ্ঞ চলতেই থাকে। আগুনে নির্মমভাবে ছুঁড়ে ফেলার আগে পঞ্চম সপ্তর্ষির চুল ধরে রুক্ষ মাটির উপর কোনো দয়ামায়া না দেখিয়েই টেনে আনা হয়। এই দফায় অসুর-রাজ নিজেই জল্লাদের ভূমিকা নিলো। যদিও এই অসম্ভব ঠান্ডা মাথাতেও দুই মরণাপন্ন ঋষির ভবিষ্যদ্বাণী সুরাকে অস্থির করে তুলছিলো, তবে নিজের লোকদের সামনে নির্ভীক মনোভাব দেখাতে তাকে ওটা উপেক্ষা করতেই হতো।

জ্বলন্ত ঋষির চিৎকার আগের দুজনের চিৎকারের চেয়েও ভয়ংকর ছিলো। এবার একটা মেয়ের কণ্ঠ, যা বিভাষণের কল্পনারও বাইরে। এ যেন কোনো এক অসহায় মায়ের ভূতুড়ে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠ, যিনি তার সন্তান হত্যার কারণে শোক প্রকাশ করছেন। যদিও বাকি সব দুর্ভাগা এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় একই সাথে ভয় আর বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছিলো, কিন্তু হরপ্পার সূর্য সাথে সাথেই বুঝতে পারলেন, এ এক স্বর্গীয় শব্দ। আগে তিনি কখনোই এই শব্দ শোনেননি। তবুও নিশ্চিত ছিলেন এটা কার কণ্ঠস্বর।

সরা মা...

আকাশের বজ্রপাতের মতো বিকট সেই নারী কণ্ঠের চিৎকারে রাক্ষসরাজ আর তার বুনো ঘাতকদের রক্ত ঠান্ডা হয়ে এলো। এই আওয়াজ প্রলয়ের। ভয়, দুর্ভাগ্য আর ধ্বংসের। এ এক চিরস্থায়ী অভিশাপের শব্দ যা মানব জাতিকে চিরদিনের জন্য জর্জরিত করবে।

'সপ্তর্ষিরা নিজেদের একজনের মতোই তোমাকে ভালোবেসেছিলো। আমি তোমাকে নিজের সন্তানের মতো করেই ভালোবাসতাম। দেবতারা তোমাকে দেবত্ব দিয়েছিলো এবং তুমি তা কৃতজ্ঞ চিত্তে আর যোগ্যতার সাথেই বহন করছিলে–তোমার হিংসা তোমার সর্বনাশের কারণ না হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত,

তোমার দুর্নীতি এই মহাহত্যাযজ্ঞ বয়ে নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত, হে দেবতা! অসুররা যে পাপ করেছে তা ক্ষমার অযোগ্য। হরপ্পাবাসীরা সমষ্টিগতভাবে পাপ করেছে। রাজারা পাপ করেছে, পুরোহিতরা পাপ করেছে। রাক্ষসরা পাপ করেছে, পাপ করেছে দেবতারাও। মানব জাতি এই মহাবিশ্বকে বাধ্য করেছে এক মহাজাগতিক শুদ্ধি ছড়িয়ে দিতে। আমি এই অসীম অনৈতিকতার ভূমি ত্যাগ করবো, ফিরে যাবো পৃথিবী মায়ের পবিত্র গর্ভে। সরস্বতী, জ্ঞানের নদী, কিংবদন্তি হয়ে হারিয়ে যাবে। কিন্তু তার উপর যারা অন্যায় করেছে, তাদের উপর চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়ার আগে না।

'সাআআআআবধান...প্রলয়...আস্যতি...!

'মহাপ্রলয়...আসছে...!'

বিভাষণ পূজারি এখন হাঁটুতে ভর করে বসে আছে, তার চোখ বন্ধ, মাথা নত আর প্রার্থনার ভঙ্গিমায় দুই হাত জড়ো করা। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে সে প্রলয় সম্পর্কে পড়েছে আর জানে এটা এমন কিছু যা প্রতিটা যুগের শেষেই শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার আর সব সৃষ্টিকে একটা নতুন জীবন শুরু করার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এসে থাকে। সে জানে না এটা অতি শীঘ্রই আসবে কি না বা সেই এই বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের কেন্দ্রবিন্দু কি না। কিন্তু তারপরেও সে এসব পাত্তা দিলো না। তার যতটুক স্মরণ আছে, প্রলয় এরই মাঝে তার জীবনে আঘাত করেছে–যা কিছু তার প্রিয় ছিলো তার সবকিছুই ধ্বংসের মাধ্যমে।

রক্তধারা বা রক্তের নদী এখনো শেষ হয়নি। সেই শক্তিশালী, প্রতিধ্বনিত কণ্ঠ তখনো বাজছে।

'প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয়ে থাকা মানবতা দেবতা হওয়ার সম্ভাবনা ধারণ করে। তবুও মানুষ নিজের ভেতরে ও বাইরে আধ্যাত্মিক মুক্তির বাইরে গিয়ে তাকে দেওয়া উপহার ব্যবহার করে বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যা, লুণ্ঠন আর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে। তোমার জাতিই এই ভাগ্য বেছে নিয়েছে! তবে তাই হোক! দেবতারা কখনোই তোমাকে তোমার ঘৃণ্য পরিণতি থেকে মুক্তি দেবেন না। অত্যাচার আর রক্তপাত মানব জাতির গলায় সাপের মতো পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করবে; এই বাঁধন সে কখনোই আলগা করবে না। যেই দেবতাদের সাথে আজ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, একদিন সেই দেবতাদের নামেই একে অন্যকে খুন আর ধ্বংস করবে তারা! গণহত্যা আর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড কখনোই তোমার কাছ থেকে দূরে যাবে না। এই আমার অভিশাপ, হে পতিত দেবতা! মানব জাতিকে শেষ সময় পর্যন্ত সীমাহীন কষ্টের চিৎকার শুনে যেতে হবে!

'আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম! আমি তোমাদের সবাইকে অভিশাপ দিলাম!'

বিভাষণ পূজারির চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আচমকা তার পৃথিবীতে কী যে হলো...কীভাবে কদিন আগেও যা ঠিকঠাক চলছিলো, সেটা এতটা বিধ্বংসী আর নিষ্ঠুরভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল? যে হরপ্পার সূর্য একসময় পুরো হরপ্পার প্রধান পুরোহিতের আসনে উঠতেন, তিনি এখন পরিণত হয়েছেন একচোখা এক দানবে। তার যে ঘরটা প্রিয়তমা স্ত্রী আর ছেলের হাসিতে মুখরিত থাকতো, তা এখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সপ্তর্ষিরা, যাদেরকে সে পথপ্রদর্শক আর ভাই হিসেবে সমাদর করতো, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তার নিজেরই যোগসাজশের ফলে। স্বর্ণের শহর হরপ্পা মহাপ্লাবনে ডুবতে চলেছে। আর জ্ঞানের নদী, যাকে সে মা হিসেবে শ্রদ্ধা করতো, এখন সে নিজের পৈশাচিক অবতার রক্তের নদী হিসেবে মানব জাতিকে অভিশাপ দিচ্ছে।

খুব দ্রুতই তার নীরব কান্না ভারী আহাজারিতে রূপ নিলো। অনবরত কেঁদে চলেছেন তিনি। তার কান্না খুন হওয়া ঋষিদের পবিত্র ধুলোকে চারপাশে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

দেবতা তখনো জানতেন না, এই চোখের জল তার জীবনে যে ভয়াবহ শেষ অধ্যায় অপেক্ষা করছে, তার জন্য যথেষ্ট না।

আর এখন যখন তিনি প্রচণ্ডভাবে মৃত্যুর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন, তার স্রষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইছেন, তিনি জানতেন না তার ফিরে আসাটা পূর্বনির্ধারিত...কয়েক শতাব্দী পরে।

সেবার সত্যিকার অর্থেই পৃথিবীতে আসা শেষ দেবতা হিসেবে।

বানারস, ২০১৭
প্রতিশোধ

'আমি ওকে খুঁজে বের করে হত্যা করবো।'

ত্রিজাত কাপালিকের সাথে কী করা উচিত বিদ্যুৎ তা নিশ্চিত। শ্মশান-রাজার পেছনে কে আছে তা কোনো ব্যাপার না। আড়ালে যারা কলকাঠি নাড়ছে তাদের হিসেব পরে। আপাতত দেবতা খুবই কঠোর। সে কখনোই আরেকজন মানুষকে খুন করার কথা কল্পনা করেনি। এমনকি কদিন আগে দশাশ্বমেদ ঘাটে সবচেয়ে কঠিন সময়েও সে কারো প্রাণ হরণ করেনি।

কিন্তু তারপরেই সেই ঘটনা। বালার অমানবিক হত্যাকাণ্ড, তাও আবার মঠের পবিত্র ভূমির মাঝে, যা বিদ্যুৎকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো তারা লড়াই করছে এক অদম্য, নির্মম শত্রুর বিরুদ্ধে। এমন এক শত্রু, যে কিছুতেই থামবে না। রুমি পেরেরা বা ভাড়াতে খুনিদের ব্যর্থতা এই শত্রুকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। তাই একটা জিনিস পরিষ্কার। কোনো অসম্পূর্ণ ব্যবস্থায় এই প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা যাচ্ছে না।

এটা চূড়ান্ত একটা লড়াই। ত্রিজাত কাপালিক আর আড়াল থেকে যারা এই অশুভ খেলা খেলছে তাদের মৃত্যুর লড়াই।

* * * * *

'আশ্চর্যের বিষয় হলো, ত্রিজাত আত্মগোপনে যায়নি। আমাদের গুপ্তচর সেনা রিপোর্ট করেছে যে সে কেবল শহরের উপকণ্ঠে নিজের যজ্ঞশালা পর্যন্ত পিছু হটেছে। ঐ জায়গা কেবল নামেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জায়গা। আসলে একটা দুর্গ। এটা শ্মশান-রাজার আধ্যাত্মিক আর সামরিক ঘাঁটি। সে জানে তুমি তার পিছু নেবে। সে চায় তুমি তাকে ধাওয়া করো,' সতর্ক করে দিলো মঠের সামরিক প্রধান বলভান্ত।

'আমাদের ওকে ধরতেই হবে, বলভান্ত দাদা। যদি তার অর্থ এই হয় যে তাকে নরকের অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলতে হবে, তবে তাই হোক!'

'হ্যাঁ, বিদ্যুৎ। আমরা ওকে ধরবো। তবে আমাদের ভালোভাবে পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা সমগ্র কাশীর সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষটার সাথে লড়াই করছি। তাকে হালকাভাবে নিতে পারি না আমরা। প্রতি-আক্রমণে একই সাথে সাহস আর বীরত্ব দরকার। তবে সবচেয়ে বড় কথা, এজন্য দরকার নিখুঁত পরিকল্পনা।'

সম্মতিতে মাথা নাড়লো বিদ্যুৎ। বলভান্তের যুদ্ধ অভিজ্ঞতা অন্য সবার মিলিত অভিজ্ঞতার চেয়ে বেশি।

'কেন আমরা আমাদের লোকজন নিয়ে তাদের নকল যজ্ঞশালা উড়িয়ে দিচ্ছি না, বলভান্ত দাদা?' অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলো সনু। 'আমাদের একশোজনই তার ৬৬৬ নেশাখোর অনুসারীদের ধরাশায়ী করতে যথেষ্ট।'

'না, সনু। খোলামেলা অবরোধ আর সামরিক আক্রমণ অতিরিক্ত রক্তপাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে আর অনেক বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আর যেহেতু এটাও নিশ্চিত যুদ্ধে আমাদের পক্ষেও কিছু ক্ষতি হবে, আমাদের এটা যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা দরকার। সবশেষ কথা, যখন আমরা স্বয়ং মহাতান্ত্রিকের মুখোমুখি হবো, তার পক্ষ থেকে কেবল মানুষই লড়তে আসবে না,' একটানা বলে গেল বলভান্ত।

বিদ্যুৎ কথা বলার আগে প্রায় অর্ধেক মিনিট সবাই চুপ ছিলো।

'তাহলে আমরা কী করবো, দাদা? যদি তাকে সরাসরি আক্রমণ করতে না পারি, আমাদের হাতে কী বিকল্প আছে?'

বলভান্ত গভীরভাবে চিন্তা করছে।

'পুরো বানারসে একজনই আছেন যে আমাদের সাহায্য করতে পারে,' বললো সে।

* * * * *

বিখ্যাত বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের (B.H.U) বিস্তীর্ণ ক্যাম্পাসে হেঁটে যাচ্ছিলো ওরা। ১৯১৬ সালে পণ্ডিত মদন মোহন মালভিয়ার প্রতিষ্ঠিত B.H.U-কে এশিয়ার সবচেয়ে বড় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় মনে করা হয়। ৭৫-এর বেশি হোস্টেলে ১২,০০০-এর বেশি ছাত্রছাত্রী বাস করছে। ১,৩০০ একর জুড়ে

বিস্তৃত এই গৌরবময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ৪০-এর বেশি দেশের প্রায় ৩৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করছে।

বলভান্ত জোর দিয়ে বলছিলো যে একজনের সাথে দেখা করার সময় বিদ্যুতের থাকতেই হবে। যে কিনা ত্রিজাত কাপালিকের আপাত দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করতে তাদের সাহায্য করতে পারবে।

'অধ্যাপক প্রভাত ত্রিপাঠি সংস্কৃতের একজন পণ্ডিত আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এক দশকের বেশি সময় ধরে যুক্ত। বেদ, উপনিষদ আর অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের বিষয়ে তিনি সবচেয়ে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ। যেকোনো সময় ডজনের বেশি পিএইচডি শিক্ষার্থী তার অধীনে ইন্টার্ন করে। একজন আপাদমস্তক ভদ্রলোক, দ্বারকা শাস্ত্রীজিকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। দুর্ভাগ্যবশত, তিনি একচোখে দেখতে পান না, যে কারণে তুমি সব সময়ই তাকে সানগ্লাস পরে থাকতে দেখবে,' বর্ণনা দিলো বলভান্ত।

'জানানোর জন্য ধন্যবাদ, দাদা। তবে তিনি কীভাবে আমাদের বর্তমান প্রয়োজনে সাহায্য করবেন?'

বলভান্ত স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিলো, 'কারণ শিক্ষাগত এই নীরব জীবন বেছে নেওয়ার আগে অধ্যাপক ত্রিপাঠি ত্রিজাত কাপালিকের সহযোদ্ধা ছিলেন।'

* * * * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস লনের ছোট ক্যান্টিনে চা নিয়ে বসেছে ওরা। অধ্যাপক ত্রিপাঠি এমনই সহজ-সরল যে ঘাসের উপরেই দুই পা ভাঁজ করে বসেছেন। তার সাক্ষাতে আসা অতিথিদেরকেও আরাম করে ঘাসের উপর বসার আহ্বান করতেও দ্বিব্রত বোধ করেননি। কিছু সৌজন্য বিনিময়ের পরে বলভান্ত সাবধানে প্রসঙ্গ তুলে ধরলো।

'ত্রিপাঠিজি, আমরা এখানে আপনার সাহায্য আর আশীর্বাদ নিতে এসেছি। কেবল আপনিই আমাদের বিপজ্জনক সাধনায় সাফল্যের পথ দেখিয়ে দিতে পারেন।'

অধ্যাপক ভদ্রভাবে হাসি দিয়ে বললেন, 'তোমার মতো একজন যোদ্ধার জন্য বিপজ্জনক আবার কী, বলভান্ত? আর বই এবং শ্রেণিকক্ষ নিয়ে ব্যস্ত একজন মানুষ কীভাবে সাহায্য করতে পারে?'

বিদ্যুৎ বুঝতে পারছে অধ্যাপক ত্রিপাঠি একজন অমায়িক, সরল আর দয়ালু ব্যক্তি। তাকে নিষ্ঠুর মহাতান্ত্রিকের পাশে কল্পনা করাও অসম্ভব।

দ্বিধা নিয়ে পরের কথাগুলো বলার আগে কয়েক মুহূর্ত চুপ রইলো বলভান্ত।

'ত্রিজাত কাপালিকের যজ্ঞশালায় অনুপ্রবেশের একটা উপায় আমাদের দরকার...'

অধ্যাপকের চেহারা পাথরের মতো জমে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিদ্যুৎ দেখতে পেল তিনি রাগে কাঁপছেন। নাটকীয়ভাবে নিজের রাগ প্রকাশের তুলনায় সুশীল এই ভদ্র অধ্যাপক নমস্তে ভঙ্গিমায় নিজের হাত জড়ো করে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

'ত্রিপাঠিজি...আমি অনুরোধ করছি...দয়া করে থাকুন...' অনুনয় করে বললো বলভান্ত। অধ্যাপকের জামার হাতা ধরে তাকে বসতে আকুল অনুরোধ জানালো। ত্রিপাঠিজি যখন হাল ছেড়ে দিলেন, তখন সে স্বস্তি পেল।

'আমার সামনে ঐ শয়তানের নাম উচ্চারণ করে তুমি আমাকে অপমান করেছ। অনেক দিন আগে আমি এই জীবন ছেড়ে এসেছি। ওটা আমার জীবন থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে গেছিলো। সবকিছু...আর ভেবো না সে জানে না যে তুমি এখানে এসেছ। সে সবকিছু দেখে। সবকিছুই জানে!' প্রচণ্ড ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন অধ্যাপক।

* * * * *

'আমি নয় বছর অঘোরী তান্ত্রিক হিসেবে কাটিয়েছি। ত্রিজাত ছিলো আমার ভাইয়ের মতো। বা আমি তাই ভেবেছিলাম। এগুলো সে আজকের দিনের শ্মশান রাজা বা মহাতান্ত্রিক হয়ে ওঠার অনেক আগের কথা। আমাদের বয়স কম ছিলো। আমাদের সাধনা ফল দেওয়া শুরু করে। সিদ্ধিরা ক্ষমতা দিয়ে মাতাল করে তুলেছিলো আমাদের। যারাই আমাদের পথে বাধা দিতো, তাদের উপর আমরা বগ্লামুখীর মতো প্রাচীন ধ্বংসাত্মক জাদু প্রয়োগ করতে পারতাম। তবে মাস আর বছর পার হতেই ত্রিজাতের ভেতর কিছু একটা পরিবর্তিত হতে শুরু করে।'

অধ্যাপক এখন দুষ্ট কঙ্কাল-বহনকারীর সাথে নিজের অতীত স্মরণ করছেন।

'সে দিন দিন আরো বেশি নিষ্ঠুর হয়ে উঠছিলো। তার সাধনা তখন রুদ্রের উপাসনা কম আর ডাকিনী, পিশাচ ও চুড়েলদের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বেশি ছিলো। সে একাকিত্ব বেছে নেয়। সাধারণ শ্মশানে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতো। অন্ধকার আচারের জন্য মৃতদেহ উত্তোলন করার মতো জঘন্য পাপ শুরু করে একসময়।

কেউই জানতো না সে কী অর্জনের চেষ্টা করছিলো। কিন্তু আমরা বলতে পারি সে এমন কিছু করতে চাইছিলো যা কখনোই হওয়া উচিত না।'

অধ্যাপক এখন স্পষ্টতই বিরক্ত। এইসব স্মৃতিচারণ তার ঘাম বের করে দিচ্ছে। বিদ্যুৎ তাকে এক বোতল পানি সাধলো, যা তিনি কৃতজ্ঞতার সাথেই গ্রহণ করলেন।

'কিন্তু তার সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কখনোই শ্মশান তারা, মানে শ্মশানের দেবীকে ডাকতে পারেননি। মা তাকে দর্শন দেননি। এটা আমাকে বিস্মিত করে। ত্রিজাতের তুলনায় অনেক কম জ্ঞানী তান্ত্রিকরাও শ্মশান তারাকে খুঁজে পাওয়ার দাবি করেছে। এটা আমার সন্দেহ হয়। আর প্রথমবারের মতো আমি নিজে ত্রিজাতের কুণ্ডলী প্রস্তুত করি।'

প্রভাত ত্রিপাঠি এখন ভূতের মতো ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছেন। স্পষ্টভাবেই অতীতে ফিরে গেছেন।

'আপনি তার কুণ্ডলীতে কী পড়েছিলেন, ত্রিপাঠিজি?' প্রশ্ন করলো বিদ্যুৎ। 'আমি নিশ্চিত, ওটা আপনাকে বলেছিলো সে কেমন পাপীষ্ঠ মানুষে পরিণত হবে...'

অধ্যাপক মাথা নাড়লেন।

'সে ভালো মানুষ হবে নাকি খারাপ মানুষ হবে, সেটা তার কুণ্ডলী বলেনি। এটা এমন এক রাশিফল যেটা কোনো জ্যোতিষী শত শত বছরেও দেখেনি। আমি পড়েছি, বারবার পড়েছি, যেন আমি যা দেখছি তা বিশ্বাস করতে পারি। ভালো বা মন্দ দূরে থাক, এটা কোনো মানুষের কুণ্ডলীই ছিলো না!'

বলভান্ত আর বিদ্যুৎ পুরোপুরি হতবাক হয়ে গেল। অধ্যাপক এইমাত্র কী বলেছেন তারা সেটা পুরোপুরি বুঝতেই পারেনি।

'দুঃখিত, ত্রিপাঠিজি...আমি আপনার কথা ধরতে পারিনি,' ভদ্রভাবে বললো বিদ্যুৎ।

অধ্যাপক এখন উদ্বিগ্ন হয়ে ঘামছেন। ভীত কণ্ঠে ফিসফিস করে বললেন, 'সম্ভবত মা তারা তাকে নিজের দর্শন দেননি...কারণ...ত্রিজাতের জন্ম রাক্ষস যোনীতে (দানব জন্ম)। সে একজন রাক্ষস, যে বহু শতাব্দী পর পৃথিবীতে অবতরণ করেছে।'

‘তুমি একটা বিশাল আকৃতির তরী বানাবে, মানু। একটা জাহাজ যা এতই বড় হবে যে এর মাত্রা হবে মানুষের বোধগম্য সীমার বাইরে। একটা জাহাজ, যা এতই বড় হবে যে এর হাল মেঘের উপরে উঠে যাবে। শেষ সময় পর্যন্ত কেউই নিজের সবচেয়ে অদ্ভুত কল্পনাতেও এই জাহাজের ছবি আঁকতে পারবে না। এই তরী এর নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ করবে আর স্বাভাবিক নিয়মে সময়ের সাথে সাথে ক্ষয়ে যাবে। কিন্তু এর কিংবদন্তি অমর হয়ে থাকবে। ঠিক তোমার নামের মতোই, সত্যব্রত মানু।’

মৎস্য এইমাত্র যা বললো, তা শুনে মানু হতবাক হয়ে গেল।

নৌকার বিশালতা যদি এমন হয় যা মানুষের কল্পনার সীমার বাইরে, তাহলে আমি কীভাবে এটা নির্মাণ করবো? কীভাবে কেউ একজন এমন কিছু তৈরি করতে পারে যেটা সে ধারণাই করতে পারে না? আর আমাকেই কেন এটা বানাতে হবে? এই জাহাজের উদ্দেশ্য কী? আর কেন মৎস্য আমাকে সত্যব্রত মানু বলে ডাকবে?

মানুর মুখের অবাক ভাব দেখতে পেলেন মৎস্য। তিনি হেসে মানুকে তার সাথে হাঁটতে ইশারা করলেন। কালো পাহাড়ের উঁচু গুহা থেকে দুজন বেরিয়ে আসতেই তারা আবার প্রচণ্ড বাতাস আর তীক্ষ্ণ বৃষ্টির মুখে পড়লো। আকাশ দেখতে গত কয়েক দিনের মতোই নির্দয় দেখাচ্ছিলো। যেন চির অন্ধকার হয়ে গেছে সব।

ঝড়ের মধ্যে ওরা কেন বাইরে এসেছে–মৎস্যকে এই প্রশ্ন করার আগেই মানু দেখতে পেল, কয়েকটা ক্লান্ত ঘোড়া তাদের থাকার গুহা পর্যন্ত আসা আঁকাবাঁকা পথ ধরে ভারী পা ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এদের মাঝে একজন আরোহীকে হরপ্পার সূর্যপুত্রের চিনে নিতে খুব বেশি সময় লাগেনি। এইমাত্র তিনি একটা মশাল পেরিয়ে এসেছেন; ভয়ংকর বাতাস থেকে ওটাকে

রক্ষার জন্য তুলার সুতা দিয়ে একটা স্বচ্ছ ল্যাম্পশেড বানিয়ে নেওয়া হয়েছে।

তিনি পণ্ডিত সোমদত্ত, হরপ্পার প্রধান স্থপতি আর তার মহান বাবার সর্বশেষ বন্ধু।

* * * * *

পণ্ডিত সোমদত্ত তখনো তার চোখের পানি মুছে চলেছেন। তিনি বিভাষণ পূজারির ছেলেকে জীবিত, সুস্থ আর আনন্দিত অবস্থায় দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। এখন যা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছেন, তাতে প্রচলিত সত্যটাই নিশ্চিত হলো।

বাবার মতোই মানু কোনো সাধারণ মরণশীল নয়। সে যে আঘাত পেয়েছিলো, কেবল একজন দেবতাই তা থেকে বেঁচে ফিরতে পারে।

মানু দৌড়ে সোমদত্তের কাছে গিয়ে তাকে প্রায় জিন থেকে নামিয়ে আলিঙ্গন করলো। হরপ্পার জ্ঞানী নির্মাতার পা ছুঁয়ে ধরে তাকে জড়িয়ে ধরলো আবার। বাবা-মায়ের স্মৃতিতে চোখ ভিজে উঠেছে তার। সোমদত্ত বারবার মানুকে আশীর্বাদ করে যাচ্ছেন, আর যেখানেই থাকুক না কেন, নিজের ছেলেকে মানুষ হতে দেখে গর্বিত সানজানার হাসিমুখ কল্পনা করছিলেন।

যদিও তিনি নিশ্চিত না যে সানজানা নিজের স্বামীকে নিয়ে কেমন অনুভব করছে।

কিন্তু সোমদত্তের এসব নিয়ে চিন্তা করার কিছু ছিলো না। বিভাষণ আর সানজানার আত্মা শুরু থেকেই একে অন্যের সাথে ছিলো আর অনন্তকাল ধরে থাকবে, একেবারে সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত। সানজানা তার দেবতাকে দেখে রাখছে। সে জানতো, বিভাষণ এখনো সেই মানুষটাই আছেন যাকে সে ভালোবাসতো। সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। সে জানতো, নিয়তি বিভাষণ পূজারিকে এমন এক পরীক্ষায় ফেলেছে যার মধ্য দিয়ে কোনো মানুষেরই যাওয়া উচিত না। আর জানতো, বিভাষণকে স্রষ্টার সাথে মিলিত হওয়ার আগে নির্বাণ খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত আরো কয়েক জীবন ভোগ করতে হবে।

সানজানা নিজেও তার সাথে যন্ত্রণা ভোগ করবে। প্রত্যেক জীবনেই তার পাশে থাকবে সে।

অন্য জগতেও তারা সফল হবে...একসাথে।

* * * * *

'আমি কখনোই আপনার ঋণ শোধ করতে পারবো না, সোমদত্তজি,' দুই হাত জড়ো করে বললো মানু। 'আমার বাবার সাথে শেষ সময় পর্যন্ত কেবল আপনিই ছিলেন।'

মানু এইমাত্র কী বললো সেটা সোমদত্ত বুঝতেই পারেননি। মানু কেন তার বাবার শেষ সময়ের কথা বলছে, যেখানে বিভাষণ পূজারি এখনো বেঁচে আছেন?

যখনই তিনি কিছু বলতে যাবেন, মৎস্য বাধা দিলেন। তার চোখ সোমদত্তকে আপাতত চুপ থাকতে বলছে।

'দয়া করে আমাদের সামান্য আশ্রয়ে আসুন, সোমদত্ত,' বললেন তিনি। 'আপনি আর আপনার দলের এখন গরম খাবার দরকার। আর দরকার কিছুটা বিশ্রাম।'

সোমদত্ত মাথা নাড়লেন, মানুর দিকে তাকিয়ে উঁচু গুহার প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মৎস্য যখন মানুর কাঁধ চাপড়ালেন, সে তখন সোমদত্তের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে। মানু মৎস্যের দিকে তাকানোর জন্য ঘুরতেই তিনি মানুর পেছনে কিছু একটার দিকে ইঙ্গিত করতে ভ্রু নাচালেন।

কিছু একটা নয়। কোনো একজন।

তারা।

পুরোটা সময় জুড়ে তাকে যেসব প্রশ্ন বিরক্ত করছিলো, তা করার বেশ কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলো বিদ্যুৎ।

'বাবা, ওরা কেন আমাদের নিয়ে এত ভয় পায়? কী কারণে তারা বিশ্বাস করে যে আমাদের কাছে তাদের বিশাল আর সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ককে পরাজিত করার ক্ষমতা আছে? তার চেয়েও বড় কথা, ওরা কেন শুরু থেকেই আমাদের ভয় পায়? কেন কনস্ট্যান্টিন মহান অদ্বৈত শাস্ত্রীকে এত বিশ্বাস করেছিলেন?'

দ্বারকা শাস্ত্রী হাসলেন।

'ওরা আমাদের নিয়ে ভীত না, বিদ্যুৎ। ওরা কালো মন্দিরে যা লুকিয়ে আছে তা নিয়ে ভীত।'

বিদ্যুৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লো। আর তারপর কেবল হাসলো।

'বাবা, আমি জানি, আপনি আমাকে কেবল তখনই কালো মন্দিরের গোপন রহস্য নিয়ে বলবেন যখন আপনার মনে হবে সঠিক সময় হয়েছে। তাই আমি কিছুটা বিস্ময় জমিয়ে রেখেছি। আর জানতে চাইবো না এটা কী।'

দ্বারকা শাস্ত্রী উচ্চ স্বরে প্রাণখোলা হাসিতে জবাব দিলেন। বিদ্যুৎ তার প্রপিতামহকে এত আন্তরিকভাবে হাসতে দেখে খুশিই হলো।

'দেখে ভালো লাগলো যে তুমি এখন আমাকে ভালোভাবে বোঝো, বিদ্যুৎ,' বললেন তিনি।

'তবুও বাবা, আমরাই কেন? কেন ভারতীয় যোগীদের একটা আশ্রম বানারসের এত ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? কীভাবে একটা গোপন সংগঠনের দানব, যাকে কিনা বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা পরিচালনা করে, সে আমাদের কোনো হুমকি বা তাৎপর্যপূর্ণ মনে করে?'

'বিদ্যুৎ, এর একমাত্র কারণ, আমরা ছিলাম প্রাচীন জ্ঞানের সবচেয়ে বড় ভান্ডারের গ্রহণকারী আর রক্ষক,' সরলভাবে উত্তর দিলেন গোত্র প্রধান।

বিদ্যুৎ মুচকি হেসে তার প্রপিতামহের দিকে সন্দেহের দৃষ্টি দিলো। মঠাধীশ এইমাত্র যা বললেন তা সে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি।

* * * * *

'তুমি কি মানুর তরীসংক্রান্ত কিংবদন্তি বিশ্বাস করো, বিদ্যুৎ?' জানতে চাইলেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

তিনি বিদ্যুতের বাস্তবতা আর তার সাথে মানু এবং তরীর সংযোগ প্রকাশ করছেন না।

এখনই না।

'আমাদের চারপাশে এমন হাজারো উদাহরণ আছে যা একটা হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার দিকে ইঙ্গিত করে, বিদ্যুৎ। প্রাচীন জ্ঞান, যা সময়ের চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে...অথবা আমার হয়তো বলা উচিত, মহাসাগরের গভীরে তলিয়ে গেছে,' বললেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

বিদ্যুৎ মনোযোগ দিয়ে সব শুনে যাচ্ছে।

'গভীরভাবে ভাবো আর ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করো, বৎস্য। তুমি সবখানেই একটা হারিয়ে যাওয়া যুগের ছাপ দেখতে পাবে। আমাকে বরং কিছু বহুল প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনি আর গল্প দিয়েই শুরু করতে দাও। নিজের মহাকাব্য আর ধর্মগ্রন্থ নিয়ে তোমার খুব ভালো জানাশোনা আছে। তো আমাকে বলো, রামায়ণ আর মহাভারত উভয় জায়গায় কারা উপস্থিত ছিলো, যদিও এই দুই মহাকাব্যের মাঝে বহু যুগের ব্যবধান আছে?'

মনে মনে কয়েক সেকেন্ড ধরে দুই মহাকাব্য চষে বেড়ানোর পর উত্তর দিলো বিদ্যুৎ, 'আচ্ছা, অবশ্যই ভগবান হনুমান আছেন–আমরা তাকে রামায়ণ আর মহাভারত দুই জায়গাতেই দেখতে পাই। তিনি ছিলেন ভগবান রামের সবচেয়ে বড় ভক্ত। তার বীরত্ব কিংবা বুদ্ধি ছাড়া রামায়ণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা সোনার শহর লংকা পুড়িয়ে দেওয়া হোক কিংবা বিশাল সমুদ্র লাফিয়ে পার হওয়ার কাহিনি হোক, হনুমান রামায়ণের সবর্ত্রই ছিলেন। এরপর মহাভারতেও তার বেশ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে তিনি একটা ছোট বানরের বেশ ধরে মহান ভীমের অহংকার ভেঙে দিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিজেকে অর্জুনের রথের ব্যানারে স্থাপন করেছিলেন।'

'ভালো, তবে এটা সহজ ছিলো। আর কে?' জানতে চাইলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই আলাপ তিনি উপভোগ করছেন।

'এরপর শক্তিশালী গরুড় পাখি–স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর বাহক। রামায়ণে যখন রাক্ষস রাজকুমার মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিৎ তার কুখ্যাত অস্ত্র নাগপাশা দিয়ে আক্রমণ করে, তখন গরুড় পাখি রাম ও লক্ষ্মণের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। গরুড়কে দ্রুত অস্ত্রের ভেতরে থাকা বিষাক্ত সাপগুলোকে গ্রাস করার জন্য ডেকে আনা হয়েছিলো। আর এরপর মহাভারত বা কৃষ্ণাবতারের সময় গরুড় আবারো হাজির হয়, রাক্ষস রাজা নরকাসুরের সাথে কৃষ্ণের যুদ্ধে।'

মঠাধীশ হাসছেন। 'আমি মুগ্ধ হলাম, বিদ্যুৎ। এবার আমাকে সবশেষ উদাহরণটা দাও।'

'বাবা, এরপর আছেন মহান সন্ন্যাস-যোদ্ধা পরশুরাম। যাকে ধারণা করা হয় ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের একজন। রাম কর্তৃক ভগবান শিবের পিনাকা ধনুক ভাঙায় বিরক্ত হয়ে তিনি নিজেকে সীতার স্বয়ম্বরে (বিয়ে) উপস্থাপন করেছিলেন। পরে মহাভারতে তিনি তিনজন মহান যোদ্ধাকে যুদ্ধবিদ্যা শেখান–ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য আর কর্ণ।

'অসাধারণ!' বিস্মিত হলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। 'এবার আমাকে বলো বিদ্যুৎ, যে তিন নাম তুমি বললে, এদের মাঝে কী মিল খুঁজে পাও? হনুমান, গরুড় আর পরশুরামের মাঝে সাধারণ কোন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান?'

বিদ্যুতের আসলে কোনো ধারণাই ছিলো না। কয়েক মুহূর্ত ভেবেছে, কিন্তু ভগবান হনুমান, শক্তিশালী স্বর্গীয় পাখি গরুড় আর মন্দের কিংবদন্তি বিনাশকারী পরশুরামের মাঝে কোনো সংযোগ খুঁজে পেল না।

'দুঃখিত, বাবা, কিন্তু আমি এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মাঝে কোনো মিল দেখতে পাচ্ছি না। তারা প্রত্যেক বিবেচনাতেই খুব বেশি ব্যতিক্রম।'

'হ্যাঁ, তারা ব্যতিক্রম। তবে তাদের এমন এক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদেরকে একই শ্রেণিভুক্ত করেছে। আর তা হলো গতি। যদি তুমি মহাকাব্যগুলো ভালো করে মনে করে দেখো, বিদ্যুৎ, তারা প্রত্যেকেই মনের গতি বা চিন্তার গতির চেয়েও দ্রুত ভ্রমণের দক্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। হনুমান এমন বিদ্যুৎ গতিতে ভ্রমণ করেছিলেন যে তিনি লাফিয়ে উঠে সূর্যকে গিলে ফেলেছিলেন। গরুড়কে ভগবান বিষ্ণু বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, যার কারণ ছিলো গরুড়ের অতুলনীয় গতি। পরশুরাম এমন বর পেয়েছিলেন যা তাকে চিন্তাশক্তির গতিতে যেকোনো স্থানে ভ্রমণ আর গন্তব্যে পৌঁছানোর ক্ষমতা দিয়েছিলো।'

জ্ঞানী বৃদ্ধ লোকটি এইমাত্র যা ব্যাখ্যা করলেন তা পুরোপুরি বুঝে নিতে তার প্রপৌত্রকে খানিক সময় দিলেন। খানিক বিরতির পর তিনি আবার কথা শুরু করলেন। 'এখন, তোমার কি এটা আশ্চর্যজনক মনে হয় যে তিনটা চরিত্র, যারা যুগ যুগ ধরে টিকে আছে, প্রবাদ বলে, তারা আলোর গতিতে কিংবা হয়তো তার চেয়ে বেশি গতিতে ভ্রমণ করতে পারেন?'

'হায় ভগবান!' যেন কিছু একটা আবিষ্কারের খুশিতে লাফিয়ে উঠলো বিদ্যুৎ। 'আপনি বলতে চাইছেন, শত হাজার বছর ধরে তাদের তারুণ্য ধরে রাখা সম্ভব হয়েছিলো কেবল তাদের আলোর গতিতে ভ্রমণ করার কারণে? আর আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটির প্রয়োগ অনুসারে, কেউ যদি আলোর বেগের চেয়ে দ্রুত গতিতে ভ্রমণ করে, তাহলে সে স্থির অবস্থায় সময়ের গতি অনেক ধীর হিসেবে উপলব্ধি করবে?'

'ঠিক তাই, বিদ্যুৎ!' উত্তর দিলেন গোত্র প্রধান। 'কিন্তু আসল প্রশ্নটা হচ্ছে–যদি আইনস্টাইন বিংশ শতকে বাস করেন এবং থিওরি অব রিলেটিভিটির তত্ত্ব প্রদান করেন, তবে কীভাবে প্রাচীন ঋষিরা যারা হাজার বছর আগে মহাকাব্য আর ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এমন আধুনিক যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক ধারণা সম্পর্কে জানতেন? কীভাবে তারা জানতেন, কেবল যে সকল স্বর্গীয় সত্তা আলোর গতি অর্জন করতে পারে, তারাই যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকতে পারে?'

* * * * *

এতক্ষণে প্রপিতামহ আর প্রপৌত্রের জুটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে অনেকগুলো সূত্র, ইঙ্গিত আর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছে, যেগুলো এমন এক সমাজের ইঙ্গিত করে যা সম্ভবত বৈজ্ঞানিক দিক বিবেচনায় বর্তমান মানব জাতি থেকেও অনেক উন্নত ছিলো।

'টেলিস্কোপ আবিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত গ্রহ এবং নক্ষত্রের মাঝে পার্থক্য করা অসম্ভব ছিলো। তাহলে প্রাচীন লেখকরা কীভাবে নয় গ্রহ এবং সৌরজগতের নবগ্রহ নিয়ে জানলো? রামায়ণে লক্ষ্মণ আর্যাবর্তে বীরত্ব না থাকা নিয়ে রাজা জনকের বিলাপে বিরক্ত হয়েছিলেন, আর কীভাবে তিনি পৃথিবীকে একটা বলের মতো ছুঁড়ে ফেলতে পারেন তা বর্ণনা করেছিলেন?

'ভগবান বিষ্ণুর বিরাহ অবতার প্রলয়ের মাঝ থেকে পৃথিবীকে তার ধারক থেকে একটা গোলকের মতো করে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বলে বর্ণনা করা

হয়েছে। আমাদের পৃথিবী গোলাকার হওয়ার প্রথম লিখিত উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের গ্রিক বর্ণনায়। আনুমানিক ৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব নাগাদ পিথাগোরাস একে প্রতিষ্ঠিত করার পরেও ৩য় খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত এই ধারণা গ্রহণ করা হয়নি। তাহলে কীভাবে প্রাচীন ভারতীয়রা এর চেয়ে শত শত কিংবা হাজার বছর আগে মহাকাব্যে পৃথিবীকে একটা গোলক হিসেবে উপস্থাপন করে?' ভারতীয় পুরাণ থেকে প্রপিতামহের বিভিন্ন আশ্চর্য সূক্ষ্ম জিনিসগুলোর সাথে কথাটা যুক্ত করলো বিদ্যুৎ।

তিনি নিজে যা শেখাতে চাচ্ছেন সেটায় তার প্রিয় বিদ্যুৎকে গ্রহণ আর সংযুক্ত করতে দেখে দ্বারকা শাস্ত্রী খুশি হলেন। তিনি তার বইয়ের তাকের দিকে হেঁটে গিয়ে একটা ভলিউম বের করে আনলেন, যেটা দেখে মনে হয় ওটা যেন লক্ষ বছরের পুরোনো। মঠাধীশ তার প্রাগৈতিহাসিক দর্শন বই খুলে কিছু তথ্যসূত্রের জন্য পাতা উলটাতে শুরু করলেন।

'আয়ুর্বেদ বা প্রাচীন ভারতের জীবনসম্পর্কিত বিজ্ঞান তোমাকে আরো মুগ্ধ করবে বিদ্যুৎ। সুশ্রুত আর চরক নামের দুই প্রাচীন ঋষি আধুনিক ঔষধ আর সার্জারি নিয়ে বিশাল নথি লিখে রেখেছেন। যেসব মানুষের আণুবীক্ষণিক পর্যায়ে ওষুধের প্রভাব বুঝবার মতো প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রপাতি ছিলো না, তারা কীভাবে আধুনিক অপারেশন পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারে আর অসাধারণ কার্যকর প্রেসক্রিপশন দিতে পারে? সুশ্রুত সংহিতা ৭০০-র বেশি ঔষধি গাছের তালিকা করেছে। কিন্তু বড় আকারের টেস্টিং ল্যাবরেটরি কিংবা মৌলিক আণুবীক্ষণিক যন্ত্র ছাড়া কীভাবে তারা জানলো এই গাছগুলোর রোগ নিরাময়ের গুণ আছে? কীভাবে তারা সিজারিয়ান সেকশন, প্রোস্টেট গ্রন্থি অপসারণ, আধুনিক চেতনানাশক ছাড়াই প্রস্থেটিক সংযোগ...এমন সব জটিল সার্জারি করতে পারতো?'

'এটা সত্যি, বাবা। আর আপনি কি জানেন, ধর্মগ্রন্থে মহাপ্রাচীন অস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রের ধ্বংসের পরে যে ছবি আঁকা হয়েছিলো, তার সাথে হিরোশিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বিস্ফোরণে বেঁচে ফেরা মানুষের বর্ণনার অদ্ভুত মিল রয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমি ওটা পড়েছি, বিদ্যুৎ। আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের নিশ্চয়ই বিপুল পরিমাণ জ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিলো যা শতাব্দী পার হওয়ার সাথে সাথে কোথাও হারিয়ে গেছে। একটা তারা, যাকে এখন আন্তারেস বলা হয়, ওটা রাতের আকাশে ১৫তম উজ্জ্বল বস্তু। কিন্তু প্রাচীন লোকরা এটাকে জ্যেষ্ঠ বা বড় বা সর্ববৃহৎ নামে ডাকতো। কেন তারা এমনটা করবে, যদি-না তারা জানে

যেন আন্তারেস আসলেই রাতের আকাশের সবচেয়ে বড় তারা, যা কিনা আমাদের সূর্যের চেয়ে ৪০,০০০ গুণ বড়? হাবলের মতো বিশাল টেলিস্কোপ ছাড়া এমন জ্ঞান সম্ভব ছিলো না।'

* * * * *

গুণী এই বৃদ্ধ আর তার সুযোগ্য উত্তরসূরি মঠাধীশের বড় ঘরটায় এসে বসলো। তাদের দুজনেরই প্রাচীন জ্ঞানের সাথে গভীর আর রহস্যময় সংযোগ আছে, যা তারা এখন এক স্তর এক স্তর করে প্রকাশ করছে।

ইফিসাসের গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাস যেমন বলেছিলেন, মহাজগতে একমাত্র ধ্রুবক হলো পরিবর্তন। ভারত বা আর্যবর্তের গর্ব ছিলো যে একসময় তারা মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের চাবিকাঠি ধারণ করেছিলো। ধীরে ধীরে সময়ের সাপেক্ষে বিদেশি শক্তি আর নিজ সন্তানদের একাংশের যোগসাজশে তা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গেছে।

অনন্য ভারত সব সময়ই তার নিজের স্বজাতির দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছে। হোক তা আম্বিই, যে আলেকজান্ডারকে সুবিশাল উপমহাদেশের সীমান্তে নিয়ে এসেছিলো। বা জয়চাঁদ, যে রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজের সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলো। অথবা হোক পলাশীর প্রান্তরের মীর জাফর কিংবা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইলাহি বকশ। কিংবা ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত জমিদাররা। বা যারা আজও পশ্চিমাদের সাম্রাজ্যবাদী, দেশবিরোধী এজেন্ডা পরিচালনা করে। কথা হলো, এই অসাধারণ দেশ, অনন্ত জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু বারবার বেদনাদায়ক দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে।

হরপ্পা, খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

সন্তানের পর সন্তান, প্রজন্মের পর প্রজন্ম

ষষ্ঠ ঋষির চামড়ার মতো অবশিষ্ট দেহটাকে আগুনের দিকে লাথি মারলো। বরফের মতো ঠান্ডা আর শাস্তিমূলক শিলাবৃষ্টি অসুরদের মনোবলে ব্যাপক আঘাত করছিলো। এই অভিশাপ আর কেয়ামত আগমনের পূর্বাভাস তাদের ভেতর পর্যন্ত নাড়িয়ে দিলো, এমনকি তাদের রাজারও। কেবল তাদের পাগলাটে একগুঁয়েমি এই অনর্থক হত্যাকাণ্ড এখন পর্যন্ত চালিয়ে নিয়েছে। উঁচু পাহাড়টা অস্বস্তিকর গতিতে ধসে পড়ছে।

'থামো, সুরা! সরা মায়ের যন্ত্রণাদায়ক ভবিষ্যদ্বাণী তুমি শুনতে পাওনি?' পাঁচ আধ্যাত্মিক ঋষিকে গ্রাস করে নেওয়া নীল আগুনের দিকে ইশারা করে চিৎকার করে বললেন বিভাষণ পূজারি। 'অভিশাপের বেলায় তোমার কান কি বধির হয়ে ছিলো? এখন তুমি কী চাও, অসুর?'

সুরা যতটা ক্ষিপ্ত ছিলো, ঠিক ততটাই ছিলো রেগে। যেই মুহূর্ত থেকে তারা সপ্তর্ষিদের বাসস্থানে পা রেখেছে, তখন থেকে কোনো কিছুই তার পরিকল্পনা মতো হয়নি। অতিরিক্ত উচ্চাশা আর দ্রুত জয়ের গন্ধে পাগল হয়ে সে খুব দ্রুতই ঋষিদের নির্মূল করার মাধ্যমে সমগ্র আর্যাবর্ত আর তার বাইরেও নিজের অবিসংবাদিত শাসনের পথ প্রশস্ত করার আশা করেছিলো। কিন্তু রাতটা ভূতুড়ে এক রাতে বদলে গেল। সপ্তর্ষিদের ব্যাখ্যাতীত বয়স বৃদ্ধি আর ভয়ানকভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়া, তাদের মুমূর্ষু সাদা চোখ, শক্তিশালী নীল আগুন, স্নায়ুচাপে ফেলে দেওয়ার মতো তুষারঝড় আর এখন অভিশাপের ভয়!

তবে কি মহাবিশ্ব আমার চেনা পৃথিবীর সিংহাসনে আরোহণ নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে?

* * * * *

'পিছে যাও, হে অ-দেবতা!' চিৎকার করলো রাক্ষসরাজ। পাথুরে পথ ধরে সে বিভাষণ পূজারির দিকে হেঁটে গেল, উদ্দেশ্য নিজের অবাধ্যতা প্রকাশ করা। 'তুমি জানতে, তাই না?' অভিযোগের সুরে দেবতাকে জিজ্ঞেস করলো সে।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম, সুরা, এগুলো কেবল সপ্তর্ষিদের মরণশীল অবশিষ্টাংশ। তোমার কী মনে হয়, তাদের বয়স এমন ভয়ানকভাবে বেড়ে গেল কেন? কারণ তাদের অমর আত্মা চলে গেছে। তারা যোগ বিজ্ঞানের মহাগুরু। নিজেদের সিদ্ধি ব্যবহার করে বহু আগেই তারা শরীর ত্যাগ করে গেছে। এখন যখন আমরা কথাগুলো বলছি, তাদের আত্মা অন্য কোথাও আছে...আর আমার মনে হয় আমি জানি কোথায় আছে...' যুক্তি দিয়ে বলার চেষ্টা করছিলেন বিভাষণ পূজারি।

সূরা দেবতার বলা সবকটা শব্দ অগ্রাহ্য করলো।

'তুমি জানতে এসব মায়াবী অ-ঋষিরা আমাদের উপর কালোজাদু প্রয়োগ করতে পারে...' নিজেকেই বিড়বিড় করে শোনালো সে। তার চোখ তীক্ষ্ণ হচ্ছে আর ক্রমেই পাগলামি ফুটে উঠছে তাতে।

আচমকা সুরা তার অসুর দলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ার মতো করে কথা বলা শুরু করলো, এমনভাবে ঘোষণা দিলো যেন সে এখনই চারপাশের সবকিছু আর সবার সর্বোচ্চ অধিপতি।

'আমার সাহসী যোদ্ধারা, এই অন্ধকারের ছলনা যেন তোমাদের বোকা বানাতে না পারে! এই দুষ্ট অ-ঋষিরা মায়া তৈরির ওস্তাদ। যা কিছু ঘটছে তা এসব বুদ্ধিমান জাদুকরের সাজানো ছলচাতুরি ছাড়া আর কিছুই না!'

রাক্ষসরাজ তার বিশাল হাড় কাটার যন্ত্র বের করে ভয়ংকরভাবে আকাশের দিকে উঁচু করে ধরলো। চিৎকার করে বললো, 'শক্তিশালী অসুর রাজ্যের উত্থান!'

নিজেদের চিরায়ত বর্বরতা দিয়ে তার পাপাচারী সেনারা এর জবাব দিলো। তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের প্রাণঘাতী অস্ত্র উঁচিয়ে ধরেছে, সেই সাথে ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ করতে তাদের রাজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'শক্তিশালী অসুর রাজ্যের উত্থান!'

একসাথে কানে তালা লাগানো শব্দে স্লোগান দিচ্ছে ওরা।

* * * * *

সুরা তার রাজকীয় বাহিনীর নিষ্ঠুর কমান্ডারের দিকে তাকালো, যে সাথে সাথেই বুঝতে পারলো তার রক্তপিপাসু রাজা এখন কী চাইছে। সে বড় একটা বর্শা দিয়ে ষষ্ঠ ঋষির পিঠ চিরে ফেললো। আর তাকে এমনভাবে উঁচিয়ে ধরলো, যেমনটা ডেড গেমের পর শিকারিরা তাদের শিকারকে তুলে ধরে। আগুনে পুড়ে যাওয়ার আগে কুঁজো সেই ঋষি একবার মাত্র যন্ত্রণায় আহ করতে পারলেন। এখনো বর্শার সাথে ঝুলে আছেন, যেন মাংসের একটা টুকরো পোড়ানো হচ্ছে। এখনো তিনি জীবিত।

কমান্ডার আর তার বর্বর পঞ্চাশ সেনা বুনো অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো।

সরস্বতীর পাঁচ সন্তানের মতো পুড়তে থাকা ষষ্ঠ ঋষি এবার নীল আগুনের মাঝ থেকে কথা বলতে শুরু করলেন।

'তুমি নিছক কথা দিয়ে এই কসাইদের থামাবার দুর্বল চেষ্টা করেছিলে, হে দেবতা! আর তাও এমন সময়ে যখন দেবতারা তোমাকে শক্তিশালী মহাজাগতিক অস্ত্রের অধিকারী হিসেবে মঞ্জুর করেছেন! এমন সময়ে যখন তুমি রত্ন-মরু ধারণ করেছ। তবে তাই হোক।

'ঠিক যেভাবে এই দুর্ভাগ্যজনক রাতে একের পর এক আধ্যাত্মিক ঋষিকে পুড়তে দেখেছ, ভাগ্য এমন হিংস্রভাবে সন্তানের পর সন্তান আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তোমার বংশকে ধ্বংস হতে দেখবে। আমি তোমাকে আর তোমার সমগ্র রক্তধারাকে অভিশাপ দিলাম, হে পদচ্যুত দেবতা...

'তোমার বংশের প্রতিটা ছেলেই মারা যাবে আজ রাতে যেমন দেখলে ঠিক তেমন হিংস্র আর ভয়ংকর উপায়ে! আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম! সেই সাথে তোমার পুরো বংশকে! আর এই অভিশাপ আজীবন চলতেই থাকবে।'

ঠিক আগের মতোই বিভাষণ পূজারি নড়লেন না। তবে তিনি কষ্টে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

ত্রিকালদর্শী সপ্তর্ষিরা কেন সত্যটা জানেন না?

তিনি হাত জড়ো করলেন, লজ্জিত আর বিচলিত হয়ে জ্বলন্ত ঋষির অস্পষ্ট অবয়বের দিকে আত্মসমর্পণ করলেন।

'আমি আপনার অভিশাপ গ্রহণ করছি, ঠিক যেভাবে সব সময় আপনার আশীর্বাদ গ্রহণ করে এসেছি। আমার একটা সহিংস আর অসহনীয় পরিণতি প্রাপ্য। কিন্তু আপনি হয়তো ভুলে গেছেন, হে মহান ঋষি...আমার কোনো বংশধারা থাকবে না। আমার একমাত্র সন্তান, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান...আমার মানু, এরই মাঝে মারা গেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক মুহূর্তের জন্য থামলেন তিনি। কান্না আর দুঃখ হজম করলেন।

'আর হ্যাঁ, হয়তো সে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুই পেয়েছে...আপনার অভিশাপ সত্য, হে ঋষি...আমার মানু বিকৃত হয়ে আর বিষপ্রয়োগে মারা গেছে!'

ষষ্ঠ ঋষি ধীরে ধীরে ছাইয়ের সাথে মিশে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো কথা বললেন...এবার তাতে ক্রোধের চেয়ে করুণাই মিশে ছিলো বেশি।

'তুমি সত্যিই অন্ধ হয়ে গেছ, বিভাষণ। একজন সর্বোচ্চ মানুষ যে কিনা অন্য মানুষের আত্মা কিংবা সময়ের পরিক্রমার দিকে তাকাতে পারতো, সে আজ নিজের সন্তানের ব্যাপারে উদাসীন।

'তোমার ছেলে বেঁচে আছে, হে কলঙ্কিত সূর্য! আর মহাপ্লাবন সরে গেলে সে-ই হবে প্রথম ব্যক্তি যে সকালের আলো দেখবে। মানু পূজারি...সে হবে সমগ্র সৃষ্টির রক্ষক! আর পরিচিত এবং অমর হয়ে থাকবে সত্যব্রত মানু হিসেবে...চিরন্তন সত্যের অভিভাবক হিসেবে!

'আমরা তোমাকে করুণা করি। কারণ তুমি দুর্ভাগা এক পিতা। তুমি কলুষিত এক অর্ধ-ঈশ্বর!'

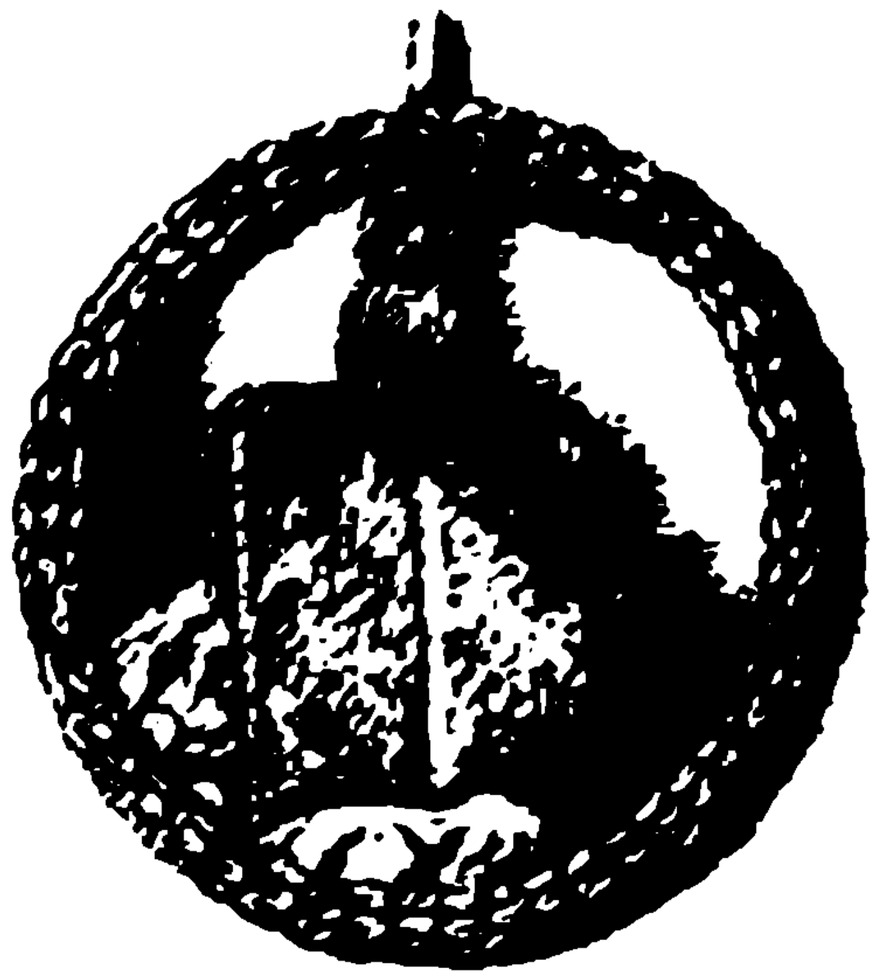

বানারস, ২০১৭

অন্ধকার ভ্রাতৃসংঘ—পর্ব ৩

মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনই প্রথমবারের মতো জনসম্মুখে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, বললেন দ্বারকা শাস্ত্রী। 'যদিও এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে স্থাপিত লিগ অব নেশনসের সূত্র ধরে বলা হয়েছিলো। তবে অনেকেরই বিশ্বাস, সেদিনই এই অর্ডার ধীরে ধীরে নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করে আর এক-বৈশ্বিক সরকার ব্যবস্থার দর্শন প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়।'

'বাবা, আর বেশি আগাবার আগে জিজ্ঞেস করি, নাইটস টেম্পলারদের সময় থেকে এই অর্ডারের যাত্রাপথ কেমন ছিলো, সেটা দয়া করে বলতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ।

মাথা নাড়লেন মঠাধীশ। বড় আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পুরো এক মিনিট ব্যয় করলেন চিন্তাগুলো সব জড়ো করতে।

'নাইটস টেম্পলাররা এমনই দর্শনীয় সম্পদের অধিকারী ছিলো যে বলা হতো তারা পুরো সাইপ্রাস দ্বীপের মালিক ছিলো। তাদের অস্ত্র আর যুদ্ধের উপকরণ সময়ের সবচেয়ে দামি অর্থের মাধ্যমে কেনা সম্ভব ছিলো। আর যেন তাদের এই সামরিক শক্তি যথেষ্ট ছিলো না, তাই নাইটস টেম্পলারদের সকল আইনের উর্ধ্বে বলে ঘোষণা করা হয়। আর এই ডিক্রি জারি করেছিলেন পোপ দ্বিতীয় ইনোসেন্ট।'

'এর মানে কী, বাবা? সকল আইনের উর্ধ্বে?'

'সহজে বললে এর অর্থ হলো, টেম্পলারদের কোনো আঞ্চলিক আইন মানার দরকার ছিলো না। রাজ্যগুলোর মাঝে তারা অবিরাম, কোনো প্রশ্ন ছাড়াই যাতায়াত করতে পারতো, কোনো ট্যাক্স দিতে হতো না আর ইচ্ছা হলেই খুন করতে পারতো।'

'তার মানে, নাইটস টেম্পলারদের বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ভ্রাতৃসংঘ হিসেবে পরিণত করার ক্ষেত্রে রাজা আর চার্চের একটা যৌথ প্রচেষ্টা ছিলো।'

'ঠিক তাই। তবে টেম্পলারদের উত্থান ঠিক ততটাই নাটকীয় ছিলো, যতটা বেদনাদায়ক ছিলো তাদের শেষটা। ১৩০৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ ফিলিপ শখানেক টেম্পলারদের আটক, নির্যাতন এবং হত্যার আদেশ প্রদান করেন। ধর্মদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগে ব্যাপকভাবে আঘাত হানা হয়, অমানুষিক নির্যাতন দ্বারা আদায় করা হয় স্বীকারোক্তি আর দ্রুতই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। একটা ভ্রাতৃসংঘ, যেটা ইউরোপ আর মধ্যপ্রাচ্যে শত শত বছর ধরে আধিপত্য ধরে রেখেছিলো, তাদের কয়েক দিনের ব্যবধানে নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়...'

'ওয়াও...নিশ্চিতভাবেই বেশ নাটকীয় বলা চলে! আর নোংরাও বটে। জানতে চাইছি, কেন ফ্রাইডে দ্য থার্টিনকে আজো কিছু মানুষ অশুভ মনে করে?'

'লোকে বলে, রাজা ফিলিপ নাইটস টেম্পলারদের কাছে অর্থের দিক দিয়ে এত পরিমাণ ঋণী ছিলেন যে তিনি সামান্য কিছু অভিযোগকে নাইটস টেম্পলারদের সংক্ষেপে ধ্বংস করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। আর একই সাথে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধের কারণে যে পাহাড় পরিমাণ ঋণ জমা হয়েছিলো সেটাও নির্মূল হয়ে যায়। কিন্তু আরো ঘটনা আছে। আরো একবার এতে চার্চ গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে, আর অভিযোগগুলো ছিলো সম্পূর্ণ ধর্মীয়। তাই এবার রাজা এবং যাজকরা একত্রে ভ্রাতৃসংঘের উপর এমন অভিযোগ আনেন, যারা কিনা শত শত বছর খ্রিষ্টান ধর্মকে রক্ষা করেছে। অভিযোগটা হলো, ধর্মকে অপবিত্রকরণ। স্পষ্টতই, একসময় টেম্পলাররা ছিলো সম্পদের মতো। তারপর বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বা আন্ডারগ্রাউন্ড সোসাইটির মাস্টারপ্ল্যানে কিছু একটা পরিবর্তন আসে আর টেম্পলাররা পরিণত হয় একটা দায়বদ্ধতায়। খেলায় দুই পক্ষই ছিলো আসলে একই। যারা কলকাঠি নেড়ে টেম্পলারদের তৈরি আর প্রশ্রয় দিয়েছিলো, তারাই নিজেদের কাজের শেষে একটা নিখুঁত আঘাতে টেম্পলারদের ধ্বংস করে দেয়।'

'কিন্তু বাবা, আপনার কী মনে হয়? এই নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে কারণ কী ছিলো?'

'নিশ্চিতভাবে কেই বা বলতে পারবে, বিদ্যুৎ? যেমনটা আমি ব্যাখ্যা করলাম, এই গোপন ভ্রাতৃসংঘের শত শত বছর ধরে বিকৃত একটা বৈশ্বিক নীলনকশা রয়েছে। বিশ্বের কোনো এক প্রান্তের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটা ছোট পরিবর্তন তাদের মূল পরিকল্পনার বড় সংস্কারের সূত্রপাত ঘটায়, যেন তাদের পরিকল্পনায় লেগে থাকা যায়। তুমি কি এটা জানো, নাইটস টেম্পলারদের এমনকি আত্মসমর্পণ করারও অনুমতি দেওয়া হয়নি? কোনো বিচারকাজও হয়নি। কোনো গণশুনানিও না। যে দ্রুততার সাথে পুরো অদ্ধিকরণ করা হয়েছিলো, তা কেবল একটা বাস্তবতাকেই ইঙ্গিত করে–টেম্পলাররা এমন কিছু জানতো যা গোপন সংঘগুলো চায়নি প্রকাশ হোক।'

* * * * *

'তাহলে নাইটস টেম্পলারদের বিনাশ হওয়ার পর গোপন ভ্রাতৃসংঘের কী হলো, বাবা?'

'ঠিক এক ভয়ংকর পৌরাণিক দানবের মতোই গোপন সমাজের সবচেয়ে ক্ষমতাধর পুরুষ এবং নারীরা খোলস পরিবর্তন করতেন, পরিচয় পরিবর্তন করে প্রভাব বাড়াতেন। তারা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কিছু ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়, প্রতিষ্ঠা করে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। তারা বিশ্ব অর্থনীতি আর সেই সাথে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তার সবকিছুরই নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করলো–ফার্মাসিউটিক্যালস, তেল, শেয়ার বাজার, অস্ত্র, প্রযুক্তি আর রাজনীতি।

'তাদের বিকৃত নকশা পুরো বিশ্বে উন্মুক্ত হতে শুরু করে। দশকের পর দশক আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা বিপ্লব আর নাগরিক অসন্তোষে বিনিয়োগ করে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় কিছু যুদ্ধ হয়েছিলো যেখানে দুই পক্ষই বিনিয়োগ আর উসকানি পেয়েছিলো গোপন সংঘের দ্বারা। মানুষের জীবন তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই না। তারা বিশ্বাস করে, তারা একটি প্রভাবশালী জাতি যারা বাকি মানব জাতিকে শাসন করার দায়িত্ব পেয়েছে।'

বিদ্যুৎ প্রচণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো। সে এই রহস্যময় আর ভয়াবহ শক্তি সম্পর্কে প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা তথ্য আর প্রতিটা সূক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করতে চায়। একটা ধীর উপলব্ধি তার মাঝে ঢুকে পড়েছে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে থামাতে হবে।

* * * * *

'অন্য আর কী কী অবস্থা আর পরিচয় দিয়ে এই সংঘ নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিলো, বাবা? আপনি বলেছিলেন তারা সব সময়ই বাইরের খোলস পরিবর্তন করে।'

'হ্যাঁ, বিদ্যুৎ। নাইটস টেম্পলারের পর এই দলের সবচেয়ে শক্তিশালী রূপ ছিলো ইলুমিনাতি।'

ইলুমিনাতি...আমি এদের নিয়ে শুনেছি।

'আর ইলুমিনাতিই একমাত্র ছিলো না–আরো কিছু ছিলো। রোসিক্রুসিয়ান গ্রুপ, দ্য স্কাল এন্ড বোনস সোসাইটি, ফ্রিম্যাসনস...নামগুলো দেওয়া হয়েছিলো ভ্রাতৃসংঘের প্রধান ব্যক্তিদের নামকরণের জন্যে।'

দ্বারকা শাস্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো তিনি ক্লান্ত।

'আমি তোমাকে এগুলো নিয়ে অন্য কোনো এক সময় বলবো, বিদ্যুৎ,' বললেন তিনি। 'তাতে অনেক শক্তির দরকার হবে।'

বিদ্যুৎ বুঝতে পারলো। নিজের প্রপিতামহকে এতখানি তাগাদা দেওয়ার জন্য ধিক্কার দিলো নিজেকে। তার মনে পড়লো, দ্বারকা শাস্ত্রী মাত্রই মারাত্মক অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়েছেন।

'অবশ্যই, বাবা। কেবল শেষ একটা প্রশ্ন...আবার,' জোর করলো সে।

দ্বারকা শাস্ত্রী হেসে মাথা নাড়লেন। বিদ্যুৎকে তার মনে আসা প্রশ্ন করার অনুমতি দিলেন।

'যদি এই সংঘ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধগুলোকে প্রভাবিত করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, যদি তারা বৈশ্বিক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, যদি এর প্রেসিডেন্ট আর বিলিয়নিয়াররা এর সদস্য হিসেবে থাকেন, তাহলে তারা কীভাবে আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে? কেন তারা আমার মতো নগণ্য মানুষকে খুন করতে চায়? যদি তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কিংবা ভবিষ্যতে নিজেদের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের আশায় প্রস্তুত থাকে, তাহলে আমরা তাদের জন্য এমন কী?'

'এখানে প্রশ্ন একটা নয়, বিদ্যুৎ। অনেকগুলো প্রশ্ন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতেও সময় লাগবে। আপাতত এটা জেনে রাখো–এই গ্রহে ধর্মতত্ত্বের প্রভাব বোঝার বেলায় এসব ব্যতিক্রমী আর ভুলপথে যাওয়া প্রতিভাবানদের খুব গভীর আর জটিল প্রকৃতির ভুল ধারণা রয়েছে। তারা প্রাচীন রহস্যগুলো নিয়ে

গোপনীয়তা বজায় রাখে আর অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো তারাও জানে, একটা কেন্দ্রীয় সংযোগ ব্যবস্থা আমাদের বিশ্বকে একটা সর্বোচ্চ শক্তির সাথে সংযুক্ত করে রেখেছে যা পুরো মহাবিশ্বকে শাসন করে। যেমনটা আমি আগে বলেছি, ওরা আমাদের ভয় পায় না। কালো মন্দিরে যা লুকিয়ে আছে, তারা সেটাকে ভয় পায়।'

মঠাধীশ বিদ্যুতের মুখে হালকা বিরক্তির ভাব লক্ষ করলেন। কালো মন্দিরের গোপন কথা এখনো বিদ্যুৎকে জানানো হয়নি, আর এই প্রসঙ্গ উঠিয়ে আনাও ঠিক হয়নি। কিন্তু এখনো সময় আসেনি। গ্রপৌত্রকে শান্ত করার জন্য দ্বারকা শাস্ত্রী এই মুহূর্তে আরেকটা অতিরিক্ত তথ্য জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

'বিদ্যুৎ, একটা প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী তোমাকে কালো মন্দিরের সাথে সংযুক্ত করে রেখেছে। শতাব্দী ধরে সেখানে যে গোপন তথ্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা মানব জাতির সবচেয়ে বেশি মূলবান। এটা এমন কিছু যা সবাই জেনেছে, কিন্তু সত্যিই ঘটবে বলে কেউ আশা করে না। তবে এটা ঘটবে। আর অর্ডারের অধিপতিরা এটা জানে। যদি ওরা তোমাকে হত্যা করে, তারা ভবিষ্যৎ বদলাতে পারবে।'

হরপ্পা, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
মহেঞ্জোদারোর শেষ রাজকুমারী

[illegible] তার বড় আকারের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের অঝোর বৃষ্টি [illegible] তরফের রাতের দিকে তাকিয়ে আছে। তার বড় বড়, সুন্দর চোখজোড়া হতাশা [illegible] অপরাধবোধ আর ভয়ের মিশ্রণে ভিজে আছে। যখন থেকে সূর্য যন্ত্রণা ভোগ [illegible] কিংবা অত্যাচারিত হচ্ছিলেন, যখন থেকে হরপ্পার মাটি সানজানার [illegible] হয়েছিলো, যখন থেকে এক যুবক সন্তানকে বিষাক্ত তীর দ্বারা [illegible] নিজ করা হয়েছিলো, তখন থেকেই ক্রোধে কাঁপছিলো [illegible] [illegible]

বজ্রপাত হয়েছে, সে কল্পনা করছে তার মুখ বিশ্রী ডাকিনীর মতো বিকৃত হয়ে গেছে। তার নিজস্ব এই বিভ্রম, সে নিজেকে কীভাবে উপলব্ধি করছে তার প্রতিফলন ব্যতীত আর কিছুই না।

আমি এমনই হয়ে উঠেছি, একজন ডাকিনী।

অসুররা ইট-তামার পাহাড় দখলে নেওয়ার খবর তার কানে এসে পৌঁছেছে। সে জানতো, ভূতের মতো দেবতা তাদের আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। রক্তের বৃষ্টিতে কী হয়েছিলো তার বিশদ বর্ণনাও পেয়েছে সে।

আমি আমার পাপের জন্য শাস্তি পাচ্ছি। আমার মহান স্বামী আমার অভিশপ্ত ভাগ্যের ফল ভোগ করবে। হরপ্পার জনগণ আমার অপকর্মের জন্য ধ্বংস হয়ে পড়বে। যে রাজ্যের জন্য আমি এত ব্যাকুল, তা এই প্রবাহে ভেসে যাবে।

আমি হবো হরপ্পার শেষ হতভাগা রানী। আমি হবো মহেঞ্জোদারোর শেষ রাজকন্যা।

'আমাকে স্পর্শ করবে না!' তার স্বামী পন্ডিত চন্দ্রধর তাকে জানালা থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করতেই প্রতিক্রিয়া দেখালো সে। ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে সে, ঠান্ডা বাতাস এমনভাবে সহ্য করে নিচ্ছে যেন তার কোনো অস্তিত্বই নেই। লম্বা, রেশম-কোমল চুল ভিজে গিয়ে সোজা তার সরু কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার হাত ক্রমাগত কাঁপছে।

'চলে এসো, প্রিয়ংবদা। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। বাইরে কিছুই নেই...' বললো চন্দ্রধর।

সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো, যেন চন্দ্রধর যা বলেছে তা সে শুনতেই পায়নি। এরপর ধীরে ধীরে স্বামীর দিকে তাকানোর জন্য ঘুরলো।

'সে আমাদের জন্য আসবে, তাই না? আমি শুনেছি সে প্রেতাত্মায় পরিণত হয়েছে। বিভাষণ পূজারি আমাদের দুজনকে হত্যা করতে আসবে...'

চন্দ্রধর তার মৃত্যুভয়ের সাথে যুদ্ধ করতে দাঁতে দাঁত চেপে রাখলো। প্রিয়ংবদা ঠিকই বলেছে।

'সে আসবে না, প্রিয়। তার এক চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। গুরুতর আহত সে। আর আমাদের বাড়ি পাঁচশো সৈন্য দ্বারা পাহারা দেওয়া হচ্ছে।'

প্রিয়ংবদা বাঁকা হাসি হাসলো, তারপরেই ফেটে পড়লো ভয়ানক হাসিতে। সুন্দরী অথচ পাগল ডাইনির মতো করে বেশ অনেকটা সময় ধরে হেসে গেল

সে। কয়েক সেকেন্ড পরপরই কানফাটানো বজ্রপাতের শব্দের নিচে তার হাসি. চাপা পড়ে যাচ্ছিলো আর বজ্রপাতের চোখধাঁধানো আলোর মাঝে তাকে মাথা পেছনে হেলিয়ে হাসতে থাকা ভূতুড়ে অবয়বের মতো লাগছিলো।

'তুমি জানো আমরা দুজনেই এবার শেষ, পণ্ডিত চন্দ্রধর! তুমি জানো, সে এক নিমেষে এসব সেনাদের ভেদ করে বেরিয়ে যাবে। আমরা দুজন এরই মাঝে মারা গেছি, চন্দ্রধর!' পাগলাটে হাসির মাঝেই চিৎকার করে বললো সে।

চন্দ্রধর জানতেন প্রিয়ংবদা ভুল বলেননি। তার সেনাবাহিনীর কোনো সদস্যই বিভাষণকে থামাতে পারবে না।

কেবল একজন বাদে।

স্বয়ং চন্দ্রধর।

সে বুঝতে পারলো দেবতার সাথে কোনোভাবেই পেরে উঠবে না। সে জানতো যে কেবল তাকে ততক্ষণই আটকে রাখতে পারবে, যতক্ষণে প্রিয়ংবদাকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। এই পুরো পৃথিবীতে তার এখন কেবল প্রিয়তমা স্ত্রীই আছে।

পণ্ডিত চন্দ্রধর যা জানতেন না তা হলো, বিভাষণ পূজারি কেবল তার রানি আর তার জন্যেই আসছেন না। গ্রেট বাথে যখন তাকে নির্যাতন করা হচ্ছিলো, তখন যে রক্তশীতল চিৎকার দিয়েছিলেন, তা সত্যে পরিণত করতে তিনি হরপ্পার সকল পুরুষ, নারী, শিশু, পশু, পাখি আর পোকামাকড়কে হত্যা করতে এগিয়ে আসছেন।

আর এটা কোনো ঢাল-তলোয়ারের যুদ্ধ না।

বানারস, ২০১৭
'বিজাত মৃতদের জাগিয়ে তুলবে'

একদিন পর বলভান্ত আর বিদ্যুৎ অধ্যাপক ত্রিপাঠিকে তাদের সাথে দেব-রাক্ষস মঠে আসার জন্য রাজি করাতে সক্ষম হলো। যদিও প্রথম দিকে অধ্যাপক ত্রিপাঠি প্রতিবাদ করেছিলেন, তবে দ্বারকা শাস্ত্রীর সাথে দেখা করার বিরল সুযোগ তাকে রাজি করানোর জন্য যথেষ্ট ছিলো।

যেকোনো তান্ত্রিক, যে নিজের কাজে কিছুটা দক্ষ, সে কখনোই এই সুযোগ হাতছাড়া করবে না। শুধু দ্বারকা শাস্ত্রীর উপস্থিতিই ছিলো একপ্রকারের সাধনা। মঠাধীশের আভাই একজন যোগীর অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্রুত কয়েকগুণ বৃদ্ধির জন্য, কিংবা একজন তান্ত্রিক বা নাগা সাধু এমনকি একজন অঘোরীর আধ্যাত্মিক কমণ্ডলকে পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট।

মহান গোত্রপতির পায়ে লুটিয়ে পড়লেন প্রভাত ত্রিপাঠি। অস্বাভাবিক স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ মঠাধীশ প্রফেসরকে প্রণাম থেকে তুলে নিয়ে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন। বিদ্যুৎ এমন দুজন মানুষকে দেখতে পেল যারা একে অন্যকে ভালোবাসতো আর সম্মান করতো। অধ্যাপক এমন আচরণ করছেন যেন মন্দিরে কোনো ভক্ত তার দেবতার মুখোমুখি হয়েছে।

* * * * *

'আমি ওদের এর বিপক্ষে উপদেশ দিয়েছি, গুরুজি,' বিএইচইউ থেকে আসা শিক্ষাবিদ বললেন।

দ্বারকা শাস্ত্রী মাথা নড়লেন, একই সাথে ন্যায়নাকে ইশারা দিলেন অধ্যাপক ত্রিপাঠিকে আরো কিছু চিড়া-মটর পরিবেশন করার জন্য।

'তাহলে তুমি কী পরামর্শ দিচ্ছো, ব্রহ্মানন্দ?' জানতে চাইলেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

বিদ্যুৎ, ন্যায়না আর সনু একে অন্যের দিকে তাকালো। মঠাধীশ এইমাত্র অধ্যাপক ত্রিপাঠিকে যে নামে ডেকেছে সেটার আগামাথা তাদের কেউই বুঝতে পারছে না। বিষয়টা আরো জটিল করতেই হয়তো অধ্যাপক চোখের পলকও ফেললেন না। আর এমনভাবে প্রতিক্রিয়া দেখালেন যেন কোনো কিছুই হঠাৎ করে আসেনি।

'গুরুজি, ত্রিজাতকে আপনার চেয়ে বেশি চেনার দাবি আর কেই বা করতে পারে। আপনি জানেন সে যেকোনো কিছুই করতে পারে। তাছাড়া, অতীতে আমি কখনো জানতাম না বা কল্পনাও করিনি যে আপনার উপস্থিতিতেই সে দেব-রাক্ষস মঠে প্রবেশ করার সাহস রাখে। আর ভয়ংকর, প্রথামাফিক শিরশ্ছেদ তো পরের কথা! স্পষ্টতই তাকে কেউ সমর্থন জোগাচ্ছে। কেউ একজন যে এমনই বর্ণনাতীত শক্তিশালী যে মশান-রাজ এমনকি আপনার মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবছে। এটা স্বাভাবিক না, গুরুজি। এখানে কিছু একটা নিশ্চয়ই গড়বড় আছে।'

যা কিছু বলা হচ্ছে বিদ্যুৎ সেই প্রতিটা কথা, প্রতিটা বক্তব্য খেয়াল করছিলো।

গুরুজি, ত্রিজাতকে আপনার চেয়ে বেশি চেনার দাবি আর কেই বা করতে পারে?

কী ছিলো ওটা? কেন বাবা ত্রিজাতকে আর সবার চেয়ে ভালোভাবে জানবেন?

প্রথামাফিক শিরশ্ছেদ?

ব্রহ্মানন্দ?

* * * * *

'একটা দুর্বল জায়গা থাকতেই হবে, ত্রিপাঠিজি,' জানতে চাইলো বলভান্ত। 'সব সময়ই থাকে। আপনাকে কেবল আমাদের সেদিকে নিয়ে যেতে হবে। বাকিটা আমরাই করবো। আমরা পিশাচদের দুর্গে তাণ্ডব চালাবো!'

বিদ্যুৎ খেয়াল করলো, একসময়ের অঘোরী তান্ত্রিক এই ভদ্র অধ্যাপক এতসব প্রশ্নের কারণে স্পষ্টতই চাপের মাঝে রয়েছেন। সে এই এক চোখের ভদ্রলোকের জন্য কথোপকথন কিছুটা সহজ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একই সাথে সে তার প্রপিতামহের সাথে যুক্ত রহস্য নিয়েও একটু সতর্ক ছিলো। এই প্রাচীন মঠের প্রতিটি কানাগলি আর দূরসম্পর্ক পর্যন্ত জড়িত প্রতিটা

মানুষের পেছনে লুকিয়ে থাকা সব রহস্য আর গোপনীয়তা উন্মোচন করতে তার আরো কত সময় লাগবে?

'ত্রিপাঠিজি, আপনি টিকে (ত্রিজাত কাপালিক) থেকে আলাদা হয়ে গেছিলেন কেন?'

অধ্যাপকের মুখ ঘৃণায় ভরে উঠলো, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়াই তিনি দেখালেন না। রৌদ্রোজ্জ্বল বারান্দায় ছিলো আনন্দময় নীরবতা। গোত্র প্রধানের আঙ্গিনায় বসে থাকা অর্ধেক মানুষ বুঝতেই পারেনি বিদ্যুৎ এইমাত্র কী জিজ্ঞেস করলো। ঐ অর্ধেক এও বিশ্বাস করতে পারেনি যে ত্রিজাত কাপালিকের মতো ভয়ংকর একজনের জন্য বিদ্যুৎ এমন সাদামাটা আর প্রায় হাস্যকর সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করছে।

কেউই জানতো না, রাগে বিদ্যুতের বুকে প্রতিহিংসার আদিম আগুন জ্বলছে এই মুহূর্তে। শুধু দ্বারকা শাস্ত্রী জানতেন।

আর জানতেন ব্রহ্মানন্দ।

* * * * *

গোত্র প্রধানের অনিচ্ছাকৃতভাবে দেওয়া অনুমতি নিয়েই অধ্যাপক দুই গ্লাস ভাং সাবাড় করে দিলেন। আর তারপর যেন লাইব্রেরির খোলা বইয়ের মতো করে নিজের মনের দরজাটাও খুলে দিলেন তিনি।

দেব-রাক্ষস মঠের গোত্র প্রধানের মতো একজন হয়েও দ্বারকা শাস্ত্রী সাধারণ বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে ছিলেন। মারিজুয়ানা, ক্যানাবিস বা অ্যালকোহলের মতো পার্থিব আনন্দকে তিনি ন্যূনতম গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যেকোনো দক্ষ যোগীর আত্মা এ সকল ক্ষণস্থায়ী পদার্থের উর্ধ্বে। একজন সত্যিকারের সাধক সর্বদাই আনন্দময় অবস্থায় বিরাজ করেন।

'তুমি জানো, ত্রিজাতের যজ্ঞশালা একটা প্রাচীন শ্মশানের উপর নির্মাণ করে হয়েছে? এই প্রাগৈতিহাসিক মূল্যবান শহরের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বড় আকারের যুদ্ধগুলো হয়, তার কারণে যে বিশাল দাহ এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মাঠ তৈরি করা হয়েছিলো সেখানেই এর অবস্থান। এটা বেশ অদ্ভুত, অজাতশত্রুর মতো প্রাচীন ভারতীয় রাজা থেকে শুরু করে কুতুবুদ্দিন আইবেক কিংবা রাজিয়া সুলতানার মতো মধ্যযুগীয় সম্রাজ্ঞীর প্রত্যেকেরই বানারস শহরের সাথে ব্যাখ্যাতীত সখ্যতা ছিলো। কেউ কেউ একে রক্ষা করতে আর প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। অন্যরা চেয়েছিলেন একে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে।'

এই শহরের ব্যাপারে এমন কী আছে?

'যাই হোক,' অধ্যাপক তার কথা চালিয়ে গেলেন, 'যে কারণে ত্রিজাত এই জায়গা বেছে নেয় তার কারণ এটা পিশাচ আর ডাকিনীদের রাগী আত্মায় ভরতি। এরা তারাই যারা যুদ্ধগুলোয় অকালে আর প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করে মারা গেছিলো। সে তাদের ডেকে আনে আর অন্ধকার জগত থেকে তাদের মাধ্যমে অসীম কালো শক্তি সংগ্রহ করে। তাই আপনারা যখন তার আস্তানায় আক্রমণ করার কথা ভাবছেন, তখন মনে রাখবেন এটা কেবল মানুষের মাঝে লড়াইয়ের চেয়ে অনেক বেশি কিছু হবে। ত্রিজাত মৃতদের জাগিয়ে তুলবে!'

বিদ্যুৎ আর তার অনুসারীরা সবাই শান্ত হয়ে আছে। প্রায় একই সময়ে তারা সকলেই একজন মানুষের দিকে তাকালো, যে কোনো প্রকার সন্দেহ ছাড়াই এই পৃথিবীতে প্রাচীন জাদুবিদ্যার অধিপতি। পৃথিবীর একজন মানুষ যে কিনা স্বয়ং ব্রহ্মা রাক্ষসকে নিজের মাঝে ডেকে আনতে পারে। যে অসামান্য যোগী শত শত পবিত্র মানুষকে আঁধারের বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য ইশারা করতে পারেন।

একমাত্র পরম-তান্ত্রিক, যে কিনা মহাতান্ত্রিক ত্রিজাত কাপালিককে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

তারা প্রত্যেকেই মহান বৃদ্ধের দিকে তাকালেন।

দ্বারকা শাস্ত্রী।

মঠাধীশ তার চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন। গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তিনি। একজন দক্ষ যোগী যেকোনো অবস্থায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় চলে যেতে পারেন। নিজেই তান্ত্রিক-বিদ্যার একজন বিজ্ঞ চর্চাকারী হিসেবে বিদ্যুৎ দেখতে পেল তার প্রপিতামহ কী করার চেষ্টা করছেন।

তিনি মনে মনে গ্রহ এবং নক্ষত্রগুলোর অবস্থান দেখে নিচ্ছেন। আক্রমণ করার জন্য বেছে নিচ্ছেন উপযুক্ত সময়।

'আমি এটা নিয়ে বেদে পড়েছি, হে মৎস্য। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, প্রাচীন সাতপথ ব্রাহ্মণে,' বললো মানু।

'আর তোমার এখনো মনে হয় প্রলয় নিছকই একটা তাত্ত্বিক ধারণা, তাই না, সত্যব্রত?' জানতে চাইলেন মৎস্য।

হঠাৎ করে মৎস্যর দেওয়া এই নতুন নামে কিছুটা বিরক্ত হলো মানু।

'মৎস্য, আমার বন্ধু, আমার ভাই, আমার পরামর্শদাতা...এই অন্ধকার রাতে কয়েক ঘণ্টা আগের নীল বজ্রপাতের পর থেকে আপনি আমাকে সত্যব্রত বলে সম্বোধন করছেন কেন?'

মৎস্য গভীরভাবে মানুর চোখের দিকে তাকালেন।

কারণ অভিশাপ বর্ণনা করা হয়ে গেছে। নীল আগুনের ভেতর থেকে ষষ্ঠ সপ্তর্ষি কথা বলেছেন। বিধির বিধান, মানে অত্যাবশ্যকীয় নিয়তি লেখা হয়ে গেছে। তবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ না, মানু। তোমার কী মনে হয়, প্রলয় শুধুই একটা পৌরাণিক কাহিনি?'

'অবশ্যই না, মৎস্য। সাতপথ ব্রাহ্মণের মতো একটা বেদ কী করে ভুল হতে পারে?'

* * * * *

তারা যখন মানুকে দেখতে পেল, সে স্থির দাঁড়িয়ে রইলো। এখন পর্যন্ত সে যুদ্ধের ভারী পোশাক পরে আছে। তার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে এখনো। মাছের মতোই ভেজা আর ঠান্ডা, বাতাসের রাতে কাঁপছে। কিন্তু বরাবরের মতোই তার চোখ চকচক করছে–অনেকটা চকমক করা মুক্তো যেন সূক্ষ্মভাবে সুন্দর,

ভাস্কর্যের মতো মুখটায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, সে কান্না করছিলো। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ভেঙে পড়েনি।

তারা খুবই শক্ত ধাঁচের মানুষ।

ছোটবেলায় মানু আর তারা একে অন্যের প্রতিযোগী ছিলো। সবকিছুতেই তারা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতো–তীর ছোঁড়া, ঘোড়দৌড়, বৈদিক গণিত, নিরস্ত্র যুদ্ধ, ধর্মগ্রন্থ...আর এমনকি আশপাশের শিশুদের সাথে বাইরে গিয়ে খেলার সময়েও। তারা সব সময়ই জিততো। তাকে আরো আটজন এতিম শিশুর সাথে শাস্ত্রী পরিবারের ছোট হোস্টেলে থাকার জন্য সানজানা নিজ হাতে বেছে নিয়েছিলো। তাদেরকে পরিবারের মতোই যত্ন নেওয়া হয়েছিলো, আর স্বয়ং মহান বিভাষণ পূজারি তাদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা দিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই বেড়ে উঠেছিলো আকর্ষণীয় যুবক-যুবতী হিসেবে, সাথে ছিলো দেবতার কাছ থেকে পাওয়া সব রকমের গুণ আর প্রতিভা।

যখন ঝগড়া করা বাচ্চা থেকে দুজনেই লাজুক কিশোরে পরিণত হয়, মানু আর তারা একে অন্যকে পছন্দ করতে শুরু করে। দুজনে এটা নিয়ে কখনো কথা বলেনি, তবে তাদের চোখ মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত দুই-এক মুহূর্তের জন্য কথা চালিয়ে নিয়েছে। ওরা একে অন্যকে স্পর্শ করেনি। তবু দুজনেই জানতো। ঠিক যেমনটা জানতেন বিভাষণ এবং সানজানা। দুইজনেই এই দুই অসাধারণ তরুণের মাঝে মিষ্টি প্রেমের আকর্ষণ বুঝতে পারছিলেন আর স্বেচ্ছায় সুন্দরী তারাকে পুত্রবধূ হিসেবে কল্পনাও করে নিয়েছিলেন, যে কিনা একদিন ঐতিহ্য মেনে ভাতের পাত্র উলটে দিয়ে তাদের ঘরে পা রাখবে–মানুর স্ত্রী আর আত্মার সঙ্গী হয়ে।

* * * * *

'তুমি পেরেছ, মানু...' সে তার ভালোবাসার মানুষের উদ্দেশে বললো। 'তুমি পেরেছ!'

মানু তার দিকে হেঁটে গেল, প্রথমে ধীরে ধীরে...এরপর অধৈর্য দৌড়ের ভঙ্গিমায়। সে দৌড়ে গিয়ে তাকে বাহুতে আঁকড়ে ধরলো। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে পুরো মহাবিশ্বের কাছে শপথ করলো, সে তাকে ছেড়ে দেবে না। কখনোই না।

'আমার তারা...' সে কেবল এটুকুই ফিসফিস করে বলতে পারলো।

তারা আর নিজের কান্না চেপে রাখতে পারেনি। তার প্রিয় মানুষটাকে জীবিত দেখে, তার বাহুতে আশ্রয় নিতে দেখে আর একখানি ভালোবেসে তার নাম উচ্চারণ করতে দেখে সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি। মানুর বুকে নিজের মুখ লুকালো সে, দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করলো।

আর কেঁদেই গেল। যদিও তারা খুব শক্ত ধাঁচের মানুষ ছিলো। কিন্তু সব মিলিয়ে সে ছিলো একজন উনিশ বছরের নারী, যার এমন কিছু দরকার ছিলো যা প্রত্যেক মানুষের দরকার হয়। ভালোবাসা।

নিষ্ঠুর, ভয়ানক আকাশের নিচে এই প্রবল বৃষ্টির মাঝে তারা আর মানু অন্ধকার, নির্জন পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। দুজন ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো, একে অন্যের মাঝে ডুবে যাচ্ছে যেন।

মৎস্যের জন্য এ একটা অদ্ভুত দৃশ্য, যিনি তাদের দুজনকে একটা ওষ্যর দেয়ালের সরু খাঁজ থেকে দেখছিলেন। তিনি আগেও এমন দৃশ্য দেখেছেন, অন্য এক যুগে, অন্য কোনো গ্যালাক্সিতে, সমান্তরাল কোনো ব্রহ্মাণ্ডে, এরকমই এক গ্রহে। আর বিষ্ণু তাদের সবাইকে দেখছিলেন।

প্রেম বিশ্বজগতের সবচেয়ে শক্তিশালী আর অপ্রতিরোধ্য শক্তি। চারপাশের সমস্ত ধ্বংস আর তাদের চারদিকের মৃত্যুর মাঝে, যা কিছু এরই মাঝে হারিয়ে গেছে, সেই সাথে যা কিছু স্মৃতি, ঘৃণা এবং তাদের ঘিরে সহিংসতা, দেবতা আর শহরের পতনের মাঝেও তারা দুজন ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলো। দুজন একে অন্যের ভালোবাসায় নিমগ্ন।

তখনই মৎস্যের মনে পড়ে গেল কীভাবে আর কেন সৃষ্টিকর্তা মানব জাতির কথা কল্পনা করেছিলেন। কেন এটাই ছিলো ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, স্বয়ং ঈশ্বরেরই একটি সম্প্রসারণ। সে এই প্রজাতির মাস্টারপিসের দিকে তাকিয়ে রইলো, যারা ঈশ্বরেরই দেবত্বের একটি নমুনা বহন করে। যে দেবত্বের কারণে তাদের ঘর, জমি, তাদের প্রিয়জন, সম্পদ আর যা কিছু তাদের প্রিয় সবকিছু কেড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু কখনোই মানুষের কাছ থেকে একটা জিনিস কেড়ে নেওয়া যায় না।

আশা।

* * * * *

আরামদায়ক আগুনের চারপাশে যে বৈঠক ডাকা হয়েছে, মৎস্য ছিলেন তার সভাপতি। সোমদত্ত, তারা আর তাদের অল্প কিছু সাহসী সঙ্গী ততক্ষণে খাওয়া আর বিশ্রাম সেরে নিয়েছে।

সময় হয়েছে তাদের সামনে যা আসছে তার জন্য প্রস্তুত হওয়ার।

আর নিজেদের ভূমিকা পালন করার।

ঘরভরতি মানুষের মাঝে বসে কথা বলছেন মৎস্য। পাহাড়ের রক্ষী আর তাদের নেতা, মৎস্যের দলের কিছু মৎস্য-মানব, সোমদত্ত, তারা, তাদের যোদ্ধা–সবাই উপস্থিত। মৎস্য চেয়েছিলেন এমনটাই হোক। আর উজ্জ্বল নীল রঙের মানুষটি যেমনটি আশা করেছিলেন, ঘোষণাটি শুনে তাদের মাঝে তেমনই অবিশ্বাসের আওয়াজ আর ভয়ের দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

'এটা অবশ্যম্ভাবী, সোমদত্ত। আমাদের চেনাজানা সবকিছুই প্রলয় ধ্বংস করে দেবে। এ নিয়ে তোমার মনে সন্দেহ রেখো না।'

মৎস্য সাদামাটা আর পরিষ্কার অক্ষরে কথা বলে গেলেন। তিনি জানতেন এখন কোনো কিছু বাড়তি রং চড়ানোর সময় না।

সোমদত্ত উঠে দাঁড়িয়ে পুরো দলটাকে চুপ থাকার অনুরোধ জানালেন। যদিও তিনি এই লোকটার কাছ থেকেই জীবনের সবচেয়ে অশুভ কথাটা শুনছেন, তবু মাছের চামড়ার আলখাল্লার নিচে জ্বলজ্বলে নীলচে বর্ণের মৎস্য নামের লোকটা থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছিলেন না। সোমদত্ত পুরো পৃথিবী দেখেছেন। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল থেকে কাশী পর্যন্ত। মেসোপটেমিয়া আর এমনকি দূর পিরামিডের দেশের মহান ফারাওদের সবচেয়ে মহান ব্যক্তির সাথে আলাপ এবং কাজ করেছেন। অন্য কেউ নন, বরং স্বয়ং হরপ্পার দেবতারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো তার। কিন্তু এমনকি বিভাষণ পূজারির দীপ্তিও এই মানুষটার আকর্ষণীয় ক্ষমতার তুলনায় কিছু নয়। কিছু একটা সোমদত্তকে বলছিলো, তিনি অন্য কিছু। মৎস্য ছিলেন বেশি কিছু, তার দেখা যেকোনো মানুষের চেয়ে বেশি কিছু। না...তিনি এমনকি একজন দেবতা থেকেও বড় কিছু।

'আমার কথা একটু শুনবেন, হে মৎস্য, যেহেতু আমি এই গুহার সকল মানুষের পক্ষ থেকে কথা বলছি।'

মৎস্য শান্তভাবে সোমদত্তের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, তাকে কথা বলার উৎসাহ দিলেন।

'আমি কিছু বলার আগে, মৎস্য, দয়া করে আমার দুই হাত জোড় করার এবং মাথা নোয়াবার অনুমতি দিন। আপনি সাধারণ মানুষ না। আমার অভিজ্ঞ চোখ তা দেখতে পাচ্ছে। আর আমি যদি সত্যি বলে থাকি, তাহলে আমাকে আপনার বক্তব্য নিয়ে প্রশ্নের স্বাধীনতা আর আপনাকে বিরক্ত করার আগেই আপনার অনুগ্রহ দিয়ে আশীর্বাদ করুন।'

আচমকাই মৎস্য এই স্থপতি এবং যোদ্ধার প্রতি পুরোপুরি মায়া অনুভব করলেন, যে কিনা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিভাষণ আর সানজানার পাশে ছিলো। তিনি নিশ্চিত হলেন, তার পছন্দ সঠিক ছিলো।

মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় জাহাজের নির্মাণে স্থাপত্যবিদ্যা কিংবা নির্মাণশৈলীর চেয়েও বেশি কিছু দরকার। এর কিছু চরিত্র দরকার ছিলো।

মৎস্য কিছু বলে ওঠার আগেই আরেকটা হাত উঠে গেল।

'আমারও একটা প্রশ্ন আছে!' এক আত্মবিশ্বাসী নারী কণ্ঠ বলে উঠলো।

মৎস্য ঘরের চারপাশে তাকালেন কিন্তু কণ্ঠের উৎপত্তি ধরতে পারেননি।

'কে?'

'আমি, তারা,' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললো সে।

মৎস্য খেয়াল করলেন সে পুরো ঘরের একেবারেই শেষে বসে আছে তার প্রিয়, তার আশ্রিত...সত্যব্রত মানুর পাশে।

'তারা...কী সুন্দর নাম,' বললেন মৎস্য। 'ঠিক তোমার মতোই সুন্দর, প্রিয়।'

গর্বে মানুর বুক ফুলে উঠলো। তার তারার জন্য স্বয়ং মৎস্যের কাছ থেকে আসা প্রশংসা!

'এই নামে আমরা তাকে ঘরে ডেকে থাকি, মৎস্য। তার আসল নাম অন্য কিছু,' ভিড়ের পেছন থেকে বলে উঠলো মানু। অদ্ভুত ধরনের লজ্জা লাগছে তার।

'তাই নাকি?' জানতে চাইলেন মৎস্য। যেন এমন কিছু আছে যা তিনি জানেন না। 'তাহলে তার আসল নাম কী?'

তারার দিকে নজর দিতে ঘুরলো মানু। সে চাইছিলো তারাই যেন মৎস্যকে নাম বলে।

তারা মানুকে বুঝতে পারলো। সে মানুর দিকে বোঝা যায় না এমন হাসি দিয়ে মৎস্যর দিকে তাকালো।

'শতরূপা।'

বানারস, ২০১৭

রক্তবীজ অনুষ্ঠান

'একটা উপায় আছে...একটা উপায় যেটা পরিস্থিতি আমাদের দিকে হেলিয়ে দেবে, গুরুদেব,' বললেন অধ্যাপক ত্রিপাঠি।

সিদ্ধান্ত হলো বলভান্ত সশস্ত্র আক্রমণের নেতৃত্ব দেবে। আর এই বিষয়ে কোনো আলোচনার দরকার নেই যে, দ্বারকা শাস্ত্রী অপার্থিব সৃষ্টি আর কালো মন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন।

প্রপিতামহের আশীর্বাদ আর অনুমতি নিয়ে বিদ্যুৎ নিজেই সরাসরি মশান-রাজ আর তার দুই পিশাচিনীর মুখোমুখি হওয়ার দায়িত্ব নিলো। সেদিন মঠে তাদের কোমরে যে ভোঁতা কাস্তে ঝুলতে দেখেছিলো, সেগুলো এখনো বিদ্যুৎকে তাড়িয়ে বেড়ায়। সে জানতো, কোন অস্ত্র দিয়ে বালার মাথা নির্মমভাবে কেটে আলাদা করে ফেলা হয়েছিলো। শক্তির অবতার হিসেবে নারীদের প্রচণ্ড রকম সম্মানের পাশাপাশি প্রশংসা করার মতো মানুষ ছিলো বিদ্যুৎ। তবে এই দুই ঘাতক নারীর বেলায় সেই চিন্তা বাদ দিলো সে।

ওরা সাধারণ ছিলো না। ওরা ছিলো পাগলাটে খুনি, যাদের পৃথিবীতে কোনো স্থান নেই। বিদ্যুৎ তাদের ঠিক সেভাবেই শাস্তি দেবে যেভাবে নির্মম, খুনি কোনো পুরুষকে দেওয়া হয়।

মন্দ এবং বর্বরতার কোনো লিঙ্গভেদ হয় না।

'সেই উপায়টা কী, ত্রিপাঠিজি?' জানতে চাইলো সনু। এই তরুণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য একেবারেই তৈরি। দশাশ্বমেদ ঘাটে যে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলো সেটার প্রতিশোধ নিতে সে উদ্‌গ্রীব। ওরা যেভাবে তার মঠ আর তার ঘর অপবিত্র করেছে, সেও ঠিক ওভাবেই তাদের দুর্গে প্রবেশ করে লুণ্ঠন করতে চায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, সে তার প্রিয় দেবতা–তার বিদ্যুৎ দাদাকে রক্ষা করার জন্য নিজের ক্ষমতার সবটুকু উজাড় করে দিতে চায়।

এমনকি এখন তাদের প্রহরীদের মাঝ দিয়ে ত্রিজাতের যজ্ঞশালায় প্রবেশের সর্বোত্তম উপায় খোঁজ করছে, যেন তাদের দিক থেকে হতাহতের পরিমাণ কম হয়। শত্রুদের দুর্গে প্রবেশ করার জন্যে ওদেরকে এখন অধ্যাপক ত্রিপাঠি বা ব্রহ্মানন্দের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তিনি বহু বছর ধরে সেখানকার অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি ছিলেন।

'এটা কেবল চাঁদহীন, অন্ধকার অমাবস্যার রাতেই করা যাবে,' জবাব দিলেন অধ্যাপক ত্রিপাঠি। আচমকাই তিনি উদ্যমী হয়ে উঠলেন, যেন এইমাত্র দারুণ কিছু আবিষ্কার করেছেন।

বাকিরা তার কথা শুনছিলো।

যদিও ব্রহ্মানন্দ তার কথা পুরোপুরি শেষ করার আগেই দ্বারকা শাস্ত্রী এরই মাঝে মৌন অসম্মতিতে মাথা নাড়তে শুরু করলেন।

মন্দ আত্মাদের নিশাচর বা রাতের ভ্রমণকারী বলার একটা কারণ আছে।

অমাবস্যার চাঁদের আলোবিহীন রাত সেই সময় যখন মৃতরা অদম্য হয়ে ওঠে।

* * * * *

'এর পেছনে কারণ একটা আছে, গুরুদেব। প্রতি অমাবস্যায় ত্রিজাত এক অসামান্য যজ্ঞ পালন করে, যেখানে সে এক বিশেষ গর্তে বড় আকারের পূজার আগুন জ্বালিয়ে রাখে। গর্তটা নির্মাণ করা হয়েছিলো এই বিশেষ উদ্দেশ্যে। সদ্য উত্তোলন করা লাশ আগুনে উৎসর্গ করা হয়, সেই সাথে অগণিত মানুষ ও পশুর রক্ত, আদিকালের শক্তিশালী তান্ত্রিকদের মাথার খুলি এবং বিভিন্ন প্রকার বিস্ময়কর উৎসর্গ যেমন কবরের কাফন, পচা মাংস আর নিষিদ্ধ কেতকী ফুল দেওয়া হয়। কিন্তু সবচেয়ে ব্যাখ্যাতীত হলো, প্রতি অমাবস্যায় ত্রিজাত উদারভাবে নিজের রক্ত পূজার আগুনে ঢেলে দেয়...'

বিদ্যুৎ বারান্দায় পায়চারি করছিলো। সে অথর্ব বেদ, গরুড় পুরাণ আর জাদুবিদ্যা এবং তন্ত্রের উপর লেখা অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের ছাত্র ছিলো। কিন্তু সে অধ্যাপক ত্রিপাঠির বর্ণিত এমন ভয়ানক পূজার কথা কখনো শোনেনি।

কীসের পিছে ছুটছেন ত্রিজাত?

বিদ্যুৎ তার প্রপিতামহের দিকে ফিরলো। সে জানতো, দ্বারকা শাস্ত্রী এমনকি এই উদ্ভট মৃতদেহ অনুষ্ঠান নিয়েও জানতে পারেন।

'বাবা, লোকটা আসলে কী করছে? আমি এরকম কোনো তান্ত্রিক আচারের কথা আগে শুনিনি। দয়া করে আমাদের জানান...'

'রক্তবীজ অনুষ্ঠান,' বিদ্যুৎ পুরো লাইন শেষ করার আগেই গমগম কণ্ঠে বললেন গোত্র প্রধান।

রক্তবীজ কে তা বিদ্যুৎ জানতো। দ্বারকা শাস্ত্রীর শেষ কথাগুলো শুনে সে জমে গেল।

'সে রাক্ষসদের পুরো একটা বাহিনীকে পৃথিবীতে ডেকে আনার চেষ্টা করছে।'

* * * * *

'রক্তবীজ ছিলো এক শক্তিশালী রাক্ষস, যাকে শেষ পর্যন্ত মা দুর্গা আর মা কালী তাদের অসুর-রাজ মহিষাসুরের যুদ্ধে বধ করেছিলেন। রক্তবীজ ছিলো মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি। এক অনন্য আশীর্বাদের বাহক ছিলো সে, যার কারণে অলৌকিকভাবে প্রতিটি ফোঁটা রক্ত থেকে একজন একজন করে তার আরো হাজারো ক্লোন তৈরি হয়েছিলো। যখনই কোনো এক ক্লোনকে বধ করা হয়, তার রক্তের ফোঁটা আরো রক্তবীজ তৈরি করে। এ এক অনন্ত যুদ্ধ। যার কারণে রক্তবীজকে পরাস্ত করা যায় না,' ন্যায়না সনুকে ব্যাখ্যা করলো। একমাত্র সে-ই এই প্রায় অমর রাক্ষস সম্পর্কে জানতো না।

'এরপর কী হলো, ন্যায়নাদি?' জানতে চাইলো সনু। 'তুমি যা বর্ণনা করলে, তাতে এই রাক্ষসকে বধ করা অসম্ভব। কারণ তাকে হত্যার চেষ্টা করলেও তার মতো কয়েক হাজারের জন্ম হবে।'

'ঠিক তাই। আর এই কারণেই মা দুর্গা কালীকে ডেকেছিলেন, যিনি স্বয়ং দেবীর ভয়ংকর রূপ। তারা দুজন দল হিসেবে রক্তবীজের সাথে যুদ্ধ করেন, যেখানে দুর্গা রাক্ষস আর তার ক্লোনগুলোর শিরশ্ছেদ করেন, একই সময়ে কালী মাটিতে পড়ার আগেই সকল রক্ত শুষে নেন। তাহলে দেখতেই পাচ্ছো কেন মা কালীকে সব সময় রক্তে রঞ্জিত জিহ্বাকে প্রসারিত অবস্থায় চিত্রিত করা হয়ে

থাকে? ধীরে ধীরে সকল ক্রোন দুর্গার হাতে মারা পড়ে আর রয়ে যায় কেবল রক্তবীজ–নিজেকেই নিজে খুন করার জন্য।'

সনু বিস্ময় আর আনন্দে হেসে ফেললো।

'আমি সব সময়ই ভাবতাম কেন মা কালীকে লাল জিহ্বা দিয়ে দেখানো হয়। এবার জানলাম!' আনন্দ নিয়ে বললো সে।

ন্যায়না পুরো বর্ণনা দেওয়া পর্যন্ত বিদ্যুৎ চুপ ছিলো। সে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন।

'বাবা, এই রক্তবীজ অনুষ্ঠান কী? শুনে তো ভালো কিছু মনে হচ্ছে না।'

'রক্তবীজ অনুষ্ঠান খুব দুর্লভ প্রজাতির তান্ত্রিক তপস্যা, যা এর সকল তপস্যাকারীকে অপশক্তি, বিশেষ করে আদিম রাক্ষসদের উপর বিচরণকারী আত্মার উপর অতুলনীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। ভৃগু, ভরদ্বাজ, অগস্ত্য, দুর্বাসা, এমনকি পবিত্র শাস্ত্রের প্রথম লেখক সত্যব্রত মানুর মতো সকল প্রাচীন ঋষি কর্তৃক এটি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই অবিশ্বাসী সিদ্ধি খুব সাধারণ একটা কারণে বহু শতাব্দী আগে পরিত্যক্ত করা হয়েছিলো।'

পুরোহিতজি, ন্যায়না, সনু, বলভান্ত, অধ্যাপক ত্রিপাঠি আর বিদ্যুৎ দ্বারকা শাস্ত্রীর প্রতিটি কথায় আঠার মতো লেগে রইলো।

'কী কারণ...বাবা?' নম্র, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলো ন্যায়না।

দ্বারকা শাস্ত্রী সময় নষ্ট করার মতো অবস্থায় ছিলেন না।

'কোনো তান্ত্রিক, যেভাবেই সিদ্ধি হোক, এই অনুষ্ঠানে বেঁচে থাকেনি। তাদের প্রত্যেকেই কেবল যে মারা গেছে তাই নয়, বরং এতই ভয়ানকভাবে মারা গেছে যে এই চর্চা নিষিদ্ধ অনুশীলনের গভীরে চিরতরে সমাহিত করে ফেলা হয়। যদি ত্রিজাত এই নিষিদ্ধ আচারকে জীবিত করার চেষ্টা করেই থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই এমন কিছু জানে যা আমরা জানি না।'

বিদ্যুৎ বুঝতে পারলো, তার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠান্ডা অনুভূতি নেমে গেছে। যদি তার প্রপিতামহই কিছু না জানেন, তাহলে তারা কীভাবে যুদ্ধ করতে পারে? কীভাবে তারা এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে?

* * * * *

'আমি রক্তবীজ অনুষ্ঠানকে এখন এর চেয়ে বিস্তারিতভাবে বলতে পারবো না, বিদ্যুৎ। আমাদের যা জানা দরকার, ত্রিজাত যদি এটাই মুক্ত করার আশা করে

থাকে, আমাদের তাকে থামাতেই হবে...যেকোনো মূল্যে। এর মানে যদি হয় আমাদের অমাবস্যার মাঝে যেতে হবে, তবে তাই হোক।'

যখন থেকে বিদ্যুৎ তার মহান মঠাধীশের সাথে দেখা করেছে, সে তাকে কেবল একবারই এমন আতঙ্কিত হতে দেখেছে। যখন গোত্র প্রধান বিদ্যুতের সামনে রুমির দেওয়া প্রাণঘাতী জিঙ্গো লাইটারের উপস্থিতি আঁচ করতে পেরেছিলেন। এর মানে ছিলো বিদ্যুতের নিশ্চিত মৃত্যু। যদি তার বাবা আবারো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, তার মানে এখানে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আছে।

বিদ্যুৎ দুই-এক মিনিট চুপ হয়ে রইলো। তার মন এখন ফাইটার জেটের গতিতে কাজ করছে। ন্যায়না খেয়াল করলো তার মাথা খুব আলতোভাবে দেয়ালের সাথে ঠেকানো। দুই চোখ বন্ধ। তার মুষ্টি বন্ধ হতেই চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। সে জানতো না, কীভাবে এই সুদর্শন, বিবেকবান আর প্রচণ্ড দক্ষ মানুষটার প্রতি বারবার প্রেমে পড়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব। সে এই তীব্র আকর্ষণ ঝেড়ে ফেললো।

তার ব্যক্তিগত চাহিদার সাপেক্ষে এই সময়টা অনেক বেশিই অন্ধকার।

'ত্রিপাঠিজি, অমাবস্যা কেন আমাদের আক্রমণের জন্যে উপযুক্ত সময় তা আমাদের সাথে আলোচনা করে নিতে যাচ্ছিলেন। কেন আপনি এমন ভাবছেন, সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করুন,' আবার নিজের আসনে বসতে বসতে প্রশ্ন করলো বিদ্যুৎ।

'এর সাধারণ কারণ, অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, সূর্যোদয় পর্যন্ত ত্রিজাত অস্থায়ীভাবে তার অপার্থিব শক্তি হারিয়ে ফেলে। যদিও এই আচার-অনুষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে অসীম শক্তির দাতা, তবে অনুশীলনকারীর কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য আধ্যাত্মিক শক্তি শুষে নেয়। অসুস্থ অনুষ্ঠান থেকে আসা মারিজুয়ানার একটি শক্তিশালী তরল তার সকল অঘোরী সঙ্গীদের দেওয়া হয়।'

এইমাত্র যা ব্যাখ্যা করলেন, সেটা তার শ্রোতারা হজম করতে পারলো কিনা সেটা দেখার জন্য থেমে অধ্যাপক ত্রিপাঠি ইতি টানলেন।

'অমাবস্যার অন্ধকার রাতে ত্রিজাত কাপালিক তার সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায় থাকে।'

হরপ্পা, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

অনুর্বর ভূমির সম্রাট

হরপ্পার শেষ দেবতা মনে হলো পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছেন। তিনি একই সাথে হাসছেন, আবার কাঁদছেন। তিনি মাটিতে ঘুসি দিচ্ছেন, স্বর্গের দিকে চেয়ে চিৎকার করছেন...সবকিছুই একই সাথে। যেন তার মাঝে দেবতা আর রাক্ষসের চূড়ান্ত, ভয়ানক যুদ্ধ চলছে।

তার পুত্র মানু বেঁচে আছে, ষষ্ঠ ঋষির এমন ঘোষণা বিভাষণ পূজারির জন্য সবকিছু বদলে দিয়েছে। গত কয়েক দিনের রক্তক্ষয়ী দিনে তিনি জোর করে হত্যার মাধ্যমে ঐশ্বরিক বিবেককে দমন করেছেন, রাক্ষসদের দমন করেছেন আর ভয়ংকর সহিংসতার প্রকাশ করেছেন–সবই তার নিজের ধার্মিক সত্তার বিশ্বাস এবং মূলনীতির পুরোপুরি বিপরীত। তিনি ইচ্ছা করেই নিজের ভেতরের দেবতাকে শ্বাসরোধ করেছেন আর প্রতিহিংসাপরায়ণ পিশাচকে খাইয়ে বড় করেছেন। যদি তিনি জানতেন তার আদরের ছেলে মানু বেঁচে আছে!

শুধু যদি একবার জানতে পারতেন!

এমনকি ঈশ্বররাও আমার কাছ থেকে এটা লুকিয়েছেন!

* * * * *

বিভাষণ পূজারি আর সহ্য করতে পারছেন না। তার প্রতিশোধের তৃষ্ণা শত শত হরপ্পান সেনাদের হত্যার কারণ হয়েছিলো। যাদের অনেককেই অভিশপ্ত শহরের সুন্দর দিনগুলোতে দেবতা নিজেই প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে উদ্ধারের যুদ্ধে আর গোলযোগের পাহাড়ে নিশাচর অভিযানে, অগণিত মানুষ মারা যায়। সে সানজানাকে হারিয়েছে, তার প্রিয়তমা স্ত্রী আর কর্মময় জীবনের নিরবধি

আত্মার সাথি। তার সুদর্শন, বাধ্য এবং সাহসী পুত্র মানু পৃথিবীর আলো দেখার পর থেকেই মহৎ হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু এর পরিবর্তে তাকে নিজের মায়ের মৃত্যু আর বাবার অপমান সইতে হয়েছে। এরপর যৌবনের সুন্দরতম সময়ে তাকে সহ্য করতে হয়েছে যন্ত্রণাদায়ক ছুরি আর বিষাক্ত তীরের আঘাত। এই অপার্থিব নীল আগুন তার অতি-ভালোবাসার ছয় সপ্তর্ষিকে গ্রাস করেছে। সরা মা, প্রেমময় সরস্বতী, জ্ঞানের নদী নির্দয় রক্তধারায় পরিণত হয়েছে, আর নিজেই সমগ্র মানব জাতিকে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব আর অভিশাপ দিয়েছেন।

প্রতিশোধ নেওয়ার আর কিছুই বাকি ছিলো না।

প্রলয় সবকিছু গ্রাস করে নেবে, একদম সবাইকে...

* * * * *

নীল অন্ধকারে প্রাচীন রত্ন-মরুর গায়ের কারুকাজ জীবন্ত হয়ে উঠলো। দেবতা তার দুর্ধর্ষ অস্ত্র বের করে এখন সুরা আর ভূতুড়ে আগুনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন। এক হাঁটুতে ভর করে তার পুরো পেশিবহুল দেহ বিশ্রাম নিচ্ছে, অন্য হাঁটু ওঠানো আর দুই কিংবদন্তির অসাধারণ তলোয়ারের হাতলের উপর রাখা। মাথা নিচু, অর্ধ-টাক মাথার ত্বকে আগুনের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। তাকে দেখে মনে হলো একটা নীল রঙের ভূত।

নির্বাচিত অসুর রেজিমেন্টের কমান্ডার এতক্ষণে বর্বরতা এবং লাগামহীন, একতরফা হত্যায় নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে। রাজাকে খুশি করার চেষ্টা হিসেবে সে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলো।

ক্ষমতার মোহে পড়ে ছোট মানুষেরা প্রায়ই বড় ধরনের ভুল করে থাকে।

'তুমি রাক্ষসরাজ সুরার কথা শুনেছ, হে অ-বিভাষ–'

সে কথা শেষ করার আগেই রত্ন-মরু তার শিরশ্ছেদ করে ফেললো। রাতের অন্ধকারে উড়ে গেল তার মাথা আর বাকি শরীরটা হাঁটুতে ভর করে পড়ে গেল। ঘাড় থেকে রক্ত নীল আগুনে ছিটকে পড়ছে–যেন আগুনে এক অনুতপ্ত উৎসর্গ করা হচ্ছে।

এই সহজ বলিদান করতে বিভাষণের এক সেকেন্ডও সময় লাগেনি। আর সে ছিলো প্রবীণ, পাগলাটে সেনাপতি। দেবতা যদি তার মৃত্যুদণ্ডের ক্যানভাস বড় করতেই চান, তাহলে পরিণতি কী হবে, তা বাদবাকি অসুরদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

কিন্তু সুরা এমনি এমনি অনুর্বর ভূমির সম্রাট হয়নি। কোনো কথা না বলেই সে নিজের তলোয়ার বের করে আনলো। আরো পঞ্চাশটা তলোয়ারও সাথে সাথেই বের হয়ে এলো খাপ ছেড়ে। সুরার এই বর্বরতা ছিলো আত্মঘাতী সেনাদের দল। তাদের এই হিস্র গোত্রে তারা তখনই শহীদের গৌরবময় মর্যাদা পায়, যখন তাদের কেউ আত্মঘাতী অপারেশনে মারা যায়। তারা এই বিশ্বাসে বোকা বনে গেছিলো যে নিজের জাতের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করলে তারা মৃত্যুর পর স্বর্গ খুঁজে পাবে। স্বয়ং অসুর-রাজ সুরার মাধ্যমেই তারা বোকা বনে গেছে। যে নিজে আর্যাবর্তের সিংহাসনের পথে রক্তস্নাত যাত্রায় একটা মুহূর্ত এসব আত্মউৎসর্গকারী ছেলে আর যুবকদের থেকে দূরে ছিলো না।

সুরার নেতৃত্বে সমস্ত অসভ্য যোদ্ধারা বিভাষণ পূজারির কাছে আসতে শুরু করেছে। দেবতা একচুলও নড়লেন না, ঠিক আগের ভঙ্গিতেই বসে ছিলেন। শিকারি হয়ে ওঠার আগ মুহূর্তে চিতাবাঘ যেমন থাকে, এ ঠিক তেমন স্থির ভঙ্গিমা।

সুরা একেবারে আঘাত হানার মতো দূরত্বে আসতেই কেউ একজন তার প্রতি চিৎকার করে উঠলো।

'আমাদের অবশ্যই থামতে হবে, প্রিয় রাজা!'

কথাটা বলেছে প্রচণ্ড।

* * * * *

প্রচণ্ড সুরার চেয়ে কোনো অংশেই কম শয়তান ছিলো না। নৃশংসতায় পিছিয়ে ছিলো না। নিজের রাজার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সে সমস্ত যুদ্ধেই অংশ নিয়েছে। কোনো অনুতাপ আর সংশয় ছাড়াই গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে। মনের দিক থেকে সে ছিলো একজন সত্যিকারের অসুর।

কিন্তু কিছু একটা আজ তাকে বদলে দিয়েছে। সে দেবতার অবর্ণনীয় বিচারের সাক্ষী হয়েছে। যখন সে ঋষিদের চোখ আর অস্বাভাবিক বার্ধক্য দেখতে পেল, তার মনে হচ্ছিলো হৃদয়ে একটা সুঁই বিঁধে গেছে। প্রচণ্ড নীল আগুন তাকে প্রায় সম্মোহিত করে দিয়েছিলো। সে সরা এবং ছয় সপ্তর্ষির অভিশাপ শুনেছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এই বজ্রপাত, প্রচণ্ড শব্দের বাতাস, বুনো শিলাবৃষ্টি...সবই অমৌসুমী, অপ্রাকৃতিক।

এমন কিছু যা কেউ শোনেইনি, যা অনিয়ন্ত্রিত, ধ্বংসাত্মক...এমন কিছু সত্যিই ধেয়ে আসছে। তাদের সবার জন্য।

সুরা আরেকবার প্রচণ্ডের দিকে তাকানোর জন্য ধীরে ধীরে ঘুরলো, তার চোখ রাগে জ্বলছে।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে, প্রচণ্ড? তুমি সুরার তলোয়ারের ক্রোধ চেপে রাখার চেষ্টা করছো?'

'প্রভু আমার, ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমরা কি যথেষ্ট করিনি? আমরা এই ছয় মায়াবী ঋষিকে ছাই করে দিয়েছি। কিন্তু তাদের কেউই মানুষের মতো করে পুড়ে যায়নি। আর ঐ...ঐ নীল আগুন কোনো জাদুকরের কারসাজি না। আমরা কণ্ঠগুলো শুনেছি, সূর্যের বিস্ফোরণের মতোই জোরালো সেসব শব্দ। পৃথিবীর কোনো কালো জাদুকর কিংবা মায়াবীরা এমন কিছু কল্পনা করতে পারে না...এ মানুষের কল্পনার বাইরে!'

'চুপ করো, প্রচণ্ড!' চিৎকার করছে সুরা, রাগে কাঁপছে এখন।

প্রচণ্ড হাল ছাড়েনি।

'আমরা চলে যাই, হে মহারাজ। আর্যবর্তের পশ্চিমের সবকিছু আমাদের আছে। কেন এই ভূমিতে থাকবো, যা দেখে মনে হচ্ছে মানুষ আর প্রকৃতি–এই দুয়ের হাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে? চলুন আমরা চলে যাই। আমাদের এর দরকার নেই। আমরা হিন্দুকুশের পশ্চিমের অবিসংবাদিত শাসক...'

'*আমরা? আমরা*...অবিসংবাদিত শাসক, প্রচণ্ড?'

'ক্ষমা করবেন, হে মহান সুরা। আপনিই অবিসংবাদিত শাসক।'

'তোমাকে হত্যা করার আগেই সরে যাও, প্রচণ্ড,' আদেশ দিলো রাক্ষসরাজ।

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এটাই লেখা আছে: যখন সর্বশক্তিমান কাউকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি কেবল তার ভালোমন্দ যাচাই করার ক্ষমতা কেড়ে নেন।

বানারস, ২০১৭
মহান দ্বারকা শাস্ত্রী

বিদ্যুৎ দেখলো তার প্রপিতামহ এমন বইয়ের মাঝে ডুবে আছেন, যা দেখে মনে হয় এই ৮০০ বছরের পুরাতন দেব-রাক্ষস মঠের চেয়েও বেশি পুরাতন। তিনি অস্থিরভাবে পাতা উলটাচ্ছেন, এক লেখা থেকে অন্য লেখায় সরে যাচ্ছেন। বেশিরভাগ বই-ই সংস্কৃততে লেখা। কিছু দেখে মনে হলো প্রাচীন মিশরীয়, আওয়াধি, ল্যাটিন, ইংরেজি আর হিন্দিতে লেখা।

'কী খুঁজছেন, বাবা?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ। 'আমি কি সাহায্য করতে পারি?'

'আমি রক্তবীজ অনুষ্ঠান নিয়ে তথ্যসূত্র খুঁজছি, বিদ্যুৎ। মনে হচ্ছে কোথাও এর উল্লেখ খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কিন্তু বাবা, আপনি এরই মাঝে এর সম্পর্কে সবকিছুই জানেন, তাই না?'

মঠাধীশ মুখ তুলে তাকালেন, ভারী রিমের চশমা খুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিলেন।

'না। আমি জানি না, বিদ্যুৎ। একবার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এর সাথে সম্পর্কিত সব লেখা সতকর্তার সাথে বের করে এনে ঋষিদের মাধ্যমে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিলো। আজকের দিনে এই আচার নিয়ে যা কিছু জ্ঞান আমার বা অন্য কারো কাছে আছে, সেটা মুখে মুখে চলে এসেছে।'

'কিন্তু কোন বিষয় নিয়ে আপনি পড়াশোনা করতে চান, বাবা?'

দ্বারকা শাস্ত্রী এক গভীর শ্বাস ছাড়লেন। 'নির্দিষ্ট কিছু না। কেবল এটাই যে আমি এই প্রাচীন, পরিত্যক্ত ধর্মীয় রীতিনীতি নিয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান না নিয়ে অমাবস্যার রাতে যেতে আগ্রহী না। কোনো সন্দেহ নেই যে যদি ব্রহ্মানন্দ এটাই সুপারিশ করে থাকে, সে অবশ্যই ঠিক বলছে। অন্ধকার বিজ্ঞানসহ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে নিজের জ্ঞান সম্পর্কে সে খুবই নিখুঁত।'

এটাই বিদ্যুৎকে একটা বুদ্ধি দিলো।

'বাবা, আমরা মশান-রাজের আস্তানায় আমাদের অভিযানে অধ্যাপক ত্রিপাঠিকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি না কেন? তার জ্ঞান আর ভেতরের তথ্য আমাদের কেবল সাহায্যই করবে।'

গোত্র প্রধান মাথা নাড়লেন, সুপারিশ নিয়ে ভাবতে ভাবতে তার চোখ সরু হয়ে এলো।

'হ্যাঁ। তা সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সে কেন আমাদের সাথে এই নরকের আগুনে আসবে? আর যদিও সে নিজে মহাতান্ত্রিকের চেয়ে কম না, কিন্তু সে অত্যন্ত নম্র এবং এখন এসব থেকে দূরে আছে। যাই হোক, এটা তার যুদ্ধই না,' বললেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

অর্ধেক মিনিট নীরব থাকার পর মঠাধীশের সরু চোখ আচমকা খুলে গেল।

'অথবা হয়তো হ্যাঁ,' বিড়বিড় করলেন তিনি।

'কী বললেন, বাবা?' জানতে চাইলো বিদ্যুৎ।

'সম্ভবত এটা তারই যুদ্ধ!'

বিদ্যুৎ দ্বিধায় পড়ে গেল। 'এটা কেন বলছেন, বাবা? অধ্যাপক ত্রিপাঠি এমনকি ত্রিজাত আর তার সাথে কাটানো দিনগুলো নিয়েই কথা বলতে নারাজ ছিলেন। তার সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো কারণই নেই। আমি বুঝতে পারছি না, কেন আপনি বললেন যে এটা তারও যুদ্ধ।'

দ্বারকা শাস্ত্রী বিদ্যুতের দিকে তাকালেন এবার।

'ব্রহ্মানন্দ কীভাবে তার চোখ হারিয়েছিলো বলে তোমার মনে হয়, বিদ্যুৎ?'

বিদ্যুৎ উত্তরটা শুনতে চায়নি।

'ওটা কাস্তে দিয়ে নির্মমভাবে তুলে ফেলা হয়েছিলো, যদিও ব্রহ্মানন্দ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলো আর দয়া ভিক্ষা করেছিলো।'

* * * * *

শেষ দেবতাকে দেখে মনে হলো খুবই বিরক্ত হয়েছে। সে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। তার কপাল হাত দিয়ে চেপে রাখা।

পুরোহিতজি আর দ্বারকা শাস্ত্রী দেখতে পাচ্ছেন যে চারপাশে যা হচ্ছে তা সে উপভোগ করতে পারছে না। নিশ্চিতভাবেই রক্তপাত আর শুকনো রক্তের অপ্রতিরোধ্য বাস্তবতা তার উপর চেপে বসেছে।

'কী হয়েছে, পুত্র?' বিদ্যুতের শক্ত কাঁধে একটা হাত রেখে জানতে চাইলেন পুরোহিতজি।

বিদ্যুৎ মাথা নেড়ে পুরোহিতজির দিকে তাকিয়ে হাসলো। সে নিজে যতই চাপে থাকুক না কেন, বিদ্যুৎ এমন একজন মানুষ না যে নিজের কারণে তার ভালোবাসার মানুষগুলোকে এক মিনিটও চাপে রাখবে।

'কিছু না, পুরোহিতজি। শুধু এত বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র আর সহিংসতা নিয়ে একটু সতর্ক। আমি এটা ভালো করে জেনেই বড় হয়েছি যে আমাদের মঠ আর আমাদের পরিবার সাধারণ না, কিন্তু আমার কোনো ধারণাই ছিলো না এখানে প্রতি পদে পদে প্রতারণা, ষড়যন্ত্র আর রক্তপাতের জাল ছড়িয়ে আছে।'

সহানুভূতির হাসি হাসলেন পুরোহিতজি, বললেন, 'এমনকি অর্জুনও মহাভারত যুদ্ধের আগে সতর্ক হয়েছিলেন, বিদ্যুৎ। এটার দোষের কিছু নেই।'

বিদ্যুৎ আবার হেসে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে পুরোহিতজির হাত চাপড়ে দিলো।

দ্বারকা শাস্ত্রী মুগ্ধ হতে পারলেন না। তার প্রপৌত্রকে আরো বেশি শক্ত হতে হবে, প্রস্তুত থাকতে হবে...তার সামনে অপেক্ষমান কিছু ভয়ানক যুদ্ধের জন্য–যতক্ষণ না ভবিষ্যদ্বাণী করা সেই সময় উপস্থিত হয়।

আর মাত্র ছয় দিন বাকি। শত শত বছরের যন্ত্রণা, সংগ্রাম আর ত্যাগ। এই একটা দিনের জন্য। এই একটা স্বর্ণালি দিনের জন্য।

* * * * *

'একটা বিশেষ কারণে আমি তোমাকে আর পুরোহিতকে একত্রে ডেকেছি,' বলতে শুরু করলেন গোত্র প্রধান।

'জি, বাবা?' বললো বিদ্যুৎ, কণ্ঠে তার সেই চিরচেনা বাধ্যগত সুর।

'আমার সময় হয়ে এসেছে, বিদ্যুৎ। পুরোহিত আর আমি বহু বছর ধরেই আমার কুণ্ডলী পড়ছি আর আমরা দুজনেই একমত। আমার শেষ খুবই কাছে, বাবা আমার। খুব কাছে।'

এইমাত্র যা শুনলো বিদ্যুৎ তা বিশ্বাস করতে চায়নি। সে পুরোহিতজির দিকে তাকানোর জন্য ঘুরলো, আশা করছিলো তিনি হাসিতে ফেটে পড়বেন আর সবকিছু খুব বড়সড়ো কৌতুক হয়ে যাবে। কিন্তু পুরোহিত তার দিকে কোমল অথচ করুণ চোখ তাকালেন।

'কিন্তু বাবা, আপনি কেন এসব বলছেন? আপনি কেবলই খুব দ্রুত সেরে উঠেছেন। আপনি সুস্থ আর একদম ঠিকঠাক। ত্রিজাত যেদিন এসেছিলো, সেদিন আপনাকে দেখেছি আমি। আপনি সেখানে একজন যোদ্ধার মতো করে

দাঁড়িয়ে ছিলেন! হঠাৎ করে আপনার কী হতে পারে? আমি আপনার পাশে আছি, বাবা। আপনার আর মৃত্যুর মাঝে আমি দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। আমার বাবাও আমাকে এভাবেই ছেড়ে চলে গেছিলেন! এখন আপনি আমাকে এভাবে ফেলে যেতে পারেন না, বাবা...' বাচ্চাদের মতো চিৎকার করে বললো বিদ্যুৎ। কান্নায় ভেঙে পড়ার জন্য প্রস্তুত। সে ক্রমাগত মাথা নাড়ছে, তাকে যা বলা হয়েছে তা স্বীকার করতে একেবারেই নারাজ।

মহান মঠাধীশের চোখ দিয়ে পানি নেমে এলো। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎ যেখানে বসে আছে সেখান পর্যন্ত কয়েক পা যেতে তাকে খানিক কষ্ট করতে হলো। এই মহান বৃদ্ধ তার প্রতীক্ষিত বংশধরকে কাঁধে ধরে তুলে শক্ত করে জড়িয়ে নিলেন।

বিদ্যুৎ চিৎকার করে কেঁদে ফেললো। সে তার জীবনের প্রায় পুরোটা সময় একাকী কাটিয়েছে। তাকে ভালোবাসার কিংবা তার সাথে থাকার মতো একটা পরিবারকে ছাড়াই। সে বালার মতো একজন বন্ধুর উপর নির্ভর করতো। সেই ভ্রাতৃত্বের ভালোবাসাও কিছু অদ্ভুত ভাগ্যের ছোবলে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। শেষ কয়েক দিন সে সব সময় যা চেয়েছিলো সেটা বাবার মাঝে খুঁজে পেয়েছিলো। কেবল তাকেও হারিয়ে ফেলার উপলক্ষ্যে!

'বাবা, আপনি একটা বিস্ময়। আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। আপনি স্থান আর সময়ের রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। নিজেকে রক্ষা করুন, বাবা। আপনি একজন দেবতা!'

দ্বারকা শাস্ত্রী বিদ্যুতের মুখটা নিজের বড় হাতে ধরে রেখেছেন, ঠিক যেমন আদুরে বাবা ছোট সন্তানকে ধরে রাখে।

'আমি দেবতা নই, বিদ্যুৎ। যদিও এত সব শতাব্দী ধরে মানুষ বিশ্বাস করে আমাদের বংশের সব ছেলে আর মেয়েই দেবতা কিংবা দেবী ছিলো। সত্যটা অন্য রকম। আমাদের পরিবারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কেবল দুজন সত্যিকারের দেবতা ছিলো। একজন ছিলেন মহান বিভাষণ পূজারি, যার গল্প আমি তোমাকে বলেছি।'

মঠাধীশ এক মুহূর্তের জন্য থামলেন। তিনি বিদ্যুতের দেবতার মতো মুখটার দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে আছেন। তার চোখ কারো ভালোবাসা আর অপেক্ষায় ভেজা, যে শীঘ্রই অনেক দূরে চলে যাবে।

'আর অন্যজন হলে তুমি, বিদ্যুৎ। তুমিই শেষ দেবতা। তোমার পর এই পৃথিবী আর কখনোই দেবতার দেখা পাবে না।

হরপ্পার পূর্বে, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
'তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ'

প্রত্যেকটা দল জড়ো হতে আর মৎস্য এইমাত্র যা ঘোষণা করলো সেটা বুঝে উঠতে পুরো জমায়েত আলোচনায় বিরতি দিলো।

মানু আর তারা, মানে সত্যব্রত মানু এবং শতরূপা, দুজনে পাহাড়-প্রহরীদের কোমল স্বভাবের ধর্মমাতার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো।

'মা আমার, মৎস্য কে? আপনি কীভাবে তাকে চেনেন?' প্রশ্ন করলো মানু।

হাসলেন তিনি, তবে মানুর দিকে ফিরলেন না। যেন তিনি আশা করছিলেন, যেকোনো সময় এই প্রশ্ন উঠতে পারে আর প্রশ্ন শুনে তিনি মোটেও অবাক হননি।

'তুমি কেন জানতে চাইছো, মানু?' হাঁটতে হাঁটতেই কথাটা বললেন তিনি।

'তিনি অসাধারণ, মা। তার উপস্থিতি চারপাশের সকল হৃদয় আর মনকে শান্ত করে ফেলে। একদিকে তাকে দেখে মনে হয় নির্ভীক যোদ্ধা। আরেক দিকে তাকে মনে হয় স্নেহময়ী বাবার মতো কোমল। তিনি ভয়ানক, তবে অসীম মায়া প্রদর্শন করেন। তিনি যখন আমার দিকে তাকান, মনে হয় আমার এই জীবন আর তার আগের সব জীবনের আত্মার দিকে তাকিয়ে আছেন। সত্যি বলতে...আসলে, আমার ধারণা তিনি ভগবান বিষ্ণুর অবতার।'

'সে খুব তাড়াতাড়ি মুগ্ধ হয়ে যায়,' কিছুটা ঠাট্টা করে বললো তারা। সে তার মানুকে চেনে আর তার যোদ্ধা-রাজপুত্র কত দ্রুত আবেগী হতে পারে আর বিশ্বাস করতে পারে তাও জানে।

সৌম্যদর্শন সেই বৃদ্ধা তারার কথায় হাসলেন। মানু আর তারার নিখুঁত ভালোবাসা আর বন্ধুত্বের বন্ধন দেখে খুশি হয়েছেন তিনি।

'তুমি তাকে কেবল একবারই দেখেছ...তাও ভিড়ের মাঝে দূর থেকে, তারা,' বললেন তিনি। 'তার সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎ পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এছাড়া, মৎস্যই নির্ধারণ করে দেন কে তাকে স্বর্গীয় অনুভব করবে আর কে

করবে না। তুমি নিজ ইচ্ছায় তাকে ভালোবাসতে শুরু করবে না। তিনিই সময় নির্ধারণ করে দিবেন। তুমি তাকে ঘৃণা করবে, যদি সেটা তার বৃহত্তর পরিকল্পনার সাথে খাপ খায়। তার মনে কী চলছে তা কেউই বলতে পারবে না। আমি তোমাকে শুধু এটুকু বলতে পারি, পৃথিবীতে হাঁটতে থাকা ঈশ্বরের সবচেয়ে কাছাকাছি আছেন তিনিই।'

যা শুনেছে তাতে মানু বিস্মিত হলো না। সে নিজের মাঝেই গভীরভাবে এই কথা অনুভব করে। তারার একটু সন্দেহ হলো; তার কাছে মনে হচ্ছিলো এটা অতিরঞ্জিত বর্ণনা।

'আমাকে দয়া করে এটা বলুন,' প্রশ্ন করলো মানু, 'আপনি যেমন বললেন, যদি তিনি তেমনই হন আর আমি নিশ্চিত তিনি ঠিক তাই, তাহলে আমি কীভাবে তাকে আরেক দিন কয়েক ফোঁটা পানির জন্য তৃষ্ণার্ত আর অচেতন অবস্থায় পেয়েছিলাম? যিনি এমন সর্বশক্তিমান, তিনি কীভাবে এমন অসহায় অবস্থায় পড়েন?'

'সেদিন তিনি মারা যাচ্ছিলেন না, মানু। তুমিই মারা যাচ্ছিলে! তিনি অনন্ত, জীবন আর মৃত্যুর ধরাবাঁধা নিয়মের উর্ধ্বে। এটা কেবল তোমার জন্য তার চূড়ান্ত পরীক্ষা ছিলো। তিনি কেবল নিশ্চিত হতে চাইছিলেন, পৃথিবী থেকে যে মানুষকে তিনি আশা করছিলেন, আক্ষরিক অর্থেই সে তার বিশ্বাসের যোগ্য কি না। আরেকজন মানুষকে রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ দিতে ইচ্ছা প্রকাশের মাধ্যমে তুমি তাকে সঠিক প্রমাণ করেছ। পরীক্ষায় পাশ করেছ তুমি।'

'কিন্তু তারপর, আপনি কীভাবে মৎস্যের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন? তিনি এখানে থাকেন না, তবুও মনে হয় তিনি সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। তিনি রাজা নন, তবে হাজারো রাজার সম্মিলিত আভা তার মাঝে আছে। তিনি যখন হাসেন, পুরো মহাবিশ্ব তার সাথে হাসতে থাকে। তিনি যখন বিরক্ত হন, আকাশ বিলাপ আর কান্নাকাটি করে। তিনি কে আসলে?'

মহিলাটি কিছুক্ষণ ভেবে কথা শুরু করলেন।

'মৎস্য কোথা থেকে আসে তা কেউই জানে না, মানু। কেউই জানে না তার অনুসারীরা কারা। বলা হয়, তার হাজার হাজার অনুসারী আছে, যারা সবাই পানিতে বাস করে। কেউ কেউ বলে, সমুদ্রের পৌরাণিক দানব লোক-নাস বা মানব ধ্বংসকারী, একশত জাহাজের সম্মিলিত আকারের চেয়েও বড় জলজ ড্রাগন তারই একনিষ্ঠ ভৃত্য। মৎস্য একবার এই পাহাড়কে বর্বর সেনাপতির বিশাল বাহিনী থেকে রক্ষা করেছিলেন। যখন শত শত ঘোড়সওয়ার তার দিকে এগিয়ে আসছিলো, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি একাই দাঁড়িয়েছিলেন,

তার মাছের ঝাঁকে তৈরি লম্বা আলখাল্লা বাতাসে শব্দ করে উড়ছিলো। মৎস্য সহজ হাসি দিয়ে বাতাসে তার দুই হাত উঁচু করলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি। শত শত ঘোড়া থেমে যায়, তাদের আরোহীরা বাতাসে উড়ে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের বালিতে আছড়ে পড়ে। পিছু হটার আগে ঘোড়াগুলো মৎস্যের কাছে মাথা নত করে।'

মানু আর তারা নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলো, তারা হতভম্ব। এই দয়ালু গোত্রকর্ত্রী কখনোই মিথ্যা বলবেন না। তার মতো আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করা কেউ দৃষ্টিভ্রম কিংবা জাদুকরের জাদুতে বিভ্রান্ত হবেন না।

'আমাদের সাথে এতগুলো আলাপ করার জন্য ধন্যবাদ; মা। মৎস্য কে তা আমাকে নিশ্চিত করে বলার কোনো দরকার নেই। আমার মনে হয়, আমি জানি তিনি কে,' দুর্বল হাসি দিয়ে বললো মানু।

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন। তিনিও কথাটা জানতেন।

'কেবল একটা প্রশ্ন, মা...মৎস্যের গায়ে কীভাবে সব সময় সমুদ্রের গন্ধ থাকে? এখান থেকে আশপাশে একশো মাইলের মাঝে কোনো সমুদ্র নেই।'

'তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, মানু,' উত্তর দিলেন তিনি, 'মৎস্য নিজেই সমুদ্র।'

* * * * *

গলা উঁচিয়ে কথা বলছে ওরা।

তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। এত কিছুর পরেও, এমনকি আসন্ন প্রলয়ের মাঝেও মানু তার প্রতিশোধের জন্য হরপ্পায় যেতে চাইছে।

মৎস্যের তাৎক্ষণিক উপদেশে সোমদত্ত তারাকে পরামর্শ দেয়, এ কথা সে যেন মানুকে না বলে যে দেবতা বেঁচে আছেন। আর তিনি কে বা কী হয়ে উঠেছেন। তারা তীব্র প্রতিবাদ করেছিলো। সে তার প্রিয় মানুষটা থেকে কোনো কিছুই লুকাবে না–অন্তত তার বাবা বেঁচে থাকার খবর তো নয়ই। কেবল মানুর নিরাপত্তাই তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি করিয়েছিলো। সে জানতো, যদি মানু বুঝে ফেলে বিভাষণ পূজারি জীবিত আছে, সে হয়তো তার বাবার সাহায্যার্থে ছুটে যাবে–যাকে সে মুক্তির উর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করে। হরপ্পার সূর্য সম্পর্কে সে যা জানতো তা হলো, তিনি মৃত। আর যা অবশিষ্ট ছিলো, তা হলো একটা খুনে রাক্ষস...আর মানুও তেমন একজন হয়ে যাবে, যদি সে মানুকে বিভাষণ

পূজারির মতো করে নিজের প্রতিশোধের আগুনে জ্বলার সুযোগ করে দেয়। মানুর কাছে একটা কিছু গোপন রাখার জন্য সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছিলো, যদিও তার হাতে আর কোনো উপায় ছিলো না।

'তোমাকে একটা না একটা জিনিস বিশ্বাস করতে হবে, মানু,' চাপা কণ্ঠে বললো তারা। সে বেশ কিছু দিন ধরে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে চলেছে। 'তুমি হয় বিশ্বাস করবে যে প্রলয় আসছে। সেক্ষেত্রে, প্রিয়ংবদা, চন্দ্রধর, গান, শা, এপ–যারা দেবতাকে পাথর দিয়ে আঘাত করেছিলো, যেসব হতভাগারা তাকে থুতু মেরেছিলো, প্রত্যেকে যেভাবেই হোক ধ্বংস হবে! আর যদি তুমি বিশ্বাস নাই করে থাকো যে মহাপ্রলয় আসন্ন, তাহলে কেন আমরা এই অন্ধকার পাহাড়ে পড়ে আছি?'

তার কথায় যুক্তি আছে। সব সময়ই ছিলো।

'যদি প্রলয় এসে আমার পরিবারকে যারা ধ্বংস করেছে, আমাকে মাকে যারা হত্যা করেছে, আমার বাবার থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে, সেসব নারী আর পুরুষকে খুন করে, তাহলে তা মানু পূজারির অস্তিত্বের জন্য লজ্জাজনক! আমার তলোয়ারের ঠান্ডা ধারালো প্রান্ত যে প্রগাঢ় যন্ত্রণা বেরিয়ে আসে সেটাই প্রিয়ংবদা, চন্দ্রধর আর ওসব কালো জাদুকরের পৃথিবীর থেকে চলে যাওয়ার আগে শেষ অনুভূতি হওয়া উচিত,' ঠান্ডা গলায় বললো মানু।

'আর তুমি কী মনে করো সেটা তোমার মা, অনন্য সুন্দরী সানজানাকে গর্বিত করবে, সত্যব্রত?'

মানু আর তারা খেয়াল করলো, মৎস্য তাদের কাছে চলে এসেছেন। নীল মৎস্য-মানব তারার দিকে তাকিয়ে হাসি দিলেন। তারার নিঃশ্বাস যতখানি ছিলো অতটুকুতেই আটকে গেল, আর সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, ঠিক যেমনটা মৎস্যের সাথে প্রথমবার দেখা হওয়ার পর মানু দাঁড়িয়ে ছিলো। সে ঠিক তেমন শান্তি অনুভব করছিলো, যেমনটা ঐশ্বরিক মন্দিরের একেবারে গভীরতম স্থানে পাওয়া যায়। এমন শান্তি যা সে শৈশবে সানজানার কোলে পেয়েছিলো। এমন সুখ যেটা মানুর প্রতি ভালোবাসা তাকে দিয়েছিলো। তার মনে হলো সে কোথায় যেন মৎস্যকে দেখেছে। অথবা দেখেছে সবখানে।

মানু ঠিকই বলেছে...তিনিই ভগবান বিষ্ণু।

* * * * *

মৎস্যকে সম্মানজনক অভ্যর্থনা জানাতে মানু দুই হাত জড়ো করে মাথা নোয়ালো। সে-ই বর্তমানে তার সবকিছু। মৎস্য এইমাত্র যে প্রশ্ন করেছে তা সে এড়িয়ে গেল।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, মানু। তোমার কী মনে হয়, তোমার নিজের চাচা আর তিনজন অন্ধ লোকের সাথে একজন মহিলাকে হত্যা করলে কি তোমার বাবা-মা আর পূর্বপুরুষরা তোমাকে আর তোমার বীরত্ব নিয়ে গর্ব বোধ করবে?'

'আমি সেসব জানি না, মৎস্য। আমার মা আর বাবাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য আমাকে তাদের শাস্তি দিতেই হবে। দয়া করে আমাকে থামাবেন না, আপনার কাছে অনুরোধ করছি।'

মৎস্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে মানুর কাছে এগিয়ে গেলেন। তারা তখনো স্থির হয়ে আছে। দেবত্বে ডুবে যাচ্ছে সে।

'মেসোপটেমিয়ান জাদুকরদের নিয়ে ভাবতে হবে না, মানু। মহেঞ্জোদারোর রাজকন্যা এরই মাঝে তাদের পচন আর মৃত্যুর জন্য মৃৎ-কারাবাসে ছুঁড়ে ফেলেছে। এরা প্রলয় থেকে বাঁচবে না। কিন্তু তাদের ঘৃণ্য নামটা বেঁচে যাবে। আমি তোমাকে নিশ্চিত করছি, ঐ শয়তানদের কালো আত্মা কখনোই শান্তি পাবে না। আর প্রলয় থেকে বেঁচে যাওয়া প্রজন্মের মাঝে অন্ধকার অধ্যায়ের প্রতীক হিসেবে ওরা স্মরণে থাকবে। সামনের সময়ে এপ-শা-গান একটা ঘৃণার শব্দে পরিণত হবে।'

মানু মেনে নিয়েছে বলে মনে হলো না।

'আমাকে বলো, সত্যব্রত, তোমার মা তোমাকে কী দেখতে চাইতেন...একটা জীবন রক্ষা করবে অথবা একটা নেবে?' প্রশ্ন করলেন মৎস্য।

'অবশ্যই জীবন বাঁচানো, মৎস্য, কিন্তু এটা...'

'আর যদি এটা প্রতিহিংসার তৃষ্ণা নিবারণ নিয়ে কোনো প্রশ্ন হয়, তবে তিনি তোমার কাছে কী চাইতেন...সমগ্র সৃষ্টি রক্ষা নাকি পুরো বিশ্বকে মুক্ত করে দেওয়া?'

বানারস, ২০১৭
'ওরা ছিলো তার শিষ্য'

প্রায় এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। আর এর বেশিরভাগ সময়ই বিদ্যুৎ ছিলো অসহায়। জীবনরক্ষাকারী যজ্ঞ থেকে শুরু করে লস অ্যাঞ্জেলসে তার গোত্র প্রধানকে ভর্তি করানো পর্যন্ত সব রকম পরামর্শ দিলো সে। তার পরিবারের শেষ আর একমাত্র সদস্যকে ধরে রাখার জন্য ব্যাকুল ছিলো।

কিন্তু সময় গড়াতেই বিদ্যুৎ নিজেই তার বাবার রাশিফল দেখে নেয়, বাস্তবতা মেনে নিতেও শুরু করে। তীর্ব মর্কেশ বা অনিবার্য মৃত্যুর সময় খুব স্পষ্টভাবে তার প্রপিতামহের কুণ্ডলীর উপর কালো ছায়া ফেলছে।

যদি জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করে, তবে সত্যটা হলো, কেউই দ্বারকা শাস্ত্রীকে বাঁচাতে পারবে না।

মঠাধীশ বা পুরোহিত যা আশা করেছিলেন, বিদ্যুতের কুণ্ডলী পাঠের দক্ষতা তার চেয়েও বেশি ছিলো। দেবতা কিছু একটা দেখলেন যাতে তার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

দ্বারকা শাস্ত্রীর কুণ্ডলী কেবল এটাই বলেনি যে তার সময় ঘনিয়ে আসছে। খুবই যন্ত্রণাদায়ক, বীভৎস এক মৃত্যুর কথাও ভবিষ্যদ্বাণী করেছে।

* * * * *

'এখানে আরো কথা আছে। আমার সিদ্ধিগুলো মনে হলো পশ্চিমে কুখ্যাত ভূতের সাথে যুদ্ধের পর থেকেই বিবর্ণ হয়ে আসছে। ব্রহ্ম-রাক্ষস অবশ্যই আমার সেবা করছে, যেমনটা অর্ধ শতাব্দী আগে আমাকে সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক পরিশ্রম নিশ্চিতভাবেই এর প্রাপ্য বুঝে নিয়েছে। আমি বালার কালো আত্মা দেখতে পাইনি, যদিও সে আমার সামনেই ছিলো। আমার ত্রিকাল-শক্তি কোথায় ছিলো যখন ত্রিজাতের পিশাচিনী তার

উপর আমাদের সম্মিলিত মনোযোগের সুযোগ নিয়েছিলো আর পিছলে গিয়ে বালাকে খুন করলো? আর এখন যখন আমরা খুব সম্ভবত আমার জীবনের শেষ যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি না। আমি রক্তবীজ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত মনে করতে পারছি না। আমি এও জানি না, বিদ্যুৎ, যে আমি তোমাকে আদৌ কোনো সাহায্য করতে পারবো কি না।'

বিদ্যুৎ উঠে দাঁড়ালো, দ্বারকা শাস্ত্রীর চেয়ারের দিকে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে বসে পড়লো। মঠাধীশের এক পা নিজ হাতে তুলে নিয়ে শান্তভাবে টেপা শুরু করলো–নিজের বাবার প্রতি এটা তার গভীর ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার নিদর্শন।

'কেবল আপনার উপস্থিতিই এসব দুষ্ট আত্মাদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, বাবা। কেবল আপনার আভাই অর্ধেক কালো শক্তিকে বিনাশ করে দেবে। আমরা জানি না ত্রিজাত আমাদের দিকে কী ছুঁড়ে মারবে। এটা যেকোনো কিছুই হতে পারে। যদি তার অনিশ্চিত আক্রমণ থেকে আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারে, তবে সেটা আপনিই। কিন্তু এত কিছু বলার পরেও, বাবা, আমি আপনাকে অনুরোধ করবো আমাদের সাথে যোগ না দেওয়ার জন্য। দয়া করে এখানেই থাকুন।'

এটা কখনোই সম্ভব না। দ্বারকা শাস্ত্রী কখনোই তার প্রিয় বিদ্যুৎকে একাকী ছাড়বেন না।

এমনকি যদি এর মানে এও দাঁড়ায় যে এটাই তার খ্যাতিমান কিন্তু নির্মম কুণ্ডলীর শেষ অধ্যায়ের অবিকল নিয়তি।

* * * * *

'একদমই না, ন্যায়না!' গলা চড়ালো বিদ্যুৎ। অমাবস্যা আক্রমণে তাদের বিপদ সম্পর্কে তাকে বোঝানোর বৃথা চেষ্টা করছে সে।

'দেখো ন্যায়না, এবার আমরা একেবারে শয়তানের গুহার ভেতরে যাচ্ছি। ওখানে এমন শত শত আছে। আর এটা এখন কেবল হাত কিংবা অস্ত্রের যুদ্ধও না। এটা এমন এক যুদ্ধ যেটা আমি কিংবা তুমি আগে কখনোই করিনি।'

'তাহলে তুমি কেন যাচ্ছো?' প্রশ্ন করলো সে।

'কারণ আমি একজন তান্ত্রিক, ন্যায়না। আমার আকর্ষণীয় জামাকাপড় আর দামি ঘড়ির নিচে আমি জাদুবিদ্যার একজন দক্ষ চর্চাকারী। আমি বিশ বছর প্রশিক্ষণ নিয়েছি...প্রথমে আমার বাবার কাছে, এরপর আমার হিমালয়ান মঠের

বন্ধু গোপালের অধীনে। আমি হয়তো ত্রিজাতকে কৌশলে পরাজিত করতে পারবো না, তবে আমি কিছু সময়ের জন্য তার আক্রমণ সহ্য করতে পারবো।'

ন্যায়না তার মাথা ঝাঁকালো। সে কিছুই শুনতে রাজি না।

'তুমি নিশ্চয়ই আমার সাথে মজা করছো, বিদ্যুৎ,' জবাব দিলো সে। একই রকম বিরক্ত সেও। 'এই মঠ আমার ঘর! আমি এমন কোনো যুদ্ধ থেকে সরে আসবো না যেটা আমার পরিবার, আমার বাবা আর তোমাকে চিন্তায় ফেলে দেয়। তুমি...বিদ্যুৎ।'

বিদ্যুৎ এখন সরাসরি তার বড়, জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ন্যায়না, তুমি না...' বলতে শুরু করেছিলো সে।

'তুমি এখনো বুঝতে পারছো না, তাই না?' কথায় বাধা দিলো ন্যায়না।

সে বিদ্যুতের চোখে খুঁজছিলো...উত্তর, স্বীকৃতি। সে কিছু একটা দেখতে চেয়েছিলো।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' মৃদু স্বরে বললো সে।

বিদ্যুৎ জমে গেল। কীসে তাকে আঘাত করেছে তা সে জানে না। ন্যায়নাকে এত দুর্বল, এত আবেগী আর এমন বর্ণনাতীত সুন্দরী আগে কখনোই লাগেনি।

'কী?' সে কেবল এতটুকুই বলতে পারলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক হাজার বার হ্যাঁ...আমি তোমাকে ভালোবাসি, বিদ্যুৎ।' যেন তাকে নিজের অন্তরের কথা শোনার আর্জি করছে ন্যায়না। যেন নিজে দুই দশক ধরে যা শুনতে চায় তা বলার জন্য তাকে অনুরোধ করছে।

এক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এলো। আর কিছু না, একজন পুরুষ আর একজন নারী একে অন্যের উপস্থিতি আরো তীব্রভাবে অনুভব করছে, যেটা তাদের কেউ জানতো না সম্ভব ছিলো কি না। একজন খুব গভীর আর অসহায়ভাবে ভালোবাসে। আরেকজন প্রায় সেখানেই ছিলো, কিন্তু এরপরেও সীমানার ওপাশে না যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সে বলতে পারছে না সেও তাকে পাগলটা ভালোবাসে। কিন্তু আবার তার মনটাও সে ভাঙতে পারবে না। এতসব কিছুর পরে অন্তত না।

শুদ্ধ প্রবৃত্তিতে বিদ্যুতের হাত চলে গেল ন্যায়নার সরু কোমরের পেছনে, ততক্ষণে সে তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে এসেছে। তাদের শরীর কাছাকাছি আসতেই ন্যায়না টের পেল এরপর কী হতে যাচ্ছে। সে চোখ বন্ধ করে নিজেকে তার দেবতার কাছে সমর্পণ করলো।

বিদ্যুৎ নিজের ঠোঁট ন্যায়নার ঠোঁটে রাখলো, মেয়েটা যাকে শান্ত আর নম্রভাবেই গ্রহণ করলো। এক মুহূর্ত কেটে গেল দুজনের ঠোঁটে ঠোঁট লাগোয়া অবস্থায়। সেটা ভাঙলো আরেকটা দীর্ঘ, আবেগপূর্ণ চুম্বনের ঠিক আগে।

* * * * *

মঠের খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বিদ্যুৎ পুরোহিতজির সাথে কিছুটা একাকী সময় পেল। সে এখনো কয়েক ঘন্টা আগে তার আর ন্যায়নার মাঝে যা হয়েছে তাতে এখনো অবাক হয়ে আছে।

আমি কখনোই ঐ চুমুর কথা ভুলবো না। কখনোই না।

'পুরোহিতজি, আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। কখন ত্রিজাত আর বাবা কথা বললো, মনে হলো একে অন্যকে আগে থেকেই চেনে। একই ব্যাপার ঘটেছে অধ্যাপক ত্রিপাঠির সাথেও, যাকে বাবা ব্রহ্মানন্দ বলে ডাকছিলেন। হচ্ছেটা কী?'

'তুমি এখনো বুঝতে পারছো না, বিদ্যুৎ?' পালটা প্রশ্ন পুরোহিতজির। শেষ দেবতার প্রশ্নে কিছুটা অবাক তিনি।

হতবিহ্বল চাহনিতে এবং মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে পালটা প্রতিক্রিয়া দেখালো বিদ্যুৎ।

'আরে বাচ্চা ছেলে, ত্রিজাত আর ব্রহ্মানন্দ দুজনেই মহান দ্বারকা শাস্ত্রীর শিষ্য। এই মঠেই তারা থাকতো, প্রশিক্ষণ নিতো। এছাড়া আর কীভাবে ত্রিজাত আর তার পিশাচিনীরা মঠের কারাগারের একেবারে সঠিক জায়গায় পৌঁছে যেতে পারলো?'

একমাত্র পরম-তান্ত্রিকের দিক নির্দেশনা ছাড়া এই পৃথিবীর কেউই ঐ দুজনের মতো তান্ত্রিক দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না।

শেষ সন্ধ্যা

বিভাষণ পূজারি তার রত্ন-মরু দিয়ে প্রথম অসুরের পেট থেকে বুক পর্যন্ত কোনাকুনিভাবে কেটে রীতিমতো ছিঁড়ে ফেললেন। বজ্রের গতিতে ঘুরে দাঁড়ালেন এরপর, দ্বিতীয় অসুরের শিরশ্ছেদ করতে করতেই তৃতীয় একজনের বুকে লাথি মারলেন। কয়েক ফুট উড়ে দূরের পাথুরে মাটিতে আছড়ে পড়লো সে।

এই সৈন্যরা সামরিক দক্ষতার দিক থেকে দেবতার সাথে কোনোভাবেই খাপ খাওয়ানোর মতো না। তাদের মাঝে কেউই তার সাথে পেরে উঠছিলো না।

কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিলো পঞ্চাশজন, সেই সাথে ছিলো তাদের কিংবদন্তি যোদ্ধা রাজা সুরা।

পরের কয়েক মিনিট ধরে চলা যুদ্ধে দেবতা আরো দশজন বর্বর যোদ্ধাকে হত্যা করলেন। এরা তাকে চারদিক থেকে আক্রমণ করছিলো, আর তিনি নিজেও তার শরীরে কিছু কাটা আর আঘাত সহ্য করেছেন। তার চামড়া সদৃশ বিকৃত দেহের কারণে দেবতা আর কোনো ক্ষত বহন করতে পারছিলেন না।

আর তখনই সুরা তার সেরা সাতজন সেনার নাম ধরে ডাক দিলো, সেই সাথে বের করে আনলো নিজের বিশাল আকারের তলোয়ার।

* * * * *

সুরা কোনো সাধারণ সেনা ছিলো না। অতীতে সে দেবতার হাতে পরাজিত হয়েছিলো, তবে তখন ছিলো দুজনের মুখোমুখি লড়াই। এছাড়া, এখন দেবতা এখন যেমন শারীরিক তখন আছে, তখন তেমন অবস্থায় ছিলো না। এই দুই কারণেই বিভাষণের জন্য বাধা প্রতিরোধ করা আর চারদিক থেকে বর্শার আক্রমণ ঠেকানো কঠিন হয়ে যাচ্ছিলো।

আচমকা দেবতা তার চারপাশের প্রতিপক্ষের বলয় ভেদ করে কাছের এক পাথরের দিকে চলে গেল। এক সূক্ষ্ম আর দক্ষ মুভমেন্টে এক পায়ে বড়

পাথরটায় ধাক্কা দিয়ে ঘুরিয়ে পাথরটা নিজেকে উঁচুতে ওঠানোর জন্য ব্যবহার করলো। এতে করে সে বাতাসে ভেসে আক্রমণের সুবিধা পেল। এই বুদ্ধি কাজে দিয়েছে। এদিকে রত্ন-মরু এক অসুরের মাথা আলাদা করে ফেললো। ব্যথায় চিৎকার করে সাথে সাথেই মারা গেল সে।

কিন্তু দেবতার নড়চড় ক্রমেই শেষ হয়ে আসছে। সুরা এখন তাকে ভারী তলোয়ার দিয়ে একটানা উন্মাদের মতো আক্রমণ করছে, সেই সাথে প্রতিটা শক্তিশালী আঘাতের সাথে সাথে বুনো পশুর মতো হুঙ্কার আর গর্জন করছে।

দেবতা যেমন সুরার পশুর মতো সব আক্রমণ ঠেকাচ্ছে, সেই সাথে আরো শত শত ব্লেড আর পাইকের আক্রমণও ফিরিয়ে দিচ্ছে। সে দেখতে পেল একটা লম্বা-ধারালো তলোয়ার তার দিকে এগিয়ে আসছে। পাঁজর ছিন্ন করে বেরিয়ে যাওয়া ঠেকাতে ওটার ধারালো প্রান্ত ধরে ঝাটকানো ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিলো না।

দেবতা ধারালো তলোয়ার আঁকড়ে ধরতেই তার হাতের তালু আর আঙুলে গভীর ক্ষত করে কেটে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন বিভ্রষণ পূজারি। তার অসামান্য বীরত্ব আর চৌদ্দজন নিহত অসুরের মৃতদেহ চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকার পরেও এটা এমন এক যুদ্ধে রূপ নিচ্ছে, যেটায় দেবতা জিততে পারবে না।

তারপর আচমকা শিলাবৃষ্টির মাঝে ধসে পড়া পাহাড়ের মাঝে চলা অসুর ও দেবতার তীব্র যুদ্ধের মাঝেই সপ্তম সপ্তর্ষি এক গম্ভীর, উঁচু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন–একমাত্র ঋষি যিনি প্রত্যাশিত দুর্বল আর কুঁচকানো দেহে বিরাজ করছিলেন না।

সকলকে ভয় পাইয়ে দিয়ে তার চোখ আবার খুলে গেল, এবার উজ্জ্বল নীল–বিশালকার আগুনের শিখার মতো নীল।

'নীল আগুনে রত্ন-মরুকে পুড়িয়ে নাও, দেবতা, আর দুষ্ট পাপাচারীদের পরাজিত করো। সপ্তর্ষিদের পবিত্র অবশেষ যে আগুনে আশীর্বাদ দিয়েছে তাতে এটা ঝালাই করে নাও। আর এই প্রাচীন তলোয়ারকে এর চূড়ান্ত পরিণতির জন্য প্রস্তুত করো!'

সবশেষ সপ্তর্ষির চিৎকার যখন শুনতে পেলেন, বিভ্রষণ পূজারি তখনো বাম হাত দিয়ে ভয়ানকভাবে এগিয়ে আসা তলোয়ারের সাথে লড়াই করছেন আর ডান হাতে নিজের তলোয়ার দিয়ে পালটা আক্রমণ করে চলেছেন। উঁচু, চিৎকার করা কণ্ঠের কারণে যেটুকু মনোযোগ সরে গেছিলো সেটা তাকে প্রয়োজনীয় সময় এনে দিলো। স্বর্গীয় আগুনটা থেকে তিনি মোটে বিশ ফুট দূরে ছিলেন।

এত অল্প রাস্তা দেবতাকে আটকে রাখা অসুরদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিলো না।

* * * * *

দৃশ্যটায় এমন কিছু ছিলো যেটা স্বয়ং পৃথিবী মাতা চিরদিন মনে রাখবেন। পৃথিবী কী করে মানব আর ঐশ্বরিক এই মিলন ভুলে যাবে? কী করে ভাগ্যের গতিপথ পরিবর্তন করার জন্য ঈশ্বরের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা তার চিরদিনের স্মৃতিতে খোদাই না হয়ে থাকতে পারে?

দেবতা তার তলোয়ার আগুনের মাঝে ছুঁড়ে দিতেই আগুন হুশ করে উঠলো, যেন নতুন করে ধরানো হয়েছে। ঠিক তার পর মুহূর্তেই একঝলক নীল আগুনের জ্বলন্ত কলামের মতো লাফিয়ে উঠলো আকাশ অব্দি। সুরা আর তার দলের সবাই বুঝতে পারলো তাদের নিষ্ঠুর হৃদয়ের গভীরে প্রাণঘাতী ভয় ঢুকে পড়ছে। প্রথমে তারা একে অন্যের দিকে ঠান্ডা দৃষ্টিবিনিময় করলো, এরপর জ্বলন্ত কলামের উচ্চতা দেখার জন্য চোখ আর মাথা উপরে তুললো–শুধু স্বর্গ থেকে বারবার নীল বজ্রপাত পড়তে দেখা গেল।

পৃথিবীর রাজত্বের বাইরে কেউ এখানে হস্তক্ষেপ করছে।

আকাশে যিনি আছেন, তিনিই এই অতিপ্রাকৃত ঘটনার পেছনে ইন্ধন জোগাচ্ছিলেন।

জ্বলন্ত কলামের পাশে আদিম যোদ্ধার মতো দাঁড়িয়ে আছে বিভাষণ পূজারি। তার মাথা পেছনে হেলানো, তার পা ছড়ানো আর হাত আগুনের স্তম্ভের ভেতর পর্যন্ত ছড়ানো। তার চোখ বন্ধ আর প্রার্থনায় ঠোঁট নড়ছে, শক্তিকে ডাকছে সে, সমস্ত সৃষ্টির দেবী যিনি। এই অন্ধকার ঝড়ের রাতে তাকে দেখতে স্বয়ং আগুনের মতো নীল লাগছে।

ধীরে ধীরে কলামের আগুন কমতে শুরু করেছে। প্রথমে এটা বড় আকারের নীল আগুনে ফিরে আসে, এরপর আরো কমে সাধারণ জ্বলজ্বলে হলদে আগুনে। বৃষ্টি আর শিলা খুব দ্রুতই এই সাধারণ পার্থিব আগুনকে নিভিয়ে ফেলবে।

কিন্তু কিছু একটা তখনো উজ্জ্বল নীল হয়ে জ্বলছে।

দেবতার তলোয়ার।

বানারসের সীমান্তে, ২০১৭
কালচক্র

ভয় পেয়ে গেল।

বিদ্যুৎ আর বলভান্ত অনেক বোঝানোর পর আর মঠাধীশের কড়া নির্দেশ
পক ত্রিপাঠিকে ত্রিজাতের গুহায় তাদের অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য
জ করানো হয়। বিদ্যুৎ বুঝতে পারছিলো, তার এতসব প্রতিবাদের পরেও
কোথায় যেন নিজের অন্ধ চোখের জন্য সুপ্ত প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষাই এই
অধ্যাপককে রাজি করিয়েছিলো। তিনি একা মৃতক-নাথের উপর প্রতিশোধ
নেওয়ার আশা করতে পারেননি। কিন্তু মহান দ্বারকা শাস্ত্রী, বিদ্যুৎ আর
বলভান্তের সাহায্যে তিনি সত্যিকারের বদলা নেওয়ার একটা সূক্ষ্ম সুযোগের
আভাস পাচ্ছিলেন।

পুরো দলটা তৈরি। এর নেতৃত্ব দিবেন স্বয়ং গোত্র প্রধান। সাথে ছিলো বলভান্ত, সনু, ব্রহ্মানন্দ, মঠের বাছাই করা একশো বা তার বেশ কিছু যোদ্ধা...আর বিদ্যুৎ।

* * * * *

ওদেরকে প্রচণ্ড নেশাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। নিকষ অন্ধকার, অমাবস্যার রাতে যজ্ঞশালার বাইরে দায়িত্বে থাকা অঘোরী প্রহরীরা দাঁড়ানো অবস্থাতেই অল্প অল্প দুলছে। অধ্যাপক ত্রিপাঠি ঠিকই বলেছিলেন। ওদের দেখে মনে হলো, ওরা কোনো শক্তিশালী মাদকের প্রভাবের মাঝে আছে।

ত্রিজাত কাপালিকের যজ্ঞশালা মূল বানারস থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। এর অবস্থান এক অস্বাভাবিক প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যা নিয়ে সাধারণত স্থানীয় পুলিশ খুব বেশি মাথা ঘামায় না। এর পেছনে পাপিষ্ঠ মশান-রাজের প্রতি তাদের ভয় আর তাদের আয় দুটোই কাজ করে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা ঐ এলাকা পুরোপুরিই এড়িয়ে চলে, যেহেতু তারা মধ্যযুগীয় এই শ্মশান নিয়ে জানতো। তারা বিশ্বাস করতো, মাঝে থাকা রহস্যময় দুর্গসহ এই পুরো এলাকা ছিলো ভূতুড়ে।

তারা ভুল ছিলো না।

* * * * *

চারদিক থেকে কয়েকশো মিটার গাছের ঝোপ ত্রিজাত কাপালিকের যজ্ঞশালা ঘিরে রেখেছে। রাতের অন্ধকারে, দ্বারকা শাস্ত্রী তার কমণ্ডল থেকে পবিত্র জল দুষ্ট যজ্ঞশালার চারপাশের মাটিতে ছিটিয়ে দিতেই বিদ্যুৎ আর বাকিরা কিছু অদ্ভুত প্রাণীর রাগী চিৎকার শুনে অবাক হয়ে গেল। চিৎকার যারা করছিলো তারা মানুষ ঠিকই। তবে শব্দ শুনে মনে হলো ওরা পৃথিবীর গর্ভ থেকে ভেসে আসছে।

সামন্ততান্ত্রিক এই শ্মশানে প্রাণ ফিরে আসছিলো।

পায়ে হেঁটে চুপিসারে অন্ধকার মঠের চারপাশের উঁচু প্রাচীরের দিকে পথ করে নিতেই অবর্ণনীয় একটা কিছু তাদের থামিয়ে দিলো। তারা অনেকগুলো নারী কণ্ঠের ভয়ংকর আর্তনাদ শুনতে পেল, যন্ত্রণায় আর অনন্ত অপেক্ষা নিয়ে কান্না করছে।

সনু বিদ্যুতের দিকে ঘুরলো, ভয়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে।

'ডাকিনী,' শান্তভাবে বললো বিদ্যুৎ।

কথাগুলো বলামাত্রই বিশাল আকারের কয়েক স্তরের একটা পূজার লণ্ঠনের আগুন ধরালেন–ঠিক যেমনটা পুরোহিতরা গঙ্গা আরতির বেলায় ব্যবহার করে। এর কর্পূর শিখা অন্ধকারে উঁচুতে উঠে গেল। যেইনা পবিত্র এই মশাল জ্বালানো

হলো, কান্নার শব্দ সাথে সাথে ফিসফিস, চাপা গর্জন আর চিৎকারের এক তীব্র আওয়াজে রূপ নিলো। মঠাধীশ মন্ত্র উচ্চারণ শুরু করতেই বাতাস এসে মাটি থেকে শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে গেল আর গাছগুলো সব দুলতে শুরু করলো–মনে হলো এই প্রাচীন শ্মশানে বসবাসকারী আর শ্মশান-রাজকে যারা সেবা করতো তাদের সম্মিলিত চিৎকারের কারণেই এই বিশৃঙ্খলার শুরু।

বিদ্যুৎ ঠিকই বলেছিলো। এমনকি নিজের ক্লান্ত আর বিকল অবস্থাতেও দেব-রাক্ষস মঠের গোত্র প্রধান ছিলেন দুর্দান্ত। একমাত্র এই পরম-তান্ত্রিকই প্রেতাত্মাদের নিজের ঘাঁটিতেই তাদের পুরো বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারেন।

* * * * *

ওরা এখন বিশাল কালো গেটের খুব কাছাকাছি। এটাই ত্রিজাত কাপালিকের যজ্ঞশালার প্রবেশপথে প্রহরা দিয়ে রেখেছে। বিদ্যুৎ তার বাবাকে প্রচণ্ড চাপের মাঝে দেখতে পেল। ভয়ানক দুর্গের কাছে প্রতিটা পদক্ষেপেই রাগী প্রেতাত্মা আরো শক্তিশালী হচ্ছিলো আর দ্বারকা শাস্ত্রী দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। মনে হলো, অদৃশ্য ছায়া গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে কেন মন্ত্রের আভা কমে এলেই তাদের সত্যিকারের ভয়াবহতা তুলে ধরা যায়।

'বাবা, আমার আর অধ্যাপক ত্রিপাঠির কি মন্ত্র উচ্চারণে যোগ দেওয়া উচিত? ওদের বিরুদ্ধে আপনার একার তুলনায় আমাদের তিনজন আরো বেশি শক্তিশালী হবো, কী বলেন?' প্রশ্ন করলো বিদ্যুৎ, নিজের প্রপিতামহকে নিয়ে উদ্বিগ্ন সে।

দ্বারকা শাস্ত্রী নাকচ করলেন আর বিদ্যুৎকে ইশারা করলেন পেছনের গেটে আক্রমণ করতে।

বিদ্যুৎ বলভান্তের দিকে ঘুরলো, যে ততক্ষণে তার দুটো ছোট ছুরিই বের করে এনেছে। এই যুদ্ধ চাকু, বর্শা আর হাতের মাধ্যমে হবে। দুই পক্ষই ভালো করে জানে, গুলি করে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণের চেয়ে এটাই ভালো, যেহেতু তারা এখানে রক্তের বন্যা বইয়ে দেবে। মঠের যোদ্ধারা এখন অন্ধকার শক্তির দুর্গে ঝড় তোলার জন্য প্রস্তুত।

* * * * *

ঠিক যে মুহূর্তে বিদ্যুৎ যজ্ঞশালার দিকে দৌড় দিতে যাবে, তখনই দ্বারকা শাস্ত্রী তার দিকে ঘুরলেন। তাকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'কিছু একটা ঠিক নেই, বিদ্যুৎ। পিশাচ আর ডাকিনীদের অমাবস্যায় আমি যেমনটা আশা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি ভয়ংকর মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি এর চেয়ে বেশি কিছু অনুভব করছি...আমরা যা কল্পনা করতে পারি, তার চেয়েও ভয়ানক কিছু। আমরা যেমনটা আশা করছিলাম, এই রাতে তেমন পরিণতি আসবে না।'

বিদ্যুৎ বুঝতে পারছিলো না কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত। অধ্যাপক ত্রিপাঠি দৃঢ়ভাবে এই সময়টা সুপারিশ করেছেন। আর এখন পিছু হটে যাওয়া মানে পরের অমাবস্যার জন্য অপেক্ষা করা।

দ্বারকা শাস্ত্রী বিদ্যুতের দ্বিধা বুঝতে পারছিলেন।

'এগিয়ে যাও, বিদ্যুৎ। মৃতরা এরই মাঝে জেগে উঠেছে আর পিছু হটে যাওয়ার জন্য অনেক দেরি হয়ে গেছে। কেবল নিজের দিকে খেয়াল রেখো, বাবা আমার...'

দেবতা তার গোত্র প্রধানের চোখে যন্ত্রণার ছাপ দেখতে পেল। যেভাবে শেষ বাক্যটা তিনি বলেছেন, মনে হলো বিদায় জানাচ্ছেন।

এতক্ষণে ত্রিজাতের প্রহরীরা মঠের সেনাবাহিনীকে দেখতে পেল আর সংকেত ছড়িয়ে দিলো।

'আমাদের যেতে হবে...এখুনি!' বিদ্যুতের দিকে চিৎকার করে বললো বলভান্ত।

বিদ্যুৎ তার প্রপিতামহকে ছেড়ে যেতে চায়নি। এখনো অনেক কিছুই অব্যক্ত, অনেক ভালোবাসা আর সম্মান দুজনের মাঝে ভাগ করে নেওয়া বাকি।

'আমি আপনার জন্য ফিরে আসবো, বাবা...আমি প্রতিজ্ঞা করলাম! আমি আপনার জন্য ফিরে আসবো!'

দ্বারকা শাস্ত্রী হেসে মাথা নাড়লেন, তার পবিত্র চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। তার অন্য এক সময়ের কথা মনে পড়ে গেল, অন্য এক যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে একজন স্নেহময়ী পুত্র তার মায়ের কাছে একই প্রতিজ্ঞা করেছিলো। কর্মের ধারাবাহিকতা কারোই নিয়ন্ত্রণে থাকে না। সময়ের চাকা সর্বদাই ঘুরছে, মানুষের আত্মাকে একই পরীক্ষায় সে বারবার উপস্থাপন করে।

কারণ কালচক্র অবিরাম।

হরপ্পার পূর্বে, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
সত্যব্রত মানু

হরপ্পাই সর্বপ্রথম মহাপ্রলয়ে ধুয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, জানালেন মৎস্য।

ওরা এখন সেই গুহায় ফিরে এসেছে যেখানে মৎস্য বড় একটা দলকে উদ্দেশ করে কথা বলছে। মৎস্য জগতের প্রধান যে ভয়ানক সম্ভাবনার কথা বললেন, তাতে প্রত্যেককেই হতবাক মনে হলো।

এই দলগত বৈঠকের আগের বৈঠকে তারা মৎস্যকে প্রশ্ন করার সিদ্ধান্ত নেয় তিনি কে আর কীভাবে এমন অদ্ভুত বিপর্যয় সম্পর্কে অনুমান করতে পারেন। কিন্তু তারপরেই সেই মুহূর্ত হাজির হলো। তারা নিজে মৎস্যের মতো মানুষ আগে কখনোই দেখেনি। খুব কাছ থেকে একনজর দেখে তাতেই সে বুঝে নিলো তিনি কোনো সাধারণ মানুষ নন। তিনি অন্য রকম কেউ।

ঠিক যেমনটা পাহাড়-প্রহরীদের নেত্রী বলেছিলেন, মৎস্যই ঠিক করে দেন কে কখন তাকে নিজের মতো করে নেবে, তাকে দেবতার মতো সমাদর করবে আর নিজ সন্তানের মতো স্নেহ করবে।

সে তাকে আর কোনো প্রশ্ন করবে না। তার শরীর, মন, আত্মার প্রতিটা বিন্দু এই অসাধারণ নীলচে মানুষের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তার মানু আর সে তাকে অনুসরণ করবে।

অন্ধভাবে।

* * * * *

'হরপ্পা কয়েক ঘণ্টার বেশি টিকবে না। আগামী কাল রাতের অন্ধকারে রক্তধারা পুরো নগরীকেই গ্রাস করে ফেলবে।'

মশালের মৃদু আলোয় উজ্জ্বল গুহাটায় হতবিহ্বল নীরবতা নেমে এলো। ঠান্ডা আর ভেজা সন্ধ্যার মাঝেও উপস্থিত সবার ঘাম বেরিয়ে আসছে।

হরপ্পায় বন্যা মানেই কয়েক হাজার মানুষের নিশ্চিত মৃত্যু।

'আমাদের অবশ্যই কিছু না কিছু করার আছে, মৎস্য,' কণ্ঠে প্রচণ্ড জরুরি ভাব এনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন সোমদত্ত। 'আমাদের হাতে কয়েক ঘণ্টা সময় আছে। আমরা হরপ্পায় যেতে পারি আর সবাইকে সতর্ক করে আসতে পারি। তারা তাদের সন্তানদের বাঁচাতে পারবে, মৎস্য। তারা নিজেদের বাঁচাতে পারবে...'

মৎস্য সাড়া দিলেন না। তিনি সোমদত্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন তার মনের প্রচেষ্টার অসাড়তার ছবি কল্পনা করছেন।

'কিছু একটা বলুন, হে মহান মৎস্য,' আর্জি করলেন সোমদত্ত। তিনি নিজেও এই ঐশ্বরিক মৎস্য-মানবের প্রতি মুগ্ধ। তিনি নিজেও কোনো এক কারণে গভীর থেকে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন সবকিছুই এখন মৎস্যের হাতে। মৎস্য এককভাবে পৃথিবীকে আসন্ন মৃত্যু এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে।

এবার মানুর উঠে কথা বলার পালা।

'আপনার অনুমতি নিয়ে আমরা এক ঘণ্টার মাঝে হরপ্পায় যাচ্ছি। সত্যি বলতে, এই শহর আর তার মানুষরাই আমার পরিবার এবং আমার কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। হরপ্পার সেনাদের তীরই আমার মায়ের হৃৎপিণ্ডে এসে বিঁধেছিলো। এই শহরের মানুষরাই আমার বাবাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলো, তার অত্যাচারিত হওয়া দেখে হেসেছিলো। আর যখন তিনি রক্তাক্ত ছিলেন, তাকে থুতু মেরেছিলো। কিন্তু তবুও, আমি বলবো, আমরা যাবো। আমরা যাবো; কারণ যদি আমরা এসব মানুষকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হই, তবে আমাদের সাথে সেইসব দুষ্ট হৃদয়ের বদমাশদের কোনো পার্থক্যই থাকবে না, যারা এই সমস্ত ঘৃণার কাজ করেছে। আমরা যাবো কারণ মানুষের জীবন আমার প্রিয় মা আর মহান বাবার জীবনের মতোই মূল্যবান।'

মৎস্যর চোখ এই যুবকের চরিত্র আর নৈতিক বুননের প্রশংসা না করে পারেনি। সেই সাথে ছেলেটার সিদ্ধান্ত নিয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্টি কাজ করছিলো তার মনে।

কেবল বিভাষণ পূজারি আর সানজানাই পারেন এমন চমৎকার একজন মানুষকে বড় করতে, যে সমস্ত পুরুষের মাঝে এক রত্ন।

'তোমরা দুজনেই কি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনোনি, সত্যব্রত, সোমদত্ত?' জানতে চাইলেন মৎস্য। এমন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছেন যারা

এইমাত্র নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যদের বাঁচানোর প্রস্তাব করেছে। হরপ্পায় যাওয়া মানে উভয়ের জন্যই তাৎক্ষণিক গ্রেফতার আর মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু তবুও তারা মানুষের জন্য নিজের জীবন বাজি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'যাদের নিয়তিতে সামনের এই বিশাল শুদ্ধতায় ধ্বংস লেখা হয়ে গেছে, তাদের বাঁচানোর চেষ্টার মানে কী? প্রলয় সবকিছু গ্রাস করবে, সবাইকে!' বলে গেলেন তিনি।

'যেমন হওয়ার হোক, হে শক্তিমান মৎস্য, আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি না,' শ্রদ্ধার সাথেই বললো মানু। 'যদি প্রলয়কে সবকিছু গ্রাস করতেই হয়, তাহলে আমরা প্রকৃতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবো না। তবে আমার মাঝে শেষ নিঃশ্বাস বাকি থাকা পর্যন্ত আমি নিশ্চল বসে থাকতে আর মানুষকে নিজের বাড়িতে ডুবে মরতে দেখতে পারবো না।'

মৎস্য মাথা নাড়লেন; মানুর এমন দৃঢ়চেতা অবস্থানে সম্পূর্ণ অসহায় তিনি।

'তাহলে তুমি মনে করো, যারা কয়েক মাস পরেই ধ্বংস হতে যাচ্ছে, তাদেরকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁচাতে যাওয়ার মানে আছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'হ্যাঁ, মানে আছে, মৎস্য,' এবার তারা উত্তর দিলো। 'যদি এর মানে এতগুলো মানুষের জীবনে আরো একটা দিন যোগ করা হয়, তাহলে এই ঝুঁকি নেওয়া যেতেই পারে।'

মৎস্য হাসলেন এবার। ঘরটায় থাকা সবাই অনুভব করলো, পুরো গুহার উপর দিয়ে একটা আনন্দের বাতাস বয়ে গেছে। তিনি হাল ছেড়ে দিলেন।

মানুষের ইচ্ছাশক্তিরই জয় হলো।

* * * * *

সিদ্ধান্ত হলো, মানু, সোমদত্ত, তারা আর কিছু পাহাড়-প্রহরী তৎক্ষণাৎ হরপ্পার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়বে। যদি ওরা একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে নিতে পারে, তাহলে সম্ভাব্য দুর্যোগের কয়েক ঘণ্টা আগে তারা ঐ অভিশপ্ত শহরের প্রবেশমুখে গিয়ে পৌঁছাবে। যদি ওরা দ্রুত শহরটা খালি করে ফেলতে পারে, অগণিত জীবন বেঁচে যাবে।

অন্তত এখনকার জন্য।

কিন্তু তাদের এই দুর্ভাগ্যজনক যাত্রা শুরু করার আগে মৎস্য আরেকটা ছোট দলের একটা সভা আহ্বান করলেন। যেখানে তিনি পাহাড়-প্রহরীদের সৌম্যদর্শন নেতা, সেই সাথে সোমদত্ত, তারা, মানু আর তার নিজের জাতির কয়েকজনকে আরেকটু ছোট গুহা-কক্ষে ডেকে নিলেন।

'তুমি খুব জেদি, সত্যব্রত,' সভার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন মৎস্য।

মানু থেমে মৎস্যের বাহু ধরলো, বাধ্য করলো সেই মৎস্য-মানবকে থেমে যেতে। মৎস্য মানুর দিকে তাকানোর জন্য ঘুরলো, এভাবে ধরে রাখায় কিছুটা অবাক সে।

'হে মৎস্য, আমাকে আপনি সত্যব্রত বলে ডাকেন কেন? আমার নাম মানু।'

মৎস্য হেসে চলতে শুরু করলেন, কিন্তু মানু তার মুঠো শক্ত করে ধরে তাকে পেছনে টেনে নিয়ে গেল।

'আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আপনি কোথাও যাচ্ছেন না,' মানু কিছুটা ঠাট্টা করেই বললো, তবে তার বন্ধু আর অভিভাবকে সে যেতে দিচ্ছে না। এতক্ষণে তারা দুজন এমন বন্ধন ভাগাভাগি করে নিয়েছে যা মানুকে কিছু স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

'দেখলে, আমি বলেছিলাম তুমি জেদি,' উত্তর দিলেন মৎস্য। এবার মানুর দিকে ফিরলেন তিনি।

দুই হাত বাড়িয়ে মানুর দুই কাঁধ ধরলেন তিনি।

'আমাকে বলো তো, মানু, সত্যব্রত মানে কী?'

মানুকে চিন্তাও করতে হয়নি। 'এর মানে এমন একজন যে সত্য কথা বলার অঙ্গীকার করেছে। এমন একজন যে সত্যের অভিভাবক হয়েছে।'

মৎস্য হাসলেন। তার চোখ গভীর স্নেহ নিয়ে মানুর চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে। 'ঠিক তাই। তুমিই হবে একমাত্র যে সত্যকে প্রলয়ের অন্য পাশে নিয়ে যাবে, মানু। তুমিই হবে একমাত্র সত্যব্রত।'

বিদ্যুৎ এমন লাথি মারলো যেটা ত্রিশূল হাতে এগিয়ে আসা অঘোরীর পাঁজরে কামানের গোলার মতো আঘাত করেছে। ব্যথায় লোকটা তীব্র চিৎকার করে উঠলো। তার পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে।

দেবতা এক ক্ষমাহীন মানসিক অবস্থার মাঝে ছিলো, বিদ্যুতের মতো একজন সোনালি হৃদয়ের মানুষের ক্ষেত্রে যা খুবই বিরল।

পরের দুজন একই রকম দুর্ভাগা। বিদ্যুতের ঘুসি একজনের মুখ বিকৃত করে দিলো। অন্যজন তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো কসাইদের ছুরি নিয়ে। দেবতা আক্রমণ এড়ালেন, আক্রমণকারী অঘোরীর কবজি চেপে ধরলেন এবং তার অন্য হাত আক্রমণকারীর গলা চেপে ধরলো। এরপর বিদ্যুৎ নিজের কপাল দিয়ে অঘোরীর কপালে আঘাত করলো। এমন নির্মম শাস্তিতে ভেঙে পড়লো সে।

বিদ্যুৎ দুর্গের কালো গেটের দিকে এগোতেই ত্রিজাতের দলের আরো কিছু লোক একই ভাগ্য বরণ করলো। যদিও একটা বিষয় দেবতাকে অঘোরীদের সাথে লড়াই করার সময় ভাবিয়ে তুলছিলো।

আজ রাতে তাদের যেমন নেশাগ্রস্ত থাকার কথা ছিলো, এসব মানুষকে তেমন লাগছে না।

মশান-রাজের যজ্ঞশালার উঠানে পা রাখার পর বিদ্যুৎ আর বলভান্ত নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না। এটা তাদের দেখা বা কল্পনা করা সবচেয়ে অসুস্থ, বিদ্বেষপূর্ণ জায়গা। ক্ষণিকের জন্য তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলো, এরপর তারা তাকালো অধ্যাপক ত্রিপাঠির দিকে, যাকে দেখতে জীবন্ত মৃতদেহের মতো লাগছে।

বিশালাকারের খোলা মূল অংশটায় একশোরও বেশি তন্ত্র আয়োজনের মঞ্চ ছিলো, প্রতিটাই নিচু সিমেন্টের বসার আসন দিয়ে ঘেরা। দীর্ঘদিনের

কালো আচার-অনুষ্ঠানের ফলে মস্তগুলো সব পুড়ে গেছে। ত্রিজাতের অঘোরীরা যেকোনো সময় একশত পূজা করতে পারে...একসাথে। বিদ্যুৎ কেবল অনুমান করছিলো, এরকম কিছু ঠিক কতখানি অদম্য আধ্যাত্মিক টান উন্মুক্ত করে দিতে পারে। খোলা চত্বরের চার কোণে কালো মার্বেলে তৈরি ভয়ানক দর্শন, চমৎকার এক মূর্তি। বিদ্যুৎ তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলো ওগুলো কীসের মূর্তি। অথবা তার চেয়ে বড় কথা, ওগুলো কার ভাস্কর্য। পুরো চত্বর মাংসের টুকরো, রক্তের দাগ, পশুর কাটা অঙ্গ, দেশীয় মদ এবং সব রকমের হাড় ছড়ানো। কিন্তু তাদের আচার-অনুষ্ঠানে একটা বিশেষ জিনিসের উপস্থিতি এই অঘোরীদের সত্যিই ঘৃণ্য করে তুলেছে।

মৃতদেহ।

তাদের মাঝে কেউ কেউ এখনো সাদা কাফনে মোড়ানো, শক্তভাবে রুক্ষ পাটের দড়িতে বাঁধা। অন্যরা রিগর মর্টিসের প্রভাবে দুমড়ে গেছে, তাদের চোখ উলটানো আর চোয়াল বিকৃত হয়ে আছে। পিটফায়ারের বড় মাঠের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য মৃতদেহ।

মৃত্যু আর মানুষের পচনের এই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে এই অসুস্থ রাক্ষস মঠের বাতাসে।

* * * * *

লড়াই তখনো চলছে। দেব-রাক্ষস মঠের তরুণ যোদ্ধারা তাদের দেবতাকে বীরের মতো অনুসরণ করে গেল। আর এখন ত্রিজাত কাপালিকের বর্বর অনুসারীদের সাথে ছুরিকাঘাত, হাতাহাতি আর রক্তপাতের এক ভয়ংকর যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওরা।

বিদ্যুতের চোখ পুরো কম্পাউন্ড চষে বেড়াচ্ছে, সেই রাক্ষসকে খুঁজে ফিরছে যে দেব-রাক্ষস মঠের প্রতিরক্ষা ভেঙে ফেলেছিলো। সে ঐ কালো জাদুকরকে খুঁজছে যে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলো বালাকে। সে আচার-অনুষ্ঠানের মাঠে সেই রাক্ষসের সন্ধানে ছিলো যে এক গোপন, বৈশ্বিক সংগঠনের সাথে সন্ধি করেছে আর দানবদের চুপিসারে তার বাড়ির দরজায়, তার মঠে নিয়ে এসেছিলো।

তার চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে মৃতদের দেবতা ত্রিজাত কাপালিককে।

সে যখন নিজের লক্ষ্যের আভাস পেতে চেয়েছিলো, তখন বিদ্যুৎ খেয়াল করলো বলভান্ত একটা কালো মার্বেলের মূর্তিকে খুঁটিয়ে দেখছে। ওটা

পেশিবহুল এক মানুষকে চিত্রিত করেছে যার প্রাগৈতিহাসিক দ্রাগনের মতো ডানা আছে। মূর্তির মুখ সুদর্শন হলেও স্বস্তিদায়ক না।

'বলভান্ত দাদা, আমাদের ত্রিজাতকে খুঁজে বের করতে হবে,' বললো বিদ্যুৎ। সে মঠের প্রধান সেনাপতিকে তার স্থির অবস্থা থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছে।

এক মুহূর্ত সময় নিলো বলভান্ত, কিন্তু শীঘ্রই ফিরে এলো বিদ্যুতের কাছে। আবারো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

যখন তারা পাশাপাশি কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে পূজার মাঠ, করিডর আর চারপাশের সারিবদ্ধ ঘরের দিকে নজর রাখছিলো, তখন বলভান্ত দেবতাকে প্রশ্ন না করে পারলো না। 'এগুলো কার মূর্তি, বিদ্যুৎ? এই অদ্ভুত শক্তিশালী কিন্তু ভয়ানক দর্শন প্রাণী কে? আমি আমাদের ধর্মগ্রন্থে তার কথা কখনো শুনিনি।'

বিদ্যুৎ চুপ করে রইলো।

তুমি তার কথা শোনোনি কারণ সে আমাদের ধর্মগ্রন্থে নেই।

'আমাকে বলো বিদ্যুৎ...' চাপ দিলো বলভান্ত।

সেনাপ্রধানের দিকে তাকালো বিদ্যুৎ। 'আমি জানি না কী হচ্ছে, দাদা। আমি জানি না এই মানুষগুলো কারা আর তারা কিইবা খুঁজছে। আমি সব সময়ই ভেবেছিলাম ত্রিজাত কাশীর একজন তান্ত্রিক। কিন্তু এই মূর্তিগুলো আমাকে ভিন্ন কিছু বলছে। ওগুলো এখানে থাকার কথা না।'

দেবতা এইমাত্র যা বললো তা পুরোপুরি ধরতে পারেনি বলভান্ত। 'কে এটা, বিদ্যুৎ?'

দেবতা কেবল একটা নাম নিলো। সম্ভবত পুরো পশ্চিমা বিশ্বে সবচেয়ে ভয় ধরানো নাম। 'এটা সে, দাদা। স্বয়ং শয়তান।'

বলভান্ত কিছুই বুঝতে পারেনি। কেবল বিদ্যুৎ যা বললো তাই আবার বললো, কোনো কিছু না বুঝেই, 'এটাই শয়তান?'

'হ্যাঁ, দাদা,' উত্তর দিলো বিদ্যুৎ। 'এটা লুসিফার।'

* * * * *

অবশেষে বিদ্যুৎ তাকে দেখতে পেল। ভয়ংকর আর বিশ্রি রকম জমকালো দেখাচ্ছে তাকে।

ওরা তাকে এমনি এমনিই শ্মশানের রাজা বলে ডাকেনি। অন্ধকার রাজ্যের সম্রাটের মতোই দাঁড়িয়ে আছে সে, ছাই-মুখ আর রক্ত-লাল মুখের অনুসারীদের মাঝে পরিবেষ্টিত অবস্থায়।

আর তখনই বিদ্যুৎ ওদের দেখতে পেল।

দুই পিশাচিনী। তাদের চোখ দেবতার উপর নিবদ্ধ। বিদ্যুৎ যখন তাদের দেখলো, তারা ভারী নিঃশ্বাস ফেললো।

শ্বাস নে। শ্বাস নে কারণ আজই তোরা তোদের শেষ শ্বাসটুকু নিবি।

বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে রইলো মশান-রাজ। নির্ভয়ে সে দেবতাকে ইশারা করলো, তাকে অনুসরণ করার আহ্বান জানালো। তখনই সে ঘুরলো আর বেসমেন্টের দিকে চলে যাওয়া একটা সিঁড়িতে মনে হলো যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার অনুসারীরা আর দুই ডাইনি তার সাথেই চলে গেল।

বিদ্যুৎ রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে তার দাঁতে দাঁত চাপলো আর মশান-রাজের দিকে এগিয়ে যেতে উদ্যত হলো। ঠিক তখুনি অধ্যাপক ত্রিপাঠি পেছন থেকে দেবতার বাহু ধরে ফেললেন।

'না, বিদ্যুৎ, সে তোমাকে পাতালের অভ্যন্তরে ইশারা করেছে। যেখানে সে রক্তবীজ অনুষ্ঠান পালন করে। সে তোমাকে প্রাচীন নরকের একেবারে মাঝখানে আহ্বান করছে। ও তোমাকে পাতালের প্রতি আকৃষ্ট করছে, বিদ্যুৎ।'

হরপ্পা, খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

হরপ্পার দেবতা

সুরা হাঁটুতে ভর করে বসলো। মাথা নিচু করে প্রচণ্ড অবিশ্বাস নিয়ে বিশাল, উজ্জ্বল তলোয়ারের দিকে চেয়ে আছে। তার বুক চিরে তলোয়ারের তীক্ষ্ণ প্রান্ত অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, রাক্ষসরাজের রক্ত টপটপ করে পড়ছে সেখান থেকে।

সুরা আজীবন বিভাষণ পূজারিকে ঘৃণা করে এসেছে। সপ্তর্ষিদের ঘৃণা করেছে, আর্যাবর্তকে মনে করে এসেছে তুচ্ছ।

অসুর সম্রাট কখনো আন্দাজই করতে পারেনি যে আর্যাবর্তের বুকে শেষ সপ্তর্ষির আদেশে আর বিভাষণ পূজারির তলোয়ারেই তার শেষ দেখতে হবে।

নিয়তি কিংবদন্তি রাক্ষসরাজকে মৃত্যুর জন্য হিন্দুকুশের গিরিখাত পর্যন্ত পুরো পথ টেনে এনেছে।

মৃত্যুর জন্য।

* * * * *

বিভাষণ পূজারির তলোয়ার চালানোর দক্ষতার পৃথিবীর কারো সাথেই তুলনা চলে না। রাক্ষসরাজ আর তার অনুসারীদের বধ করার জন্য দেবতার কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগেনি। একমাত্র যে অসুর দাঁড়িয়ে আছে, সে প্রচণ্ড। আর সে এই মুহূর্তে সুরার বর্বরতা থামানোর চেষ্টা করছে।

শেষ সপ্তর্ষি পাথুরে নদীতীরে শুয়ে ছিলেন, ভগ্ন আর বৃদ্ধ অবস্থায় শেষ সময়ের নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। বিভাষণ শ্রদ্ধার সাথে তাকে কোলে তুলে নিয়ে আলতো করে পাথরে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলেন।

বিচলিত দেবতা এই মুহূর্তে সবশেষ সপ্তর্ষির পায়ের কাছে বসে আছেন। অনেক হয়েছে। প্রিয় সন্তানের চিন্তায় তার আত্মা আনন্দিত হলো। তিনি যা হয়েছিলেন, তাতে তার বিবেক অনুতপ্ত। বিভাষণ পূজারি এখন শুধু মুক্তি চান–সেই সাথে আরো একবার মিলিত হতে চান সানজানার সাথে, সে যেখানেই থাকুক না কেন।

'আমায় ক্ষমা করুন, হে ধার্মিক ঋষি! যদি সম্ভব হয় আমাকে ক্ষমা করুন...' বললেন দেবতা। তীব্র বেদনা আর অবর্ণনীয় অনুশোচনায় তার কান্না ঋষিদের বাসস্থানের পবিত্র ভূমির উপর গড়িয়ে পড়ছিলো। সেই ঋষি সাড়া দিলেন না। গভীর ধ্যানে তার চোখ বন্ধ। দেবতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন।

আমার আত্মা ক্ষমা আর পুনরুদ্ধার ক্ষমতার উর্ধ্বে।

বিভাষণ তার নীলকান্তমণি হাতলের ছোরা বের করলেন।

'আমার কথা শুনুন, হে মহান ঋষি। আপনার পদচ্যুত ভৃত্য জানে যে আত্মঘাত (আত্মহত্যা) মানব বা মানবীর পক্ষে সম্ভব এমন সবচেয়ে বড় পাপের একটি। এটি জন্ম এবং মৃত্যুর জাগতিক চক্র উলটে দেয়। এটা সৃষ্টিকে অপমান করে যা আমাদের জীবনের মতো মূল্যবান উপহার দিয়েছে। কিন্তু আমি নিজেকে বাঁচানোর আর কোনো পথ দেখি না। এর চেয়ে লঘু কোনো শাস্তিই যথেষ্ট না। যদি সম্ভব হয় আমাকে ক্ষমা করবেন, হে স্বর্গীয় ঋষি।

'আমি, বিভাষণ পূজারি, আপনার প্রতি নিজের জীবন উৎসর্গ করলাম। এই কলঙ্কিত দেবতার মৃত্যুই হোক আপনার আর যে ঈশ্বরকে সে আশাহত করেছে, তার প্রতি শেষ উৎসর্গ।'

এই কথার সাথে সাথেই হরপ্পার কলঙ্কিত সূর্য নিজের পেটের সাথে ছুরি ঠেকালেন। প্রচণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে সবকিছুর সাক্ষী হয়ে রইলো। সে নিজেও খুবই অবাক হয়েছে; এতই অভিভূত যে বাধা দিতে পারছে না।

দেবতা চোখ বন্ধ করে ছুরির হাতলে হাত রাখলেন। ভগবান রুদ্রের প্রতি শেষ প্রার্থনা নিবেদন করছেন তিনি।

কিন্তু নিজের সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির মৃত্যু এভাবে হওয়ার কথা ছিলো না। ছুরিটা নিজের পেটে ঢুকিয়ে দেওয়ার একদম আগ মুহূর্তে শেষ ঋষি কথা বললেন।

'বিলাপ কোরো না, হে হরপ্পার সূর্য। তুমি পাপ করেছ এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমার আত্মা এখনই মুক্তির উর্ধ্বে নয়। এর কাজ এখনো শেষ হয়নি। তুমি ফিরে আসবে, হে দেবতা...অন্য এক যুগে, অন্য এক সময়ে।'

* * * * *

বিভাষণ পূজারি হাঁটু ভাঁজ করে বসে দুই হাত উরুর উপর রাখলেন। সাময়িক স্বস্তি আর কৃতজ্ঞতায় চোখ বুজলেন তিনি। এই বিভীষিকাময় রাতে এই প্রথম সপ্তর্ষিদের চিরায়ত, নম্র কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন তিনি, ঠিক যেমনটা একসময় শুনতেন তেমন।

'আমাকে যেতে দিন, হে ঋষি। আপনি কীভাবে আমার প্রতি সদয় থাকেন, যেখানে আমিই সীমা ছাড়িয়ে আপনার ছয় ভাইয়ের মৃত্যুর কারণ হয়েছি। আমি কেবল আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি আর এক ক্ষুদ্র নিবেদন হিসেবে আমার জীবন বিলিয়ে দিতে পারি,' দুই হাত জোড় করে বললেন দেবতা।

'তুমি সপ্তর্ষিদের হত্যা করোনি, বিভাষণ। কে তাদের ক্ষতি করতে পারে, যারা সৃষ্টির সাথেই এক হয়ে আছে? যেইমাত্র তুমি এখানে পা রেখেছ, তোমার ভেতরের দেবতা বুঝতে পেরেছ আমাদের ক্ষয়িষ্ণু দেহ আর ঋষিদের বাসস্থান ছিলো না। তুমি ঠিকই ধরেছিলে। সপ্তর্ষিরা চিরন্তন, অমর...আর আমরা এখন কালো মন্দিরের ঘরগুলোতে বাস করছি, যা আমাদের তপস্যার নীল আলোয় জ্বলছে। আমাদের আত্মা এখন নতুন ঐশ্বরিক দেহে বাস করবে। আর তোমার ছেলে, সত্যব্রত মানু, আমাদের সাথেই থাকবে।'

বিভাষণ পূজারির মনে হলো তার উত্তেজিত আত্মা হঠাৎ করেই শান্তির সাগরে ডুবে গেছে। আত্মসমালোচনায় ভুগতে থাকা বিবেক নিজেকে শান্তিতে ভারমুক্ত অবস্থায় খুঁজে পেল। সে জানতো কালো মন্দিরের ভেতরে কী লুকানো

আছে। সে জানতো, যদি মানু আর সপ্তর্ষিরা ওখানে থাকে, তবে তারা প্রত্যেকেই নিরাপদ। এই মহাবিশ্বের অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে বেশি নিরাপদ।

দেবতা এবার সপ্তর্ষির কাছে মিনতি করার শক্তি ও সাহস জোগাড় করলেন। তার কাছে শেষ একবার ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

'হে মহান ঋষি! আমার পুত্রকে আপনার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিন। এবং তাদের সন্তানদেরও। আমি যেহেতু পাপ করেছি, তাই শাস্তি আমাকেই দিন। আমাকে তেমন যন্ত্রণায় বন্দি করুন যা মানুষের সহ্য ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু আমার পুত্রকে রেহাই দিন। দয়া করে আমার বংশধরদের রক্ষা করুন।'

কী কারণে পাহাড়ে গর্জন হচ্ছিলো তা এখন দেখা যাচ্ছে। এক প্রচণ্ড ভূমিধস নদীর দিকে ধেয়ে আসছে। এরই মাঝে ছোট ছোট নুড়িপাথর বৃষ্টি আর শিলায় মাখামাখি মাটির উপর আছড়ে পড়তে শুরু করেছে।

এক মিনিটের মধ্যেই, যেখানে দেবতা অসুরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তা ধসে পড়া পাহাড়ের নিচে চাপা পড়তে যাচ্ছে।

'যা বলা হয়ে গেছে, তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, হে দেবতা! অভিশাপ ফেরানো যাবে না। কিন্তু তুমি তোমার অন্তরে ধার্মিকতা প্রদর্শন করেছ। তোমার আত্মার মঙ্গলময় দিক আমাকে, শেষ ঋষিকে রক্ষা করেছে। আমি তাই তোমার ঋণ শোধ করবো, হে হরপ্পার সূর্য। তোমার ছেলে, সত্যব্রত মানু, এই অভিশাপের স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবে।

'তোমার বংশধরদের সকলেই খ্যাতি অর্জন করবে, কিন্তু অভিশাপের সত্যতা রাখতে তারা সকলেই নৃশংসভাবে মারা যাবে। তুমি অন্য এক সময়ে গ্রহে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তারাই হবে কালো মন্দিরের অভিভাবক।

'সবশেষ অসুরের মাধ্যমে রত্ন-মরুকে কালো মন্দিরে পাঠিয়ে দিও, হে দেবতা। প্রচণ্ড তার সুরা রাজ্যে ফিরে যাবে আর তার জাতের মধ্যে এক নতুন ভোরের নেতৃত্ব দেবে। এখন চলে যাও, বিভাষণ পূজারি, পাহাড়কে এই ভূমির উপর চিরতরে কাফন পরিয়ে দিতে দাও।'

হরপ্পার দেবতা শেষ ঋষিকে প্রণাম করলেন। তার ভগ্নহৃদয় যা যা আশা করতে পারে, সপ্তর্ষি তার প্রায় সবই মঞ্জুর করেছেন। রাক্ষসরাজের মৃতদেহ থেকে তিনি তলোয়ার বের করে আনলেন আর শ্রদ্ধার সাথে অবিরাম বয়ে যাওয়া পানি এবং বৃষ্টির সাহায্যে ধুয়ে নিলেন।

'এটা কালো মন্দিরে নিয়ে যাও, হে প্রচণ্ড। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবো। এই অসাধারণ তলোয়ারকে তার উপযুক্ত স্থানে রেখে এসো,' অনুরোধের সুরে বললেন দেবতা।

শ্রদ্ধার সাথে তলোয়ার গ্রহণ করলো প্রচণ্ড এবং বিভাষণ পূজারিকে আশ্বস্ত করলো।

'তাই হবে, হে মহান দেবতা। আমি হিন্দুকুশের বাইরে সরার এই উপকথা সাথে নিয়ে ফিরে যাবো, যেন অসুরদের সব প্রজন্ম উপাসনা করতে আর শিখতে পারে। আপনার সাথে আজ রাতে এখানে থাকা আমার জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত। আপনি সত্যিকার অর্থেই অর্ধেক মানব, অর্ধেক ঈশ্বর।'

সপ্তর্ষির পবিত্র বাসস্থান পাথর আর ধুলোর স্তূপের নিচে চাপা পড়ার আগে সব আওয়াজ ছাপিয়ে শেষ ঋষির কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

'তোমার নাম অমর হয়ে থাকবে, হে বিভাষণ পূজারি। তুমি আবার জন্মাবে, এখন থেকে হাজার হাজার বছর পরে–এমন এক লক্ষ্য পূরণ করতে যা পৃথিবীতে পা রাখা আর কেউ কখনো পূরণ করতে পারেনি।

'চূড়ান্ত সময়ে কালো মন্দিরের রহস্য রক্ষার জন্য তুমি আবার জন্ম নেবে। তুমিই এক বিশেষ পূর্ণিমা রাতে রোহিণী নক্ষত্রে এর উন্মোচন করবে, আজ থেকে শত হাজার বছর পরে।

'কারণ এই কাজের জন্য তুমিই মনোনীত হয়েছ, হে মহান দেবতা।'

পাতাল

ত্রিজাতের যজ্ঞশালার নিচে নামার ঝুলন্ত সিঁড়ি ধরে নামার সময় বিদ্যুতের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে এলো।

বিশাল একটা হল, যেখানে স্বাভাবিক আলোর একটা সরু রেখা পর্যন্ত নেই। দেখে মনে হলো, এটা প্রাচীন একটা গুহা, কেবল দেয়ালে ফ্রেম করে রাখা শত শত মশালের আলো ছাড়া আর কোনো আলো নেই। পুরো দেয়াল জুড়ে লোহার দণ্ডের উপর মানুষের খুলি থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। খুলিগুলোর মুখ খোলা, খালি কোটর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। এসবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতো বিদ্যুৎ। দেহাবশেষের প্রতি তান্ত্রিকরা খুব গুরুত্ব দেয়, বিশেষ করে প্রাচীন তান্ত্রিক ও যোগীর ক্ষেত্রে মাথার খুলি। তাদের বিশ্বাস ছিলো, তারা এর থেকে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি অর্জন করতে সক্ষম।

গুহার দূরের প্রান্তে বিভিন্ন দেবীর বিশাল সব মূর্তি রাখা–মা কালী, মা বগ্লামুখী, মা শ্মশান তারা এবং অন্যরা। মশান-রাজ জানতো, মৃতদের জগতের কোনো অনুষ্ঠানই শক্তির এসব অবতারের আশীর্বাদ ছাড়া সম্পন্ন হবে না। বিদ্যুৎ সাথে সাথেই বুঝে গেল ত্রিজাত কত বড় ভুল করতে বসেছে।

দেবীর চোখের সামনে কোনো অশুভ শক্তিই শুভ শক্তিকে বিনাশ করতে পারবে না। আজ রাতে ত্রিজাত জয় পাবে না।

কিন্তু দেবতাকে যেটা সবচেয়ে বেশি চমকে দিয়েছিলো সেটা গুহার ঠিক মাঝখান বরাবর এক বিশালাকার গর্ত। সম্ভবত ওটা লম্বায় পঞ্চাশ ফুট আর বিশ ফুট মতো প্রশস্ত। বিদ্যুৎ এমন কোনো যজ্ঞ-আগুনের কথা কানে পর্যন্ত শোনেনি। হলঘরের মেঝেতে গর্তটা আনুমানিক পাঁচ ফুট গভীর আর তা জ্বলন্ত, উজ্জ্বল কয়লার অঙ্গার দিয়ে ভরা। আগুনের তাপ রীতিমতো অসহ্য আর পুরো জায়গাটাই ছিলো অস্বাভাবিক আর্দ্র। বিদ্যুৎ খেয়াল করে দেখলো গর্তটা কয়লায়

পরিপূর্ণ না। যখনই দেখলো মানুষের অঙ্গ এবং হাড় ঐ অন্তত আগুনে পোড়ানো হচ্ছে, রীতিমতো ছিটকে গেল সে। বুঝতে পারছে, এখানকার উৎকট বাতাস মূলত মানুষের মাংস পোড়ানোর কারণেই তৈরি।

যদি কোনো নরক বা পাতাল পৃথিবীতে থেকেই থাকে, বিদ্যুৎ তাতে পা রেখেছে।

* * * * *

'আমার এই দীনহীন যজ্ঞশালায় আপনাকে স্বাগত, হে দেবতা!' বিদ্যুতের দিকে না তাকিয়েই গর্তের অন্য প্রান্ত থেকে চিৎকার করলো ত্রিজাত। সে একটা মাটির পাত্র থেকে কিছু নিয়ে গর্তের আগুনে ঢালছে। নিচে জলন্ত অঙ্গারের সমুদ্র থেকে আসা লাল আভায় মশান-রাজকে স্বাভাবিকের তুলনায় আরো বেশি ভৌতিক মনে হচ্ছিলো। দুজনের মাঝে বেশ অনেকটা দূরত্ব থাকলেও বিদ্যুৎ সাথে সাথেই মহাতান্ত্রিকের পায়ের উপর বসে থাকা জম্বির মতো দুই মূর্তিকে চিনতে পারলো।

পিশাচিনী।

ত্রিজাতের বিশাল দেহের অঘোরী রক্ষকরা ধীরে ধীরে গর্তের অন্ধকার কোনা থেকে কমলারঙা আলোর দিকে সরে আসছে। এই তাপমাত্রা বেশ যন্ত্রণা দিচ্ছে আর বিদ্যুৎ ঘামে চুপসে আছে। ক্রমশ তাকে ঘিরে ফেলা সশস্ত্র অঘোরীদের দিকে চোখ রেখেই কালো শার্টের বোতাম খুলে ফেললো বিদ্যুৎ, ওটা খুলে নিয়ে কোমরে বাঁধলো। দেবতার শরীরের পেশিবহুল গড়ন আবছা আগুনের আলোয় চকচক করে উঠলো।

ততক্ষণে বলভান্ত, প্রফেসর ত্রিপাঠি আর সনুও নারকীয় বেজমেন্টে নেমে এসে বিদ্যুতের সাথে যোগ দিয়েছে।

যুদ্ধটা শুরু হওয়ার উপক্রম।

বিদ্যুৎ এগুলো, মুহূর্তেই সেটা দৌড়ে রূপ নিয়েছে। সে যে গতিতে এগিয়েছে তা অঘোরীদের সম্পূর্ণ হতবাক করে দিলো। সেকেন্ডের মধ্যেই দেবতা লাফ দিয়ে এক বিশাল প্রহরীর বুকে তার পা দিয়ে সজোরে আঘাত করলো। অঘোরীরা নিজেরদের অস্ত্র ওঠানোর আগেই বাতাসে ভেসে পরের প্রহরীর মাথা বরাবর লাথি দিলো বিদ্যুৎ। দুজনেই গাছের গুঁড়ির মতো মাটিতে নুয়ে পড়লো।

বাকিদের দিকে এগিয়ে যেতেই বিদ্যুৎ চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেল, ত্রিজাত এবার সেই একই পাত্র থেকে দুই পিশাচিনীর উপর রক্ত ঢালছে–যাদের এখন দেখতে একপ্রকার মোহগ্রস্ত বলেই মনে হচ্ছে। বলভান্ত আর সনুও শত্রুর দিকে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। আর মঠের প্রধান সেনাপতিই প্রথম আঘাত হেনেছে। এক আক্রমণকারীর পুরো বাহুই ছিঁড়ে নিয়েছে সে।

এই যুদ্ধ খুব বেশি লম্বা হবে না। আর সেটাই বিদ্যুতের চিন্তার কারণ।

এটা খুবই সহজ। মশান-রাজ কি আমাদের প্রতি এমন আক্রমণই করবে?

আর তারপরেই সে ওটা খেয়াল করলো।

যা দেখছে, তা ঠিক কি না সেটা বুঝে নিতে মাথা নাড়লো বিদ্যুৎ। দেখতে যা লাগছিলো, যেন দুটো ভৌতিক দেহাবয়ব গর্তের আগুন থেকে বেরিয়ে আসছে। মনে হচ্ছিলো গাঢ়, ধূসর ধোঁয়ায় তৈরি, কিন্তু দেবতা তার ভেতরে দুজনের অবয়ব দেখতে পাচ্ছে। দুটো ভয়ানক অবয়ব। যেইনা তারা দুজন বিদ্যুতের দিকে তাকালো, তার ঘাম ঠান্ডা হয়ে এলো। ঐ দুজন ছিলো তার দেখা সবচেয়ে রক্তশীতল করা, সবচেয়ে কুৎসিত আর সবচেয়ে বিদঘুটে চেহারা। তাদের আতঙ্ক ছিলো মানুষের কল্পনার বাইরে। ওরা ছিলো দুই প্রাচীন ডাকিনী; যাদেরকে ত্রিজাত মৃতদের জগৎ থেকে ডেকে এনেছিলো।

দুই পিশাচিনী গর্তের ধারে বসা, তাদের চোখ উলটানো আর মুখ খোলা, প্রচণ্ড শব্দে শ্বাস নিচ্ছে। ত্রিজাত কাপালিক অবিরাম কালো জাদুর মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছে, বা রাগী ডাকিনীদের সাথে কথা বলছে। দুই ভয়ংকর ধূসর ধোঁয়ায় ভেসে ভেসে পিশাচিনীর দিকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে যাচ্ছে।

এখন বিদ্যুৎ জানে, মহাতান্ত্রিক কী করতে যাচ্ছিলো। সে দুই ডাকিনীকে তার ঘাতকদের শরীরে ডেকে নিচ্ছিলো। যদি সে সফল হয়...স্বয়ং বিদ্যুৎও এদের অশুভ আক্রমণ ঠেকাবার সক্ষমতা রাখে না।

* * * * *

'ওঁম বিজাম;
নামাহ শক্তি;
সিভায়েতি কিলকাম...'

বিদ্যুৎ, বলভান্ত, সনু, ব্রহ্মানন্দ...প্রত্যেকেই মাটির নিচের গুহার সিঁড়িতে দ্বারকা শাস্ত্রীর উঁচু হতে থাকা ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে। বিদ্যুৎ আর প্রফেসর

ত্রিপাঠি দুজনেই জানতো প্রধান ধর্মগুরু কোন মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। সময়ের শুরু থেকেই অতিপ্রাকৃত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী মন্ত্র।

তিনি ভগবান শিবের শাশ্বত রক্ষাকবচ উচ্চারণ করছেন। সেই অপ্রতিরোধ্য শিব কবচ!

দুই ভূতুড়ে অবয়ব প্রতিবাদে চোখ রাঙালো। তাদের চিৎকার এতই ভয়ানক ছিলো, সনু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটুতে ভর করে বসে গেল। দুই হাত দিয়ে কান চাপ ধরেছে সে। ডাকিনীর থেকে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে।

তারা পাক খেলো, চোখ পাকালো, চিৎকার করলো...তবে সবই ব্যর্থ। এটা পরিষ্কার ওরা পিছু হটছে। যে অন্ধকার থেকে উঠে এসেছিলো, তাতেই ফিরে যাচ্ছে।

কোনো ডাকিনী বা প্রেতাত্মাই শিব কবচের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারে না। তবে শিবের এই শাশ্বত রক্ষাকবচ একজন মানুষকে অন্য আরেক মানুষের প্রতারণা থেকে রক্ষা করতে পারে না।

বিদ্যুতের মনে হচ্ছে তার মাথা দুই ভাগ হয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা, আর সেই সাথে তার দৃষ্টিও কমে আসছে। দুই হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরলো দেবতা। আঙুলগুলো তাৎক্ষণিক তার মাথার ত্বকের ক্ষত থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে ভিজে যাচ্ছে। অজ্ঞান হওয়ার আগ মুহূর্তে কী তাকে আঘাত করেছে তা দেখার জন্য চারপাশে তাকালো।

দ্রুত ঝাপসা হয়ে আসা দৃষ্টিতে এক চোখের এক দানবকে দেখলো সে। আর সাথে সাথে তাকে চিনতেও পারলো।

ক্ষ্যাপাটে উন্মাদের মতো করে হাসছেন প্রফেসর ত্রিপাঠি। তার চশমা এখন আর নেই। তার শূন্য চোখ দিয়ে হলদে কোটরের ভেতরে গোলাপি মাংসপেশি দেখা যাচ্ছে। তাকে দেখতে ডাকিনীদের মতোই বীভৎস লাগছে।

অজ্ঞান হতে হতেই বিদ্যুৎ ব্রহ্মানন্দের মুখ থেকে আসা শেষ কথাগুলো শুনতে পেল।

'নরকে স্বাগতম, দেবতা!'

হরপ্পার পূর্বে, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
মানুর জাহাজ

'কিন্তু কী ধরনের তরী আপনি বানাতে চান, মৎস্য? আর আমাদের নতুন একটা কেনই বা বানাতে হবে? বন্দরে হাজারের মতো বড় জাহাজ আছে। আমরা যদি সময়মতো পৌঁছাতে পারি, আমরা সেখান থেকে কিছু জাহাজ নিতে পারবো।'

মৎস্য যখন সোমদত্তকে বিশাল জাহাজের প্রধান প্রকৌশলী হতে বললেন, তখন তিনি রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেছিলেন।

পুরো রুমে নীরবতা নেমে এসেছে। মানু, তারা, পাহাড়-রক্ষকদের প্রধান আর বাকি সবাই মনে হলো সোমদত্তের সাথে একমত। কিন্তু যেখানে আকাশ খুব বেশি ভরসা জোগাচ্ছে না, প্রচণ্ড বাতাসে চোখ খোলা রাখাই অসম্ভব, মানুষ এবং জন্তু উভয়েই ভয়ে জমে গেছে, সেখানে নতুন কিছু বানানোর ব্যাপারে একমত হতে পারছে না ওরা কেউই।

মৎস্য উঠে দাঁড়ালেন। পাথুরে দেয়ালের প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি জানালা দিয়ে বাইরে নজর দিলেন তিনি। দেখতে পেলেন বজ্রপাতের আকাশ ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে। বৃষ্টির ফোঁটা তার আশ্চর্য নীল মুখের উপর এসে পড়ছে।

সময় হয়ে এসেছে।

* * * * *

'যখন পর্যন্ত আর্যাবর্ত হুমকির মাঝে আছে, এটাই বিশ্বের শেষ!'

মৎস্য যখন বাকি সবাইকে মানুর সাথে তার কথাবার্তা সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছে, তখনই বুঝতে পেরেছিলো যে সময় ঘনিয়ে আসছে।

'ক্ষমা করবেন আমায়, তবে আপনি বিশ্বের শেষ বলতে আসলে কী বুঝিয়েছেন, মৎস্য? আমরা যতখানি কল্পনা করতে পারি, পুরো পৃথিবী এর চেয়েও অনেক বড়। নিশ্চয়ই সেখানে এমন অনেক অঞ্চল থাকবে যা এই দুর্যোগের আওতায় পড়বে না?' খানিকটা যুক্তি দিয়েই জানতে চাইলেন সোমদত্ত।

তিনি ভুলে যাচ্ছিলেন, মানুষের যুক্তিবিদ্যার আরো লক্ষ লক্ষ বছর আগেই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিলো। সৃষ্টিকর্তা, যিনি কয়েক বিলিয়ন গ্যালাক্সি আর পৃথিবীর মতো ট্রিলিয়ন খানেক গ্রহের তত্ত্বাবধায়ক, তার যুক্তি সোমদত্তের চেয়েও অনেক বেশি বিস্তৃত। আর তিনি অনেক কিছু বিবেচনায় এনেছিলেন।

জানালা থেকে সরে দাঁড়ালেন মৎস্য। দিনের আলোর মাঝেই আকাশে বজ্রপাত হলো, যেন মৎস্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি যা বলবে তার প্রতি আলোকপাত করছে।

'আর্যাবর্ত এমন মহাপ্লাবন আগে কখনোই দেখেনি। অথবা পুরো পৃথিবীর ক্ষেত্রেই এটা সত্য। কোনো কিছুই বাদ যাবে না। না কোনো মানুষ, না কোনো উদ্ভিদ, কোনো প্রাণি, কোনো পাখি, কোনো পোকামাকড়, কোনো বাড়ি, কোনো মন্দির, কোনো পাহাড় বা কোনো বনভূমি। প্রলয় সেই মহাজাগতিক শক্তি যা আর্যাবর্তকে সবকিছু থেকে মুক্ত করে দেবে। পাহাড়ের চেয়েও উঁচু ঢেউ উঠে আসবে আর সে পথে যা কিছু পাবে তার সবই ধ্বংস করে দেবে।

'হ্যাঁ, কিছু জায়গা বেঁচে যাবে। তবে আর্যাবর্ত থেকে কেউই অত দূরের জায়গায় যেতে পারবে না।

'রক্তের মতো লাল হয়ে উঠবে আকাশ। কয়েক মাস ধরে চলবে মুষলধারে বৃষ্টি, আর তাতে মহাসাগরগুলো চেনা পৃথিবীর সবকিছু ডুবিয়ে দেবে। মুহূর্তের মাঝে শহরগুলো তলিয়ে যাবে, লাখ লাখ প্রাণ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।

'প্রলয়...ভয়ানক মহাপ্রলয় ধেয়ে আসছে।'

* * * * *

তাদের দেখে মানু নির্বাক হয়ে রইলো।

গুহার উপরে উঁচু চূড়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন মৎস্য।

বৃষ্টির মাঝে অবিচল সাহস নিয়ে বসে পাহাড়ের উপর সাত সন্ন্যাসী ধ্যান করছেন। হালকা নীল আলোয় জ্বলছেন সাতজনেই। যখন বজ্রপাতের আলোয়

পাথর আলোকিত হয়ে উঠলো, তখন সেই আলো থেকে মানু বুঝতে পারলো, এসব সন্ন্যাসীরা সাধারণ যুবকের চেয়েও বেশি কিছু না, সম্ভবত বয়সে তার চেয়েও ছোট। তারা অবিশ্বাস্য রকম শান্ত। তাদের সেই শান্তভাব অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের সারা শরীরেই উজ্জ্বল দীপ্তি, যেন এইমাত্র কোনো ঐশ্বরিক গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছেন সবাই।

সত্যিই তাই।

'মানু, ওরা সপ্তর্ষি। তুমি যে কঠিন যাত্রা শুরু করছো, তাতে ওরা তোমাকে পথ দেখাবে, তোমার সঙ্গী হবে। তুমিও তাদের জন্য ঠিক একই রকম কাজ করবে। একসাথে তোমরা সৃষ্টির এক নতুন যুগকে স্বাগত জানাবে। এমন এক যুগ, যখন মানুষ অতল সাগর জয় করবে, রুপার রথে চড়ে আকাশে উড়বে আর পা রাখবে চাঁদের বুকে। একটা স্বর্ণ যুগ।'

মৎস্যের দিকে তাকালো মানু।

'সপ্তর্ষিরা আমাকে পথ দেখাবে মানে কী বোঝাতে চাইছেন? আপনি কি আমার সাথে সেখানে থাকবেন না, মৎস্য?'

হাসলেন মৎস্য, তবে এবার সেটা আমুদে কোনো হাসি না। এ এমন এক হাসি যা বুঝিয়ে দিলো, খুব দ্রুতই তাদের পথ আলাদা হয়ে যাবে।

'আমি সব সময়ই তোমার পাশে থাকবো, সত্যব্রত। এই মূল্যবান গ্রহের বাসিন্দাদের জন্য আমি সব সময়ই থাকবো। হয়তো সেটা ভিন্ন কোনো নামে, ভিন্ন বেশে, অনেক দূরের কোনো এক জায়গায়...কিন্তু আমি সব সময়ই থেকে যাবো।'

* * * * *

মৎস্য এখন নির্মম আকাশের নিচে এক খাড়া, উঁচু চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। মানু, তারা, সোমদত্ত আর বাকিরা এই স্বর্গীয় মৎস্য-মানব কী বলেন তা শোনার অপেক্ষায় রয়েছে।

মৎস্য প্রজাতির নেতার দিকে দমকা বাতাস বয়ে গেল। তার লম্বা চুল আর ঢিলা আলখাল্লা বাতাসে উড়ছে। বৃষ্টির মাঝেই রহস্যময় মানুষটা দুই পাশে হাত ছড়িয়ে দাঁড়ানো। তার মুখ উপরে স্বর্গের দিকে তাকাতেই আরো একবার বজ্রপাত এই স্বর্গীয় বিস্ময়কে স্বাগত জানালো। বজ্রপাতের সাদা আলোর নিচে মৎস্য এখন চমৎকার নীল আলোয় জ্বলজ্বল করছে।

'তিনি একজন ধর্মগুরু...' মানুকে ফিসফিসিয়ে বললো তারা।

'তা নয়, তারা। তিনি এমন একজন যিনি ধর্মগুরুদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।'

'হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো আর বাকিসব বাসস্থান থেকে হাজার দশেক নারী, শিশু আর পুরুষদের একত্র করো। পাহাড় আর বনের বাসিন্দাদের মধ্য থেকে আরো কিছু নাও। প্রলয় সবকিছু গ্রাস করে নেওয়ার আগে যে কয়মাস সময় হাতে আছে, তার মাঝেই পৃথিবীতে সাগরের বুকে ভাসতে সক্ষম এমন সবচেয়ে বড় তরী বানিয়ে নাও।

'এমন এক তরী যা এতই বিশাল হবে, এর মাস্তুল আকাশ চিরে ফেলবে। এমনই বড় আকারের জাহাজ যাতে দশ হাজার মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করবে। এমন একটা জাহাজ যেটা এক লাখ উদ্ভিদ, পাখি, প্রাণি আর বীজ বহন করতে সক্ষম।

'রসায়নবিদ, ডাক্তার, স্থপতি, কৃষক, সংগীতজ্ঞ, লেখক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক আর যাজকদের একত্র করো। তোমাদের সাথে বেদ, ধর্মগ্রন্থ, ধাতব জিনিস, তা, ঔষধি উদ্ভিদ, যন্ত্রপাতি আর রত্ন নিয়ে নাও।

'তোমরা পৃথিবীকে আবার জাগ্রত করবে, সভ্যতাকে নতুন করে তৈরি আর কালচক্রের ঘূর্ণন বন্ধ করে দেবে।

' তরী মানুর তরী...আর চিরদিন মনে রাখা হবে তাকে। কারণ এটা করবে। সৃষ্টিকে রক্ষা করবে।'

হরপ্পা, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
বিভাষণ পূজারি

আশপাশের কয়েক মাইলের মাঝে তিনিই ছিলেন একমাত্র মানুষ। এই অস্বাভাবিক ভয়ধরানো, ঝড়ের রাতে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। বিশেষ করে তার রক্ত, কান্না এবং ঘাম এই অসময়ের মুষলধারের বৃষ্টির সাথে মিশে দৃষ্টি একেবারেই ঝাপসা হয়ে আছে। এই ঘুটঘুটে কালো অন্ধকারের মাঝে টাক মাথা আর খালি গায়ে থাকা ব্রাহ্মণ জ্বর গায়ে নিয়েও সামনে-পেছনে তার কুঠার ছুঁড়লেন। পাটের অন্তত একটা মোটা দড়ি কাটার চেষ্টা করছেন তিনি। ওটা মানুষের হাতে বানানো ইট আর তামার পাহাড়ের একটা পিলারের সাথে আটকানো। যদিও এটা বানানো হয়েছিলো নদীর গতিপথ বদলানোর উদ্দেশ্যে, তবে পাথর, ইট, ধাতু আর কাঠের ব্লকের বিশাল স্তূপ দেখে মনে হলো, উত্তাল সাগরের একটা বিধ্বংসী সুনামির থাবা সরিয়ে দেওয়ার জন্যেও এটা একপ্রকার হুমকি। কিন্তু তারপরেও যে নদীর কথা বলা হচ্ছে, সেটা শক্তিশালী সাগরের চেয়েও কোনো অংশে কম নয়।

প্রবল বর্ষণের ব্যাপক শব্দের মাঝে দাঁড়িয়ে মোহাচ্ছন্ন মানুষের মতো বিড়বিড় করে যাচ্ছেন তিনি। বহু বছরের চর্চা আর বৈদিক নিয়মনীতি মেনে শরীরকে কষ্টসহিষ্ণু করে তুলেছিলেন। আর এখন সেই শরীরের সবটুকু শক্তি ব্যবহার করছেন তিনি। আঙুল ফুলে যাওয়া কিংবা রক্ত ঝরার পরেও মোটা দড়িটার উপর ক্রমাগত আঘাত করেই যাচ্ছেন। যখন আর শ্বাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না, মাথাটা একবার পেছনে নিয়ে উপরের দিকে তাকালেন যেন ভারী বৃষ্টি তার মুখে প্রচণ্ড বেগে এসে পড়ে। পানির নির্মম ফোয়ারা তার চোখের পাতায় জমে থাকা লাল কাদামাটি পরিষ্কার করে দিতেই এক ভয়ানক গগনবিদারী চিৎকার করে উঠলেন তিনি। সম্ভবত এটা দেবতাদের নিজের অবর্ণনীয় রাগ বোঝানোর জন্য তার সাম্প্রতিক কালো আত্মার একটা চেষ্টা

ছিলো। কিন্তু তিনি জানতেন অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে। দেবতারা তার কার্যক্রমে ভীত হয়ে পড়েছেন। তারা আর তাকে ক্ষমা করবেন না। কিংবা কাউকেই না।

ছোট কুঠার দিয়ে আবারো দড়ি কাটার চেষ্টা করলেন তিনি। তবে এবার আগের চেয়ে ভয়ানকভাবে। তিনি জানেন, প্রায় এক ঘণ্টার উপর ধরে তিনি কেবল একটা মাত্র পিট কাটার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এই দড়িগুলো বিশেষভাবে তৈরি, তারই নির্দেশে। তিনি জানেন এখানে আরো ৯৯৮ টা ইট, তামা আর পাথরের স্তম্ভে এমন আরো হাজারটা দড়ির গিট দিয়ে এই দুর্ভেদ্য পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে। আর সারা দিন সারা রাত কাজ করলেও এটা ভাঙতে এক হাজার মানুষের পুরো এক সপ্তাহ লেগে যাবে। কৌশলগত উপায়ে নকশা করা শক্তিশালী এই ৯৯৯ টি পিলার তার নিজেরই স্থাপত্য এবং জ্যোতিষ নির্দেশনা মেনে নির্মাণ করা হয়েছিলো।

কী করছেন তিনি? পাগল হয়ে গেছেন? তিনি জানতেন এই বিশাল ঢিবিকে কোনোভাবেই পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিন্তু তারপরেও তিনি ক্রমাগত হতাশ হয়ে তার কুঠার দিয়ে আঘাত করেই চলেছেন।

মধ্যরাতের ভারী বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তৃত ভূমিতে একাকী দাঁড়িয়ে কেবল একজন ব্যক্তি। তিনি বিভাষণ পূজারি, এমন এক মানুষ যাকে মানুষ কয়েক দশক ধরে দেবতা (অর্ধেক মানব-অর্ধেক ঈশ্বর) হিসেবে পূজা করেছে। যাকে বলা হচ্ছিলো হরপ্পার সূর্য, তাকে এখন দেখতে ভূতের মতো লাগছে। তিনি এখন প্রচণ্ড ব্যথা আর গভীর পাপবোধে ডুবে যাচ্ছেন, জানেন এই অশুভ পরিণতি ঠেকানো সম্ভব না। তিনি কাঁদছেন, গোঙাচ্ছেন আর কুঠার দিয়ে আঘাত করেই যাচ্ছেন। আর তারপরেই তিনি শুনতে পেলেন ওটা।

শুরু হয়ে গেছে সব।

দূরে কোথাও–যদিও খুব বেশি দূরেও না–সেই শক্তিশালী নদীর অশুভ গর্জন অতিপ্রাকৃত হয়ে উঠছে, যেটা তার রক্তকে হিম করে দিলো। একসময়ের উদার, স্নেহময়ী আর লালন-পালনকারী নদীমাতা এখন তার সন্তানদের গ্রাস করতে আচমকাই তৃষ্ণার্ত রক্তধারার মতো করে এগিয়ে আসছেন। জ্ঞানের নদী তারই প্রিয় এক সন্তানের কাছে প্রতারিত হয়েছেন। তিনি প্রতারিত হয়েছেন তার দেবতা পুত্রের কাছে। যার নাম বিভাষণ পূজারি।

একসময়ের ধার্মিক আর অদম্য বিভাষণ পূজারির হাত থেকে কুঠার ছুটে গিয়ে কাদাপানিতে ভোঁতা শব্দ করে পড়ে গেল। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন

তিনি। তার দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ, যেদিক থেকে তার ক্ষিপ্ত মাতা নিজের দানবীয় রূপ নিয়ে উপস্থিত হবেন। তিনি তখনই বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন, আজকের রাতে বেদিতে তার রক্তই সবার আগে পড়বে। আর আচমকা তিনি মন থেকে তাই চাইতে শুরু করেছেন।

ধীরে ধীরে নিজের ভেতর একপ্রকার স্বস্তি আর মুক্ত ভাব অনুভব করছেন তিনি। আশা অনুভব করছেন। হয়তো তার মা তার জীবন কেড়ে নেবেন, কিন্তু আরো লাখখানেককে মুক্তি দেবেন। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন বিভাষণ, নতি স্বীকারের ভঙ্গিতে দুই পাশে হাত ছড়িয়ে দিয়েছেন, খুলে দিয়েছেন হাতের মুঠি। বৃষ্টি তার সুঠাম আর ক্ষতবিক্ষত শরীর ধুয়ে দিচ্ছে, যেন অবশেষে তার জঘন্য মানসিকতা ধুয়ে ফেলতে সাহায্য করছে। যেন বিভাষণ পূজারিকে করুণা করছে আর শেষবার স্নানের সুযোগ করে দিচ্ছে।

'আমার জীবন নিয়ে নাও, হে শক্তিমান মাতা! আমি তোমার রাগের কারণ হয়েছি। আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম!' তার চিৎকারের সাথে সাথেই রাতের আকাশ ক্রুদ্ধ বজ্রপাতের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো। যেন ভগবান এই পতিত দেবতার আবেদন ফিরিয়ে দিচ্ছে।

আবার চিৎকার করলেন তিনি। কয়েক মুহূর্তের জন্য দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল দেখালো সবকিছু। নিস্তব্ধ আলো বিভাষণ পূজারির রক্ত, ঘাম আর ক্ষতবিক্ষত মুখের উপর এসে পড়ছে। আর তারপরেই এলো ওটা। ব্রিজের বিকট ধ্বনিতে যেন পুরো সূর্যেরই বিস্ফোরণ ঘটেছে।

দেবতারা জানিয়ে দিলেন, না!

বিভাষণ পূজারি মুখে একটা শক্তিশালী দমকা বাতাস অনুভব করলেন। সেই সাথে দেখতে পেলেন দূরের ঐ পাহাড় সমান উঁচু ঢেউ। তিনি যেখানে হাঁটু গেড়ে বসেছেন, সরাসরি সেই দিকেই এগিয়ে আসছে। দেখে মনে হলো, এক বিশালাকারের হাইড্রা ড্রাগন তার শিকার বরাবর মাথা ঘোরাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত আগে বজ্রপাতের যে শব্দ হয়েছিলো, নদীর গর্জনের শব্দ তার চেয়েও বেশি। বিভাষণ পূজারি আগের জায়গাতেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। উপরের দিকে তাকিয়ে পাহাড়সম ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন–অন্ধকারের মাঝেও ছায়া ফেলছে ওটা। সুমেরু পর্বতের কাছে পিঁপড়াকে যেমন ছোট দেখায়, তাকেও তেমনই মনে হচ্ছে। আকাশ সমান উচ্চতা থেকে নিজের নদীমাতার সুনামি তাকে গ্রাস করে নিতে আর কয়েক মুহূর্ত বাকি।

বিভাষণ পূজারি গত কয়েক দিনে তার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। সারা জীবনের সুনাম কয়েক দিনের অন্ধ প্রতিশোধের মোহে হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু এরপরেও তিনি ছিলেন বিভাষণ পূজারি। একজন দেবতা। উন্নত যোগ শিক্ষিত বাকি সবার মতো এক নিমেষেই তিনি কুণ্ডলিনীর মাঝে তার আত্মাকে ডেকে একীভূত করে নিলেন। হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দিয়ে নশ্বর দেহকে মৃত্যুর জন্য তৈরি করে ফেললেন। আর এক মুহূর্ত পরেই আগুয়ান পানির প্রচণ্ড তোপে মাটিতে মিশে যাবে তার শরীর। তবু এই অন্তিম মুহূর্তে শান্তভাবে শেষ এক প্রার্থনা করলেন দেবতা।

'মা, ওদের ক্ষমা করো। আমার পাপের জন্য তাদের ধ্বংস করে দিও না। ওদের ক্ষমা করো, মা!'

ধ্বংসাত্মক নদী দেবতা বিভাষণ পূজারিকে এমনভাবে গ্রাস করলো যেমনভাবে বিশাল এক টর্নেডো গাছের শুকনো ডালকে গুঁড়িয়ে দেয়। সকল দেবতা, ঘাতক রক্ত-নদী, অন্ধকার রাত, ইন্দ্রের বজ্রপাত, বিস্তৃত ভূমি আর নির্মম বৃষ্টি ঐ সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে রইলো। তবে বিভাষণ পূজারির মৃত্যুতে এই গ্রহে তার প্রভাব শেষ হচ্ছে না। এ কেবল শুরু। দ্বন্দ্ব, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র আর সহিংসতার মধ্য দিয়ে আরো হাজার বছর বেঁচে থাকবেন তিনি। তিনি কেবল আর্যাবর্ত না, বরং পুরো বিশ্বকে সেই ঈশ্বরের নামে অবিরাম রক্তপাত এবং খুনোখুনিতে বাধ্য করবেন, যে একই ঈশ্বর তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। এমনকি তার মৃত্যুও তাকে বা মানব জাতিকে এই ধরনের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবে না।

সরস্বতী তার নির্মম গতিপথ ধরে রাখলেন। বিভাষণ পূজারির শেষ প্রার্থনার পরেও রক্তের এই নদী তাদের ক্ষমা করবে না।

শক্তিশালী হরপ্পা নগরীকে তার প্রত্যেকটা নাগরিকসহ গ্রাস করতে যাচ্ছেন সরস্বতী।

দেব-বলি : দেবতাকে উৎসর্গ

এই গরমটা একেবারেই অসহনীয়, মনে হচ্ছে যেন আগুনের মধ্যে আছে। তার হাত-পা এমনভাবে টানা হচ্ছে, যেকোনো সময় ছিঁড়ে যেতে পারে। তার মাথা ঘোরাচ্ছে, সেই সাথে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। হাতের কবজি আর পায়ের গোড়ালি মনে হলো ধাতব কিছু দিয়ে কেউ কেটে নিয়েছে।

জ্ঞান যখন ফিরে এলো, তখন বিদ্যুৎ অসহ্য যন্ত্রণা আর পুরোপুরি এলোমেলো অবস্থায় ছিলো। চোখ খোলার পর কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো সে কোথায় আছে আর তার সাথে আসলেই কী হয়েছে সেটা বুঝে নিতে।

তার মনে হলো, বাতাসে ভেসে একটা বড় আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই আগুনটা তার শরীর পুড়িয়ে দিচ্ছে।

সে ঠিকই ধরেছিলো। কয়েক মুহূর্তের মাঝেই বিদ্যুতের মনে পড়ে গেল সে কোথায় ছিলো আর তার এই অবস্থা কতটা গুরুতর।

ত্রিজাত কাপালিকের গর্তের আগুনের দশ ফুট উপর আড়াআড়িভাবে ঝুলছে সে। তার মুখ আর জামাহীন দেহের উপরের অংশ নিচের প্রচণ্ড উত্তাপে ঝলসে যাচ্ছে। হাত-পা চারদিকে ছড়ানো, গুহার দেয়ালের লম্বা হুকের সাথে লোহার চেইন দিয়ে আটকানো। তার অচেতন অবস্থায় মশান-রাজ, রাক্ষস ব্রহ্মানন্দ, পিশাচিনী আর মহাতান্ত্রিকের বাকি সঙ্গীরা দেবতাকে শিকলে বেঁধে জ্বলন্ত কয়লা আর মাংসের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছে।

* * * * *

'দেখো...দেবতার দিকে দেখো!' গর্তের চারপাশে হাঁটতে হাঁটতে বিদ্যুৎকে উপহাস করে চেঁচাচ্ছে ত্রিজাত কাপালিক। 'সাদা চামড়ার মানুষগুলো এই দেবতাকেই এত ভয় পায়?'

অশুভ আনন্দে হেসে ফেললো ব্রহ্মানন্দ। 'আমরা পেরেছি, ত্রিজাত! কাজটা হয়েছে। যাকে শত শত বছর ধরে ভয় পাচ্ছিলাম, সে আমাদের সামনে রান্না করা হাঁসের মতো ঝুলে আছে।'

বলভান্ত আর সনু দুজনকেই দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে দুজনেই। বিদ্যুৎকে অসম্ভব যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখে কাঁদছে সনু। তবে সেটা সবচেয়ে বেশি বিব্রতকর দৃশ্য না। দ্বারকা শাস্ত্রীরও দুই হাত বেঁধে রাখা হয়েছে, গলায় একটা ভোঁতা কাস্তে চেপে ধরা। রক্তের পিপাসায় গবলিনের মতো ভারী নিঃশ্বাস ফেলছে সেই পিশাচিনী।

'ওদের যেতে দাও, ত্রিজাত...' বললো বিদ্যুৎ, যন্ত্রণায় গলা কাঁপছে ওর। 'তুমি প্রাচীন অঘোরী নামে একটা কলঙ্ক। তুমি নিজেই আধ্যাত্মিক অঘোরী দর্শনের একটা অপমান। প্রকৃত অঘোরী তান্ত্রিকরা ভগবান রুদ্রের উপাসক, দত্তাত্রেয়ার ভক্ত আর তার আশীর্বাদ-দাতা। ওরা পার্থিব বস্তুবাদের নিন্দা করে, আর করে সত্যের প্রকৃত অনুসন্ধান। তুমি আদতে অঘোরী নও, মশান-রাজ! তুমি সত্যিকারের তান্ত্রিকও নও! তুমি আমাকে চাও তো? ঠিক আছে, আমাকে মেরে ফেলো...কিন্তু ওদের যেতে দাও।'

'মেরে ফেলবো?' বিদ্যুতের অপমানে পাত্তা না দিয়ে জিজ্ঞেস করলো মশান-রাজ। 'তার মানে তুমি সত্যিই জানো না, তাই না?' প্রশ্নটা করে বিদ্যুতের দিকে তাকানোর আগে দ্বারকা শাস্ত্রীর দিকে একবার জিজ্ঞাসু নজরে তাকালো সে।

'তোমাকে বহু বছর ধরে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, হে দেবতা। রোহিণী নক্ষত্র খুব বেশি দূরে নেই। কালো মন্দির উঠে আসবে! কেবল এরপরেই তুমি মরবে...নিশ্চিতভাবে।'

মহাতান্ত্রিক এবার ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করে মাথা উঁচু করলো, যেন কোনো কালো শক্তির কাছে প্রার্থনা করছে। কয়েক সেকেন্ড পর আচমকা চোখ খুললো সে। তার চোখে উন্মত্ত নিষ্ঠুরতা, ছাইবর্ণের মুখটা থেকে ক্ষমতার লালসা যেন বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝরছে। সে বিদ্যুতের দিকে ইশারা করলো।

'উসপ্রাহার ইসসি অনুষ্ঠান-অগ্নি মে দেব-বলি চাদেগি!'

* * * * *

'ত্রিজাত...এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ,' বললো ব্রহ্মানন্দ। 'আমাদের অনুষ্ঠানে অতুলনীয় শক্তি যুক্ত করার এটাই সুযোগ।'

ব্রহ্মানন্দের দিকে ঘুরলো ত্রিজাত। কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলো এই একচোখা অধ্যাপক আসলে কী বলতে চাইছে। সে তার অঘোরী ভাইকে ভালোভাবেই চিনতো। ও যা বলছে তা নিশ্চিতভাবেই কিছুটা অশুভ আর কিছুটা দুর্ধর্ষই হবে।

'তোমার চারপাশে তাকাও, ত্রিজাত...আমরা প্রতিষ্ঠিত তান্ত্রিকদের মাথা সংগ্রহ করতে বছরের পর বছর ব্যয় করেছি। প্রতিটা কপাল আমাদের অন্ধকার জগতের দিকে আরো এগিয়ে নেয়। তাদের মাঝে কিছু মহাতান্ত্রিকও ছিলো বটে।'

আগ্রহ নিয়েই শুনছিলো মশান-রাজ, তবে তার সঙ্গী কী বোঝাতে চাইছে তা ধরতে পারেনি।

ব্রহ্মানন্দ চোখ টিপলো। ত্রিজাতের দিকে ঝুঁকে গেল সে, কিন্তু এতটা জোরে কথা বললো যেন বিদ্যুৎসহ বাকি সবাই শুনতে পায়। মহান মঠাধীশের দিকে তাকালো সে।

"ভেবে দেখো, ত্রিজাত...পৃথিবীর একমাত্র পরম-তান্ত্রিকের কপাল আমাদের কেমন ক্ষমতা এনে দেবে!'

পিশাচিনীর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো ত্রিজাত। মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে গেল। নিজেকে এর পরবর্তী আনন্দের জন্য প্রস্তুত করে নিচ্ছে।

'না...! থামো...!' বিদ্যুৎ চিৎকার করে উঠলো। হাত-পা আটকে রাখা শিকলে টান দিলো একবার। কিন্তু ওগুলো খুবই শক্তিশালী।

বিদ্যুৎ জানতো তার হাতে সময় খুবই কম। সে আবার টান দিলো, এবার নিজের সর্বশক্তি কাজে লাগালো। তার বুকের পেশি লোহার তারের মতো প্রসারিত হয়ে গেল। তার শক্তিশালী বাহুর শিরাগুলো যেন ফেটে পড়বে। বলভান্ত আর সনুর জন্য দেবতার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ছিলো একেবারেই বিস্ময়কর। এই বীরত্বপূর্ণ চেষ্টার দিকে ভেজা চোখে আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওরা।

বিদ্যুৎ সত্যিকার অর্থেই দেবতা ছিলো।

ত্রিজাত আর ব্রহ্মানন্দের ভয় বেড়ে গেল, যখন দেখলো বিদ্যুতের ডান হাত আটকে রাখা লোহার হুক সরে আসতে শুরু করছে। প্রথমে ফাটল দেখা গেল। এর পরপরই গুহার দেয়ালের পাথুরে তল ভেঙে পড়তে শুরু করলো।

শিকল ধরে টান দিতেই ভাঙা দেয়াল থেকে তার ডান হাত মুক্ত হয়ে গেল। বিদ্যুতের দুই চোখ এখন নিচের নরকের লাল জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রতিফলনে জ্বলজ্বল করছে। দৃষ্টি নিবদ্ধ ত্রিজাত কাপালিকের দিকে। মহাতান্ত্রিক এখন প্রচণ্ড অবিশ্বাসে কাঁপছে।

'মশান-রাজ! তুমি খুব বড় রকমের ভুল করে ফেলেছ!' চিৎকার করে বললো বিদ্যুৎ। তার কণ্ঠ থেকে যন্ত্রণা, রাগ আর ঘৃণা ছিটকে পড়ছে।

কথাটা বলেই শেষ দেবতা তার ডান পাও মুক্ত করে ফেললো। এখন সে আগুনের পৃষ্ঠের উপরে উড়ন্ত দেবতার মতো করে ভাসছে।

'তুমি ভুলে গেছিলে, ত্রিজাত! আমি অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ঈশ্বর!'

চলবে...

জুবায়ের আহাম্মেদ। বইয়ের মূল লেখকের মতোই তিনিও অর্থনীতিতেই স্নাতক শেষ করেছেন। অনুবাদক হিসেবে কিছুটা কাঁচাই বলা চলে চট্টগ্রামের এই মানুষটিকে। এখন পর্যন্ত ৫টি বই অনুবাদ করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। তবে প্রকাশিত বই সংখ্যা ৩।

ভালোবাসেন ভাবতে, বই পড়তে আর লিখতে। দেশের একাধিক পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন নিছক শখের বশে।

মাথায় প্রচুর স্বপ্ন নিয়ে ঘুরতে থাকা এই তরুণ নিজের বিষণ্ণতাকে লালন করতে ভালোবাসেন। প্রিয় ফুটবল দল লিভারপুলের হার-জয় ছাড়া জাগতিক আর সব বিষয়ে ব্যাপক উদাসীন তিনি।

বর্তমানে এই তরুণ ব্যক্তিটি নিজের স্বপ্নকে বাস্তব করার চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন!

অর্ধেক মানব-অর্ধেক ঈশ্বর বিভাষণ পুজারি, প্রাচীন শহর হরপ্পার দেবতাতুল্য মানুষটি আচমকাই বদলে গেলেন যুদ্ধের ডামাডোলে। প্রিয়তমা স্ত্রী আর পুত্রের করুণ পরিণতি শুনে ক্ষিপ্ত আর হতাশ বিভাষণ হাত মেলালেন অসুর রাজের সাথে! তার পরের লক্ষ্য জাগতিক কেউ নয়, বরং সাধারণের উর্ধ্বে অন্য কেউ।

যুবক মনু ছুটে চলেছে রহস্যময় কালো মন্দিরের দিকে। কি আছে সেই কালো মন্দিরে? খুব অল্প সংখ্যক মানুষই জানেন এই কালো মন্দিরের রহস্য। যাদের মাঝে অন্যতম নীল চামড়ার মৎস্য! মনুকে নিয়ে কি করতে চান এই রহস্যময় ব্যক্তিটি?

দেব-রাক্ষস মঠের গোত্রপ্রধান দর্ক শাস্ত্রীর উপস্থিতিতেই মঠের ভেতর ঘটে গেল এক বীভৎস খুন! কপাল অর্পণের প্রকাশ্য হুমকি দিয়ে গেল ভয়ানক ত্রিজাত কাপালিক। ত্রিজাতকে ঠেকানোর একটাই উপায়। সেই দুঃসাহসিক পথে কি সত্যিই এগিয়ে যাবে সবশেষ দেবতা বিদ্যুৎ?

প্রলয় উপন্যাসের বাঁকে বাঁকে আপনার সাথে দেখা হবে বিখ্যাত কনস্ট্যান্টিনোপোলের সাথে! দেখা হবে মরুর বুকে কাউন্সিল অফ নিশিয়ায়। ভিনীত বাজপেয়ির আরেক পৌরাণিক যাত্রায় আপনাকে স্বাগত।

প্রলয়

দ্য গ্রেট ডেলিউজ

বিনীত বাজপেয়ী

অনুবাদ : জুবায়ের আহমেদ

প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন

Facebook.com/নয়া উদ্যোগ পাবলিকেশন্স

email: nayaudyogdhaka@gmail.com

শোরুম: ৩৮/এ এম আলী টাওয়ার, ২য় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN

9 789849 699323

হরপ্পা ট্রিলজির তৃতীয় বই

বিনীত বাজপেয়ী

কালী

সিক্রেট অব দ্য ব্ল্যাক টেম্পল

অনুবাদ : নিজাম উদ্দিন অপু

বিনীত বাজপেয়ী একজন ভারতীয় উদ্যোক্তা এবং লেখক। জন্ম ১৯৭৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হংসরাজ কলেজ থেকে ১৯৯৭ সালে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তারপর ১৯৯৯ সালে এমবিএ ডিগ্রী সম্পন্ন করেন দিল্লীর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট থেকে। ক্যারিয়ার শুরু করেন জেনারেল ইলেক্ট্রিক-এ। তবে এক বছরের বেশি কাজ করেননি সেখানে। ২০০০ সালে শুরু করেন নিজের কোম্পানীর কাজ। ডিজিটাল এজেন্সী ম্যাগনন ছাড়াও মিডিয়া ও এন্টারটেইনমেন্ট সেক্টরে প্রতিভা খুজে বের করার প্রতিষ্ঠান ট্যালেন্ট্রাক এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তিনি।

বেস্ট সেলার হরপ্পা ট্রিলজির লেখক বিনীত বাজপেয়ী। ২০১৭ সালে প্রকাশের সাথে সাথেই আমাজন বেস্ট সেলারে জায়গা করে নেয় তার হরপ্পা: কার্স অব দ্য ব্লাড রিভার। এরপর এই সিরিজের দুটি বই একই রকম জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে কাজ করছেন নতুন একটি সিরিজ নিয়ে। সিরিজের দুটি বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি আত্ম-উন্নয়নমূলক বইয়ের রচয়িতাও তিনি।

প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন

কাশী

সিক্রেট অব দ্য ব্ল্যাক টেম্পল

কাশী

সিক্রেট অব দ্য ব্ল্যাক টেম্পল

বিনীত বাজপেয়ী

অনুবাদ : নিজাম উদ্দিন অপু

সম্পাদনা : আশরাফুল সুমন

নয়া উদ্যোগ
বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা -২০২৩
প্রকাশক
সাফায়েত খন্দকার
নয়া উদ্যোগ
৩৮/এ হাজী এন আলী টাওয়ার (২য় তলা)
মোঃ ০১৫৬৭ ৯০২৬০১
E-mail: nayaudyogdhaka@gmail.com

© নয়া উদ্যোগ

প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন
অক্ষর বিন্যাস : আপন কম্পিউটার
মুদ্রণ : আমানত প্রিন্টার্স

অনলাইনে বই পেতে যোগযোগ করুন
রেইনবো বুকস
কলকাতায় অনলাইনে পেতে যোগাযোগ করুন
বইবাংলা

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

ISNB : 978-984-96993-1-6

Kashi : Secret of the Black Temple by Vineet Bajpai
Translated by : Nizam Uddin Apou
Published by Naya Udyog, 38/A Haji N Ali Tower (2nd Floor)
Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : Book Fair 2023

Price : 500.00 Taka Only

U. S.A. Distributor ▣ Muktadhara

37-69,74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N. Y. 11372

Kolkata Distributor ▣ Boibangla
Stall No. 17 Block 2, Surya Sen Street Colleg Square South, Kolkata-700012
Phone No. + 917908071765

উৎসর্গ

আমার মেয়ে রুকাইয়া নূর ইসলাম
ও
আমাকে এই সুন্দর উপহার দানকারী
আমার স্ত্রী রুপালী আক্তার কে–

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পূর্বে যা ঘটেছিলো

প্রথম অংশঃ হরপ্পা

হরপ্পা, খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

হরপ্পার দেবতা, পরাক্রমশালী বিভাসন পূজারি, যাকে কয়েক দশক ধরে হরপ্পার সূর্য হিসেবে শ্রদ্ধা করা হয়, নির্মম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছেন। তার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং ভগ্নিপতি, জ্ঞানী পণ্ডিত চন্দ্রধর, তার সুন্দরী স্ত্রী, মহেঞ্জোদারোর রাজকুমারী প্রিয়ংবদার ক্রূর লোভের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। প্রিয়ংবদা ও তার কুটিল সহকারী রাঙার আমন্ত্রণে মেসোপটেমিয়া থেকে তিনজন অন্ধ কালো জাদুকর গান, শা এবং এপ হরপ্পায় আসে। অন্ধকার জাদুকররা শহরের জলের উৎসগুলোকে তাদের এক বিশেষ ধরনের মিশ্রণ দিয়ে বিষাক্ত করে ফেলে, যা পুরো জনসাধারণকে পাগল এবং হিংস্র করে তোলে।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিভাসন পূজারিকে হরপ্পার সবচেয়ে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী নয়নতারাকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং হরপ্পার এই দেবতাকে মৃৎ-কারাবাস বা মৃতদের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হয়। তার বীর পুত্র, যুবক মানু, হরপ্পার প্রধান স্থপতি এবং বিভাসন পূজারির শেষ অবশিষ্ট বন্ধু পণ্ডিত সোমদত্তের বাহিনীতে যোগদান করে। পরবর্তীতে যুদ্ধে মানু অসাধারণ এক সম্মুখ যুদ্ধে ক্রূর রাঙাতে হত্যা করে। ঠিক একই সময়ে, জ্ঞানের নদী সরস্বতী অস্বাভাবিকভাবে ফেঁপে ওঠে, যা পুরো হরপ্পা সভ্যতার জন্য হুমকিস্বরূপ। জ্যোতিষীরাও আসন্ন প্রলয়ের পূর্বাভাস দেন। দেবতার করুণাময় স্ত্রী এবং মানুর মা, সানজানা, হরপ্পান সৈন্যদের তীরের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তার ছেলের কোলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সোমদত্ত এবং তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু সুন্দরী তারার নির্দেশে মানু তার মায়ের দেহ কোলে নিয়ে কুয়াশার মধ্যে চলে যায়। কিন্তু সে কুয়াশায় লুকিয়েও পড়লেও তার পিঠে ও ঘাড়ে বিঁধে থাকা তীরগুলোতে থাকা বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

হরপ্পার দেবতাকে হরপ্পার মহাস্নানে পশুর মতো টেনে নিয়ে অত্যাচার করা হয়। উন্মাদ সৈন্যরা তার চামড়া তুলে ফেলে এবং একসময় তাকে দেবতাজ্ঞান করা হরপ্পার নাগরিকরা উন্মত্ত হয়ে তার দিকে পাথর ছুঁড়তে থাকে, ছিটাতে থাকে থুতু। দেবতা, মানে হরপ্পার সূর্য বিভাসন পূজারি প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ করে। একসময় নিজের উজ্জ্বল ও ঈশ্বরের মতো চেহারার জন্য পরিচিত মানুষকে এখন শয়তানের চেয়েও ভয়ংকর দেখায়। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন এবং হরপ্পার জনসাধারণের উদ্দেশে তার রক্তহিম করা শেষ কথাগুলো চিৎকার করে বললেন,

'শোন, মৃতের দল! শোন, পচে যাওয়া মৃত আত্মার দল। শোন, মূর্খরা। আমি অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ঈশ্বর!'

বানারস, ২০১৭ (বর্তমান সময়)

প্রাচীন শহর বানারসে অবস্থিত দেব-রাক্ষস মঠের (ঈশ্বর-দানব গোষ্ঠী) ১০৮ বছর বয়সি রহস্যবাদী গোত্রপ্রধান দ্বারকা শাস্ত্রী মৃত্যুশয্যায় রয়েছেন। তিনি তার অত্যন্ত সফল, সুদর্শন ও প্রতিভাবান প্রপৌত্র বিদ্যুৎকে মঠে ডেকে পাঠালেন। গুরগাঁও থেকে চলে যাওয়ার আগে বিদ্যুৎ তার প্রিয় সঙ্গী দামিনী এবং তার সেরা বন্ধু বালার কাছে স্বীকার করে যে সে দেবতাদের একটা প্রাচীন এবং রহস্যময় বংশ থেকে এসেছে। বানারসে পৌঁছে বিদ্যুৎ দেখলো যে তারা বহু শতাব্দী ধরে তার জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানে সে তার অনেক প্রিয়জন যেমন মঠের সেনাপতি বলভান্ত, বংশের চিকিৎসক গোবর্ধন ও তার ছেলেবেলার বন্ধু ন্যায়নার সাথে দেখা করে। ন্যায়না অসাধারণ সুন্দর একজন তরুণীতে পরিণত হয়েছে এবং বিদ্যুৎ তার প্রতি এক অবর্ণনীয় টান অনুভব করে।

মহান মঠাধীশ দ্বারকা শাস্ত্রী বিদ্যুতের কাছে তাদের বংশের উপর থাকা অভিশাপের কথা প্রকাশ করেন এবং তাকে এটাও বলেন যে সে শেষ দেবতা, যার সম্পর্কে শুধু মঠ বা বানারসের নয়, পুরো মানব জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বিদ্যুৎ যখন বানারসে এসেছে, প্যারিসে তখন রেগ মারিয়ানি নামের এক রহস্যময় ব্যক্তি এমন এক ব্যক্তির সাথে মিটিংয়ে ব্যস্ত ছিলো যে তার নামের চেয়ে বেশি বিখ্যাত ছিলো নিজের পদবির জন্য–মাশ্চেরা বিয়ানকা। রেগ তার নিজের উর্ধ্বতন দ্য বিগম্যানের হয়ে মাশ্চেরার কাছে একটা চিরকুট হস্তান্তর করে। সেখানে শুধু পাচঁটি শব্দ লেখা আছে: *সেই আর্য ছেলেটিকে মেরে ফেলো।* মাশ্চেরা বিয়ানকা অথবা সাদা মুখোশ হলো ইউরোপের সবচেয়ে ভয়ংকর ক্রাইম লর্ড। এরপর রুমি পেরেরা নামের নিষ্পাপ দেখতে এক দক্ষ ঘাতককে পাঠানো হলো বানারসে।

মহান দ্বারকা শাস্ত্রী বিদ্যুতের কাছে হরপ্পার ভয়ংকর ঘটনা এবং সেই সাথে কীভাবে একটা অন্ধকার ষড়যন্ত্র ভারতীয়দের কাছ থেকে মহানগরের সত্যকে চিরতরে লুকিয়ে রেখেছে তা বর্ণনা করেন। পাশাপাশি কীভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার সবচেয়ে মূল্যবান ধ্বংসাবশেষ ধ্বংস করে এবং উপমহাদেশকে তার প্রকৃত, প্রাচীন গৌরব থেকে বঞ্চিত করে তা ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হলো, যখন মঠাধীশ বললেন যে বিদ্যুৎই হচ্ছে মহান বিভাসন পূজারি, যিনি তার চূড়ান্ত নিয়তি পূর্ণ করার জন্য ৩৭০০ বছর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন।

এরই মধ্যে বিদ্যুৎ তার জীবনের একটা সাহসী কিন্তু ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। পাশাপাশি ন্যায়নার বিদ্যুতের গালে তার প্রথম চুমু খাওয়ার মতো জাদুকরী মুহূর্ত, দামিনির হঠাৎ মঠে আগমন এবং শেষ দেবতাকে রুমির দশাশ্বমেদ ঘাটে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য আমন্ত্রণের মতো কিছু ঘটনা দ্রুত ঘটে যায়। এরই মাঝে ন্যায়নার উপর সন্দেহবশত যেই রহস্যময় সংস্থা রুমিকে পাঠিয়েছে তাদেরই কিছু ঘাতকের সামনে বিদ্যুৎ নিজের পরিচয় প্রকাশ করে। বিদ্যুৎ একাই তাদের সামলে নেয়। কিন্তু তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু বালা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং বিদ্যুৎকে গুলি করে। বালাকে বন্দি করা হয়। এরপর বিদ্যুৎ রাতের বেলা বানারসের অন্ধকার ঘাট পেরিয়ে রুমির পেছনে যায় এবং তাকে ধরে ফেলে। কিন্তু রুমি পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে ফেলে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বিদ্যুৎকে জানিয়ে দেয় যে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নামক একটা শক্তি তার এবং সমস্ত মানব জাতির ক্ষতি করার জন্য তেড়ে আসছে।

পূর্বে যা ঘটেছিলো
দ্বিতীয় অংশঃ প্রলয়

হরপ্পা, খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

হরপ্পার দেবতা, বিভাসন পূজারি, অলৌকিকভাবে মহাস্নানের নির্যাতন থেকে বেঁচে যান। তার শেষ বন্ধু এবং হরপ্পার তৎকালীন প্রধান স্থপতি, পণ্ডিত সোমদত্ত, বীর তারা সহ একটা সাহসী ও সহিংস অভিযানে তাকে উদ্ধার করে। উদ্ধার প্রচেষ্টার ফলে একটা কিংবদন্তি যুদ্ধ হয় যা রক্তের বৃষ্টি হিসেবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিভাসন পূজারি বন্দিদশা থেকে একটা রাক্ষসের মতো বেরিয়ে আসেন, তিনি খালি হাতে একজন হরপ্পান সেনাপতির পুরো শরীর ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন।

তার পুত্র মানু যে এখনো বেঁচে আছে সেই সম্পর্কে অন্ধকারে থাকা হরপ্পার সূর্য বিভাসন পূজারিকে ঘৃণার কালো ছায়া গ্রাস করলো। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে থাকা দেবতা একাই তার এক সময়ের শত্রু অসুর-রাজ সুরার কাছে যান। সুরা এবং তার দক্ষ সেনাপতি প্রচণ্ড বিভাসন পূজারির আত্মাকে আরো বিষাক্ত করে তোলে। যারা এই দেবতার উপর থুতু ছিটিয়েছে, অত্যাচার করেছে সেই হরপ্পানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের বিনিময়ে, যে শহর তার প্রিয় সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়েছিলো তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের বিনিময়ে সূর্য তাদের কাছে এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দিলেন যা তার ধার্মিক আত্মাকে চিরতরে কালো করে দেবে। তিনি তাদেরকে হরপ্পার শাশ্বত রক্ষকদের প্রধান ঐশ্বরিক সপ্তর্ষিদের গোপন আস্তানায় নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এদিকে, মানু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে সক্ষম হয়। সেখানে পশু রাঙাকে হত্যা করে সে এবং তার প্রিয় মায়ের দেহ কোলে নিয়ে চলে যায়। গুরুতর আহত মানু সোমদত্তের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ব দিকে কালো মন্দিরের দিকে যায়। সেখানে সে

এক অদ্ভুত মৎস্য-মানবকে দেখতে পায় যে কয়েক ফোঁটা পানির জন্য কাতরাচ্ছিলো। এই রহস্যময় মানুষ, যিনি মাছের মতো পোশাক পরেন এবং যার শরীর থেকে অদ্ভুত নীল আলো বিকিরিত হয়, ধীরে ধীরে মানুর পরামর্শদাতা, বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠেন। মানু বিশ্বাস করে যে তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর অবতার।

মৎস্য মানুকে কালো মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার সময় বলেন যে এই মন্দির কতগুলো মন্দিরের মধ্যে একটা মাত্র। এবং কালো মন্দির মানব জাতির সবচেয়ে মূল্যবান গোপনীয়তা রক্ষা করছে। তিনি মানুকে জানান যে মানুর পিতা কালো মন্দিরের একজন অভিভাবক ছিলেন এবং এখন সেই দায়িত্ব এখন মানুর কাঁধে এসেছে।

মৎস্য তখন সর্বনাশের সূচনা ঘোষণা করেন:

'প্রলয়...আসীৎ...!'

'মহাপ্রলয় আসছে!'

যখন মানুর সাথে তার প্রিয় শতরূপা, যাকে সে ভালোবেসে তারা ডাকে, সে এবং পণ্ডিত সোমদত্তের পুনর্মিলন ঘটে, মৎস্য তাকে সত্যব্রত নামে নামকরণ করেন এবং তাকে একটা বিশাল জাহাজ তৈরি করার নির্দেশ দেন।

একটা জাহাজ যা প্রলয়ের আক্রমণের বিরুদ্ধে মানব জাতির শেষ আশ্রয় হিসেবে আবির্ভূত হবে।

বিভাসন পূজারি হরপ্পার সৈন্যদের পিষে ফেলেন এবং যুদ্ধে অত্যাশ্চর্য পরাক্রম প্রদর্শনের পর ইট ও ব্রোঞ্জের পাহাড়ের নিয়ন্ত্রণ দখল করেন। তিনি অসুরদের রাজা ক্রূর সুরাকে সপ্তর্ষিদের গোপন আশ্রয়ে নিয়ে যান। যার ফলে সেখানে ভয়ানক একটা যুদ্ধ হয় এবং বিভাসন পূজারি সাত ঋষিদের রক্ষা করার নিরর্থক চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রায় পরাজিত দেবতার তলোয়ার মহান রত্ন-মরুকে নীল আগুনে পোড়ানো হয়, যে আগুনে সপ্তর্ষিরা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারপর হরপ্পার সূর্য অসুর-রাজ সুরাকে হত্যা করে।

কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। সপ্তর্ষিরা হলেন জ্ঞানের দেবি সরস্বতির প্রবাদ পুত্র, যিনি তার সন্তানদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে ক্রোধে ফেটে পড়েন। তিনি শুধু বিভাসন পূজারি এবং তার বংশধরদেরই নয়, সমস্ত মানব জাতিকে চিরন্তন কলহ, হিংসা ও ঘৃণার অভিশাপ দেন। তিনি এবং তার জ্বলন্ত পুত্ররা ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে বিভাসন পূজারির রক্তরেখার প্রতিটি পুত্র একই বর্বরতায় মৃত্যুবরণ করবে যা সপ্তর্ষিরা এই নীল আগুনের রাতে সহ্য করেছেন।

অবশেষে, শেষ সপ্তর্ষি হরপ্পার দেবতাকে আশীর্বাদ করেন। সপ্তর্ষিদের বাসস্থান একটা বিধ্বংসী তুষারপাতের মাঝে গ্রাস হওয়ার আগে শেষ ঋষি বিভাসন পূজারিকে আশ্বস্ত করেন যে তার পুত্র মানু অভিশাপ ও মহাপ্রলয়ের উপর বিজয়ী হবে।

সত্যব্রত মানুই হবে দেবতাদের উন্মুক্ত করা প্রলয়ংকরী শুদ্ধির বিরুদ্ধে মানব জাতির মুক্তির পথ।

শেষ ঋষি তখন বিভাসন পূজারির নিজস্ব মহাজাগতিক নিয়তির কথা বলেন,

'আপনার নাম অমর হয়ে থাকবে, হে বিভাসন পূজারি। আপনি আবার জন্মগ্রহণ করবেন, এখন থেকে হাজার হাজার বছর পরে–এই গ্রহের যে-কারো চেয়ে বড় একটা নিয়তি পূরণ করতে। কালো মন্দিরের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য আপনার পুনর্জন্ম হবে। এখন থেকে সহস্রাব্দের এক বিশেষ পূর্ণিমার রোহিণী নক্ষত্রে আপনিই এটি উন্মোচন করবেন। কারণ হে মহান দেবতা, আপনিই সেই মনোনীত ব্যক্তি।'

বানারস, ২০১৭ (বর্তমান সময়)

বানারসের ঘাট থেকে দেব-রাক্ষস মঠের চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুৎ তার শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো। দ্রুত সুস্থ হওয়ায় বিদ্যুৎ আবিষ্কার করে যে কীভাবে তার মহান প্রপিতামহ, বিস্ময়কর দ্বারকা শাস্ত্রী, বিদ্যুতের আত্মাকে পাতালের অন্ধকার গভীরতায় শুষে যাওয়া থেকে বাঁচাতে এক্সরসিজমের একটা মারাত্মক যুদ্ধ করেছেন।

নিজের সবচেয়ে ভালো বন্ধু বালার বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ার পরেও বিদ্যুৎ এই বিশ্বাসঘাতকের সাথে দেখা করতে মঠের কারাগারে যায়। কিন্তু বালার মাঝে কোনো অনুশোচনা দেখা গেল না, উলটো বিশ্বের বাস্তবতা সম্পর্কে বিদ্যুতের অজ্ঞতা নিয়ে তাকে উপহাস করলো। সে বিদ্যুৎকে জানালো, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার চাওয়াতেই বিদ্যুৎ বেঁচে আছে, এবং তারা চায় সে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোহিণী নক্ষত্র পর্যন্ত বেঁচে থাকুক। দেব-রাক্ষস মঠে ত্রিজাত কাপালিক নামক এক ভয়ংকর মহাতান্ত্রিকের আগমনে তাদের কথোপকথনে ব্যাঘাত ঘটে। মসান-রাজ বা শ্মশানের প্রভু হিসেবে পরিচিত সেই ব্যক্তি ভয়ংকর জাদু-সম্রাট দ্বারকা শাস্ত্রীকে বিদ্রুপ করে এবং বিদ্যুৎকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে। তার সাথে থাকা দুই বিভ্রান্ত, খুনি-যমজ অঘোরীদের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বালার শিরশ্ছেদ করা মাথাটি সেই টেবিলেই পাওয়া যায় যেখানে সে বিদ্যুতের সাথে কথা বলতে বসেছিলো। অমানুষিক এই বর্বরতায় শেষ দেবতা

কেঁপে ওঠে। তার প্রপিতামহ, পরাক্রমশালী দ্বারকা শাস্ত্রী তখন বিদ্যুৎকে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের ভীতিকর কাহিনি বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে কীভাবে নিসিয়ার ঐতিহাসিক কাউন্সিলের পাশাপাশি রোগাক্রান্ত বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তি শুরু হয়েছে, কীভাবে তাদের বীর পূর্বপুরুষ অদ্বৈত শাস্ত্রী কনস্ট্যান্টাইন দ্য গ্রেটকে এই দানবকে মুক্ত করা থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছেন এবং কীভাবে ১২ শতকের নাইটস টেম্পলাররা অর্ডারের প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিলো। পাশাপাশি তিনি বিদ্যুতের কাছে এটাও ব্যাখ্যা করেন যে কীভাবে একসময়ের এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং শক্তিশালী মানুষদের এক অন্ধকার ভ্রাতৃসংঘে পরিণত হয়েছে।

সমস্ত রক্তপাত এবং ষড়যন্ত্রের মধ্যে বিদ্যুৎ আর ন্যায়না তাদের দুজনের প্রত্যাশার চেয়ে কাছাকাছি চলে আসে। ন্যায়নার আকর্ষণীয় সৌন্দর্যে বিমোহিত বিদ্যুৎ নিজেকে ধরে রাখতে অক্ষম হয়ে বানারসের শ্বাসরুদ্ধকর সুন্দরী এই মেয়েটিকে চুমু দেয়।

রোমের বিগম্যান তার দূতকে আবারো সবুজ চোখের ইতালীয় ডনের কাছে পাঠায়, যাকে মাশ্চেরা বিয়ানকা বা সাদা মুখোশ বলা হয়। গোপন ভ্রাতৃসংঘের ওভারলর্ডদের এই বিশ্বস্ত মিত্র, সাদা মুখোশ, একটা রক্তমাখা পথে উল্কার গতিতে উঠে এসেছে–মিলানের রাস্তায় স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে করা খুন থেকে শুরু করে ইউরোপের অপরাধ জগতের অবিসংবাদিত নেতা হওয়া পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ এবং বলভান্ত বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞ শিক্ষক অধ্যাপক ত্রিপাঠির কাছে সাহায্য চায়। অতীতের এই অনিচ্ছুক তান্ত্রিক মঠে বিদ্যুতের সহকারী হিসেবে যোগদান করায় দ্বারকা শাস্ত্রী অধ্যাপককে ব্রহ্মানন্দ হিসেবে স্বাগত জানান। পুরোহিতজি বিদ্যুৎকে জানান যে ত্রিজাত এবং ব্রহ্মানন্দ উভয়েই একসময় মহান দ্বারকা শাস্ত্রীর শিষ্য ছিলো। ব্রহ্মানন্দ অমাবস্যার রাতে মশান-রাজের আস্তানায় আক্রমণ করার পরামর্শ দেন। তার মতে, রক্তবীজ অনুষ্টানে বাধা দেওয়া অপরিহার্য। এটা বিঘ্নিত না হলে এই ভূতুড়ে অনুষ্ঠান ত্রিজাতকে অজেয় করে তুলবে।

বিদ্যুৎ, বলভান্ত এবং দ্বারকা শাস্ত্রী ত্রিজাত কাপালিকের জঘন্য যজ্ঞশালায় আক্রমণ করলে যুদ্ধ শুরু হয়। মসান-রাজের অভয়ারণ্যে মৃতদেহ-সজ্জিত আচার-ক্ষেত্র দেখে বিদ্যুতের আত্মা স্তব্ধ হয়ে যায়...সে পাতালের গহ্বরে মহাতান্ত্রিকদের দুর্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

ত্রিজাত মৃতদের জাগিয়ে তোলে। তার যজ্ঞের পিট থেকে দুটি ডাকিনী বেরিয়ে আসতে লাগলো, ঠিক তখন দ্বারকা শাস্ত্রী শিব-কবচ মন্ত্র পড়তে থাকেন

এবং অশরীরী প্রাণীগুলোকে অন্ধকারের জগতে ফেরত পাঠান। কিন্তু এই সময় বিদ্যুৎ একটা মর্মান্তিক বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়, ব্রহ্মানন্দ পেছন থেকে তার মাথায় আঘাত করে এবং জ্ঞান হারায়। যখন সে চোখ খোলে, তখন সে দেখে যে তার হাত-পা মাটির নিচের গুহার চারটি পাথরের স্তম্ভে শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ত্রিজাতের জ্বলন্ত আচার-পিটের উপরে সরাসরি ঝুলে আছে।

একচোখা দানব ব্রহ্মানন্দের কুৎসিত পরামর্শ শুনে মসান-রাজ তার দুই হত্যাকারীকে দ্বারকা শাস্ত্রীর শিরশ্ছেদ করার নির্দেশ দেয়। তার এই দুঃসাহস দেখে বিদ্যুৎ ক্রোধে ফেটে পড়ে। দেবতা তখন পাথরের একটা স্তম্ভ ধ্বংস করে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয় এবং আত্মা শীতল করা কণ্ঠে বলে ওঠে,

'তুমি বিশাল একটা ভুল করেছ, হে মশান-রাজ!'

এর সাথে দেবতা তার ডান পা ছাড়িয়ে নিলো এবং আগুনের উপর উড়ন্ত দেবতার মতো ঝুলতে থাকলো।

'তুমি ভুলে গেছ, ত্রিজাত! আমি অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ঈশ্বর!'

প্রস্তাবনা

নভেম্বর ১৯৯১, ফিশারম্যানস ওয়ার্ফ, সান ফ্রান্সিসকো

ও জানতো যে বেশি দিন লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

ওদের অনেক লোক আছে এখানে। ওরা তাকে গঙ্গার তীর থেকে শুরু করে কুখ্যাত আলকাট্রাজ কারাগারের আশেপাশের জলাশয় পর্যন্ত অনুসরণ করেছে।

ও ভালো করেই জানতো যে বিশ্বের সেরা লোকগুলো তার পিছু নিয়েছে...আর এখানে তাদের থামানোর মতো কেউ নেই।

আপাতত নয়।

অন্তত ভবিষ্যদ্বাণীকৃত রোহিণী নক্ষত্র পর্যন্ত নয়।

আমাকে একটা ফোন খুঁজে বের করতে হবে। তারপর কল দিতে হবে পিতামহকে।

* * * * *

সে ভিজে যাওয়ার কারণে যতটা কাঁপছে, দুশ্চিন্তার কারণেও ঠিক ততটাই কাঁপছে। যুদ্ধে থাকা একজন সৈনিক যখন জানে যে তার মৃত্যু এগিয়ে আসছে, তখন যেমনটা অনুভব করে তেমন। সেই মুহূর্তের অনুভূতি যখন সে জানে যে এই প্রতিকূলতা এড়ানোর কোনো উপায় নেই, এবং মৃত্যু বিজয়ী শত্রুর হাত ধরে খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে।

কিন্তু ও কোনো সাধারণ মানুষ নয়। আর সহজে পরাজিতও হবে না। সুদর্শন চেহারা থেকে লম্বা বাদামি চুলগুলো পেছনের দিকে সরালো সে, কাঠবাদামের মতো চোখগুলো কয়েক মুহূর্তের জন্য গভীরভাবে বন্ধ করলো। নিজের পুরো চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করলো কুণ্ডলিনীতে, যেভাবে বৈদিক যোগব্যায়ামের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অনুশীলনকারীরা নিজেদের নশ্বর দেহকে চূড়ান্ত প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত করে।

দেব-রাক্ষস মঠের বংশধর দাঁতে দাঁত চেপে সেই অশুভ রাতের অন্ধকারে একটা খোলা রেস্তোরাঁর কাউন্টারের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো। ছায়ার মধ্য দিয়ে বন্ধ দোকানগুলোর দেয়ালের সাথে মিশে হাঁটছে। যখন সে তাড়াহুড়ো করে একটা পে ফোনের দিকে যাচ্ছে, নভেম্বরের প্রবল বৃষ্টি তার মুখ ও চকচকে রেইনকোটে আঘাত হানছে। তার শেষ একটা ফোনকল করতে হবে, বিদায় জানাতে হবে।

কারণ তাকে একাই মোকাবেলা করতে হবে পুরো একঝাঁক উন্মাদ নেকড়ের।

* * * * *

দৈত্যাকার আফ্রো-আমেরিকান লোকটি হঠাৎ করেই উদিত হলো। উচ্চতা কম করে হলেও ৭ ফুট হবে। শরীরটা প্রায় ষাঁড়ের মতো প্রশস্ত। বেল্টের কাছ থেকে ছুরি বের করার সময় তাকে দেখে মনে হয়নি যে ভারী বৃষ্টি তাকে বিরক্ত করছে।

অন্যদিকে, কাশীর সাহসী ছেলেটি একদম নির্বিকার। দৈত্যাকার লোকটির দিকে দৌড়ে এগিয়ে গেল সে, ডানে একটা লম্বা গ্রিলের দিকে মুহূর্তের মধ্যে নিজের পথ ঘুরিয়ে নিলো, এরপর উচ্চতাকে ব্যবহার করে নিজের পেশিবহুল শরীরকে ঘুরিয়ে আফ্রো-আমেরিকান লোকটির মাথায় কষে লাথি মারলো একটা।

কিন্তু দানবাকার লোকটি দাঁড়িয়ে রইলো ভঙ্গুর পাহাড়ের মতো, হাতের ছুরিটি ঘোরাচ্ছে এলোপাথাড়িভাবে। এবার মঠের বংশধর আফ্রো-আমেরিকান লোকটির হাতে লাথি মেরে ছুরিটা ছিটকে ফেলে দেয়। আমেরিকান লোকটির পেটে শেষ একটা লাথি দিতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই পিঠে আঘাতের শব্দ শুনলো। অনুভব করলো অসহ্য ব্যথা।

পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখলো, ৭/৮ জন ষণ্ডামার্কা লোক এই অন্ধকার বৃষ্টির রাতে তাকে ঘিরে রেখেছে। আততায়ীদের আড়ালে গোল্ডেন গেট ব্রিজের লাল ঝলক দেখতে পাচ্ছে সে। তাদের মধ্যে একজন ইতোমধ্যে তাকে ছুরি দিয়ে মারাত্মক জখম করেছে। আরো দুজন ধরে আছে দুটো মরিচা-ধরা চেইনশ।

ফুটো বেলুন দিয়ে যেভাবে পানি বের হয়, ঠিক সেভাবে তার শরীর থেকে রক্ত বের হচ্ছে। দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে আসছে। ও জানে তার শেষ সন্নিকটে। কিন্তু এরপরেও নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে ওদের সাথে লড়াই করার জন্য অবস্থান নিলো।

কিন্তু ও জানতো।

আমি এভাবেই মারা যাবো। এই বৃষ্টিস্নাত রাতে। আমার প্রিয়জনদের থেকে অনেক দূরে। এ এক নির্মম মৃত্যু। যেমনটা প্রাচীন অভিশাপে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

* * * * *

'বাবাআআআ!' ফোনটা কানে দিয়ে শোক আর অসহ্য যন্ত্রণায় সে কেঁদে উঠলো। 'আমি...বাবা...'

ফোন বুথের কাচের প্যানেলের সাথে হেলান দিয়ে আছে সে। বুথের দেয়াল এই মহৎ আত্মা, এই গম্ভীর যোগী এবং এই দক্ষ যোদ্ধার পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে।

'হ্যাঁ, বাছা, আমি জানি এটা তুমি...আমি জানি এটা তুমি!' বৃদ্ধ দ্বারকা শাস্ত্রী চিৎকার করে বললেন।

মঠাধীশ জানতেন কী ঘটছে। ওরা তাকে ধরে ফেলেছে। অবশেষে, এত বছর পৃথিবীর অন্ধকার শক্তির সাথে লড়াই করার পরে শাস্ত্রী রক্তরেখার আরো একজন শিকার হতে চলেছে কালো অভিশাপের।

'আমি যাচ্ছি, বাবা...' ও হাঁফাচ্ছে। 'কিন্তু আমি ওদের সাথে দীর্ঘ লড়াই করেছি। নির্ভয়ে লড়াই করেছি...বাবা...'

অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে, ফোনের রিসিভারটি প্যাঁচানো তারের সাহায্যে তখনো তার কানের পাশে ঝুলছে।

'কিছু বলো...কিছু বলো...বাছা!' দ্বারকা শাস্ত্রী তার ফোনে চিৎকার করে বললেন। এরপর অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আর কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

নড়েচড়ে উঠলো সে। কাশীর লোকটা এত সহজে, এত তাড়াতাড়ি মারা যাবে না। শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে আবার ফোনটা হাতে নিলো সে। 'আমি প্রকাশ করিনি, বাবা...আমি কালো মন্দিরের গোপন কথা বলিনি!' নিজের অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে ফিসফিস করে বললো।

বৃদ্ধ দ্বারকা শাস্ত্রীর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ায় তিনি নিজের দাঁত চেপে ধরলেন। 'তুমি আমাকে গর্বিত করেছ, বাছা। তুমি আমাদের সবাইকে গর্বিত করেছ।'

'বাবা...আমার স্ত্রীর দেখাশোনা কোরো, বাবা। আর আমার ছেলে...ওকে দেখেশুনে রেখো! ওকে কাশীতে থাকতে দিও না। আমাকে কথা দাও, বাবা...আমাকে কথা দাও তুমি তাকে নিরাপদে রাখবে। একমাত্র তুমিই পারো ওকে...নিরাপদে রাখতে...বাব...'

ব্যথিত, যন্ত্রণায় কাতর কণ্ঠটি ধীরে ধীরে নীরব হয়ে গেল।

'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, বাছা...' দ্বারকা শাস্ত্রী বললেন, কষ্টে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তিনি আবার ফিসফিস করে বললেন, 'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি...হে পরাক্রমশালী কার্তিকেয়!'

বানারস, ২০১৭

'নাআআআগ!'

তিনি অস্পষ্ট, পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। নিচে যাওয়ার এই বিভ্রান্তিকর, আঁকাবাঁকা, খাড়া ধাপগুলো শুধু তার ধরে থাকা মশালের আলোয় আলোকিত হচ্ছে। কাশীর এই রহস্যময় প্রতিষ্ঠানের প্রবীণ সদস্য হিসেবে কয়েক দশক পার করার পরেও এই গোপন কক্ষে এমন কিছু ছিলো যে তিনি গত কয়েক দিনে এই প্রথম এখানে এসেছেন।

তার নেওয়া প্রতিটা পদক্ষেপই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখা পিনপতন নীরবতা এবং ফাঁপা অন্ধকার ভেদ করে আসা এক বিকট, অস্বস্তিকর শব্দের মাঝে। তার *খাণ্ডা*ও বা চ্যাপটা স্যান্ডেল দুটো বিরক্তিকরভাবে শব্দ করছে, যা তার দুঃশ্চিন্তাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি বারবার ঘাম মুছছেন, প্রার্থনা করছেন ভগবান বিষ্ণুর কাছে। তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে পৃথিবীর এত গভীরে এই ভূগর্ভস্থ তেহখানা গড়ে উঠেছে। তিনি এর সম্পর্কে অনেকবার শুনেছেন, কিন্তু তার সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্নেও তিনি এত ভূতুড়ে, এত রহস্যময় জায়গার কথা কল্পনা করতে পারেননি।

শেষ পর্যন্ত তিনি ঘরের মেঝে স্পর্শ করলেও স্বস্তি পেলেন না। এখন তার অগ্নিপরীক্ষার সবচেয়ে কঠিন অংশ শুরু হবে।

* * * * *

প্রায় কাঁপা হাতে ঘরের দেয়ালে থাকা দুটি মশাল জ্বালিয়ে দিলেন তিনি। ধীরে ধীরে অন্ধকার কক্ষটি আংশিক প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। আগুনের আলোর নিচে একটা নিস্তেজ লাল রং জ্বলজ্বল করছে।

তখনই তেহখানার আসল বিস্তৃতি দৃশ্যমান হলো। গোপন চেম্বারটি কালো পাথরে তৈরি, যেখানে সুন্দরভাবে খোদাই করা মূর্তিগুলো পৌরাণিক, প্রাচীন অসুরদের উপর ভগবান শিব এবং ভগবান বিষ্ণুর বিজয়কে চিত্রিত করছে। এই ভাস্কর্যগুলোর

উপস্থিতিই তাকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগাচ্ছে। তিনি সতর্কতার সাথে সামনে পড়ে থাকা দীর্ঘ, অন্ধকার পথের দিকে ঘুরলেন, সেই পথ তাকে এই বিশাল, ভূগর্ভস্থ কক্ষের অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রের গভীরে নিয়ে গেল। গলায় কিছু একটা আটকে আছে বলে মনে হচ্ছে। ভয় তাকে আবার গ্রাস করছে। কেনই বা করবে না?

তাকে এখন এই ধুলোময়, অন্ধকার পথ ধরে হাঁটতে হবে, যে পথ নিয়ে যায় *ঐ প্রাণীর* কাছে।

সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার পরেও তিনি এই রহস্যময়, গুরুত্বপূর্ণ *অতিথি*-কে বর্ণনা করার জন্য এর চেয়ে ভালো শব্দ খুঁজে পাননি।

কিংবা বলা যায়, এই *জিনিস*-টাকে।

* * * * *

প্যাসেজের অর্ধেক পথে তিনি দূর থেকে একধরনের সবুজ আভা দেখতে পেলেন, যার ফলে তার মেরুদণ্ড দিয়ে এক শীতল অনুভূতি বয়ে গেল। আবারো তার হৃৎপিণ্ড বেশ কয়েকটি স্পন্দন এড়িয়ে গেল। গোপন সেলারে এ হলো তার দ্বিতীয় সফর। কিন্তু এখনো তার স্নায়ুতে প্রথম ভ্রমণের প্রভাব অনুভব করতে পারছেন। দূরের ক্ষীণ আলো সরে গেল; তাদের স্বর্গীয় অতিথির শরীর থেকে এই সবুজ আভা বের হচ্ছে।

আর তারপর তিনি শুনতে পেলেন। শব্দটা শুনে মনে হচ্ছে দেয়াল, ছাদ এবং কালো গুহার মূর্তি থেকে বের হচ্ছে। এক স্নায়ু-বিধ্বংসী হিসস জাতীয় ধ্বনি।

এ এক দানবীয়, আদিম সর্পের হিসধ্বনি!

এই অপার্থিব শব্দ কোথা থেকে আসছে তিনি জানেন না। কিন্তু মনে হচ্ছে এটা জোর করে দেব-রাক্ষস মঠের শরীরে আঁশওয়ালা অতিথির উপস্থিতি ঘোষণা করছে। কোনো মধ্যযুগীয় কবরস্থানের উপর দিয়ে বয়ে চলা শীতল, দমকা হাওয়ার মতো শব্দ করে এখানে যে উপস্থিত আছে তার ঘোষণা দিচ্ছে...

'নাআআআগগ...'

'নাআআআআআগগ...'

'নাআআআআআআগগ...'

এই শীতল হিসধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছে ভূগর্ভস্থ এই কক্ষের প্রতিটি কণা, প্রতিটি ধূলিকণার মাঝে।

ভয়ের শীতল তীরের মতো এই ধ্বনি চলে যাচ্ছে পুরোহিতজির আত্মা ভেদ করে।

* * * * *

পুরোহিতজি যে বালতি নিয়ে এসেছেন, সেখান থেকে তিনি তার দুই হাত দিয়ে দুধ নিলেন। ওখানে যে আছে তার লম্বা চুল মুখকে পুরোপুরি ঢেকে রাখে। বিশ ফুট দূর থেকেও বুড়ো পুরোহিত বুঝতে পেরেছেন যে তাদের অতিথিটি বিশাল আকারের, সম্ভবত আট ফুটেরও বেশি লম্বা। তার শরীরের গঠন মানুষের মতো হলেও চামড়া সরীসৃপের মতো আঁশযুক্ত, অনেকটা সাপের মতো। এমনকি মৃত্যুভয়ের মধ্যেও পুরোহিতজিকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে অতিথির খসখসে ত্বক এমন এক চকচকে সবুজ আলো বিকিরণ করছে যা তিনি আগে কখনো দেখেননি।

একটা কোবরা তার পায়ের উপর দিয়ে পিছলে যাওয়ায় তার মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি নিচে তাকাতে সাহস করেননি কারণ তিনি জানতেন কী দেখতে পাবেন। মনে হচ্ছে কয়েক ডজন বিষাক্ত কিং কোবরা এই সর্প-মানবের সেবা করছে। এরা একবারও তাকে বা তার অনুগ্রহ উপভোগ করা কাউকে কামড়ে দেয়নি–যে *অনুগ্রহ উপভোগকারী* হলেন আপাতত পুরোহিতজি। সাপগুলো তার কাঁধ, তার শক্তিশালী এবং প্রায় দৈত্যাকার বাহুগুলির উপর দিয়ে সব সময় চক্কর দিচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে এরা তার ইচ্ছামতো কাজ করছে।

পুরোহিতজি এই সর্প-মানবের প্রতি শ্রদ্ধায় হাতজোড় করার তাগিদ অনুভব করছেন। তার মধ্যে এক অন্য ধরনের আকর্ষণ আছে। তাছাড়া, দ্বারকা শাস্ত্রী এই অথিতির এমনভাবে খাতির-যত্ন করতে বলেছেন, যেমনটা ভগবান শিব তার বাসায় অতিথি হিসেবে এলে তিনি করতেন। এর নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ রয়েছে। কিন্তু এই পবিত্র অথচ ভয়ংকর *প্রাণী*-র উপস্থিতিতে তার মতো আধ্যাত্মিক একজন মানুষও যে ভয় অনুভব করেছে, তা অন্য সব কিছুকে পরাভূত করে। রহস্যময় অতিথিকে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি দুধ পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করার পর জ্ঞানী পুরোহিত চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

'আমি এখন বিদায় নিচ্ছি, প্রভু,' পুরোহিতজি মাথা নিচু করে প্রণাম করে বললেন।

অতিথি মাথা নাড়লেন, কিন্তু তার চোখ তখনো নিজের তালুতে নিবদ্ধ। পুরোহিতজি চলে যাচ্ছেন, এমন সময় ভয়ংকর অতিথি তার মাথা উপরে তুললেন। তার চেহারা তখনো চুল দিয়ে ঢাকা কিন্তু চোখ দেব-রাক্ষস মঠের পুরোহিতের দিকেই ছিলো। দেখে পুরোহিত ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ এগুলো মানুষের চোখ নয়। ওগুলো অন্ধকার ভেদ করে কালো আকাশে অশুভ সূর্যের মতো জ্বলে উঠেছে। এগুলো এক অমর, আদিম সর্পের হলুদ এবং কালো চোখ।

হরপ্পা, খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

'দেবতারা আমাদের পরিত্যাগ করেছেন!'

ওরা তাকে শহরের পরিসীমার দেয়াল থেকে দেখছে। কড়া পাহারায় থাকা গেট দিয়ে নির্ভীক সিংহের মতো প্রবেশ করলো সে।

তাকে আগে যারা দেখেছে, তাদের সবার কাছেই আজ তাকে আশ্চর্যজনকভাবে ভিন্ন লাগছে। এমনকি এই ঝড়ের রাতের অন্ধকার ও মশালের এলোমেলো নড়াচড়ার মধ্যেও হরপ্পার মহান সূর্যের পুত্রের মাঝে কিছু একটার পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হচ্ছে।

কেউই জানতো না কীসের পরিবর্তন হয়েছে। কেউই জানতো না কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে। এর কারণ হলো, তাদের কেউই জানতো না যে মানু গত কয়েক দিন কার ঐশ্বরিক সংস্পর্শে কাটিয়েছে।

মানুকে তার মহান পিতার মতোই চমৎকার দেখাচ্ছে। তাকে দেখেই শত শত হরপ্পাবাসী আক্ষেপ আর অনুশোচনার কান্নায় ভেঙে পড়লো। ওরা বিশ্বাস করে, সূর্য বেঁচে থাকলে এই বিপর্যয়ের কিছুই ঘটতো না।

বিভাসন পূজারি বেঁচে থাকলে আসন্ন বিপর্যয় ঠেকানো যেত।

হয়তো তাদের ধারণা সঠিক ছিলো।

* * * * *

ওর ডান দিকে তার প্রিয় সঙ্গী তারা। মেয়েটা একজন সত্যিকারের যোদ্ধা-রাজকুমারীর মতোই তার পাশে চলছে, তলোয়ার ঝুলছে কোমরে। তার প্রিয় রণ-কুঠারটি হাতে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে, দেখে মনে হচ্ছে একাই পুরো এক সৈন্যদলের মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। পণ্ডিত সোমদত্ত ছিলেন মানুর বাম দিকে। তার সম্মানিত উপস্থিতি এই মুহূর্তটিতে বিশেষ মর্যাদা এবং বিশ্বস্ততা যোগ করেছে।

তার নিজের দলের যোদ্ধা এবং সোমদত্তের সৈন্য ছাড়াও মানুকে যেটি সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে তা হলো তার পতাকার নিচে শক্তিশালী মৎস্য-মানবদের যোগদান। হরপ্পাবাসী এবং সৈন্যরা এমন শক্তিশালী চেহারার সেনাবাহিনী কখনো দেখেনি।

মৎস্য-উপজাতির যোদ্ধারা মানুকে যেভাবে তাদের সুসংগত সাজ এবং কৌশলী গতিবিধিতে স্তম্ভিত করেছে, ঠিক একইভাবে হরপ্পাবাসীকেও অবাক করে দিয়েছে। তাদেরকে হিংস্র, অজেয় মনে হচ্ছে।

মানু গেটের থেকে মাত্র একশো গজ দূরে এসে দাঁড়ালো। এরপর সে তার ডান হাতটি উপরে উঠালো। এ হলো তার সৈন্যদের থামার নির্দেশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই খুরের আওয়াজ আর অস্ত্রের ঝনঝন শব্দ শান্ত হয়ে গেল। হরপ্পার নাগরিকরা নিস্তব্ধ নীরবতায় শহরের দেয়ালের ওপাশ থেকে উঁকি মারছে। এরা আসলে জানে না বিভাসন পূজারির ছেলের কাছ থেকে ঠিক কী প্রত্যাশা করবে। মানু কি শহর দখল করতে এসেছে? নাকি এখানে তার পিতামাতার ভয়ংকর পরিণতির প্রতিশোধ নিতে এসেছে?

এখন শুধু তীক্ষ্ণ বাতাসের শনশন শব্দ আর আকাশের বজ্রধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

মানু নেমে তার এক সহচরকে একটা মশাল দিলো। সোমদত্তের দিকে তাকাতেই তিনি সমর্থনমূলক সম্মতিতে মাথা নাড়লেন। মানু ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে শহরের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল, যেখান থেকে সে জানতো হরপ্পাবাসীরা তার কথা শুনতে পাবে। তাদের কাছাকাছি পৌঁছানোর সাথে সাথে মানু তার তলোয়ারটি কোষমুক্ত করলো, তারপর সবার দেখার জন্য একে উপরে তুলে পর মুহূর্তেই জোরে ধাতব ঝনঝন শব্দে ফেলে দিলো মাটিতে। এ ছিলো তার সেইসব লোকদের আশ্বস্ত করার উপায় যারা একসময় তার মহান পিতাকে ভালোবাসতো। তাদেরকে বোঝানোর উপায় যে মানু তাদের ক্ষতি করার জন্য এখানে আসেনি।

তখন তারা জানতো না যে মানু শুধু তাদের নয়, সমগ্র মানব জাতিকে উদ্ধার করতেই এখানে এসেছে। পুরুষ, মহিলা এবং শিশু। বৃদ্ধ এবং তরুণ। ধনী ও নিঃস্ব। পাপী ও সাধু। একদম সবাইকে।

ও তাদের নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে এসেছে। প্রলয় থেকে রক্ষা করতে যাচ্ছে।

* * * * *

"হে হরপ্পার বাসিন্দারা, আমার কথা শুনুন!' মানু প্রাচীরের পেছনে ভিড় করা হাজার হাজার লোকের উদ্দেশে চিৎকার করে বলছে। ভেতর থেকে ঘাড় লম্বা করে মানুকে একনজর দেখার চেষ্টা করছে তারা। 'হরপ্পায় কল্পনাতীত ধ্বংসলীলা সংঘটিত হতে যাচ্ছে।'

'এই তুষারঝড়, যা ক্ষুধার্ত অজগরের মতো ভূমিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে; এই অবিরাম বৃষ্টি, যা আমাদের আত্মাকে পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে; ইন্দ্রের এই বজ্র, যা মহাজাগতিক ড্রাগনের মতো গর্জন করছে এবং আগুন ছড়াচ্ছে–এগুলো সমস্ত আর্যাবর্তের জন্য ধ্বংসের লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়!'

মহানগরের মানুষ স্তব্ধ হয়ে গেল। বিগত কয়েক দিনের অস্বাভাবিক, অস্বস্তিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা যেকোনো কিছু বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক। হরপ্পার সাধারণ মানুষের মধ্যে একজন অসাধারণ মানুষ নিজেকে একটা শাল দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিভাসন পূজারির ছেলের প্রতিটি কথা শোনার জন্য তিনিও অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাকি সবার মতো।

তিনি ছিলেন পণ্ডিত চন্দ্রধর, হরপ্পার ক্ষণস্থায়ী, হতভাগ্য রাজা।

* * * * *

'পর্বতসম এক জলোচ্ছ্বাস আপনাদের শহরের দিকে ছুটে আসছে, হে হরপ্পাবাসী! এই প্রলয় এতই প্রকাণ্ড যে এক প্রহরেরও কম সময়ে সমগ্র বসতিকে গ্রাস করে ফেলবে। আপনাদের সন্তানদের বাঁচাতে হবে। নিজেকে বাঁচাতে হবে। আপনাদের আমাকে বিশ্বাস করতে হবে! এখনই শহর খালি করতে হবে আমাদের!'

প্রাচীরের জনগণের মধ্যকার পিনপতন নীরবতা হঠাৎ গুঞ্জনে রূপ নিলো। এই তরুণ ছেলেটিকে বিশ্বাস করা কি ঠিক হয়েছে? সে কি এই ভয়ানক পর্বতসম জলোচ্ছ্বাস দেখেছে যার কথা সে বলছে? আর যদি দেখেই থাকে, তাহলে সে কীভাবে বেঁচে ফিরলো?

'কেন আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো, হে সূর্যপুত্র?' একজন চিৎকার করে উঠলো। 'তুমি কীভাবে এই অব্যক্ত ভাগ্য সম্পর্কে এত নিশ্চিত হলে?'

এতক্ষণে সোমদত্ত এসে মানুর সাথে যোগ দিলেন। সবাই হরপ্পার প্রধান স্থপতিকে চিনতে পেরেছে। তার সম্মানে শত শত হাত উপরে উঠতে লাগলো। সোমদত্তের ব্যক্তিত্ব নতুন যে ব্যাপারটা যোগ করেছে তা হলো, এতক্ষণে জনগণ জানতে পারলো যে একমাত্র সোমদত্তই হরপ্পার সূর্যের সবচেয়ে কঠিন সময়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আর আজ হরপ্পার প্রতিটি অধিবাসী একজন সোমদত্ত হতে চায়।

'তর্ক-বিতর্কের সময় শেষ হয়ে গেছে, বন্ধুরা। আমরা যত সময় নষ্ট করবো, ততই মৃত্যু ও ধ্বংসের কাছে যেতে থাকবো,' সবাই যাতে শুনতে পায়, তাই সোমদত্ত উচ্চ স্বরে বললেন। 'এই যুবক মহান বিভাসন পূজারির পুত্র। তার পিতা সেই ব্যক্তি ও দেবতা যিনি এই শহর এবং এর জনগণকে সবচেয়ে বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আপনারা তাকে বিশ্বাস করেছেন। আমি আজ আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা তার যোগ্য সন্তানকে বিশ্বাস করুন। সত্যব্রত মানুকে বিশ্বাস করুন!'

* * * * *

অভিশপ্ত শহরের বেশ কিছু নারী-পুরুষ তাদের সন্তানদের তুলে নিতে এবং সেই সাথে মূল্যবান জিনিসপত্রের অন্তত কিছু সংগ্রহ করতে তাড়াহুড়ো করে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলো। বাকিরা শহরের দেয়ালের পাশেই রয়ে গেছে এবং উদ্বিগ্নভাবে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছে।

হঠাৎ রাতের বাতাসে ভেসে এলো তীক্ষ্ণ এক আওয়াজ।

'দেবতারা আমাদের পরিত্যাগ করেছেন!' চিৎকার করে উঠলো একজন বয়স্ক মহিলা।

অন্ধকার এবং কোলাহলের মধ্যে তার কাঁপা-কাঁপা, জাদুকরী কণ্ঠস্বর প্রতিটি হৃদয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করলো।

'না, করেনি!' মানু চেঁচিয়ে উঠলো। 'অন্তত তাদের মধ্যে একজন করেনি...'

শেষের কথাটা কিছুক্ষণ পর নিজেকেই ফিসফিস করে বলেছে।

বানারস, ২০১৭

একজন অভিশপ্ত অসুর সম্রাট, একজন পরাজিত কৌরব রাজকুমার ও একজন বিশ্বাসঘাতক তান্ত্রিক

তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার সারা শরীর লাল আগুনে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বিদ্যুৎ এখন ত্রিজাত কাপালিকের যজ্ঞের আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার ভেদ করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও সে প্রতি পদক্ষেপের সাথে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলো, কিন্তু তার হৃদয়ের ভেতর যে নরক যন্ত্রণা হচ্ছে সেই তুলনায় এই আগুন কিছুই নয়।

ঠিক যেভাবে বালার শিরশ্ছেদ করতে বলা হয়েছে, সেভাবেই যখন মশান-রাজ তার দুই নৃশংস নারী সঙ্গীকে দ্বারকা শাস্ত্রীর উপর তাদের জঘন্য কাজে ব্যবহার করার নির্দেশ দিলো, সেখানেই সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছে সে। ভবিষ্যদ্বাণীকৃত দেবতার উপর তাদের স্বল্পস্থায়ী বিজয়ের নেশায় ত্রিজাত এবং ব্রহ্মানন্দ উভয়েই ভুলে গেছে যে মহান মঠাধীশ ছিলেন বিদ্যুতের একমাত্র পরিবার। তার সবচেয়ে মূল্যবান *বাবা*!

এবং শেষ দেবতা তাদের এই দুঃসাহসী পাপ মোটেও ক্ষমা করবে না।

* * * * *

ব্রহ্মানন্দ যখন দেখলো যে বিদ্যুৎ যজ্ঞের আগুনের মাঝ দিয়ে হেঁটে আসছে, কিন্তু জ্বলন্ত কয়লার কারণে তার শরীরের নানা জায়গায় ফোসকা পড়ার পরেও কোনো পরোয়া করছে না, নিজের অশুভ চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলো না সে। দেখে মনে হচ্ছে যেন ভূগর্ভের গলিত, ধোঁয়াময় গভীরতা থেকে একটা অস্পষ্ট,

কমলা রঙের আদিম প্রাণী আবির্ভূত হচ্ছে। দুই ডাকিনীর মনোযোগ এখন সেই ব্যক্তির প্রতি যাকে তারা এইমাত্র তার ক্ষীণ, পেশিবহুল শরীরের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে মরিচা-ধরা শিকল এবং পাথরের স্তম্ভগুলোকে ভাঙতে দেখেছে।

কিন্তু সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত এবং বিভ্রান্তিকর প্রতিক্রিয়া এসেছে স্বয়ং মশান-রাজের কাছ থেকে। পিট থেকে কয়েক কদম দূরে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ত্রিজাত, পলক না ফেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিদ্যুতের দিকে। মোহগ্রস্তের মতো একই কথা বারবার বলছে সে।

'এটাই তিনি। এটাই তিনি। এটাই তিনি...'

তার অনুসারীরা এই প্রথম শ্মশানের প্রভুর মুখে মৃত্যুভয় দেখতে পেয়েছে।

* * * * *

বিদ্যুতের মনে কোনো ধরনের দ্বিধা ছিলো না। এই দুই ডাকিনীকে কঠিন শাস্তি পেতেই হবে। বালা হাতবাঁধা এবং অরক্ষিত অবস্থায় থাকার পরেও তারা নির্দয়ভাবে ওর শিরশ্ছেদ করেছে। এমনকি এখনো তারা কাপালিকের নির্দেশে বিদ্যুতের প্রপিতামহকে মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছে। এরা মানুষ নয়। অন্তত এখন আর নেই। এবার এদের দমন করতেই হবে।

এরা যাতে আর কারো ক্ষতি করতে না পারে সে ব্যাপারে বিদ্যুৎ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ডাকিনীটা বিদ্যুতের প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত নড়ে উঠলো। যেই না বিদ্যুৎ পিট থেকে বেরিয়ে দ্বারকা শাস্ত্রীর কাছে থাকা ডাকিনীটার দিকে গেল, সাথে সাথে সে সাপের মতো পিছলে ক্ষীপ্র গতিতে সেখান থেকে সরে গেল। বিদ্যুৎ কিছু বোঝার আগেই দক্ষ জিমন্যাস্টের মতো তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। এরপর নিপুণভাবে তার ভোঁতা, দাগযুক্ত কাস্তে দিয়ে দেবতাকে আক্রমণ করলো। কিন্তু এই জঘন্য হত্যাকারীর কোনো ধারণাই ছিলো না যে সে কার মুখোমুখি হয়েছে।

বিদ্যুৎ তেমন কিছু না করে মুখ ঘোরালো, এরপর দক্ষ কিক বক্সারের মতো ঘুরে ফোসকা-পড়া পা দিয়ে ডাকিনীর মুখে কষে একটা লাথি মারলো। লাথিটা এমন জোরে তার মুখে আঘাত করলো যে মনে হচ্ছে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন ওকে ধাক্কা মেরেছে। মাটিতে পড়ে গেল সে, মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। এই হীন শত্রুকে পরাস্ত করতে বিদ্যুতের দশ সেকেন্ডেরও কম সময় লেগেছে। আরেকটা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে বিদ্যুৎ অন্য ডাকিনীর দিকে ফিরে গেল। সে যা দেখলো তা যা আশা করেছে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দ্বিতীয় ডাকিনী তার অস্ত্র ফেলে দিয়ে ভয়ে কাঁপছে। সে ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল এবং গুহার এক কোনায় গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। তার রক্তবর্ণ চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। মনে

হচ্ছে যেন ত্রিজাতের ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া এবং তার জমজের পরাজয় এই দুর্ভাগাকে হঠাৎ করেই এক কালো জাদু থেকে মুক্তি দিয়েছে।

* * * * *

বিদ্যুৎ ক্লান্ত, আহত, দগ্ধ ও স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু ভেঙে পড়েনি। ঘুরেফিরে সেই মহাতান্ত্রিক দোসরদের দেখতে লাগলো যারা বছরের পর বছর দুষ্ট মশান-রাজের তত্ত্বাবধানে এই নরকের গহ্বরে, এই পাতালে ঘুরেছে। কিন্তু ভূগর্ভস্থ গুহাটির ঝলকানো লাল অন্ধকারে তাদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। দেবতার প্রাথমিক আক্রমণেই এই পথভ্রষ্টরা প্রচুর মার খেয়েছে। কিন্তু এবার এই অসাধারণ মানুষকে পাথরের স্তম্ভ ভেঙে ফেলা ও স্টিলের চেইনকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলতে দেখে তারা পালিয়ে গেছে। যে সময়ে মশান-রাজের তার অনুসারীদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিলো, তখন তার পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ ছিলো না।

প্রাচীন আর্যাবর্তের অভিশপ্ত অসুর সম্রাট হোক, দ্বৈপায়ণ হ্রদের গভীরে লুকিয়ে থাকা একজন পরাজিত কৌরব রাজপুত্র হোক কিংবা একজন বিশ্বাসঘাতক তান্ত্রিক যিনি তার পথ হারিয়েছেন–প্রতিবার, প্রতিটি মহাবিশ্বের প্রতিটি পৃথিবীতে এভাবেই মন্দের শেষ হয়।

সম্পূর্ণ একাকী অবস্থায়।

হরপ্পা, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
চন্দ্রধর

দৃশ্যটা একই সাথে অবিশ্বাস্য এবং বিস্ময়কর।

হরপ্পার হাজার হাজার পুরুষ, মহিলা এবং শিশু এখন মহানগরের অন্ধকার রাস্তায় ভিড় করেছে। কিছুক্ষণ পরপর কানে তালা লাগানো বজ্রপাতের কারণে নীল আলোয় আলোকিত হচ্ছে জায়গাটা। তারা নির্ভয়ে এই তীব্র ঝড় ও ঠান্ডা বৃষ্টি সহ্য করছে।

এরা সবাই একযোগে একজন ব্যক্তির উপর তাদের বিশ্বাস স্থাপন করেছে। পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করেছে বিভাসন পূজারির উপর। এমনকি তার মৃত্যুর উপরও। এখন তাদের সকলের অটল বিশ্বাস যে সত্যব্রত মানু যদি তার মহান পিতার চরিত্রের বিন্দুমাত্রও ধারণ করে থাকে, তবে সে-ই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

পরাক্রমশালী সরস্বতীর নির্দয় প্রলয় গ্রাস করার পরেও হরপ্পার সূর্য তার প্রজাকে ত্যাগ করেননি। তিনি তাদের হৃদয়ে, তাদের অনুশোচনায় এবং তাদের আশায় বেঁচে ছিলেন।

* * * * *

ধনী বণিক এবং পুরোহিতরা ঘোড়ায় আরোহণ করেছে। তাদের পরিবার ছাউনি দেওয়া ঘোড়ার গাড়িতে করে অনুসরণ করছে তাদের। আরো হাজার হাজার লোক তাড়াহুড়ো করে গুছিয়ে রাখা জিনিসপত্র এবং মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গরুর গাড়িতে চড়েছে। কিন্তু পায়ে হেঁটে চলছে এক বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী, যারা নিজেদের সামনে থাকা দুঃসাধ্য, কখনো শেষ না হওয়া যাত্রার সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ।

হরপ্পার সেনাবাহিনীর সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে এই মহান দেশত্যাগে সাধারণ লোকদের সাথে যোগ দিয়েছে। মেসোপটেমিয়ার অন্ধ জাদুকর এপ-শা-গান যে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে, হরপ্পার সেনাবাহিনীর উপর থেকে তার প্রভাব কেটে যাচ্ছে। তারা এখন অপরাধবোধে ব্যথিত, অশ্রুসিক্ত হয়ে সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করছে যখন হরপ্পার সূর্য তাদের হাত ধরে তলোয়ার চালানো শিখিয়েছিলেন। তাদের হাজার হাজার সৈন্য এখন স্নেহের সাথে স্মরণ করছে সেই দিনের কথা, যেদিন দেবতা তাদের দেখিয়েছিলেন কীভাবে একটা অশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এই জন্তুটির জন্য আজ তারা গর্বিত।

এই সৈন্যরা জানতো যে তারা এখন পরাজিত এবং নেতৃত্বহীন। হিংসাত্মক রাঙার শেষ পরিণতির গল্পটি এই গুরুত্বপূর্ণ রাতের কয়েক দিন আগে তাদের কানে পৌঁছেছে। তারা দেখতে পেয়েছে যে রক্তাক্ত লড়াইয়ের বিজয়ী বিনীতভাবে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা রক্তের বৃষ্টির কথাও শুনেছে যার অধীনে বিভাসন পূজারিকে উদ্ধার করা হয়েছে। তারা সূর্যের হাতে তাদের বাহিনীর আরেক সেনাপতির নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো না। পরাক্রমশালী দেবতা বিভাসন পূজারির জন্য তারা যা করতে পারেনি, তারা এখন তার বীর পুত্রের জন্য তাই করবে। আর তাই তারা সত্যব্রত মানুর আদেশ বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছে।

* * * * *

জ্ঞানী, সাহসী অথচ হতভাগ্য পণ্ডিত চন্দ্রধর তার বিশাল প্রাসাদে তার ব্যক্তিগত আবাসিক কক্ষের প্রবেশপথে বসেছিলেন। তিনি তার সমস্ত বীরত্ব আর সাহসকে তার আত্মা যে সমস্ত মহাজগতে বাস বা পরিদর্শন করেছে তার গভীরতম অবকাশ থেকে ডেকে আনার জন্য একটা ব্যক্তিগত যজ্ঞ করেন। তিনি তার প্রিয় লম্বা তলোয়ারটি বের করলেন যা তার সামনে একটা জ্বলন্ত স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এক হাতে আঁকড়ে ধরে আছে শক্তিশালী তলোয়ারের হাতল। অসিটার তীক্ষ্ণ অংশটি উজ্জ্বল মেঝেতে আঁচড় কাটছে।

যদি তার ভাগ্নে মানু তার পিতামাতা সানজানা এবং বিভাসনের অপমান, যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে আসতো, তবে তা করা তার জন্য ভুল কিছু হতো না।

কিন্তু তোমাকে সবার আগে আমার সম্মুখীন হতে হবে, ছেলে।

চন্দ্রধর নিজের জীবনের জন্য চিন্তিত ছিলেন না। যেদিন তিনি তার প্রিয় বন্ধু, পরামর্শদাতা এবং আর্যাবর্তের রক্ষক, বিভাসন পূজারির গণহত্যা এবং নির্যাতন নীরব দর্শকের মতো প্রত্যক্ষ করেছেন, সেদিন থেকেই তিনি মারা গেছেন। কিন্তু

প্রিয়ংবদার বিষাক্ত ষড়যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও, ক্ষমতার প্রতি তার অতৃপ্ত লালসা সত্ত্বেও, তার সেই ঘৃণা যা হরপ্পাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনেছে তা এবং তার নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও তার প্রিয়ংবদাকে রক্ষা করতে হবে। কারণ সে হলো তার জীবনের ভালোবাসা। সে হলো তার স্ত্রী। এতক্ষণে চন্দ্রধর ভালো করেই জেনে গেছেন যে প্রিয়ংবদার প্রতি তার অন্ধ ভালোবাসা তার মাথার রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা তাকে কারণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এটি তাকে বাস্তবতা এবং যুক্তির কাছে দৃষ্টিহীন করে তুলেছে। তাকে রূপান্তর করেছে দানবে।

এমনকি সমস্ত রক্তপাত এবং বিশ্বাসঘাতকতা, সমস্ত মৃত্যু এবং তার চারপাশে সমস্ত ধ্বংসের পরেও হরপ্পার প্রথম এবং শেষ রাজা তার চোখ খুলেননি।

তিনি কখনো খুলবেনও না।

আর এই কারণেই ইতিহাস তাকে চিরতরে নিজের পাতা থেকে মুছে দেবে।

ব্যারাকপুর (বাংলা), ১৮৫৬
আর্য আক্রমণ

প্রায় মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে।

অন্যান্য সময় সে ৯ টার মধ্যে চলে যায়, কিন্তু আজ এই ব্রিটিশ অফিসার এখনো নিজের বিশৃঙ্খল মেহগনি কাঠের তৈরি টেবিলে বসে আছে। তেলের লণ্ঠনের আবছা আলোয় সে পড়ছে, তার ঘরটা ঘন ঘন সিগারেট খাওয়ার কারণে ধোঁয়ায় ভরে গেছে।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। ওয়েন অ্যাশক্রফ ছিলো শক্তিশালী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন তরুণ অফিসার। এই কোম্পানি ছিলো একটা ভদ্র বাণিজ্য সংগঠন, যা মুঘল রাজদরবারে কর এবং আনুগত্য স্বীকার করতো। সেখান থেকে এটা মাত্র কয়েক শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে বিশাল এক সাম্রাজ্যবাদী পশুতে রূপান্তরিত হয়েছে, যা সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে। ১৭৯৯ সালের ৪ই মে মহীশূরের আপাতদৃষ্টিতে অজেয় বাঘ টিপু সুলতানের পরাজয় ও হত্যার সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। আর এই আধিপত্যের সাথে এলো ব্রিটিশদের অহংকার, যা পরবর্তী কয়েক দশক ধরে উপমহাদেশের ভয়ংকর ইতিহাস রচনা করেছে।

কোম্পানির প্রথম দিকের বছরগুলোতে যে ইংরেজ অফিসার, কেরানি এবং সৈন্যরা জাহাজে চড়ে বোম্বে ও কলকাতা বন্দরে এসে পৌঁছেছে, তারা হিন্দুস্তানের প্রেমে পড়ে গেছে। ভারতীয় পোশাক থেকে শুরু করে ভারতীয় স্ত্রী-ইংরেজরা আন্তরিকভাবে এই দেশকে আলিঙ্গন করেছিলো। কিন্তু তারপর পরিস্থিতি বদলে গেল।

কোম্পানির নতুন যেই অফিসাররা এলো, তারা ছিলো অহংকারী শাসক মেজাজের। স্থানীয় সবকিছুকেই তারা ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করলো।

ফলশ্রুতিতে, ভারতীয় সিপাহিদের মধ্যে ঘৃণা জন্মাতে থাকে। তারা নিজেদের মধ্যে নীরবে মাথা নাড়ায় এবং দৃষ্টিবিনিময় করে, যা আসন্ন বিদ্রোহের একটা আলামত ছিলো।

মানব জাতির উদ্দেশে ঘৃণা ও হত্যা করা নিয়ে করা একটা প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী আবারো সত্য হতে চলেছে।

রক্তনদীর অভিশাপ সত্যি হতে চলেছে।

* * * * *

বয়সের সাথে সাথে হলুদ হয়ে যাওয়া কাগজগুলোকে দেখার সময় কিছুক্ষণ পর পর সে তার পড়ার বৃত্তাকার চশমাটা পরিষ্কার করছে। ওয়েন অ্যাশক্রুক তার আশেপাশের বেশিরভাগ ব্রিটিশ অফিসারের থেকে আলাদা। ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং অতুলনীয় ঐতিহ্যের গভীরভাবে প্রশংসা করতো সে।

ম্যানচেস্টারে জন্মগ্রহণ করে লোকটা, এমন একটা পরিবারে বেড়ে ওঠে যেখানে বেঁচে থাকার জন্য বছরের পর বছর ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছে। ওয়েন তার শিক্ষা শেষ করতে এবং নামি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে তালিকাভুক্ত হতে কঠোর লড়াই করেছে।

স্কুলে তাকে ছাত্রদের দ্বারা হয়রানির শিকার হতে হয়, যারা মূলত ধনী টেক্সটাইল ব্যারনদের বিগড়ে যাওয়া সন্তান ছিলো। ফলে সে ভদ্রতাকে মূল্য দিতে শিখেছে। আর ম্যানচেস্টারের নব্য ধনীদের জটিল মানসিকতার সম্মুখীন হওয়ায় সে মানুষের সরলতাকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে।

আর তাদের এই ভদ্রতা এবং সরলতার কারণেই ভারতীয়রা এই তরুণ, সৎ অফিসারের মন জয় করেছে।

আর এটাই বিপদ ডেকে এনেছে তার নিজের জন্য।

* * * * *

'আমার...আমার এখনই কর্নেল স্যান্ডার্সের সাথে দেখা করতে হবে,' কর্নেল স্যান্ডার্সের ইংরেজি জানা ভারতীয় বাটলারকে বললো সে। বাটলার ব্যারাকপুর ছাউনি বা সেনানিবাসের কেন্দ্রস্থলে থাকা কর্নেল মার্ক স্যান্ডার্সের বিস্তীর্ণ বাংলোর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়েন সব কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে এসেছে। সে এই বিরল এবং রহস্যময় নথিগুলোর

একটা সেট প্রয়াগ বা এলাহাবাদের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আগ্রা এবং অওধের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) একজন পুরোনো হিন্দু পুরোহিতের কাছ থেকে পেয়েছে। পুরোহিত ওয়েনকে অবাক করে দিয়েছেন এটা বলে যে তিনি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওয়েনের জন্য অপেক্ষা করেছেন। ইংরেজ যখন উত্তর দিয়েছে যে সে চল্লিশ বছর আগে জন্মগ্রহণও করেনি, তখন রহস্যময় পুরোহিত ওয়েন সম্পর্কে তার জন্মস্থান, তার পিতামাতা এবং তার জীবনের ঘটনা সমস্ত কিছু বর্ণনা করে তাকে হতবাক করে দিয়েছেন।

'এই হিন্দুস্তান...এখান থেকেই সব সভ্যতা শুরু হয়েছে, ওয়েন সাহেব। এই পুঁথিগুলো নিয়ে যান। আর পারলে সত্যকে খুঁজে বের করুন।' এই বলে পুরোহিত তার হাতে এক বান্ডিল রুক্ষ পুরোনো কাগজ ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দিন থেকে যেই বিষয়টা তার রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে, তা হলো তাকে দেওয়া পুরোহিতের সতর্কবাণী।

'ওরা আপনার ক্ষতি করার আগে দুবার ভাববে না, সাহেব। অন্ধকার শক্তি থেকে সাবধান। অর্ডার থেকে সাবধান...'

ওয়েন কথাটা না ভেবে পারলো না।

পুরোহিত যদি আমার অতীতের সবকিছু দেখতে পান, তবে তিনি নিশ্চিত আমার ভবিষ্যৎও দেখতে পেয়েছেন। তিনি জানেন আমার সাথে কী হতে চলেছে।

কিন্তু ওয়েন পুঁথিগুলো থেকে যা আবিষ্কার করেছে, তা তার ভয়ের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলো।

* * * * *

'এটা অযৌক্তিক, ওয়েন!' কর্নেল স্যান্ডার্স রাগে তার স্টাডি রুমের টেবিলের উপর একটা ঘুসি মারলেন।

নিজেকে শান্ত করার জন্য কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তিনি বিশাল লণ্ঠন-জ্বালানো ঘরের এককোণে রাখা মোটা কাঠের ক্যাবিনেটের কাছে চলে গেলেন। এরপর একটা প্যানেল খুলে সেখান থেকে এক বোতল স্কচ হুইস্কি বের করলেন। কোনো কথা না বলে দুটি কাচের গ্লাসে দুটো ডাবল ড্রিংক তৈরি করলেন তিনি। এরপর ওয়েনের দিকে ফিরলেন এবং দুঃশ্চিন্তায় ঘামতে থাকা তরুণ অফিসারের হাতে একটা গ্লাস দিলেন। স্যান্ডার্স নিজের ডেস্কে গিয়ে বসলেন। এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে ধূমপান করার পাইপ জ্বালালেন। এরপর ওয়েনকে ইশারা করে ডেস্কের সামনের চেয়ারে বসতে বললেন।

'দেখো, ওয়েন, আমি তোমাকে এই অ্যাসাইনমেন্টের জন্য বেছে নিয়েছি। আমি বলছি না যে তুমি একজন ভালো নৃবিজ্ঞানী কিংবা ইতিহাসবিদও নও। সত্যি বলতে, এসব দিকে তুমি খুবই ভালো। কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্টের সংবেদনশীলতার কারণে আমি তোমাকে সরাসরি আমার নিজের অধীনে নিয়ে এসেছি। আমি সব সময় জানতাম আমি তোমার উপর নির্ভর করতে পারি।'

'জি, স্যার...' ওয়েন তার গ্লাস থেকে সোনালি তরল পান করলো। তার অস্থির স্নায়ুকে শান্ত করা প্রয়োজন।

'তো তুমি বলছো যে এই প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিগুলো অধ্যয়ন করেছ এবং আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে আসেনি। আর তুমি দাবি করছো যে এই পুঁথিগুলো বৃহত্তর কোনো পরিকল্পনার জন্য হুমকিস্বরূপ,' স্যান্ডার্স বললেন, তিনি একঝলক হাসির আড়ালে নিজের ভয় এবং নিষ্ঠুরতা লুকানোর চেষ্টা করলেন।

'কর্নেল স্যান্ডার্স, স্যার, আপনি যদি আমাকে ব্যাখ্যা করার অনুমতি দেন তো ভালি। ১৮৪২ সালে চার্লস ম্যাসন যে ধ্বংসাবশেষগুলো আবিষ্কার করেন, সেগুলো কোনো সাধারণ বসতি ছিলো না। এই মধ্যযুগীয় কাগজপত্রগুলো থেকে এটা নিশ্চিত যে এই পুঁথিগুলো প্রাচীন কোনো পুঁথি থেকে যত্নসহকারে প্রতিলিপি তৈরি করা হয়েছে। বলা হয় যে আসল পাণ্ডুলিপিটি আর কেউ নয়, স্বয়ং সত্যব্রত মানু নামের একজন মহান ঋষি-রাজ লিখেছেন।'

* * * * *

স্যান্ডার্স টেবিলের নিচে টেপ দিয়ে আটকে রাখা রিভলবারটি শক্ত করে ধরলেন। এরপর আবার ছেড়ে দিলেন।

আমি নিজে এটা করতে পারবো না। অন্তত এখানে না। এই সেনানিবাসের মাঝখানে তো কোনোভাবেই না।

ওয়েনের মোটেও ধারণা ছিলো না সে মৃত্যুর কতটা কাছে চলে এসেছে। একজন সত্যিকারের পণ্ডিত ব্যক্তির মতো সে সবকিছু ব্যাখ্যা করে গেল।

'আমি গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিতের সাথে কথা বলেছি, স্যার। তারা সবাই বলেছে এই সত্যব্রত মানু কোনো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি মহাপ্লাবনের সময় সমস্ত সৃষ্টির ত্রাণকর্তা ছিলেন। এই মহাপ্রলয়কে স্থানীয়রা প্রলয় বলে। মানু হিন্দুদের কাছে খ্রিষ্টানদের নোয়াহ-এর মতো, কর্নেল। প্রকৃতপক্ষে, কিছু ব্যুৎপত্তিবিদ মনে করেন যে নোয়াহ মোটেও একজন ব্যক্তির নাম নয়। এটি স্থানীয় শব্দ নৌকা বা নাইয়া বা নাভ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ মূলত একটা জাহাজ।'

পুরো রুমে পিনপতন নীরবতা। মানব জাতির ইতিহাস নিয়ে নিজের এক বিরাট ও যুগান্তকারী আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকায় কর্নেল স্যান্ডার্সের মুখের শীতল বিকৃতি তার চোখে পড়লো না।

'স্যার, এই ধ্বংসাবশেষগুলো প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সভ্যতার। সরস্বতী সভ্যতার, স্যার! ভারত হচ্ছে মানব জাতির উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু। এটি পৃথিবীর যেকোনো দেশ বা অঞ্চলের চেয়ে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যসম্পন্ন ভূমি। আমাদের অবশ্যই এই মহিমান্বিত সত্যকে সামনে আনতে হবে, স্যার।'

সেই বৃদ্ধ, কুঁচকানো চামড়ার পুরোহিত ঠিক বলেছেন।

অর্ডার ওয়েনের কথা শুনছে।

* * * * *

সে কলকাতা ট্রিবিউনের সম্পাদককে ধন্যবাদ জানিয়ে এই প্রসিদ্ধ দৈনিকের অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

কোলাহলপূর্ণ, জনাকীর্ণ রাস্তা এবং স্ট্রিট ফুডের স্টল পেরিয়ে কলকাতার শান্ত গলির দিকে যাওয়ার সময় ওয়েনকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। কর্নেল স্যান্ডার্স যেভাবে অস্ত্রের মুখে তার কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন তাতে সে গভীরভাবে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে এমন আচরণ সে কখনো কল্পনাও করেনি। তবে স্যান্ডার্সের সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগে সে মধ্যযুগীয় পুঁথিগুলোর কপি তৈরি করে রেখেছে বলে এখন খুশিই হয়েছে।

চিন্তায় মগ্ন ছিলো সে, এমন সময় সন্ধ্যার ম্লান আলোয় একটা কণ্ঠ ডেকে উঠলো।

'ক্যাপ্টেন ওয়েন অ্যাশব্রুক?'

'হ্যাঁ...' তাকে কে ডাকছে তা দেখার জন্য ঘুরতে গিয়ে বললো ওয়েন।

* * * * *

পরের দিন সকালে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সচিবালয়ের বাইরে একটা গাছে ওয়েনের বিকৃত লাশ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। সংবাদপত্রগুলো এটিকে দুই ভারতীয় সিপাহি দ্বারা সহিংসতার কাজ বলে ঘোষণা করে। কিন্তু সত্য ছিলো অন্য কিছু। ভয়ংকর কিছু।

ভবিষ্যদ্বাণীকৃত রক্ততৃষ্ণা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চলেছে।

বানারস, ২০১৭
রাক্ষস-বলি

ত্রিজাতের একজন অনুসারীর ফেলে রাখা একটা তলোয়ার উঠালো বিদ্যুৎ, এরপর মহান মঠাধীশকে যে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে সেগুলো কেটে ফেললো। এরপর সে বলভান্তকে মুক্ত করার পর তার প্রপিতামহের কাছে ফিরে এসে তাকে মাটি থেকে তুলে জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে।

'আমি দুঃখিত যে আমি এত সময় নিয়েছি, বাবা। আমি দুঃখিত আমি নিজেকে পেছন থেকে আঘাত করতে দিয়েছি...'

দ্বারকা শাস্ত্রী তখনো একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। মাত্র এক মিনিট আগেও তিনি একটা ধারালো তলোয়ারের মুখে ছিলেন, খুব কাছাকাছি ছিলেন একটা নির্মম, বেদনাদায়ক মৃত্যুর। তারপর চোখের পলকে তিনি তার দুর্দান্ত প্রপৌত্রের পতন এবং ফিনিক্স পাখির মতো উত্থানের সাক্ষী হলেন। তবে তিনি নিজের প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি মুহূর্ত গণনা করেছেন। তার নিজের শেষ সময়ের মুহূর্তগুলো। কিন্তু এই সময় এসে আবার চলেও গেছে! তার কুণ্ডলী স্পষ্টভাবে দ্বারকা শাস্ত্রীর মৃত্যুর জন্য এই নির্দিষ্ট সময়টিকে চিহ্নিত করেছে। পুরো ব্যাপারটা তার কুণ্ডলীতে থাকা মার্কেশের সর্বোচ্চ স্তবকের সাথে একটা প্রহেলিকা সৃষ্টি করছে। মার্কেশের অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর অনিবার্য সময়।

কিন্তু এখনো তিনি বেঁচে আছেন। মহান দ্বারকা শাস্ত্রী সুস্থ এবং বলিষ্ঠ আছেন, যখন তার আত্মিক জগতের রাজ্যে প্রস্থান করার কথা ছিলো।

কিছু একটা তার ভাগ্য পরিবর্তন করেছে।

কিছু একটা...কিংবা কেউ।

* * * * *

বিদ্যুৎ সমুকে ইশারা করে সাইকোপ্যাথ অধ্যাপক ত্রিপাঠি বা ব্রহ্মানন্দকে বন্দি করতে বললো। ত্রিজাত কাপালিকের সাথেও একই কাজ করার জন্য বলভাদ্রের দিকে মাথা নাড়লো। এরপর সে তার বাবার দিকে মনোযোগ দিলো।

কিন্তু যে ব্যাপারটা লক্ষ করলো তা হলো বলভাদ্রের রক্তমাখা চোখের বর্বর ক্রোধ।

দ্বারকা শাস্ত্রী নিজের চোখের পানি আটকে রাখতে পারলেন না, অঝোরে কেঁদে ফেললেন। বিদ্যুৎও কেঁদে ফেললো এবং তার লম্বা পরদাদার শক্তিশালী কাঁধে মাথা রাখলো। তাদেরকে আজ শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবতা বুঝতে পারলো যে তার বাবা এখন অসহায়ভাবে কাঁদছেন। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। কারণ তারা যে মানসিক আঘাতের মধ্য দিয়ে গেছে, তারপরেও দ্বারকা শাস্ত্রী এভাবে ভেঙে পড়ার মতো লোক নন। বিদ্যুৎ মাথা তুলে মঠাধীশের মুখের দিকে তাকালো। সে এখনো তার বাবার বাহু ধরে আছে।

'কী হয়েছে, বাবা?' সে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো।

দ্বারকা শাস্ত্রী আর্দ্র চোখে উপরে তাকালেন, হাত রাখলেন তার প্রপৌত্রের গায়ে।

'তুমি আসলেই একজন দেবতা, বিদ্যুৎ!' তিনি জবাব দিলেন। 'তুমি একজন সত্যিকারের দেবতা।'

বিদ্যুৎ ক্লান্ত হাসি দিলো। 'অবশ্যই না, বাবা। আমি জানি যে আমি গত কয়েক দিনে "আমি অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ঈশ্বর" কথাটা দুবার ব্যবহার করেছি, কিন্তু সেটা আসলে লড়াইয়ের উত্তেজনায়। আমি বলে বোঝাতে পারবো না...কিন্তু এটা আমাকে আরো শক্তিশালী, আরো দারুণ অনুভব করিয়েছে। যেন এই শব্দগুলো আমি আগেও বলেছি...' বিদ্যুৎ বললো, অতীতে কোথায় কখন সে এই ভূতুড়ে, বহুবর্ষজীবী কথাগুলো বলেছে তা মনে করার চেষ্টায় একটু হারিয়ে গেল।

রক্তক্ষরণ, নির্যাতনের আখড়ায় পরিণত এক মহান স্নানে সে এই কথাগুলো বলেছিলো। বলেছিলো খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দে। প্রাচীন মহানগর হরপ্পার শেষ সময়ে। কিন্তু বিদ্যুৎ হিসেবে নয়।

'শোন, মৃতের দল। শোন, পচে যাওয়া মৃত আত্মার দল। শোন, বোকারা। আমি অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ঈশ্বর!'

* * * * *

'আমার এমন কোনো মোহ নেই, বাবা। আমি দেবতা নই, অর্ধ-ঈশ্বরও নই। আমি শুধু তোমার বিদ্যুৎ। শুধু একজন মানুষ।'

মাথা নাড়লেন মঠাধীশ, একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথা বললেন। তবে এবার তিনি বিদ্যুৎকে হতবাক করে দিয়ে কাঁপতে থাকা হাতদুটো তার নিজের প্রপৌত্রের প্রতি শ্রদ্ধায় ভাঁজ করলেন।

'শুধু একজন সত্যিকারের দেবতাই কালচক্র, অর্থাৎ সময়ের অবিরাম চাকাকে পরাভূত করতে পারে। আমার মৃত্যু লেখা ছিলো, বিদ্যুৎ। এই মহাবিশ্বের কোনো কিছুই একে পরিবর্তন করতে পারেনি। আমার সময় এসে গেছে। কিন্তু সেই সময় এসে আবার চলেও গেছে!'

বিদ্যুৎ সেখানে দাঁড়িয়ে শুনছে, কিন্তু তার প্রপিতামহ কী বলছে তা সে বুঝতে পারছে না।

'দেখছো না, বিদ্যুৎ? তোমার উপস্থিতি সবকিছু বদলে দিয়েছে। তোমারই ইচ্ছাশক্তি স্থান-কাল পরিবর্তন করে দিয়েছে। এই অন্ধকার গুহার বাইরে তুমি আমাকে বলেছিলে যে তুমি আমার জন্য ফিরে আসবে। মহাবিশ্ব শুনেছে, বিদ্যুৎ। তোমার কথা মান্যও করেছে।'

* * * * *

এই উদ্ধত তত্ত্ব বিশ্বাস করার মতো মনের অবস্থা বিদ্যুতের ছিলো না, যদিও এটা তার প্রিয় একজন ব্যক্তি বলেছেন।

'আমাদের এখন এখান থেকে চলে যেতে হবে, বাবা। আমরা ফিরে গিয়ে নাহয় এই বিষয়ে আলোচনা...'

বিদ্যুৎ তার বাক্য শেষ করার আগেই ভূগর্ভস্থ গুহায় একটা বিকট চিৎকার ভেসে উঠলো।

'বিদ্যুৎ দাদাআআ...!'

বিদ্যুৎ ঘুরে দেখলো সনু চিৎকার করছে। হতভম্ব হয়ে মশান-রাজের যজ্ঞের পিটের দিকে ইঙ্গিত করছে যুবক।

সনু যেদিকে ইশারা করছে, সেদিকে তাকাতেই দেবতা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো।

* * * * *

'না, বলভান্ত দাদা...থামো!' চিৎকার করে উঠলো বিদ্যুৎ, সে তার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু মনে হচ্ছে তার সামনে হাজার মাইলের রাস্তা। দেব-রাক্ষস মঠের যুদ্ধপ্রধান বলভান্ত ত্রিজাত কাপালিককে তার যজ্ঞের পিট, যেটা মূলত ভয়ংকর রক্তবীজ অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করা হয়েছে, তার সীমানায় চেপে ধরলো। বলভান্তের শক্তিশালী পা ছিলো ত্রিজাতের বুকে, পতিত অঘোরীর মাথা জ্বলন্ত কয়লা ও মাংসের ঠিক উপরে ঝুলছে।

বলভান্তের কাছে ক্ষমার জন্য অনুনয় করছে মহাতান্ত্রিক।

* * * * *

বিদ্যুৎ জানতো সে বলভান্তের কুঠার পড়ে যাওয়ার চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারবে না।

'ও আমাদের মঠকে কলুষিত করেছে, বিদ্যুৎ! ও তোমাকে, ভবিষ্যদ্বাণীকৃত ত্রাণকর্তাকে, হত্যা করার চেষ্টা করেছে! প্রথমে আমাদের এবং তারপরে আমাদের মঠাধীশের গলায় ছুরি ধরার সাহস করেছে!' বলভান্ত চিৎকার করে বলছে। এরপর সে মৃত্যুর দেবতা মহাকালের কাছে একটা প্রার্থনা করে জ্বলন্ত কুঠার তুললো।

স্তব্ধ মশান-রাজের চওড়া চোখের দিকে তাকালো বলভান্ত। চিৎকার করে কিছু শব্দ বললো। এগুলো ত্রিজাত নিজে কিছুক্ষণ আগে ঘোষণা করেছে, কিন্তু তার থেকে একটু আলাদা।

'আজ এই যজ্ঞের অগ্নিতে একটা রাক্ষস বলি দেওয়া হবে!'

হরপ্পা, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

‘আরো এক দিন বাঁচতে চাইলে আমার সাথে আসুন, হে মহেঞ্জোদারোর রাজকুমারী!’

‘তুমি কোথায় যাচ্ছো, মানু?’ তারা চেঁচিয়ে উঠলো। কারণ মানু তার ঘোড়াটিকে হরপ্পার নতুন রাজার দুর্গের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

‘আমাকে ওদের বাঁচাতে হবে, তারা। আমাকে পণ্ডিত চন্দ্রধর ও প্রিয়ংবদাকে বাঁচাতে হবে। তারা আমার পরিবার এবং আমার প্রতি কী করেছে তা এখন আর বিবেচ্য নয়। আমি মৎস্যের চোখে দেখেছি। যেহেতু আমরা এই মহাপ্লাবনকে প্রতিহত করছি, প্রতিটি আত্মার পুনরুত্থিত হওয়ার অধিকার আছে। শেষ পর্যন্ত প্রলয় যে পদ্ধতি বেছে নেবে, সে পদ্ধতিতেই সবাইকে পরিশুদ্ধ করবে।’

‘কিন্তু বন্যার তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে, সত্যব্রত! দৈত্যাকার ঢেউগুলো শহরকে গ্রাস করার আগে তুমি ফিরে আসার সময় না-ও পেতে পারো!’ তারা মানুকে আটকে রাখার নিরর্থক প্রচেষ্টায় চিৎকার করে বললো।

সূর্যপুত্র আবার ঘুরে দাঁড়ালো, ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরে গেল তার ঘোড়াটাও। এই উত্তাল রাতেও মানুর মুখে একটা মিষ্টি, প্রেমময় হাসি লেগে আছে।

‘কেন জানি না; তবে তুমি যখন আমাকে সত্যব্রত বলে ডাকো, তখন আমার ভালো লাগে।’

তারার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

ঝড়ের রাতে যাত্রা করার আগে মানু তাকে কেবল এ কথাটাই বলেছে এবং একটা প্রেমময় চাহনি দিয়েছে। তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুদিন আগেও মানু প্রতিশোধের আগুনে জ্বলেছে। আর এখন, সে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের দিকে ছুটে যাচ্ছে তাদের দুজনকে বাঁচাতে যারা একসাথে তার পৃথিবী ধ্বংস করে দিয়েছে।

এই গভীর পরিবর্তন নিয়ে এলো কীসে?

মুহূর্তেই নিজের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল তারা। হাসলো একটু।

মৎস্য।

* * * * *

সে বুঝতে পেরেছিলো যে এটাই হরপ্পার শেষ রাত।

এই অশুভ রাতের ভয়াবহতায় নিজের একাকী ঘোড়াটিকে প্রাসাদে, মানে তার বাড়ির দিকে দৌড়ে আসতে দেখলো। মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলো সে। যদিও জানতো যে তার স্বামী চন্দ্রধর নিজেই একজন দক্ষ যোদ্ধা, কিন্তু প্রতিশোধের সমস্ত গ্রাসকারী রিপু মানুকে তার চেয়ে দ্বিগুণ বড় যোদ্ধা করে তুলেছে।

এখন মনে হচ্ছে সেই রক্ত নিশ্চিত তার নিজের বাড়িতেই ঝরে পড়বে। কিন্তু দেখার বিষয় হলো, এটা বিভাসন পূজারির ছেলের নাকি তার নিজের স্বামীর রক্ত হতে চলেছে।

মানু তার ঘোড়ায় চড়ে সোজা রাজার প্রাসাদের কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারে চলে গেল, চকচকে পাথরের মেঝের উপর ঘামঝরানো এই জন্তুর খুর প্রাসাদের সুউচ্চ হলের মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত ও গর্জন করছে। যখন সে নিচের তলা খালি দেখতে পেল, তখন মানু তার ঘোড়ায় চড়ে বিশাল সিঁড়ি বেয়ে সরাসরি উপরের তলায় উঠে গেল।

মানু যে রাজার বিলাসবহুল বাসভবনে ঘোড়ায় চড়ে উঠছে সেটা আগ্রাসন বা অসম্মান দেখানোর জন্য নয়।

এটা করা জরুরি ছিলো।

কারণ প্রলয় আসছে।

* * * * *

হরপ্পার জ্ঞানী রাজা মানুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজের ভারী তলোয়ারটা টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় এর ভয়ংকর ডগা পালিশ করা মেঝেতে আঁচড় দিয়ে স্ফুলিঙ্গ তৈরি করলো। তিনি ভেবেছিলেন এটা তার জীবনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হতে চলেছে।

কিন্তু তিনি ভুল ছিলেন।

মানু তার একসময়ের প্রিয় মামাকে উঁচু তলার হলওয়েতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘোড়া থেকে নামলো। বিশাল কক্ষটি মশালের আলোয় আলোকিত। বড় জানালার সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ পর্দাগুলো হাওয়ার কারণে নড়ছে হিংস্রভাবে। পুরো ভবন জুড়ে ঝড়ো হাওয়া বইছে।

মানু হাতজোড় করে তার মামাকে প্রণাম করলো। তার সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও তার তরুণ হৃদয় আগুনে জ্বলছে। এক মুহূর্তের জন্য তার ইচ্ছা হলো তরবারি বের করে পিতামাতার প্রতিশোধ নেয়। তার মৃত মা এবং নির্যাতিত

পিতার দৃশ্য তাকে তাড়িত করছে। কিন্তু তারপরেও কোনো না কোনোভাবে মৎস্যের হাসিমাখা মুখটি তার চোখে ভাসতে লাগলো, ধীরে ধীরে তাকে পরিণত করলো সেই মহিমান্বিত মানুষে, যা তার ভাগ্য ছিলো।

'তুমি জয়ী হও, মানু,' চন্দ্রধর বললেন।

পন্ডিত চন্দ্রধরের মতো মহিমান্বিত একজন মানুষই তার প্রতিপক্ষকে বিজয়ের আশীর্বাদ করতে পারে। তিনি তার প্রিয় বোন সানজানাকে ভোলেননি। তার অনুশোচনা শক্তিশালী হিমালয়ের অন্ধকার ফাটলের চেয়েও গভীর। তার আত্মা তার প্রয়াত বন্ধুর জন্য এখনো কাঁদে। একা থাকলে অনেক আগেই তিনি এই নশ্বর দেহ বিসর্জন দিতেন। তবে তিনি একা ছিলেন না। কারণ তার সাথে ছিলো প্রিয়ংবদা।

* * * * *

যখন তারা দুইজন মুখোমুখি দাঁড়ালো, অসাধারণ সুন্দরী প্রিয়ংবদা কোথাও থেকে আবির্ভূত হলো। হলওয়েতে এলো নিঃশব্দে, খালি পায়ে। তার লম্বা সাদা জামাটা মেঘের মতো ফ্লোরের উপর দিয়ে তার পিছুপিছু ভেসে আসছে। সুন্দর চুলগুলো খোলা, চোখের কাজল অশ্রুতে মিশে ফর্সা গালে লেপটে আছে। তার চেহারায় আছে এক ভূতুড়ে ভাব, কিন্তু এখনো তাকে অসম্ভব সুন্দরী দেখাচ্ছে।

এই মহিলাকে দেখার সাথে সাথে মানু তার মুষ্টি বদ্ধ করে এবং দাঁতে দাঁত চেপে রাগ প্রশমন করলো। সে ভালো করেই জানে এই ষড়যন্ত্রে চন্দ্রধর দাবার ঘরের একজন সাধারণ সিপাহির মতো; একজন আবেগী স্বামী। মূলত যে অশুভ শক্তি শুধু তার পরিবার নয়, পুরো আর্যাবর্তকে ধ্বংস করেছে, তা এই হতভাগ্য মহিলার হৃদয়ে বিষধর সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে।

কিন্তু সে আবার নিজেকে মনে করিয়ে দিলো কেন সে এখানে এসেছে। আর তাই প্রিয়ংবদার দিকে দৃঢ়ভাবে তাকিয়ে জোরে বলে উঠলো, 'আরো এক দিন বাঁচতে চাইলে আমার সাথে আসুন, হে মহেঞ্জোদারোর রাজকুমারী।'

আলিবাগ, মুম্বাই উপকূল, ২০১৭
অপরাধ ও রক্তের সাম্রাজ্য

আসলাম বাইকার ঘামছে।

সে ঐ ব্যক্তির আগমনের অপেক্ষায় আছে যার কণ্ঠস্বর বছরের পর বছর ধরে শুনে এসেছে–সেই অকল্পনীয় শক্তিশালী, বিপজ্জনক ব্যক্তি যিনি টেলিফোন লাইনের অপর প্রান্ত থেকে কেবল তার হিসহিস শব্দ ও রাজতন্ত্রীয় বক্তৃতা দিয়ে আসলামের রক্তকে হিম করে ফেলেন।

আর আসলামের রক্ত যে প্রতিদিন ভয়ে জমে যায় তা নয়। তাকে মুম্বাইয়ের সবচেয়ে সাহসী এবং ভয়ংকর আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনদের একজন হিসেবে গোনা হয়।

* * * * *

তার আসল নাম ছিলো আসলাম রাজী। কিন্তু কোলাবার পথশিশু থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সবাই তাকে আসলাম বাইকার নামে চেনে। সে যখন ছোটখাটো অপরাধের মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করে, তখন তার বস্তিতে দুজন আসলাম ছিলো। আসলাম রাজীর বাবা ছিলেন একজন সৎ টেক্সটাইল মিলের কর্মী, যিনি টাকা সঞ্চয় করে একটা ঝকঝকে নতুন ১০০ সিসি মোটরসাইকেল কেনেন। বৃদ্ধ যা জানতেন না তা হলো, প্রতিরাতে তার অপরাধী ছেলে এই বাইক নিয়ে বের হতো এবং সুপারি বা চুক্তি করে খুন করার পর এই বাইক সে পালানোর জন্য ব্যবহার করতো।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তার কিংবদন্তি ছড়িয়ে পড়ে। এই বাইক তার এমন একটা পরিচয় হয়ে ওঠে যা তাকে অন্য সবার থেকে এবং বস্তির নিরীহ আসলাম থেকে আলাদা করে ফেলে।

কয়েক বছরের মধ্যে সবাই তার রাজী পদবি ভুলে যায়। ডালবারের সার্কেল থেকে শুরু করে পুলিশের রেকর্ড পর্যন্ত সে শুধু একটা নামেই পরিচিত হয়।

আসলাম বাইকার।

বিলাসবহুল সিকরস্কি এস-৭৬সি হেলিকপ্টার, যা সাধারণত ব্ল্যাক হক নামে পরিচিত, ধীরে ধীরে আসলামের বিশাল বিচ হাউসের সবুজ মাঠে নামলো। হেলিকপ্টারের প্রধান যাত্রী যে ছিলো, সে-ই মুম্বাইয়ের বিভিন্ন গ্যাংয়ের মধ্যকার নৃশংস যুদ্ধের মাঝে বছরের পর বছর ধরে আসলামকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আসলামের জন্য জুরিখে ব্যাংকের দরজা খুলে দিয়েছে। সে-ই আসলামের 'পান্টারদের' ব্যবহার করার জন্য অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র সরবরাহ করে। তার একটা ফোন কলই আসলামের কাছ থেকে এখানকার বিচার ব্যবস্থাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। চকচকে রুপালি হেলিকপ্টারের দরজা খোলার সাথে সাথে আসলাম এবং তার লোকেরা লক্ষ করলো যে এই ধাতব পাখিটি দেখতে বিলাসবহুল উড়ন্ত যন্ত্রের মতো হলেও এটি সামরিক গ্রেডের। এই হেলিকপ্টার বহরের মালিক তার নিজের নিরাপত্তাকে খুব গুরুত্বের সাথে নিয়েছে।

তাদের সবার দৃষ্টি ব্ল্যাক হকের ভেতরের চকচকে কাঠ ও বাদামি লেদারের দিকে নিবদ্ধ ছিলো, আর ঠিক তখনই ওরা তাকে দেখতে পেল। সে এমন একটা মানব দেয়ালের মাঝে ছিলো যে কেউ তাকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভেবে ভুল করবে।

স্বর্ণকেশী, সুদর্শন লোকটি যখন মুম্বাইয়ের ডনের দিকে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো, ভয়ে ঢোক গিললো আসলাম। ও আসলে এই স্বর্ণকেশী লোকের বিরাট অপরাধ ও রক্তের সাম্রাজ্যের একজন সাধারণ সৈনিক মাত্র।

* * * * *

সে যখন সিকরস্কি এস-৭৬সি-এর ইস্পাত ও মেহগনির তৈরি সিঁড়ি দিয়ে নামছিলো, তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো প্রাকৃতিক শক্তিধর কেউ। তার চেহারা এতটাই সুন্দর যে চেহারায় কিছুটা মেয়েলি ভাব আছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘের এই অবিসংবাদিত রাজার শারীরিক গঠন অ্যাথলেটদের মতো পেটানো। তার চুলগুলো কপালের উপর থেকে পেছনের দিকে আঁচড়ানো এবং মেবাচ দ্য ডিপ্লোম্যাট ১ সানগ্লাস পরা অবস্থায় তার চেহারা অসাধারণভাবে উজ্জ্বল,

বালকসুলভ দেখাচ্ছে। কিন্তু যখন তার বেল্টের নিচে থাকা কাস্টম কোল্ট পাইথন রিভলভারের হাতির দাঁতের হাতলটি দেখা যায়, তখন আর তার চেহারা বালকসুলভ লাগে না।

সে যখন টারমাকে পা রাখলো, তার কালো জ্যাকেট সমুদ্রের বাতাসে উড়তে লাগলো। নিজেই নিজেকে সাহস জোগালো আসলাম বাইকার, তারপর সিদ্ধান্ত নিলো নিজের ইতালিয়ান প্রভুকে অভিবাদন জানানোর। সে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে স্বর্ণকেশী ডনের একজন লোক তার বাম হাত প্রসারিত করে মুম্বাইয়ের গ্যাংস্টারকে পেছনে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিলো। লোকটির ডান হাতে একটা সেমি-অটোম্যাটিক ম্যাক-১০ মেশিনগান।

শক্তিশালী অতিথি তার প্রতি কিছুটা সদয় হলো এবং তাকে আসতে দেওয়ার জন্য দেহরক্ষীর উদ্দেশে মাথা নাড়লো।

আসলাম বাইকার এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার হৃদয় হিম হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তার মেবাচ চশমা খুলে ফেললো ডন। তার গভীর সবুজ চোখ আসলামের আত্মার গভীরে ভেদ করে গেল, তাকে মনে করিয়ে দিলো প্রকৃত ভয়ের অর্থ কী।

সে শুধু কয়েকটা শব্দ মুখ দিয়ে বের করতে পারলো...

'মুম্বাইয়ে স্বাগত, মাশ্চেরা।'

হরপ্পা, খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
কর্মফলের দায়

'তোমার তরবারি ওঠাও, বৎস,' চন্দ্রধর বললেন। 'প্রতিশোধের তীব্র তৃষ্ণা নিবারণের অধিকার তোমার রয়েছে। এদিকে আমার একমাত্র ভালোবাসার মানুষটিকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। সম্মানিত পুরুষ হিসেবে আমাদের যা করা উচিত আমরা দুজনেই তাই করছি।'

প্রিয়ংবদা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে দুই তেজস্বী পুরুষের কথা শুনছিলো। তার নিঃশ্বাস ভারী ও পরিশ্রান্ত, যেন এই নিঃশ্বাস তার ভারাক্রান্ত বিবেকের বিশাল ভার বহন করছে।

'আমি এখানে প্রতিশোধ নিতে আসিনি, পণ্ডিত চন্দ্রধর। আপনি হয়তো লক্ষ করেছেন, আমরা এখন একটা ভয়ংকর প্রলয়ের মুখোমুখি। শহর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের এখন আমার সাথে আসতে হবে।'

বিশাল হলটি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইলো কারণ ঝড়ো হাওয়া এসে প্রিয়ংবদার চুলকে তার সুন্দর চেহারার উপর এনে ফেলেছে। পুরো ঘরটিকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য সাদা করে ফেলেছে বজ্রপাতের আলো। চন্দ্রধর এইমাত্র যা শুনলেন তা বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি তার উদ্বিগ্ন স্ত্রীর দিকে তাকানোর আগে কিছুক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার মুখে স্বস্তির ছাপ স্পষ্ট।

* * * * *

'কিন্তু কেন, মানু? তুমি যখন কথা বলছিলে তখন আমি শহরের দেয়ালের পাশ থেকে তোমার কথা শুনেছি। মানুষ তোমাকে অনুসরণ করছে! সেনাবাহিনী তোমাকে অনুসরণ করছে! আর তারা কোনো ভুলও করছে না। কিন্তু আমরাই কেন? কেন তুমি এখানে আমাদের দুজনকে বাঁচাতে এসেছ...আমরা দুজন, যারা

তোমার সব কিছু কেড়ে নিয়েছি!' চিৎকার করে উঠলেন চন্দ্রধর, তার চোখ ছলছল করছে, গলা ধরে আসছে।

মানুর অনেক কিছুই বলার ছিলো। অনেক কিছু তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু এখন সেসবের সময় নয়। তার মন যা বলছে সে শুধু সেই অনুযায়ী কাজ করছে। সে হৃদয়ে যা অনুভব করছে তাই তার আসল পরিচয়।

'আমি এটা করছি কারণ আমি হরপ্পার মহিমান্বিত সূর্য মহান বিভাসন পূজারি পুত্র।' মানু কথা শেষ করার আগে নিজের ধরে আসা গলার উপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য থামলো। 'আর আমি জানি তিনিও এটাই করতেন।'

* * * * *

পণ্ডিত চন্দ্রধর হাঁটু গেড়ে বসে অস্বস্তিতে কাঁদতে লাগলেন। তিনি চেয়েছিলেন মানু তাকে আক্রমণ করুক। তিনি চেয়েছিলেন এই যুবক যেন তার প্রতিশোধ নেয়। তিনি নিজেকে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু এই বলিষ্ঠ যুবকের এই মহত্বের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না চন্দ্রধর। মানুর তীরের ফলাও পণ্ডিত চন্দ্রধরকে এতটা কষ্ট দিতো না যতটা তার ক্ষমা ও উদারতা দিচ্ছে।

উন্মাদনার এক মুহূর্তে হরপ্পার শেষ রাজা তার তলোয়ার তুলে নিয়ে মানুর কাছে ছুটে গেলেন, তারপর লড়াইয়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালেন।

'তোমার তলোয়ার তুলে আমার সাথে যুদ্ধ করো, যুবক!' তিনি মানুকে চিৎকার করে বললেন। 'আমি জানি এই জন্যই তুমি এখানে এসেছ। তোমার তলোয়ার ওঠাও। আমাকে দেখাও তুমি কী দিয়ে তৈরি। পণ্ডিত চন্দ্রধরকে কোনো রাঙা মনে কোরো না, যাকে তুমি অনায়াসে পরাজিত করবে। কেউ আমাকে মারতে পারবে না, ছেলে! একমাত্র মানুষ বা দেবতা যে পারতেন...তিনি আর হরপ্পায় নেই। তাই বলছি, আমার সাথে লড়াই করো।'

মানু নড়লো না। এই প্রথমবারের মতো তার সামনের হতভাগ্য লোকটির জন্য তার করুণা হলো।

তারপরে সে প্রিয়ংবদাকে লক্ষ করলো। তার অভিব্যক্তি পরিবর্তিত হয়েছে, নরম হয়েছে। সে কাঁদছিলো। তার মুখে ভালোবাসা এবং অনুতাপের কথা লেখা আছে। কী এক দৃশ্য! প্রতিশোধের আর প্রয়োজনই ছিলো না। চন্দ্রধর এবং তার হতভাগ্য স্ত্রী প্রিয়ংবদা ইতোমধ্যেই যন্ত্রণার চুল্লিতে জ্বলছে, তলোয়ার, বর্শা বা তীর দিয়ে যতটা কষ্ট পেত তার থেকেও অনেক বেশি যন্ত্রণায় ভুগছে। এখন মানু বুঝতে পারছে কীভাবে কর্মফলের দায়ের অবিরাম চক্র কাজ করে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইতোমধ্যেই প্রিয়ংবদা এবং তার স্বামীর পাপের জন্য নির্ধারিত শাস্তি দিতে শুরু করেছে। এখানে রক্তপাতের প্রয়োজন এমনিতেও ছিল না।

মহাবিশ্ব সমস্ত ঋণ শোধ করতে যাচ্ছে। নিজস্ব উপায়ে।

* * * * *

'এখানেই আমাদের যাত্রা শেষ, মানু...' মানুর গালে তার নরম, কাঁপা হাত রেখে বললো প্রিয়ংবদা।

ঘনিয়ে আসা প্রলয়ের স্নায়ু-বিধ্বংসী গর্জন শোনা যাচ্ছে। মানু জানে এখনি যদি তারা রওয়ানা না দেয়, তাহলে তিনজনেরই এই দুর্ভাগ্যজনক মহানগরের দিকে ছুটে আসা জলের পাহাড়ের মাঝে সলিল সমাধি ঘটবে।

'বুঝছেন না কেন, হে জ্ঞানী পণ্ডিত চন্দ্রধর, আমাদের এখনই চলে যেতে হবে!' প্রায় চিৎকার করে বললো মানু। এখনকার এই জরুরি অবস্থা এখন সকল ভদ্রতার উর্ধ্বে।

'আমাদের এখানে রেখে যাও, মানু। এই সোনার শহর, যা আজ আমাদের হীনতার ফলে ধ্বংসের মুখে, আমাদের শেষ বিশ্রামস্থল হোক। তুমি এখন সন্দেহাতীতভাবে তোমার মহান পিতার সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি। এর অর্থ কেবল একটা জিনিসই হতে পারেঃ সৃষ্টিকর্তা তোমাকে খুব বড় কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন। তোমাকে এখন যেতে হবে, সত্যব্রত। যাও, তোমার ঐশ্বরিক নিয়তি পূরণ করতে যাও।'

মানু চন্দ্রধরের কথা উপেক্ষা করে প্রিয়ংবদার দিকে ফিরে হাত বাড়িয়ে দিলো।

'আমার ঘোড়ায় উঠুন। এই জন্তুটি আমাদের তিনজনকে এই অভিশপ্ত শহর থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী...'

প্রিয়ংবদা তার চোখের পানি ধরে রাখতে পারছেন না। জামার হাতায় কিছুক্ষণ পরপর চোখের পানি মুছছেন। গভীর প্রশংসা ও স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালেন মানুর দিকে।

'আমার মধ্যে কোনো দেবত্ব নেই, হে বীর সত্যব্রত। হয়তো মানবতার কোনো চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু আমার যদি এখনো স্পন্দিত হওয়ার মতো হৃদয় থাকে, কাঁদতে পারে এমন চোখ থাকে, আশীর্বাদ করার মতো হাত থাকে, তবে মহাবিশ্বের সাথে আমার আধ্যাত্মিক বন্ধনটি এখনো নষ্ট হয়ে যায়নি।'

মানু এই সুন্দরী, কুট মহিলার কথা মনোযোগ সহকারে শুনছে, যে তার বর্তমান অবতারে তার মোহনীয়তা এবং মঙ্গলময়তা দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে বিমোহিত করতে পারতো।

'আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, মানু...' মহেঞ্জোদারোর রাজকন্যা একটা সুন্দর, কোমল হাসি দিয়ে বললো। 'এই মহাবিশ্ব তোমাকে যে পবিত্র কাজ দিয়েছে তাতে তুমি যেন সফল হও। যেন তুমি অভ্যন্তরীণ শান্তির প্রদীপ এবং চিরন্তন প্রেমের উপহার পাও।'

এরপর সে সামনে এগিয়ে এসে মানুর কপালে চুমু খেলো। সেই যুবকের জন্য তার আশীর্বাদের চূড়ান্ত অংশটি উচ্চারণ করলো যে প্রকৃতির সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক আদিম ক্রোধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে।

সে তাকে যা আশীর্বাদ করেছে তা সত্য হতে যাচ্ছে...সম্পূর্ণরূপে।

'তোমার নাম চিরন্তন, অমর হোক, হে সত্যব্রত মানু!'

বানারস, ২০১৭
মানব হত্যা

ষোলো ঘন্টা হয়ে গেছে।

'কিছু না, বাবা...' সনু তার হাতে একটা অস্পর্শিত খাবারের প্লেট নিয়ে ফিরে এসে বললো।

দেব-রাক্ষস মঠে তাদের আগমনের সাথে সাথেই বিদ্যুৎ তার ঘরে ঢুকে নিজেকে তালাবদ্ধ করে রাখে। এরপর থেকে ষোলো ঘন্টা হয়ে গেছে সে কারো সাথে কোনো কথা বলেনি।

দেবতার আত্মা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

এই আত্মা নিরাময়ের উর্ধ্বে।

* * * * *

নিজের বর্বর উন্মাদনার মুহূর্তে, এবং তার মঠাধীশের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার বর্বর ইচ্ছায় বলভান্ত নিজের ভারী কুঠার দিয়ে ত্রিজাত কাপালিকের মাথাটি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। বিদ্যুৎ তার কাছে পৌঁছে তাকে থামানোর আগে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সবকিছু ঘটে গেছে।

বিদ্যুৎ শুধু অসহায়ভাবে এই ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। মশান-রাজের মাথা তার নিজস্ব আচারের গর্তে পড়ে যায়, তার লম্বা চুলগুলো পুড়ে যায় আগুনে। আর তারপর এই আগুন খুব শীঘ্রই মহাতান্ত্রিকের মাথার খুলিকে গ্রাস করে।

আর এই ব্যাপারটাই তার দুঃখকে চরম সীমায় নিয়ে গেছে। সে যখন গুরগাঁওয়ের পেন্টহাউজে নিজের ব্যাগ গোছাচ্ছিলো, ভেবেছিলো এটা দুয়েক দিনের একটা ভ্রমণ হবে। তখন বিদ্যুৎ তার জন্য অপেক্ষা করা রক্তপাত, ষড়যন্ত্র, কালো জাদু এবং প্রতারণার কোনো আভাস পায়নি। তবুও সে অসাধারণ দৃঢ়তা ও

সাহসিকতার সাথে সবকিছুর মুখোমুখি হয়েছে–ভাড়াটে খুনিদের সাথে লড়াই, ভয়ংকর একজন আততায়ীর সাথে সম্মুখ লড়াই, সবচেয়ে খারাপ বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করা, বালার শিরশ্ছেদ হতে দেখা, সব। এর উপর প্রাচীন অভিশাপ ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সম্পর্কে জেনেছে এবং মোকাবেলা করতে শিখেছে। কিন্তু তার নিজের দলের কেউ একজন কোনো মানুষের জীবনে কেড়ে নিয়েছে, এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

জীবন, সেটা হৃদয়ের দিক দিয়ে ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন, পবিত্র ছিলো। বিদ্যুৎ এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে থাকতে চায় না যারা এই ব্যাপারটা মানে না। মানুষকে হত্যা করার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

বলভান্তের জঘন্য, নির্বোধ কাজটি মঠের যুদ্ধ-প্রধানের কল্পনার চেয়েও বেশি ক্ষতি করেছে।

এটি দেব-রাক্ষস মঠের প্রতি বিদ্যুতের বিশ্বাসকে নাড়িয়ে দিয়েছে। সেই সাথে তার প্রশ্নবিদ্ধ করেছে অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকেও।

* * * * *

ভোরের দিকে পুরোহিতজি দিনের প্রথম প্রার্থনা করছেন। দেব-খণ্ডের কেন্দ্রীয় উদ্যানের একটা বিশালাকার শিবমূর্তি প্রদক্ষিণ করার সময় তিনি এমন কিছু লক্ষ করলেন যা তিনি দেখার আশা করেননি।

বিদ্যুৎ মহান দ্বারকা শাস্ত্রীর কুটিরের সিঁড়িতে বসে আছে। তার পোশাক ও গোছানো ব্যাগ দেখে পুরোহিতজির মন ভেঙে গেল। ব্যাপারটা বৃদ্ধ পুরোহিতের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল সাথে সাথে।

বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে।

পুরোহিতজি শেষ দেবতার কাছে গেলেন। দেবতা তাকে দুর্বল কিন্তু ভদ্র হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো।

জ্ঞানী পুরোহিত বিদ্যুতের পাশের খালি জায়গাটার দিকে ইশারা করে ভোরের বাতাসের মতো প্রশান্তিদায়ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি বসতে পারি?'

বিদ্যুতের সমস্ত সৌজন্য সত্ত্বেও পুরোহিতজি দেবতার হৃদয়ে একটা গভীর ক্ষত অনুভব করতে পারছেন।

* * * * *

'তো তুমি চলে যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, পুরোহিতজি।'

এক মুহূর্তের জন্য নীরবতায় কাটলো সব। তারা দুজনেই তাকিয়ে আছে নীল-কমলা বর্ণের আকাশের দিকে। প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মনে হচ্ছে প্রাচীন কাশী শহর তার পবিত্র ঘুম থেকে জেগে উঠছে। পাখিরা কিচিরমিচির করতে শুরু করেছে। গরুগুলো চিৎকার করছে; মঠের আশেপাশের বেশ কয়েকটি পরিবার সেগুলোকে স্নেহের সাথে খাওয়াচ্ছে। কাছাকাছি এবং দূরের মন্দিরের ঘণ্টা মিশে গেছে সকালের আরতির পবিত্র শব্দের সাথে।

'আমাকে বলো তো, বিদ্যুৎ...কেন আমাদের পুরাণে মন্দের উপর ভালোর জয় নিয়ে এত গল্প আছে?' বিদ্যুতের দিকে না ফিরেই পুরোহিতজি জিজ্ঞেস করলেন।

বিদ্যুৎ বুঝতে পারছে আলোচনা কোন দিকে যাচ্ছে। কিন্তু সে এমন কিছু নিয়ে বিতর্ক করার মেজাজে ছিলো না যাকে সে পাপের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য বলে মনে করে।

'দেখুন, পুরোহিতজি, আপনি জানেন আমি আপনাকে কতটা ভালোবাসি এবং সম্মান করি। কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপাতত আমাকে একা থাকতে দিন। আমি গতকাল আমার চোখের সামনে একজন লোককে হত্যা করতে দেখেছি, অথচ কিছুই করতে পারিনি। আপনার কোনো কথাই এই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারবে না।'

'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর নয়, বিদ্যুৎ,' শান্তভাবে উত্তর দিলেন পুরোহিতজি। 'তুমি যদি চলে যাওয়ার মন তৈরি করে ফেলো, তবে কেউ তোমাকে আটকাতে পারবে না। তবে তুমি যতই বিচলিত হও না কেন, মঠকে নিজেকে রক্ষা করতে না দেওয়াটা খুব অন্যায় হবে।'

'আত্মরক্ষা? আপনি কীসের আত্মরক্ষার কথা বলেছেন? ভগবান, আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না!' বিদ্যুৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো। বিরক্তিতে মাথা নেড়ে ব্যাগটা তুলে নিয়ে হাঁটা শুরু করলো এরপর।

পুরোহিতজি এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করলেন। কিন্তু এরপর বুঝতে পারলেন এখনই উপযুক্ত সময়।

তিনি চিৎকার করে বিদ্যুৎকে বললেন, 'তুমি যদি মনে করো যে আমরাই এই সহিংসতা শুরু করেছি, তবে তুমি ভুল করছো, প্রিয় দেবতা। তুমি কি জানতে চাও না যে তোমার পিতা মহান কার্তিকেয় শাস্ত্রীকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, বিদ্যুৎ?'

হরপ্পা, খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
হরপ্পা—রক্তনদীর অভিশাপ

'দ্রুত যাও...দ্রুত, আমার বিশ্বস্ত বন্ধু!'

মানু তার শক্তিশালী ঘোড়ার কানে কথাগুলো বলে যাচ্ছে, তাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে জলের বিশাল পাহাড়গুলোকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য। পাহাড়গুলো এখন অন্ধকার, লাল-আকাশের দিগন্তে দৃশ্যমান। এই প্রলয় মানুষের কল্পনার চেয়েও বিশাল ও ভয়ংকর। তার বিরল সাহসিকতা এবং অসাধারণ দৃঢ়তা সত্ত্বেও দূরের আকাশছোঁয়া ঢেউ দেখে সূর্যপুত্র আতঙ্কিত হয়ে পড়লো।

একমাত্র দেবতারাই বলতে পারেন এই মহাপ্রলয় কেমন ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে মানব বিলুপ্তির এই বার্তাবাহকের বিধ্বংসী আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। হরপ্পা নগরীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা সর্বগ্রাসী ঢেউয়ের কারণে বাতাস তীরের চেয়েও দ্রুত গতিতে বইছে বলে মনে হচ্ছে। গত কয়েক দিন ধরে মৎস্য তাদেরকে কী নিয়ে সতর্ক করছিলেন তা মানু এখন পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারছে।

মহাপ্রলয় এই গ্রহে আসছে এর প্রতিটি জীবনকে ধ্বংস করার জন্য।

আর প্রথম বজ্রপাত দেখার সাথে সাথেই মানু নিশ্চিত হলো যে প্রলয়ই হচ্ছে পৃথিবীর পরিসমাপ্তি।

* * * * *

অস্থায়ী নিরাপত্তার জন্য উঁচু যায়গায় ছুটে যাচ্ছে সে, কিন্তু তার মন তখনো পড়ে আছে মৃত্যুর মুখে থাকা স্বামী-স্ত্রীর কাছে। লাগামহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভরা হৃদয়ের

থেকে বড় দুর্ভাগ্যজনক আর কী আছে? কোনো সিংহাসন কি এত সুন্দর হতে পারে যা এর দীপ্তি দিয়ে মানুষের আত্মার কষ্ট আর ভোগান্তিকেও অসাড় করে দিতে পারে? আর কীভাবে এসবের সমাপ্তি ঘটে?

ভালবাসা এবং ক্ষমার সাথে সত্যব্রত মানু রাজকীয় দম্পতিকে তার চূড়ান্ত বিদায় জানালো। 'বিদায়, হে জ্ঞানী পণ্ডিত চন্দ্রধর। বিদায়, হে মহেঞ্জোদারোর সুন্দরী রাজকুমারী।'

প্রলয় প্রথম যে জিনিসটাকে সফলভাবে শুদ্ধিকরণ করতে পেরেছে, তা হলো মানুর ঘৃণা।

* * * * *

এ এমন এক দৃশ্য যে তাদের কেউই ভাবতে পারেনি এটা সম্ভব। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি কোনো নদী এতটা শক্তিশালী হয়ে যাবে যে বিশাল সমুদ্রকেও এর সামনে ছোট মনে হবে। কিন্তু এখন এটা তাদের সামনেই আছে। রক্তনদী।

মানু, তারা এবং সোমদত্ত যখন দেখলো ঢেউয়ের প্রথম আঘাত কীভাবে একসময়ের চমৎকার শহরের দেয়ালগুলোকে ভেঙে দিচ্ছে, তখন সবাই কান্নায় ভেঙে পড়লো। এ ছিলো আসল দানবের ছোট্ট একটি আক্রমণ, যে দানব হরপ্পাকে গ্রাস করতে এসেছে।

হরপ্পার উপরে জলের বিধ্বংসী আস্তরণ এমনভাবে ঘিরে আছে যে দেখে মনে হচ্ছে একটা বিশাল সাপ ফণা তুলেছে। নদীটা পুরো শহরকে এক নিমেষে গ্রাস করার কিছুক্ষণ আগে শুধু ফিসফিস করে নীরবে প্রার্থনা করেছে মানু। মহাপ্রলয় এক মুহূর্তে সমগ্র হরপ্পা শহরকে নির্দয়ভাবে গ্রাস করেছে। অথচ এই শহরকে একসময় চিরস্থায়ী বলে মনে হতো।

প্রিয় শহরটিকে ধ্বংস হতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লো হাজার হাজার হরপ্পাবাসী। তারা তাদের চোখের সামনে প্রতিটি ভবন, প্রতিটি মন্দির এবং প্রতিটি বাগান ধ্বংস হতে দেখছে। গর্বিত বিশাল দুর্গগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে হাতুড়ির সামনে পিপড়ার বাসা পড়ে আছে। শস্যভান্ডারগুলো ভেসে গেছে বালুর স্তূপের মতো। মহাস্নান এত গভীরে নিমজ্জিত হলো যে এটা আর কখনোই দিনের আলো দেখতে পাবে না। ইটের পর ইট, গলির পর গলি, বাড়ির পর বাড়ি...চিরতরে হারিয়ে গেল হরপ্পা।

এই মহাবিশ্বই একসময় মানব জাতিকে হরপ্পার মতো বিশাল একটি শহর গড়ে তোলার ইচ্ছা, উদ্যোগ এবং দৃঢ়তা দিয়েছিলো। আর সৃষ্টির সেই একই শক্তিই আবার তা ফিরিয়ে নিলো।

রক্তনদীর অভিশাপ কেবল তার ক্রোধ প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

বানারস, ২০১৭
কার্তিকেয়

পুরোহিতজির কথা শুনে বিদ্যুতের পা জমে গেল।

'তুমি কি জানতে চাও না তোমার পিতা মহান কার্তিকেয় শাস্ত্রীকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, বিদ্যুৎ?'

বিদ্যুৎকে ছোটবেলা থেকেই বলা হয়েছে যে তার বাবা কার্তিকেয় শাস্ত্রী ১৯৯১ সালের সেই দুর্ভাগ্যজনক নভেম্বরের এক বৃষ্টিভেজা রাতে সান ফ্রান্সিসকোতে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

আমার জীবনের এমন কিছু কি আছে যা সত্য? এই জায়গাটা কী? এরা আসলে কারা?

বিদ্যুৎ ক্লান্তভাবে তার ব্যাগ ফেলে দিলো। ক্রোধ ও সত্য জানার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষায় সে কাঁপছে। ফিরে গেল বৃদ্ধ পুরোহিতের দিকে, যিনি এখনো বসে আছেন সিঁড়িতে।

পুরোহিতজি বিদ্যুতের ভেতরে বাড়তে থাকা অধৈর্য ও অবিশ্বাস অনুভব করতে পারছেন। তিনি জানেন তাকে এই ক্ষুব্ধ দেবতাকে মানব জাতির প্রতিরক্ষার শেষ ভরসা দেব-রাক্ষস মঠে ফিরিয়ে আনতেই হবে।

তিনি দ্রুত, স্পষ্টভাবে কথা বললেন। 'বলভান্ত যে লোকটিকে গতকাল হত্যা করেছে, সে একই প্রাণঘাতী, বিশাল সংগঠনের অংশ ছিলো যে আমাদের প্রিয় কার্তিকেয়কে হত্যা করেছে, বিদ্যুৎ। ত্রিজাত কাপালিক ছিলো নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের অনেক শক্তিশালী সদস্যদের একজন।'

* * * * *

তারা এখন দেব-খণ্ডের লনে হাঁটছে। বিদ্যুৎ তার হৃদয়ে যে সমস্ত ঘৃণা ও আঘাত পোষণ করেছে, পুরোহিতজির প্রতি তার ভালোবাসা সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। মহান দ্বারকা শাস্ত্রী ঘুম থেকে উঠার আগ পর্যন্ত সে জ্ঞানী বৃদ্ধ পুরোহিতের সাথে সময় কাটাতে রাজি হলো।

'আমি তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি তা বোঝা কঠিন হবে, বিদ্যুৎ। এবং বিশ্বাস করা তো আরো কঠিন হবে। এই অকল্পনীয় ষড়যন্ত্রের মাত্রা এবং অবিনশ্বরতা যে

কাউকে ধাক্কা দেবে। কিন্তু আমি এখন তোমাকে যা বলছি, বা তোমার পরদাদা তোমাকে পরে যা বলবেন, এর সবই সত্য। প্রতিটা শব্দই।'

বিদ্যুৎ মাথা নাড়লো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখন সে অন্য কিছু শুনতে আগ্রহী নয়। সে শুধু জানতে চাচ্ছিলো কে তার প্রিয় বাবাকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। তখন তার বয়স ছিলো মাত্র আট বছর। সে তার মা, সুন্দরী এবং যত্নশীল পূজাকে বছরের পর বছর নীরবে কষ্ট পেতে দেখেছে। পুরো শৈশব পিতৃহীন কাটিয়েছে, প্রায় লুকিয়ে, এমনকি বানারসে যাওয়াও তার জন্য নিষিদ্ধ ছিলো, যার কারণ সে এখনো জানে না।

পুরোহিতজি বলতে থাকলেন।

'কন্সট্যান্টাইন দ্য গ্রেট যে অর্ডারটি নিসিয়া কাউন্সিলের ঠিক পরেই চালু করেছেন, তা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রতিভাধর পুরুষদের একটা বিপজ্জনক এবং অপ্রতিরোধ্য কার্টেলে পরিণত হতে খুব বেশি সময় নেয়নি। নাইট টেম্পলারের উত্থান এবং পতন ছিলো ক্ষমতা, প্রতারণা এবং বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণের অনেকগুলো প্রাথমিক খেলার মধ্যে একটা, যা এই অর্ডারটি খেলতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাদের নকশা এবং তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো বেশি ঘৃণ্য হয়ে ওঠে।'

বিদ্যুৎ অধৈর্য হয়ে উঠছিলো। এখন ঘটনার ধারাবাহিকতায় তার কোনো আগ্রহই নেই। সে কোনো নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের পরোয়া করে না। তার শুধু জানা দরকার তার বাবার খুনি কারা।

'সম্মানের সাথেই বলছি, পুরোহিতজি, আপনার ও বাবার বলা এই অর্ডারের ইতিহাস এবং কর্মকাণ্ড শোনার ইচ্ছা বা অবস্থা কোনোটাই এই মুহূর্তে আমার নেই। আপনি কি দয়া করে আমাকে বলবেন কে আমার মহান পিতা, আপনার প্রিয় কার্তিকেয়কে হত্যা করেছে?'

পুরোহিতজি বিদ্যুতের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি থেমে গিয়ে তার দেবতার দিকে ফিরলেন।

'শুধু একটা কথা মাথায় রাখো, প্রিয় বিদ্যুৎ। যদিও অন্য কারো ক্ষতি তোমার সাথে তুলনা করা যায় না। আমরা সবাই কার্তিকেয়কে যতটা ভালোবাসতাম, তোমাকেও ততটা ভালোবাসি। হয়তো একটু বেশিই।'

চোখে জল নিয়ে বৃদ্ধ পুরোহিত তার দুই হাত তুলে তাদের দিকে তাকালেন। এরপর তিনি ফিরলেন বিদ্যুতের দিকে।

'আমি এই হাত দিয়েই কার্তিকেয়কে বড় করেছি, হে দেবতা। সে আমার প্রথম সন্তানের মতো ছিলো।'

মহেঞ্জোদারো, খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ

মৃতের স্তূপ

'হে সত্যব্রত, তোমার এটা চেষ্টা করা বোকামি হবে।' সাত তরুণ ঋষি, পবিত্র সপ্তর্ষি, মানুর সাথে কথা বলছিলেন। সূর্যের পুত্র বিস্তীর্ণ, মশাল দ্বারা আলোকিত, উঁচু গুহার মধ্যে পায়চারি করছে যেখানে তারা রাতের জন্য আশ্রয় নিয়েছে।

'মহান ঋষিরা ঠিকই বলেছেন, মানু। এখান থেকে মহেঞ্জোদারো প্রায় ত্রিশ যোজন দূরে। এমনকি দ্রুততম এবং শক্তিশালী অশ্বরাও সময়মতো শহরে পৌঁছাতে পারবে না,' তারা বা শতরূপা চিন্তিত স্বরে বললো। সে খুব উদ্বিগ্ন কারণ মানু আরেকটা আত্মঘাতী অভিযানে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু সে তার বেদনাদায়ক অবস্থাও বুঝতে পারছে। মহেঞ্জোদারো ছিলো আর্যাবর্তের দ্বিতীয় জনবহুল শহর। যদি এই মহানগরীকে মহাপ্লাবন গ্রাস করে, তবে এর অর্থ হবে গৌরবময় শহরের অগণিত বাসিন্দার জন্য নিশ্চিত মৃত্যু।

'আমরা তবে কিছু না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবো?' মানু বিরক্ত হয়ে বললো। মনের গভীর অভ্যন্তরে সেও জানতো যে এই প্রতিকূলতা প্রায় অনতিক্রম্য। 'তোমরা কি ভুলে গেছ সেই মহিমান্বিত শহরে কত মানুষ বাস করে? হাজার হাজার! হয়তো এক লাখেরও বেশি! কীভাবে আমরা তাদেরকে নিশ্চিত ধ্বংসের জন্য ছেড়ে দিতে পারি?'

উঁচু গুহায় পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে এবং মশালের ম্লান কমলা আলোর কারণে পরিস্থিতি আরো গম্ভীর লাগছে। গুহার বিষণ্নতা তাদের হৃদয়ের ভেতরে থাকা নিরাশাকে ধীরে ধীরে বাস্তব রূপ দান করছে।

* * * * *

'আমি যাবো!' একটা কণ্ঠ বেজে উঠলো। সবার দৃষ্টি গুহার অন্ধকার কোণে গেল, যেখানে পাথরের ফলকের উপর নিজের তীরগুলো তীক্ষ্ণ করতে বসেছিলো ধ্রুব। সুন্দর বাদামি চুলের পেশিবহুল এই অসাধারণ যুবকটি মানুর শৈশব বন্ধু এবং একজন দক্ষ যোদ্ধা।

'কী বলতে চাও, ধ্রুব?' তারা জিজ্ঞেস করলো।

ধ্রুব উঠে দাঁড়ালো, তীর-ধনুক দিয়ে ভরা তূণীরটা তুলে নিয়ে গুহার তুলনামূলকভাবে উজ্জ্বল কেন্দ্রে গেল। এরপর সে মানু, তারা, সোমদত্ত ও সপ্তর্ষিদের মুখোমুখি দাঁড়ালো। সাতজন নির্মল ঋষি আংশিক ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে ছিলেন তখন।

'আমাকে মহেঞ্জোদারো যাওয়ার অনুমতি দাও, মানু। আমি একা যাবো আর দিনরাত ছুটবো। আমার ঘোড়া যদি এই কঠিন যাত্রায় না বাঁচে, আমি হেঁটে মহেঞ্জোদারোতে যাবো।'

'পাগলের মতো কথা বোলো না, ধ্রুব,' এবার সোমদত্ত কথা বললেন। 'আমি তোমার সাহস ও অন্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার ইচ্ছার প্রশংসা করছি। আমি সত্যিই করি। কিন্তু এখন মহেঞ্জোদারোতে যাওয়ার কথা ভাবা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের পর্যবেক্ষকরা যে খবর দিয়েছে, তাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রলয় দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে আর শহরকে লন্ডভণ্ড করে ফেলবে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা, দিন নয়,' সোমদত্ত বললেন।

'কিন্তু আমরা ওদের সবাইকে মরতে দিতে পারি না!' চিৎকার করে উঠলো মানু। ভয় এবং অসহায়ত্বে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। মানুর একটা উচ্চ কণ্ঠের বক্তব্য যেকোনো সমাবেশকে শান্ত করার জন্য যথেষ্ট।

ধ্রুব তার বন্ধুর কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রাখলো।

'আমাদের মধ্যে যেকোনো একজনকে যেতে হবে, মানু। আজ যদি আমরা এই শহর পরিত্যাগ করি, তুমি এবং আমি উভয়েই জানি যে আমরা আমাদের বিবেকের উপর এই বোঝা নিয়ে বাঁচতে পারবো না। আর আমরা তোমাকে ঝুঁকি নিতে দিতে পারি না, বন্ধু। তুমি জাহাজ এবং মানব জাতির যা কিছু অবশিষ্ট আছে তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে যেতে অনুমতি দাও, আমার রাজা।'

মানু একটা কথাও বললো না। সে তার তলোয়ার তুলে তারার দিকে এগিয়ে গেল। সে তার কপালে চুমু খেলো। তার চোখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললো, 'তুমি জানো আমাকে এটা করতে হবে, তারা। আমি বিভাসন পূজারির ছেলে। আর মহান বিভাসন পূজারি কখনোই তার লোকজনকে পেছনে ফেলে আসতেন না।'

তারার কিছু বলার অপেক্ষা না করে মানু এবার ধ্রুবর দিকে ফিরলো।

'আমরা দুজনেই এই মুহূর্তে মহেঞ্জোদারোতে যাচ্ছি।'

* * * * *

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, হে সূর্যপুত্র।'

মানু এবং ধ্রুব গুহা থেকে বেরিয়ে আসার আগে মহৎ ঋষিদের একজন উচ্চ স্বরে বলে উঠলেন। তখনো ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তিনি।

ন্যাড়ামাথার ও পরিষ্কারভাবে কামানো দাড়ির এই ঋষিকে উনিশ বছরের যুবকের মতো দেখাচ্ছে। সপ্তর্ষিদের সাতজনই অল্পবয়সি বালক, কিন্তু একটা উজ্জ্বল আভা ছড়াচ্ছেন প্রত্যেকেই। তারা অতিপ্রাকৃত জীবনশক্তিতে প্রদীপ্ত বলে মনে হচ্ছে। মানুর কাছে মনে হলো যেন মৎস্য পবিত্র সপ্তর্ষির সাথে তার একটা ছোট অংশ রেখে গেছেন। অন্তত মানু তাই আশা করছে।

তরুণ ঋষি চোখ খুললেন, যেন তারা কোনো দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, সত্যব্রত। বিধ্বংসী প্রলয় শহরে আঘাত করেছে...কিছুক্ষণ আগে।'

এই বলে প্রথম ঋষি চোখ বন্ধ করলেন। আতঙ্কিত মানু কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই দ্বিতীয় ঋষি চোখ খুললেন, প্রস্তুত হলেন কথা বলার জন্য।

'প্রলয় ফটক, দেয়াল এবং দুর্গে আঘাত করেছে। মহেঞ্জোদারোর পতন হয়েছে, হে মহারাজ। এই শহর আর কখনো জেগে উঠবে না।'

তারপর গুহার শোকার্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনি তুলে বাকি পাঁচ ঋষি একের পর এক ভয়ংকর ঘোষণা করতে লাগলেন।

'নিমজ্জিত জনতার বধির কান্না সমগ্র বিশ্বকে কাঁদাবে। মহান শুদ্ধি শুরু হয়েছে...'

'চিরকাল এই শহরের স্মৃতি টিকে থাকবে রহস্যে আবৃত হয়ে। চিরকাল এর নাম আমাদের মহাপ্লাবনের কথা মনে করিয়ে দেবে...'

'শহরের সিন্ধুবাসীরা তাদের মৃতদের যেমন মুয়া বলে ডাকে, যাকে বহুবচনে বলে মুয়ান, সেই নামটা এই অভিশপ্ত মহানগরী এবং এর দুর্ভাগা বাসিন্দাদের নামের সাথে শেষ পর্যন্ত লেগে থাকবে...'

'এটাকে চিরকাল বলা হবে মুয়ান-জো-দারো।'

'এটাকে চিরকাল বলা হবে মৃতের স্তূপ।'

বানারস, ২০১৭
হত্যা নীতি

বিদ্যুৎ মেঝের একটা জায়গায় চোখ স্থির করে বসে রইলো।

তারা এখন মহান মঠাধীশের ঘরে আছে। পুরোহিতজি এবং দ্বারকা শাস্ত্রী উভয়েই বিদ্যুতের মুখে যন্ত্রণা ও হতাশা দেখতে পাচ্ছেন। তারা জানতেন যে তাদের দ্রুত কিছু করতে হবে। শেষ দেবতাকে দূরে সরে যেতে দেওয়া যাবে না। এই সময়ে না।

রোহিণী নক্ষত্রের আর মাত্র তিন দিন বাকি আছে। এখন তো কোনোভাবেই না।

* * * * *

'শত বছর ধরে এই যুদ্ধ চলছে, বাছা,' দ্বারকা শাস্ত্রী বললেন। 'অহিংসা দিয়ে কোটি কোটি মানুষের গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একজন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা কী আদৌ সম্ভব?'

বিদ্যুৎ কোনো কথা বললো না। দ্বারকা শাস্ত্রী বলতে থাকলেন, 'আমি মানছি যে বলভান্ত যা করেছে তা দুঃখজনক ছিলো, বিদ্যুৎ। আর তা এড়ানো যেত। এটা এড়ানো উচিত ছিলো! কিন্তু আমাদের কাছে কি আর কোনো বিকল্প ছিলো? বলভান্ত যদি ত্রিজাতকে জীবিত রেখে যেত, তবে মহাতান্ত্রিক দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আমাদের দিকে ফিরে আসতো। হ্যাঁ, আমরা তাকে বন্দি করতে পারতাম। কিন্তু আমরা বালাকেও বন্দি করেছিলাম। সেখানে কী হয়েছে তা আমরা সবাই জানি।'

দ্বারকা শাস্ত্রী আবার বলার আগে কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। পুরো রুম কয়েক মিনিটের জন্য নীরব হয়ে গেল।

'আমরা নিজেদেরকে নিষ্কলঙ্ক রাখার চেষ্টা করে এমন একটা নির্মম দৈত্যের সাথে যুদ্ধ করতে পারবো না, যে মানুষের সাথে চরম অবজ্ঞার আচরণ করে, বেপরোয়া বর্বরতার সাথে নিরপরাধের রক্ত ঝরায়, বিদ্যুৎ। এটা তোমাকে খুব

ভালোভাবে বুঝতে হবে, বাছা, যে আমরা যুদ্ধে আছি। দেখতে হয়তো মনে হচ্ছে না, কিন্তু এটাই বাস্তবতা।'

বিদ্যুৎ শুনছে। তার মন যে ঝড়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তার গভীরে একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিলো। তা হলো তার পিতামহের অনবদ্য নৈতিক চরিত্র এবং প্রশ্নাতীত মানবতা।

'বাবা, আমরা যুদ্ধে আছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথমে রুমি পেরেরা এবং উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভাড়াটে খুনিরা। তারপর বালার ঠান্ডা মাথায় খুন। এরপর মহাতান্ত্রিক ও অধ্যাপক ত্রিপাঠি। আমি বুঝতে পারি যে আমরা ব্যতিক্রমী, শক্তিশালী এবং নিষ্ঠুর একজনের সাথে লড়াই করছি,' বিদ্যুৎ বললো।

দেবতা শেষ পর্যন্ত তার নীরবতা ভাঙায় দ্বারকা শাস্ত্রী ও পুরোহিতজি দুজনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

* * * * *

'সবকিছুর সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও, বাবা, আমি কাউকে হত্যা করতে পারবো না। আমি চাইলেই রুমিকে মেরে ফেলতে পারতাম। আমি ভাড়াটে খুনিদের প্রত্যেককে হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু আমি করিনি। আর সেটাই আমার বাবা-মা আমাকে শিখিয়েছেন। পুরোহিতজিও আমাকে সেটাই শিখিয়েছেন। তুমি আমাকে এটাই শিখিয়েছ, বাবা।'

দ্বারকা শাস্ত্রী মাথা নাড়লেন।

'এজন্যই পুরোহিতজি তোমাকে আমাদের পুরাণে বর্ণিত ভালো ও মন্দের যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, বিদ্যুৎ।'

বিদ্যুৎ হঠাৎ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে উপরে তাকালো।

বাবা কী করে জানলেন এই কথা? পুরোহিতজি যখন বলেছেন, তখন তো তিনি সেখানে ছিলেন না!

শেষ দেবতা তার বিস্ময় লুকাতে না পেরে পুরোহিতজির দিকে তাকালেন, যিনি কেবল হাসলেন। বিদ্যুৎ মাথা নেড়ে নিজে নিজেই হাসলো। উভয় ব্যক্তিই জানে যে মহান মঠাধীশ ত্রিকালদর্শী, বা স্থান-কালের তিনটি রাজ্যের পর্যবেক্ষক।

'হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্ম সর্বজনীন শান্তিতে বিশ্বাসী। এটা সর্বধর্ম-সমাভাব বা সমস্ত ধর্ম ও বিশ্বাসের স্নেহপূর্ণ সহাবস্থানকে সমর্থন করে। এটা মানুষকে ত্যাগের পথ ও ব্রহ্ম বা চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান করতে শেখায়। এমনকি যখন এই ধর্ম *বাসুধৈব কুটুম্বকম* উচ্চারণ করে, তখন সমগ্র বিশ্বকে একটা বৃহৎ, ঐক্যবদ্ধ পরিবার হতে উৎসাহিত করে ।'

দ্বারকা শাস্ত্রী কিছুক্ষণের জন্য থামলেন। তিনি চাইছিলেন তার নাতি যেন তার বলা প্রতিটা শব্দ ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে।

'কিন্তু এরপরেও মা দুর্গা মহিষাসুরের শিরশ্ছেদ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাক্ষস নরকাসুরকে বধ করেন। মা কালী রক্তবীজের রক্ত থেকে উদ্ভূত হাজার হাজার রাক্ষসকে নির্মূল করেন। ভগবান রাম রাবণকে বধ করেন এবং শিব ত্রিপুরা রাক্ষসকে ধ্বংস করেন। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে পরাজিত করেন এবং বিষ্ণুর নরসিংহ অবতার রাক্ষস অত্যাচারী হিরণ্যকশিপুর পেট চিরে ফেলেন। এইসবই আমাদের মানুষের কাছে একটা বিশেষ বার্তা পাঠানোর জন্য, বিদ্যুৎ।

মন্দের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। স্বৈরাচারকে পরাজিত করতে হবে। আর লক্ষ লক্ষ নিরপরাধের বিরুদ্ধে ব্যাপক নিষ্ঠুরতা ঠেকাতে যদি অত্যাচারীর সাথে সহিংসতার প্রয়োজন হয়, তবে সেই পথই বেছে নিতে হবে।'

* * * * *

'কিন্তু বাবা, মশান-রাজ নিরস্ত্র ছিলো। সে পরাজিত হয়েছে। যুদ্ধের কোন নীতি সেই অবস্থায় কাউকে হত্যা করার অনুমতি দেয়?'

এবার পুরোহিতজি রাগে ফেটে পড়লেন। তার মুখ লাল হয়ে গেছে। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। এরপর ক্ষোভ ও দীর্ঘদিনের চাপা ক্রোধের কারণে চিৎকার করে উঠে বিদ্যুতের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন।

'সেই একই নীতি যেটা মহান যোদ্ধা-পুরোহিত অদ্বৈত শাস্ত্রীকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যার অনুমতি দিয়েছে! একই নীতি যা তোমার পূর্বপুরুষ মার্কণ্ডেয় শাস্ত্রীকে একা উপাসনায় মগ্ন থাকার সময় টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার অনুমতি দিয়েছে। সেই একই হত্যা নীতি যা ক্যাপ্টেন ওয়েন অ্যাশব্রুককে গাছ থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছে।'

পুরোহিতজির কথায় বিদ্যুৎ চমকে গেল। কিন্তু ক্ষুব্ধ পুরোহিতের কথা শেষ হয়নি। তিনি তার শেষ লাইনটি চিৎকার করে উঠার সময় তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

'সেই একই নীতি যা তোমার বাবা কার্তিকেয় শাস্ত্রীকে হাজার হাজার মাইল দূরে খুঁজে বের করে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছে।'

আর্যাবর্তের অন্ধকার বন, খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৯৯ অব্দ

দৈত্য

প্রচণ্ড হাঁফাচ্ছে সে। দম প্রায় ফুরিয়ে আসছে কিন্তু থামার কোনো উপায় নেই। কারণ তাদের কাছে যাওয়ার আগে ওকে তার মূল্যবান আলকেমিস্টদের কাছে পৌঁছাতে হবে।

ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করে যেতে হচ্ছে ওকে। ঢালু মাটিতে পা ঘনঘন পিছলে যাচ্ছে। নিজের শক্তিশালী কবজির জোরে তলোয়ারটা ধরে রেখেছে। তার পথে আসা যেকোনো শত্রুর উপর আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত আছে অসিটা।

মৃত্যু, ধ্বংস, যুদ্ধ, ঘৃণা, হতাশা এবং আশার শেষ কয়েক মাসে তার চেহারা আমূল বদলে গেছে। তার একসময়ের ন্যাড়া মাথাটা এখন একঝাঁক লম্বা চুলে আচ্ছাদিত, যেগুলো তার মেদহীন, শক্তিশালী কাঁধ থেকে লাফিয়ে উঠছে। একসময়ের পরিষ্কার করে কামানো বালকসুলভ নির্মল চেহারাটা এখন কঠোর হয়ে গেছে যুদ্ধের কারণে; শক্ত চোয়াল খোঁচা খোঁচা দাড়িতে আচ্ছাদিত। তার মুখমণ্ডল ও শরীর তীর আর তলোয়ারের কাটা দাগে ঢাকা। গত কয়েক মাস ধরে পথের সমস্ত প্রতিকূলতার পরেও তার একটা বৈশিষ্ট্য তখনো আগের মতোই ছিলো।

ঐ গভীর, ন্যায়নিষ্ঠ, বাদামি রঙের চোখ।

সত্যব্রত মানুর চোখের তীক্ষ্ণ সততা তখনো অপরিবর্তিত ছিলো।

* * * * *

হরপ্পার ধ্বংসের তাৎপর্যপূর্ণ রাতের পর থেকেই মানুর জন্য সবকিছু কঠিন হয়ে পড়ে। পরবর্তী কয়েক দিন ও রাত কালিবঙ্গন এবং ধোলাভিরা, অন্যান্য ছোট জনপদ এবং বসতিগুলো ছাড়াও বড় শহরগুলোকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য উন্মত্ত প্রচেষ্টায় অতিবাহিত হয়েছে। বিশাল প্রলয় নির্মমভাবে, নির্দয়ভাবে, পরিকল্পিতভাবে আঘাত করার আগে ওরা বিপুলসংখ্যক লোককে বের করে আনতে এবং অসংখ্য জীবন বাঁচাতে সফল হয়।

সপ্তাহ ও মাস যতই এগিয়েছে, প্রলয় তার অতল পেটে শত শত যোজন জমি গ্রাস করেছে। যে জমিগুলো একসময় অনুর্বর ছিলো, ক্যাকটাস এবং টিকটিকি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, সেগুলো এখন সমুদ্রের গভীরতম অংশ। পাহাড় এবং পর্বতগুলো, যেগুলো একসময় আকাশের বিপরীতে বিশাল দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে ছিলো, সেগুলো এখন বিশাল ঢেউয়ের নিচে নিমজ্জিত।

মহান পরিশুদ্ধি মানুষের হৃদয় ও আত্মার গভীরে যা চাপা পড়ে ছিলো তাও বের করে এনেছে। বের করে এনেছে মানুষের অধঃপতনের বিষাক্ত দিক, ঠিক যেমন এটা আশ্চর্যজনক উদারতা এবং পরোপকারিতাকে উন্মোচিত করেছে যা মানুষের কাছে এত দিন অজানা ছিলো। একদিকে এই ধ্বংসযজ্ঞ কিছু নর-নারীকে নিজেদের সবকিছু দিয়ে একে অপরকে রক্ষা করতে শিখিয়েছে। অন্য দিকে এটা মানুষকে এমন দৈত্যে রূপান্তরিত করেছে যে তারা আসন্ন বিলুপ্তির মুখেও দুর্বল ও অসহায়দের শোষণ করার কোনো সুযোগই ছাড়েনি।

কয়েক মাসের মধ্যেই মানুর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তর পরিবর্তন আসে। সে আর বিশ্বাস করে না যে মানব আত্মা মঙ্গলময়–যতক্ষণ না তার আত্মাকে পরিস্থিতি দ্বারা বাধ্য করা হচ্ছে। সে এই গ্রহের প্রভাবশালী প্রজাতিটির যথেষ্ট অবক্ষয় দেখেছে। তাই সে এ সম্পর্কে নিশ্চিত।

মানুষ হচ্ছে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের একটা অভিব্যক্তি।

আবার মানুষই হচ্ছে শয়তানের একটা প্রতিচ্ছবি।

* * * * *

ওরা হায়েনার মতো দল বেঁধে শিকার করে। দিনরাত অন্ধকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। তাদের চোখ ঘন জঙ্গলে চলাফেরা করে এমন সবকিছু দেখে। তারা শিকার করে, রান্না করে এবং সিংহের মতো গর্ব ও উৎসাহে বনের নদী থেকে ধরা কাঁচা মাছে কামড় দেয়।

এই দুষ্ট বনবাসীদের প্রত্যেকেই আর্যাবর্ত জুড়ে দৈত্য নামে পরিচিত ছিলো এবং সকলেই তাদের ভয় পেত।

তারা যে সমস্ত প্রাণীর মাঝে বাস করতো, তাদের মতোই শুধু নৃশংস শক্তি এবং যুদ্ধের দক্ষতাই নির্ধারণ করে দিতো তাদের নেতৃত্ব। ফলস্বরূপ, এই দুষ্ট গোত্রের প্রতিটি গোত্র প্রধানকেই পূর্ববর্তী গোত্র প্রধানকে লড়াইয়ের জন্য আহ্বান করতে হতো এবং প্রকাশ্যে অস্ত্রবিহীন লড়াইয়ে হত্যা করতে হতো।

বর্তমান গোত্র প্রধান, যে অন্ধকার অরণ্যে মুকুটহীন রাজার মতো শাসন করে, সে যে একজন মানুষরূপী জানোয়ার ছিলো। শোনা যায় যে সে সাত হাতের চেয়েও বেশি লম্বা এবং তার খালি হাতে তার পূর্ববর্তী গোত্র প্রধানের অন্ত্র ছিঁড়ে ফেলেছে এবং সেই অন্ত্র সে খুব গর্বের সাথে নিজের কোমর-বন্ধনী হিসেবে ব্যবহার করে।

সমস্ত বনভূমি এবং সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়ে সে নারা-মুন্ডা নামে পরিচিত।

বানারস, ২০১৭

কাশী বিশ্বনাথ

তিনি মন্দিরের দিকে যাওয়ার সরু গলির এককোণে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সমস্ত কার্যক্রম দেখছিলেন। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির তার আগে পরিদর্শন করা অন্য যেকোনো উপাসনালয়ের তুলনায় আধ্যাত্মিকভাবে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। এই মন্দিরে বার্ষিক যে পরিমাণ তীর্থযাত্রী আসে, ভ্যাটিকান এবং মক্কায় একসাথেও এত তীর্থযাত্রী হয় না।

তারা ঠিক বলেছে। এই জায়গা, এই প্রাচীন শহরে অদ্ভুতভাবে শক্তিশালী কিছু আছে।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে দেবতা এখানে আছেন।

তিনি মূল মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারেননি কারণ বিদেশিদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি ছিলো না। কিন্তু মন্দিরের ফটকের বাইরে থেকে তিনি অন্নকূট দেখতে পাচ্ছেন, যা হাজার হাজার দরিদ্র ও দুস্থদের বিনামূল্যে খাবার পরিবেশন করে। তিনি দূর থেকে মন্দিরের কেন্দ্রীয় গম্বুজের দিকে তাকালেন, যা একসময় শক্ত সোনার তৈরি ছিলো। তিনি মন্দিরের রৌপ্য মুদ্রা খচিত মেঝে দেখতে পাচ্ছেন।

পথচারীরা তার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। যদিও বিশ্বনাথ গলিতে বা মন্দিরের দিকে যাওয়ার রাস্তায় বিদেশিদের দেখতে পাওয়া নতুন কিছু ছিলো না, তবে তিনি যে আকর্ষণীয় উপস্থিতি বহন করছেন তা তারা সচরাচর দেখতে পায় না।

আর ব্যাপারটা আসলেও তাই।

এর আগে প্রাচীন কাশী নগরে তার মতো কেউ যায়নি কখনো।

* * * * *

জ্ঞান-বাপী কূপ এবং এর আশেপাশের ভক্তদের সাথে দেখা করার সময় তিনি একই সাথে মন্ত্রমুগ্ধ এবং চিন্তিত ছিলেন। অসীম জ্ঞানের উৎস হিসেবে পরিচিত জ্ঞান-বাপী কূপের সাথে বেশ কয়েকটি কিংবদন্তি যুক্ত আছে। এর মধ্যে একটা হলো, যখন লুটপাটকারী সুলতানের একটা বাহিনী প্রথমে বানারসে এবং অবশেষে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে, তখন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত শিব লিঙ্গকে আলিঙ্গন করে তুলে নেন এবং পবিত্র কূপে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দেন যাতে হানাদাররা এই পবিত্র শিবলিঙ্গকে অপবিত্র ও অসম্মান করতে না পারে।

তিনি পবিত্র কূপের কাছে প্রার্থনা করতে আসা প্রতিটি ভক্তকে মনোযোগ সহকারে দেখেন। তিনি একটা তরুণ দম্পতির দিকে তাকালেন যারা প্রকৃতপক্ষেই অসহায়। তিনি শীর্ণ বৃদ্ধা, অর্ধনগ্ন বৃদ্ধ, কাঁদতে থাকা শিশু, পঙ্গু ও রোগাক্রান্তদের খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন। যে ব্যাপারটা তাকে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত করছে তা হলো তাদের চোখে থাকা প্রশ্নাতীত ভক্তির গভীরতা। তারা তাদের দরিদ্রতা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করছে না। তারা তাদের একনিষ্ঠ ভক্তির পথে নিজেদের বিকলঙ্গতাকে আসতে দিচ্ছে না।

এমন তীব্র আর সম্মিলিত আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, এমন লোককে কে পরাস্ত করতে পারবে? তার চেয়েও বড় কথা হলো, কে এমন কাউকে পরাজিত করতে পারবে যার অতিপ্রাকৃত সত্তায় এই সমস্ত জীবনশক্তি সুপ্ত হয়ে আছে?

আর তাই, দেরি হওয়ার আগেই দেবতাকে থামাতে হবে।

* * * * *

তিনি নির্ভীক ছিলেন, তাই একাই পবিত্র মন্দির এবং পবিত্র কূপ পরিদর্শনের জন্য বের হয়েছেন। এখন বাইরের ব্যস্ত রাস্তায় চলে এসেছেন, বরাবরের মতোই দ্রুত হাঁটছেন। চওড়া রাস্তার কাছে আসার সাথে সাথেই তার নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে ঘিরে ফেলে এবং তিনি প্রশিক্ষিত যোদ্ধাদের মাঝে হারিয়ে যান।

বিদ্যুৎ, দ্বারকা শাস্ত্রী, দামিনী, পুরোহিতজি, ন্যায়না, সনু, বলভান্ত এবং সমগ্র দেব-রাক্ষস মঠের চিন্তার একটা কারণ অবশ্য ছিলো। সমগ্র মানব জাতিরই চিন্তার কারণ ছিলো।

খুবই ভয়ংকর একটা কারণ।

মাশ্চেরা বিয়ানকা কাশীতে এসে পড়েছে।

যা মানব জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করতে যাচ্ছে তা চিরতরে থামানোর জন্য।

আর্যাবর্তের অন্ধকার বন, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৯ অব্দ
সৃষ্টির আক্রমণ

মানু এবং তার আহ্বাভাজন ধ্রুব তাদের অস্ত্র বের করলো। চারজন মাস্টার আলকেমিস্টকে অন্ধকার বনের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় তারা তাদের চোখ ও কান সজাগ রেখেছে যাতে কারো আসার সূক্ষ্মতম শব্দটিও শুনতে পায়।

এই ভয়ংকর বনভূমির প্রতিটি ধাপে বিপদ লুকিয়ে থাকা সত্ত্বেও আলকেমিস্টদের এখানে আনতে হয়েছে। ঐশ্বরিক সপ্তর্ষি, যারা এখন সত্যব্রত মানুর আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং প্রলয়ের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশীদার ছিলেন, তারা যেসব প্রয়োজনীয় ঔষধি গাছ এবং শিকড় তালিকাভুক্ত করেছেন, সেগুলো সংরক্ষণ এবং জাহাজে বহন করার জন্য এই অন্ধকার বনের গভীর থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

* * * * *

মানু বেশ কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করার পর এই সত্যের সাথে মানিয়ে নিতে পেরেছে যে তার প্রিয় ভাই, শিক্ষক, বন্ধু এবং দার্শনিক, পরাক্রমশালী মৎস্য, যাকে মানু স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলে বিশ্বাস করতো, তাকে শেষ বিদায় না বলেই চলে গেছেন।

মৎস্য মানুর জন্য একটা চিরকুট রেখে গেছেন, যখন সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর্যায় চলে আসবে, তখন যেন তাকে সাহায্যের জন্য ডাকে। এবং তিনি মানুর জন্য একটা বাঁকা দেখতে শিঙা রেখে গেছেন। অদ্ভুত শিঙাটি কোনো রহস্যময় সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আর এটা তখনই ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, যখন মানু অনুভব করবে যে মানব জাতির জন্য সমস্ত আশা শেষ হয়ে গেছে, অন্যথায় কখনোই নয়।

যদিও প্রকৃতির সমস্ত শক্তি এবং ক্রোধের বিরুদ্ধে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বিশাল জাহাজ তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু হওয়ার কয়েক মাস পেরিয়ে গেছে, মানু তার পাশে মৎস্যকে ছাড়া একধরনের তিক্ত একাকিত্ব অনুভব করছে। যখন সে মৎস্যের বিশাল জাহাজ নির্মাণের নেতৃত্ব দেওয়ার আদেশ মেনে নিয়েছিলো, তখন সে এটা ভেবেই মেনে নিয়েছিলো যে মহৎ নীল-মানব সব সময় তার পাশে থাকবে। কিন্তু তা হওয়ার ছিলো না।

সত্যব্রত মানু একাই রয়ে গেল। একাই সৃষ্টির আক্রমণের বিরুদ্ধে সৃষ্টিকে বাঁচানোর মহান কাজ সামলাচ্ছে সে।

* * * * *

মানু ও ধ্রুবর সাথে ছিলো অর্ধডজন যোদ্ধার একটা ছোট দল।

মানুষ জাহাজ নির্মাতাদের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠেছে। গত কয়েক মাস ধরে মহাপ্রলয় যখন সমস্ত আর্যাবর্তকে গ্রাস করেছে, তারা কয়েক লক্ষ পুরুষ, মহিলা এবং শিশুকে বাঁচাতে সফল হয়েছে। এতক্ষণে তারা সফলভাবে কালিবঙ্গন শহরটি খালি করেছে এবং লোথালের মতো দূরবর্তী স্থানে আরোহীদের পাঠিয়ে দিয়েছে।

প্রতিটি শহর মানুর জাহাজের কর্মী ও সেনাবাহিনীতে অবদান রেখেছে। সমস্ত সক্ষম-শরীরের পুরুষদের পদাতিক বা অশ্বারোহী বাহিনীর অধীনে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, পাশাপাশি তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নির্মাণ শ্রমশক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অস্থায়ী হলেও শেষ সভ্য মানব উপনিবেশটিকে দস্যুদের বড় দল এবং বর্বর ভূমির যুদ্ধবাজ আক্রমণকারীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য একটা সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর প্রয়োজন ছিলো।

মহিলারাও কোনো অংশে কম ছিলো না। সশস্ত্র ইউনিটের পাশাপাশি স্থাপত্য কর্মশক্তিতে সমানভাবে অবদান রেখেছে তারা। আহত এবং অসুস্থদের দেখাশোনাকারী প্রয়োজনীয় দল গঠন করে সেগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছে। বিশাল রান্নাঘর তৈরি ও পরিচালনা করেছে এবং সব প্রাণী, গাছপালা, পোকামাকড়, ধাতু, কাপড়, বই, ভেষজ, বীজ, অগ্নিপাথর এবং মানচিত্রের নমুনাগুলোকে সুরক্ষিত রেখেছে। অস্ত্র তৈরি করেছে তারা, সেই সাথে মানুষের কাছে পরিচিত সর্বশ্রেষ্ঠ নৌযান নির্মাণের জন্য রেখেছে বিশদ তালিকাও।

তারা সবাই বেঁচে থাকার জন্য একসাথে লড়াই করেছে যাতে প্রলয়ের পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

এই উদ্যোগটি একটা সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবী গড়ার চেয়ে কম কিছু ছিলো না–তাও বরফশীতল বৃষ্টি এবং হৃদয়-কাঁপানো বজ্রপাতের নিচে। যে সমস্ত

উচ্চভূমিকে তারা তাদের বেস ক্যাম্প হিসেবে বেছে নিয়েছিলো, প্রলয় ছড়িয়ে পড়ায় ও পুরো গ্রহকে গ্রাস করে নেওয়ায় কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাদের সেগুলো পরিত্যাগ করতে হয়েছে।

এই প্রলয় সবকিছু গ্রাস করে নিচ্ছে।

কেবল একপাশে পবিত্র শহরকে একলা ছেড়ে।

* * * * *

শক্তিশালী যুবক ধ্রুব তর্জনী উঁচিয়ে তার ছোট দলকে থেমে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলো। তারপর সে পাঁচটি আঙুল উঁচিয়ে অস্ত্র প্রস্তুত রাখার ইঙ্গিত দিলো প্রত্যেককে। তার বিশেষজ্ঞ সৈনিকের কানে তখনো পাতার ক্ষীণ আওয়াজ ধরা পড়েছে।

মনু, ধ্রুব ও তাদের ছয়জন যোদ্ধা তাদের বর্শা, তলোয়ার ও ধনুক তুলে নিয়ে চারজন বৃদ্ধ আলকেমিস্টকে বৃত্তের মাঝে ঘিরে রাখলো। তারা এখন যেকোনো অতর্কিত হামলার জন্য প্রস্তুত। বিন্ধ্য রেঞ্জের ওপারে দূরবর্তী দেশ থেকে আসা একজন বিজ্ঞ আলকেমিস্ট কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস না করে পারলেন না।

'হে পরাক্রমশালী সত্যব্রত, আমরা আগেও বহুবার বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। প্রত্যেকটাই একে অপরের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক। কিন্তু আমি কখনো এমন বিপদের সাক্ষী হইনি। দৈত্যদের নিয়ে বিশেষভাবে উদ্বেগজনক কিছু আছে কি?'

মানু সাড়া দিলো না। কিন্তু তার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ধ্রুব উত্তর দিলো।

'হ্যাঁ, হে জ্ঞানী। দৈত্যরা আমাদের আগে মোকাবেলা করা অন্য যেকোনো শত্রুর তুলনায় একটু বেশিই বিপজ্জনক।'

মানু ধ্রুবর দিকে অসম্মতির দৃষ্টিতে তাকায়। ধ্রুব কেবল তার বন্ধু এবং নেতার দিকে চোখ বুলিয়ে তার বিবৃতিটি সম্পূর্ণ করে।

'দৈত্যরা নরভোজী, হে জ্ঞানী। তারা মানুষখেকো।'

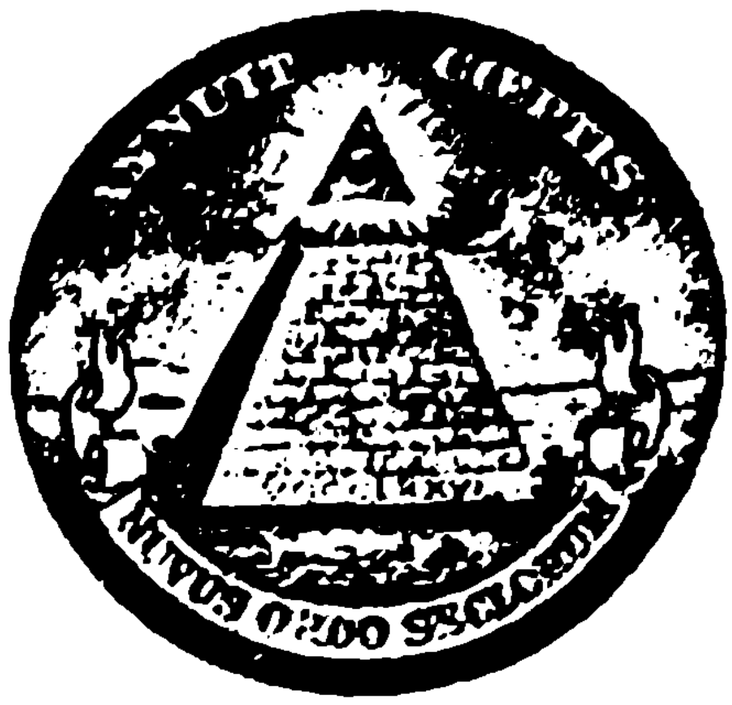

বানারস, ২০১৭
স্বৈরাচারী সরকার

তার প্রপৌত্রের সাথে দ্বারকা শাস্ত্রীর হৃদয়ও কেঁদে উঠলো। কিন্তু তিনি জানতেন এই দিনটা একদিন আসবে। বিদ্যুৎকে কোনো না কোনোভাবে এর সম্মুখীন হতেই হবে।

তার বাবা কার্তিকেয় শাস্ত্রী গাড়ি দুর্ঘটনার মারা গেছেন, এই কথা প্রায় আড়াই দশক বিশ্বাস করার পর দেবতা আজ অবশেষে সত্যটা জানতে পারলো।

আজ সে তার জীবনের কঠিনতম, সবচেয়ে অসহনীয় সত্যের মুখোমুখি হয়েছে।

আমার বাবাকে অতর্কিত আক্রমণ করে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে!

* * * * *

'আমাকে সবকিছু বলুন, বাবা। কোনো কিছু গোপন করবেন না। কোনো সঠিক সময়ের অপেক্ষা নয়...আমাকে সবকিছু জানতে হবে, বাবা।'

বৃদ্ধ জানেন সঠিক সময় এসে গেছে।

'*সবকিছু*, বাবা...' বিদ্যুৎ ইচ্ছা করেই সবকিছু শব্দটির উপর জোর দিয়ে কথা বলছে। 'আমাকে এই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার সম্পর্কে বলুন। রোহিণী নক্ষত্র সম্পর্কে বলুন। নাইটস টেম্পলারদের পতনের পর কী ঘটেছিলো? আমার বাবাকে কেন হত্যা করা হলো? কে তাকে হত্যা করেছে? রুমি পেরেরা এবং ত্রিজাত কাপালিকের মতো দানব কে পাঠাচ্ছে?'

বিদ্যুতের চোখ একবার তার প্রপিতামহ এবং একবার পুরোহিতজির দিকে ঘুরছে। তার উত্তর দরকার। তাও আজই।

'আর বাবা...কালো মন্দিরের রহস্যটা কী?'

* * * * *

'যেমনটা তোমাকে বলেছিলাম, বিদ্যুৎ...বাদশ শতাব্দীতে নাইটস টেম্পলারদের সাথে করা পরিকল্পিত এবং পাশবিক কারসাজি ছিলো নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের প্রথম সাফল্য। টেম্পলারদের উত্থান গতিতে এবং লাগামহীনভাবে ধনসম্পদ ও ক্ষমতার শিখরে উত্থান আর তারপরে একই গতিতে নাটকীয় পতন অর্ডারের অধিপতিদের উৎসাহিত করেছে–যেমনটা আগে কখনো হয়নি। তারা পরিকল্পিতভাবে একটা সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে। নির্বিঘ্নে ব্যাংকিং ও রাজনীতিকে একসাথে মিশিয়ে ফেলেছে। দেশ দখলের সাথে জড়িয়েছে ধর্মকে। পুরোহিতকে করেছে রাজার সঙ্গী। যখন তাদের ইচ্ছা হয়, একটা শক্তিশালী সামরিক বাহিনী সৃষ্টি করে। আবার তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তা ধ্বংসও করে ফেলে।'

মঠাধীশ আবার বলার আগে কিছুক্ষণের জন্য থামলেন।

'কথিত আছে যে ১৩০৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ তারিখ শুক্রবারের সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনে সমস্ত টেম্পলারদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়নি। তাদের কেউ কেউ পালিয়ে যায়, অর্ডার যাদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছে। তাদের পালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অংশে পৌঁছাতে পারে এবং গোপন ভ্রাতৃসংঘের জন্য নতুন শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করতে পারে। অর্ডারের অধিপতিরা এবার অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলো। যদি তারা ফ্রান্স এবং সাইপ্রাসের ভূ-রাজনীতিকে নিজেদের হাতের পুতুল করতে পারে, তাহলে তাদের আরো অঞ্চল, জাতি এবং মহাদেশের নিয়ন্ত্রণ নিতে কে বাধা দেবে?'

বিদ্যুৎ মনোযোগ দিয়ে শুনছে। কিছু একটা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে তাকে বোঝাচ্ছিলো যে এই সবকিছুই কোনো না কোনোভাবে মঠের সাথে, তার প্রয়াত বাবার সাথে, রুমি এবং ত্রিজাতের সাথে এবং তার নিজের সাথে জড়িত।

সেই সাথে জড়িত হরপ্পার সাথে।

* * * * *

যখন সে অর্ডারের নাইটস টেম্পলারদের সাথে করা কারসাজি সম্পর্কে জানছিলো, বিদ্যুৎ তখনো বুঝতে পারেনি তারা আসলে শেষ পর্যন্ত কী অর্জন করতে চাইছে।

'বাবা, এই অর্ডার আসলে কী চায়? রাজনীতি, জাতি ও ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা বোধগম্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী?'

গভীর এক শ্বাস নিয়ে দ্বারকা শাস্ত্রী দীর্ঘ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন।

'তুমি জানো যে এই সবই শুরু হয়েছে নিসিয়ায়, পরাক্রমশালী সম্রাট কন্সট্যান্টাইনের এক-বৈশ্বিক সরকার প্রতিষ্ঠার ইচ্ছার সাথে। শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সমাজ ও ব্যক্তির জন্য এ এক নতুন নিয়ম। এ এক স্বৈরাচারী সরকার, যা ধর্মীয় গোঁড়ামি, অর্থনৈতিক সুরক্ষাবাদ, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, এমনকি দেশপ্রেমের

বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তিকে অতিক্রম করবে। তার যুক্তি, তা আজ যতই উদ্ভট শোনাক, তাত্ত্বিকভাবে সঠিক এবং উদ্দেশ্যমূলক ছিলো। কিন্তু এটা ব্যর্থ হওয়ার ছিলো প্রথম দিনেই। বৈচিত্র্যই মানব জাতিকে এই গ্রহের সর্বোচ্চ প্রজাতিতে পরিণত করে। বৈচিত্র্যই সংস্কৃতির, উচ্চাকাঙ্ক্ষার, শিল্প-সাহিত্যের, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির, অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষার এবং আরো অনেক কিছুর জন্মদাতা। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর এই সমৃদ্ধ ভান্ডার না থাকলে আমরা তেড়ার বিশাল পাল ছাড়া আর কিছুই হতাম না। যদি আজ বিশ্বে বানারসের ঘাটের পাশাপাশি একটা সিস্টিন চ্যাপেল থাকে, যদি আমাদের একটা ক্রমবর্ধমান ক্রীড়া শিল্পের পাশাপাশি একটা বিশ্বব্যাপী ফ্যাশন ইকোসিস্টেম সমৃদ্ধ হয়, যদি ইচ্ছামৃত্যু এবং গর্ভপাত নিয়ে স্বাস্থ্যকর বিতর্ক হয়, তবে এসবের পেছনে একটাই কারণ: আমরা মানুষরা একে অপরের থেকে ভিন্ন।

'সুতরাং, অন্য কথায় বললে, কলট্যান্টাইনের পরিকল্পনা ছিলো মৌলিকভাবে প্রকৃতির প্রাথমিক বাস্তবতা, মানে বিবর্তনের বিরুদ্ধে। তিনি মানব জাতিকে একটা পালে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় ভুল হলো যে তিনি একটা অত্যন্ত শক্তিশালী শক্তিকে উপেক্ষা করেছেন। মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।'

* * * * *

'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এবং তাদের অবিশ্বাস্যভাবে ঘৃণ্য নকশা সম্পর্কে তোমাকে আরো কিছু বলার আগে একটা শেষ জিনিস রয়েছে যা আমি চাই তুমি খুব ভালো করে বুঝে নাও, বিদ্যুৎ। তুমি কি জানো টেম্পলারদের পুরো রক্তাক্ত অধ্যায় থেকে তাদের সবচেয়ে মূল্যবান অর্জন কী ছিলো? এমন কিছু যা তাদের একটা অপ্রতিরোধ্য বৈশ্বিক শক্তিতে পরিণত করেছে।'

'কী, বাবা?' বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করলো।

দ্বারকা শাস্ত্রী উত্তর দিলেন, 'এমন কিছু যা মানবতার ভাগ্যকে চিরকালের জন্য অর্ডারের গোড়ালির নিচে ফেলে দিয়েছে, সেই সাথে যুদ্ধ, স্বৈরশাসক, গণহত্যা এবং অমানবিক নৃশংসতার পথ প্রশস্ত করেছে।

'তারা শিখেছে যে যুদ্ধ সাজানো হতে পারে। শিখেছে যে তারা চাইলে উভয় পক্ষের হয়েই যুদ্ধ করতে পারে। আর এই ভয়ংকর, নির্দয় কৌশল বিশ্বকে ধ্বংস করে দিচ্ছে...বারবার।'

আর্যাবর্তের অন্ধকার বন, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৯ অব্দ

ধ্রুব

তীরটি তেড়ে আসতে থাকা দৈত্যের কপালে ভ্রুর ঠিক মাঝখানে আঘাত করেছে। তীরের গতি আক্রমণকারী নরখাদক দৈত্যকে কয়েক পা পেছনে নিয়ে ফেললো। চিৎকার করে উঁচু গাছের ডাল থেকে পড়ে গেল আরো দুটি দৈত্য; কারণ দুটি ভয়ংকর তীর একই সাথে তাদের ভেদ করে চলে গেছে।

ধ্রুব নিঃসন্দেহে আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। তার তীর-ধনুক তার কাছে নিজের শরীরের একটা অংশের মতোই ছিলো।

* * * * *

মানু দৈত্যের বুকে লাথি মারলো। সেই লাথি গড়িয়ে আসা পাথরের মতো আঘাত করলো দানবটাকে। একই গতিতে সূর্যপূত্র আরেক আক্রমণকারীর শিরশ্ছেদ করেছে, যেটা একজন আলকেমিস্টের বিপজ্জনকভাবে খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলো। দৈত্যের মস্তকবিহীন শরীর থেকে তীব্র বেগে ছিটকে এলো রক্ত। সত্যব্রতের মুখ, চুল এবং কাঁধ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে সেই রক্ত। এর ফলে তাকে খুব ভয়ংকর দেখাচ্ছে এখন। এত দিনে মানু রক্তে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। চামড়ার তৈরি কবজি-রক্ষক দিয়ে মুখ মুছে যুদ্ধ চালিয়ে গেল সে।

যুদ্ধের অবস্থা দেখার জন্য পেছনে ফিরতেই মানু দেখলো, দৈত্যদের একটা তীরন্দাজ ধ্রুবকে লক্ষ্য করে নিজের ধনুক তুলেছে। এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে এবং অত্যাশ্চর্য সূক্ষ্মতার সাথে সত্যব্রত মানু তার মোটা তরবারির হাতলটা দুই হাতে ধরে পিঠের পেছনে নিলো এবং একটা শক্তিশালী ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মতো নিজের তরবারি ছুঁড়ে মারলো। শক্তিশালী তলোয়ারটা নরখাদক তীরন্দাজের বুক ভেদ করে একটা পুরু গাছের কাণ্ডের সাথে আটকে ফেললো তাকে।

ধ্রুব এটা খেয়াল করে তার জীবন বাঁচানোর জন্য মানুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নাড়লো। যোদ্ধা-রাজপুত্রও মাথা নাড়লো তার সবচেয়ে কাছের বন্ধুর দিকে তাকিয়ে।

সত্যটা হলো, মানু এবং ধ্রুবর সাহসী জুটি একসাথে একটা সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে পারে।

* * * * *

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শেষ হতে কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগেনি। মানু এবং ধ্রুব সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ফলাফল জরিপ করলো, আর ফলাফলে তারা সন্তুষ্টই হলো। তাদের একজন মানুষেরও কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু আশেপাশে প্রায় এক ডজন দৈত্য মরে পড়ে আছে। তাদের নিচের মাটি, আশেপাশের গাছপালা–সবকিছু দৈত্যদের রক্তে লাল হয়ে গেছে।

'এটা খুব সম্ভবত প্রথম ধাপ ছিলো, ধ্রুব। আমাদের দ্রুত আলকেমিস্টদের এখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে,' মানু বললো। সে ঘন পাতার আড়ালে ঘোরাফেরা করা আক্রমণকারীদের দিকে নজর রাখছে।

ধ্রুব সম্মতিতে মাথা নাড়লো এবং দলকে জঙ্গল থেকে বের করার নেতৃত্ব দেওয়ার সময় ধনুকে একটা তীর প্রস্তুত করলো।

মানু যা জানতো না তা হলো, এই আক্রমণ ছিলো একটা অনুসন্ধানী মিশন।

নরখাদকদের এত সহজে মেরে ফেলা যায় না।

সত্যব্রত মানু, ধ্রুব, আলকেমিস্ট এবং তাদের যোদ্ধারা অন্ধকার বনের সীমানা ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু উঁচু গাছের মধ্যে লুকোনো মাচান থেকে যে নিষ্ঠুর কালো চোখ তাদের দেখছে, সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না।

সে তাদের দেখছে।

এবং এখন শক্তিশালী নরমুন্ডা তাদের যুদ্ধের ধরন, তাদের শক্তি এবং তাদের দুর্বলতাগুলো খুব স্পষ্টভাবে জানে।

সূর্যপুত্রকে নিজের জন্য চিহ্নিত করলো সে।

সেই সাথে মানুর স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড কাঁচা খাওয়ার শপথ নিলো।

বানারস, ২০১৭
কেদারনাথ

'আমি ভালো আছি, গুরুদেব,' ন্যায়না বললো। 'হ্যাঁ...সে ভালো আছে। আমাদের দেবতা ভালো আছে।'

সে তার মোবাইল ফোনে কথা বলছে এবং দেব-রাক্ষস মঠের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সহজ যন্ত্রটি তার অবিরাম সঙ্গী হওয়ার আগে সে একটা ইরিডিয়াম ৯৫৫৫ স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করতো। বিদ্যুৎ বানারসে আসার আগে সে যে দুর্গম পাহাড়ে ছিলো, সেখানে অন্য কোনো যন্ত্র কাজ করে না। এবং এখন লাইনের অপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তিটিও একটা অনুরূপ, উন্নত স্যাট-ফোন ব্যবহার করছেন। কারণ তিনি যোগাযোগ নেটওয়ার্কের অন্য সব মাধ্যমের নাগালের বাইরে ছিলেন।

সে উত্তর হিমালয়ের উঁচু পাহাড়ের এক রহস্যময় সাধু মহন্ত ভবাণীশঙ্করের সাথে কথা বলছে, যার আশ্রম মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থিত।

বৃদ্ধ মহন্ত (প্রধান পুরোহিত) হলেন শেষ কালো মন্দিরের অভিভাবক।

তিনি উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগের কেদারনাথ মন্দিরের মহাযাজক।

* * * * *

কেদারনাথ মন্দিরটি ভগবান শিবের পরম শ্রদ্ধেয় বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটা। এই বারোটি পবিত্র উপাসনালয় শিবের ঐশ্বরিক আলোর প্রতীক এবং শত শত বছর ধরে হিন্দুদের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবে উপাসনা করা হচ্ছে।

কেদারনাথের মন্দিরটি মূলত ভগবান শিবকে সন্তুষ্ট করা এবং মহাভারতের যুদ্ধে হওয়া রক্তপাতের জন্য তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য হস্তিনাপুরের পাঁচজন বীর ও ধার্মিক ভাই পাণ্ডবরা তৈরি করেছেন বলে মনে করা হয়। শত শত বছর অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে পবিত্র এই অভয়ারণ্য লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর জন্য একটা পবিত্র আকর্ষণ হয়ে উঠেছে।

২০১৩ সালে উত্তরাখণ্ডের আকস্মিক বন্যার সময় যখন পার্বত্য রাজ্যের বিশাল অংশ পানির নিচে তলিয়ে যায়, মন্দিরটি তখন অলৌকিকভাবে অক্ষত থেকে যায়। বলা হয়ে থাকে যে বিশাল একটা পাথর মন্দাকিনীর স্ফীত স্রোতের আক্রমণকে সরিয়ে দিয়ে মন্দিরটিকে রক্ষা করে। তাই মন্দিরটি আজও তার আসল জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

কীভাবে এই অলৌকিক ঘটনা ঘটলো? বন্যার আক্রমণে চারপাশের সবকিছু ভেঙে পড়লেও কীভাবে মন্দিরটি অক্ষত ছিলো?

কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না।

সম্ভবত কোনো অজানা ঐশ্বরিক শক্তি এই মহামূল্যবান এলাকা পাহারা দিচ্ছিলো। সম্ভবত মন্দিরের হৃদয়ে এমন অমূল্য কিছু লুকিয়ে আছে যে মন্দাকিনীকেও মানতে হয়েছে, ভয়ংকর অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও।

যতই হোক, কেদারনাথই ছিলো শেষ কালো মন্দির।

তাই নয় কি?

* * * * *

'এটা আমাদের কাছেই আছে, গুরুদেব। দূরে লুকোনো আছে। বাবা নিজে সুরক্ষিত করে রেখেছেন। আর আমরা সবাই রোহিণী নক্ষত্রের জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি। কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারি না যে বিদ্যুৎ কীভাবে তিন হাজার বছর আগের একটা গোপন রহস্য উন্মোচন করবে। আমরা কি তার কাছ থেকে খুব বেশি আশা করছি না?'

মহন্ত ভবাণীশঙ্কর আনন্দে হাসলেন। যে কারণে তিনি তার পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন তা কিছু দিনের মধ্যে ফল দিতে চলেছে। আর তিনি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন, ন্যায়নার মতো সন্দিহান নন।

'দেখো, যেমনটা বলা হয়েছে সবকিছু ঠিক সেভাবেই একত্র হচ্ছে। বিদ্যুৎ কাশীতে এসেছে, ঠিক যখন গ্রহগুলো পবিত্র নক্ষত্রের জন্য নিজেদেরকে একত্র করতে চলেছে। অশুভ শক্তি ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে এবং লুসিফার নিজেই চূড়ান্ত যুদ্ধ করতে এসেছে। মহান দ্বারকা শাস্ত্রী তার মার্কেশ কালাম (মৃত্যুর সময়)-এর

বাইরে বেঁচে আছেন এবং নীচ মহাতান্ত্রিক তার নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠানে ছাইয়ের মতো পড়ে আছে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, ন্যায়না...সবই ঘটছে যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেভাবে?'

সাদা দাড়িওয়ালা মহন্ত আবার হেসে উঠলেন, ফোনটা পাশে রেখে পাহাড়ের স্রোতের ঠান্ডা জল ছিটিয়ে দিলেন মুখে। তার ভক্তিপূর্ণ হাসি তাকে ঘিরে থাকা তুষারঢাকা পাহাড় জুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ন্যায়নাও স্বস্তির হাসি দিলো। সে জানতো যে মহন্ত ঠিক বলেছেন।

সবকিছু যেভাবে অনুমান করা হয়েছে ঠিক সেভাবেই উন্মোচিত হচ্ছে। সে তার দুটো আঙুল ক্রসের মতো করে ফিসফিস করে প্রার্থনা করলো।

যাই হোক, সে নিজের মধ্যে যে আশা ও স্বস্তি অনুভব করছে, সেটা ছাড়াও মহন্তের একটা কথা ন্যায়নার মাথায় ঘুরছে। একটা নাম সে বুঝতে পারেনি।

লুসিফার।

* * * * *

'গুরুদেব, লুসিফার নিজেই এসেছেন বলে আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন তা আমি বুঝতে পারিনি। লুসিফার কে, গুরুদেব?'

এই নাম শোনার পর প্রথমবারের মতো ভবাণীশঙ্কর গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'তোমাকে সবকিছু বোঝানোর মতো যথেষ্ট সময় এখন আমার হাতে নেই, ন্যায়না। শুধু মনে রাখবে যে ভালোর সবচেয়ে বড় শক্তিকে থামাতে মন্দের সবচেয়ে বড় শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবে।'

ন্যায়না শুনছে, কিন্তু মহন্ত কী বলতে চাইছেন তা বুঝতে করতে পারলো না।

'সাবধান হও, ন্যায়না...আর মহান মঠাধীশকে জানাও। তাকে বলো শয়তান এখন কাশীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

দেখে মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবীকে একটা প্রকাণ্ড ব্রাশ দিয়ে ধূসর রং করা হয়েছে।

মানু এবং ধ্রুব যখন তাদের বিশাল বেসক্যাম্পের কেন্দ্রীয় গলি দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন ছাই রঙের দেখাচ্ছিলো সবকিছু। ঢালু মাঠ, অস্থায়ী তাঁবু আর সেখানকার লোকজনের ছেঁড়া জামাকাপড়, পশুপাখি, দূরের পাহাড়, আকাশ...প্রতিটা কণিকা যেন এক বিষাদময় ধূসর রঙে ছেয়ে গেছে।

এ ছিলো দিনের শেষ সময়ের দৃশ্য। রাতগুলো ছিলো ভয়ংকর। লাল ও কালো আকাশ বজ্রের ভাষায় চিৎকার করে মৃত্যুর ঘোষণা দিচ্ছিলো। লক্ষ লক্ষ পুরুষ, মহিলা ও শিশু তাদের শিবিরের দুর্বল সুরক্ষায় এই রাতগুলো কাঁপতে কাঁপতে কাটিয়েছে। এক ঘণ্টার ঘুম হাজার ঘোড়ার চেয়েও মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

মানু নিজের চারপাশে তাঁবুর বিস্তীর্ণ, দুর্বিষহ শহরের দিকে তাকালো যা চারদিকে মাইলকে মাইল ধরে ছড়িয়ে আছে। সে যা দেখতে পেল তা হলো, হাজার হাজার মানুষ আর একটা দিন বাঁচার জন্য প্রতিটা মুহূর্ত প্রাণপণ লড়াই করছে। সে যা শুনতে পাচ্ছিলো তা হলো শিশুদের অবিরাম হাহাকার, আহত, রোগাক্রান্তদের অসহ্য কান্না, ভীত জন্তুর আর্তনাদ–সবই মিশে যায় অবিরাম প্রবাহিত বাতাসের তীব্র শিসের সাথে।

কয়েক মাস ধরে বৃষ্টি থামেনি। সবকিছু পানিতে ডুবে ছিলো। বেঁচে থাকা হতভাগ্যরা হয়তো তাদের সবথেকে খারাপ দুঃস্বপ্নেও এমনটা কল্পনা করেনি। প্রতিদিন মৃতের সংখ্যা বাড়ছিলো। তাদের দেহ প্রকৃতির এই অবিরাম আক্রমণের সাথে মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে।

* * * * *

ধ্রুব তার বন্ধু ও নেতার মুখে হতাশা দেখতে পেল।

মানুর এই শৈশব সহচর একটা জিনিস ভালো করেই জানে; যদি কেউ মহাপ্রলয়ের এই বিধ্বংসী ঢেউ ভেদ করে তাদের সবাইকে প্রলয়ের ওপারে নিয়ে যেতে পারে, সে হলো একমাত্র সত্যব্রত মানু। সে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে মানুই একমাত্র মানুষ যে মহাপ্লাবন এবং মানব জাতির নিশ্চিত বিলুপ্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

স্বয়ং ধ্রুব এই শেষ আশার রশ্মিকে কখনই ম্লান হতে না দেওয়ার গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। সে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারে মানুকে প্রতিদিন কী পরিমাণ চাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই হাজার হাজার মানুষের জীবনের জন্য দায়ী হওয়ার বোঝা কতটা অসহনীয় হতে পারে, বিশেষ করে এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, ধ্রুব তা অনুধাবন করতে পারছে। সে তার দিনের বেশিরভাগ সময় সূর্যপুত্রের সাথেই কাটাতো এবং নিজের উদ্বেগ ও ভয়গুলো গোপন রাখতো। জানতো যে এই ধরনের ধ্বংসের মুখে মানু তার নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে এখনো অনিশ্চিত–বিশেষ করে তার পথপ্রদর্শনের জন্য যখন মৎস্য উপস্থিত নেই।

এরপরেও, ধ্রুব গত কয়েক মাসে মানুর চমকপ্রদ নেতৃত্বে সবচেয়ে দুর্দান্ত উদ্ধারকার্য ও স্থানান্তরণ অভিযান প্রত্যক্ষ করেছে।

সূর্যের ছেলে শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম মানুষজনকে তাদের বাড়ি থেকে বের করে এনেছে। এই ক্ষেত্রে প্রলয়ের সতর্কবার্তার চেয়েও বেশি ভূমিকা রেখেছে তার ব্যক্তিত্ব। সে মানুকে মানুষদের বাঁচানোর জন্য ঝড়ের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং বেশ কয়েকবার নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলতে দেখেছে। প্রতিবারই মানুষদের উদ্ধার করে বেঁচে ফিরেছে মানু, সেই সাথে বেড়েছে তার মর্যাদা।

ধ্রুবও তার নেতার পাশাপাশি ঝড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই মহান ব্যক্তির উপর তার সন্দেহাতীত বিশ্বাস আছে।

সে কখনো মানুকে হাল ছাড়তে দেয়নি।

* * * * *

'তুমি কী নিয়ে চিন্তিত, মানু?'

মানু সাড়া দিলো না। ধ্রুবর দিকেও ফিরলো না। সে চলতে থাকলো, তার ঘোড়া লক্ষ্যহীনভাবে বেসক্যাম্পের সরু গলিতে ঘুরছে। ধ্রুব তার নেতাকে অনুসরণ করলো।

বিস্তীর্ণ জনবসতি পরিদর্শন করার কয়েক মিনিট পর মানু কথা বললো।

'তোমার কি মনে হয় আমরা মহাপ্রলয় থেকে রক্ষা পাবো, ধ্রুব? এই মানুষগুলোর দিকে একবার তাকাও। যতই দিন যাচ্ছে, ততই তারা দুর্বল হয়ে পড়ছে। এদের চোখে থাকা আশাও একটু একটু করে কমে যাচ্ছে। তাদের পেট খালি, চামড়া কুঁচকে গেছে, শরীরের হাড়গুলো বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর কত দিন ওরা টিকে থাকতে পারবে বলে মনে হয়?'

'যত দিন ওরা তোমাকে দেখতে পাবে, মানু,' ধ্রুব বললো। 'তুমি এই লাখ লাখ মানুষের আশার আলো। প্রলয় যখন তাদের শহর ও ঘরে আঘাত হানে, তখন তাদের অধিকাংশই মারা যেত। আজ তাদের প্রত্যেকেই বেঁচে আছে, শ্বাস নিচ্ছে এবং মানব জাতির জন্য একটি নতুন ভোরের সূচনা করার উদ্দেশ্যে লড়াই করছে–শুধু তোমার কারণে। এরা সকলেই বিশ্বাস করে যে তুমি তাদের একবার রক্ষা করেছ, আর সব সময়ই তাই করবে। তোমার প্রতি তাদের বিশ্বাস আছে, মানু। শুধু তোমার প্রতি।'

মানু তার ঘোড়া থামিয়ে ধ্রুবর দিকে ফিরলো। তার মুখে বিরক্তির পাশাপাশি অসহায়ত্বও দেখা যাচ্ছে।

'ওরা যা ভাবছে আমি তা নই, ধ্রুব! তুমি আমাকে ছোট থেকেই চেনো। আমি বাকি সবার মতোই একজন সাধারণ মানুষ, যে মৎস্যের অভিনবত্বে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। আমি এমনকি এটাও জানি না জাহাজটা সময়মতো নির্মিত হবে কি না। আমি জানি না এত বিশাল, ভারী কিছু সত্যিই এই প্রলয়ংকরী বন্যা সহ্য করতে পারবে কি না। মহাতরীটা অতিকায় পাথরের মতো ডুবে যেতে পারে, সমস্ত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। আসলেই, মৎস্য হলেন একজন সুদর্শন জাদুকর। বাকপটু আর অভিব্যক্তিপূর্ণ একজন ব্যক্তি। তিনি যা বলেছেন আমি তা নই। আমি অযোগ্য, ধ্রুব!'

ধ্রুব অবিশ্বাস নিয়ে তার নেতার চোখের দিকে তাকালো। সে জানতো যে রাজা মানুর উচ্চ মর্যাদা পাশে রেখে একজন সত্যিকারের বন্ধুর মতো কথা বলার সময় এসেছে।

'তুমি এইমাত্র যা বলেছ তার কিছুই তুমি মন থেকে বিশ্বাস করো না, সত্যব্রত মানু। আমি তোমার এবং তারার কাছ থেকে যে বর্ণনা শুনেছি, মৎস্য আসলেই ঐশ্বরিক। তুমি তাকে বর্ণনাতীত ভালোবাসো, তাই তোমার পাশে না থাকায় তার প্রতি তোমার প্রচুর অভিমান হয়েছে। আর তুমি জানো তুমি সাধারণ নও, মানু। বিভাসন পূজারির রক্ত কীভাবে সাধারণ হতে পারে? মানব জাতির এই শেষ উপনিবেশ শুধু তোমার কারণেই টিকে আছে। নারী-পুরুষের এই সাগর আজও টিকে আছে কেবল তোমার জন্য। তোমার কারণেই দৈত্যরা তাদের টুকরো

টুকরো করে জীবন্ত খেয়ে ফেলছে না। পৃথিবীতে যদি এমন কেউ থাকে যার জন্য আমি আমার জীবন বাজি ধরতে পারি, এমন কেউ যার ক্ষমতা এবং গুণ আছে মহাপ্লাবনকে পরাজিত করার, সে একমাত্র তুমি, বন্ধু। সত্যব্রত মানু!'

ধ্রুব প্রায় চিৎকার উঠলো। যে তীব্রতায় কথাগুলো বলছে, তাতে তার গলার শিরাগুলো ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো।

তবে তার কথাগুলো কাজে দিয়েছে।

ক্লান্ত, স্নেহময় হাসি দেওয়ার আগে মানু তার গম্ভীর মুখ বজায় রাখার চেষ্টা করলো। এইমাত্র ধ্রুব যেই শক্তি, বিশ্বাস এবং সাহস দিলো, তা তার প্রয়োজন ছিলো।

সত্যব্রত তার প্রিয় বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হলো নিজের ছোট তাঁবুর দিকে।

চলে যাওয়ার সময় মানু পেছনে তাকিয়ে ধ্রুবকে ডাকলো।

'একটু বিশ্রাম নাও, হে শক্তিশালী তীরন্দাজ। আগামী কাল আমরা মহান জাহাজে চড়বো।'

'মানুর জাহাজে!' ধ্রুব হাসতে হাসতে জবাব দিলো। লজ্জায় মাথা নেড়ে সরে গেল মানু।

বানারস, ২০১৭
স্বৈরাচারী সরকার—দ্বিতীয় অংশ

তারা একটা ছোট আচারের আগুনের চারপাশে বসে ছিলো, যেটা পূজা শেষ হওয়ার পরে ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে। দ্বারকা শাস্ত্রী তার সন্ধ্যার পূজার জন্য বিরতি নিয়েছিলেন।

'যেমনটা আমি তোমাকে আগে বুঝিয়েছি, বিদ্যুৎ, এই ডার্ক অর্ডার বেশ কয়েকবার তাদের নাম ও গঠন পরিবর্তন করেছে। একে কোনো একক সংস্থা ভেবে ভুল কোরো না। এটা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা গোপন সমাজ, সংগঠিত প্রতিষ্ঠান এবং শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের একটা জটিল ম্যাট্রিক্স। এদের উদ্দেশ্য শুধু রাজনৈতিক নয়। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার একটা শতাব্দী পুরোনো নেটওয়ার্ক যেটা পুরো বিশ্বের মানুষের ভাগ্য একটা নির্দিষ্ট দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তারা একা কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নিয়ে কাজ করে না। তারা বিশ্ব অর্থনীতি, ধর্ম, সামরিক কর্ম, গৃহযুদ্ধ, সামাজিক বক্তৃতা, মিডিয়া এবং অবশ্যই রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। তারা নাইটস টেম্পলারদের দিয়ে রাজা, পুরোহিত, যোদ্ধা, স্বর্ণ এবং ভূগোলের যে জটিল গোলকধাঁধা তৈরি করেছে তা ধীরে ধীরে আরো জটিল ও নাগালের বাইরে চলে গেছে। কেউ কিছু জানার আগেই পৃথিবীকে যুদ্ধ-অর্থনীতি হিসেবে চালানো হচ্ছে।

'বাবা, যুদ্ধ-অর্থনীতি বলতে কী বোঝায়?' বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি কি কিছু লক্ষ করেছ, বিদ্যুৎ...আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ হোক বা ফরাসি বিপ্লব, রাশিয়ার জার বলশেভিক যুদ্ধ হোক বা বিশ্বযুদ্ধ, শীতল যুদ্ধ হোক বা মধ্যপ্রাচ্য, কাশ্মীর বা চেচনিয়া—এত কিছুর পরেও বিশ্ব কি এক দিনের জন্যেও যুদ্ধ ও রক্তপাতমুক্ত হতে পেরেছে?'

দেবতা গভীর চিন্তায় মগ্ন। মহান মঠাধীশ ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এটা এত সহজ হতে পারে না।

'ঠিক বলেছেন, বাবা। কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে আমরা মানুষ বা আমাদের প্রজাতি হোমো স্যাপিয়েন্সের নিজেদের ধ্বংস করার একটা অসাধারণ প্রতিভা আছে বলেই এমনটা হয়েছে? গোষ্ঠী, উপজাতি বা রাষ্ট্র গঠন করা এবং তারপরে এই পরিচয় রক্ষার জন্য লড়াই করা কি মানব বিবর্তনের একটা অপরিহার্য উপাদান নয়?'

দ্বারকা শাস্ত্রী সাড়া দেওয়ার আগেই পুরোহিতজি কথা বললেন।

'আমরা এর কারণ এবং প্রভাব কী সে সম্পর্কে সত্যিই কি নিশ্চিত হতে পারি, বিদ্যুৎ? তুমি আমাদের মানুষ সম্পর্কে যা বললে তা আমরা নিজেদের উপর যে ক্রমাগত সহিংসতা চালাই তার পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু আমরা কি শুধু জিনগত ও জৈবিকভাবে রক্তপাতের প্রতি আকর্ষণের কারণে লড়াই করি? নাকি আমরা এটা মেনে নিয়েছি যে আমরা হিংস্র কারণ কেউ বা কিছু একটা আমাদের কখনো শান্তিতে থাকতে দেয়নি? উদাহরণস্বরূপ, ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণই দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতি চায়। চারটা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, অসংখ্য লোক প্রাণ হারিয়েছে। দুই দেশেরই উচিত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানে বিনিয়োগ করা। কিন্তু তারা উভয়ে পারমাণবিক অস্ত্র ও ফাইটার বিমান কেনার জন্য হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ করতে ব্যস্ত। কয়েক দশক ধরে যেখানে সাধারণ ভারতীয় বা পাকিস্তানিরা শান্তি চেয়ে যাচ্ছে, তোমার কি মনে হয়, কী সেই শান্তিকে বারবার আটকে দিচ্ছে?'

'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার,' বিদ্যুৎ কথা শেষ করলো।

* * * * *

'ঠিক আছে, বাবা, এখন আমি বিস্তারিতভাবে বুঝতে পারি যে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের গঠন কী, এবং এটা কিছু অসাধারণ শক্তিশালী লোক দ্বারা পরিচালিত হয় যারা আরো ক্ষমতার জন্য তৃষ্ণার্ত। কিন্তু এত ষড়যন্ত্র, প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তারা ঠিক কী অর্জন করতে চায় সে বিষয়ে আমি এখনো স্পষ্ট নই।'

'তাদের লক্ষ্যগুলো যেমন সহজ তেমনি তারা সাহসী, এবং সম্ভবত তারা সাধারণ মানুষের বোঝার ক্ষমতার বাইরে। এখানে তারা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এক-বৈশ্বিক অর্থনীতি। এক-বৈশ্বিক ধর্ম। এক-বৈশ্বিক সেনাবাহিনী। এক-বৈশ্বিক সমাজ। এবং এক-বৈশ্বিক সরকার...'

'...তাদের নিজেদের তথাকথিত ভ্রাতৃসংঘের হাতে পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত করেছে,' বিদ্যুৎ তার প্রপিতামহের বাক্য শেষ করে বললো। বিদ্যুৎ এসব শুনে অবাক হয়ে গেছে। সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে এমন অশুভ কিছু পুরো পৃথিবীকে বিশাল একটা অন্ধকার ছায়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঢেকে রেখেছে এবং তারপরেও সাতশো কোটি মানুষ এর সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ।

দ্বারকা শাস্ত্রী কথা চালিয়ে গেলেন।

'যেমনটা আমি তোমাকে আগেই বলেছি, প্রথমবার একজন বিশ্বনেতা প্রকাশ্যে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নামটি ঘোষণা করেছেন ১৯২১ সালে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন জনসমক্ষে এটা ব্যবহার করেছেন তখন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নবগঠিত লিগ অব নেশনস-এর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তখনই আমরা, কালো মন্দিরের অভিভাবকরা, জানতাম যে অর্ডার একটা বিপজ্জনক অংশ অর্জন করে ফেলেছে এবং বিশ্বমঞ্চে তাদের ভয়ংকর চেহারা উন্মুক্ত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তারপরে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি বিভিন্ন পাবলিক প্ল্যাটফর্ম এবং মিডিয়া থেকে একটা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করে। এই ব্যক্তিদের তালিকায় উন্নত দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী এবং প্রভাবশালীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এটা কি কাকতালীয় যে একই শব্দ, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার, ১৯২১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় একশো বছর ধরে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে? একটা বীজ বপন করা হচ্ছে, বিদ্যুৎ। যেন একটা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের প্রয়োজনীয়তা কৃত্রিমভাবে জনগণের মনে সৃষ্টি করা হচ্ছে।'

* * * * *

'বাবা, আগে আপনি উল্লেখ করেছেন যে অর্ডারের সবচেয়ে শক্তিশালী পদ্ধতি ছিলো যে এটা উভয় প্রান্ত থেকেই যুদ্ধ করেছে। এর দ্বারা আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন? তারা কোনো যুদ্ধ দুই দিক থেকেই নিয়ন্ত্রণ করেছে?'

'তুমি এই প্রশ্নটি করায় আমি খুশি হয়েছি। কারণ এর উত্তর অর্ডারের ইতিহাসকে ঘিরে থাকা রহস্য এবং সন্ত্রাসের অসংখ্য জট খুলে দেবে। আর তুমি তোমার সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্নেও এই গোপন ভ্রাতৃসংঘের প্রভাব যে কত বেশি তা কল্পনা করতে পারবে না। একবার আসল সত্যটা জানতে পারলে এই পৃথিবীকে কখনোই আর তোমার একরকম মনে হবে না।'

বিদ্যুৎ যা শুনেছে এবং পার করেছে, এতে সে নিশ্চিত যে আর কোনো কিছুই তাকে অবাক করতে পারবে না।

কিন্তু ওর ধারণা ভুল ছিলো।

'আমাকে দয়া করে বলুন, বাবা। আমি জানতে চাই একদল দৃঢ়সংকল্পিত এবং নিষ্ঠুর মানুষ আমাদের অতীত এবং বর্তমানের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। সর্বোপরি, একটা গোপন ভ্রাতৃসংঘ ইতিহাসের গতিপথকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে?'

মঠাধীশ হাসলেন। তিনি বিদ্যুৎকে এমন প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন যা তার প্রপৌত্র কখনো কল্পনাতেও ভাবতে পারেনি।

'তোমার মতে ফরাসি বিপ্লবের পেছনে কে ছিলো, বিদ্যুৎ? আর সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন? কিংবা নাইন ইলেভেনের দুর্ঘটনা?'

আর্যাবর্তের জলাভূমি, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৯ অব্দ

জাহাজ

বিশাল সমভূমির দিকে যাত্রা করছে ওরা। বৃষ্টির কোঁটাগুলো তাদের মুখে চাবুকের মতো আঘাত করছে। সমতলভূমির কেন্দ্রস্থলে থাকা বিস্তীর্ণ এক উচ্চভূমিকে বেছে নেওয়া হয়েছে মানব জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যোগের নির্মাণস্থল হিসেবে।

ধ্রুব কাফেলাগুলোকে প্রবল ঝড়ের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনুর্বর জলাভূমি আর দূরের পাহাড় ছাড়া মাইলের পর মাইল কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অনবরত বর্ষণের কারণে কোনো কিছুই হতে পারেনি। আর্যাবর্তের অন্ধকার বন ছাড়া বাকি সব গাছপালা প্রলয়ের পানিতে ভেসে গেছে। এই দলকে দেখে মনে হচ্ছে তারা ভিন্ন কোনো গ্রহে এসেছে, যেখানে প্রাণের কোনো অস্তিত্বই নেই।

ওরা এবং যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত বিশজন যুবতী নারী ধ্রুবকে অনুসরণ করছে। এই ভয়ংকর এবং কার্যকরী শক্তির প্রতি তার গভীর প্রশংসার কারণে মানু এই নারী শাখার নামকরণ করেছে দামিনী-সেনা বা বজ্রবাহিনী।

দামিনী-সেনা মানুর ঝকঝকে সূর্যের ব্যানারের নিচে থাকা সেরা যোদ্ধা-দলের চেয়ে কম শক্তিশালী নয়।

সেই দিন থেকে তিন হাজার সাতশো বছর পর যে তার প্রিয় প্রয়াত মা সানজানার পুনর্জন্ম হবে এবং দামিনীর নাম ধারণ করবে, সে বিষয়ে মানুর কোনো ধারণাই ছিলো না।

* * * * *

মানু নিজেই সেই বিশাল ঘোড়ার গাড়ির পেছনে চড়েছে যেগুলো সাইটের কর্মীদের জন্য খাদ্য সামগ্রীতে বোঝাই ছিলো। দুশো গাড়ি। আর কাফেলাটা ছিলো

তুলনামূলক ছোট। নির্মাণ সাইটের জন্য সরবরাহ লাইন চব্বিশ ঘণ্টা খোলা ছিলো। হাজার হাজার মেহনতি নর-নারীকে খাওয়াতে হতো, কাপড় আর কাঁচামালের যোগান দিতে হতো। দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্ধ-যোজন কাফেলাটি এক হাজার সশস্ত্র অশ্বারোহী বাহিনীর প্রহরায় তার গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গত কয়েক সপ্তাহ এবং মাসে বেশ কয়েকটা সরবরাহ কাফেলার উপর পাহাড়ি-যুদ্ধবাজ দালালদের পাশাপাশি দুষ্ট দৈত্যরা আক্রমণ ও লুটপাট করেছে। বর্তমান সময়ে আক্রমণকারীদের জন্য এই কাফেলা এক অনন্য পুরস্কার বটে, আর তাই মানু এর কাছাকাছি থাকছে।

ও জানে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নজর রাখা হচ্ছে। আরো জানে যে এই রেশন এবং উপকরণগুলো নির্মাণের জায়গায় তার লোকদের কাছে পৌঁছানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

* * * * *

পাথুরে পাহাড়ের একটা অংশের উপর দিয়ে যাচ্ছে ওরা, যার উপর দিয়ে রসদবাহী গাড়ি সহজে পার হওয়ার জন্য একটা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। ওপারে আসতেই ওটাকে দেখতে পেল তারা।

ওরা এখনো উচ্চভূমি থেকে অনেক দূরে আছে, এখনো অন্তত এক দিনের যাত্রা...তবুও তারা একে অতিকায় মূর্তির মতো দিগন্ত থেকে উঠতে দেখেছে।

জাহাজ।

* * * * *

যতবারই এই বিশাল জাহাজের দিকে চোখ যায়, মানু আশা ও গর্বের এক অদ্ভুত মিশ্রণ অনুভব করে। মাত্র আট মাসের মধ্যে তারা এই বিশাল জাহাজের মৌলিক কাঠামো তৈরি করতে সফল হয়েছে, যা মানুষের কল্পনার চেয়েও বড়। দূর থেকে জাহাজটিকে মনে হচ্ছে যেন একটা বিশাল ধূসর পর্দা স্বর্গ থেকে নেমে এসে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছে আকাশ আর পৃথিবীকে।

প্রাচীন প্রকৌশলের এই বিস্ময়ের কাছাকাছি যাওয়ার সাথে সাথে মনে হচ্ছে, জাহাজটা যেন দিগন্তকেও ঢেকে রেখেছে। ব্যাপারটা খানিকটা অসীম কোনো প্রাচীরে আরোহণ করার মতো।

ধীরে ধীরে জাহাজের বাহ্যিক কাঠামো দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। পাশবিক শক্তি ব্যবহার করে বাঁকানো হয়েছে শত সহস্র শক্তিশালী ওক গাছ, ওগুলো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে জাহাজের বিশাল কাঠামো। দৈত্যাকার জাহাজটিকে উঁচুতে ধরে রাখার

জন্য প্রায় সমানসংখ্যক শক্তিশালী গাছের গুঁড়ি, আঙুর-লতা এবং বিশাল বিশাল পাথরকে থাম হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে।

আরো কাছাকাছি যাওয়ার পরে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র, চলমান বিন্দু দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক মাইল দূর থেকেও সহজে বলা যায় এই বিন্দুগুলো আসলে কী। এরা মানুষ! সংখ্যায় এত বেশি যে দেখে মনে হচ্ছে উইপোকার দল কোনো বট গাছের কাণ্ড আক্রমণ করেছে। হাজার হাজার পুরুষ, মহিলা এবং শিশু মানব জাতির আশা বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অবিরাম কাজ করছে।

সবদিক থেকেই দেখার মতো এক দৃশ্য বটে। বিভিন্ন শহর, প্রদেশ ও ভাষার কয়েক লক্ষ মানুষ এই বীরত্বপূর্ণ উদ্যোগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। ভেজা কাঠে ঢোকানো প্রতিটা তামার পেরেক মানব জাতিকে নিশ্চিত বিলুপ্তির থেকে আরো এক ধাপ করে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। তারা ক্ষুধা, রোগ, বন্য প্রাণীর আক্রমণ, শোক, অঙ্গচ্ছেদ এবং কল্পনাতীত দুর্ভোগের সাথে লড়াই করছে। কিন্তু খুব শীঘ্রই এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা সমগ্র মহাবিশ্বের কাছে একটা বিষয়কে স্পষ্ট করে তুলছিলো।

মানুষের আত্মার গভীরে চাপা একটা প্রবৃত্তি আছে যা প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি।

* * * * *

এই বিস্ময়কর জাহাজ নির্মাণের জন্য ভালো মূল্য চুকাতে হচ্ছে।

প্রতিদিনই দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে বেশ কিছু শ্রমিক। অবিরাম বৃষ্টি ও বজ্রপাতের কারণে মানুষের চলাফেরা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কয়েকজন মারা গেছে জাহাজের উপর থেকে পিছলে গিয়ে। অনেকে আবার পাথরের মতো ভারী, স্থানচ্যুত বিমের নিচে পিষ্ট হয়ে মারা গেছে। অনেকে আবার মারা গেছে মরণঘাতী বজ্রপাতের আঘাতে–সত্যিটা হলো, যখন-তখন বজ্রপাত হচ্ছে। এমনকি জাহাজের অনেক জায়গাও বজ্রপাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এইসবের উপরে প্রতিদিন বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলা নির্মাণ কাজের আঘাত বা ক্লান্তিতে মারা যাচ্ছে।

কিন্তু মানুষের প্রাণহানির প্রধান কারণ এগুলোও না, অন্য কিছু ছিলো।

ডজন ডজন নারী, পুরুষ ও শিশুকে ভয়ংকর রাতের অন্ধকারে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জীবিত খেয়ে ফেলার জন্য।

তিনি যে বোর্ড মিটিংয়ের সভাপতিত্ব করছেন, সেখান থেকে অব্যাহতি নিয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে তার নিজস্ব জমকালো অফিস চেম্বারের দিকে চলে গেলেন। স্থানটা মনোরম ম্যানহাটন স্কাইলাইনের মুখোমুখি অবস্থিত। তিনি একজন ৪৪ বছর বয়সি স্বর্ণকেশী পুরুষ এবং সবচেয়ে ভালো ও দামি একটা ব্যবসায়িক স্যুট পরে আছেন। কিন্তু তিনি যে জিনিসটা সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারেন তা হলো, চেহারায় একটা রাজকীয় অভিব্যক্তি ফুটিয়ে রাখা; কারণ তিনি অসাধারণ সম্পদ এবং ক্ষমতার মাঝে জন্মগ্রহণ করেছেন।

কল ধরার জন্য আইফোন বের করলেন তিনি। স্টোনফেলার পরিবারের এই উত্তরাধিকারী বিগম্যানের কল মিস করার মতো বোকা নন।

তারা হলেন পার্টনার। দুজনেই অর্ডারের সর্বোচ্চ পদে আসীন। দুজনেই বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অশুভ গোপন ভ্রাতৃসংঘের সর্বোচ্চ অধিপতিদের ভেতর পড়েন।

'শুভেচ্ছা, মহানুভব,' বললো ফ্রাংক স্টোনফেলার।

তিনি ষষ্ঠ প্রজন্মের ধনী এবং বিলিয়নিয়ার। তিনি কিংবা তার হলিউডের অভিনেত্রী স্ত্রী–কেউই তাদের আর্থিক পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না। তেল, ফার্মাসিউটিক্যালস, ইনফোটেক, মিডিয়া, অস্ত্র এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং–গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বৈশ্বিক ব্যবসায় তার পরিবারের জোরদার অবস্থান আছে।

'হ্যালো, ফ্রাংক। ব্যবসা কেমন যাচ্ছে, বাছা?'

'সবকিছু ভালোভাবেই চলছে, মহানুভব।'

'বিয়াট্রিস আর সাইমন কেমন আছে? সাইমনের তো মনে হয় এখন ছয় বছর হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, ফাদার, আপনার আশীর্বাদে তারা দুজনেই ভালো আছে।' বিগম্যানের এই ভালোমানুষিতে ফ্রাংক বিরক্ত হচ্ছিলেন। তিনি ভালো করেই জানেন যে বিগম্যান মোটেও কোনো ভালো লোক নন, এবং ফ্রাংকের স্ত্রী ও সন্তানের ভালো-খারাপের তিনি কোনো পরোয়াই করেন না।

প্রকৃতপক্ষে, এই বুড়ো হারামজাদাকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ফ্রাংক সঠিক সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করছেন।

* * * * *

'আপনার কাছ থেকে শুনে সব সময় আনন্দ হয়, ফাদার। বলুন, কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি?'

বিগম্যান জানতেন যে ফ্রাংক স্টোনফেলারের কথার পেছনে একটা বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে আছে। তিনি তার বংশ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন।

এরা প্রতারক পরিবার। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের সাথে প্রতারণা করে আসছে।

দেবতা এবং কালো মন্দিরের সাথে আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে ভালোর জন্যই স্টোনফেলারদের রক্তরেখা চিরতরে মুছে ফেলতে হবে।

আমাকে ক্ষমা করুন, প্রভু, কারণ সাইমন একটা শিশু। কিন্তু যা করার তা করতেই হবে।

* * * * *

'খুশি হলাম, ফ্রাংক। তুমি আমার একজন পুরোনো বন্ধু। তোমাকে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, অন্তরের অন্তস্তল থেকে ভালোবাসি।'

'আমিও তাই করি, মহানুভব। আসলে, বিয়াট্রিস জিজ্ঞেস করছে আমরা কবে আবার আপনাকে আতিথেয়তা করার সম্মান পাবো।'

বিগম্যান একটা ভদ্র হাসির ভঙ্গি করলেন। আসল কথায় আসার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

'বিয়াট্রিস যেমন সুন্দরী তেমনি উদার। এখন শোনো, ফ্রাংক, তুমি জানো গঙ্গার তীরে সেই বিপজ্জনক ভারতীয় শহরে কী চলছে, তাই না?

'হ্যাঁ, ফাদার। আমি এখন ভবিষ্যদ্বাণীকৃত সময়ের ক্ষণ গুনছি। আমরা সহস্রাব্দ ধরে যা কিছু করেছি–সমস্ত ত্যাগ, সমস্ত শুদ্ধিকরণ, কর্পোরেশন, যুদ্ধ এবং

মহামারি–সবই এই শেষ একটা ঘণ্টার জন্য। আমরা এখন ব্যর্থ হতে পারি না, ফাদার। আমাদের ব্যর্থ হওয়া যাবে না।'

'আমরা ব্যর্থ হবো না, ফ্রাংক,' বিগম্যান রোম থেকে বললেন। 'মাশ্চেরা আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। অতীতে সে কখনো ব্যর্থ হয়নি। আর তুমি জানো কী কারণে সে অন্যদের চেয়ে আলাদা...কী কারণে সে অজেয়। তুমি জানো এই মুখোশের আড়ালে কী অন্ধকার লুকিয়ে আছে।'

ফ্রাংক স্টোনফেলার এবং বিগম্যান উভয়ই জানেন ঝুঁকিটা কোথায়। তারা দুজনেই জানেন যে বিদ্যুৎকে থামানো না গেলে তারা চূড়ান্ত যুদ্ধে হেরে যাবে। তারা যে গ্র্যান্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডারের পরিকল্পনা করেছেন, তা যা আসছে তার উত্তাপে বাষ্প হয়ে যাবে।

তারা জানতেন, যদি বিদ্যুৎ কালো মন্দিরের রহস্য উন্মোচন করতে সফল হয়, মহাবিশ্বের সবচেয়ে পরাক্রমশালী শক্তিটা পৃথিবীতে নেমে আসবে। এই শক্তি এতটাই ধ্বংসাত্মক যে তাদের সর্বশক্তিমান বিশ্ব ভ্রাতৃসংঘও তার পথে দাঁড়াতে পারবে না।

মহান দ্বারকা শাস্ত্রী আর পুরোহিতজির মতোই একটা ব্যাপারে বিগম্যান এবং ফ্রাংক স্টোনফেলারও নিশ্চিত ছিলেন।

বিদ্যুৎ আর সাদা মুখোশের মধ্যে এই যুদ্ধ মানবতার ভাগ্য নির্ধারণ করতে চলেছে।

রাষ্ট্রকূট রাজ্য, ৭৬২ খ্রিস্টাব্দ

পৃথ্বীবল্লভ

'কা'শী থেকে আরোহীরা এসেছে, মহারাজ।'

সুদূর দেশ এবং সাত সমুদ্র জুড়ে দুর্জয় পৃথ্বীবল্লভ হিসেবে পরিচিত পরাক্রমশালী রাজা কন্নেশ্বর তার সেনাপতির দিকে ফিরলেন।

এই মুহূর্তটার জন্যই আমি জন্মগ্রহণ করেছি।

পৃথ্বীবল্লভ ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণ উপদ্বীপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা। তার বীরত্বের গাথা বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। রাষ্ট্রকূট রাজবংশের সিংহাসনে আরোহণের কয়েক বছরের মধ্যে তার বাহিনী গঙ্গাবাদী রাজা শ্রীপুরুষ এবং কোঙ্কনের শিলাহারদের মতো অসংখ্য শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেছেন। পাশাপাশি পরাজিত করেছেন চালুক্য শাসক বিষ্ণুবর্ধনকেও।

কিন্তু শুধু তার বিজয়ই পৃথ্বীবল্লভের গৌরবকে বিন্ধ্যের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়নি। অন্য কারণও ছিলো।

পৃথ্বীবল্লভ ভগবান শিবের একজন মহান ভক্ত। সেই সাথে চমৎকার করে পাথর কেটে বানানো গুহা মন্দিরের কিংবদন্তি নির্মাতা।

তবে এমনকি তিনিও জানতেন না যে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এখনো আকার নিতে পারেনি। এ এমন এক স্মৃতিস্তম্ভ, যার কারণে তিনি মানুষ এবং ঈশ্বর উভয়ের সাথে যুদ্ধ করবেন। যেই যুদ্ধ তাকে চিরতরে অমর করে দেবে।

* * * * *

'আমি নিজে ওদের স্বাগত জানাবো,' রাজা বললেন, তারপর রাজকীয় আলখাল্লা পরে আবাসিক চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

সেনাপতির সাথে সুন্দর এই প্রাসাদের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে পা রাখতেই দেখলেন, কাশী থেকে আসা লোকজন সামনের ফটক দিয়ে প্রবেশ করছে।

বানারসের রহস্যময় দেব-রাক্ষস মঠের জাফরান এবং লাল পোশাক পরা যোদ্ধা-সন্ন্যাসীদের কাফেলার মাঝখান থেকে ছুটে আসা ঘোড়ার গাড়িটিকে যখন লক্ষ করলেন, তার হৃদয়ের স্পন্দন এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল।

এক পলকের জন্য চোখ বন্ধ করলেন রাজা, হরিহরের কাছে প্রার্থনা করলেন। হরিহর হলো প্রভুর একটা পবিত্র রূপ, যা শিব আর বিষ্ণু উভয়ের দেবত্বকে একত্র করে সৃষ্ট।

পৃথ্বীবল্লভ জানতেন যে হাজার বছরের মধ্যে যদি এমন কোনো দিন থাকে যেদিন শিব ও বিষ্ণুর মিলন উদ্‌যাপন করা হবে, তা হলো আজ।

* * * * *

ঘোড়সওয়াররা যখন কাছে এসে একের পর এক নামতে থাকলো, রাজা তখন তাদের নেতাকে দেখতে পেলেন। দেব-রাক্ষস গোষ্ঠীর বর্তমান শাসক মঠাধীশ, ব্যাপকভাবে সম্মানিত তান্ত্রিক এবং সাধক, দুর্গাদাস শাস্ত্রী। তিনি ঘোড়ার গাড়ির ঠিক সামনেই ছিলেন। ঐ গাড়িটা বহন করছে অদ্ভুত এক অচেনা মিশ্র ধাতু থেকে তৈরি বিশাল, প্রাচীন একটা বাক্স।

দুই মহান ব্যক্তি একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তাদের পারস্পরিক প্রশংসা এবং স্নেহ রাষ্ট্রকূট সেনাপতির কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ছে। তিনি তখন যোদ্ধা-সন্ন্যাসীদের সুগন্ধি জল এবং ঐতিহ্যবাহী চিরোটি মিষ্টি দিয়ে স্বাগত জানাতে ব্যস্ত ছিলেন।

'হে মহান দুর্গাদাস শাস্ত্রী, আপনাকে আমার এই নগণ্য আবাসে স্বাগত,' শ্রদ্ধায় হাতজোড় করে বললেন রাজা। অষ্টম শতকের মঠাধীশ ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে পৃথ্বীবল্লভের কাছে এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখলেন।

'তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে আনন্দিত হলাম, পুরোনো বন্ধু। শেষবার যখন আমাদের দেখা হয়েছিলো, তুমি তখন যুবরাজ ছিলে,' দুর্গাদাস শাস্ত্রী বললেন।

'আর আপনার চুল তখন কালো ছিলো!' ব্যঙ্গ করে বললেন রাজা। দুজনেই আনন্দে হেসে উঠলেন।

মশকরা শেষ হতেই বিনয়ের সাথে নাস্তার ট্রে প্রত্যাখ্যান করলেন দুর্গাদাস। তিনি তার সাথে নিয়ে আসা অত্যন্ত মূল্যবান সিন্দুকটার প্রতি রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

'এটা রক্ষা করা এখন থেকে তোমার দায়িত্ব, হে মহান রাজা,' মিশ্র ধাতুর তৈরি বাক্সটি দেখিয়ে বললেন তিনি।

পৃথ্বীবল্লভ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বাক্সটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হচ্ছে বাক্সের ভেতরে যা ছিলো তা রাজার উপর কোনো জাদু করেছে। রাষ্ট্রকূট সম্রাট ধীরে ধীরে ঘোড়ার গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে মিশ্র ধাতুর বাক্সটি আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করলেন। এরপর তার দুই হাত ও কপাল এর উপরে রাখলেন।

তারপর কেঁদে ফেললেন ভক্তিভরে।

* * * * *

'কিন্তু শাস্ত্রীজি, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের কথা তো স্কন্দ পুরাণের কাশী খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। এ তো চিরন্তন। পৃথিবীর কোনো শক্তির দ্বারা তা কীভাবে ধ্বংস হবে?'

ওরা এখন আছে রাজার জাঁকজমকপূর্ণ ভোজনশালায়। সম্রাট কর্তৃক ছাপ্পান্ন পদের খাবার দেওয়া সত্ত্বেও দুর্গাদাস শাস্ত্রী শুধু দুধে সিদ্ধ এক বাটি ভাত খেলেন। তার সমস্ত পূর্বসূরির মতো তিনি একজন তপস্বী ছিলেন। যিনি কালো মন্দিরের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি রক্তের নদীর প্রাচীন অভিশাপ সম্পর্কে ভালো করেই জানতেন। আরো জানতেন যে তিনি এক হিংস্র, নৃশংস মৃত্যুকে বরণ করতে যাচ্ছেন।

'এই মন্দির চিরন্তন। আর সব সময় তাই থাকবে। কিন্তু এটা নিজের আকৃতি আর রূপ পরিবর্তন করবে, পৃথ্বীবল্লভ। এখন থেকে কয়েক শতাব্দী পরে মন্দিরটি ভেঙে পড়বে–আবার নতুন করে ওঠার জন্য। তারপর অবশেষে কালো মন্দিরের রহস্য কাশীতে ফিরে আসবে, হে রাজা। দেবতা এলেই ফিরে আসবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর মনোনীত অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত হলে।'

সম্রাট নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাকে বিশ্বের সবচেয়ে অমূল্য ধন পাহারা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এমন একটা জিনিস যার জন্য তিনি মরতেও প্রস্তুত।

'হে মহান ঋষি, আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো। কিন্তু তার আগে আমার আপনার বিজ্ঞ পরামর্শ প্রয়োজন। আমার বানানো মন্দিরগুলোর মধ্যে কোনটাকে আপনি পরবর্তী কালো মন্দির হওয়ার উপযুক্ত মনে করেন?'

দুর্গাদাস অকপটে জবাব দিলেন, 'কোনোটিই নয়।'

* * * * *

মঠাধীশকে তার ভোজনশালার চেয়ার থেকে উঠতে দেখে রাজা হতবাক হয়ে গেলেন। তার কাঁধে যে দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যদি তার বিশাল মন্দিরগুলোর কোনোটিই যোগ্য না হয়, তবে তার এখানে আর কী করার থাকে?

তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একজন তরুণ আলকেমিস্টের মতো উত্তেজনায় দুর্গাদাস শাস্ত্রীর চোখ চকচক করছে। তিনি সরাসরি দীপ্তিমান পৃথ্বীবল্লভের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার স্বরে বললেন, 'হে পরাক্রমশালী পৃথ্বীবল্লভ, এমন একটা মন্দির নির্মাণ করো যেটা অবিনশ্বর। সবচেয়ে শক্ত পাথর থেকে প্রভুর জন্য একটা রথ কেটে নাও, যা তুমি এত দক্ষতার সাথে খোদাই করবে যেন তাজা মাখন। পৃথিবীর-মাতার বুকের গভীরে একটা মন্দির তৈরি করো যা এতই দুর্ভেদ্য হবে যে কালো মন্দিরের গোপনীয়তা আগামী শতাব্দীর জন্যেও সুরক্ষিত রাখবে। এমনকি এখন থেকে হাজার বছর পরের মানুষরাও যাতে তোমার স্থাপত্য দেখে আশ্চর্য হয়ে তোমার নামের জয়-জয়কার করে।

'আর এই দর্শনীয় মন্দিরটিকে এমন একটা নামে ডেকো যা তোমার দেবতা, দেবতাদের ঈশ্বর, স্বয়ং শিবের প্রতি অমর শ্রদ্ধার প্রতীক হয়ে ওঠে।

'এটাকে ইলোরার কৈলাস মন্দির নামে ডেকো।'

'এই গোপন ভ্রাতৃসংঘ বৈজ্ঞানিক বা বিবর্তনীয় ধারণার ভিত্তিতে হাজার হাজার বছর ধরে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনা করেছে। যদিও কন্সট্যান্টাইন সম্ভবত মানব গ্রহের অগ্রগতির সাথে তার পরিকল্পনার সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে সচেতন ছিলেন না, কিন্তু অর্ডারের ক্রুর উত্তরসূরিরা তা খুব ভালোভাবেই তা জানে।

'ইউভাল নোয়া হারারি তার বই *স্যাপিয়েন্স: এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব হিউম্যানকাইন্ড*-এ যেমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যে বিশ্ব এবং সমাজ একীভূত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আর তা একধরনের সর্বজনস্বীকৃত নৃতাত্ত্বিক সত্য। খ্রিষ্টপূর্ব ২০,০০০ অব্দে পৃথিবী হাজার হাজার মানব দলে বিভক্ত ছিলো যারা শিকারি এবং সংগ্রহকারী হিসেবে বাস করতো। খ্রিষ্টপূর্ব ২,০০০ সাল নাগাদ তারা বড় বসতিতে সংগঠিত হয়। এর বাইরে তারা ছিলো তুলনামূলকভাবে সভ্য এবং কৃষিকাজও শিখেছিলো। এর মধ্যে রয়েছে সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল, মেসোপটেমিয়া, মিশরীয় সভ্যতা এবং আরো অনেক কিছু। ধীরে ধীরে এই বসতিগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বিকাশ লাভ করতে শুরু করে এবং মানব জাতি অর্থনীতির নীতি, চাহিদা এবং সুবিধার মাধ্যমে আরো বেশি ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে।'

তারা একসাথে আছে প্রায় সাত ঘণ্টা হয়ে গেছে। দ্বারকা শাস্ত্রীর অবিরাম, অক্লান্তভাবে বক্তৃতা দেওয়ার সাথে সাথে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় উন্মোচিত হওয়া মহান ষড়যন্ত্রের বর্ণনায় বিদ্যুৎ পুরোপুরি মুগ্ধ হয়ে গেছে।

'হরপ্পা মেসোপটেমিয়ার জনগণের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, যার ফলস্বরূপ মিশরের সাথেও বাণিজ্য সম্পর্ক ছিলো। তারপরে ধর্ম একীকরণ পরবর্তী সামাজিক মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়। বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টধর্ম দ্রুত এশিয়া ও ইউরোপের বিশাল অংশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। কিন্তু ধর্মের দ্রুত বিকাশ ও ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও এটি এখনো এক নম্বর একত্রীকরণকারী হিসেবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। এখন পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ একত্রীকরণকারী শক্তি হলো দখলদারিত্ব।

'ইতিহাসের সবচেয়ে অবিস্মরণীয় কিছু ব্যক্তি এবং রাজতন্ত্রের সাম্রাজ্য নির্মাণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বাণিজ্য ও ধর্ম ব্যবহার করা হয়েছে। আলেকজান্ডার, সমুদ্রগুপ্ত এবং চেঙ্গিস খান বা রোমান, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই হোক না কেন, পৃথিবী কিন্তু ধীরে ধীরে ঠিকই হাজার হাজার উপজাতির একটা বিচ্ছিন্ন জনবহুল গ্রহ থেকে একটা বিশ্ব মানচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে যা স্পষ্টভাবে কয়েকশো জাতি ও রাষ্ট্রে চিত্রিত করা যেতে পারে।

'সমসাময়িক ইতিহাস পর্যন্ত এই একীকরণ অব্যাহত রয়েছে। এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ৫৬৫ রাজকীয় রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। আজ এটা একটা দেশ, একটা পরিচয়: ভারত। তো অর্ডার মনে করে তারা প্রকৃতি ও ভাগ্য যা চায় তাই করছে। তারা নিজেদেরকে আধুনিক যুগের অধিপতি মনে করে। এমন এক অধিপতি যে অনিবার্যকে ত্বরান্বিত করে।'

'কিন্তু এটা তো পাগলামি, বাবা! আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক বিবর্তন সম্পর্কে আপনি যেগুলো বললেন, তা ঘটতে প্রাকৃতিক অগ্রগতিরই হাজার হাজার বছর লেগেছে। সেই তুলনায় নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার তো একটা শিশু! তাছাড়া, এতগুলো মানব সমাজ এবং সভ্যতার একত্রীকরণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরি করা কোনো পরিকল্পনার ফলাফল হিসেবে ঘটেনি। এ এক জটিল প্রক্রিয়া, যা অসংখ্য কারণের সাথে জড়িত। এটা মানব জাতির যাত্রা এবং অবস্থানকে প্রায় বলতে গেলে একটা ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে সংজ্ঞায়িত করেছে। কেউ কীভাবে তাদের সঠিক জ্ঞানে এত বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনার স্বপ্ন দেখতে পারে?'

দ্বারকা শাস্ত্রী আবার একটা ক্লান্ত, হতাশ হাসি দিলেন।

'তারা ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকবার সফলভাবে এই বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে, বিদ্যুৎ।'

* * * * *

'যদিও অর্ডারটা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন রূপ এবং নাম ধারণ করে এবং ফ্রিম্যাসনস, দ্য অর্ডার অব দ্য স্কাল অ্যান্ড বোনস, প্রাইরি অফ সায়ন এবং রোসিক্রুসিয়ানস সহ বিভিন্ন শক্তিশালী শাখায় তাদের প্রভাব বিস্তার করে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলো ভয়ংকর ইলুমিনাতি,' মহান মঠাধীশ চালিয়ে গেলেন।

বিদ্যুৎকে এবার উদ্বিগ্ন দেখালো। যদিও সে চায়নি এই জীবন-পরিবর্তনকারী বক্তৃতা বন্ধ হোক, এবং যে অশুভ শক্তি তার বাবাকে হত্যা করেছে তার সম্পর্কে জানতে সে আরো তৃষ্ণার্ত ছিলো, কিন্তু সে লক্ষ করেছে যে তার প্রপিতামহ গত

কয়েক ঘণ্টায় এক ফোঁটা পানিও পান করেননি। তিনি তার আয়ুর্বেদিক ঔষধগুলোও খাননি এবং তাকে বেশ পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে।

'বাবা, আমরা পরে চালিয়ে যেতে পারি। আপনার এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা কথা বলছেন,' বিদ্যুৎ বিনয়ের সাথে পরামর্শ দিলো।

দ্বারকা শাস্ত্রী তার প্রপৌত্রের পরামর্শ উপেক্ষা করলেন।

মঠাধীশের সমগ্র জীবন, তার সমস্ত কাজ, এক একটা ভয়ংকর যুদ্ধ এবং ভয়ংকর বলিদান–সবকিছুই এখন তার চোখের সামনে ভাসছে। তিনি যে কারণগুলোর জন্য বেঁচে আছেন এবং নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, সেগুলো এখন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভবিষ্যদ্বাণী করা সময় এগিয়ে আসছে। ভয়ংকর অথচ বহুল প্রতীক্ষিত অতিথি এসে পড়েছেন, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন মঠের রাক্ষস-খণ্ডের নিচে অন্ধকার, পবিত্র ঘরের মধ্যে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রহগুলো নিজেদের একত্র করতে শুরু করবে।

ঐ সহস্রাব্দ-প্রতীক্ষিত, নির্দিষ্ট, ঐতিহাসিক রোহিণী নক্ষত্র আসতে চলেছে।

* * * * *

'ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ঘটনা সম্পর্কে কিছু অদ্ভুত তথ্য জেনে নাও। চলো, বলশেভিক আন্দোলন বা জারবাদী শাসনের পতন ঘটানো ১৯১৭ সালের রাশিয়ান বিপ্লব দিয়েই শুরু করি। এর মাধ্যমেই সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা জানি, বলশেভিকরা কার্ল মার্কস দ্বারা উত্থাপিত মতাদর্শ অনুসরণ করেছে এবং দেশের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য জারের প্রাসাদে আক্রমণ করেছে। কিন্তু তুমি কি জানো, বিদ্যুৎ, মহান বিপ্লবের মাত্র চার বছর আগে পর্যন্ত বলশেভিকরা একটা ছোট রাজনৈতিক দল ছিলো? এদের কোনো বাস্তব প্রভাব ছিলো না। তাহলে কীভাবে তারা হঠাৎ এমন একটা শক্তিশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো? সর্বশক্তিমান জারের পতন ঘটালো? কী তাদের এই উল্কার গতিতে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছে? কে তাদের সাহায্য করেছে?

'আরো পুরোনো উদাহরণ নেওয়া যাক। চলো আমরা একটু ফরাসি বিপ্লবের দিকে তাকাই। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটা রোমান্টিক সাহিত্য এবং থিয়েটারকে অনুপ্রাণিত করেছে, সেই সাথে অনুপ্রাণিত করেছে সর্বকালের সব বিপ্লবীদের। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে ফরাসি বিপ্লব আসলে কী অর্জন করেছে? এটা কিন্তু এখন সন্ত্রাসের

রাজত্ব ও মানুষের জীবনের ব্যাপক ক্ষতির জন্য পরিচিত। তবুও, আমি যদি তোমাকে বলি যে ফরাসি বিপ্লব শুরু হয় প্রায় ৫ বছর আগে, ১৭৮৪ সালে? ইলুমিনাতির প্রতিষ্ঠাতা এডাম ভাইসপটের কাছ থেকে ম্যাক্সিমিলিয়েন রবসপিয়ের নামে একজন ব্যক্তির কাছে একটা গোপন চিঠি যায়, যেখানে কীভাবে বিপ্লব পরিচালনা করা হবে তা বিস্তারিত লেখা ছিলো। বিদ্যুৎ, ফরাসি বিপ্লব শুধু তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে দরিদ্র ও শোষিতদের বিদ্রোহ ছিলো না। এটি ইলুমিনাতির দ্বারা পরিকল্পিত একটা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রকল্প ছিলো।'

রুমে স্তব্ধ নীরবতা। এমনকি পুরোহিতজিও বলশেভিকদের উত্থান এবং ফরাসি বিপ্লবের মতো গভীর বৈশ্বিক ঘটনা নিয়ে ইলুমিনাতির কাজের জটিল বিবরণ জানতেন না। অবশেষে কয়েক সেকেন্ড পর বিদ্যুৎ কথা বললো।

'বাবা, ইলুমিনাতি কারা? তারা কীভাবে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সাথে যুক্ত?'

দ্বারকা শাস্ত্রী একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে রক্তমাখা গল্পের সবচেয়ে রহস্যময় অধ্যায় শুরু করলেন।

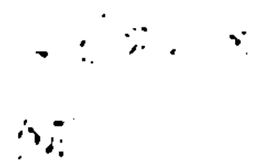

আর্যাবর্তের জলাভূমি, খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৯৯ অব্দ

প্রচণ্ডের আগমন

সত্যব্রত মানু একটা অস্থায়ী কাঠের টেবিলের উপর ছড়িয়ে থাকা নকশার চার্টের উপর ঝুঁকে আছে। চার্টগুলো তুলা শক্ত করে তৈরি করা এক ধরনের কাগজের উপর তৈরি করা হয়েছে। জাহাজের কাঠামোগত পরিকল্পনাগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এতে। তারা দানবীয় জাহাজটির একটা আধা-নির্মিত কেবিনে জড়ো হয়েছে। এই নির্জন এলাকাটিকে বিশাল প্রকল্পের জন্য নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করছে মানু।

ওর লম্বা চুল মাথার পেছনে বেণি করে বাঁধা এবং কান থেকে বড়, বৃত্তাকার কুণ্ডল ঝুলছে। তারার পীড়াপীড়িতে সে তার চোখে সুরমা পরেছে, যা চোখদুটোর জ্বলন্ত তীব্রতাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। তাকে ঠিক সেই প্রাচীন ঋষি-রাজের মতোই দেখাচ্ছে। আর চিরকাল ধরে তাকে এভাবেই স্মরণ করা হবে।

'এটা তো ঠিকঠাক মনে হচ্ছে না,' সে সোমদত্তকে বললো। উনি একটা উলটে যাওয়া গাছের গুঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং অন্য একটা চার্ট অধ্যয়ন করছেন।

'কী, মানু?' সোমদত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

গত কয়েক মাস ধরে মানু প্রচণ্ড গতিতে জাহাজ নির্মাণের শিল্প ও বিজ্ঞান সম্পর্কে শিখেছে। বেশ কয়েক রাত ধরে সোমদত্তের সুপারিশকৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করছে। প্রধান স্থপতি আর তার দলের দ্বারা পরিচালিত অধিবেশনগুলোতেও যোগ দেয় এবং মনোযোগ সহকারে নোট নেয়। সোমদত্তের কাছ থেকে বৈদিক গণিত এবং স্থাপত্যের সূক্ষ্মতা বুঝতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করেছে সে, জিজ্ঞেস করেছে শত শত প্রশ্ন। এতটাই যে অল্প কয়েক মাসের মধ্যে প্রধান স্থপিতও মহাতরী নির্মাণের জন্য মানুর দেওয়া কাঠামোগত তথ্যগুলোকে খুব গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন। আর যাই হোক, এই প্রকল্প আসলেও যেকোনো মানুষের মস্তিষ্কের কল্পনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার বাইরে ছিলো।

'স্টার্ন রাডারে খুব বেশি তার ব্যবহার করে হয়েছে। এতে রাডারের ওজন অনেকটাই বেড়ে যাবে এবং চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। মনে রাখবেন দুপাশ থেকে মাত্র পনেরোশো লোকের টানার ব্যবস্থা আছে।'

'হুম...আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছে। আমরা যদি মাস্তুলের সংখ্যা বাড়াই এবং নির্ভরতা কমিয়ে দেই...' সোমদত্ত তার বাক্য শেষ করার আগেই মৎস্য-মানবের এক সৈনিক এমন একটা বার্তা নিয়ে এলো যা মানু আশা করেনি।

'প্রণাম, সত্যব্রত,' দূত বললো। 'একটা খুব বড় সশস্ত্র দল মহাতরীর কাছে আসছে। আমাদের ফাঁড়ি থেকে আরোহীরাও উদ্বেগজনক খবর নিয়ে এসেছে।'

মানু তার তরবারিটা শক্ত করে ধরলো।

'আর সেই উদ্বেগজনক খবরটা কী?' সোমদত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

সংবাদটা বলার আগে এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করলো সৈনিক।

'এই দলটা হচ্ছে অসুরদের।'

* * * * *

'ওরা আক্রমণ করছে বলে তো মনে হচ্ছে না,' ধ্রুব বললো। ওরা জাহাজের উপরে দাঁড়িয়ে আগত অসুর সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করছে এখন।

ধ্রুব ঠিকই বলেছে। অসুররা ধীর গতিতে জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। যদিও তারা সবাই সশস্ত্র, কিন্তু কারো অস্ত্রই প্রস্তুত নয়। তাছাড়া, এই দূর থেকে দেখেও ধ্রুব আর মানুর কাছে অসুরদের ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে। ভীষণ ক্লান্ত।

'আমাদের যোদ্ধাদের প্রস্তুত থাকতে বলুন। তবে অসুররা প্রথমে আক্রমণ না করলে একটা তীরও যাতে ছোঁড়া না হয়,' জাহাজের সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডারদের নির্দেশ দিলো তারা।

'রান্নাঘরে গিয়ে বলুন যে প্রচুর গরম মাংসের ঝোল তৈরি করতে। মনে হচ্ছে আমাদের অতিথিদের এটার প্রয়োজন হবে,' যুদ্ধের কমান্ডাররা চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে মানু বললো।

* * * * *

ক্লান্ত অবস্থায়ও প্রচণ্ডকে চিত্তাকর্ষক লাগছে। সে তার বিশাল প্লাটুনের নেতৃত্ব দিয়েছে, কিন্তু যখন সে তার মহিমান্বিত পূর্বসূরি সুরার মতো গৌরবান্বিতভাবে রাজকীয়তা দেখাতে ব্যর্থ হলো, তখন ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিজেকে অনেক কম অহংকারী ও নিষ্ঠুর হিসেবে উপস্থাপন করতে শুরু করলো।

দর্শনার্থীদের গ্রহণ করার জন্য মানু এখন মহাতরীর থেকে এক মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এরা শান্তির জন্য এসেছে। এই মুহূর্তে ওর সাথে আছে তার অবিচ্ছেদ্য বন্ধু ধ্রুব এবং তার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা পণ্ডিত সোমদত্ত। যেকোনো অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য একটা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা হিসেবে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মৎস-মানবদের বিশজন সেরা সৈনিক।

অসুররা খ্যাতির দিক দিয়ে তাদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে আছে।

আর প্রচণ্ড ছাড়া মানুর জাহাজের কেউই বিভাসন পূজারির শেষ যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই জানতো না।

* * * * *

মহাতরীর বড় হলগুলোর একটাতে পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি রুক্ষ মাদুরের উপর বসে আছে ওরা। মানু ভালো করেই জানে, সে যত বেশি মিত্র বানাতে পারবে, তার জন্য ততই ভালো। এত দিনে প্রায় সবাই জাহাজটিকে তাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা হিসেবে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। এ হলো মানব জাতির স্বীকৃত শেষ আশা ও শেষ জাহাজ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে প্রলয় পুরো আর্যাবর্তকে প্লাবিত করবে। অন্যদিকে, কুখ্যাত জলদস্যুরা তাদের জাহাজের দিকে নজর রাখছে। ওরা এই জাহাজ ছিনিয়ে নিতে চায়।

অসুররা ওদের পাশে থাকা মানে মানুর জাহাজে অনেক বেশি প্রতিরক্ষা শক্তি যোগ হওয়া। সে জানে যে একটা বিরাট যুদ্ধ সামনে আসছে। তাই অসুর রাজাকে উন্মুক্ত বাহুতে স্বাগত জানানোটাই হবে সূর্যপুত্রের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ। ধীরে ধীরে হলেও সত্যব্রত কূটনীতি শিখছিলো।

* * * * *

কাঠের দেয়াল এবং স্তম্ভগুলোর স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিশাল এই জাহাজের অন্যান্য কোনার মতোই বিরাট হলের শত শত জায়গা থেকে বৃষ্টির জল চুইয়ে পড়ছে।

সম্পূর্ণ স্তম্ভিত অবস্থায় আছে প্রচণ্ড। এই মহাতরীটিকে একবার দূর থেকে, আরেকবার কাছ থেকে দেখাটা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এত বিশাল কিছু যে থাকতে পারে সেটা ভাবতেই আলাদা একটা শিহরন অনুভূত হয়। তার উপর জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে এটা মানুষের তৈরি, কোনো স্বর্গীয় প্রাণী নয়। এই তথ্যটা নিজেই একটা স্নায়ু-বিধ্বংসী ব্যাপার।

উপরের দিকে তাকালো পরাক্রমশালী অসুরদের নতুন সম্রাট, সব দিক ঘুরে ঘুরে দেখে জাহাজটার প্রশংসা করলো। সে তখনো বিশাল এই তরীর খুব নিম্নস্তরের মধ্যে ছিলো। ছোট জানালাগুলো দিয়ে ভেতরে ঠান্ডা বাতাস আসছে। সেই হাওয়ায় জ্ঞানী অসুর ও তার সেনাপতিদের হাড় জমে যাচ্ছে। এই বিশাল জাহাজের সর্বোচ্চ ডেকে গর্জন করতে থাকা আকাশ ও মেঘের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন লাগবে, তা ভাবতেও ভয় পাচ্ছে সে।

* * * * *

'দয়া করে খাওয়া শুরু করো, প্রচণ্ড। যদিও আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই শাকাহারি, তারপরেও বিশেষভাবে তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের জন্য মাংস প্রস্তুত করা হয়েছে,' মানু বললো। একটু আগেই অসুর রাজাকে তার সাথে রুটি খেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে।

পিতা ও পুত্রের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করে বিস্মিত হলো প্রচণ্ড। শুধু একই রকম শক্তিশালী চোয়াল এবং চোখের অভিন্ন দৃষ্টিই নয়, সত্যব্রত মানু তার মহৎ পিতার মতো একই ধরনের কর্তৃত্বপূর্ণ নম্রতার সাথে কথা বলছে।

খাবারটা খুব সাধারণ হলেও সবাই অনেক পছন্দ করেছে। প্রচণ্ড এবং তার লোকেরা মশলা দিয়ে রান্না করা ছাগলের মাংস ও তাজা ভাতে তাদের আঙুল ডুবিয়ে দিলো। উত্তর-পশ্চিমের শক্তিশালী পর্বতমালার ঠান্ডা ফাটলের মধ্য দিয়ে তাদের কষ্টকর যাত্রার পরে এই গরম খাবারটি অসুর এবং তার সেনাপতিদের জন্য জীবন রক্ষাকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রচণ্ড প্রথম লোকমা মুখে তুলতে নিয়েও থেমে গেল।

'কোনো সমস্যা, বন্ধু? তুমি খাবার খেতে গিয়েও থেমে গেলে কেন?' মানু জিজ্ঞেস করলো।

প্রচণ্ড নির্দ্বিধায় বলে উঠলো, 'আমার সৈন্যদের কী হবে, সত্যব্রত? তারাও ক্ষুধার্ত এবং দুর্বল। এই দীর্ঘ, নিষ্ঠুর–'

প্রচণ্ড বাক্য শেষ করার আগেই মানু কথা বলে উঠলো, 'চিন্তা করবে না। আমাদের কথা বলার সময় তাদের মাংস, শাকসবজি এবং ভাতের গরম ঝোল পরিবেশন করা হচ্ছে। একবার ওদের খাওয়া হয়ে গেলে জাহাজের চিকিৎসকরা দুর্বল এবং অসুস্থদের যত্ন নিতে শুরু করবে।'

'রাজা মানু, তোমার মহান পিতার মতোই তুমি সদয় ও ন্যায়পরায়ণ। তুমি দেখছি কথাও একইভাবে বলো।'

প্রথমে মানু নম্রভাবে মাথা নেড়েছিলো, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সে চিবানো বন্ধ করে মুখ তুলে তাকালো। এখানে কিছু একটা ভুল হচ্ছে।

'ক্ষমা করবে, অসুর-রাজ...কিন্তু তোমার সাথে কীভাবে আমার বাবার সামনাসামনি সাক্ষাৎ কিংবা কথা হয়েছে? তিনি তো তার উপর মহাস্নানে করা নির্যাতনের আঘাতে মারা গেছেন।'

হতবাক দেখালো প্রচণ্ডকে। খেতে বসা সবার দিকে তাকালো একবার। এরপর আত্মবিশ্বাসের সাথে চিৎকার করে উঠলো, 'কথাটা ঠিক নয়, সত্যব্রত! বিভাসন পূজারি মহাস্নানে মারা যাননি। আমিই তার শেষ, তার সবচেয়ে বড় যুদ্ধের সাক্ষী ছিলাম। এই যুদ্ধই তার ভাগ্যের গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছে।'

'১৭৭৬ সালে ব্যাভারিয়ান দার্শনিক এডাম ভাইশপট ইলুমিনাতি প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও ইলুমিনাতির প্রাথমিক নীতিগুলো ছিলো গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক চার্চের দাসত্ব ও যাজকদের শাসনকে প্রত্যাখ্যান করা নিয়ে। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে সেই সময়ের সবচেয়ে ধনী এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিবারের সদস্যরা এই রহস্যময় সংঘের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং এতে যোগ দেয়। ইলুমিনাতির গোপন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে ইলুমিনাতির সদস্যরা এমন পরিবার থেকে এসেছে যেগুলো এখনো পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে ধনীদের মধ্যে পড়ে, এমনকি ফ্লোরেন্সের শক্তিশালী মেডিসি এবং স্টোনফেলার পরিবারও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইলুমিনাতির কর্তৃত্ব বাড়ার সাথে সাথে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাদের লক্ষ্য ছিলো যেকোন উপায়ে স্বৈরাচারী বৈশ্বিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭২ সালে আমেরিকান অর্থনীতির অধ্যাপক অ্যান্টনি সাটন তার রচিত *The Best Enemy Money Can Buy*-এ লিখেছিলেন যে ইলুমিনাতি ২১ শতকের প্রতিটি যুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান-পতন এবং অ্যাডলফ হিটলারের উত্থানও রয়েছে। তিনি দাবি করেন যে কসোভো থেকে আরব পর্যন্ত প্রতিটি সংঘাতে এই শক্তিশালী গোপন ভ্রাতৃসংঘ ওয়াল স্ট্রিটে থাকা তাদের ফ্রন্ট ব্যবহার করে অর্থায়ন এবং পরিচালনা করেছে। আর প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার ইলুমিনাতি ব্যাংকিং সংস্থাই সোভিয়েত ইউনিয়নের নব্বই শতাংশ সামরিক প্রযুক্তি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে সরবরাহ করেছে, যার ফলে আগামী তিন দশকের জন্য পুরো বিশ্ব একটা যুদ্ধ-অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। আর এটাই স্নায়ুযুদ্ধ নামে পরিচিত।'

মহান মঠাধীশ এবার ইঙ্গিত করলেন যে তার এক গ্লাস জল দরকার। বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি উঠে মাটির কলস থেকে প্রপিতামহের গ্লাসটা ভরে তার হাতে দিলো।

'এদের পদ্ধতি জটিল কিন্তু কার্যকর: দেশে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করা, তাদের অস্ত্রে পরিণত করা, সরকার ও জনগণের মধ্যে অবিশ্বাস ও উত্তেজনা তৈরি

করা, অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে বিরোধী দলকে অর্থায়ন করা, গৃহযুদ্ধ ঘটানো, তথাকথিত শান্তিরক্ষী সেনা পাঠানো, অঞ্চলগুলোতে যেন শান্তি ফিরে না আসে তা নিশ্চিত করা। আর ফলস্বরূপ ব্যাংকার, ফার্মা কোম্পানি, তেল উৎপাদনকারী এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রস্তুতকারকদের কোষাগার শত শত বিলিয়ন ডলারে ভরে যাচ্ছে। একই সাথে এই দ্রুত উন্নতিশীল ভ্রাতৃসংঘ বিশ্বের উপর তাদের দখল আরো শক্ত করছে।'

* * * * *

'৯/১১-এর ঘটনাটা নিয়ে কী বলবেন, বাবা? আপনি সন্ত্রাসবাদের কিছু জঘন্য কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যা শুধু নিউইয়র্ক শহর বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, সমগ্র বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে এই ঘটনার পেছনে ইলুমিনাতির হাত নেই।'

মাথা নাড়লেন দ্বারকা শাস্ত্রী। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন। তিনি বিষয়টার গুরুত্ব এবং এর প্রভাব জানতেন। কিছুক্ষণ বিরতির পর সাবধানে শুরু করলেন। 'কিছু স্বল্পোন্নত দেশের তুলনায় আমেরিকান জনগণ উচ্চ শিক্ষিত এবং আধুনিক বিশ্বের কাছে ভালোভাবে পরিচিত। কিন্তু গণতন্ত্রে তাদের অগাধ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও অদ্ভুতভাবে তাদেরকে খুব সহজেই প্রভাবিত ও মগজ ধোলাই করা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা ইলুমিনাতি এবং নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই বলে মনে করেনি। কিন্তু তারা ভুলে যায় তাদের একজন রাষ্ট্রপিতা, স্বয়ং জর্জ ওয়াশিংটন, ১৭৯৮ সালে তার উত্তরসূরিদের ইলুমিনাতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করে একটা চিঠি লিখেছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটনের মতো দক্ষ এবং দায়িত্বশীল কেউ কি ভিত্তিহীন তত্ত্ব বিশ্বাস করবেন, যদি-না তার কাছে শক্ত প্রমাণ থাকে?'

'না, তিনি বিশ্বাস করবেন না,' পুরোহিতজি বললেন। অর্ডার সম্পর্কে অনেক কিছুই আজ তিনি প্রথম শুনলেন।

দ্বারকা শাস্ত্রী ভবিষ্যদ্বাণীকৃত দেবতার জন্য এই বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের সবচেয়ে জটিল বিবরণগুলো সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন, যার দ্বারা এই সবকিছু শেষ হবে।

নাকি হবে না?

* * * * *

'৯/১১ নিয়ে প্রচুর তত্ত্ব রয়েছে। সেগুলো নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। আমি এখন তোমাকে কিছু সহজ প্রশ্ন করবো, বিদ্যুৎ। তুমি সেগুলোর ব্যাপারে নিজের সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে।'

'অবশ্যই, বাবা,' দেবতা উত্তর দিলো।

'পুরো বিশ্বের সবচেয়ে ধনী প্রতিষ্ঠান কোনটি, বিদ্যুৎ?'

বিদ্যুৎ এই প্রশ্নটি আশা করেনি, তবে উত্তর দিলো।

'নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না, বাবা...হয়তো গুগল কোম্পানি? অথবা মাইক্রোসফট? নইলে ওয়ালমার্ট বা অ্যামাজন?'

'না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার।'

'ওহ...অবশ্যই...' মাথা চুলকিয়ে বললো বিদ্যুৎ।

দ্বারকা শাস্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কী মনে হয়, দেশের বাইরে মার্কিন সরকার সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ বা খরচ কোথায় করে?'

'উম...যুদ্ধ চলছে এমন সব দেশে তাদের সামরিক বাহিনীতে, যেমন ইরাক ও আফগানিস্তান। কিংবা ন্যাটোর মতো সংস্থার অধীনে তাদের বৈশ্বিক সামরিক অবকাঠামোর পৃষ্ঠপোষকতায়?'

'সংক্ষেপে...যুদ্ধ করার জন্য, তাই তো?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'কে এই যুদ্ধ-ব্যয় অনুমোদন করে?'

'আমার যতটুকু মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট...'

'চমৎকার। এখন বলো, বাছা, এত টাকা কোথায় যায়? আমি বলতে চাচ্ছি, তুমি কি জানো একজন মার্কিন সৈন্যের রণসজ্জার খরচ কত? আমি তোমাকে বলছি। মার্কিন সামরিক বাহিনীর একজন পদাতিক সৈন্যকে সজ্জিত করতে প্রায় ১৭,০০০ মার্কিন ডলার খরচ হয়। ইরাক ও আফগানিস্তানে প্রায় বিশ লাখ মার্কিন সৈন্য যুদ্ধ করেছে। হিসাব করো, বাছা। তুমি কি কল্পনা করতে পারো যে আমেরিকা একবার যুদ্ধে গেলে যুদ্ধের সরঞ্জামের জন্য কী পরিমাণ খরচ হয়? তুমি কি জানো আমেরিকার করদাতারা শুধু ইরাকে থাকা সৈন্যদের এয়ার কন্ডিশনের জন্য সাড়ে চার বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করছে? সুতরাং, আমরা এখানে যুদ্ধে বিলিয়ন নয়, ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হওয়ার কথা বলছি।'

বিদ্যুৎ আনমনে মাথা নাড়লো। সে ভাবছে তার পরদাদা এই দেব-রাক্ষস মঠে বসে থেকে আমেরিকার সামরিক ব্যয়ের হিসাব কীভাবে জানেন।

'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি, বিদ্যুৎ। এত টাকা যায় কোথায়?'

'সম্ভবত অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারীদের পাশাপাশি অস্ত্র ও গোলাবারুদ প্রস্তুতকারক এবং বিতরণকারীদের কাছে যায়।'

'হ্যাঁ। অস্ত্র চালানকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিলিয়ন ডলার চলে যায়। ব্ল্যাক স্কাই-এর মতো প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানিকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়। ফাইটার জেট থেকে শুরু করে নাইট ভিশন চশমা, মশারি, সবকিছুর নির্মাতাদের কাছে যায় আরো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার! এখন আমাকে বলো, বিদ্যুৎ, কে মার্কিন সিনেট নির্বাচন করে?'

এই প্রশ্নটা সহজ ছিলো।

'আমেরিকার ভোটাররা,' বিদ্যুৎ আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দিলো। যে গতিতে আলোচনা এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে দ্বারকা শাস্ত্রী খুশি হয়েছেন।

'অতএব, তুমি একমত যে মার্কিন সিনেটকে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের বিষয়ে আমেরিকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, বাবা...যেকোনো গণতান্ত্রিক সরকারের মতোই করা উচিত।'

'একদম ঠিক। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছ যে কী এমন কারণ আছে যা একটা দেশের নির্বাচিত সরকারকে রাষ্ট্রের অর্থ বেসরকারি প্রতিরক্ষা ঠিকাদারদের কোষাগারে লাগামহীন ব্যয়ের জন্য নৈতিক অধিকার এবং জনসমর্থন দেয়?'

বিদ্যুৎ পুরোপুরি বুঝতে পারলো না মঠাধীশ কী জিজ্ঞেস করছেন।

দ্বারকা শাস্ত্রী চালিয়ে গেলেন। তার চেহারায় উত্তেজনার পাশাপাশি ক্ষোভ স্পষ্ট ছিলো।

'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ধ্বংস আমেরিকানদের মানসিকতায় প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দেয়। তাদের মনে ভয়, ঘৃণা ও প্রতিশোধের একটা চিরস্থায়ী গভীর ক্ষত রেখে যায়। এক ধাক্কায় এই হামলা একটা শত্রুর বিরুদ্ধে এক অবর্ণনীয় ব্যয়বহুল যুদ্ধকে সমর্থন করার পেছনে সমগ্র দেশকে একত্র করেছে, যা সত্যিই কেউ জানতো না।'

মহান বৃদ্ধ বিদ্যুতের চেহারায় স্পষ্টতা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

'এটা এর আগে কেন আমার চোখে পড়লো না, বাবা? ৯/১১ ছিলো ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আর্থিক লুটপাটের সুবিধার জন্য ইলুমিনাতির দেওয়া সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে অমানবিক নরবলি।'

আর্যাবর্তের জলাভূমি, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৯ অব্দ
নীল আগুনের রাত

ওরা তাদের রাজার জন্য অপেক্ষা করছে।

একজন রাজা, যে প্রতারণার তীর দ্বারা বিদ্ধ হওয়ার কষ্ট অনুভব করছে।

সে কোনো চক্রান্তকারীর তরবারি দ্বারা প্রতারিত হয়নি। সিংহাসনের উচ্চাভিলাষী দ্বিতীয় কোনো উত্তরাধিকারীর দ্বারাও প্রতারিত হয়নি।

একজন নয়, দুজন নয়, সে ভয়ংকরভাবে প্রতারিত হয়েছে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছে এমন তিনজনের দ্বারা।

তার প্রয়াত পিতার গুণী বন্ধু পণ্ডিত সোমদত্তের দ্বারা।

তার খুব আপন তারা, তার প্রিয় তারার দ্বারা।

এবং মৎস্যের দ্বারা।

মৎস্য আমাকে মিথ্যা বলেছে!

* * * * *

প্রচণ্ড আর তার অসুরদের পেছনে ফেলে, সমস্ত বন্ধুবান্ধব এবং পরামর্শকদের রেখে, মানু তারার বাহু ধরে জাহাজের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা অংশের দিকে চলে গেল। অনেক কথা বলার আছে।

একটা পাথরের টুলে বসে আছে তারা, হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছে। অন্যদিকে, খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে মহাতরীর একটা উঁচু ডেক থেকে দিগন্তের দিকে লক্ষ্যহীনভাবে তাকিয়ে আছে মানু।

'আমি মিথ্যা বলেছি কারণ আমি তোমাকে দানব হয়ে ওঠার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, মানু!' তারা চিৎকার করে বললো, তার কণ্ঠ এখনো কান্নায় ভেঙে যাচ্ছে।

মানু নড়লো না, যেন সে তার উপস্থিতির কথা একেবারেই ভুলে গেছে। ওর অবস্থা শোচনীয়। নিজের আহত, ভগ্নহৃদয় পিতার সুরা এবং তার অভিজাত সৈন্যদের সাথে একা লড়াই করার কথা কল্পনা করতেই গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। রক্তধারা কিংবা রক্তনদীর তার বাবাকে গ্রাস করার কথা ভেবে কেঁদে উঠলো তার হৃদয়। পরকালে গিয়ে সে কীভাবে তার মা সানজানার মুখোমুখি হবে?

আরো ব্যাপার আছে। প্রচণ্ড তাকে যে ভয়ংকর তথ্য দিয়েছে, তাতে মানু তার আত্মায় ছুরিকাঘাত করার মতো মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করছে। নতুন অসুর রাজা মানুকে মহান সপ্তর্ষিদের অন্ধকার ভবিষ্যদ্বাণী, সেই সাথে মা সরস্বতীর ভয়ংকর অভিশাপের কথা জানিয়েছে।

* * * * *

মানু এখন প্রায় প্রতিটি ভয়ংকর অভিশাপ একের পর এক শুনতে পাচ্ছে। কল্পনা করতে পারছে নীল আগুনের দুর্ভাগ্যজনক রাতে তার হতাশ, ভগ্নহৃদয়, একাকী বাবার অবস্থা।

রক্তনদীর অভিশাপ ভয়ংকরভাবে বেজে উঠলো তার মনে।

'সপ্তর্ষিরা তোমায় তাদের নিজেদের মতো ভালোবাসতেন। আমি তোমাকে ছেলের মতো ভালোবাসতাম। দেবতারা তোমাকে দেবত্ব দান করেছেন, এবং তুমি কৃপা ও যোগ্যতার সাথে তা বহন করেছ–তোমার ঘৃণা তোমার সর্বনাশ হয়ে দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত, হে দেবতা! আর তোমার এই অধঃপতনের হাত ধরেই এসেছে জীবহত্যার এই ভয়াবহ কাল! অসুররা অসীম পাপ করেছে। হরপ্পার বাসিন্দারা সমষ্টিগতভাবে পাপ করেছে। রাজারা পাপ করেছে, পাপ করেছে পুরোহিতরাও। রাক্ষসরা পাপ করেছে, পাপ করেছে দেবতারাও। মানব জাতি মহাবিশ্বকে মহাজাগতিক পরিশুদ্ধি করতে বাধ্য করেছে। আমি চিরকালের জন্য এই অসীম অনৈতিকতার দেশ ত্যাগ করবো এবং পৃথিবীর পবিত্র গর্ভে ফিরে যাবো। সরস্বতী, জ্ঞানের নদী, এক কিংবদন্তি হয়ে যাবে। কিন্তু যারা তার সাথে অন্যায় করেছে, তাদের তার চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়ার আগে নয়।

'সাবধান...প্রলয়...আসীৎ!

'মহাপ্রলয়...আসছে!'

সত্যব্রত মানু তার কল্পনায় পরবর্তী অভিশাপটিকে পুনরায় না দেখে থাকতে পারলো না।

এতক্ষণে প্রচণ্ড তাকে যা বলেছে তা তার মনে পড়ে গেল। তার মনে পড়লো রক্তধারা কীভাবে শুধু একটা অভিশাপেই সন্তুষ্ট হয়নি।

তার শক্তিশালী, প্রতিধ্বনিত কণ্ঠ মানুকে আঘাত করতে থাকে।

'মানুষের হৃদয়ে থাকা মানবতার কারণে প্রতিটি ব্যক্তির ঈশ্বর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তারপরেও নিজেদের ভেতর ও বাহিরের আধ্যাত্মিক পরিত্রাণ খোঁজার পরিবর্তে ঈশ্বরের দেওয়া উপহারগুলো ব্যবহার করে মানব জাতি বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যা, লুণ্ঠন এবং প্রতিশোধ নিতে ব্যস্ত থাকে। তোমার প্রজাতি এই ভাগ্য বেছে নিয়েছে! তো এটাই থাক! ঈশ্বর তোমাকে তোমার ঘৃণ্য নিয়তি থেকে মুক্তি দেবেন না। সহিংসতা এবং রক্তপাতের সাপগুলো মানব জাতির উপর তাদের শ্বাসরোধ করা বাঁধন কখনোই শিথিল করবে না। তারা যেই ঈশ্বরের সাথে আজ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেই ঈশ্বরের নামেই একে-অপরকে হত্যা ও ধ্বংস করবে! গণহত্যা ও বর্বরতা কখনো তোমার সঙ্গ ছাড়বে না। এ আমার অভিশাপ, হে পতিত দেবতা! মানব জাতি তাদের শেষ পর্যন্ত সীমাহীন যন্ত্রণা ভোগ করবে।

'আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম! আমি তোমাদের সবাইকে অভিশাপ দিলাম!'

তারা এখন লাল, অশ্রুসজল চোখে মানুর দিকে তাকিয়ে আছে। সে জানে যে মানু রাগান্বিত নয়। কিন্তু সে এভাবে কখনো চুপ করেও থাকে না। তার সাথে তো কখনোই না। এমনকি রাগ যখন তাকে প্রায় গ্রাস করে নেয়, সেই বিরল সময়গুলোতেও না।

এতক্ষণে সত্যব্রত মানু নীল আগুনের রাতে তার মহান পিতা এবং রাক্ষস-রাজা সুরের বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধের দৃশ্যে চলে গেছে। সে তার চোখের সামনে সেই ভয়ংকর রাতটি প্রায় দেখতে পাচ্ছিলো...

সরস্বতীর পাঁচ পুত্রের মতোই ষষ্ঠ ঋষি নীল অঙ্গারের মধ্য থেকে কথা বললেন।

'তুমি নিছক কথার মাধ্যমে এই কসাইদের থামানোর ক্ষীণ চেষ্টা করেছ, দেবতা! অথচ তুমি ঈশ্বরের প্রদত্ত শক্তিশালী মহাজাগতিক অস্ত্রের অধিকারী! মহান রুদ্র-মারুর ধারক! তবে তাই হোক! এই দুর্ভাগ্যজনক রাতে তুমি যেভাবে ঐশ্বরিক ঋষিদের একের পর এক জ্বলতে দেখেছ, ভাগ্য তোমার বংশকে ঠিক সেরকম হিংস্রভাবেই ধ্বংস করবে–পুত্রের পর পুত্র, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। আমি তোমাকে এবং তোমার সমগ্র রক্তরেখাকে অভিশাপ দিলাম, হে পতিত দেবতা...

'তোমার বংশের প্রত্যেকটি ছেলের আজকের মতোই হিংস্র ও ভয়ংকর মৃত্যু হবে।

'আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম! তোমার পুরো রক্তরেখাকে অভিশাপ দিলাম!

'এই অভিশাপ শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হবে!'

ষষ্ঠ সপ্তর্ষি ভস্মীভূত হওয়ার আগে শেষবারের মতো কথা বলে উঠলেন। কিন্তু এবার তার কণ্ঠে রাগের চেয়ে বেশি করুণা ছিলো।

'তুমি সত্যিই অন্ধ হয়ে গেছ, বিভাসন। তুমি ছিলে সর্বোত্তম মানব, যে একসময় মানুষের আত্মার গভীরে এবং সময়ের বালুকাতে তাকাতে পারতো, সে আজ তার নিজের সন্তানের ব্যাপারে উদাসীন।

'তোমার ছেলে বেঁচে আছে, হে কলঙ্কিত সূর্য! আর সেই হবে প্রথম ব্যক্তি, যে মহাপ্রলয় কমার পর সকালের প্রথম রশ্মি দেখতে পাবে। মানু পূজারি সকল সৃষ্টির রক্ষক হবে! সত্যব্রত মানু হিসেবে পরিচিত এবং অমর হয়ে শাশ্বত সত্যের অভিভাবক হবে!

'তোমার জন্য সমবেদনা, হে হতভাগ্য পিতা, কলঙ্কিত অর্ধ-ঈশ্বর!'

* * * * *

যেন দূর থেকে তারার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে মানু, বুঝতে পারছে যে সে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ওর আঙুলগুলো তার হাতের চারপাশে আঁকড়ে ধরে তাকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করছে।

ও এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিলো। দুঃখ, অপরাধবোধ ও ভয়ের এক ঘোর। অভিশাপগুলো একের পর এক সত্য হচ্ছে। আর্যাবর্ত তখন থেকেই রক্তপাতের আগুনে পুড়ছিলো। যদি এই ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শেষ পর্যন্ত সত্য হয়, তাহলে এর পরের কথাগুলোও অবশ্যই সত্য হয়ে যাবে। তার রক্তরেখা ও সমগ্র মানব জাতি রক্তনদীর অভিশাপের থাবায় বন্দি হয়ে গেছে তাহলে।

ধীরে ধীরে বর্তমানের ফিরে এলো মানু, মুখে ঠান্ডা, আর্দ্র বাতাসের স্পর্শ অনুভব করছে। অনুভব করলো, তারা ওকে আলতো করে চুম্বন করছে। গলা আর ঘাড়ে কামড় দিচ্ছে আলতো করে। সে ভালোবাসা মিশিয়ে এমনভাবে মানুর কানে ফিসফিস করে কথা বলছে যে তা শুনে হয়তো যেই নির্দয় ঈশ্বররা মানব জাতির উপর প্রলয় এনেছে, তাদের কঠোর মনও গলে যাবে।

'তুমি শুধু আমার, মানু, চিরকালের জন্য। আমি চাইনি তুমি সেখানে যাও। প্রতিশোধের চুল্লি তোমাকে এবং আমাদের সবাইকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতো। মৎস্য জানতেন যে এটা সত্য। সে যা করেছে, আমি যা করেছি, তা শুধু এই শত-সহস্র মানুষের মনে আশা বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এরা সবকিছুর জন্য তোমার উপর নির্ভরশীল, মানু। এই কথা বলার জন্য দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো, হে পরাক্রমশালী সত্যব্রত। কিন্তু আমি দেখেছি যে মহান সূর্যের কী পরিণতি হয়েছে। আমি সেখানে রক্তের বৃষ্টিতে ছিলাম। আমি তোমাকে একই পথে চলতে দিতে চাইনি। আমি চাইনি তুমিও দানবে পরিণত হও।'

বানারস, ২০১৭

মৃত্যুর শীতল চোখ

আসলাম বাইকার দূর থেকে একটা বড় কাচের জানালার ভেতরে দেখছে।

তখন প্রায় মধ্যরাত। ঝকঝকে বানারস হোটেলের পুরো জিমনেসিয়াম ভাড়া করা হয়েছে মাচেরা বিয়ানকার জন্য। হোটেলের হেলথ-ক্লাবের প্রবেশদ্বারটি সিল করে দেওয়া হয়েছে এবং ইউরোপীয় ক্রাইম লর্ডের সশস্ত্র যোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছিলো।

সাদা মুখোশ তার শীতল মন, অবিনশ্বর দেহ ও অন্ধকার আত্মার উপর সম্পূর্ণ নির্জনতায় কাজ করতে পছন্দ করে।

* * * * *

এই গভীর রাতে এসে বিদ্যুৎ ব্যায়াম করার মতো সময় খুঁজে পেল। সারা দিন বাবা ও পুরোহিতজির সাথে স্নায়ু-বিধ্বংসী তথ্য নিয়ে আলোচনার পর তার এখন এন্ডোরফিনের প্রয়োজন, যাতে তার দেহ কিছুটা শিথিল হয়।

সে তার বাসভবনের বারান্দায় একা একাই ব্যায়াম করছে। সনু এসে তাকে সাহায্য করছে মাঝেমধ্যে। তার একনিষ্ঠ অনুসারী তাকে সবকিছুতেই সাহায্য করে যাচ্ছে–জলের বোতল আনা থেকে শুরু করে তার দেবতাকে ভারী ওজন তুলতে সাহায্য করা পর্যন্ত।

চাঁদের রুপালি আলোয় বিদ্যুতের ঘর্মাক্ত শরীর চকচক করছে।

* * * * *

একজন মানুষ যে এই পরিমাণ ওজন উঠাতে পারে, আসলাম বাইকার এই প্রথম দেখলো। যদিও তার হিংস্র কর্মজীবনের চাহিদার কারণে তাকে নিয়মিত জিমে যেতে হয়, কিন্তু কখনো এরকম দৃশ্য সে দেখেনি।

মাশ্চেরা অত্যাধুনিক বেঞ্চে শুয়ে আছে। শুধু শরীরের নিচের অংশে একটা কালো রঙের ইজরায়েলি ক্র্যাভ মাগা পরে আছে। সে ক্রোম রড ধরে যে ওজন উঠালো সাধারণত তা উঠানোর জন্য ভারী ক্রেনের প্রয়োজন হয়। অমানবিক চাপের কারণে তার মাথায় রক্ত জমাট বেঁধে শিরা ফেটে যাওয়ার অবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু ব্যায়াম চালিয়ে গেল সাদা মুখোশ।

কোনো কারণে আসলাম বাইকারের মনে হলো সে বমি করে ফেলবে। এ এক বিদঘুটে দৃশ্য। অস্বাভাবিক এবং খুব ঘৃণ্য। চিত্তাকর্ষক ব্যায়াম হিসেবে যা শুরু হয়েছে, তা এখন অতিমানবীয়, অপ্রাকৃত শারীরিক শক্তির প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে।

* * * * *

প্রতিটি নতুন দিন এর সাথে অনন্য কিছু নিয়ে আসে যা সনুকে তার দেবতা সম্পর্কে মুগ্ধ করে।

শারীরিক সহনশীলতা ও পরিশ্রম সম্পর্কে সনু অজ্ঞ নয়। সে একজন স্বাস্থ্যবান তরুণ যে মঠের ব্যায়ামশালায় প্রতিদিন সকালে ঘন্টাখানেক ব্যায়াম করে। এমনকি সে বানারসের আখড়াতেও যায় যেখানে সে ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী পালোয়ান বা কুস্তিগীরদের দেখেছে।

কিন্তু তার বিদ্যুৎ দাদার ব্যাপারে কিছু একটা ভিন্ন ছিলো। সনু একাই বিদ্যুতের পেশিবহুল দেহের কমনীয়তা দেখছে না। অন্য কেউও ছিলো এখানে। কিছুটা দূরে ন্যায়না তার বারান্দা থেকে এই স্বর্ণমানবের থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। বিদ্যুতের পুরুষালি সুবাসের কথা তার মনে পড়ে গেল। সে তার নরম ঠোঁটের স্পর্শ প্রায় অনুভব করতে পারছে।

রাতের এই সময়ে, এই মুহূর্তে তাকে তার প্রয়োজন। তার ভালোবাসা, তার বিদ্যুৎকে এখন তার প্রয়োজন।

ভয় যখন ঘিরে রেখেছে সাদা মুখোশকে, ভালোবাসার চাদর তখন ঘিরে রেখেছে শেষ দেবতাকে।

* * * * *

মনে হচ্ছে আসলাম বাইকারের পাদুটো তাকে সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে পেরেক দিয়ে গেঁথে রেখেছে। সে নড়তে পারছে না। জানালার আড়ালে পাগলামি চলা সত্ত্বেও সে তাকিয়ে রইলো, কিছু একটা তাকে থাকতে বাধ্য করছে কী ঘটে তা দেখার জন্য।

মাচেরা এখন জিমের এককোণে ঝোলানো বিশাল এক পাঞ্চিং ব্যাগে ঘুসি মারছে। তার হাতের উপরে টেপ বাঁধা, ধীরে ধীরে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ছন্দে ঘুসি মেরে যাচ্ছে। ঘেমে ভিজে গেছে সে, সোনালি চুলগুলো পেছনের দিকে ফেরানো।

তারপর গতি বাড়িয়ে দিলো সাদা মুখোশ। এখন দেখে মনে হচ্ছে পাঞ্চিং ব্যাগে কেউ মেশিনগান দিয়ে গুলি করছে। মিলানের সবুজ চোখের তরুণ, ক্রু-ডাইভার খুনি একজন অসাধারণ দক্ষ যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। এত দ্রুত ঘুসি মারছে যে তা দেখে আসলামের মাথা খারাপ হয়ে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে মুম্বাইয়ের গ্যাংস্টার আরেকটা উদ্ভট দৃশ্য লক্ষ করলো। মাচেরার হাত টেপের মোটা স্তর দিয়ে ঢাকা থাকলেও তার আঙুলের গিটগুলো গোলাপি বর্ণ ধারণ করেছে।

যতই সময় যেতে থাকলো, সাদা মুখোশের হাত তার নিজের রক্তে লাল হতে থাকলো, কিন্তু এরপরেও সে চামড়ার ব্যাগটিতে অনবরত আঘাত করে যাচ্ছে, যেন সে ব্যথা পায় না। যেন সে কোনো মানুষ নয়।

* * * * *

বিদ্যুৎ তার ব্যায়ামের দ্বিতীয় ধাপ শুরু করলো। কিছুটা দূরেই দাঁড়িয়ে থাকা ন্যায়না আর সনু বিশ্বাসই করতে পারছে না যে অষ্টাঙ্গ যোগব্যায়ামে বিদ্যুৎ এতটা দক্ষ। তার ফ্রি হ্যান্ড আর ওজন উত্তোলন ব্যায়ামের পর দেবতা সমান গুরুত্বের সাথে যোগব্যায়াম করতে শুরু করলো।

কিন্তু এটাই সব ছিলো না।

অষ্টাঙ্গ যোগ হলো যোগ কোরুন্তার প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে বামন ঋষি দ্বারা লিপিবদ্ধ যোগব্যায়ামের প্রাচীন একটা পদ্ধতি। কিন্তু বিদ্যুৎ শুধু এই একটা পদ্ধতিই ব্যবহার করছে না। সে অষ্টাঙ্গ যোগের সাথে চাইনিজ মানসিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণের একটা পদ্ধতি চি-গং-এরও সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। সে ধীরে ধীরে তার হাতগুলো বৃত্তাকারে ঘোরাচ্ছে, পাশবিক শারীরিক শক্তি তার যোগিক গতিবিধির সাথে সমানভাবে মিলছে।

কিছুক্ষণ পর ধ্যানে বসলো বিদ্যুৎ। প্রাথমিক ব্যায়ামের কারণে হওয়া তার উর্ধ্বশ্বাস ধীর ধীরে শান্তিপূর্ণ, ছন্দময় শ্বাস-প্রশ্বাসে রূপান্তরিত হলো। নিকটবর্তী

গঙ্গা থেকে নির্গত শীতল কাশীর হাওয়া বিদ্যুতের লম্বা, সুন্দর চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিচ্ছে। তার অভিব্যক্তি ধীরে ধীরে একজন দক্ষ, তরুণ ঋষির মতো হতে শুরু করে। তার ধ্যানমগ্ন মুখে ফুটে ওঠে প্রায় অলক্ষিত, সুন্দর এক হাসি।

যারা তাকে ভালোবাসে, তাদের কাছে তাকে দেখতে ঈশ্বরের মতো দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে।

* * * * *

মাশ্চেরা বিয়ানকা এখন হোটেলের উজ্জ্বল আলোকিত, বিশাল, বিলাসবহুল জিমনেসিয়ামের কেন্দ্রে বসে আছে।

মেঝেতে বসে থাকায় দেখে মনে হচ্ছে তপস্যা করছে। কোনো ধরনের মন্দ, বিকৃত ভঙ্গিতে। ধ্যানরত মানুষের চেহারা সাধারণত শান্ত থাকে; আসলাম বাইকার তা ভালো করেই জানে। কিন্তু মাশ্চেরার চেহারা ভয়ংকর দেখাচ্ছে। এই ধরনের ধ্যান দেখে আসলামের জাপানের সামুরাইদের ধ্যানের কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু তার চেহারায় সামুরাইদের মতো ভক্তি ছিলো না। এই অভিব্যক্তি ভিন্ন।

নিনজা, হয়তো? মুম্বাইয়ের ডন ভাবলো। এতক্ষণে সে মাশ্চেরার চেহারার একটা দিকই দেখতে পাচ্ছিলো।

মাশ্চেরা কিছু শব্দ উচ্চারণ করছে, কিন্তু আসলাম যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তার কোনো কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। মুম্বাইয়ের ডন এখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। যথেষ্ট হয়েছে। সে স্বস্তিতে ছিলো এই ভেবে যে মাশ্চেরা তাকে ব্যক্তিগত সময়ে উঁকি দিতে দেখেনি। যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতেই তার হৃদয় জমে গেল। মাশ্চেরা হঠাৎ চোখ খুলেছে। আসলাম বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করার আগেই ওর দিকে ঘুরে তাকালো লোকটা।

সে যা দেখলো, হলফ করে বলতে পারে যে এগুলো মানুষের চোখ নয়। সাদা মুখোশের সবুজ চোখগুলো সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে আসলামের দিকে তাকিয়ে থাকা চোখগুলো কাফনের মতো সাদা।

এগুলো নির্ঘাত মৃত্যুর শীতল চোখ।

সাদা মুখোশকে দেখতে স্বয়ং শয়তানের মতো দেখাচ্ছে।

'তোমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া একটা বার্তা আছে তোমাকে দেওয়ার জন্য, সত্যব্রত,' প্রচণ্ড বললো।

প্রচণ্ডের অনুরোধে মানু অসুর-রাজকে পুরো জাহাজ ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। সে তারাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। বুঝতে পেরেছে যে মেয়েটা যা করেছে তা কেন করেছে। মানু তাকে খুব ভালোবাসে, তাই তার উপর দীর্ঘক্ষণ রাগ ধরে থাকতে পারে না। সে সোমদত্তকেও তার বাবার সম্পর্কে সত্য গোপন করার জন্য ক্ষমা করে দিয়েছে। এমনিতেও সে সোমদত্তের কাছে অনেক ঋণী ছিলো। প্রধান স্থপতির মুখে মানু তার মহান পিতার আভাস খুঁজে পায়।

কিন্তু সে মৎস্যকে ক্ষমা করেনি। ও জানে যে সোমদত্ত আর তারা সর্বোপরি সাধারণ মানুষ। এরা মৎস্যের কথা অমান্য করতে পারতো না। তার কথার উপরে কথা বলতে পারতো না। কিন্তু মৎস্য হচ্ছেন ঈশ্বর। তিনি চাইলে জিনিসগুলো অন্যভাবে করতে পারতেন।

তিনি চাইলে আমি শেষবারের মতো বাবার সাথে দেখা করতে পারতাম। তিনি চাইলে আমরা বাবাকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে পারতাম।

মৎস্যের প্রতি সত্যব্রত মানুর তিক্ততা মহৎ এই ব্যক্তির প্রতি তার সীমাহীন ভালোবাসার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ঠিক সেই ধরনের বিরক্তিকর আকাঙ্ক্ষা যা একটা শিশু তার ব্যবসায়ী বাবার জন্য অনুভব করে, যিনি ব্যবসায়িক কারণে কয়েক মাস ধরে সমুদ্রে আছেন।

কেবল পার্থক্যটা হলো, এই ক্ষেত্রে মৎস্য নিজেই ছিলেন সমুদ্র।

* * * * *

'কী বার্তা, হে পরাক্রমশালী প্রচণ্ড? আমার বাবা কী বলেছেন?' মানু সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলো। তার প্রিয় বাবার যেকোনো শব্দ এই যুবক ঋষি-রাজের জন্য একটা মূল্যবান উপহার ছিলো।

প্রচণ্ড থেমে মানুর দিকে ফিরলো।

'তোমার মহান পিতার শেষ মুহূর্তে একমাত্র সান্ত্বনা ছিলো যে তিনি জানতেন তুমি প্রলয় পরবর্তী সময়টা দেখার জন্য বেঁচে থাকবে। শেষ সপ্তর্ষি তাকে আশ্বস্ত করেছেন। তিনি আরো ঘোষণা করেছেন যে এই শেষ মুহূর্তে তুমিই হবে মানব জাতির ত্রাণকর্তা।'

মানু দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লো। কী বলবে, কী বিশ্বাস করবে বুঝতে পারছে না। আপাতত প্রলয়কে অপরাজেয় বলেই মনে হচ্ছে।

'হে অসুর-রাজ, আমরা দেখবো কী হয়। এখন অনুগ্রহ করে আমার বাবার বার্তা আমাকে বলো,' মানু অনুরোধ করলো।

'সূর্য আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে হাজার হাজার মানুষকে জাহাজে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তুমি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণীকেও বাঁচাতে পারবে। তার কোনো সন্দেহ ছিলো না যে তুমি প্রয়োজনীয় ভেষজ, সুতা, বীজ এবং সংকর ধাতুও বহন করবে। তবে তিনি আমাকে বিশেষভাবে জানাতে বলেছেন যে তোমার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো জ্ঞানকে বহন করা, আমাদের সময়ের জ্ঞানকে মানবতার নতুন ভোরে নিয়ে যাওয়া।'

তার বাবা আসলে কী বলতে চেয়েছেন সত্যব্রত তা স্পষ্ট বুঝতে পারলো না। কিন্তু সে তার প্রয়াত বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য যেকোনো প্রান্তে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শত হোক, এ তার বাবার চূড়ান্ত আদেশ।

'হে অসুরদের রাজা, আগামী যুগে আমাদের প্রাচীন ও বর্তমান জ্ঞান যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে আমি খুব ভালো করেই জানি। এই কারণেই আমাদের পণ্যসম্ভারে বই, মানচিত্র এবং ধর্মগ্রন্থের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি সবচেয়ে ভালো পণ্ডিত, রসায়নবিদ, চিকিৎসক এবং স্থপতিদের আমরা আমাদের সাথে নিয়ে যাচ্ছি। সপ্তর্ষিরাও আমাদের সাথে আছেন এবং...'

'তোমার বাবা এটা বোঝাতে চাননি, মানু,' প্রচণ্ড বাধা দিলো, বাতাসে হাত তুলে ইঙ্গিত দিলো যে মানুর কথা বন্ধ করা উচিত। কিছুক্ষণ বিরতির পর সে আবার বলতে শুরু করলো, 'বর্তমানে যে শাস্ত্রগুলো তুমি বহন করছো, সেগুলো কি মহাপ্রলয়ের গল্প ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বর্ণনা করবে?'

'না, করবে না,' মানু ভেবেচিন্তে উত্তর দিলো।

'অন্যদের কথা ছেড়ে দাও। তোমার বহন করা শাস্ত্রগুলোতে কি সত্যব্রত মানু, শতরূপা এবং মহাভরীর গল্প থাকবে?'

মানু চুপ করে রইলো।

প্রচণ্ড এবার বিভাসন পূজারি যা যা বলছেন তা হুবহু বলতে লাগলো।

'হে সত্যব্রত, তোমাকে নতুন করে শাস্ত্র লিখতে হবে। পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে লেখো। বর্তমান নিয়ে লিখো। লেখো কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ। কোনটা পবিত্র আর কোনটা ভ্রষ্ট। দেবতাদের গল্প আর অসুরদের গল্প। বিষ্ণুর কথা লেখো, পশুপতির কথা লেখো। সূর্যের কথা লেখো, সরস্বতীর কথাও। আজ তুমি যা লিখবে তা অমর হয়ে থাকবে, সত্যব্রত। তুমি যা লিখবে তা হবে পবিত্র শাস্ত্র, যা অধ্যয়ন করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত মানব জাতি এর উপাসনা করবে।'

মানুর চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। বাবার কথাগুলো সে যেন শুনতে পাচ্ছিলো। হাতজোড় করে প্রচণ্ডকে প্রণাম করলো সে, যাকে আপাতত তার প্রিয় বাবার ছায়া বলে মনে হচ্ছে।

'যদি তুমি মনে করো যে আমি এমন একটা কঠিন উদ্যোগ নিতে সক্ষম, যদি বিশ্বাস করো যে আমি পবিত্র শাস্ত্রগুলো নথিভুক্ত করতে পারবো, তবে আমি তোমার আদেশ অনুসারে কাজ করবো, বাবা...' মানু বললো।

'আমি শাস্ত্র লিখবো। সেই সাথে লিখবো যোগ-শাস্ত্র, ন্যায়-শাস্ত্র, ধর্ম-শাস্ত্র, বাস্তু-শাস্ত্র, মোক্ষ-শাস্ত্র, রসায়ন-শাস্ত্র, কাব্য-শাস্ত্র এবং আরো অসংখ্য। আমার বংশধররা প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই শাস্ত্রে তথ্য যোগ করে যাবে।

'আমরা যাতে তোমার কাছে যে পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা কখনো ভুলে না যাই, সেজন্য আজ থেকে আমরা পূজারি নামে নয়, শাস্ত্রী উপাধিতে পরিচিত হবো। আমার সন্তান এবং তাদের সন্তানেরা চিরকাল শাস্ত্রের রচয়িতা হিসেবে পরিচিত হবে।

'তাদের চিরকাল শাস্ত্রী বলা হবে।'

বানারস, ২০১৭
বিদ্যুৎ ও ন্যায়না

এখন প্রায় রাত ২ টা বাজে।

বিদ্যুৎ শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত। তারপরেও ঘুম আসছে না।

সে ইলুমিনাতি, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এবং এই গ্রহে ও এর বাসিন্দাদের উপর তাদের ভয়ংকর দখল সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছে।

কিন্তু সে এখনো জানে না কারা তার বাবাকে হত্যা করেছে। জানে না কেন তারা তার বাবাকে হত্যা করেছে।

* * * * *

ব্যায়ামের পর একটা দীর্ঘ স্নান ও হালকা নাস্তার পর সে বিশ্রাম নিতে গেল। বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়তেই দরজায় একটা মৃদু ধাক্কা শুনতে পেল। উঠে গিয়ে দরজার পুরোনো লোহার ছিটকিনি খুললো বিদ্যুৎ।

ন্যায়না দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের মধ্যে থাকা সমস্ত সঠিক এবং সমস্ত ভুল সত্ত্বেও বিদ্যুৎ এবং ন্যায়না নিজেদেরকে একে অপরের হৃদয় ও মন থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারেনি। ন্যায়না জানতো বিদ্যুতের বাগদান হয়ে গেছে। কিন্তু তার স্পন্দিত হৃদয় তার সকল যুক্তিকে পরাভূত করে, তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অসাড় করে দেয়। বিদ্যুৎ জানতো যে তার উপর শুধু দামিনীর অধিকার আছে। কিন্তু ন্যায়নার মধ্যে এমন কিছু আছে যা তাকে সমস্ত কারণ, সমস্ত সচ্ছলতা, এমনকি সমস্ত দেবত্ব ভুলে যেতে বাধ্য করে।

তবুও মানবিক দুর্বলতার এক বা দুই মুহূর্ত বাদ দিলে এই এত কিছুর পরেও সে দামিনীকে ভুলতে পারেনি।

ন্যায়না একটা ঢিলেঢালা কালো শার্ট পরেছে, যেটার বোতাম স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি নিচে ছিলো। তার চোখ চকচক করছে, মুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করছে

ত্বক। বিদ্যুৎকে খালি গায়ে পেয়ে আনন্দিত হলো সে। এগিয়ে গিয়ে তার বুকে কিছুক্ষণ নিজের ঠোঁট চেপে রাখলো। তারপর বারবার চুমু খেতে লাগলো তার কাঁধ, বুক এবং ঘাড়ে।

বিদ্যুৎ তাকে প্রায় বিছানায় নিয়েই চলে গেছে। এদিকে ন্যায়না অপ্রতিরোধ্য। তার মতো সুন্দরী কোনো মেয়ের গভীর ভালোবাসা ও আবেগ কেবল কোনো দেবতাই প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

আর বিদ্যুৎ দেবতাই ছিলো।

কিছুক্ষণ নতি স্বীকার করার পর বিদ্যুৎ আলতো করে সরে গেল।

ন্যায়নার খেয়াল ছিলো না। সে এগিয়ে গেল, পেছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দেবতাকে তার বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলো।

'আমাকে ভালোবাসো, বিদ্যুৎ...' দেবতার কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললো ন্যায়না, এইমাত্র তার কানের লতিতে মৃদু কামড় বসিয়েছে।

বিদ্যুৎ ন্যায়নার কবজি ধরে তার পাশ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলো। ন্যায়না কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই বিদ্যুৎ তার চোখের দিকে তাকালো, তারপর উষ্ণ এক আলিঙ্গনে বাঁধলো। এই রাতে দেবতা ন্যায়নাকে শুধু এতটুকুই দিতে পারবে। কিন্তু ন্যায়নার আরো বেশি কিছু প্রয়োজন ছিলো।

বিদ্যুতেরও।

কিন্তু বিদ্যুৎ ৩,৭০০ বছর আগে দামিনীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে।

বিভাসন সানজানাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তারা অপর দিকে পার হবেন একসাথে।

* * * * *

ন্যায়না কোনো সাধারণ মেয়ে ছিলো না।

সে প্রতিকূলতা সামলাতে জানে। সন্ত্রাসীদের সাথে সামনাসামনি লড়াই করতে জানে। জানে কীভাবে ঘৃণা আর অসুরদের সামলাতে হয়।

কিন্তু প্রত্যাখ্যান কীভাবে সামলাতে হয় তা সে জানতো না।

অন্তত বিদ্যুৎ থেকে নয়।

অন্ধকার রুমের একটা চেয়ারে বসে আছে সে। একমাত্র যে ব্যক্তিকে সে মন থেকে চায়, তার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় বিব্রত ও ভেঙে পড়লো।

'আমার যাওয়া উচিত!' নিজের সুন্দর আঙুল দিয়ে গালে বয়ে যাওয়া অশ্রু মুছে ফেললো।

'যেও না, ন্যায়না...' বলেই বিদ্যুৎ ওর হাত ধরে বললো। 'আমাদের কথা বলা দরকার, তাই না?'

সে জানে এখানে অনেক কিছু আছে যা তাদের একসাথে আবদ্ধ করে রেখেছে। অনেক কিছু, যেগুলো বলা যায় না, শোনা যায় না।

* * * * *

'তুমি জানো, দামিনী যদি আমার জীবনের ভালোবাসা না হতো, কিছুই আমাকে তোমার থেকে দূরে রাখতে পারতো না, ন্যায়না? তুমি এটা জানো, তাই না?'

'তুমি আমার কাছে কী চাও, বিদ্যুৎ?' জবাব দিলো ন্যায়না। সে দ্বিতীয় স্থানের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলো না। ভালোবাসা তার কাছে কোনো প্রতিযোগিতা নয়।

ন্যায়নার পায়ের কাছে বসলো বিদ্যুৎ, তার হাতটা আদর করে জড়িয়ে ধরলো।

'আমি চাই তুমি চিরকাল আমার সেরা বন্ধু হয়ে থাকো, ন্যায়না। বালা চলে যাওয়ায় আমি অনেক একা হয়ে গেছি। আমার এমন একজন বন্ধু দরকার যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি। আমার এমন একজন বন্ধু দরকার যাকে আমি ভালোবাসতে পারি...'

ন্যায়না হাসলো, তার সুন্দর মুখ বেয়ে তখনো অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

'তুমি কি জানো, বিদ্যুৎ...দামিনী সত্যিই ভাগ্যবান। সবাই এমন কাউকে খুঁজে পায় না যে তাদের এত আবেগের সাথে, এত আপসহীনভাবে ভালোবাসে...'

বিদ্যুৎ সরাসরি তার চোখের দিকে তাকালো, তার প্রতিটি অশ্রুবিন্দু যন্ত্রণায় পূর্ণ ছিলো।

বিদ্যুৎ সামনে ঝুঁকে তার গালে চুমু খেল।

'না, আমি সত্যিই ভাগ্যবান। তোমার মতো চমৎকার কেউ সবার প্রেমে পড়ে না।'

ন্যায়না চোখ বন্ধ করলো, বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটা নিজের সহ্য সীমার চেয়ে বেশি মানসিক কষ্ট পাচ্ছে।

তারপর চোখ খুললো সে। ওর মধ্যে তার স্বাভাবিক দুষ্টু আভা ফিরে এসেছে আবারো। অবজ্ঞার সুরে বললো, 'তোমার প্রেমে? তুমি যে কারণেই এই ভুল ধারণায় থাকো না কেন, জনাব অর্ধ-মানব, অর্ধ...'

কিন্তু বাক্যটা সম্পূর্ণ করতে পারেনি মেয়েটা। বিদ্যুতের বুকের উপর মাথা রাখলো ন্যায়না, তারপর তার চোখের জল না শুকানো পর্যন্ত কাঁদতে থাকলো।

প্রচণ্ড ও তার প্রধান সেনাপতিরা হতবাক হয়ে গেছে।

তারা টানা সাত ঘণ্টা ধরে হাঁটছে, কিন্তু জাহাজের ছোট একটা অংশও এখন পর্যন্ত ঘুরে শেষ করতে পারেনি। যদিও দৈত্যাকার জাহাজটি দেখতে কদাকার এবং মনে হচ্ছে প্রলয়ের একটা ছোট ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

তবুও এটাকে একরকম মহিমান্বিত, দুর্ভেদ্য এবং একমাত্র জাহাজ মনে হচ্ছে, যে জাহাজ এই কেয়ামতের বন্যাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। সেই বন্যা যা সমস্ত পরিচিত পৃথিবীকে গ্রাস করেছে।

'একদম নিচের অংশে আমরা সবচেয়ে ভারী উপাদানগুলো সংরক্ষণ করবো যেগুলো আর্দ্রতা ও অন্ধকারের কারণে তূলনামূলক কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এই পানির নিচের অংশে কার্গোগুলোতে তামার অস্ত্র, বড় বড় সাপ আর সরীসৃপ রয়েছে। মাছ আর সমুদ্রের প্রাণীদের জন্য আমাদের বৃহত্তম জলাধারগুলোও এই নিচের অংশে স্থাপন করা হয়েছে।'

মানু বাস্তবসম্মতভাবে জাহাজের প্রতিটা অংশ বর্ণনা করছে। শ্রোতারা, যারা এই প্রকৌশল পদ্ধতি এই প্রথম দেখছে, তাদের কাছে এটা কোনো রূপকথার গল্পের মতো ছিলো। সরীসৃপের সাথে তামার অস্ত্র! জাহাজে সামুদ্রিক প্রাণী?

সত্যব্রত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কথা বলছে। সে ইঙ্গিতে তার বন্ধু ধ্রুবকে ট্যুর চালিয়ে নিতে বললো।

'এই মহাতরীর সামনের হালটি দশ হাজার ওক গাছ দিয়ে তৈরি। প্রতিটি হালেই হাতল আঁটা ও দড়ির লিভার লাগানো আছে, যাতে পনেরোশো লোক দুই দিক থেকেই এটা টানতে পারে। আমরা এখনো এটা পরীক্ষা করিনি, কিন্তু গাণিতিক সমীকরণমতে, হালগুলো পানির নিচে গেলে সেগুলো এই পরিমাণ মানুষের দ্বারা পরিচালনা করার মতো হালকা হয়ে যাবে।'

তারা যা তৈরি করেছে তাতে ধ্রুব দৃশ্যত গর্বিত ছিলো।

* * * * *

এমনকি প্রচণ্ডের মতো সাহসী ব্যক্তিও ভয় পাচ্ছে। তারা, সোমদত্ত আর ওদের লোকজন যে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে সহজেই ওঠানামা করছে, তা প্রচণ্ড ও তার লোকের কাছে মরণ ফাঁদের মতো লাগছে। একবার পিছলে যাওয়া মানে শুধু মৃত্যুই নয়। এর অর্থ হলো এত দীর্ঘক্ষণ ধরে অবাধে পড়তে থাকা যে এই ঘটনাকে ঘিরে থাকা প্রতিটি ভাবনা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা যাবে। এদিকে কালো মেঘ এবং অবিরাম বৃষ্টি আরোহণ আর অবতরণকে আরো জটিল করে তুলেছে। এ এক ধোঁয়াটে, হিমায়িত নরকে নেমে যাওয়ার মতো ব্যাপার।

তারপর মানু ও ধ্রুবকে দেখতে পেল প্রচণ্ড। ওরা কেবল দড়ি ব্যবহার করে জাহাজের অন্তহীন খাড়া কাঠামোতে ওঠানামা করছে। দুজনেই আলাদা আলাদা দুটি দড়ি ধরলো। পা ব্যবহার করে ওরা নিজেদের বাতাসে ঠেলে দেয়, এরপর দক্ষ পর্বতারোহীদের মতো বিশেষ এক পদ্ধতিতে নিচে নেমে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই ওরা কুয়াশার অনেক নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রচণ্ড আর তার লোকদের দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না, যা মানু এবং ধ্রুবর পরিবহন পদ্ধতির তুলনায় এখন বিলাসিতা বলে মনে হচ্ছে।

অবশেষে ওরা সবাই নিচের ডেকে নামলো। এই অগ্নিপরীক্ষায় কোনো সঙ্গী না হারানোয় স্বস্তিই পেল। অসুররা চোখ বড় বড় করে স্থাপত্যের এই বিস্ময়কে দেখছে।

'প্রধান ডেকের নিচের সতেরোটি স্তর আমরা আমাদের লোকেদের থাকার জন্য রেখেছি। প্রতিটি স্তরে বারোশোটি করে কেবিন আছে এবং প্রতিটি কেবিনে চারজন করে মানুষ খুব স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারবে। শিশু ও নারীরা দুই শিফটে বিশ্রাম নেবে। সক্ষম পুরুষরা তিন শিফটে বিশ্রাম নেবে, যাতে সবাই অন্তত আট ঘন্টা করে বিশ্রাম নিতে পারে। এই পদ্ধতিতে আমরা প্রায় দুই লক্ষ মানুষকে আশ্রয় দিতে সক্ষম হবো বলে আশা করি। শুধু একটা ব্যাপার, কেবিনগুলো একটা ছোট জানালাসহ এক ধরনের বাক্স ছাড়া আর কিছুই হবে না। মুশকিল হলো, আমরা জানি না যে মহাপ্রলয় কমতে কত সময় লাগবে। সবকিছু স্বাভাবিক হতে হতে কয়েক মাস...এমনকি বছর পার হয়ে যেতে পারে...' ধ্রুব বললো।

মনোযোগ দিয়ে শুনছে প্রচণ্ড। সে ভাবছে রাজাদের জন্য আলাদা কেবিন দেওয়া হবে কি না। ভাবনাটা মাথা থেকে দ্রুত মুছে ফেললো। প্রতিটা কেবিন মানে চারটা জীবন। চারটা মানুষের জীবন!

* * * * *

প্রচণ্ড নিজের সাথে আনা সোমরস উদারভাবে সবাইকে বিলাচ্ছে। সে মানুর দিকে একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিলো, কিন্তু মানু বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করলো। ধ্রুব অসুর রাজাকে সঙ্গ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো এবং সাদরে গ্লাসটি গ্রহণ করলো। ওর দেখাদেখি তাদের বেশ কয়েকজন নিলো সেই সোমরস।

কিন্তু কথোপকথন ধ্রুব যতটা আশা করেছে ততটা আনন্দদায়ক হলো না।

'আমার মানুষদের সাথে পাহাড়-পর্বত ঘুরে তোমার এখানে আসার একটা কারণ আছে, সত্যব্রত। যেমনটা জানো যে অসুরদের গুপ্তচরবৃত্তি খুবই শক্তিশালী। আমরা ব্যাডল্যান্ডের প্রতিটি উপজাতি ও প্রতিটি গ্রামে প্রবেশ করেছি যেখানে যুদ্ধবাজ দস্যুরা তাদের বর্বর সৈন্যসামন্ত নিয়ে শাসন করে। এরা সব সময়ই নিষ্ঠুর ডাকাত ছিলো। যাকেই সামনে পায় তাকেই আক্রমণ, খুন এবং লুটপাট করে। আমি শুনেছি যে তারা এমনকি তোমার সরবরাহের কাফেলাকেও পরাভূত করার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু সম্প্রতি আমার গুপ্তচরদের থেকে আরো বেশি উদ্বেগজনক তথ্য পেয়েছি।'

'কী তথ্য, হে পরাক্রমশালী রাজা?' টেবিলে উপস্থিত সোমদত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

'গত কয়েক মাস ধরে আমার গুপ্তচররা এমন কিছু লক্ষ করেছে, যা তারা এর আগে কখনো দেখেনি। দস্যু যুদ্ধবাজদের গ্রাম এবং ক্যাম্পগুলো অপ্রত্যাশিত দূতরা পরিদর্শন করছে,' প্রচণ্ড বললো।

'কার দূত, রাজা প্রচণ্ড?' এবার প্রশ্নটা করলো মানু। সে উত্তর শুনতে ভয় পাচ্ছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলো যে তার ভয় ভুল ছিলো না।

'দৈত্যদের দূত, মানু। বর্বর নারা-মুন্ডা সব দস্যু গোত্রের কাছে বার্তাবাহক পাঠাচ্ছে। ব্যাপার অত্যন্ত ভীতিকর; কারণ এর আগে কখনো এমনটা ঘটেনি। দৈত্য আর দস্যুদের মধ্যে সব সময় লড়াই হয়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে...'

'কোন উদ্দেশ্যে তারা দূত পাঠাচ্ছে? বর্বর নারা-মুন্ডা দস্যুদের কাছে কী চায়?' ধ্রুব কিছু বুঝতে না পেরে মানু আর প্রচণ্ডকে জিজ্ঞেস করলো।

'এরা নিজেদের মধ্যকার শত্রুতার ইতি টানছে শুধু আমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য। নারা-মুন্ডা তার নেতৃত্বে সব দস্যু ও উপজাতিদের একসাথে করতে চাইছে, ধ্রুব।'

'কিন্তু কেন?' ধ্রুব বিড়বিড় করে বললো, সে বিপদটা তখনো আঁচ করতে পারেনি।

মানু সহজভাবে উত্তর দিলো, কিন্তু তার শান্ত স্বর তার মনের গভীরে থাকা অস্থিরতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

'এরা জাহাজ চুরি করতে চায়।'

বানারস, ২০১৭
দেবতা ও রাক্ষস

বিদ্যুৎ তার বাবার সাথে খাওয়া-দাওয়া করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করে না। এখন সকাল ৯ টা বাজে। তারা মহান দ্বারকা শাস্ত্রীর কুটিরের বারান্দার মেঝেতে বিছানো খড়ের মাদুরের উপর বসে ছিলো।

মঠের কিছু তরুণ ছাত্র তাদের শ্রদ্ধেয় মঠাধীশ, তাদের প্রিয় পুরোহিতজি এবং তাদের প্রিয় বিদ্যুৎ দাদার কাছে সকালের নাস্তা পরিবেশন করছে। দ্বারকা শাস্ত্রী ও পুরোহিতজি সাধারণ চূরা-মটর খাচ্ছেন, অন্য দিকে বিদ্যুতের সামনে বানারসের সেরা দোকান থেকে সুস্বাদু গরম কচুরি ও জিলাপি পরিবেশন করা হয়েছে। তার সমস্ত দেবত্ব এবং বীরত্বের পরেও তারা এখনো বিদ্যুতের সাথে ছোট বাচ্চাকাচ্চার মতো আচরণ করছেন। সকালের নাস্তা শেষ করার পর তাদের কিছু গরম ভেষজ চা পরিবেশন করা হলো। দ্বারকা শাস্ত্রী সেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটি আবার শুরু করেছেন যা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

'আমরা সত্যব্রত মানুর বংশধর, বিদ্যুৎ। তুমি কি এই নামটা শুনেছ?'

বিদ্যুৎ এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। যে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে, সে সত্যব্রত মানুর কথা অবশ্যই শুনেছে। তিনি ছিলেন মহান ঋষি, মহান ত্রাণকর্তা। সে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে বুঝতে পারলো না। জীবনের প্রথম সে এমন কোনো তথ্য পেল যাতে সে একসাথে বিস্ময় ও গর্ব অনুভব করছে।

'কী!' বিদ্যুৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

'হ্যাঁ, বিদ্যুৎ। তোমার মনে আছে আমি তোমাকে বিভাসন পূজারি সম্পর্কে বলেছিলাম, সেই দেবতা যিনি ৩,৭০০ বছর আগে এই পৃথিবীতে ছিলেন? সেই একই দেবতা, যিনি এখন তোমার মধ্যে অবস্থান করছেন, যিনি তার দৈব ভাগ্য পূরণের জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন। তোমার হয়তো মনে আছে যে আমি হরপ্পার শেষ দিনের ভয়ংকর গল্প বর্ণনা করার সময় সূর্যের পুত্র মানুর কথাও উল্লেখ করেছিলাম।'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ, বাবা...আপনি বলেছেন।'

'বিভাসন পূজারির সেই পুত্র আর কেউ নন, তিনি হলেন অমর সত্যব্রত মানু-মহাতরীর নির্মাতা, যাকে মৎস্য নিজে মনোনীত করেছেন। তিনি ছিলেন শাস্ত্রের রচয়িতা। আমরা তারই বংশধর, বিদ্যুৎ। আমরা সেই মহান পুরোহিতরাজের বংশধর যিনি মানবতাকে মহাপ্রলয় থেকে রক্ষা করেছেন।'

* * * * *

'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের গোপন ভ্রাতৃসংঘের সবচেয়ে রহস্যময় এবং ভীতিকর দিক হলো আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র সম্পর্কে তাদের গভীর এবং তীব্র উপলব্ধি। যেমনটা আমি আগে উল্লেখ করেছি, তারা বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান পুরুষদের নিয়ে গঠিত। কিংবা চাইলে প্রতিভাবানও বলতে পারো। যদিও বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ ভাবে যে এইসব প্রতিভাবান মানুষরা নাস্তিক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃসংঘের সদস্যরা গভীরভাবে অন্য জগতের শক্তির মধ্যে প্রবেশ করে, ভালো এবং মন্দ উভয়ই, যা আমাদের গ্রহকে প্রভাবিত করে।'

'এ তো বিস্ময়কর ব্যাপার, বাবা। কে জানতো যে এই গণহত্যাকারী বদমাশরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী?'

মহান মঠাধীশ দ্বিমতে মাথা নাড়লেন। 'আমি বলিনি যে তারা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, বিদ্যুৎ। আমি বলেছি যে তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা সক্রিয়ভাবে শয়তানের কাছ থেকে অশরীরী সহায়তা চায়। সময়ের শুরু থেকে ভালো এবং মন্দ উভয়ই মহাজগতের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। গ্রহে জীবন এবং প্রেমের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে যে যারা বিশ্বকে একটা অন্ধকার রাজ্যে রূপান্তর করতে চায়, তাদের থেকে পুণ্যের শক্তি বেশি শক্তিশালী। কিন্তু এই যুদ্ধ চিরন্তন, বিদ্যুৎ। আর অর্ডার মনে করে যে তারা সময়কে তাদের পক্ষে ঘুরিয়ে নিতে পারবে।'

দ্বারকা শাস্ত্রী যা বলছিলেন বিদ্যুৎ তা বোঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভালো ও মন্দ, দেবতা ও রাক্ষসদের মধ্যকার চিরন্তন লড়াই...তথ্যগুলো এভাবে সরাসরি নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে। বিদ্যুৎ আরো বিশদ ব্যাখ্যা চাইতে পারার আগেই পুরোহিতজি থেকে শুরু করে বারান্দায় থাকা শিক্ষকদের সেবা করা যুবক-যুবতীদের কিছু একটা চমকে দিয়েছে। মনে হলো মেঝের নিচে কিছু একটা গর্জন করছে। ঠিক যেন পৃথিবীর হৃদয় থেকে নির্গত একটা ম্লান গর্জনের মতো। এক বা দুই সেকেন্ড স্থায়ী হওয়া এই অবর্ণনীয় কম্পন শুনে এবং তা অনুভব করার সাথে সাথে সবাই থমকে গেল।

দেখে মনে হচ্ছে যেন বিশাল কিছু মঠের মেঝের ঠিক নিচ দিয়ে চলে গেছে। একে অপরের দিকে তাকালো ওরা, হতবাক এবং নার্ভাস। বিদ্যুৎ লক্ষ করলো যে তার বাবা নিশ্চুপ।

দ্বারকা শাস্ত্রী তার প্রপৌত্রের মুখে কৌতূহলী উদ্বেগ দেখতে পেলেন। তিনি পুরোহিতজির দিকেও তাকালেন, যিনি ভয়ে প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছেন।

'শান্ত হও, তোমরা উভয়ে...তোমরা সবাই,' মঠাধীশ বললেন, যেন এইমাত্র যা ঘটলো তা গোপন করতে চাইছেন। 'যখন একটা মহান দেব-রাক্ষস যুদ্ধ নিজেকে উন্মোচন করার পর্যায়ে থাকে, তখন ভালো ও মন্দ উভয়ের শক্তিই পৃথিবীর গর্ভে নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করে।'

* * * * *

'যখন মহাতরী শেষ পর্যন্ত প্রলয় থেকে বেঁচে যায়, তখন মৎস্য নামক এক ঐশ্বরিক মৎস্য-মানব সত্যব্রত মানুর কাছে একটা প্রাচীন রহস্য নিয়ে যান। একটা ভবিষ্যদ্বাণী, আমাদের সময় বা কলিযুগের সাথে সম্পর্কিত একটা বৈশ্বিক ঘটনা। বিভাসন পূজারি ছিলেন এই গোপনীয়তার একজন অভিভাবক, যা মৎস্য তখন সত্যব্রত মানু এবং তার বংশধর, মানে আমাদের কাছে দিয়েছেন।'

'দারুণ! আপনি কি মৎস্যের কথা বললেন, বাবা? ভগবান বিষ্ণুর মৎস্য অবতারের কথা বলছেন নাকি? আপনি কি বলছেন মানু ও মৎস্যের পৌরাণিক কাহিনি আসলে সত্যি?'

দ্বারকা শাস্ত্রী হাসলেন।

'যিশু খ্রিস্টের গল্প কি সত্য, বিদ্যুৎ? আর নবী মোহাম্মদের? সিদ্ধার্থ গৌতমের বা বুদ্ধের? আমরা যদি তাদের সকলকেই বিশ্বাস করি, তাহলে ভগবান রাম, কৃষ্ণ বা মৎস্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে এত কঠিন কেন?'

বিদ্যুৎ ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে মাথা ঝাঁকালো। সে একটা মূর্খের মতো প্রশ্ন করেছে, তাও এমন একজনের কাছে যিনি তার পুরো জীবন মৎস্যের ভবিষ্যদ্বাণী রক্ষায় উৎসর্গ করেছেন।

'কে বলতে পারে মৎস্য অবতার নাকি মানুষ? এমনকি যখন ভগবান পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তিনি একজন মানুষের রূপেই আসেন, তা তিনি রাম বা কৃষ্ণ বা বুদ্ধই হোন না কেন। তিনি যখন একজন পবিত্র বার্তাবাহক হয়ে আসেন, তখন একজন মানুষ রূপে, একজন অবতার হয়ে আসেন। তিনি যখন ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে আসেন, তিনি তখনো একজন মানুষই থাকেন–এমন এক মানুষ যিনি ভালোবাসেন, যার রক্তপাত হয় এবং ব্যথা অনুভব করেন। দেবতা আর মানুষকে আমরা যতটা আলাদা বলে মনে করি ততটা নয়, বিদ্যুৎ। আর নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার ঠিক এটাকেই কাজে লাগাতে চায়।'

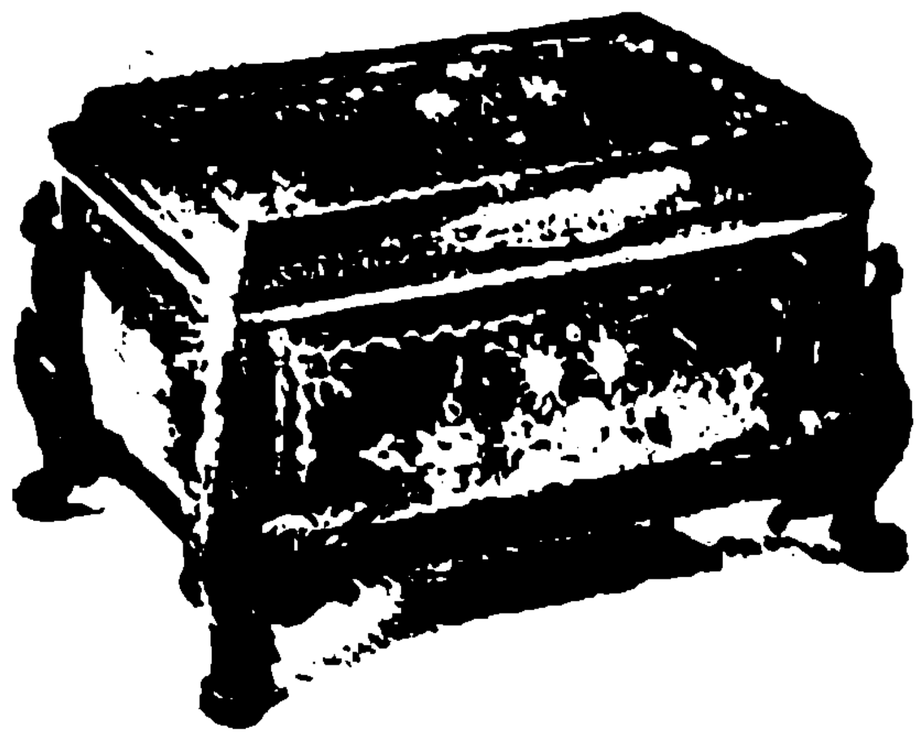

আর্যাবর্তের জন্মভূমি, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৯ অব্দ
বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র

'এটা এমন কোনো নির্জন জায়গা হতে হবে, যেখানে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।'

মহাতরীর বিরুদ্ধে দৈত্য এবং কয়েকটা দস্যু উপজাতির চলমান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মানু ও ধ্রুবকে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছে প্রচণ্ড। সে মানুকে এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে নারা-মুন্ডা যদি তার পরিকল্পনায় সফল হয়, তাহলে সে বর্বর, রক্তপিপাসু যোদ্ধাদের এমন বিশাল বাহিনী তৈরি করবে যাদের থামানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

মানু প্রত্যেক অসুর আর তাদের পরিবারের জন্য একটা আসনের বিনিময়ে তাদের জাহাজের প্রতিরক্ষায় যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দিলো, পাশাপাশি প্রচণ্ডকে একপাশে নিয়ে গেল কথা বলার জন্য।

'যদি দৈত্য এবং যুদ্ধবাজ দস্যুরা বাহিনী একত্র করে এবং জাহাজে আক্রমণ করে, তবে সম্ভবত তা হবে তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ, হে সূর্যপুত্র। এমনকি হরপ্পার সৈন্য, তোমার সাথে থাকা শক্তিশালী মৎস্য-মানব ও আমার সৈন্যরা একত্রে তাদের মোট সৈন্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ হবে।'

মানু মনোযোগ দিয়ে শুনছে। হীনতার জন্য দৈত্য এবং বুনো দস্যুদের ভয়ংকর যোদ্ধা হিসেবে কুখ্যাতি আছে। প্রচণ্ড যে প্রতিকূলতার কথা বর্ণনা করছে, তা বিবেচনা করলে জাহাজটিকে বর্বরদের হাতে পড়া থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হবে। আর যদি মহাতরীটি হারিয়ে যায়, তবে মানুর মনে সামান্য সন্দেহ নেই যে দৈত্যাকার জাহাজের সমস্ত বাসিন্দাকে হয় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হবে, নয়তো দাস বানানো হবে।

'হে মহারাজ প্রচণ্ড, তোমার উপদেশ কী? কীভাবে এই যুদ্ধ জয় করা যাবে? কারণ এই যুদ্ধে আমাদের জিততেই হবে।'

প্রচণ্ড হাসলো।

'সব আশা হারিয়ে যায়নি, সত্যব্রত। তোমার সাথে একান্তে কথা বলার একটা কারণ আছে। আমি শুধু তোমার বাবার কাছ থেকে যে বার্তা নিয়ে এসেছি তা নয়। আমি আমার সাথে বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্রও নিয়ে এসেছি।'

* * * * *

বারোজন লোক রত্নখচিত ভারী তামার বাক্সটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

পবিত্র সপ্তর্ষিকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মানু। তাদের পাশাপাশি ছিলেন সতরূপ, সোমদত্ত, ধ্রুব, প্রচণ্ড এবং পুরোহিতরাজ সত্যব্রত মানু স্বয়ং। বাক্সটি খুব সুন্দরভাবে নকশা করা এবং আর্যাবর্তের সবচেয়ে দামি রত্ন দিয়ে সাজানো। এর ঝকঝকে অবস্থা থেকে এটা স্পষ্ট যে অসুররা এই মূল্যবান বাক্সটি খুব যত্নের সাথে পরিবহন করেছে। প্রচণ্ড এই স্বর্গীয় আদেশ পালনে কোনো কমতি রাখেনি।

'ভয়ংকর দৃশ্যটি এখনো আমার মনে তাজা, আর চিরকালই আমার আত্মায় রয়ে যাবে। সেই ভয়ংকর রাতে বিভাসন পূজারি অভিজাত অসুর সৈন্যদের পুরো বাহিনীর সাথে একাই লড়াই করেছেন। দানবীয় আকাশ, সপ্তর্ষিদের জঘন্য হত্যা, রক্তধারার অভিশাপ, মৃতপ্রায় ঋষিদের ভবিষ্যদ্বাণী, স্বর্গীয় নীল আলো এবং চূড়ান্ত যুদ্ধ...সবই ছিলো খুবই ভয়ংকর, খুবই বীভৎস...'

অসুর রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে গভীর কোনো ঘোরের মধ্যে চলে গেছে।

মানু দেখলো যে সেই ভয়ংকর রাতের ঘটনা বর্ণনা করার সময় মহান অসুর রাজা ঘেমে ভিজে যাচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে নীল আগুনের রাত প্রচণ্ডের মন এবং আত্মায় একটা গভীর ক্ষত রেখে গেছে।

'ঠিক আছে, হে পরাক্রমশালী প্রচণ্ড। এসবই এখন অতীত। আমরা এই মুহূর্তে বর্তমানে আছি, আর আমাদের সামনে আছে কঠিন এক যাত্রা। আমাদের তোমার অভিজ্ঞতা, তোমার জ্ঞান এবং তোমার বীরত্বের প্রয়োজন, হে মহান রাজা।'

প্রচণ্ড মানুর কথাকে সমর্থন করলো এবং ইঙ্গিত দিয়ে সম্মতি জানালো। এরপর সে যেই শক্তিশালী অস্ত্রটি প্রদর্শন করতে চলেছে তার পেছনের গল্পটি সে উন্মোচন করতে থাকে।

* * * * *

'বিভাসন পূজারি নিঃসন্দেহে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন। আমরা এর আগেও তার সাথে যুদ্ধ করেছি, শুধু খুব দ্রুত পরাজিত হওয়ার জন্য। আমি তখন তাকে ইট ও ব্রোঞ্জের পাহাড়ে হরপ্পার সৈন্য শিবিরে একাই হামলে পড়তে দেখেছি। এমন সাহসিকতার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। তিনি যে দক্ষতা ও নির্ভুলতার সাথে একসাথে একাধিক তীর ছুঁড়ছিলেন, তা কেউ সামনাসামনি না দেখলে কখনো বিশ্বাস করবে না,' প্রচণ্ড বললো।

'আমি তার শিষ্য, হে প্রচণ্ড। আমার চেয়ে ধনুক নিয়ে সূর্যের দক্ষতা আর কেউ দেখেনি,' গর্বিত হয়ে বললো ধ্রুব।

এতক্ষণে মানুর পক্ষে চোখের জল ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। সে তার পিতার ভালোবাসার জন্য, তার আশীর্বাদের জন্য আকুল ছিলো। তার বীরত্ব ও দক্ষতার কথা শুনে মানুর হৃদয় গর্বে ভরে গেল। মহান বিভাসন পূজারির পুত্র হতে পেরে সে সম্মানিত ও ধন্য।

কথা চালিয়ে গেল প্রচণ্ড। 'কিন্তু নীল আগুনের রাতে সূর্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভেঙে পড়েছিলেন। আর তা শুধু শারীরিকভাবে নয়। তিনি অসহ্য অপরাধবোধ এবং অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় যখন তিনি অসুর যোদ্ধাদের মধ্যে পঞ্চাশজন দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, তখন আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তাকে পরাজিত করা হবে এবং হত্যা করা হবে। আর তারপরে বিশেষ কিছু ঘটলো।'

প্রচণ্ডকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সে সময় পরিক্রমা করে এসেছে। তারা যেই কেবিনে দাঁড়িয়ে আছে, তার বড় জানালার ভেতর দিয়ে প্রচণ্ডের চোখ ঝড়ের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে।

চূড়ান্ত সমাধান

'মৎস্য মানুকে যে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলেছেন, তা সহস্রাব্দ ধরে কালো মন্দিরের গভীরে সুরক্ষিত আছে। যা মূলত তৈরিই করা হয়েছে এই রহস্যকে রক্ষা করার জন্য। এ হলো এমন কিছু যা সম্পর্কে মহাবিশ্ব নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, তবুও এটাকে মন্দের অন্ধকার শক্তি থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো,' দ্বারকা শাস্ত্রী বললেন।

বিদ্যুৎ বুঝতে পারছে যে সে অবশেষে কালো মন্দিরের রহস্যের কাছাকাছি চলে এসেছে। সে দেখতে পেল যে প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তার প্রপিতামহের মুখে উদ্বেগ বাড়ছে।

'এই রহস্যকে সুরক্ষিত রাখা যে-কারো কল্পনার চেয়েও কঠিন ছিলো। এটা কয়েক শতাব্দী ধরে চলতে থাকা দুঃস্বপ্নময় চক্রান্ত, রক্তপাত, যুদ্ধ এবং হত্যাকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করেছে। কন্সট্যান্টাইন দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পরপরই গোপন ভ্রাতৃসংঘ কালো মন্দিরের ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য এবং অপ্রতিরোধ্য শক্তি আবিষ্কার করে। যেমনটা তোমাকে আগেই বলেছি, ভ্রাতৃসংঘের আধ্যাত্মিক জগতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। তাদের কালো জাদুকর আর ভূত-উপাসকরা শীঘ্রই কী ঘটতে চলেছে তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তারা ভালো করেই জানতো কালো মন্দিরের গভীরে যে রহস্য লুকায়িত আছে, শুধু তা খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে পারলেই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

'আর তারপর নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এবং বিভাসন পূজারি আর সত্যব্রত মানুর বংশধরদের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। এই কয়েক শতাব্দীর প্রাণঘাতী ষড়যন্ত্র ও সহিংসতার সময়েই আমাদের পূর্বপুরুষ পণ্ডিত ভৈরব শাস্ত্রী ১২৫৩ খ্রিষ্টাব্দে দেব-রাক্ষস মঠের ভিত্তি স্থাপন করেন–যাতে কালো মন্দিরের অভিভাবকদের জন্য তৈরি করেন একটা পবিত্র দুর্গ।'

দ্বারকা শাস্ত্রী বিদ্যুতের জন্য প্রতিটা বিন্দু একটা একটা করে যোগ করছেন। কিন্তু বিদ্যুৎ এখন সত্য জানার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে...সম্পূর্ণ সত্য।

এবার পুরোহিতজি সামনের দিকে ঝুঁকে পরম শ্রদ্ধার সাথে বললেন, 'গুরুদেব, বিদ্যুৎকে কালো মন্দিরের রহস্যে দীক্ষিত করার সময় এসেছে, কী বলেন? সে-ই তো মনোনীত ব্যক্তি, গুরুদেব।'

যখন বিদ্যুৎ এই প্রস্তাবে তার বাবার প্রতিক্রিয়া দেখলো, তার হৃৎস্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। সে দীর্ঘদিন ধরে যার জন্য অসহনীয় অপেক্ষা করছে, তা এখন তার সামনে উন্মোচিত হতে যাচ্ছে।

দ্বারকা শাস্ত্রী মাথা নেড়ে শুধু একটা কথাই বললেন।

'আগামী কাল।'

* * * * *

'ঘটনাটা প্রায় অবিশ্বাস্য ছিলো। যখন ১৯ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হরপ্পা, মানে যেখানে পুরো কাহিনি শুরু হয়েছে, সেখানে পুনঃপরিদর্শনে যায়। বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী কোম্পানি ছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া, যাদের ছিলো ব্রিটিশরাজের চেয়েও বড় সেনাবাহিনী। কিন্তু এদের ভেতর গোপন ভ্রাতৃসংঘের অনুপ্রবেশ ঘটে। তাদের প্রধানত দুটি উদ্দেশ্য ছিলো। প্রথমত, তারা সেখানে প্রবেশ করে এবং কালো মন্দির সন্দেহ করে বেশ কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ উড়িয়ে দেয়। কিন্তু এরপরেই তারা জানতে পারে যে হরপ্পার সময় থেকেই কালো মন্দির কোনো নির্দিষ্ট একটা মন্দির নয়, বরং কতগুলো মন্দিরকে একসাথে কালো মন্দির বলা হয়। আর তখনই তারা বুঝতে পেরেছে কেন আমরা প্রতি কয়েক শতাব্দীতে একটা করে নতুন কালো মন্দির তৈরি করেছি। এ ছিলো অন্ধকারের শক্তিকে নাগালের বাইরে রাখার জন্য।

'দ্বিতীয়ত, এই সময়ের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। গণমানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিশেষজ্ঞ, ভ্রাতৃসংঘের অধিপতিরা প্রথমে স্থানীয় ভারতীয়দের মনকে একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। আর সেই সময় পশ্চিমে হরপ্পার শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ সমগ্র জনগণকে বশীভূত করার পথে তাদের জন্য একটা বিশাল প্রতিবন্ধকতা হতে চলেছিলো।

'এরপর বাকিটা ইতিহাস। ব্রিটিশরা মিথ্যা আর্য আক্রমণ তত্ত্বের সৃষ্টি করে এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলিং সিস্টেমের মাধ্যমে তা প্রচার করে। অবশেষে তারা তথাকথিত ইতিহাসবিদদের নিয়োগ দেয় যাতে করে তারা আর্য আক্রমণ তত্ত্বটি নিয়ে এতবার লেখালেখি করে যে মানুষ এটাকে সত্যের মতো দেখতে শুরু করে।

'এমন একটা সত্য যার কোনো সাক্ষী ছিলো না, কোনো দলিল ছিলো না, ছিলো না কোনো প্রমাণ। ইউরোপীয় আর্যদের আধিপত্য সম্পর্কে সমগ্র গ্রহকে মগজ ধোলাই করার জন্য পশ্চিমা এবং ভারতীয়, উভয় জাতের ইতিহাসবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিকদের নিয়োগ করাই তাদের একমাত্র পদ্ধতি ছিলো না। তাদের পদ্ধতিতে সেই ব্যক্তিদের নির্মূল করাও ছিলো যারা সত্যের সন্ধান করেছে এবং তা থেকে সরে দাঁড়াতে অস্বীকার করেছে। ক্যাপ্টেন ওয়েন অ্যাশক্রফ ছিলেন নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের এমনই এক রক্ত-বলি।'

'কে ছিলেন এই ক্যাপ্টেন অ্যাশক্রফ, বাবা?'

'একজন ন্যায়পরায়ণ ইংরেজ, যিনি হরপ্পার সত্যকে সামনে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি একজন সৎ অফিসার ছিলেন, আর কালো মন্দিরের অভিভাবকরা দীর্ঘ সময় ধরে তার উপর নজর রাখছিলেন। অবশেষে আমরা তাকে আদি-বৈদিক যুগের আদিবাসী ঋষিদের হাতে লেখা মূল ধর্মগ্রন্থ হস্তান্তর করি, যেগুলো ছিলো অনুমিত আর্য আক্রমণের প্রস্তাবিত সময়ের আগেকার। তিনি এগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন, তারপর এই আর্য তত্ত্বকে ভ্রান্ত বলে প্রকাশ করবেন বলে ঠিক করেন। এটা এমন একটা ব্যাপার ছিলো যা অর্ডার কখনো হতে দিতে পারে না। ফলস্বরূপ, ক্যাপ্টেন অ্যাশক্রককে কলকাতার রাস্তায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো।'

* * * * *

'বাবা, শুধু আমার বোঝার জন্য বলছি, আমি কি ঘটনাগুলো গুছিয়ে তুলে ধরতে পারি? আমি ভুল করলে সংশোধন করে দেবেন। আমি কালানুক্রম ঠিক রাখছি কি না তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, বিদ্যুৎ,' দ্বারকা শাস্ত্রী উত্তর দিলেন। 'তোমার কাছ থেকে অর্ডার এবং কালো মন্দিরের হিংসাত্মক যাত্রার সারসংক্ষেপ শোনা যাক।'

বিদ্যুৎ একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে তার বাবার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

'ঠিক আছে, তাহলে শুরু করা যাক। এসব কিছুই শুরু হয় হরপ্পায়, যখন আমাদের পূর্বপুরুষ মহান বিভাসন পূজারির সাথে তার বন্ধু ও ভগ্নীপতি পণ্ডিত চন্দ্রধর এবং তার স্ত্রী প্রিয়ংবদা বিশ্বাসঘাতকতা করে আর তাকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে। বিভাসন পূজারি যখন রক্তের বৃষ্টিতে বন্দিদশা থেকে পালিয়ে এসে তার প্রতিশোধ নিতে রাক্ষসরাজ সুরের সাথে যোগ দিয়েছেন, তখন তার মারাত্মক আহত পুত্র মানু পণ্ডিত সোমদত্তের সহায়তায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান।

'একদিকে হরপ্পার সূর্য ইট ও ব্রোঞ্জের পাহাড়ে মহানগরের বাহিনীকে ধ্বংস করেন, অন্য দিকে তার পুত্র মানু মহৎ মৎস্য-মানব মৎস্যের সাথে প্রথমবারের মতো দেখা করেন।

'বিভাসন পূজারি যখন জানতে পারলেন যে তার ছেলে বেঁচে আছে, সেই সাথে সপ্তর্ষির অমানবিক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হলেন, তখন অসুরদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের নিষ্ঠুর রাজা সুরাকে হত্যা করেন। এই সময়ে রক্তধারা আর জ্বলন্ত ঋষিরা শুধু আমাদের বংশধারা নয়, সমগ্র মানব জাতিকে সীমাহীন সহিংসতা ও যন্ত্রণা ভোগের অভিশাপ দিয়েছেন। ঋষিরা বিভাসন পূজারিকে মানুর কাছে রত্ন-মরু পাঠানোর নির্দেশ দেন।

'এরই মধ্যে মৎস্য মানুকে পাহাড়ের কালো মন্দিরে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি মানুকে আসন্ন প্রলয় সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি মানুকে আরো বলেছেন যে তার পিতা, হরপ্পার সূর্য, কালো মন্দিরের একজন অভিভাবক ছিলেন। এবং তার পরে মানুকেই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

'মহাপ্লাবনে বিভাসন পূজারি মারা যান, এবং মৎস্য মানব জাতিকে এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মানুকে একটা বিশাল জাহাজ নির্মাণের আদেশ দেন। সেই থেকে আমাদের বংশধারা কালো মন্দিরের রহস্যের অভিভাবক।

'তারপর ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে, রোমান সম্রাট কন্সট্যান্টাইন একটা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের অনুমোদন দেন, যেখানে তিনি একটা এক-বৈশ্বিক সরকার, এক-বৈশ্বিক ধর্ম এবং মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ছাড়া একটা বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আমাদের মহান পূর্বপুরুষ অদ্বৈত শাস্ত্রী তাকে এর বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছেন।

'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার দ্রুত একটা অত্যাচারী এবং নির্দয় ভ্রাতৃসংঘে রূপান্তরিত হয়, যা কন্সট্যান্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃত করে, সেই সাথে এমন একটা বিশ্ব ও সমাজের জন্য কাজ শুরু করে যা তারা সম্পূর্ণ অর্থে নিয়ন্ত্রণ করে। নাইটস টেম্পলাররা ছিলো অর্ডারের প্রথম সফলতা। তারা এমন একটা ভয়ংকর শক্তিতে রূপান্তরিত হলো যারা অর্ডারের ইচ্ছানুযায়ী নির্দয়ভাবে আঘাত করতো। ধীরে ধীরে অর্ডার পৃথিবীর প্রতিটি অংশে তাদের শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তোলে। এর সদস্য ছিলো বিশ্বের সবচেয়ে দক্ষ পুরুষ ও মহিলারা। মানব জাতির সবচেয়ে যুগান্তকারী কিছু ঘটনা, যেমন ফরাসি বিপ্লব, সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন, আরব বসন্ত, স্নায়ুযুদ্ধ, এবং এমনকি ৯/১১-এর পেছনেও অর্ডারের হাত রয়েছে।

'তারা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, প্রতিরক্ষা নির্মাতা, রাজনীতি, ঔষধ, তেল, মিডিয়া, সন্ত্রাসবাদ, প্রযুক্তি এবং আরো অনেক কিছুর উপর তাদের অভূতপূর্ব প্রভাবের

মাধ্যমে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্ডারের সর্বোচ্চ অধিপতিরা শুধু বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবানই নন, তারা অত্যাধুনিক রহস্যবাদী, যারা অন্য জগতের ভালো এবং মন্দের শক্তিগুলোকে গভীরভাবে বোঝেন।

'কালো মন্দিরের কেন্দ্রে লুকিয়ে থাকা রহস্য উদ্‌ঘাটন করাই বিশ্বের বড় বড় গুপ্তসংঘগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ তাদের বিশ্বাস, কালো মন্দিরের রহস্য তার নিজের মাঝে এমন একটা অপরাজেয় শক্তিকে বহন করে যা অর্ডারের ঘৃণ্য পরিকল্পনাকে নষ্ট করে দিতে পারে। এই কারণেই ভ্রাতৃসংঘ বহু শতাব্দী ধরে দেব-রাক্ষস মঠের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে আসছে।

'এই গুপ্তসংঘই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ভারতে অনুপ্রবেশ করে এবং হরপ্পার ধ্বংসাবশেষকে প্রথমে কালো মন্দির ভেবে তা ধ্বংস করতে যায়। অর্ডার ভালো করেই এই সভ্যতার গৌরবময় অতীত সম্পর্কে জানতো এবং তারাই এখানকার প্রাচীন আদিবাসী। কিন্তু তারা আর্য আক্রমণ তত্ত্ব উদ্ভাবন করে কারণ এটি তাদের প্রথমে উপমহাদেশে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে দেয় এবং পরে এই বিভাজনমূলক অনুমানের উপর ভিত্তি করে ভারতীয়দের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। তাদের বিশ্বব্যাপী নকশা ও সমীকরণের মাঝে যে-ই বাধা হিসেবে এসেছে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন ওয়েন অ্যাশক্রফ এমন অনেক হতভাগার মধ্যে একজন ছিলেন।

'রুমি পেরেরা, বালা, ত্রিজাত কাপালিক, ব্রহ্মানন্দ...এরা সবাই এই গুপ্তসংঘের সদস্য ছিলো।

'একদিকে তারা আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় কারণ আমিই ভবিষ্যদ্বাণীকৃত দেবতা, যে তাদের কালো মন্দিরের রহস্যের কাছে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে তারা এটা পাওয়ার সাথে সাথে আমাকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর।'

* * * * *

দ্বারকা শাস্ত্রী ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

'আমরা কি বাকি কথা সন্ধ্যায় বলতে পারি, বিদ্যুৎ? আমার একজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথির সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে,' তিনি বললেন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই, বাবা,' বিদ্যুৎ ভদ্রভাবে উত্তর দিলো, যদিও সে অবাক না হয়ে পারলো না। ভাবছে, এই দর্শনার্থী কে হতে পারে যে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থেকেও দ্বারকা শাস্ত্রীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে–তাও এর শেষ অধ্যায়ে।

'আজ সন্ধ্যা ৬ টায় আমার কাছে এসো, বাছা। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। গ্রহগুলো শীঘ্রই সারিবদ্ধ হতে শুরু করবে। তোমাকে কালো মন্দির সম্পর্কে,

তোমার পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে, মার্কণ্ডেয় শাস্ত্রী, অদ্বৈত শাস্ত্রী, দুর্গাদাস শাস্ত্রী...এবং অবশ্যই আমার প্রিয় কার্তিকের সম্পর্কে আরো কথা জানাতে হবে।'

কার্তিকেয়র নাম উচ্চারণ করেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দ্বারকা শাস্ত্রী। বিদ্যুতের প্রয়াত পিতার প্রতি তার তীব্র ভালোবাসা স্পষ্ট ফুটে উঠছে।

'আমাকে গোয়া ইনকুইজিশন সম্পর্কেও বলতে হবে, সেই সাথে পৃথ্বীবল্লভ আর সর্বোপরি অর্ডারের চূড়ান্ত সমাধান সম্পর্কে।'

'জি, বাবা,' চলে যাওয়ার সময় বিদ্যুৎ বললো।

বিদ্যুৎ বের হওয়ার জন্য দাঁড়ালো, কিন্তু তার মাথায় মঠাধীশের বলা *চূড়ান্ত সমাধান* শব্দটি ঘুরছে।

এর মাঝে অদ্ভুত ধরনের অস্তভ কিছু আছে। কিছু একটা যা তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আবার তার বাবার মুখোমুখি হতে বাধ্য করেছে।

'শুধু একটা প্রশ্ন। প্লিজ, বাবা, সংক্ষেপে উত্তর দিলেও চলবে। তাদের মাথায় চূড়ান্ত সমাধান কী, বাবা? ঠিক কী সমাধান? এটা আমাকে অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে।'

দ্বারকা শাস্ত্রী এক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেলেন, তিনি সরাসরি বিদ্যুতের চোখের দিকে তাকালেন। বিদ্যুতের মধ্যে থাকা তীব্র অন্তর্দৃষ্টি দেখে তিনি অবাক হননি। এরপর তিনি কথা বলতে শুরু করলেন।

'তারা পৃথিবীর জনসংখ্যা সাতশো কোটি থেকে এর দশ ভাগের একভাগে নিয়ে আসতে চায়, বিদ্যুৎ। যদি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার পুরো পৃথিবীকে তাদের সর্বগ্রাসী সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সফল হয়, তাহলে তারা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হত্যাযজ্ঞ চালাবে। ছয়শো কোটিরও বেশি মানুষকে হত্যা করবে তারা।'

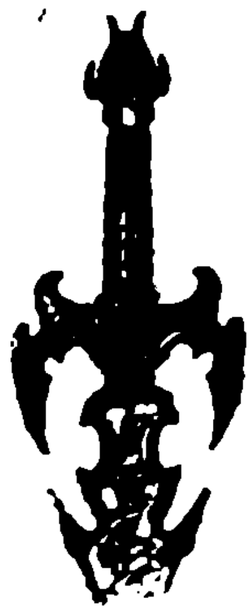

আর্যাবর্তের জলাভূমি, খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৯৯ অব্দ

রত্ন-মরু

মানুর অনুরোধে সপ্তর্ষিরা এগিয়ে এলেন।

প্রচণ্ড বর্ণনা করেছে কীভাবে নীল আগুনের শিখা আকাশ পর্যন্ত উঠে গেছে, এবং গম্ভীর ও উচ্চ স্বরে সপ্তম সপ্তর্ষি বিভাসনকে তার তলোয়ারকে নীল আগুনে পোড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সে এটাও বর্ণনা করলো যে কীভাবে পরবর্তী যুদ্ধটা একতরফা হয়েছে।

সেই মুহূর্ত থেকে রত্ন-মরু একটা মহাজাগতিক অস্ত্রে পরিণত হয়েছে, যা তার বাহককে অজেয় করে তোলে। কিন্তু একটাই শর্ত: তা হলো তলোয়ারটি তার নিজের বাহক নিজে বেছে নয়।

একজন অসাধারণ যোদ্ধার হাতে পৌঁছানোই রত্ন-মরুর চূড়ান্ত ভাগ্য।

এমন এক যোদ্ধা, যিনি মানব জাতির চূড়ান্ত, নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

আর এই যুদ্ধ হবে কলিযুগে।

* * * * *

ওরা যেই কক্ষে একত্র হয়েছে তা বেশ অন্ধকার। মশালের আলোয় ঐশ্বর্যময় তামার বাক্সটি জ্বলজ্বল করছে।

বাক্সে যা ছিলো, মানুর জন্য তা কেবলই ঐশ্বরিক তলোয়ার ছিলো না। এমন কিছু ছিলো যা তার বাবা শেষবারের মতো স্পর্শ করেছেন। আর এটাই রত্ন-মরুকে তার জন্য একটা অমূল্য উপহারে পরিণত করেছে।

সপ্তর্ষিরা এখন তামার সিন্দুকের চারপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের হাত ভাঁজ করা। এই ঐশ্বরিক তলোয়ারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সপ্তর্ষিরা মানু ও প্রচণ্ডের থেকে আরো ভালোভাবে জানেন। তারা জানতেন এই অস্ত্র কার জন্য ছিলো। জানতেন যে মানু তার নির্দিষ্ট মহাজাগতিক নিয়তি পূরণের জন্য এই তলোয়ারের একজন বাহকমাত্র।

সপ্তর্ষিরা এবার ভগবান বিষ্ণুকে আহ্বান করে একত্রে একটা মন্ত্র রচনা ও উচ্চারণ করলেন। তারা এইমাত্র যে মন্ত্রটি সৃষ্টি করলেন তা হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ প্রতিবার পবিত্র কিছুর শুরুতে ভগবান বিষ্ণুর আশীর্বাদের জন্য উচ্চারণ করবে:

'মঙ্গলম ভগবান বিষ্ণু;
মঙ্গলম গরুড় ধ্বজা
মঙ্গলম পুণ্ডরী কাকশাহ;
মঙ্গলায়া তনো হরিহ।'

সাত তরুণ ঋষি বাক্সের কাছাকাছি চলে গেলেন, এরপর সকলেই তাদের হাতের তালু এর উজ্জ্বল পৃষ্ঠে রাখলেন।

এরপর যা ঘটলো তাতে সকলের শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

সপ্তর্ষিদের চোখ উজ্জ্বল নীল আভায় জ্বলে উঠলো। তাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন তারা একটা বৃহত্তর, অতিপ্রাকৃত শক্তির সাথে সংযোগ স্থাপন করছেন। কিছুক্ষণ তামার বাক্সের সাথে আটকে রইলেন সাত ঋষি, চোখ দিয়ে নীল আলো বের হচ্ছে।

মনু, তারা, সোমদত্ত, ধ্রুব এবং প্রচণ্ড অভিভূত হয়ে যার যার জায়গায় নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সপ্তর্ষিরা তাদের হাত উঠানোর সাথে সাথে নীল আভা ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকলো। এরপর তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে মনোরম হাসি বিনিময় করলেন। অবশেষে মানুর দিকে ফিরতেই তাদের মধ্যে একজন কথা বলে উঠলেন।

'এগিয়ে যাও। উন্মোচন করো এই অপূর্ব রত্ন-মরু, সত্যব্রত।'

* * * * *

মানু চকচকে বাক্সের ভারী ঢাকনাটি উঠালো।

চমৎকার লম্বা তলোয়ারটা নরম, গাঢ় বাদামি রঙের চামড়ায় মোড়ানো।

সত্যব্রত এই অসাধারণ তলোয়ারটাকে খুব ভালোভাবেই চেনে। কারণ এটা বেশ কয়েক দশক ধরে তার মহান পিতার কোমরবন্ধনীতে শোভা পেয়েছে। সে

তার হাত ভাঁজ করে বাবার স্মরণে চোখ বন্ধ করলো। তারপর এই শক্তিশালী অস্ত্রকে প্রণাম করলো, যে অস্ত্র হরপ্পাকে অসংখ্য যুদ্ধে জয়ী করেছে।

তবুও রত্ন-মরুর ব্যাপারটা অন্য রকম ছিলো। এর রত্নখচিত হাতল জ্বলজ্বল করছে। এর অগুভ ফলকটি গরুড় পুরাণের ভয়ংকর শ্লোক দ্বারা খচিত, যা নরকের শাস্তি নির্দেশ করে। নীল আভা ছড়াচ্ছে অস্ত্রটা।

মানু হাসলো। মৎস্যের রং। ভগবান বিষ্ণুর রং।

'যাও, সত্যব্রত, তুলে নাও,' প্রচণ্ড অনুরোধ করলো। সূর্যের পুত্রের সাথে রত্ন-মরুকে একত্র করার মাধ্যমে বিতাসন পূজারির প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পেরে গভীরভাবে সন্তুষ্ট ছিলো সে।

* * * * *

পণ্ডিত সোমদত্ত এবং সপ্তর্ষিরা মানুর প্রণাম পাওয়ার সাথে সাথে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। তারার দিকে ফিরলো সূর্যপুত্র। মেয়েটা ওরই দিকে তাকিয়ে হাসছে, গভীর ভালোবাসায় চোখ দিয়ে ইশারা করছে। এরপর তার দৃষ্টি ধ্রুবর দিকে চলে গেল। ছেলেটা একবার ওর দিকে তাকিয়ে এরপর মহান তরবারির দিকে মাথা দিয়ে ইশারা করলো।

মানু তার ডান হাত প্রসারিত করে রত্ন-মারুর হাতলটি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলো। মৃত্যুর দেবতা মহাকালের কাছে তাদের আত্মার জন্য পরিত্রাণ চেয়ে প্রার্থনা করলো, যারা এই ঐশ্বরিক ফলকের দ্বারা মৃত্যুবরণ করেছে।

এরপর সে দক্ষতার সাথে তলোয়ারটা তুললো এবং সবার দেখার জন্য উপরে উঠালো। ঠিক সেই মুহূর্তে অস্বাভাবিক একটা বজ্রপাত হলো আকাশ থেকে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে চারদিক আলোকিত হয়ে গেল।

যেন মহাবিশ্ব উল্লাস করছে!

সোমদত্ত, প্রচণ্ড, তারা, ধ্রুব আর সপ্তর্ষিরা যখন মহান যোদ্ধা এবং তার উজ্জ্বল স্বর্গীয় তলোয়ারের দিকে বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে ছিলেন, তখন আর্তনাদরত আকাশ আবার কক্ষটিকে আলোকিত করে।

সত্যব্রত মানুকে দেখতে প্রকৃতির কোনো শক্তির মতো লাগছে। বজ্রপাতের আলোয় যখন পুরো কক্ষ আলোকিত হয়ে গেল, একটা দমকা হাওয়া এসে উড়িয়ে দিয়ে গেল তার লম্বা চুলগুলোকে। এই আলোর মাঝে দাঁড়িয়ে ভয়ংকর অস্ত্রটিকে দেখছে সে।

অত্যাশ্চর্য নীল আলোয় জ্বলজ্বল করছে রত্ন-মরু।

বানারস, ২০১৭
অদ্বৈত, দুর্গাদাস ও মার্কণ্ডেয়

ঠিক সন্ধ্যা ৬ টায় বিদ্যুৎ মহান মঠাধীশের দরজায় কড়া নাড়লো।

রুমে প্রবেশ করার সাথে সাথে প্রথমে অবাক হয়ে গেল সে, তারপর একজন সুন্দরী দর্শনার্থীকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লো। ওকে এখানে দেখতে পাবে বলে আশা করেনি।

'দামিনী!' চিৎকার করে উঠলো বিদ্যুৎ। দামিনী দৌড়ে তার কাছে এসে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো।

'ওহ, বিদ্যুৎ...' সে শুধু এতটুকুই বলতে পারলো।

বিদ্যুতের চেহারা লাল হয়ে গেল। লজ্জামিশ্রিতভাবে তার ভালোবাসার মানুষটিকে জড়িয়ে ধরলো এরপর। ও জানতো ভালোবাসার এমন প্রদর্শনে মহান মঠাধীশ অভ্যস্ত নন। তাই এর প্রশংসা করবেন তা আশা না করাই ভালো।

দামিনীও কিছুক্ষণ পর এটা বুঝতে পারলো এবং মহান মঠাধীশের দিকে না তাকিয়েই সরে দাঁড়ালো।

দেবতা তার প্রপিতামহের দিকে ফিরে চকচকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

'বাবা...দামিনী...কীভাবে?' সে হেসে জিজ্ঞেস করলো।

দ্বারকা শাস্ত্রী এই চমৎকার দম্পতিকে একসাথে দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন। তাদের একসাথে হওয়ার কথাই ছিলো।

'দামিনীর উপস্থিতি অপরিহার্য, বিদ্যুৎ। তুমি যার সম্মুখীন হতে যাচ্ছো এবং কালো মন্দির থেকে যে রহস্য উন্মোচন হতে যাচ্ছে, তার মোকাবেলা করার জন্য তোমাদের দুজনের আত্মার সূক্ষ্মতর অংশেরও প্রয়োজন পড়বে। তুমি দামিনীকে ছাড়া অসম্পূর্ণ, হে দেবতা। শক্তি ছাড়া শিব যেমন আংশিক, সানজানাকে ছাড়া বিভাসন পূজারিও তেমনি অপ্রতুল। সে ৩৭০০ বছর অপেক্ষা করেছেন শুধু তোমার কঠোর অনুসন্ধানে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। যা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে

তাতে তোমার পাশে থাকার জন্য। ওর জীবনীশক্তি, ওর প্রশ্নাতীত ভালোবাসা, ওর সোনার আত্মা–সবই তোমার পাশে দাঁড়াবে যখন তুমি তার মুখোমুখি হবে, বিদ্যুৎ। যখন তুমি শয়তানের মুখোমুখি হবে।'

* * * * *

এ এখন এক বড় সমাবেশে পরিণত হয়েছে। দ্বারকা শাস্ত্রী সবাইকে ডেকেছেন। তিনি যা বর্ণনা করতে চলেছেন তা কেউ পুরোপুরি জানতো না, এমনকি পুরোহিতজি বা ন্যায়নাও না।

বিদ্যুৎ ও দামিনীকে একসাথে গভীর ভালোবাসায় হাতে হাত রেখে বসে থাকতে দেখে ন্যায়না তার মাঝে একধরনের যন্ত্রণা অনুভব করছে। ন্যায়নাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বিদ্যুৎ তার হাত সরিয়ে নিলো। সে ন্যায়নাকে কষ্ট দিতে চায়নি। কিন্তু সঙ্গত কারণেই ন্যায়না বিদ্যুতের উপর এমন প্রভাব ফেলেছে। ও সত্যিই অসাধারণ। ন্যায়না বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে চোখের পলক ফেলে দামিনীকে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো। এরপর গিয়ে বসলো দ্বারকা শাস্ত্রীর পায়ের কাছে, যেখানে সে সাধারণত ভালোবাসা ও স্বস্তি খুঁজে পায়। তার হৃদয় কেঁদে উঠলেও চেহারা হাসিতে উজ্জ্বল ছিলো।

'ওয়েন অ্যাশব্রুকের হত্যাকাণ্ড অনেক পরের ঘটনা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রক্ত ঝরছিলো। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন, সাহসী হুডেড যোদ্ধা, পুরোহিত, অদ্বৈত শাস্ত্রী। তিনি কন্সট্যান্টাইন দ্য গ্রেটের ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজন ছিলেন। অদ্বৈত শাস্ত্রী কন্সট্যান্টাইনকে তার দুর্দান্ত নকশা প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন। আর তাকেই সর্বপ্রথম অর্ডারের সত্তরজন যোদ্ধা ঘিরে ধরে। এই যোদ্ধারা ছিলো নাইটস টেম্পলারদের সবচেয়ে আদিম রূপ, যারা আরো কয়েকশো বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে মূল ঘটনার সাথে যুক্ত হয়েছে। অদ্বৈত শাস্ত্রীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অবশ্য, এর আগে তিনি সাতাশজনকে হত্যা করেছেন–যদিও তিনি ছিলেন একা এবং নিরস্ত্র। লোকে বলে যে এই যুদ্ধ ঘণ্টাব্যাপী চলে এবং আশেপাশের কয়েকশো গজ রক্তে লাল হয়ে যায়। এছাড়াও, হুডধারী সন্ন্যাসী এই সত্তরজন নাইটের রক্তে মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ভিজে যান। সবকিছু শেষ হওয়ার পরে অর্ডারের বেঁচে থাকা নাইটরা তার বিস্ময়কর দক্ষতা এবং বীরত্বে হতবাক হয়ে তার বিকৃত দেহের কাছে মাথা নত করে। অদ্বৈত শাস্ত্রী শত শত বছর ধরে গোপন টেম্পলার ইতিহাসে একজন কিংবদন্তি হয়ে আছেন। তার যুদ্ধের কৌশল রেকর্ড করা হয়, এরপর সেরা টেম্পলার নাইটদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই নাইটরাই পরবর্তীতে ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়েছে।

'এ হলো চতুর্থ শতাব্দীর কথা। কনস্ট্যান্টাইন কালো মন্দিরের গোপনীয়তা জানতেন। বিশ্বকে একত্র করার চেষ্টা করে তিনি ভাবতেন যে তিনি মহাজাগতিক আদেশের সেবা করছেন। কিন্তু তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার নিষ্ঠাও ম্লান হয়ে যায় এবং তা ভ্রাতৃসংঘের নিষ্ঠুর অধিপতিদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।'

পুরো রুমে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। মহান মঠাধীশ শাস্ত্রী বংশের ইতিহাসের রক্তমাখা পাতা উলটে যাচ্ছেন, আর বিদ্যুৎ, দামিনী, পুরোহিতজি, ন্যায়না, সনু আর বলভান্ত স্তব্ধ হয়ে শুনছে।

* * * * *

'আমরা প্রতি দুশো বছর পরপর মন্দির তৈরি করে চলেছি–কখনো কখনো ধর্মপ্রাণ রাজাদের সাহায্যে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেব-রাক্ষস মঠের উল্লেখযোগ্য সম্পদ ব্যবহার করেছি,' দ্বারকা শাস্ত্রী চালিয়ে গেলেন।

'কিন্তু শুধু মন্দির কেন, বাবা? কেন অন্য কোথাও গোপন করা গেল না? প্রাসাদ বা কবরের নিচে? শুধু কালো মন্দিরই কেন?' জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ।

'ভালো প্রশ্ন, বিদ্যুৎ। আগামী কাল তুমি নিজেই এর উত্তর আবিষ্কার করবে। কালো মন্দিরে যা সমাহিত রয়েছে তার অবর্ণনীয় দীপ্তি এবং স্বর্গীয় তীব্রতার জন্য একটা সমান শক্তিশালী গর্ভগৃহ প্রয়োজন। প্রতিটি কৃষ্ণ মন্দির শত শত নিপুণ ঋষিদের দ্বারা শুধু বছরের পর বছর মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমেই নয়, বরং সেই সাথে প্রতিটি মন্দিরের দেয়াল, স্তম্ভ এবং ছাদে অলংকারিক আকারে সেই মন্ত্রগুলোর মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালীগুলো খোদাই করার পর পবিত্রতা লাভ করে। প্রাচীন রহস্যের উত্তাপে সাধারণ যেকোনো কাঠামো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

বিদ্যুৎ মাথা নেড়ে বোঝালো যে সে বুঝতে পেরেছে। সে যেমন সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী ছিলো, তেমনি নার্ভাসও ছিলো–এটা স্বীকার না করলে তার নিজের কাছেই নিজের মিথ্যা বলা হবে। কালো মন্দিরে কী আছে সেটা নিয়ে সে নার্ভাস ছিলো। তাছাড়া, আরো একটা কথা তার মাথায় ঘুরঘুর করছে। তাকে যার সম্মুখীন হতে হবে তার কথা।

লুসিফার।

* * * * *

'কালো মন্দির এর রূপ, প্রকাশ এবং অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকে। বদ্রীনাথ, সোমনাথ, বিশ্বনাথ, কেদারনাথের মতো পবিত্র মন্দিরগুলোর সবগুলোই বিভিন্ন

সময়ে পবিত্র কালো মন্দির হিসেবে নির্মিত এবং ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যে মন্দির এই গোপনীয়তাকে সবথেকে বেশি দিন ধরে রেখেছে, প্রায় কয়েকশো বছর ধরে, তা হলো ইলোরার মহান কৈলাস মন্দির,' দ্বারকা শাস্ত্রী ব্যাখ্যা করলেন।

দামিনী আর বিদ্যুৎ দৃষ্টিবিনিময় করলো। তারা অজন্তা এবং ইলোরার রহস্যময় শিলা-কাটা মন্দিরগুলো দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে বেশ কয়েকবার কথা বলেছে, কিন্তু যাওয়া আর হয়নি। আর এখন তারা নিজেদের গল্পের অংশ হিসেবে কৈলাস মন্দিরের গল্প শুনছে।

'আমাদের মহা পূর্বপুরুষ, দুর্গাদাস শাস্ত্রী, যিনি অষ্টম শতাব্দীতে কৈলাস মন্দির নির্মাণের জন্য মহান রাজা কন্নেশ্বরকে উৎসাহিত করেছেন, যিনি পৃথ্বীবল্লভ নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। কীভাবে মন্দিরটি তৈরি হয়েছে, কীভাবে এটি এমন প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে পারে যা সেই সময়ে মানব জাতির জন্য উপলব্ধ ছিলো না, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন, খুব কৌতূহলী এক গল্প। আপাতত এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে ইলোরার নিরাপত্তা চিরকাল স্থায়ী হয়নি।

'এরপর এলো গোয়া ইনকুইজিশন এবং আমাদের পূর্বপুরুষ মার্কন্ডেয় শাস্ত্রী, যিনি ১৬ শতকে পর্তুগিজ দস্যুদের সাথে লড়াই করেছেন। ইলোরার কৈলাস মন্দিরটি যখন কালো মন্দিরের গোপনীয়তার জন্য আর নিরাপদ আশ্রয়স্থল রইলো না, তখন এর স্থান বহুবার পরিবর্তন করা হয়। অবশেষে, ১৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের পূর্বপুরুষ মার্কন্ডেয় শাস্ত্রী এই মূল্যবান, ঐশ্বরিক গোপন রহস্যকে নিজের সাথে করে আমাদের দেশের অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ কোঙ্কন অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এটি গোয়ার উপকূলীয় প্রদেশে নির্মিত একটা কালো মন্দিরে লুকিয়ে রাখেন।

'তার সমস্ত সতর্কতা এবং অর্ডারের নাগালের থেকে এই রহস্যকে দূরে রাখার সকল প্রচেষ্টার পরেও তারা ধরা পড়ে যায়। এরপর যা ঘটেছিলো তা ছিলো উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী এবং সবচেয়ে অত্যাচারী জাতিগত-শুদ্ধিকরণ–গোয়া ইনকুইজিশন।'

বিদ্যুৎ গোয়া ইনকুইজিশন সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ছিলো। সে দামিনীর দিকে তাকিয়ে তার বাবা যা বলছে তার সাথে যোগ করলো, 'রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গোয়া ইনকুইজিশন আমাদের দেশে আশ্চর্যজনকভাবে অবমূল্যায়িত এবং কম অধ্যয়ন করা হয়েছে, দামিনী। এটা ছিলো ধর্মীয় নিপীড়নের সবচেয়ে কুৎসিত রূপ। হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমানকে জীবন্ত পুড়িয়ে, কারাগারে অনাহারে রেখে মারা হয়েছে এবং মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত চামড়া তুলে ফেলে অত্যাচার করা হয়েছে–সবই তাদের মূল বিশ্বাসের একটা শ্লোক পাঠ করার জন্য বা উপাসনার জন্য। অথবা বলা যায়, কোঙ্কনি ব্যবহার করার জন্য।'

দামিনীর কাছে বর্ণনাটা খুব অস্বস্তিকর লাগছে। 'আমি গোয়ায় মিশনারি এবং পর্তুগিজ সৈন্যদের সহিংসতার কথা শুনেছিলাম, বিদ্যুৎ, কিন্তু আমি জানতাম না যে এটা এতটা ভয়াবহ ছিলো।'

'ওহ, এটা আরো অবন্য ছিলো,' বিদ্যুৎ বললো। কিন্তু দামিনীকে নির্যাতন ও নিপীড়নের আরো বীভৎস বিবরণ না শোনানোর সিদ্ধান্ত নিলো।

মঠাধীশ কালো মন্দির সম্পর্কে তার বিবরণ চালিয়ে গেলেন। 'তবে ইনকুইজিশনের আসল উদ্দেশ্য ছিলো কালো মন্দির খুঁজে বের করা। পর্তুগিজ রাজার বাহিনী গোয়া লুণ্ঠন করে। নির্দয় উন্মত্ততায় মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। কেননা কিছু যাতে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করেছে, এমনকি মসজিদও রেহাই পায়নি।'

দ্বারকা শাস্ত্রী শ্বাস নেওয়ার জন্য থামলেন। দামিনী এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সবগুলো তথ্য মাথায় গেঁথে নিলো।

* * * * *

'মার্কণ্ডের শাস্ত্রীর চূড়ান্ত যুদ্ধ হলো ত্যাগ ও সিংহ-হৃদয়ের এক মহৎ, রহস্যময় গাথা। কিন্তু আজ আমাদের কাছে তা বলার সময় নেই,' বলেছেন দ্বারকা শাস্ত্রী।

'আমরা বুঝি, বাবা। কিন্তু আমরা কৈলাস মন্দিরের গল্প শুনতে চাই, আর সেই সাথে পণ্ডিত মার্কণ্ডেয় শাস্ত্রীর গল্পও শুনতে চাই,' দামিনী মৃদু স্বরে বললো।

'হ্যাঁ, অবশ্যই বাছা। এইসব শেষ হলে আমি তোমাকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলবো। তোমাদের উভয়কেই এই বিস্ময়-পুরুষদের গল্প এবং তাদের অত্যাশ্চর্য কীর্তি সম্পর্কে জানতে হবে। এখন শুধু এটা জেনে রাখো যে পণ্ডিত অদ্বৈত, মার্কণ্ডেয় বা দুর্গাদাস যিনিই হোন না কেন, তারা সবাই কালো মন্দিরের গোপনীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে যুদ্ধ করে মারা গেছেন। এবং প্রাচীন অভিশাপের সত্যতা অনুযায়ী, তারা সকলেই সহিংস ও বেদনাদায়ক মৃত্যুবরণ করেছেন।'

'আমার বাবা কার্তিকেয় শাস্ত্রীও...' বিদ্যুৎ বিড়বিড় করে বললো।

'হ্যাঁ, বাছা,' দ্বারকা শাস্ত্রী উত্তর দিলেন। 'কিন্তু কার্তিকেয়র ব্যাপারটা আলাদা ছিলো। কার্তিকেয় চেষ্টা করেছিলো পুরো ইলুমিনাতিকে একত্রে পুড়িয়ে ফেলতে।'

আর্যাবর্তের অন্ধকার বন, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৮ অব্দ
নারা-মুন্ডা

এমনকি ব্যাডল্যান্ডের নির্দয় দস্যু সর্দারদেরও গা গুলিয়ে আসছে।

ভয়ংকর নারা-মুন্ডার আমন্ত্রণে তারা এই দূর দেশে এসেছে। যদিও তারা সবাই ভালো করেই জানে যে দৈত্যরা নরখাদক, এরপরেও তারা অন্ধকার বনের গভীরে থাকা দৈত্য দুর্গের ভয়াবহ দৃশ্যটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

মানুষের পোড়া মাংসের গন্ধ তাদের কাছে অসহ্য লাগছে। উন্মুক্ত অগ্নিকুণ্ডে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাজতে দেখে যুদ্ধবাজদের বেশ কিছু যোদ্ধা বমি করে দিলো, কেউ কেউ অজ্ঞানও হয়ে গেল। দৈত্য শিশুরা খেলার জিনিস হিসেবে মানুষের তাজা কাটা মাথার চারপাশে লাথি মারছে এবং মহিলারা হাড় দিয়ে তৈরি গয়না পরে আছে।

শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে নারা-মুন্ডা প্রত্যেক সর্দারকে একশত প্রহরী সাথে নিয়ে আসার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু বিশাল দৈত্য শিবিরে কয়েক মিনিট কাটানোর পরেই দস্যু সর্দাররা বুঝতে পারলো যে তারা এখন পুরোপুরি ভয়ংকর দৈত্যরাজের দয়ার উপর আছে। প্রথমবারের মতো কেউ দৈত্যদের পূর্ণশক্তিতে দেখছে। মাইলের পর মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে তাদের শিবির। সেই সাথে দৈত্যদের বিশাল সংখ্যা দেখে অস্বস্তি হচ্ছে যুদ্ধবাজদের। তাদের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। এরা সবাই নারা-মুন্ডার জন্য মরতে প্রস্তুত।

সকলেই মানবরক্ত পিপাসু।

* * * * *

তারা এখন অন্ধকার বনে সম্রাটের তাঁবুর ঠিক বাইরে একটা বড় অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বসে আছে। নারা-মুন্ডার কথা শুনছে। আসলে অনেক কিছুই শুনছে।

তার বিশাল দেহ, নিষ্ঠুরতা এবং তার মেজাজ সম্পর্কে সবাই ভালোই অবগত আছে। এতক্ষণে তাদের প্রত্যেকেই এই পচা নরকে এসে আফসোস করছে।

প্রবল ঠান্ডা ও অপ্রতিরোধ্য বন্যার হাতে নিশ্চিত মৃত্যুই এই বর্বরদেরকে তাদের থেকেও বড় বর্বরদের কাছে আসতে বাধ্য করেছে।

তারা জানতো যে মহাতরী ছাড়া তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর একমাত্র নারা-মুন্ডাই জাহাজ দখল করতে পারবে।

* * * * *

'আমাদের বাড়িতে স্বাগত, বন্ধুরা!' চিৎকার করে উঠলো নারা-মুন্ডা, তার বাহু প্রসারিত, গলার স্বর জঘন্য এক দৈত্যের মতো।

জবাবে মলিন হাসি এবং মাথা নত করা ছাড়া যুদ্ধবাজদের কোনো উপায় ছিলো না। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অঞ্চলের ভয়ংকর সেনাপ্রধান। কিন্তু আজ ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর নারা-মুন্ডার সামনে তারা অসহায়, ভেজা কুকুরছানা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দৈত্য কথা চালিয়ে গেল। 'আজ আমরা এখানে জড়ো হয়েছি ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক জোট গঠন করতে। একসাথে আমরা শুধু মহাতরীকে আক্রমণ এবং দখলই করবো না, প্রলয় কমে গেলে গ্রহটিকেও শাসন করবো। আমাদের বাহিনী একসাথে অস্ত্র ও বর্মের সমুদ্রের মতো অগ্রসর হবে এবং মহাতরীর নির্মাতাদের হৃদয়ে ভয়ের বীজ বপন করবে। আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। এখন থেকে আপনারা আমার আশ্রয়ে বাঁচবেন এবং যুদ্ধ করবেন।'

স্তব্ধ নীরবতা বিরাজ করছে। সরদারদের কেউই আনুগত্যের প্রস্তাব দেয়নি। এ তো সমশক্তির মধ্যে একটা জোট হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু নারা-মুন্ডার মনে হচ্ছে একেবারেই আলাদা পরিকল্পনা ছিলো।

'আমার সার্বভৌমত্বের একটা দীক্ষা হিসেবে দয়া করে দৈত্যদের কাছ থেকে এই নম্র নিবেদনটি গ্রহণ করুন,' দৈত্য বললো। তার লোকদের প্রয়োজনীয় কাজ করার ইঙ্গিত দিলো সে।

প্লেটগুলো সর্দারদের সামনে পরিবেশন করা হলো।

মানুষের মাংসভাজা!

* * * * *

নারা-মুন্ডার অবিশ্বাস্য স্পর্ধা দেখে দস্যু সর্দাররা স্তব্ধ হয়ে গেল। একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেও একজন কনিষ্ঠ বীর সেনাপতি প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নেয়। দৈত্য যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক পাশেই বসে ছিলো সে। ও নিজেও বেশ শক্তিশালী মানুষ ছিলো।

'হে অন্ধকার অরণ্যের রাজা, আপনার দূতরা তো আমাদের কাছে এই কথা বলেনি। আপনার শ্রেষ্ঠতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু আমাদের মানুষের মাংস পরিবেশন করার মানে কী? যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নেবো যে কে হবেন মহাতরীর কর্তা এবং সেনাপতি। আপনিও আপনার কথা বলতে পারবেন...'

যুবক সেনাপতি তার বক্তব্য শেষ করার আগেই নারা-মুন্ডার দৈত্যাকার ডান মুষ্টি তীরের গতিতে লোকটার মুখে আঘাত করলো। আঘাতটা পাথরের গদার আঘাত থেকেও বেশি প্রাণঘাতী ছিলো। যুবক সেনাপতির মুখ থেকে কতগুলো দাঁত উড়ে গিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো। তার একটা চোখ অক্ষিকোটর থেকে বেরিয়ে গালের কাছে ঝুলছে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে শুরু করলো সে। নারা-মুন্ডা আলস্যভরে তার কাছে গিয়ে যুবকটির মাথায় তার বিশাল পা রাখলো।

প্রথম আঘাতেই যুবকটি অর্ধ-মৃত অবস্থায় চলে গেছে। কিন্তু এরপরেও যন্ত্রণায় কাতরানোর মতো যথেষ্ট জীবিত ছিলো। সে তার দুই হাত দিয়ে নারা-মুন্ডার পায়ে থাপ্পড় দিচ্ছে, তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুনয় করছে। দৈত্য ধীরে ধীরে তার মাথার খুলি ফাটালো। রাক্ষস থেমে থাকেনি, করুণাও দেখায়নি। করুণা বা করুণা বলতে কী বোঝায় তা সে জানতো না। সে হতভাগ্য লোকটার কপালে তার পা চেপে রাখলো। ফেটে চুরমার হয়ে গেল মাথার খুলি। রক্তাক্ত মস্তিষ্ক বের হয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

এমন জানোয়ারের মতো বর্বরতা যুদ্ধবাজরা বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদের হৃদয় থমকে গেছে, শিরায় জমাট বেঁধে গেছে রক্ত। এই শয়তানের সেবা করার চেয়ে মহাপ্লাবনের জলে ডুবে যাওয়াই ভালো ছিলো। কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছে। তারা ইতোমধ্যেই দৈত্য সম্রাটের নখরে আটকা পড়ে গেছে।

নারা-মুন্ডা রক্তাক্ত চোখ দিয়ে প্রত্যেক যুদ্ধবাজের দিকে মৃত্যুদৃষ্টিতে থেমে থেমে কিছুক্ষণের জন্য তাকালো।

এরপর সে হিংস্র ড্রাগনের মতো গর্জন করে বললো, 'আর কেউ জাহাজের কর্তা ও সেনাপতি হতে চায়?'

বানারস, ২০১৭

ব্ল্যাক ডেথ

অন্ধকার ঘরে তার ফোনের অ্যালার্ম বেজে উঠলো।

বিদ্যুৎ তার প্রপিতামহের নির্দেশ অনুসারে ভোর ৪:৩০-এ ঘুম থেকে উঠলো। আজই সেই দিন যার জন্য পূজারি বংশধারা কয়েক শতাব্দী ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

যেই দিন সম্পর্কে রুমি পেরেরা সায়ানাইড খাওয়ার আগে বিদ্যুৎকে সতর্ক করেছে। যে মুহূর্তটির জন্য বালা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত সময় পর্যন্ত ত্রিজাত কাপালিক বিদ্যুৎকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যার জন্য একচোখা দানব ব্রহ্মানন্দ হেসেছিলো।

রোহিণী নক্ষত্র।

আজ রাতেই, মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে, রাতের আকাশে যা আকাশে যেন এক পবিত্র ঘণ্টা তৈরি করে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত রোহিণী নক্ষত্র ফুটতে চলেছে। এমন এক নক্ষত্রমণ্ডল যেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার এবং ঈশ্বরের সবচেয়ে মহৎ প্রতিনিধিদের জন্ম হয়েছে। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ এবং ছায়াপথগুলোর একটা ঐশ্বরিক ব্যবস্থা, যা কয়েক মিনিটের জন্য কাশীকে পরিণত করেছে একটা নিখুঁত আধ্যাত্মিক কোকুনে।

* * * * *

বিদ্যুৎ যজ্ঞ-কুণ্ডের পাশে বাবার দিকে মুখ করে বসে রইলো। সময়টা ছিলো ভোরবেলা। মঠাধীশ একটা যজ্ঞের আয়োজন করেছেন, আগামী বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে যা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্য বিদ্যুৎকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে।

মঠের রাক্ষস-খণ্ডের গভীরে থাকা কাল-ভৈরবের একটা সুন্দর অথচ ভয়ংকর মন্দিরে যজ্ঞটি আয়োজন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ এর আগে এই মন্দির কখনো দেখেনি।

মন্দিরের দেয়ালগুলো কালো পাথরে তৈরি, আর এতে ভগবান শিবের বিভিন্ন গণ বা শিষ্যের মূর্তি খোদাই করা আছে। সেখানে শিব-গণ কান্নাপ্পার মূর্তি ছিলো। এছাড়াও, পুসালের একটা মূর্তি ছিলো। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলো ভৈরবের কালো আবক্ষ, যা স্থাপিত ছিলো মন্দিরের মূল গর্ভগৃহে। কাশীর লোকেরা বলে যে ভৈরবকে অবশ্যই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পূজা করতে হবে কারণ তিনি ভগবান শিবের দ্বারপাল বা দারোয়ান।

দেব-রাক্ষস মঠের বেশ কিছু নিপুণ পূজারি বা পুরোহিত পবিত্র অগ্নি-গহ্বরের বিস্তারিত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকায় দ্বারকা শাস্ত্রী গতকাল যেখান থেকে আলোচনা শেষ করেছেন সেখান থেকেই শুরু করলেন।

'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার থামানো মানে শুধু একটা অশুভ সংস্থাকে বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ নেওয়া থেকে বিরত রাখা নয়। এটা তার চেয়েও অনেক বেশি। গোপন ভ্রাতৃসংঘের নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে যে তারা কীভাবে এই বিশ্বের সমস্যাগুলো সমাধান করতে চায়–সন্ত্রাসবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন, জল-স্বল্পতা...সবকিছুই তাদের এজেন্ডায় রয়েছে। কিন্তু তারা যে সমাধানটি বাস্তবায়ন করতে চায় তার চেয়ে বেশি নৃশংস কিছু ইতিহাসে এর আগে প্রত্যক্ষ হয়নি। কিন্তু তারা দেখেছে যে জনসংখ্যার বিস্ফোরণই হবে মানব বিলুপ্তির প্রধান কারণ। তাই তাদের দৃষ্টিতে বিশ্বের জনসংখ্যার নব্বই শতাংশকে ধ্বংস করে তারা মানব জাতির মহান এক সেবা করছে, নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে সুরক্ষা প্রদান করছে।'

সবকিছু ধীরে ধীরে আরো ভীতিকর হয়ে উঠছে। এমন উন্মাদনা বিদ্যুৎ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

'কিন্তু এ তো পাগলামি, বাবা! এই লোকেরা কি বিভ্রান্ত নাকি তারা কেয়ামতের ভবিষ্যদ্বাণীকারী কোনো পাগল? হ্যাঁ, এই গ্রহের অনেক সমস্যা রয়েছে। হ্যাঁ, বিলুপ্তির পর্যায়ে চলে যাওয়ার আগে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে হবে, হোক সেটা বৈশ্বিক উষ্ণতা কিংবা ধর্মীয় গোঁড়ামি নিয়ে। কিন্তু মানব জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে কীভাবে মানব জাতির সমস্যার সমাধান করবে?'

ভৈরব মন্দির থেকে কয়েকজন পুরোহিত এসে তাকে প্রণাম করলো। দ্বারকা শাস্ত্রী তাদের আশীর্বাদ করার উদ্দেশ্যে হাত উঠালেন।

'ব্ল্যাক ডেথ কিংবা প্লেগ সম্পর্কে তুমি কী জানো, বিদ্যুৎ?'

মধ্যযুগীয় ট্র্যাজেডির এই আকস্মিক উল্লেখে দেবতা হতবাক হয়ে গেল।

'কিছুটা জানি, বাবা। বিধ্বংসী এক প্রাদুর্ভাব ছিলো। ব্ল্যাক ডেথ বা ব্ল্যাক প্লেগ বা বুবোনিক প্লেগ চতুর্দশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপ জুড়ে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ে।'

'লন্ডন, প্যারিস এমনকি মস্কোর মতো বড় শহরগুলোও প্লেগের প্রকোপ অনুভব করেছে,' দামিনী যোগ করলো। দেবতার সাথে যজ্ঞে যোগ দেওয়ার জন্য পুরোহিতজি তাকে ডেকেছিলেন, আর সেও বিদ্যুতের মতোই জ্ঞানী ছিলো।

মঠাধীশ শুনছিলেন। একবার বিদ্যুৎ আর দামিনী থেমে গেলে দ্বারকা আবার কথা বলতে শুরু করলেন।

'ঠিক বলেছ। তবুও আমি বলছি তোমরা দুজনেই ব্ল্যাক ডেথ সম্পর্কে কিছুই জানো না। কেউ কিছু জানে না।' দ্বারকা শাস্ত্রী কড়া স্বরে শেষ তিনটি কথা বললেন।

মঠাধীশের চোখ রাগে জ্বলছে।

* * * * *

'লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। অথবা যদি আমাকে নিজের কথাকে সংশোধন করার অনুমতি দাও–প্লেগ দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার পরে ইউরোপ এবং এশিয়া জুড়ে কয়েক মিলিয়ন মানুষ মারা গেছে। এটা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক মহামারি হিসেবে নথিভুক্ত এবং স্বীকৃত। এখন হয়তো এই পরিসংখ্যান বিশ্বাস করাটা মানুষের পক্ষে কঠিন হবে, কিন্তু ব্ল্যাক প্লেগ ইউরোপের সমগ্র জনসংখ্যার ত্রিশ থেকে ষাট শতাংশ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে বলে অনুমান করা হয়।'

বিদ্যুৎ মনোযোগ দিয়ে শুনছে। যদিও সে ব্ল্যাক প্লেগের কথা শুনেছে, সেই সাথে শুনেছে কীভাবে এটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বকে ধ্বংস করেছে, কিন্তু সে মানুষের জীবনের ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে জানতো না।

দ্বারকা শাস্ত্রী কথা চালিয়ে গেলেন।

'মৃত্যুর সংখ্যা ছিলো ভয়াবহ। আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন যে বুবোনিক প্লেগের সময় বিশ্ব কী অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে। অনুমান করা হয় যে ১৪ শতকে বিশ্বের জনসংখ্যা ৪৫০ মিলিয়ন থেকে ৩৫০ মিলিয়নের নিচে নেমে এসেছে। একবার ভাবো, বিদ্যুৎ, ৭৫ থেকে ২০০ মিলিয়ন মানুষ প্লেগে মারা গেছে। এই একটা রোগ বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ কমিয়ে ফেলেছে।

ব্ল্যাক ডেথ প্যারিসের অর্ধেক হত্যা করেছে মানুষকে। নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে মিশরের চল্লিশ শতাংশ। ফ্লোরেন্সের অর্ধেক। লন্ডনের ষাট শতাংশ। মস্কোর এক-তৃতীয়াংশ। এই তালিকা অন্তহীন। যদিও এগুলো আজ পরিসংখ্যানের মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু কী অবর্ণনীয় যন্ত্রণা এবং ভোগান্তি মানব জাতিকে সহ্য করতে হয়েছে তুমি কি একবার অনুধাবন করতে পারো? লাখ লাখ শিশু তাদের অসহায় বাবা-মায়ের কোলে মারা গেছে। পচনশীল লাশে ছেয়ে গেছে শহরের রাস্তাঘাট। শিশুরা দোলনায় কাঁদছে, বাবা-মা উভয়েই মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। দাঙ্গা, লুটপাট, খুন...পৃথিবীকে তার আসল সংখ্যায় ফিরে আসতে দুশো বছরেরও বেশি সময় লেগেছে।'

এতক্ষণে বিদ্যুতের গলা শুকিয়ে আসছে। সে বুঝতে পারছে কীভাবে বুবোনিক প্লেগ ব্ল্যাক ডেথের মতো ভীতিকর শিরোনাম অর্জন করেছে।

কিন্তু কাহিনি আরো অনেক বাকি ছিলো।

* * * * *

'শত বছর ধরে এটা বিশ্বাস করা হয়েছে যে ব্ল্যাক প্লেগ ইয়েরসিনিয়া পেস্টিস নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, যা মাছি আর ইঁদুরের মাধ্যমে সিল্ক রুট বরাবর এশিয়া এবং ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কালো মন্দিরের অভিভাবকরা জানতেন যে এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ১৯৮৪ সালের শেষের দিকে প্রাণীবিদ গ্রাহাম টুইগ এই তত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তার যুক্তির বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং বিশদ বিবরণে না গিয়ে আমি তোমার সাথে তার উপসংহারটি শেয়ার করি।'

শেষ দেবতা একবারের জন্যও তার চোখের পলক ফেলছে না। তার প্রপিতামহ যা বর্ণনা করছেন তাতে সে বিমোহিত হয়ে গেছে।

'টুইগ এই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন যে বুবোনিক প্লেগ ইয়েরসিনিয়া পেস্টিস দ্বারা নয়, বরং অ্যানথ্রাক্সের একটা প্রাণঘাতী রূপের কারণে হয়েছে।'

'অ্যানথ্রাক্স? এগুলো তো সেইসব ভয়ংকর ব্যাকটেরিয়ার স্পোর, যেগুলো জৈব-সন্ত্রাসের জন্য ব্যবহার করা যায়, তাই না?' দামিনী জিজ্ঞেস করলো।

'একদম ঠিক বলেছ, দামিনী। ব্ল্যাক প্লেগ ছিলো মানুষ ইতিহাসে জৈব-সন্ত্রাসের সবচেয়ে নির্দয় কাজ। কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যাকে আমূলভাবে হ্রাস করার পূর্বনির্ধারিত নকশা দিয়ে নির্মমভাবে একশো মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেছে।'

কিছুক্ষণের জন্য সবাই নীরব হয়ে গেল, শুধু মাদুর ও পূজার জিনিসপত্র রাখার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দ্বারকা শাস্ত্রী যা বর্ণনা করেছেন তার মর্মার্থ বিদ্যুতের কাছে স্পষ্ট। তবে তাকে এরপরেও পুনরায় জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত করতে হয়েছে। কারণ ব্যাপারটা আসলেই অকল্পনীয়, ক্ষমার অযোগ্য।

'বাবা, আপনি বলতে চাচ্ছেন যে অর্ডারই মানব জাতির উপর মারাত্মক ব্ল্যাক প্লেগ ছড়িয়ে দিয়েছে?' বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করলো, ভয়ে তার চোখ লাল হয়ে গেছে।

দ্বারকা শাস্ত্রী সহজভাবে উত্তর দিলেন, 'আমি ঠিক এটাই বলছি, বিদ্যুৎ। শুধু তাই না, ওরা আবারো এটা করতে যাচ্ছে। এবার আরো বড় পরিসরে।'

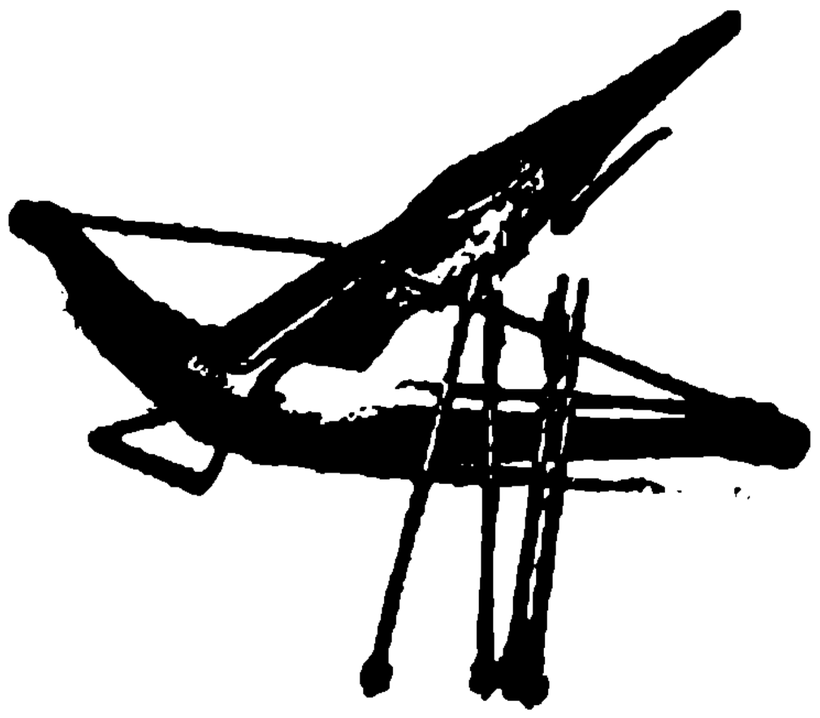

আর্যাবর্তের জলাভূমি, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৮ অব্দ
লক্ষ লক্ষ তীর

প্রচণ্ড তার লোকদের নিয়ে জাহাজ নির্মাণের জায়গায় এসে পৌঁছানোর পর বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। অসুররা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে মহাতরীর কাজ এবং যুদ্ধশক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। শেষ বেসক্যাম্প এবং উপনিবেশটিও তুলে নেওয়া হয়েছে। আর্যাবর্তের বেঁচে থাকা সমস্ত মানুষ এখন চড়ে বসেছে বিশাল জাহাজে। অসুর রাজার মধ্যে অমূল্য বন্ধু খুঁজে পেয়েছে মানু। একটা বিশাল সেনাবাহিনীকে পরিচালনা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রচণ্ডের তিন দশকের অভিজ্ঞতা আছে। তার দক্ষতা জাহাজের বৈচিত্র্যময় সৈন্যদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর।

সেখানে হরপ্পার সৈন্য ছিলো; তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার। পরম দক্ষ মৎস্য-মানবরাও সংখ্যায় কম ছিলো না; এদেরকে মৎস্য তার প্রিয় সত্যব্রতের সাথে সংযুক্ত করেছেন। প্রচণ্ডের অসুররা এই চিত্তাকর্ষক সেনাবাহিনীতে আরো কয়েক হাজার যোগ করেছে। এরপর আছে ধ্রুব এবং তার মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রমী যোদ্ধারা; এরা স্বয়ং মহান বিভাসন পূজারির দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছে।

সমস্ত দস্যু যুদ্ধবাজদের নারা-মুন্ডার নিরবচ্ছিন্ন রাজতন্ত্র মেনে নেওয়ার খবর মানুর কাছে পৌঁছে গেছে। এমনকি কোন পরিস্থিতিতে এই জোরপূর্বক জোট গঠন করা হয়েছে তাও সে জানতো। এটা কেবল মানুর উদ্বেগই বাড়িয়েছে। নারা-মুন্ডা তার প্রত্যাশার চেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

পুরোটাই এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। নির্ধারক যুদ্ধ আসছে। দৈত্যদের বিশাল বাহিনী পরের দিন নাকি পরের মাসে আসবে, শুধু এই একটা মাত্র প্রশ্ন বাকি আছে এখন।

* * * * *

'আমাদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, জাহাজের চারপাশে যত দূর পর্যন্ত চোখ যায় শুধু সমতল ও অনুর্বর জলাভূমি রয়েছে,' তারা বললো। মহাতরী ও এর আশেপাশের এলাকার অঙ্কিত চিত্রে তীর দিয়ে দেখাচ্ছে।

জাহাজের রক্ষকরা অনিবার্য যুদ্ধের জন্য পুরো মাত্রায় প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। জাহাজের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের চূড়ান্ত পর্যায়ের সকল দায়িত্ব বৃদ্ধ, মহিলা এবং শিশুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে সমস্ত সক্ষম পুরুষকে। বিপুলসংখ্যক মহিলাও দামিনী-সেনাতে নাম লেখায়, ফলে মানুর বাহিনীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্ভাব্য সকল উপায়ে দৈত্যদের অগ্রগতি ট্র্যাক করতে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো জোরদার করার জন্য প্রতিদিনই ডাকা হচ্ছে বৈঠক।

'এটা কেমন সুবিধা, তারা? অনুর্বর জলাভূমির মানে হলো শত্রু অশ্বারোহীরা কোনো প্রাকৃতিক বাধা ছাড়াই জাহাজে ছুটে আসতে পারবে। ওদের অগ্রগতি আরো দ্রুত হবে,' প্রচণ্ড বললো।

'হ্যাঁ, এটাই হবে। অবশ্য, আমরা যদি ওদের তীর-বৃষ্টির মাধ্যমে স্বাগত জানাই তো ভিন্ন কথা। আমরা এত বেশি তীর-বর্ষণ করবো যে এই অনুর্বর জলাভূমিতে পা ফেলার মতো জায়গা থাকবে না। আমরা তাদের সৈন্যদের এমন আঘাত করবো যে জাহাজের কাছে আসার জায়গাটা দৈত্য এবং দস্যুদের কবরস্থানে পরিণত হবে।'

মানু তার সুন্দরী, প্রেমময়ী তারাকে সিংহীতে রূপান্তরিত হতে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। তারা ছিলো একজন জন্মগত জেনারেল।

'ঠিক আছে, কিন্তু এত শস্ত্রশক্তি জোগাড় হবে কী করে? আমাদের তীরন্দাজ আছে, কিন্তু তীরের ঝড় তৈরি করার জন্য সংখ্যাটা যথেষ্ট নয়,' ধ্রুব বাধা দিলো। কেউ যদি এখানে ধনুর্বিদ্যা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো বুঝে থাকে, তবে সেই হলো ঐ ব্যক্তি।

'আমি জানি। এ নিয়ে আমার একটা পরিকল্পনাও আছে,' তারা উত্তর দিলো, আগের মতই আত্মবিশ্বাসী শোনাচ্ছে।

* * * * *

'আজ পর্যন্ত দামিনী-সেনায় আমাদের পনেরো হাজার যোদ্ধা আছে। আমাদের শত্রুর বর্বরতা এবং অশ্লীলতার কথা ভেবে আমি সবাইকে মাটিতে থেকে সেই বর্বরদের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে জাহাজের উপরে রাখতেই বেশি পছন্দ করবো। এতে আমরা একটা দুর্দান্ত কৌশলগত সুবিধাও পাবো। যদি আমরা পুরো বাহিনীকে তিনটি ইউনিটে ভাগ করি এবং তার মধ্যে একটা ইউনিট জাহাজের উপর রাখি, তাহলে আমাদের কাছে পাঁচ হাজার মহিলা তীরন্দাজ থাকবে, যারা

জাহাজের পুরো পরিধিকে চারদিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। পাশাপাশি ধ্রুবর অধীনে আরো সাত হাজার পুরুষ তীরন্দাজ আছে। অর্থাৎ, আমরা এখানে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি তীরন্দাজের কথা বলছি যারা যুদ্ধের প্রতিটা অংশে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।'

নিজের পরিকল্পনায় সমর্থন পাওয়ার জন্য কক্ষের চারপাশে তাকালো তারা।

'হাস্যকর কথা বোলো না, তারা।' চেয়ার থেকে উঠে গেল ধ্রুব।

ও এইভাবে তারার সাথে কথা বলতে পারে অবশ্য। কারণ ওরা ছোটবেলার বন্ধু।

'তুমি ভুলে যাচ্ছো তোমার দামিনী-সেনাদের কেউই তীর-ধনুক ব্যবহারে প্রশিক্ষিত নয়। দৈত্য এবং যুদ্ধবাজরা দক্ষ ঘোড়সওয়ার। তারা ক্ষিপ্ত গতিতে আক্রমণ করবে, মানে লক্ষ্যবস্তু চলমান হবে। নবজাতক তীরন্দাজরা কীভাবে থামাবে ওদের?'

'আমি চাই তুমি তোমার মগজটাকে আরো একটু বেশি ব্যবহার করো, ধ্রুব,' তারা পালটা জবাব দিলো। 'আমরা তীরন্দাজদের দুই ভাগে ভাগ করবো। প্রশিক্ষিত তীরন্দাজরা, মানে তোমার তীরন্দাজরা নিচের ডেকে অবস্থান করবে। অন্য দিকে দামিনী-সেনারা সর্বোচ্চ ডেকে অবস্থান নেবে। তাদের যা করতে হবে তা হলো, শুধু আকাশে প্রজেক্টাইলের মতো করে তীর ছুঁড়তে হবে। বিস্তীর্ণ ভূমিটা তীরে ঢেকে দিতে হবে, আর তার জন্য খুব বেশি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন পড়বে না। এরপর তীরগুলো যেখানেই পড়বে, নিজেদের লক্ষ্য খুঁজে নেবে। এরপর এই তীর-বৃষ্টি থেকে শত্রুপক্ষের যেই ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক সৈন্যরা বেঁচে যাবে, ওরা জাহাজের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে তোমার দক্ষ তীরন্দাজরা তাদের একে একে হত্যা করবে। তুমি কি বুঝতে পারছো না, ধ্রুব, আমরা কেবল আমাদের তীরন্দাজদের ব্যবহার করেই শত্রু বাহিনীকে অর্ধেক করে ফেলতে পারবো। এরপর আমাদের অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী তখন তাদের বাকিদের খুব সহজেই কচুকাটা করতে পারবে,' তারা চিৎকার করে বললো।

ধ্রুব স্পষ্ট প্রশংসায় ভ্রু তুলে মানুর দিকে তাকালো। মানু হাসছে।

প্রধান তীরন্দাজ তারার দিকে ঘুরে মাথা নাড়লো। 'ঠিক আছে, চলো তোমার পরিকল্পনা সফল করি।'

'ধন্যবাদ, ধ্রুব,' তারা বললো। 'এখন আমাদের একটাই সমস্যা।'

ধ্রুব ভ্রুকুটি করলো। 'সেটা কী?'

'আমাদের লক্ষ লক্ষ তীর তৈরি করতে হবে।'

পবিত্র যজ্ঞ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিদ্যুৎ আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য তার বাবার পা স্পর্শ করলো। সনাতন ধর্ম বা সহজভাবে বললে, হিন্দু পরিবারগুলোতে ছোটদের জন্য এই পদ্ধতিতে তাদের বড়দের আশীর্বাদ নেওয়ার প্রথা ছিলো।

পরের দুই দিন এবং রাতের জন্য দেবতার সব ধরনের আশীর্বাদের প্রয়োজন আছে।

‘আমরা সবার চলে যাওয়ার অপেক্ষা করবো, বিদ্যুৎ,’ বিড়বিড় করে বললেন বৃদ্ধ। ‘সময় এসেছে তোমার ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর।’

দামিনী চলে যেতে চাইছিলো না, কিন্তু সে বুঝতে পেরেছে যে তার দুই শাস্ত্রীকে একা রেখে যাওয়ার সময় এসেছে।

‘দয়া করে আমাকে যাওয়ার আজ্ঞা দিন, বাবা।’ সে উঠে হাতজোড় করে প্রণাম করলো।

দ্বারকা শাস্ত্রী মুচকি হেসে মাথাটা একটু নেড়ে দামিনীকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

দামিনী বের হওয়ার সময় বিদ্যুৎ ওর দিকে ফিরে ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

‘বাবা...’ বিদ্যুৎ বললো, ‘পূজারিদের পুজো শেষ করতে আরো একটু সময় লাগবে। তাহলে আমরা আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি না কেন? আমি এখনো ঠিক জানি না কেন আমার বাবা কার্তিকেয় শাস্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে, যদিও আমি আন্দাজ করতে পারছি।’

* * * * *

কাল-ভৈরব মন্দিরটি তখনো আনুষ্ঠানিক আগুনের ধূসর ধোঁয়ায় পূর্ণ ছিলো। বিদ্যুতের কাছে সব সময়ই যজ্ঞের ধোঁয়া, ধূপ, গাঁদা ফুল এবং কর্পূরের এই আনন্দদায়ক সংমিশ্রণটি ভালো লাগে। এতে সে গভীর এক প্রশান্তি অনুভব করে।

'ব্ল্যাক ডেথের পর মঠ ও অর্ডারের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ শুরু হয়। প্লেগের ঘটনা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয় যে অর্ডার আমাদের কল্পনার চেয়েও বেশি ভয়ংকর ও অশুভ। তখন শাস্ত্রী গোষ্ঠীর লোকেরা লড়াইটিকে অর্ডারের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপরে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়...' মঠাধীশ বললেন।

'কেমন হত্যাকাণ্ড, বাবা?'

'বাদ দাও, বিদ্যুৎ। সহিংসতা নিয়ে তোমার মতামত সম্পর্কে আমি জানি। ত্রিজাতের হত্যার সময় তোমার প্রতিক্রিয়া আমি দেখেছিলাম। বলভান্ত আমাকে এটাও বলেছে যে তুমি সেই একচোখা রাক্ষস ব্রহ্মানন্দকে মুক্তি দিয়েছ। এটা একটা বিরাট ভুল ছিলো, বিদ্যুৎ। এর জন্য তুমি একদিন আফসোস করবে। যাই হোক, গুপ্তহত্যা নিয়ে এত গভীর আলোচনার প্রয়োজন নেই। শুধু এটা জেনে রাখো যে উভয় পক্ষই তখন একে অপরকে শিকার করতে শুরু করে দেয়। আর তোমার সাহসী পিতা কার্তিকেয় কেবল তাই করেছেন যা তার কাছে প্রত্যাশিত ছিলো। যা করার জন্য তাকে আদেশ করা হয়েছিলো। এসব তো আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, বিদ্যুৎ। রক্তধারার অভিশাপের কথা তো মনে থাকার কথা। তিনি মানব জাতিকে চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার অভিশাপ দিয়েছেন। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কেবল সেই অভিশাপেরই বহিঃপ্রকাশ।'

'তার গল্পও বলুন, বাবা। আমাদের পূর্বপুরুষ–বিভাসন পূজারি, সত্যব্রত মানু, অদ্বৈত শাস্ত্রী, দুর্গাদাস শাস্ত্রী, মার্কন্ডেয় শাস্ত্রী...আর সবশেষে বাবার দুর্দান্ত কৃতিত্বের কথা আমাকে অভিভূত করে। এই কাহিনিগুলো খুব তৃপ্তিদায়ক, মনকে অসাড় করে দেয়।'

দ্বারকা শাস্ত্রী হাসলেন।

'তুমি কি জানো আমাদের বংশধারার সবচেয়ে মহান কে হবে? জানো না মনে হয়, তাই না? তুমি, বাছা। তুমিই ভবিষ্যদ্বাণীকৃত দেবতা। শেষ দেবতা! আমাদের সকলের মিলিত শক্তির চেয়েও মহান।'

'ওহ্, প্লিজ, বাবা,' বিব্রত হয়ে বললো বিদ্যুৎ। 'আমি জানি না কেন আপনি, পুরোহিতজি এবং মঠের অন্য সবাই এমন কথা বলছেন। আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের যা ছিলো, তার ভগ্নাংশও আমি অর্জন করতে পারিনি। তাহলে কেন? আমি আপনার মহত্ত্বের কাছাকাছিও কিছু করতে পারিনি, বাবা।'

'তুমি কি মনে করো ভাড়াটে ঘাতককে একা লড়াই করে হারিয়ে দেওয়া মহৎ কোনো কাজ নয়, বিদ্যুৎ? তুমি কি এমন কাউকে চেনো যে এটা করতে পারবে?

গত দেড় দশকের সবচেয়ে হাই প্রোফাইল গুপ্তহত্যার পেছনে থাকা খুনি রুমি পেরেরা সম্পর্কে কী বলবে? তুমি কি জানো যে মশান-রাজ প্রায় অজেয় ছিলো? তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক তান্ত্রিককে পরাজিত করেছ। ভুলে যেও না, বিদ্যুৎ, আমি আজ বেঁচে আছি এবং নিঃশ্বাস নিচ্ছি কারণ তোমার ঐশ্বরিক সত্তা আমাকে রক্ষা করেছে। নিজের অবমূল্যায়ন কোরো না, বাছা।'

বিদ্যুৎ হেসে দ্বিমত হয়ে মাথা নাড়লো। 'আমি আপনার সাহায্য ছাড়া ত্রিজাত কাপালিককে মারতে পারতাম না, বাবা। অধোভুবন থেকে যে ডাকিনীরা উঠে এসেছে, আমি তাদের সাথে লড়াই করতে পারতাম না। আমি একা তাদের হারাইনি, বাবা। *আমরা* তাদের হারিয়েছি।'

দ্বারকা শাস্ত্রী আনন্দের সাথে হাসলেন। 'এটা ভালো কথা যে তুমি বিশ্বাস করো একজন দেবতারও সাহায্য দরকার হয়। এই যুক্তিতে ভগবানেরও তো সাহায্য লাগবে, তাই না, বিদ্যুৎ? তুমি জানো, বাছা...তুমি যেভাবে টিমওয়ার্কের কথা বলছো তা আসলেই চমৎকার।' তিনি তখনো হাসছিলেন।

বিদ্যুৎ কিছুই বুঝতে না পেরে বাবার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর বৃদ্ধের হাসি দেখে নিজেই হাসতে শুরু করে দিলো।

'বিদ্যুৎ, তুমিও তো কারো দলে আছো। তোমাকে সেজন্যই পাঠানো হয়েছে।'

* * * * *

দেবতা বুঝতে পারলো না যে তার বাবা ঈশ্বরেরও সাহায্যের প্রয়োজন বা সেও কারো দলে আছে বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন। সে বিষয়টা পরিবর্তন করার এবং যা সবচেয়ে বেশি জানতে চাচ্ছিলো, আলোচনাটা তার দিকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

'এখন আমার বাবার কথা বলুন।'

'হ্যাঁ, বাছা। আমার মনে হয় এতক্ষণে তোমার ধারণা হয়ে গেছে যে কার্তিকেয় শাস্ত্রীর হত্যার পেছনে কারা দায়ী। তারা ঐ একই অন্ধকার শক্তি ছিলো যারা অদ্বৈত, মার্কন্ডেয় এবং দুর্গাদাস শাস্ত্রীকে হত্যা করেছে–নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার! তবে এটুকু জেনে রাখো, বিদ্যুৎ, রক্ত দুই দিক থেকেই ঝরেছে। কালো মন্দিরের গোপনীয়তা রক্ষায় এই পরিবারের যে সমস্ত ছেলে আত্মাহুতি দিয়েছে, তাদের জন্য আমরা বেশ কিছু ওভারলর্ড এবং অর্ডারের সহযোগীদের নির্মূল করেছি। প্রয়োজনে আমরা চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লড়াইটা অতীন্দ্রিয় এবং অশরীরী যুদ্ধে রূপ নেয়। কিছু আবার ছিলো কোনো ধরনের নিয়ম-

নীতি না মানা স্ট্রিট ফাইট। কিন্তু সময় আমাদের পক্ষে এসে পড়ে, যখন কার্তিকেয় অর্ডারের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি আমেরিকাকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কার্তিকেয়র সময়েই অর্ডারকে প্রতি ফোঁটা শাস্ত্রী রক্তের জন্য ভারী মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে। কিন্তু ইলুমিনাতি এবং অন্যান্য গোপন সমাজ, যারা একত্রে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার গঠন করে, তারা এমনকি কার্তিকেয়ের জন্যও খুব শক্তিশালী ছিলো। তারা অবশেষে তাদের এক নম্বর শত্রুকে ধরে ফেলে, তাকে ঘিরে ফেলে এবং সান ফ্রান্সিসকোতে এক বৃষ্টির রাতে তাকে হত্যা করে। এমনকি নিজের বিকৃত, অর্ধমৃত অবস্থায়ও আমার নাতি এবং তোমার পিতা, বীর কার্তিকেয় শাস্ত্রী, শেষ কালো মন্দিরের অবস্থান প্রকাশ করেনি।'

বিদ্যুৎ হতভম্ব হয়ে বসে রইলো। সে কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইলো, কিন্তু পারলো না। ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় তার শিরা-উপশিরা বিস্ফোরিত হওয়ার উপক্রম হলো।

'তো বুঝেছ, বাছা...' দ্বারকা শাস্ত্রী বললেন, 'এটা হলো একটা যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধ শত শত বছর ধরে চলে আসছে। আর আমরা, শাস্ত্রী বংশধারা, এই চেষ্টার যাত্রার সময় আমাদের কাছে যা কিছু প্রিয় ছিলো তা হারিয়েছি। কিন্তু আমি তোমাকে আশ্বস্ত করছি, বিদ্যুৎ, তারপরেও আমরা একবারও কোনো নিরপরাধের ক্ষতি করিনি। মানব জাতিকে রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব ছাড়া আমরা কখনোই লড়াই করিনি। শত শত বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা নৈতিকতা ও ধর্মকে এক মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করেনি।'

* * * * *

এখন এই যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে বিদ্যুৎ। তার স্নেহময় পিতার কথা তার মনে পড়ে গেল। কার্তিকেয় শাস্ত্রী ছিলেন একজন মৃদুভাষী, সদা হাস্যোজ্জ্বল, নিতান্ত ভদ্রলোক, যিনি রাতে বিদ্যুৎকে রূপকথার গল্প পড়ে শোনাতেন। আর এখন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কঠিন সত্য। গুপ্তহত্যা, জাদুবিদ্যা, এক্সরসিজম, অর্ডারের ওভারলর্ডদের হত্যা, এগুলো সে কখনো তার কল্পনাতেও ভাবতে পারেনি।

দ্বারকা শাস্ত্রী যতবার এই শতাব্দীর পুরোনো রক্ত-সংঘাতের কথা বলেছেন, বিদ্যুৎ জানতো এর অর্থ কী। কিন্তু এটা তার মানতে কষ্ট হচ্ছে যে তার পিতার, তার পিতামহের এবং তার সমস্ত পূর্বপুরুষের হাত রক্তে রঞ্জিত, যদিও সেটা মানব জাতিকে অন্ধকারের শক্তি থেকে রক্ষা করার পথে হয়েছে।

তার সামনে এখন দুটো পথ খোলা। হয় এখনই সে এখান থেকে উঠে যাবে, নিজেকে সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে নেবে, তার প্রপিতামহ, মঠ এবং এই হাজার

বছরের ভয়াবহ কাহিনি ও পাপাচার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং এইসব কিছুকে একটা দুঃস্বপ্ন ভেবে ভুলে যাবে। আর কখনো ফিরবে না। সে দামিনীকে নিয়ে চলে যাবে এবং একটা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন ধারণ করতে পারবে।

অথবা সে এই যুদ্ধের উত্তরাধিকারী হতে পারে, গ্রহণ করতে পারে তার পূর্বপুরুষদের সহিংস ঐতিহ্য। সেই সাথে পূরণ করতে পারে প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী। ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ তার নিয়তি মেনে নিয়েছিলো। দ্বারকা শাস্ত্রীর চোখের দিকে তাকালো সে; মহান বুড়োর চোখই যেন সবকিছু বলে দিচ্ছিলো। দেবতা তার দাঁত চেপে, চোখ বন্ধ করে, গর্বিতভাবে সবকিছুর জন্য তার রক্তরেখাকে আলিঙ্গন করলো।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মাথা নত করে নিজের মহান পূর্বপুরুষদের নীরব অভিবাদন জানালো সে, যারা মানব জাতির মন্দিরের বেদিতে একের পর এক আত্মাহুতি দিয়েছেন।

চোখ খোলার পর বিদ্যুৎ যেন অন্য কেউ ছিলো।

সে ছিলো কলিযুগের সবচেয়ে বড় রহস্য, কালো মন্দিরের রহস্যের শেষ রক্ষাকর্তা।

জাহাজের চারপাশের জলাভূমি, আর্যাবর্ত, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৮ অব্দ

নরখাদক রাক্ষস

জাহাজটিকে দেখে মনে হচ্ছে ওর ভেতর যেন পৃথিবীর সবচেয়ে অন্ধকার রাত নেমে এসেছে। মাইলের পর মাইল ধরে বিস্তৃত এবং হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ার চেয়েও উঁচু। কয়েক মাইল দূর থেকেও জাহাজটিকে একটা কালো দৈত্যাকার ব্লক বলে মনে হবে।

আলোর একটা ঝলকেরও অনুমোদন ছিলো না। একটা বাতিও জ্বালানো হলো না। মানু, ধ্রুব, তারা এবং প্রচণ্ড অন্ধকারকে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জাহাজের কয়েক হাজার বাসিন্দাকে বার্তা পাঠানো হয়েছে যে পুরো দিন এবং রাত সম্পূর্ণ অন্ধকারে কাটাতে হবে। কারণটা সহজ। দৈত্যরা খুব কাছে চলে এসেছে। যুদ্ধবাজদের সমর্থনে প্রচুর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ওরা। কয়েক মাইল দূরে জাহাজের চারপাশে শত শত দৈত্যশিবির স্থাপন করা হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে নরখাদক ও যুদ্ধবাজ দস্যুরা জাহাজকে দশ দিক থেকে ঘিরে রেখেছে।

জাহাজের বাসিন্দা এবং যোদ্ধারা স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা ভীত আর বিচলিত হয়ে পড়েছে, কিন্তু এরপরেও অপ্রস্তুত নয় ওরা। প্রকৃতপক্ষে, পুরো জাহাজটাই এখন সৈনিকদের একটা বিশাল ঘাঁটি হয়ে পড়েছে। যে ভয়ানক প্রতিপক্ষের জন্য অপেক্ষা করছিলো, এখন পুরোপুরি প্রস্তুত তাদের জন্য।

* * * * *

সম্পূর্ণ অন্ধকারে আক্রমণকারীদের পক্ষে মহাতরীর ডেকের উপরে থাকা হাজার হাজার তীরন্দাজদের দেখতে পাওয়া অসম্ভব ছিলো। সৈনিকরা জাহাজকে চারদিক থেকে রক্ষা করছে, প্রত্যেকেই নিজেদের জায়গায় প্রস্তুত। অভিজাত মৎস্য-মানবদের পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের বিশাল একটা সৈন্যদল রাতের

অন্ধকারতম সময়ে অগ্রসর হয়েছে; এই মুহূর্তে বিশাল ও গোপন একটা চেম্বারে অপেক্ষা করছে যা দৈত্যরা কখনো কল্পনাও করতে পারবে না।

জাহাজের একদম গভীরে অস্থায়ী রান্নাঘর স্থাপন করা হয়েছে। এতই গভীরে যে জাহাজের বাইরে থেকে কেউ এই বিশাল আগুন আঁচ করতে পারবে না। এটা করা হয়েছে যাতে নিয়মিত বিরতিতে ফ্রন্টলাইনে থাকা হাজার হাজার যোদ্ধাদের জন্য গরম শাকসবজি এবং পুষ্টিকর ঝোল সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। শত শত বড় আকারের হাঁড়িতে ক্রমাগত রান্না করা হচ্ছে মাংস আর ভাত। এটা করা হচ্ছে যুদ্ধের সময় অসুর সৈন্যদের খাওয়ানোর জন্য।

জাহাজের প্রায় প্রতিটি ডেকই গত কয়েক সপ্তাহে আনা বিশাল বিশাল কার্গো দিয়ে ভরতি। ওগুলোতে আছে তীর—লক্ষ লক্ষ তীর। জাহাজের প্রত্যেক তীরন্দাজ এই মুহূর্তে হাজার হাজার তীর দিয়ে সজ্জিত, আর মুহূর্তের মাঝেই আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের অন্যান্য প্রস্তুতির বাইরে মানু সবচেয়ে বেশি যেটার উপর নির্ভর করছে তা হলো মহান মৎস্য বিদায়ের আগে তাকে যে অস্ত্রটা দান করেছেন সেটা।

'তুমি যখন সব হারিয়ে ফেলার অবস্থায় চলে যাবে, তখন এটা ব্যবহার করবে, সত্যব্রত,' মৎস্য বলেছিলেন। 'তখন আগুনের দেবতা অগ্নি তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।'

মৎস্য মানু ও ধ্রুবকে একটা গোপন স্থান দেখিয়েছিলেন, এরপর তিনি তাদের শত শত ব্যারেল রাসায়নিক পদার্থ সরবরাহ করেন।

গন্ধক।

* * * * *

খাবার খাওয়ার সময় সোমদত্তকে অস্বাভাবিকভাবে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। মানু তার পাশে বসে নীরবে নিজের ভাতের ঝোল খাচ্ছে। এই দীর্ঘ সময়ে তাদের চোখ গভীর আঁধারের মাঝে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, এই ঘোর অন্ধকারেও সত্যব্রত তার বিশ্বস্ত পরামর্শকের উদ্বেগ অনুভব করতে পারছে। মানু জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু একটা আপনাকে চিন্তিত করছে বলে মনে হচ্ছে, সোমদত্তজি।'

সে জানতো সোমদত্ত সেই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যারা মানব জাতির ভবিষ্যতে নির্ধারক ভূমিকা পালন করবেন। তিনি না থাকলে এই মহাতরী, জাহাজ নির্মাণশৈলীর এই বিস্ময়, কখনো সৃষ্টিই হতো না। এই দুঃসাধ্য উদ্যোগ বাস্তবায়নে

গত কয়েক মাস ধরে একসাথে কাজ করার ফলে এই দুই অনুসরণীয় পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ এবং শ্রদ্ধা সীমাহীনভাবে বেড়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, সোমদত্ত তাকে তার পিতা বিভাসন পূজারির কথা মনে করিয়ে দেন। এক মুহূর্তের জন্যও মানু ভুলতে পারে না যে যখন তার পিতাকে উনার নিজের ছায়াও পরিত্যাগ করেছিলো, সোমদত্ত তখন একাই সূর্যের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। মানু হরপ্পা ও জাহাজের এই প্রধান স্থপতিকে নিজের বাবার মতোই ভালোবাসে। বিভাসন, সানজানা ও মৎস্য ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সোমদত্তই হচ্ছেন তার একমাত্র অভিভাবক। এমনকি, মহান স্থপতিও যুবক ঋষি রাজাকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসেন।

'হ্যাঁ, আমি চিন্তিত, মানু। আমি আমার চারপাশে এই সমস্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখছি...ভালোই লাগছে। হরপ্পার সেনাবাহিনী, বিস্ময়কর মৎস্য-মানব যোদ্ধা ও অসুর যোদ্ধাদের সম্মিলিত বাহিনী, আমাদের ঘিরে রাখা নরখাদকদের বিশাল বাহিনীকে প্রতিহত করার একটা ছোট কিন্তু বাস্তব সুযোগ তৈরি করেছে। পাশাপাশি, প্রলয় পুরো গ্রহকে গ্রাস করার আগে এই শেষ লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তুমি, ধ্রুব, তারা আর প্রচণ্ডের আর মতো দক্ষ ও দুর্দান্ত জেনারেল রয়েছে।'

'আপনার এই কথাগুলো আমার জন্য অনেক স্বস্তিদায়ক, সোমদত্তজি। কিন্তু তবে এরপরেও কী এমন হলো যে আপনি এই সাধারণ কিন্তু সুস্বাদু খাবারটা উপভোগ করতে পারছেন না?'

সোমদত্ত মানুর দিকে তাকালেন। এই বিস্তৃত অন্ধকার সত্ত্বেও মানু প্রধান স্থপতির মুখে ভয় দেখতে পেল।

'নারা-মুন্ডা, মানু। আমরা এই দানবীয় শয়তান নারা-মুন্ডার জন্য প্রস্তুত নই।'

* * * * *

'তোমরা সবাই বুঝতে পারছো না...সে কোনো মানুষ নয়!' জাহাজের রণকক্ষে বসে থাকা সবাইকে চিৎকার করে বললেন সোমদত্ত।

মানুর কাছে তাদের সংক্ষিপ্ত খাবারের সময় উদ্বেগ প্রকাশ করার পরপরই মানু জেনারেলদের একটা সভা ডেকেছিলো। তার নিকটতম এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহকারী ধ্রুব, তারা আর প্রচণ্ড এখন উপস্থিত আছে। পাশাপাশি আছেন সপ্তর্ষিরাও।

'নারা-মুন্ডা প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করেনি। আমি জানি না যে সে কীভাবে যেমন আছে তেমন হয়ে উঠেছে, তবে এটা অবশ্যই কোনো ধরনের জৈবিক পরিবর্তনের কারণে হয়েছে।'

রণকক্ষের সবাই মনোযোগ দিয়ে সোমদত্তের কথা শুনছে।

'তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ কেন মহান বিভাসন পূজারি এবং জ্ঞানী পণ্ডিত চন্দ্রধর হরপ্পা প্রশাসনকে আর্যাবর্তের অন্ধকার বন থেকে দূরে রেখেছিলেন? চিন্তা করো। এমনকি তার অধীনে হরপ্পার শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও, নিজের ঐশ্বরিক বীরত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হওয়ার পরেও আমার বন্ধু বিভাসন পূজারি কখনো ভয়ংকর বনের দিকে যাত্রা করেননি,' সোমদত্ত চালিয়ে গেলেন।

উপস্থিত সবাই ধীরে ধীরে কঠিন বাস্তবতা সম্পর্কে বুঝতে শুরু করেছে। স্পষ্টতই, হরপ্পার সূর্য মহানগরকে কিছু থেকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করেছেন। ভয়ংকর কিছু, যা অন্ধকার বনে লুকিয়ে ছিলো। আর এখন সোমদত্ত সত্য উন্মোচন করছেন।

'এমনকি হরপ্পার সূর্য, পরাক্রমশালী রাক্ষসরাজ সুরের হত্যাকারী, সৈন্যদের ধ্বংসকারী, অজেয় বিভাসন পূজারিও নরখাদক নারা-মুন্ডাকে ঘাঁটাতে চাননি!' সোমদত্ত তার কথা শেষ করলেন।

এই সর্বশেষ অস্বস্তিকর তথ্যটা মানুকে বিচলিত করে তুলেছে।

খুবই বিচলিত।

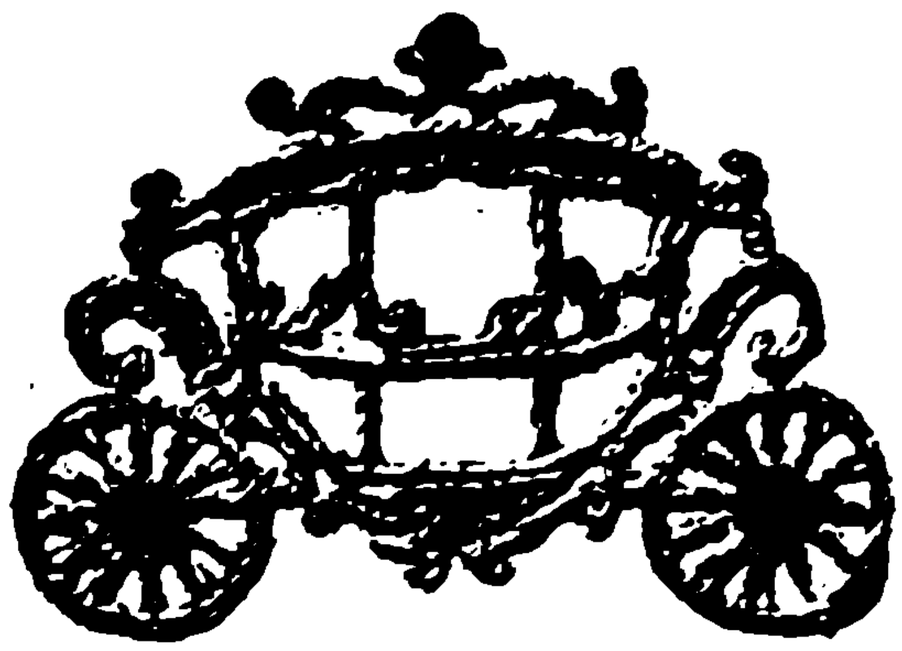

বানারস, ২০১৭
রোহিণী নক্ষত্র

'পবিত্র নক্ষত্রের সময় শুরু হতে চলেছে, গুরুদেব!' ভৈরব মন্দিরে প্রবেশের সাথে সাথে ঘোষণা করলেন এক সাধু। একজন বয়স্ক পুরোহিত, যার লম্বা সাদা দাড়ি আছে। বিদ্যুৎ ও দ্বারকা শাস্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধের চোখ আনন্দের অশ্রুতে ভরে গেল।

মঠাধীশ চোখ বন্ধ করে ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করলেন, তারপর বৃদ্ধ পুরোহিতের দিকে ফিরে মাথা নাড়লেন। 'ভবিষ্যদ্বাণীকৃত সময়ের জন্য প্রস্তুত হন, মহন্ত যোগরাজ। দেবতা প্রস্তুত!'

দেব-রাক্ষস মঠে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে মতবিনিময়ের কথা শুনে বিদ্যুৎ হতবাক হয়ে গেল। এমনকি সে ব্যাখ্যা চাইতে পারার আগেই লাল এবং জাফরান রঙের পোশাক পরা কয়েক ডজন পুরোহিত কাল-ভৈরব মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তারা সম্মিলিতভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন এবং মন্দিরের প্রতিটি কোণে পবিত্র ছাই আর ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তাদের মন্ত্রের সুসংগত উচ্চারণ দেখে বিদ্যুৎ অবাক হয়ে গেল। তাদের প্রার্থনা শুনে মনে হচ্ছে তারা শুধু একজন ব্যক্তিই। এক ক্রমবর্ধমান সুরেলা সুরের প্রভাবে মন্দিরের প্রতিটি স্তম্ভ, প্রতিটি প্রাচীর এবং প্রতিটি ধূলিকণা একটা অপ্রতিরোধ্য, ইতিবাচক কম্পনে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'আমার সাথে চলো, বিদ্যুৎ। সময় এসেছে, বাছা। যে মুহূর্তটির জন্য এই গ্রহ অপেক্ষা করছে। যে ঘণ্টার জন্য আমরা সবাই বহু শতাব্দী ধরে রক্তপাত

করেছি। মৎস্যের ভবিষ্যদ্বাণী। কালো মন্দিরের গোপন রহস্য তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, হে দেবতা!'

ঠিক সেই মুহূর্তে দামিনী মন্দিরে ঢুকে পড়লো, পুরোহিতদের দিকে তাকিয়ে রইলো স্তব্ধ দৃষ্টিতে। মহান মঠাধীশের তাকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। দামিনীর পিছু পিছু পুরোহিতজি, ন্যায়না, গোবর্ধন, বলভান্ত, সনু এবং মঠের অন্যান্য প্রবীণ পুরোহিতরাও এসে পড়েছে। এতক্ষণে যজ্ঞ ও আরতিতে ব্যবহৃত বেশ কিছু করতাল ও টিংকার-ঘণ্টা বের করা হয়েছে। পবিত্র মন্ত্রের তালে তালে তারা একটা উচ্চমাত্রার ঝনঝন শব্দ করছে।

বিদ্যুৎ নিজে একজন দক্ষ যোগী এবং তান্ত্রিক। সে এই জোরালো, মন্ত্রমুগ্ধকর স্বরের উপর পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার সাথে সাথে চিনতে পারলো।

পুরোহিতরা সম্মিলিতভাবে ভগবান শিবের চূড়ান্ত প্রার্থনা, মানে অত্যন্ত আশীর্বাদপূর্ণ রুদ্র-পথ জপ করছেন। দেবতা এখন একটা বিষয়ে পরিষ্কার। মঠাধীশ এবং পুরোহিতরা মিলে তারা যে মন্দিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তা পবিত্র করছেন, অসাধারণ কিছুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

অন্য রকম কিছু।

অতিপ্রাকৃত কিছু।

* * * * *

বিদ্যুৎ কখনো এর আগে মঠের এই অংশে আসেনি। সত্য বলতে, রাক্ষস-খণ্ডে যে এমন কোনো জায়গা আছে তাই সে জানতো না। দ্বারকা শাস্ত্রী তাকে ভগবান কাল ভৈরবের আধিপত্যময় মূর্তির পেছনে একটা অন্ধকার পথে নিয়ে গেছেন। চমৎকার মূর্তির পেছনে একটা গোপন প্রবেশদ্বার দেখে বিদ্যুৎ অবাক হয়ে গেল। মন্দিরের অন্য কোনো স্থান থেকে এই দরজাটি দেখা যাচ্ছে না।

ওরা এখন হাঁটছে। একটা বিরাট মশাল নিয়ে তাদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলভান্ত। পাথরের বিশাল করিডরগুলো দেখে অবাক হচ্ছে বিদ্যুৎ। ভৈরব মন্দির চত্বরে মন্ত্র উচ্চারণ এবং করতাল বাজানো অব্যাহত আছে, যা এখন কিছুটা কম শোনা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ বুঝতে পেরেছে যে অন্ধকার করিডরগুলো ধীরে ধীরে নিচের দিকে সর্পিল হচ্ছে এবং তাদের গভীর থেকে গভীরে, রাক্ষস-খণ্ডের বেসমেন্টে নিয়ে যাচ্ছে।

দ্বারকা শাস্ত্রী হাঁটতে হাঁটতে মন্ত্র পড়া অব্যাহত রেখেছেন, অন্যদিকে পুরোহিতজি এবং গোবর্ধন প্রতি পদক্ষেপে পবিত্র ছাই আর ফুল ছিটিয়ে দিচ্ছেন।

ক্রমশ ম্লান হওয়া আলোয় বিদ্যুৎ কিছু একটা লক্ষ করলো। দামিনীর দিকে ফিরলো দেবতা, নিষ্টশব্দে পথের দেয়াল আর ছাদের দিকে নির্দেশ করলো। ওগুলোকে এখন সুড়ঙ্গের মতো লাগছে।

দামিনী বুঝতে পারলো না বিদ্যুৎ কী বলতে চাইছে। সে ভ্রু তুলে বিভ্রান্তি প্রকাশ করলো।

দেবতা বিড়বিড় করে বললো, 'প্রতি কয়েক ধাপ পরপর পাথরগুলো আগের চেয়ে খানিকটা কালো দেখাচ্ছে।'

'আর?' ফিসফিস করে বললো দামিনী।

'তারপর পুরোপুরি কালো হয়ে যাচ্ছে।'

* * * * *

পথটা বেশ দীর্ঘ। বেশ কয়েক মিনিট পার হয়ে গেছে, কিন্তু তখনো তারা রাক্ষস-খণ্ডের নিচে বেসমেন্টের গোলকধাঁধায় ঘুরছে। বলভান্ত, পুরোহিতজি এবং মঠাধীশকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে তারা বেশ কয়েকবার এই সর্পপথে ভ্রমণ করেছে।

সর্প!

বিদ্যুতের কোনো ধারণাই ছিলো না যে সে তাদের জন্য অপেক্ষা করা চমৎকার বাস্তবতার কতটা কাছাকাছি ছিলো।

'বাবা...রুমি, বালা আর ত্রিজাত–ওরা তিনজনই বললো যে অর্ডার আমাকে এত বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি যদি তাদের জন্য এমন হুমকি হয়ে থাকি, আমি যদি ভবিষ্যদ্বাণীকৃত দেবতা হয়ে থাকি, যে দেবতা তাদের বিশাল পরিকল্পনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চলেছে, তারা কেন আমাকে আরো আগে হত্যা করেনি? যদি তারা কয়েক বছর আগে বালাকে আমার কোম্পানিতে, আমার বাড়িতে বসাতে পারে, যদি তারা ইচ্ছামতো আন্তর্জাতিক নেতা এবং সামরিক স্বৈরশাসকদের নির্মূল করতে পারে, যদি তারা গৃহযুদ্ধ শুরু করতে পারে, তহবিল বিপ্লব ঘটাতে পারে, তবে কেন তারা আমাকে ছোটবেলায় শেষ করেনি? বা তারও পরে?'

'বিদ্যুৎ, আমি তোমার কাছ থেকে এই প্রশ্নটি আশা করছিলাম,' দ্বারকা শাস্ত্রী মুখ না ফিরিয়ে উত্তর দিলেন। তিনি জানতেন যে সুড়ঙ্গের দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে তার বলা প্রতিটি শব্দ তার প্রতিভাবান প্রপৌত্রের কাছে পৌঁছাবে, পাশাপাশি তাদের সাথে রাক্ষস-খণ্ডের নিচের দিকে যেতে থাকা ছোট প্রতিনিধি দলের অন্য সকলের কাছেও পৌঁছাবে।

তাদের প্রত্যেকেই মঠের এবং অন্তত অর্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিশ্বস্ত শপথ ছিলো।

'উত্তরটা সহজ, বিদ্যুৎ। কালো মন্দিরের রহস্য তোমাকে ছাড়া খোলা যাবে না। অথবা অন্য কথায় বলতে গেলে, তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে ঐশ্বরিক রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং উন্মোচন করতে পারবে। কার্তিকেয় সহ তোমার সমস্ত পূর্বপুরুষকে নির্যাতন করা হয়েছে বা হত্যা করা হয়েছে কারণ অর্ডার কালো মন্দিরের অবস্থান খুঁজে বের করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তুমি...তুমি তাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান ছিলে। এখনো তাই আছো।'

* * * * *

তারা নীরবে আরো কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারা এখনো দূর থেকে পাথরের পুরু দেয়াল ভেদ করে আসা রুদ্র-পথের মন্ত্র শুনতে পাচ্ছে।

'বিশ্বাস করা কঠিন, বাবা। যদি তাই হয়, তবে কেন রুমি, তারপর বালা এবং তারপর ত্রিজাত আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করলো?' বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করলো। মঠাধীশের পক্ষ থেকে এবার ন্যায়না উত্তর দিলো।

'ওরা কেউই তোমাকে মারতে চায়নি, বিদ্যুৎ। ওরা তোমাকে মারাত্মকভাবে আহত করে বন্দি করতে চেয়েছিলো...এবং রোহিণী নক্ষত্র পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতো। তোমার কী মনে হয়, যে রুমি বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক এবং সবচেয়ে দক্ষ ঘাতক ছিলো, সে তোমাকে এত কাছে পেয়ে মিস করবে? বালা, একজন প্রশিক্ষিত প্রাক্তন সেনা কমান্ডো, পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে একটা গুলি মিস করবে? কেন ত্রিজাত কাপালিক তোমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলো, যখন সে অচেতন অবস্থায় তোমাকে সহজেই মেরে ফেলতে পারতো? চিন্তা করো একবার।'

ন্যায়নার এইমাত্র বলা কথাগুলো ভাবার আগেই মাটি হঠাৎ হিংস্রভাবে কেঁপে উঠলো। ভয়ে বিদ্যুতের হাত চেপে ধরলো দামিনী। মঠাধীশের বারান্দায় বসে একদিন আগে যে কম্পন অনুভব করেছিলো সেটাই আবার ঘটলো। কিন্তু এবার এটা খুব কাছাকাছি কোথাও বা কোনো কিছুর থেকে এসেছে।

জাহাজের চারপাশের জলাভূমি, আর্যাবর্ত, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৮ অব্দ

'ওরা আসছে...'

প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলছে সভা। বেশিরভাগ সময়ই ঠান্ডা, ভারী নীরবতা বজায় ছিলো। কছুক্ষণ পরপর তুমুল বজ্রপাতের শব্দ বিরক্ত করছিলো তাদের। নারা-মুন্ডার মুখোমুখি হওয়ার অনিবার্য সম্ভাবনার কথা কক্ষে ঘুরছে। কিন্তু কোনো সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না।

'হরপ্পার *গুপ্তচর-ডাল* আমাদের নগর পরিষদের সকল সদস্যকে জানিয়েছে যে সাধারণ তলোয়ার, তীর বা বর্শা দিয়ে নারা-মুন্ডার চামড়া সহজে ভেদ করা যাবে না। এমনকি সবচেয়ে দ্রুতগতির ও সময়োপযোগী তীর তার শরীরে শুধু ছোটখাটো ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। মানুষ বলে যে সে পূর্ণশক্তি দিয়ে ঘুসি মেরে ঘোড়ার মাথার খুলি ফাটিয়ে দিতে পারে। শুধু হাতের নখ দিয়ে শত্রুর বুকের হাড় ও খাঁচা ছিঁড়ে ফেলে সেখান থেকে হৃৎপিণ্ড বের করে খাওয়া এই বর্বর অর্ধ-মানুষ, অর্ধ-জানোয়ারের জন্য সাধারণ ব্যাপার।'

সোমদত্তের এই শেষ, ভয়ংকর শব্দগুলো উচ্চারণ করার সাথে সাথে ঘরে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। নিজের অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার পরেও সুন্দরী শতরূপা নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারলো না। সবার সামনে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। অন্য দিকে কক্ষের পুরুষরাও ভয়ে ঢোক গিলছে। মানুও কক্ষের অন্য কারোর চেয়ে কম ভীত ছিলো না। দৈত্যদের এই জীবন্ত কিংবদন্তির সাথে সম্মুখ লড়াইয়ের কথা চিন্তা করেও সে কম আতঙ্কিত হয়নি।

কিন্তু এই কঠিন প্রতিকূলতার সময়েই একজন সত্যিকারের নেতা বস্তুগত লোভ, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি, এমনকি গুরুতর ব্যক্তিগত ক্ষতির ভয়–সবকিছুর উর্ধ্বে গিয়ে দাঁড়ায়। মহান মৎস্য তো শুধু শুধু সত্যব্রত মানুকে মানব জাতির ভবিষ্যৎ রাজা এবং অভিভাবক হিসেবে বেছে নেননি।

'হে হরপ্পার মহান স্থপতি, আমি তার মুখোমুখি হবো,' ঘোষণা করলেন মানু।

'না, তুমি পারবে না!' তারা সাথে সাথে চিৎকার করে উঠলো। কক্ষটা পেরিয়ে মানুর দিকে এগিয়ে আসছে সে।

ক্ষণিকের জন্য হলেও মানু নারা-মুন্ডার চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছে এই সুন্দরীকে।

* * * * *

'তোমার কী হয়েছে, সূর্যপুত্র?' শতরূপা সত্যব্রতকে প্রশ্ন করলো। সত্যব্রত মানু এখন তার থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার চোখে অনুনয়ের দৃষ্টি। রাগ আর ভয়ে ভরা ভারী নিঃশ্বাস ফেললো মানু।

'শতরূপা ঠিক বলেছে, সত্যব্রত,' সোমদত্ত বললেন। 'আমরা সবাই তোমার সাহসিকতার কথা জানি এবং প্রশংসা করি। আমরা তোমাকে শুধু রাঙা নয়, পূর্ববর্তী মাসগুলোতে শত শত বর্বর প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে দেখেছি। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা ভিন্ন। নারা-মুন্ডা একাই দশজন রাঙার সমান। হে সূর্যপুত্র, অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করার মাঝে বিচক্ষণতার কিছু নেই।'

মানু জাহাজের স্থপতির দিকে ফিরলো।

'অসম্ভব? কী বলতে চাচ্ছেন সোমদত্তজি? আপনি কি দ্বৈরথের ফলাফল যুদ্ধের আগেই ঘোষণা করছেন? আপনার কি মনে আছে আপনি একই রকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যখন আমি ভয়ংকর দস্যু যুদ্ধবাজ কানকোলির সাথে তার নিজের দুর্গে যুদ্ধ করেছিলাম? ঢোলাভিরার পশুসেনাপতি যখন আমাদের শহর থেকে উচ্ছেদ করতে নাশকতার চেষ্টা করেছে, তখন আমি তাকে বিতাড়িত করিনি? যখন আমি আমাদের কাফেলার উপর আক্রমণ করা দৈত্যর সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত করেছিলাম, তখন তো আমি নিরস্ত্র ছিলাম...'

সত্যব্রত মানু সোমদত্ত বা ঘরে উপস্থিত অন্য কারো সাথে কথা বলছে না। সে নিজের সাথে কথা বলছে...ভেতর থেকে তার ইচ্ছাকে শক্তিশালী করতে ও আত্ম-প্রশংসার শব্দে তার নশ্বর ভয়কে ডুবিয়ে দিতে। যাতে সে দৈত্য নারা-মুন্ডাকে মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনী সাহস যোগাতে পারে।

কিন্তু রুমের বাকি সবার কাছে কথাগুলো তেমন শোনালো না।

সোমদত্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে তিনি মানুর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং কাজ করেছেন, কিন্তু এই প্রথম তিনি তরুণ পুরোহিতরাজের মধ্যে অহংকার লক্ষ করলেন।

'দেখো মানু, এমন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া বীরত্ব নয় যে যুদ্ধে হারতে হয়। এসো আমরা অন্য কিছু চিন্তা করি...'

'কথা প্যাঁচাচ্ছেন কেন, সোমদত্তজি? যা বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন।'

সোমদত্তের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। যতদূর তিনি বুঝছিলেন, মানু এখন ক্ষুধার্ত শিশুর মতো আচরণ করছে, যে বাস্তবতাকে দেখতে অনিচ্ছুক। মহান হৃপতি মানুকে পুত্রের মতো দেখেন এবং তার প্রিয় সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর চোয়ালে যেতে দিতে চান না। তিনি সমস্ত কৌশল পরিত্যাগ করে এই যুবককে সত্যের মুখোমুখি করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

হরপ্পার হৃপতি মানুর চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বাভাবিক উচ্চ স্বরে কথা বললেন।

'যদি তুমি দৈত্যাকার নরখাদকের সাথে সম্মুখ লড়াই করো, তবে সে তোমাকে জবাই করে তোমার মাংস গরম অবস্থায় খেয়ে ফেলবে।'

* * * * *

সত্যব্রত মানু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কাঠ ও চামড়ার তৈরি একটা চেয়ারে বসলো। সামনের দিকে ঝুঁকে বসে, হাত দিয়ে কপাল ধরে রেখেছে, আঙুলগুলো দিয়ে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে তার লম্বা চুলগুলোকে।

ও ভয় পায়নি। কিছুক্ষণ আগে বলা সোমদত্তের সরল কথার জন্য রাগান্বিতও ছিলো না। ও আসলে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলো। সে যদি নারা-মুন্ডাকে লড়াইয়ে হারাতে না পারে, তাহলে কে পারবে? এই একটা বিষয়ই পুরো ইতিহাস পালটে দিতে পারে। মানব জাতি কি প্রলয়ের পরের নতুন ভোরকে মুক্ত ও সভ্য মানুষ হিসেবে স্বাগত জানাতে যাচ্ছে? নাকি বর্বর, অসভ্য সম্প্রদায়ের দাস ও পশু হিসেবে?

সোমদত্ত দুঃখবোধ করলেন। তিনি অনুভব করেছেন যে মানব জাতি এবং বিলুপ্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র মানুষকে তিনি অপূরণীয়ভাবে হতাশ করেছেন। অন্যদিকে, নিজের মানুষটিকে এই ভগ্ন অবস্থায় দেখে তারার মন কেঁপে উঠলো। কিন্তু এরপরেও মেয়েটা স্বস্তিতে ছিলো। হয়তো সোমদত্তজির এই শেষ বিস্ফোরণ মানুকে তার মন পরিবর্তন করতে বাধ্য করবে। সে আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব শুরু করার যে পরিকল্পনা করেছে তা থেকে দূরে রাখবে।

শুধু ধ্রুবই বুঝতে পেরেছে যে মানু আসলে কী অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শৈশবের বন্ধু এবং যে মানুর মন ও হৃদয়কে খুব ভালোভাবে জানে এমন একজন মানুষ হিসেবে সে এগিয়ে গিয়ে সত্যব্রতের কাঁধে হাত রাখলো।

'আমরা ওকে হারাতে পারবো। ওকে হত্যা করতে পারবো। কিন্তু আমার পরামর্শ তোমার পছন্দ হবে না, মানু,' ধ্রুব বললো।

ঠান্ডা কক্ষের সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে। ধ্রুব কী এমন বলতে যাচ্ছে যা বিজয় ও মৃত্যুর মাঝে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

'বলো...' মানু মুখ না উঠিয়েই বললো।

'যদি আমাদের বিশজন সেরা যোদ্ধা মিলে নরখাদককে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করতে পারি...একমাত্র এই উপায়ে আমরা ওকে হারাতে পারবো। আর এই আক্রমণের নেতৃত্ব আমি দেবো।'

মানু প্রথমে উপরে তাকালো। সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে তার বিশ্বস্ত, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু তাকে কাপুরুষতার পথ অবলম্বন করার পরামর্শ দিচ্ছে।

'তুমি আমাকে হতাশ করলে, ধ্রুব। তোমার মতো একজন অসাধারণ যোদ্ধা এমন প্রস্তাব দিচ্ছে...'

মানু তার বাক্য শেষ করার আগেই মৎস্য-উপজাতির এক সৈনিক ধাক্কা মেরে দরজা খুলে রণকক্ষে ঢুকে পড়লো।

সৈন্যটা জোরে জোরে হাঁফাচ্ছে, দৌড়ে চেম্বারে আসা ও জাহাজের টাওয়ার থেকে যা দেখেছে উভয় কারণেই। তার চেহারায় আতঙ্ক স্পষ্ট।

সে মাত্র কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারলো। কিন্তু নিজের বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে।

'ওরা আসছে, সত্যব্রত...যেন একটা সমুদ্র।'

বানারস, ২০১৭

দেবতার সাথে দেখা করার সময় এসেছে...

আসলাম বাইকার তার প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুটের ডাইনিং রুমে ঢুকতেই মাশ্চেরা বিয়ানকা নাস্তার প্লেট থেকে মাথা তুলে তাকালো।

'গুড মর্নিং, বিয়ানকা,' আসলাম নার্ভাসভাবে বললো। ভদ্রভাবে হাসলো সাদা মুখোশ। হোটেলের হেলথ ক্লাবে গত রাতে যে ভয়ংকর শয়তানের রূপে আবির্ভূত হয়েছে এখন আর তাকে তেমন দেখাচ্ছে না।

তার চটকদার অভিব্যক্তি ফিরে এসেছে। ঘর ভরে গেছে দামি পারফিউমের সুগন্ধে। ঝাঁকড়া, স্বর্ণকেশী চুল এবং তার নিরস্ত্র হাসি–দুটোই লম্বা টেবিল জুড়ে দীপ্তি ছড়াচ্ছে। পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর মানুষটি খুব আদরের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো, 'বিদ্যুতের খবর কী, বন্ধু আসলাম? তারা কি পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়েছে?'

মুম্বাইয়ের ডনকে তার স্বাভাবিক আড়ম্বরপূর্ণ স্বভাবে দেখে স্বস্তি পেল আসলাম। 'না, মাশ্চেরা। তারা চলে যায়নি। সবাই এখনো দেব-রাক্ষস মঠেই আছে।'

সাদা মুখোশের চেহারায় চিন্তা ফুটে উঠলো। 'খুবই অদ্ভুত। ওদের এতক্ষণে কেদারনাথের উদ্দেশে রওয়ানা দেওয়া উচিত ছিলো। কিছু একটা ঠিক নেই...'

* * * * *

বিশাল পর্দাগুলোতে যেন প্রাণ এসে পড়লো।

সবচেয়ে অত্যাধুনিক এনক্রিপশন প্রযুক্তির দ্বারা সুরক্ষিত এই ভিডিও কলটি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী তিনজনকে সংযুক্ত করেছে।

যখনই তারা ডিজিটালভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করেছে, বিশ্ব ইতিহাসে নাটকীয়ভাবে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। গৃহযুদ্ধ, প্রাণঘাতী মহামারি, একের পর এক গুপ্তহত্যা, বড় সন্ত্রাসী হামলা, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিস্ফোরণ, যাত্রীবাহী বিমান মাঝ-আকাশে হারিয়ে যাওয়া–কিছু না কিছু ঘটেছেই।

এই তিন ব্যক্তি ছিলো নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর। তাদের মধ্যে একজন ছিলো তার চেয়ে বেশি কিছু।

* * * * *

'ওরা এখনো সেখানে আছে, মহানুভব,' মাশ্চেরা বললো।

দুই পর্দার মুখোমুখি লম্বা কনফারেন্স টেবিলের একেবারে শেষ প্রান্তে বসে আছে সে।

রোমের বিগম্যানকে অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছে। ভালো খবরের আশা করছে লোকটা। ফ্রাংক স্টোনফেলারের মনে হলো কোনো এক্সপ্রেস ট্রেন তাকে ধাক্কা মেরেছে। এই মুহূর্তে ব্যর্থতা মানে হলো অর্ডার ও এর সাথে সংযুক্ত সবকিছুর চিরসমাপ্তি। অন্যদিকে, বিজয় মানে সমগ্র মানব জাতির উপর নিরঙ্কুশ বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশ্নাতীত সার্বভৌমত্ব। ঝুঁকিটা এর আগে কখনোই এত বেশি ছিলো না।

'কিন্তু...কিন্তু ওদের এতক্ষণে চলে যাওয়া উচিত ছিলো। বিপজ্জনক নক্ষত্রমণ্ডলটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রাতের আকাশকে আলোকিত করবে। ওরা এখন কীভাবে নিশ্চিত করবে যে দেবতা সময়মতো সেই পাহাড়ের উপাসনালয়ে পৌঁছেছে?' বিগম্যান বললেন।

'কিছু একটা মিলছে না, মাশ্চেরা,' অন্য এলইডি স্ক্রিন থেকে স্টোনফেলার সায়ন বললো, কণ্ঠস্বর বরফের মতো ঠান্ডা। 'কেদারনাথই শেষ কালো মন্দির। আজ রাতেই দেবতাকে সেখানে প্রবেশ করতে হবে। এটা সহস্রাব্দ পুরোনো ভবিষ্যদ্বাণী...'

'যদি-না...' সাদা মুখোশ বলে উঠলো।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর ফ্রাংক স্টোনফেলার জিজ্ঞেস করলো, 'যদি-না কী, মাশ্চেরা?'

সে জানতো ঝুঁকিটা আসলে কোথায়, কিন্তু তার সুর ছিলো অবিচলিত। সে এমনি এমনি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গোপন ভ্রাতৃসংঘের একজন সর্বোচ্চ অধিপতি হয়নি।

'যদি-না কেদারনাথ শেষ কালো মন্দির না হয়,' সাদা মুখোশ বললো। তার সবুজ চোখ পর্দার দিকে নিবদ্ধ।

* * * * *

বুদ্ধিমান দ্বারকা শাস্ত্রী তাদের বোকা বানিয়েছে, সে সম্ভাবনা ফেলে দেওয়ার মতো নয়। চালাক বৃদ্ধ এর আগেও বেশ কয়েকবার এমনটা করেছে। কিন্তু এইবার

অর্ডার আত্মবিশ্বাসী ছিলো যে তারা শেষ কালো মন্দির খুঁজে পেয়েছে। বছরের পর বছর ধরে উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ মন্দিরে এই গুপ্তরহস্য অন্তর্নিহিত ছিলো। ভবিষ্যদ্বাণীটি এই পবিত্র মন্দিরের হৃদয়ে পূর্ণ হওয়ার কথা ছিলো।

তাদের পরিকল্পনা ছিলো সহজ। রোহিণী নক্ষত্রের আবির্ভাব এবং পূর্বাভাসিত সময় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে যাচ্ছে তারা। সহস্রাব্দ পূর্বে নির্ধারণ করা পরিকল্পনামতে দেবতাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। বিদ্যুতের কালো মন্দিরের রহস্য উন্মোচন করার জন্য ব্রাদারহুড অপেক্ষা করবে। এর পরে তারা মুছে ফেলবে পৃথিবীর শেষ দেবতাকে, সেই সাথে সেই গোপন জিনিসটি অর্জন করবে যা তারা বহু শতাব্দী ধরে শিকার করে আসছে।

কিন্তু এখন এটা স্পষ্ট যে শেষ মুহূর্তে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যদি বিদ্যুৎ এখনো দেব-রাক্ষস মঠের ভেতরে থাকে এবং পবিত্র নক্ষত্রমণ্ডল থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় বাকি থাকে, তাহলে ভবিষ্যদ্বাণীটি বাস্তবায়ন করার জন্য সে কীভাবে সময়মতো কেদারনাথে পৌঁছাবে?

'হাহাহা!' সাদা মুখোশ হাসতে শুরু করলো।

পর্দার দুজন শুধু চুপচাপ তাকিয়ে রইলো। তারা জানতো সাদা মুখোশ অপ্রত্যাশিত কিছু পেয়ে গেছে। তার কাছ থেকে এমন প্রতিক্রিয়া তারা আগেও দেখেছে। ওরা এও জানে যে সাদা মুখোশ ইতোমধ্যেই পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা করে ফেলেছে।

মাশ্চেরা বিয়াংকা আত্মসমালোচনায় মাথা নাড়তে থাকে। এক মিনিট পর শান্ত হলো সে, রুমাল দিয়ে চোখের পানি মুছলো। পর্দার দিকে ফিরে কোনো কর্পোরেট কোম্পানির সিইওর মতো করে কথা বলা শুরু করলো, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি জানি না কীভাবে, তবে কেদারনাথ থেকে আমাদের নাকের নিচ দিয়ে রহস্যটা সরানো হয়েছে। ওটা এখন পৌঁছে গেছে যেখানে তার পৌঁছানোর কথা ছিলো–শেষ কালো মন্দিরে।'

এই তথ্যটা ওভারলর্ডরা হালকাভাবে নিতে পারেনি। বিগম্যানের মুখ রাগে কেঁপে উঠলো। ফ্রাংক স্টোনফেলারও ঢোঁক গিললো চরম ক্রোধে।

'তুমি আমাদের আশ্বস্ত করেছিলে যে ভারতে তোমার লোক আমাদের হতাশ করবে না, মাশ্চেরা।'

'হ্যাঁ, আমি করেছিলাম...করেছিলাম বটে...' সাদা মুখোশ উত্তর দিলো। এরপর সে হঠাৎ করে তার সামনে থাকা রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে স্ক্রিনগুলো বন্ধ করে কলটি শেষ করে দিলো। কয়েক মিনিট নীরবে বসে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করলো সে। চূড়ান্ত সময় এসে গেছে।

সময় এসেছে দেবতার সাথে দেখা করার...

জাহাজের চারপাশের জন্মভূমি, আর্যাবর্ত, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৮ অব্দ
অন্তিম যুদ্ধ—প্রথম খণ্ড

এ এমন এক দৃশ্য যা এমনকি সবচেয়ে নির্ভীক মানুষের রক্তকেও জমিয়ে ফেলবে।

এত বিশাল সৈন্যবাহিনী পৃথিবীর কোথাও এর আগে কখনো আক্রমণ করেনি। আর কখনো করবেও না। এমনকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিষয়ক লেখকরাও এমন বিশাল সৈন্যবাহিনীর কথা কল্পনা করতে পারবে না।

যোদ্ধাদের এই জমায়েতে যে সৈন্য ছিলো তা দাসরাজ্ঞা, মানে দশ রাজার মহাপ্রাচীন যুদ্ধে যে সৈন্যবাহিনী জড়ো হয়েছিলো তার চেয়েও সংখ্যায় কয়েকগুণ বেশি ছিলো।

এত বিপুলসংখ্যক মানুষ যে একত্র হতে পারে এবং একত্রে চলাফেরা করতে পারে তা আর্যাবর্তে জীবিত কারো পক্ষে কল্পনাতীত ছিলো।

শুষ্ক মুখ এবং স্পন্দিত হৃদয়ে জাহাজের জেনারেলরা শত্রুকে সাপের মতো দশ দিক থেকে ধীরে ধীরে তাদের শ্বাসরোধ করতে দেখছে। এই দৃশ্য দেখে তারা হতবাক হয়ে গেল। কয়েক মাইল দূরের ব্যাসার্ধ থেকে লক্ষ লক্ষ মশাল আলোর নদীর মতো জ্বলছে। দৈত্য এবং যুদ্ধবাজ বাহিনীর সম্মুখ সৈন্যদল এখন সম্ভবত মহাতরী থেকে মাত্র এক ঘণ্টার পথ দূরে আছে।

কিন্তু এই বিশাল বাহিনীর চূড়ান্ত মহড়া এখনো দেখা বাকি ছিলো। বাহিনীটা এত বিশাল যে খালি চোখে দেখে তা শেষ করা যায় না।

যে বার্তাবাহক রণকক্ষে ঢুকেছে, সে ঠিক বলেছে।

এ আসলেই একটা সমুদ্র, একটা টাইফুন। আর এই টাইফুন জাহাজে আঘাত হানতে চলেছে।

এটাকে রক্তের নদীতে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য।

* * * * *

'কত...কতজন আছে বলে মনে হয় তোমার, সত্যব্রত,' প্রচণ্ড জিজ্ঞেস করলো। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মানু জাহাজের সর্বোচ্চ ডেকে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি তাকে ও তার সঙ্গীদের পুরোপুরি ভিজিয়ে দিচ্ছে। এই রাতের অন্ধকারে দৈত্য সেনাদের মশাল দেখে মনে হচ্ছে যেন চাঁদ আজ পুরো পৃথিবীকে ঢেকে ফেলেছে। এরা সত্যিই গণনার ঊর্ধ্বে চলে গেছে।

'মনে হচ্ছে এখান থেকে বিন্ধ্য পর্বত সমস্ত দস্যু উপজাতি নারা-মুন্ডার সাথে যোগ দিয়েছে। স্কাউটরা বলেছে মহাপ্রলয় কিছু দিনের মধ্যে ভূমির চূড়ান্ত অংশে আঘাত হানবে। গ্রহের এই অংশে থাকা প্রতিটি পুরুষ, মহিলা এবং শিশু এখন একটা জিনিস নিশ্চিতভাবে জানে,' ধ্রুব বললো। সে নরখাদকদের সমুদ্র থেকে এক সেকেন্ডের জন্যও চোখ সরায়নি।

'সেটা কী, ধ্রুব?' সোমদত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

ধ্রুব এক মুহূর্ত থেমে তার তূণীর থেকে একটা চকচকে তীর বের করে শক্তিশালী ধনুকের উপর রাখলো।

'এই জাহাজই বেঁচে থাকার শেষ ভরসা। তাই এটা চুরি করা আবশ্যক। হে জাহাজের রক্ষাকারীরা, প্রস্তুত হও, শত্রুর সাথে মৃত্যু অবধি লড়াই করবে।'

এই কথাগুলো বলে ধ্রুব কাছাকাছি একটা জ্বলন্ত মশালের শিখা থেকে বিশেষভাবে তৈরি করা তীরটির মাথা জ্বালিয়ে দিলো, এরপর তার সৈন্যদের সংকেত হিসেবে জ্বলন্ত তীরটি আকাশে অনেক উঁচুতে নিক্ষেপ করলো।

আর এরই মাধ্যমে যুদ্ধের ঘোষণা দিলো সে।

* * * * *

দস্যুদের রণহুংকার ছিলো ভয়াবহ। তারা এখন এতটা কাছে এসে পড়েছে যে জাহাজের যোদ্ধা ও বাসিন্দারাও তা শুনতে পাচ্ছে। হাজার হাজার সৈন্য একসাথে চিৎকার করছে। এই চিৎকার জ্বলন্ত নরকের চিৎকারের চেয়েও বেশি ভয়ংকর।

এরা বর্বর, দক্ষ, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত আর সর্বোপরি...মরিয়া।

'তুমি কি লক্ষ করেছ, ধ্রুব,' মানু বললো, 'এই পুরো সম্মুখ যুদ্ধে একজনও দৈত্য সেনা নেই?'

ধ্রুব হেসে ফেললো।

'আমি এটাই আশা করেছিলাম, মানু। বর্বর নারা-মুন্ডা প্রথমে দস্যুদের হত্যা করবে। আমাদের প্রতিরক্ষা দুর্বল করার জন্য তাদের ব্যবহার করবে সে, তারপর জাহাজ দখল করার জন্য তার বিশাল দৈত্য দল নিয়ে আমাদের আক্রমণ করবে।'

* * * * *

'অপেক্ষা করো...' তারা নির্দেশ দিলো।

মহাতরীর শীর্ষ ডেকের পুরো পরিধির চারপাশে নয় হাজার ধনুর্ধর তাদের প্রথম তীর ছুঁড়তে প্রস্তুত হয়ে আছে।

আরো তিন হাজার অত্যন্ত দক্ষ তীরন্দাজরা অপেক্ষা করছে, নিচের ডেকের রেলিং-এর পেছনে।

দস্যুদের সৈন্যবাহিনী এখন নিজেদের র‍্যাংক ভেঙে গর্জন করতে করতে জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। মহাতরীর রক্ষকদের কাছ থেকে উস্কানিমূলক প্রতিক্রিয়ার জন্য তারা এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছে। ধৈর্য হারিয়ে এবং প্রচণ্ড আক্রমণের উত্তাপে তারা তাদের প্যাঁচানো ব্লেড এবং আরোহণের হুকগুলো তুলে নিয়ে পায়ে হেঁটেই এই কাঠের দানবের দিকে ধাবিত হলো। বেশ কিছু উদ্বেগজনক মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পর হাঁফাতে হাঁফাতে আক্রমণকারীরা জাহাজ থেকে মাত্র হাজার ধাপ দূরে চলে এলো।

তখন সুন্দরী তারা দেবী দুর্গার কাছে নীরবে প্রার্থনা করে সিংহীর মতো গর্জে উঠলো।

'ছোঁড়ো!'

ঠক!

অর্ধ-মুহূর্ত।

ঠক!

অর্ধ-মুহূর্ত।

ঠক!

দামিনী-সেনারা যে গতিতে একের পর এক তীর নিক্ষেপ করে যাচ্ছে তা অবিশ্বাস্য। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিশ হাজারের বেশি তীর নিক্ষেপ করা হয়ে গেল।

জাহাজ এবং পৃথিবীর জন্য যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

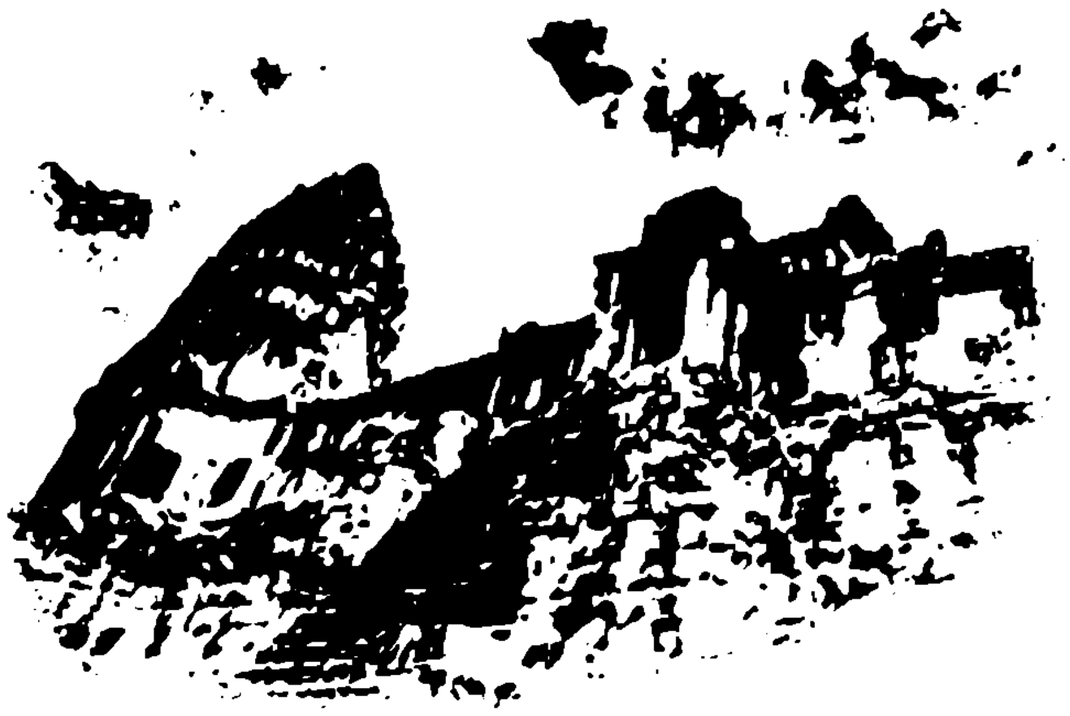

বানারস, ২০১৭
কালো মন্দির

'আমরা কোথায় যাচ্ছি, বাবা? আমরা হাঁটছি বেশ কয়েক মিনিট হয়ে গেছে...'

দামিনী নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। সে ভয়ংকরভাবে নার্ভাস, পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিতভাবে উত্তেজিত ছিলো। ভৈরবমন্দিরে মন্ত্র জপ করার শক্তি ছিলো মনোমুগ্ধকর। লুকোনো দরজা, রহস্যময় গলি, অবর্ণনীয় গর্জন এবং হাজার বছরে একবার আবির্ভূত একটা ঐশ্বরিক নক্ষত্রমণ্ডলের সম্ভাবনা...সবকিছুই তার স্নায়ুকে অস্থির করে তুলছে।

দামিনীর দিকে ফিরে হাসলেন দ্বারকা শাস্ত্রী, এরপর বিদ্যুতের দিকে তাকালেন। তারপর আবার ঘুরে হাঁটতে লাগলেন কালো পাথরের গোলকধাঁধার আরো গভীরে।

'তুমি জানো, কন্যা, কেন ভৈরবের পূজা করা হয়?' মঠাধীশ জিজ্ঞেস করলেন। তার কথা সরু গলিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

'উমম...আসলে জানি না, বাবা...দুঃখিত,' দামিনী উত্তর দিলো। সে বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে জিভ কাটলো। মহান মঠাধীশ তার কাছে জানতে চেয়েছে, এমন কিছু না জানায় বিব্রত বোধ করছে মেয়েটা।

বিদ্যুৎ হাসলো। সে তাকে অনেক ভালোবাসে!

'তার উপাসনা করা হয় কারণ তিনি হলেন সর্বশক্তিমান দ্বারপাল বা দেবতাদের দেবতা স্বয়ং ভগবান শিবের দ্বাররক্ষক,' মঠাধীশ ব্যাখ্যা করলেন।

'জি, বাবা...' উত্তর দিলো দামিনী। দ্বারকা শাস্ত্রী এইমাত্র যা ব্যাখ্যা করলেন, তা নিয়ে সে কী করবে তার কোনো ধারণা ছিলো না।

'একমাত্র তার মাধ্যমেই, দামিনী, নীলকণ্ঠ শিবকে পাওয়া যেতে পারে।'

মনে হলো কোনো বজ্রপাত বিদ্যুৎকে আঘাত করলো। ভৈরব-মন্দির, রুদ্র-পথের যপ, লুকোনো দ্বার, রোহিণী-নক্ষত্র, কালো পাথরের তৈরি সুড়ঙ্গ, ব্যাখ্যাতীত গর্জন...আর এখন দ্বারকা শাস্ত্রী তাদের দ্বারপালের মাধ্যমে ভগবান শিবের কাছে পৌঁছানোর ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

এটা আমার মাথায় আগে এলো না কেন?

শেষ কালো মন্দির দূরে কোথাও নয়। এটা এখানে...কাশীতে।

দেব-রাক্ষস মঠেরই ঠিক নিচে, গভীরে অবস্থিত।

* * * * *

আরো কয়েক মিনিট কেটে গেল। মঠের দলটি এখন একটা ছায়াময় প্রান্তে পৌঁছেছে, যা একটা সর্পিল, পাথর-কাটা সিঁড়ির দিকে নিয়ে গেছে। সিঁড়ি আরো গভীরে চলে গেছে অন্ধকার ঘরের মধ্যে।

খাড়া, বাঁকানো সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করার আগে পুরোহিতজি দ্বারকা শাস্ত্রী এবং তার অনুসরণকারী দলের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন।

'আজ তোমরা এমন কিছু দেখতে যাচ্ছো যা তোমাদের কল্পনাতেও কখনো আসেনি। শুধু এটা মনে রেখো, যত ভয়ংকর কিছুই তোমরা দেখো না কেন, তোমরাই সেই বাছাইকৃত মানুষ, যারা এই পবিত্র সুযোগ পেয়েছে। একবার তোমরা এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে তোমাদের জীবন, তোমাদের আত্মা, তোমাদের জন্ম এবং পুনর্জন্মের যাত্রা–কিছুই আর আগের মতো থাকবে না।'

সবাই চুপচাপ শুনছে। গুহার গভীর থেকে নির্গত এক অদ্ভুত শক্তি তাদের ইন্দ্রিয়কে কাবু করতে শুরু করেছে। ওদের কেউ ভয় পায়নি। ওরা কেবল মানব জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী।

ওরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

* * * * *

বিদ্যুৎ, দামিনী এবং দলের অন্য সবাই হতবাক হয়ে তাদের আচ্ছন্ন করে রাখা দুর্দান্ত কালো মন্দির ঘুরে ঘুরে দেখছে। রুক্ষ, শিলা-কাটা ছাদটি দেখে মনে হয়েছে যেন এটা হাজার হাজার বছর আগে নির্মিত হয়েছে। কালো পাথরের দেয়ালে খোদাই করা মূর্তিগুলো ছিলো শ্বাসরুদ্ধকরভাবে জটিল এবং সুন্দর। এই মহৎ মন্দিরের আকার ছিলো বিস্ময়কর।

বলভান্ত, ন্যায়না, সনু, গোবর্ধন এবং অন্যান্য পুরোহিতদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন ছিলো যে এত বিশাল কালো মন্দিরটি দেব-রাক্ষস মঠের সীমানার নিচে সমাহিত ছিলো। তারা বহু বছর ধরে মঠে বসবাস করেছে, তবুও তাদের কারোরই এই অপূর্ব মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিলো না।

দ্বারকা শাস্ত্রী বিদ্যুৎকে কিছু সময়ের জন্য বিশাল বেসমেন্ট মন্দির অধ্যয়নের অনুমতি দিয়েছেন, পাশাপাশি তিনি তাদের সাথে থাকা পুরোহিতদের পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান শুরু করার নির্দেশ দিলেন। মন্দিরের মাঝখানে ভগবান শিবের একটা মহিমান্বিত মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। পুরোহিতরা শিবের পাদদেশে একটা আনুষ্ঠানিক অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে আবার রুদ্র-পথের যপ শুরু করেন। তার বাবার নির্দেশে সনু মন্দিরের দেয়ালে থাকা বেতের মশালগুলো একের পর এক জ্বালাতে থাকে। ধীরে ধীরে অগ্নিশিখার কমলা আলোয় পুরো এলাকা আলোকিত হতে লাগলো।

'আমি এখন তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি তা বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হবে, বিদ্যুৎ। কিন্তু বিশ্বাস রেখো, বাছা, আমার প্রতিটি কথাই সত্য।'

'হ্যাঁ, বাবা। এই গর্ভগৃহটি যেভাবেই হোক অবর্ণনীয়ভাবে পবিত্র, যেন এটি স্বয়ং প্রভুর দ্বারা স্পর্শ করা হয়েছে। আমি সৌভাগ্যবান যে ভারত জুড়ে শিবের প্রায় সমস্ত পবিত্র মন্দির পরিদর্শন করতে পেরেছি। আমি বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের সমস্ত মন্দির জুড়ে ভগবান রুদ্রের দর্শন পেয়েছি। আমি গত কয়েক দিন ধরে কাশীর বেশ কয়েকটি আশীর্বাদপূর্ণ মন্দিরেও গেছি। কিন্তু আমি এখানে যতটা দেবত্ব দৃঢ়ভাবে অনুভব করছি অন্য কোথাও ততটা অনুভব করিনি। এখানে খুব আলাদা কিছু আছে। খুব অপ্রতিরোধ্য কিছু, বাবা।'

মহান বৃদ্ধ হাসলেন।

'*কিছু না, বিদ্যুৎ। কেউ।*'

নীরখাদকদের রাজা মহাতরী থেকে এক মাইল দূরে দাঁড়িয়ে হামলার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছে। নারা-মুন্ডা তার অগ্রগামী সৈন্যদের উপর তীরের বৃষ্টি দেখে হতবাক হয়ে গেল। সে প্রচণ্ড প্রতিরোধের আশা করেছে ঠিকই, কিন্তু যে অসংখ্য যুদ্ধে সে অংশ নিয়েছে, সেগুলোতে কখনো সে তীরন্দাজদের এত মারাত্মক, প্রাণঘাতী রূপ প্রত্যক্ষ করেনি।

তবে সে খুব একটা চিন্তিত ছিল না; কারণ পুরো প্রথম ধাপে শুধু দস্যু উপজাতির যোদ্ধারা অন্তর্ভুক্ত আছে। তাদের জীবনের সে কোনো পরোয়া করে না। তার জন্য তারা একটা মানব ঢাল ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। আক্রমণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা কৌশল মাত্র। তাদের কাউকেই জাহাজে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা তার ছিলো না। এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যারা বেঁচে থাকবে, তাদের সবাইকে সে হত্যা করবে।

'এভাবে চলতে পারে না, হুজুর,' দৈত্য সেনাপতি ডুন্ডা বললো। 'জাহাজের মানুষের কাছে তীরের অসীম সরবরাহ রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ওরা এই যুদ্ধের জন্য আমাদের কল্পনার চেয়েও কঠোরভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে।'

'হুমম...' নারা-মুন্ডা গর্জে উঠলো। শত শত দস্যু যোদ্ধা তখন ধারালো ধাতুর পরের ধাপের শিকার হচ্ছে।

'শীঘ্রই দস্যুরা মারা যাবে, হে পরাক্রমশালী অধিপতি। এরপর আমাদের দৈত্যরা সরাসরি সম্মুখে থাকবে।'

'না-ও থাকতে পারে...' নারা-মুন্ডা বললো। এরপর সে ঘুরে দাঁড়ালো, ডুন্ডার দিকে রক্তমাখা দাঁতগুলো বের করে বাঁকা হাসি হাসলো একবার।

দৈত্য সেনাপতি তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পেরেছে যে দৈত্যাকার পিশাচ কোনো নিষ্ঠুর, বুদ্ধিমান পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে।

* * * * *

'ওরা বধ হচ্ছে, মানু!' দামিনী-সেনার তীরন্দাজদের প্রথম দিকের সাফল্যে তার উত্তেজনা লুকিয়ে রাখতে না পেরে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন সোমদত্ত। ওরা মহাতরীর একটা উঁচু ডেক থেকে কার্যক্রম দেখছে।

'আমরা তাদের হাজার হাজার করে কমিয়ে ফেলছি। একজন শত্রু সৈন্যও জাহাজের উপর একটা হুক লাগাতে সক্ষম হয়নি,' প্রচণ্ড যোগ করলো। এমনকি তার মতো একজন অভিজ্ঞ সৈনিকও এই অকল্পনীয় মাত্রায় তীর নিক্ষেপ করতে দেখেনি। জাহাজের চারপাশের জলাভূমির এক ইঞ্চিও লক্ষ্যবিহীন রাখা হয়নি। দামিনী-সেনার ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীরগুলো যেন বিষাক্ত বৃষ্টির ফোঁটার সাথে সংখ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

মানু চুপ করে রইলো। বর্বরদের উপর জাহাজের তীরন্দাজদের জয়ে ভেতরে ভেতরে মানু অনেক আনন্দিত হলো। কিন্তু এসব কিছু খুব সহজে হয়ে গেছে। আর এই ব্যাপারটাই যুবক ঋষি-রাজকে আরো উদ্বিগ্ন করছে। নারা-মুন্ডা এই হত্যাযজ্ঞ এত সহজে চলতে দেওয়ার লোক নয়।

'ওরা পিছু হটছে!' জাহাজের সৈন্যদের একজন চিৎকার করে বললো।

মহাতরীর পর্যবেক্ষকরা যুদ্ধক্ষেত্র ভালোভাবে দেখার জন্য কাঠের রেলিংগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সৈন্যটা ঠিকই বলেছে। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে হাজার হাজার লোক হারানোর ফলে হামলাকারীরা পিছু হটছে।

'এবার দামিনী-সেনাদের ছুটি দাও, আর তাদের অবস্থানে ধ্রুবর তীরন্দাজদের অবস্থান নিতে বলো,' সত্যব্রত মানু চেঁচিয়ে আদেশ দিলো। 'রান্নাঘরে বলো বীর নারীদের গরম খাবার পরিবেশন করতে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের একসাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধনুক টানার ফলে আঙুল কেটে গেছে। ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। এক্ষুনি বৈদ্যের কাছে নিয়ে যাও ওদের! রাতের প্রহরীদের তীক্ষ্ণ এবং সতর্ক থাকতে হবে। এই যুদ্ধ মাত্র শুরু হলো। আগামী কাল দৈত্যরা দ্বিগুণ ক্রোধ আর নতুন কৌশল নিয়ে আক্রমণ করবে।'

পরের দিন দৈত্যরা কী নিয়ে আসতে চলেছে তা মানু কল্পনাও করতে পারেনি।

এমনকি এখনো সে নারা-মুন্ডার বর্বরতাকে ততটা গুরুত্বের সাথে দেখছে না।

* * * * *

'ঝড়ের রাতের অন্ধকারে দৈত্যরা মৃত ও আহতদের নিয়ে যাচ্ছে,' সারা দিনের রিপোর্ট দেওয়ার সময় বললো তারা।

কক্ষের সবাই যুদ্ধের প্রথম কয়েক ঘণ্টার কার্যক্রমে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে। অগণিত দস্যু যোদ্ধা দামিনী-সেনার মারাত্মক তীর দ্বারা বিদ্ধ হয়ে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। হতাহতের সংখ্যা এতটাই বেশি যে রুমের মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছে যে যুদ্ধ ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। পরের দিন সকালে কে আবার ফিরে আসবে এই তীক্ষ্ণ তামার ঝড়ের মুখোমুখি হতে?

ধ্রুব জবাব দিলো, 'দৈত্যরা এই দস্যুদের কোনো পরোয়া করে না, তারা।'

'তাহলে মৃত ও আহতদের নিয়ে যাচ্ছে কেন? আমি তো মনে করেছিলাম মৃতদের শেষকৃত্য সম্পাদন আর আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছে ...'

'ওরা মানুষ নিয়ে যাচ্ছে না, তারা। মাংস নিয়ে যাচ্ছে। বিশাল দৈত্য বাহিনী তাদের রাতের খাবার হিসেবে খাবে।'

তারার মনে হলো যে বমি করে দেবে। ধ্রুব এইমাত্র যা বললো তা চিন্তা করতেই তার বমি বমি ভাব হলো।

'আগামী কাল ওরা এতটা অরক্ষিত থাকবে না। আজ আমাদের তীরের ক্ষমতা দেখে ওরা একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রস্তুত করতে রাত কাটাবে। সেটা তাদের সৈনিকদের জন্য আরো শক্তিশালী, আরো মোটা বর্ম হতে পারে...' মানু উচ্চ স্বরে বললো।

'এটা অসম্ভব মনে হচ্ছে, মানু। এমনকি যদি তারা এই ধরনের বর্ম তৈরি করতে শুরু করে, তাদের বিশাল সংখ্যার জন্য তৈরি করতে মাস না হলেও কয়েক সপ্তাহ সময় তো লাগবেই,' উত্তর দিলো ধ্রুব। 'ওদের কাছে সেই সময় নেই। যেকোনো দিন প্রলয় চলে আসবে।'

'ঠিক বলেছ, ভাই। কিন্তু ওরা কিছু না কিছু নিয়ে ফিরে আসবে...একমাত্র ঈশ্বরই জানেন সেটা কী।'

বানারস, ২০১৭

সর্পরাজ

'দেব-রাক্ষস মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাতা পণ্ডিত ভৈরব শাস্ত্রী ছিলেন একজন দূরদর্শী মানুষ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শেষ কালো মন্দিরটি অন্য যেকোনোটির চেয়ে কঠোরভাবে সন্ধান করা হবে। তিনি এটাও জানতেন যে এই বছরের শক-সংবত বা হিন্দু ক্যালেন্ডারের রোহিণী নক্ষত্রের সময়ে বা এর পরে কালো মন্দিরের গোপন রহস্য অর্জনের জন্য অর্ডার যেকোনো কিছু করতে পারে।'

মহান মঠাধীশ বিদ্যুৎ ও দামিনীকে ভূগর্ভস্থ কালো মন্দিরের আরো কাছে নিয়ে যাচ্ছেন।

'বেশ কয়েক বছর ধরে কেদারনাথ মন্দিরেই ছিলো গোপন রহস্য। কিন্তু অর্ডার খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায় এবং শীঘ্রই আবিষ্কার করে যে রুদ্রপ্রয়াগের পাহাড়ে অবস্থিত পবিত্র মন্দিরটিতেই শতাব্দী ধরে তারা যা চেয়েছিলো তা লুকোনো আছে। অশুভ ভ্রাতৃসংঘ তখন কেদারনাথের দিকে নজর রাখার জন্য আসলাম বাইকার নামে মুম্বাইয়ের একজন গ্যাং-লর্ডকে দায়িত্ব দেয়।'

'আসলাম বাইকার? ওহ, ঈশ্বর! সে বেশ কুখ্যাত একজন অপরাধী, মাদকের কার্টেল আর অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা চালায়। কে জানতো যে সেও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের সাথে যুক্ত?' দামিনী বলে উঠলো। ও একজন সাংবাদিক, ফলে আসলাম বাইকার সম্পর্কে প্রায় সবকিছুই জানে।

'হ্যাঁ, সেই একই ভয়ংকর সন্ত্রাসী। যাই হোক, ইদানীং সে বানারসেই আছে। আমরা ২০১৩ সালের জুনে পাহাড়-রাজ্যে আঘাত করা বিধ্বংসী বন্যার আড়ালে কেদারনাথের মন্দির থেকে গোপন রহস্যটি সরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, মহন্ত ভবনীশঙ্কর, ন্যায়নার সাথে কাজ করেছেন, আর ঐশ্বরিক

গোপনীয়তা এখানে বানারসে দেব-রাক্ষস মঠে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই ভূগর্ভস্থ মন্দিরটি ১২৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কলিযুগের শেষ কালো মন্দির হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নির্মিত হয়েছে। আজ এটা তোমার সাথে তার নিজের ভাগ্য পূরণ করবে, বিদ্যুৎ।'

* * * * *

'নাআআআগ...'

মন্দিরের অন্ধকার গুহা থেকে আসা হিসধ্বনি শুনে দামিনী ভয়ে জমে গেল।

'শুনেছ, বিদ্যুৎ?' সে জিজ্ঞেস করলো। দেবতার জামার হাতাটা ধরে আছে, ভয়ে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছে তার।

'হ্যাঁ, শুনেছি, দামিনী,' দেবতা উত্তর দিলো। সেও সমানভাবে হতবাক হয়েছে।

তারা এখন একটা প্রশস্ত, দীর্ঘ সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছেছে যা কালো মন্দিরের আরো অন্ধকার অংশে নিয়ে গেছে। বিদ্যুৎ সুড়ঙ্গের গভীর থেকে নির্গত একটা চৌম্বকীয় টান অনুভব করছে। তার মনে হচ্ছে তার শরীরের প্রতিটা কোষ লাফাচ্ছে। এই কালো, রহস্যময় করিডরের শেষে যা লুকিয়ে আছে সেখানে পৌঁছানোর জন্য আলাদা হওয়ার চেষ্টা করছে।

'নাআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআআগ...'

আবারো ফাঁপা গুহাটি হিসহিস শব্দে ভরে উঠলো। এবার আরো জোরে হলো। একটা অজানা শক্তি ব্যতিক্রমী শক্তিশালী কিছুর উপস্থিতি ঘোষণা করছে।

'তুমি এখানে বলভান্ত আর ন্যায়নাকে নিয়ে অপেক্ষা করো।' দ্বারকা শাস্ত্রী দামিনীকে আদর করে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। 'বিদ্যুতের চিরন্তন আধ্যাত্মিক সঙ্গী হিসেবে এখানে কালো মন্দিরে তোমার উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আপাতত শিবমূর্তির সামনে অপেক্ষা করাই ভালো। এ এমন এক যাত্রা যা দেবতাকে একাই অতিক্রম করতে হবে।'

'জি, বাবা...' দামিনী জবাব দিলো। আশ্বস্ত করার জন্য ওর কাঁধে হাত রাখলো ন্যায়না।

* * * * *

'তুমি হয়তো ভাবছো এটা সম্মোহন। তুমি যা দেখতে চলেছ তা খুব গভীর সম্মোহনী জাদুবিদ্যা হতে পারে। তুমি যে প্রাচীন ঋষির সাথে দেখা করতে চলেছ,

তিনি হলেন বিশ্বের অন্যতম দক্ষ এক যোগী। শরীরের উপর তার মন এবং আত্মার শক্তি প্রায় অতিপ্রাকৃত পর্যায়ের। সবাই বলে যে তার বয়স হাজার হাজার বছর এবং প্রায় চার হাজার বছর আগে মৎস্য অবতারের সময় থেকে কখনো গ্রহ ত্যাগ করেননি,' স্বর্গীয় অতিথির দিকে যেতে যেতে ব্যাখ্যা করলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। অন্ধকারে বিদ্যুৎই প্রথম দূরে ঝলমল করতে থাকা সবুজ আলো লক্ষ করলো। সে ভক্তির সাথে ভয়মিশ্রিত এক অবর্ণনীয় অনুভূতি অনুভব করছে। যেন সে অন্য জায়গা ও অন্য সময় থেকে আসা এই অতিথিকে আগে থেকেই চেনে। ধীরে ধীরে মেঝে এবং ছাদ জুড়ে থাকা কতগুলো কিং কোবরা দেবতার চোখে পড়লো। সে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো, অবাক হয়ে তাকাচ্ছে বাবার দিকে।

'এগুলো তো কোবরা, বাবা...আমাদের সাবধানে থাকতে হবে,' বিদ্যুৎ বললো। কালো সরীসৃপদের দেখে কেঁপে উঠছে।

'ওরা আমাদের ক্ষতি করবে না, বিদ্যুৎ। ওরা আমাদের ঐশ্বরিক অতিথির সাথে থাকে। আমি গত এক সপ্তাহ ধরে প্রতি রাতে এখানে আসছি। আমাকে বিশ্বাস করো।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দুজনে। তারপর অবশেষে পাথর-কাটা ঘরে পৌঁছে গেল যেখানে তাদের বিশেষ অতিথি ছিলেন।

* * * * *

তিনি দেখতে মানুষের মতো হলেও তার দেহের আকার ছিলো বিশাল। পাথরের গুহার মাঝখানে কুঁকড়ে বসে আছেন, দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে উজ্জ্বল সবুজ আলো। কালো মন্দিরের অন্ধকারে বিদ্যুৎ অদ্ভুত কিছু লক্ষ করলো।

কুঁকড়ে যাওয়া লোকটির মুখ দুই হাঁটুর মধ্যে ডোবানো। লম্বা সাদা চুলে ঢাকা সেই মুখ, আর তার পুরো শরীর আঁশ দিয়ে ঢাকা। অসাধারণ সর্প-আঁশ, যা থেকে চকচকে নীল ও সবুজ আলো নির্গত হচ্ছে।

যদিও দৃশ্যটা একেবারেই অতিপ্রাকৃত ছিলো, কিন্তু বিদ্যুৎ ভয় পেল না। তার ভেতরের কিছু একটা তাকে এই বিস্ময়কর দর্শনার্থীর পায়ে পড়ে সম্মান জানানোর তাগিদ দিচ্ছে। পুরো কালো মন্দির যেন এই সর্প-মানবের অপ্রতিরোধ্য, জাদুকরী, মহাজাগতিক সম্মোহনে জীবিত হয়ে উঠেছে।

বৃদ্ধ মঠাধীশ এখন হাতজোড় করে অপ্রকাশিত ভক্তির সাথে কথা বললেন। 'মুখ তুলুন, হে সর্পরাজ। আমাদের আশীর্বাদ করুন!'

বিশাল লোকটি নড়েচড়ে উঠলেন। তার ত্বকের বর্ণ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এরপরে যা ঘটলো, তা দেখে অবিশ্বাসে বিদ্যুতের মাথা ঘুরে গেল। স্বর্গীয়

অতিথির আকার ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। তার দেহ থেকে নির্গত উজ্জ্বল আলোর কারণে তাদের অন্ধপ্রায় অবস্থা হলো। এই চোখধাঁধানো আলোর মাঝে যখন সে বিশালাকার সর্প-মানবের মাথাটা কয়েকটা মাথায় বিভক্ত হতে দেখলো, বিদ্যুৎ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না।

মাথা নয় আসলে।

ফণা।

আদিম সর্পটিকে এখন প্রায় বিশ ফুট লম্বা দেখাচ্ছে কারণ এর দশ ফণাযুক্ত উজ্জ্বল, মহিমান্বিত মাথাটি গুহা-মন্দিরের অন্ধকারে ফুটে উঠেছে।

বিদ্যুতের কাছে এসব কিছু স্বপ্নের মতো লাগছে।

এরপর দ্বারকা শাস্ত্রী যে কথাগুলো বললেন, মনে হলো যেন অনেক দূর থেকে সেগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে–এমন শব্দ যা দেবতা কখনো ভাবেনি যে সে বা কোনো মানুষ কখনো শুনবে।

'স্বাগত, নাগরাজ!'

'স্বাগত, শেষনাগ!'

জাহাজের চারপাশের জলাভূমি, আর্যাবর্ত, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৮ অব্দ

‘ওরা জাহাজে আরোহণ শুরু করার পূর্বে আমাদের অবশ্যই নিচে নামতে হবে’

ওরা যা ভেবেছিলো তাই হলো; ভোরের কয়েক ঘণ্টা পরেই কালো মেঘগুলো সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে ফেললো। হরপ্পার পতনের পর যে কয়েক মাস অতিবাহিত হয়েছে, তার প্রতিটি দিনের মতোই আর্যাবর্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলো।

মেঘের চাদরের ওপারে দৃশ্যমান আকাশের রেখাগুলো রক্তের মতো লাল দেখাচ্ছে, যেন নিচের পৃথিবীতে যা ঘটতে চলেছে তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। নির্দয় বর্ষণ অব্যাহত আছে, শুধু আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। এই ধরনের অবিরাম মেঘ-বিস্ফোরণ শীতল বাস্তবতার এক স্পষ্ট আগমনী বার্তা। মহাপ্লাবনের ঢেউ এখন আর মাত্র কয়েক দিন দূরত্বে রয়েছে। প্রলয় জলাভূমি গ্রাস করে আসছে।

আর তার সাথে, সমস্ত পরিচিত পৃথিবী মহাপ্লাবনে ডুবে যাবে।

দৈত্যরা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওদের জাহাজটি দখল করতেই হবে, নয়তো তাদের প্রত্যেকে ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা এখন দৈত্যদের জন্য বেঁচে থাকার যুদ্ধ, আর এজন্য তারা যেকোনো ধরনের নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিতে প্রস্তুত ছিলো।

* * * * *

দৈত্যরা ফিরে এসেছে। আবারো ভয়ংকর সংখ্যায়। দূর থেকে দেখে কে এই আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছে তা বোঝা যায় না, তবে ভয়ংকর যুদ্ধের আর্তনাদ নিশ্চিত করছে যে দৈত্যরা নিজেরাই সম্মুখ আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

ওরা নড়াচড়া না করে এক মাইল দূরে অবস্থান নিলো। তারপর অদ্ভুত কিছু ঘটলো। এক সওয়ারি দৈত্যদের ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে একাই জাহাজের দিকে যাত্রা করলো। তারা মানুর দিকে তাকিয়ে ইশারায় জানতে চাইলো যে তার তীরন্দাজদের আরোহীকে থামাতে বলবে কি না।

মাথা ঝাঁকালো মানু। 'ওকে আসতে দাও। বার্তাবাহক হতে পারে।'

সওয়ারি কাছে আসার সাথে সাথে জাহাজের উপরে থাকা সবাই অদ্ভুত কিছু লক্ষ করলো। স্পষ্টতই একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার, একজন দৈত্য যোদ্ধা তার দাঁতের মধ্যে লাগাম ধরে ছুটে চলছে। সে তার দুই হাতে বড় দুটি মশাল ধরে আছে।

সত্যব্রত মানু আর তারা উঁচু ডেকের উপর ছিলো, তাই আরোহীকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলো না।

আরোহী জাহাজের কিছুটা দূরে এসে থামলো। নিচের ডেকের তীরন্দাজদের চোখের দিকে তাকিয়ে জাহাজ বরাবর হাঁটলো খানিকক্ষণ, যেন নিজেকে প্রদর্শন করছে, সেই সাথে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তীরকে।

কোনো তীর ছোঁড়া হলো না। তারপর সে ঘুরে এসে তার দৈত্য বাহিনীর দিকে ফিরে মশাল জ্বালিয়ে দিলো। আরো বিশজন আরোহী র‍্যাংক ভেঙে জাহাজের দিকে ছুটছে এই মুহূর্তে।

মানু আর তারা বুঝতে পারলো না কী হচ্ছে।

'এ কোনো দূত নয়। জাহাজের দিকে আসতে থাকা দৈত্যদের ধ্রুব আক্রমণ করছে না কেন?' নরখাদকরা কী করছে তা বুঝতে না পেরে মানু জিজ্ঞেস করলো।

ওকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি।

ধ্রুব ছুটে এলো মানুর কাছে। তার নিজেরই এই উদ্ভট খবর আনতে কয়েক স্তর উপরে উঠতে হয়েছে।

'ওরা বর্ম বানিয়েছে, মানু। কিন্তু আমরা যা আশা করেছিলাম তা নয়।

'কী বলতে চাইছো, ধ্রুব?'

'দৈত্যরা তাদের বুকে জীবিত, কান্নারত শিশুদের বেঁধে রেখেছে।'

* * * * *

'এরা সেই হাজারো দস্যুর সন্তান যারা গতকাল মারা পড়েছে,' ধ্রুব ব্যাখ্যা করলো। 'দৈত্য যোদ্ধারা প্রত্যেকে তাদের বুকের সামনে একটা শিশুকে বেঁধে রেখেছে, আর এইভাবে তৈরি করেছে মানব ঢালের সবচেয়ে নির্লজ্জ রূপ। এরা আমাদের পরীক্ষা করছে। প্রথমে একজন আরোহীর মাধ্যমে। তারপর বিশজন পাঠানোর মাধ্যমে। এখন এরা জানে যে আমরা তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করবো না। ব্যাপারটা কিন্তু খুব খারাপ হলো, মানু।'

'বদমাশের দল!' মানু চিৎকার করে কাঠের রেলিংয়ে ঘুসি মারলো। 'নিষ্ঠুর, কাপুরুষের বাচ্চা!'

'এতে আমাদের দামিনী-সেনারা অকেজো হয়ে যাবে, মানু। আমরা এখন একটা তীরও নিক্ষেপ করতে পারবো না, পাছে কোনো শিশু আঘাতপ্রাপ্ত হয়।'

'তোমার তীরন্দাজদের কী খবর, ধ্রুব? ওরা সবাই সর্বোচ্চ প্রশিক্ষিত এবং সংখ্যায় তিন হাজার। ওরা কি শিশুদের কাউকে আঘাত না করে একে একে শত্রুদের হত্যা করতে পারবে না?'

'বুদ্ধিটা খুব একটা সুবিধার না, মানু। ওরা সবাই ঘোড়ার উপরে থাকবে, চলমান। এই আবহাওয়ায় এদের মাথা বরাবর লক্ষ্যভেদ করা অসম্ভব।'

রাতারাতি সবকিছু এমন নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হবে, মানু কখনো আশা করেনি। কিন্তু তারপরেও, এমনকি তার কল্পনাতেও সে কখনোই সেই স্তরে যেতে পারবে না যে স্তরে দৈত্যরা এত সহজে এবং নির্লজ্জভাবে গেছে।

* * * * *

'এসবের মধ্যে শুধু একটা ব্যাপারই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক,' তারা বললো, চুপচাপ শত্রু সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করছে।

'সেটা কী?' মানু জিজ্ঞেস করলো। ভালো কিছু শোনার আশায় আছে সে।

'তুমি কি লক্ষ করেছ যে আমাদের চারপাশে সেনাবাহিনীতে কোনো দস্যু ব্যানার নেই?' তারা জিজ্ঞেস করলো।

মানু শত্রু বাহিনীর দিকে তাকালো। তারা ঠিকই বলেছে।

'কিন্তু তারা, বৃষ্টির কারণে তো কিছুই পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে না। বা হয়তো দস্যুদের গতকাল অনেক মানুষ হারানোর ফলে আজ তাদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে,' মানু বললো।

'আমার মনে হয় না, মানু। ব্যাডল্যান্ড থেকে আসা দস্যুরা যতই বর্বর হোক না কেন, তাদের কেউই এইভাবে তাদের মৃত সহকর্মীর সন্তানদের ব্যবহার করার অনুমতি দেবে না।'

তারার কথা শুনে সবাই ভাবছে সে কী বলছে। মেয়েটা কথা চালিয়ে গেল। 'তাদের দক্ষ যোদ্ধাদের একটা বড় অংশ মারা যাওয়ায় দস্যু উপজাতিরা নারা-মুন্ডার খুব একটা কাজে আসছে না। দৈত্যরা সম্ভবত রাতের অন্ধকারে বাকি সব দস্যুদের হত্যা করেছে। এর অর্থ হলো, আমাদের মোকাবেলা করার জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমসংখ্যক শত্রু রয়েছে।'

তারা যা বলছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে পাল্লা এবার কিছুটা জাহাজের রক্ষকদের পক্ষে এসে পড়বে। মানু এটার উপর নির্ভর করতে চায়নি, কিন্তু তারা যা বলেছে তাতে সে সবথেকে ভালোর আশায় মাথা নাড়লো। ধ্রুবর দিকে ফিরলো সে।

'ব্যাপারটা এখন তাহলে আমাদের উপরেই নির্ভর করছে, ধ্রুব। তুমি, আমি আর রাজা প্রচণ্ড আমাদের পদাতিক বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাবো। নরখাদকদের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। এরা জাহাজে আরোহণ শুরু করার আগে আমাদের অবশ্যই নিচে নামতে হবে।'

বানারস, ২০১৭

শেষনাগ

বিদ্যুৎ শিবমূর্তির সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

সে এইমাত্র যে দুর্দান্ত দৃশ্যটি দেখেছে, তা দেখে সাথে সাথে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে। হাতজোড় করে মাথা নিচু করে আছে সে। আদিম সর্পের ঐশ্বরিক দশ জোড়া হলুদ এবং কালো চোখের বলয়ের অলৌকিক দীপ্তির কারণে ও তার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না।

যেন ঐশ্বরিক নাগ চেয়েছিলেন বিদ্যুৎ তার আসল রূপটি ক্ষণিকের জন্য দেখুক। কয়েক সেকেন্ড পরে বিশাল, দশ ফণাযুক্ত সরীসৃপটি ধীরে ধীরে, জাদুকরীভাবে সংকুচিত হতে শুরু করে, সেই সাথে হ্রাস পেতে শুরু করে তার নীল-সবুজ আভা। অবশেষে বিদ্যুৎ যখন তার দিকে তাকাতে মাথা তুললো, তখন দেখলো শেষনাগ গভীর তপস্যায় বসে থাকা বৃদ্ধ সাধুতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তার বয়স শত শত বছর, কুঁচকানো চামড়া এখনো সাপের মতো। এমনকি তার বসার ভঙ্গি থেকেও দেবতা বলতে পারে যে সর্পরাজ অস্বাভাবিক লম্বা আর শক্তিশালী।

'আজকের জন্য তোমার দর্শন সম্পূর্ণ হয়েছে, বিদ্যুৎ। পরাক্রমশালী শেষনাগ শীঘ্রই তোমাকে আবার ডেকে পাঠাবেন,' সর্পরাজের পা ছুঁয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে দ্বারকা শাস্ত্রী দেবতার কানে ফিসফিস করে বললেন।

বিদ্যুৎ যখন কালো মন্দিরের কেন্দ্রীয় গর্ভগৃহে ফিরে গেল, তখন সে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। সে এই মুহূর্তে তার জীবনের সবচেয়ে বড় অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাস অনুভব করছে।

তার অভিজ্ঞতা বলছে, এ কেবল শুরু।

* * * * *

'হিমালয়ের কিছু সাধু দাবি করেন যে এই পর্বতমালার সর্বোচ্চ শিখরে তপস্যা করার সময় প্রায়ই তারা শেষনাগকে দেখতে পেতেন। তারা বলে যে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর থেকে তাকে বহু সন্ন্যাসী দূর থেকে দেখেছেন। তাকে সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে শেষনাগ লেকের আশেপাশের এলাকায়, যেটি পহেলগাম থেকে প্রায় বত্রিশ কিলোমিটার দূরে ভগবান শিবের পবিত্র অমরনাথ মন্দিরের পথে পড়ে।'

বিদ্যুৎ প্রতিটা কথা শুনছে, কিন্তু তার মনে হচ্ছে যেন সে তখনো ঘোরের মধ্যেই আছে। আশেপাশে বসে থাকা অন্যরা নিজেদের মতো করে হতবাক হয়ে আছে। কেউই বিশ্বাস করতে পারছে না যে তারা আসলে ভগবান বিষ্ণুর চিরন্তন সহচর শেষনাগ সম্পর্কে আলোচনা শুনছে। তারা জানতো যে ভগবান রামের যুগে তার ভাই লক্ষ্মণকে এই অমর সর্পের অবতার বলে বিশ্বাস করা হয়েছে। বিষ্ণু যখন কৃষ্ণ-অবতার রূপে আবির্ভূত হন, তখন তার বড় ভাই বলরাম শেষনাগেরই অবতার ছিলেন। আর এখন মহান মঠাধীশ তাদের বলছেন যে পৌরাণিক কাহিনির ঐশ্বরিক সাপটি এই মুহূর্তে দেব-রাক্ষস মঠে বাস করে...তারা যেখানে বসেছিলো তার থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে।

'তাহলে এটাই কালো মন্দিরের রহস্য!' দামিনী হঠাৎ করেই অনুমান করলো। 'অর্ডার কি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এর পেছনেই পড়ে আছে? শেষনাগ! ওরা তাকে হত্যা করতে চায় কারণ তার মতো অবর্ণনীয় শক্তিশালী এবং অবিনশ্বর কেউ তাদের ঘৃণ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে দাঁড়াতে পারে, তাই?'

সবাই মহান মঠাধীশের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলো। দামিনীর কথা ঠিক হতেই হবে। শেষনাগই কালো মন্দিরের রহস্য।

'দয়া করে কথা বলুন, বাবা...শেষনাগই কি কালো মন্দিরের আসল রহস্য?' ন্যায়না অনুরোধ করলো।

দ্বারকা শাস্ত্রী সবার দিকে অবাক চেহারায় তাকালেন।

'অবশ্যই না।'

* * * * *

পুরোহিতজি তার সামনে মহাপঞ্চং বা সনাতন জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ক্যালেন্ডার নিয়ে বসলেন।

কয়েক মিনিট অধ্যয়ন করার পর তিনি দ্বারকা শাস্ত্রীর দিকে তাকালেন। 'শুরু হয়েছে, গুরুদেব...রোহিণী নক্ষত্র শুরু হয়েছে।'

তিনি এই বাক্যটি সম্পূর্ণ করার সাথে সাথে কালো মন্দিরের সবাই শত শত শাঁখ বা শঙ্খের আওয়াজ শুনতে পেল। যদিও তারা পৃথিবীর গভীরে, কালো পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা আছে, তবুও কাশী নগরী জুড়ে শত শত পুরোহিতের দ্বারা শঙ্খের শক্তিশালী এবং সুরেলা কলতান থামানো যায়নি।

'এটা কি, বাবা? এই শঙ্খ-নাদ কোথা থেকে আসছে?' বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করলো।

দ্বারকা শাস্ত্রী, পুরোহিতজি এবং আরো কয়েকজন গণিত পুরোহিত এখন তাদের নিজস্ব শঙ্খ প্রস্তুত করছেন। অন্য সাধুরা করতাল ও পূজার ঘন্টা তুলে নিলো।

'পবিত্র সময় চলে এসেছে, হে দেবতা! আপনার পূর্বপুরুষদের মনে রাখবেন! আপনার সমস্ত পূর্বপুরুষ–বিভাসন পূজারি, সত্যব্রত মানু, অদ্বৈত শাস্ত্রী, দুর্গাদাস শাস্ত্রী, ভৈরব শাস্ত্রী, মার্কন্ডেয় শাস্ত্রী এবং আপনার পিতা কার্তিকেয় শাস্ত্রী–এদের প্রতি হাতজোড় করুন!

'এরা সবাই যুদ্ধ করেছে, রক্তপাত করেছে, যাতে আপনি এই পবিত্রতম দিনে এখানে দাঁড়াতে পারেন। মহাবিশ্ব আপনাকে যা করতে পাঠিয়েছে তা করতে পারেন।'

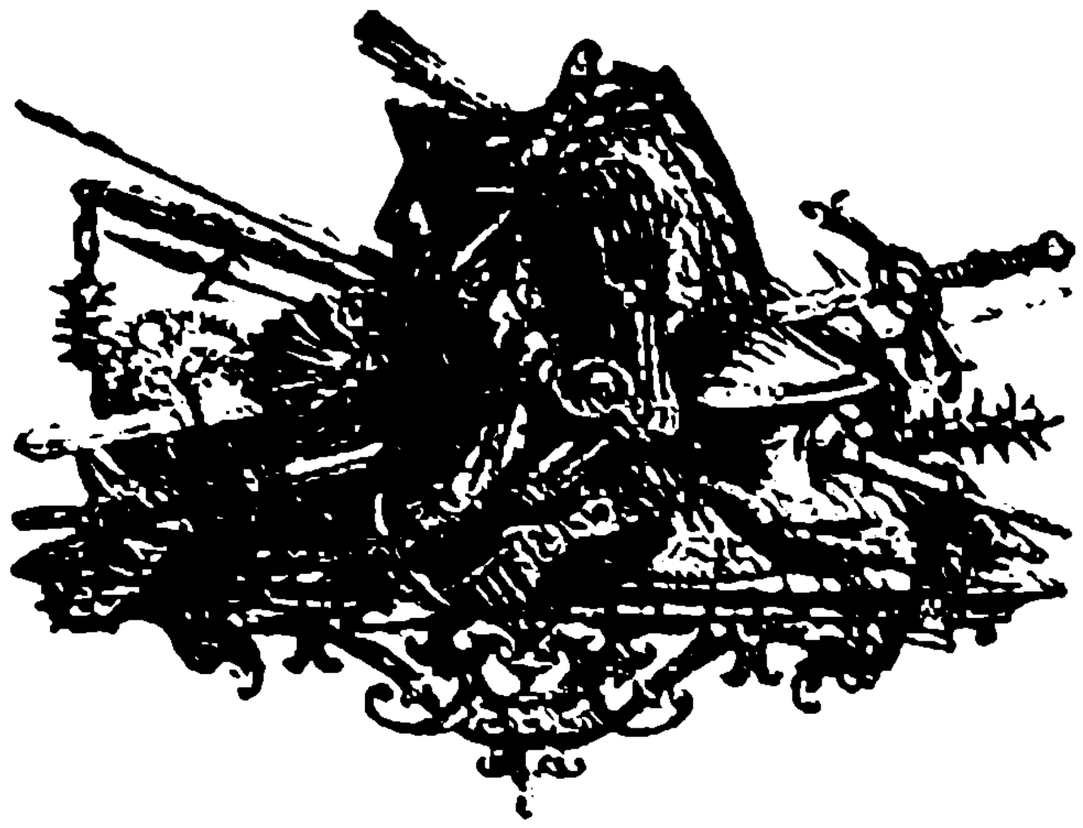

জাহাজের চারপাশের জলাভূমি, আর্যাবর্ত, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৮ অব্দ

অন্তিম যুদ্ধ—তৃতীয় খণ্ড

জাহাজের ডেকগুলো এখন বর্ম আর অস্ত্রের ঝনঝনানিতে কোলাহলপূর্ণ হয়ে আছে। মহাতরীর হাজার হাজার রক্ষক দৈত্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সম্মুখ পালটা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের প্রত্যেকে জানতো যে দস্যু সৈন্যদলগুলো ধ্বংস হওয়ার পরেও তাদের এখনো তিনজনের বিপরীতে একজন অনুপাতে যুদ্ধ করতে হবে।

'দামিনী-সেনারা এখনো দারুণ সেবা করতে পারবে, তারা,' মানু বললো। একজন সাহায্যকারী তার কোমরের পেছনে ভারী বর্মের হুকগুলো বেঁধে দিচ্ছে।

'আমরা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, মানু,' তারা জবাব দিলো। 'আমার যোদ্ধারা কারো থেকে পিছিয়ে নেই।'

'হ্যাঁ, তারা, আমি জানি। এই কারণেই তাদের সংরক্ষণ করা দরকার, জাহাজের শেষ প্রতিরক্ষা হিসেবে। আমরা যদি দৈত্যদের ফাঁদে পড়ি, ওরা জাহাজে ঝড় তুলবে, তখনই মহাতরীর নিরীহ বাসিন্দাদের রক্ষা করার জন্য লড়াই করবে দামিনী-সেনারা। তবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা আরো একটা কাজ করতে পারে।'

'কী?'

'আমাদের সৈন্যদের হাতে যে দৈত্যরা নিহত বা আহত হবে, তাদের সাথে শিশুরা বাঁধা থাকবে। সময়মতো উদ্ধার না করা হলে শিশুগুলো দুপাশ থেকে আসা অশ্বারোহী বাহিনীর খুরের নিচে মাড়িয়ে যাবে। আমরা যখন দৈত্য সেনাবাহিনীর

মাঝে প্রবেশ করবো, তখন দামিনী-সেনাদের কাজ হবে সমস্ত শিশুকে উদ্ধার করে জাহাজের নিরাপত্তার ভেতর নিয়ে আসা।'

'সত্যব্রত, তুমি সত্যিই নির্বাচিত বীর,' সোমদত্ত বললেন। মাত্র কয়েক পা দূরে শক্ত করে বর্ম পরছিলেন তিনি। 'কেবল তুমিই তোমার শত্রুর সন্তানদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে পারো, তাও এমন চরম প্রতিকূলতার মধ্যে। হে সূর্যপুত্র, মৎস্য কোনো ভুল করেননি। তোমার মতো মানুষই সব সময় ভগবান পশুপতির আশীর্বাদ পাবে।'

* * * * *

'কোনোভাবেই আমি আপনাকে এই রক্তস্নানে নামতে দিচ্ছি না, সোমদত্তজি।' সোমদত্ত যখন মানুকে এইসব কথা বলছেন, তখনই যুবক পুরোহিতরাজ লক্ষ করলো, মহান স্থপতিকে বর্ম পরানো হচ্ছে। সে তার প্রয়াত পিতার অনুগত বন্ধুকে দৈত্য আক্রমণের এই উত্তাপের মুখোমুখি হতে দেবে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো। যদিও সোমদত্ত একজন দক্ষ যোদ্ধা, কিন্তু মনের গভীরে কোথাও মানু জানতো যে বৃদ্ধ স্থপতি নরখাদকদের হিংস্রতার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবেন না।

কারণ দৈত্যরা তার দেখা আগের যেকোনো শত্রুর থেকে আরো বেশি নিষ্ঠুর ও দক্ষ ছিলো।

'ঐ ময়দান আপনার জন্য নয়, সোমদত্তজি। আপনাকে আমাদের প্রয়োজন। জাহাজের আপনাকে প্রয়োজন। ভগবান না করুক, যদি আপনার কিছু হয়ে যায়, তবে আমরা সবাই অনাথ হয়ে যাবো,' সত্যব্রত জোর দিয়ে বললো।

'হ্যাঁ, সোমদত্তজি, দয়া করে আমাদের জন্য অপেক্ষা করা নরকের আগুনে নামবেন না। আপনি যেমন দেখেছেন, এই প্রাণীগুলোর আচার-আচরণ অনিশ্চয়তায় ভরা। এরা যখন-তখন যেকোনো স্তরে নেমে যেতে পারে। নিজেকে বিপদে ফেলবেন না,' যোগ করলো ধ্রুব। সেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সোমদত্তকে দেখে সমানভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

বিজ্ঞ স্থপতি হাত উঠিয়ে সৈনিককে তার বর্মের কাজ বন্ধ করার ইঙ্গিত দিলেন। দুই সুদর্শন পুরুষের দিকে ফিরলেন তিনি। এই দুজনকে তিনি মানব জাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে জানেন।

'দেখো মানু, আমি আন্তরিকভাবে আমার সুস্থতার জন্য তোমার উদ্বেগের প্রশংসা করি। কিন্তু আমি যখন তোমার বাবাকে শেষ দেখেছিলাম, সানজানাকে কোলে নিয়ে তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যেতে দেখেছিলাম, তখন আমি

প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে নিজের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমাকে রক্ষা করবো। তুমি যদি মনে করো যে আমি তোমাকে একা সেই পাগলামিতে ঝাঁপ দিতে দিচ্ছি, তুমি ভুল করছো।'

'কিন্তু সোমদত্তজি...'

'আমার কথা এখানেই শেষ, সত্যব্রত। আমরা আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করছি। শত্রুদল দরজায় কড়া নাড়ছে। তাদের সৈন্য ইতোমধ্যে প্রথম ডেকে উঠতে শুরু করেছে। আমাদের জলদি যেতে হবে। এখন শুধু মনে রেখো, মানু...আমি তোমাকে আপন ছেলের মতোই ভালোবাসি।'

জ্ঞানী বৃদ্ধ কথা শুনতে রাজি হলেন না। মানু আর কিছু বললো না।

এটাই তো সমস্যা, সোমদত্তজি। আমিও যে আপনাকে বাবার মতোই ভালোবাসি।

* * * * *

জাহাজের রক্ষকদের পালটা হামলার মাত্রা এবং তীব্রতা এমনকি শক্তিশালী দৈত্যদের জন্যও অপ্রত্যাশিত ছিলো। দানবগুলো আশ্চর্য হয়ে গেছে; কারণ তারা দেখছে যে হাজার হাজার হরপ্পান সৈন্য বিশাল জাহাজের সর্বোচ্চ ডেক থেকে অসংখ্য দড়ি বেয়ে নিচে নামছে। কালো মেঘের ওপারে জাহাজের উপরের অংশগুলোও দেখা যাচ্ছে না। জাহাজের যোদ্ধাদের দেখে মনে হচ্ছে সোজা আকাশ থেকে উড়ে আসছে!

ধাতব সংঘর্ষগুলো বেশ হৃদয়বিদারক ছিলো। কারণ হরপ্পার সৈন্যরা মাটিতে পা না ফেলে কেবল তরবারি উঁচিয়ে জাহাজের উপর থেকে সরাসরি দৈত্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। প্রথম থেকেই যুদ্ধটা খুব নৃশংস হচ্ছে। দৈত্যরা সবকিছুকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তলোয়ার, বর্শা, ছুরি, ছোরা, পশুর নখর, বিষের ডার্ট, নিজেদের নখ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দাঁত–সবকিছু। হরপ্পার সৈন্যদের কাছে এই লড়াই একদল উন্মত্ত নেকড়ের সাথে লড়াই করার মতো।

পরের ধাপে এলো প্রচণ্ডের নেতৃত্বে থাকা অসুর দল।

দড়ি এবং লতা দিয়ে তৈরি মই ব্যবহার করে জাহাজ থেকে নেমে রক্ত-যুদ্ধে যোগ দিয়েছে ওরা। তারপর দুই ভয়ংকর যোদ্ধা দৈত্যদের সেনাবিন্যাসে এমনভাবে আঘাত করলো যেন আকাশ থেকে উল্কাপাত হয়েছে। প্রশিক্ষিত হরপ্পান সৈন্যরা যেখানে মাটি থেকে দশ বা পনেরো হাত উঁচু থেকে ঝাঁপ দিয়েছে, সেখানে এই দুই অসাধারণ সৈন্য প্রায় চল্লিশ হাতেরও বেশি উঁচু থেকে নিজেদের ছুঁড়ে দিয়েছে শত্রু

সৈন্যের মাঝে। উভয়ের হাতেই লম্বা এবং প্রশস্ত যুদ্ধের ঢাল, যা ব্যবহার করে তারা উপর থেকে দৈত্যদের বর্শা, বর্ম এবং তলোয়ারগুলো বিধ্বস্ত করছে। অবতরণ করার সময় বেশ কয়েকটিকে ভেঙেও ফেলেছে। এই গতিবেগ ব্যবহার করে তারা দৈত্য সৈন্যদের রণসারি ভেদ করে আরো গভীরে চলে গেল।

তাদের মধ্যে একজন চমৎকার একটা ধনুক ধরে রেখেছে। তার দুই উরুতে এবং পিঠে মোট চারটা তীরপূর্ণ তূণীর।

পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর তীরন্দাজ। ধ্রুব।

অন্য যোদ্ধাটা ব্রোঞ্জ এবং চামড়া দিয়ে তৈরি একটা উজ্জ্বল বর্ম পরা ছিলো। তার লম্বা চুলগুলো বেণি করে বাঁধা। হাতে একটা ঢাল এবং একটা দীর্ঘ অসি ধরে রেখেছে, কোমরের দুপাশে ঝুলছে দুটো ভয়ংকর দেখতে ক্ষুদ্র অসি। সে এমন এক ব্যক্তি যে কখনো যুদ্ধে হারেনি। এমন এক যোদ্ধা যাকে প্রত্যেক দৈত্য এড়াতে চাইছে। ও হলো সেই মানুষ, যার জন্য অপেক্ষা করছে নারা-মুন্ডা।

মনু।

মনে হলো যেন দুটো ক্ষুধার্ত সিংহ একপাল হায়েনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বানারস, ২০১৭
রুদ্রের মূর্তি

'কাশীর সবাই আনন্দ করছে, বাবা!'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো সনু। রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাকে তার বাবা, জ্ঞানী পুরোহিতজি মঠের ছাদে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে আরো খবর নিয়ে ফিরে এলো। সে হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছে, কিন্তু তাকে খুব খুশি দেখাচ্ছে।

'আপনি আমাকে যেভাবে বলেছেন ঠিক সেইভাবেই নক্ষত্রটি আকাশে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু আরো কথা আছে। পুরো শহর এই পবিত্র সময়ের উদ্‌যাপনে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে, বাবা! হাজার হাজার মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর আরতি চলছে। শত শত মঠ থেকে পবিত্র যজ্ঞের পবিত্র ধোঁয়া বের হচ্ছে। গভীর রাতের পূজা করতে পবিত্র গঙ্গার ঘাটে জড়ো হয়েছেন শত শত পুরোহিত। সমগ্র কাশী রোহিণী নক্ষত্রকে স্বাগত জানাচ্ছে, বাবা!'

দ্বারকা শাস্ত্রী চোখ বন্ধ করে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন।

'তারা নক্ষত্রকে স্বাগত জানাচ্ছে না। যিনি আসতে চলেছেন তাকে জানাচ্ছে।'

* * * * *

'কিন্তু বাবা, এই নক্ষত্রের কথা এত মানুষ জানে কী করে? আমি তো ভেবেছিলাম এটা গোপন থাকবে। এরা সবাই কি গোপন রহস্য জানে, বাবা?'

'না, বিদ্যুৎ। কিন্তু দেব-রাক্ষস মঠ থেকে তাদের কাছে একটা বার্তা পাঠানো হয়েছে। এরা সেই একই পবিত্র পুরুষ, যারা রোমের বিগম্যানের সাথে এক্সরসিজমের যুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছে–যখন সে তোমার আত্মা দখল করার চেষ্টা করছিলো আর কি। আমি তাদের খবর পাঠিয়েছি। তারা জানে ঐশ্বরিক কিছু ঘটতে চলেছে। কিন্তু শুধু শেষনাগ, পুরোহিত এবং আমি জানি এটা ঠিক কী। আর কিছুক্ষণের মধ্যে তুমিও জানতে পারবে, বাছা।'

এই বলে মঠাধীশ তার শাঁখ ঠোঁটের কাছে তুলে প্রচণ্ড জোরে ফুঁ দিলেন। অন্যান্য সাধুরা শঙ্খ, করতাল ও ঘণ্টা নিয়ে তার সাথে যোগ দিলো।

ধূপকাঠি জ্বালানো হলো, শিবমূর্তির চারপাশে সজ্জিত করা হলো কর্পূর প্রদীপ। তারপর আবারো শুরু হলো মন্ত্রের শক্তিশালী জপ।

এবার বিদ্যুৎ লক্ষ করলো ওটা রুদ্র-পথ নয়। সে আবার জপকৃত শব্দের দিকে মনোনিবেশ করলো।

'শান্তকরম ভুজগশায়নম
পদ্মনাভম সুরেশম;
বিশ্বধর্ম গগনসাদ্রীশম
মেঘবর্ণম শুভাঙ্গম... ।'

বিদ্যুৎ সাথে সাথে এই শক্তিশালী মন্ত্র চিনতে পারলো। বিষ্ণু শান্তকরম মন্ত্র! এই মন্ত্র ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়, আবৃত্তিকারীকে বীরত্ব, সাহস এবং বিজয় প্রদান করে।

দামিনী এসে তার দেবতার পাশে দাঁড়ালো। কালো মন্দিরের পরিবেশ এখন আধ্যাত্মিক শক্তিতে স্পন্দিত হচ্ছে। একাধিক শঙ্খের ধ্বনিত প্রতিধ্বনি, বিষ্ণু শান্তকরম মন্ত্রের জপ, করতাল এবং ঘণ্টার ঝনঝন, গাঁদা ও কর্পূরের সুগন্ধ...কালো মন্দির জুড়ে যেন এক সংক্রামক, চমকপ্রদ, চিত্তাকর্ষক শক্তি ছুটে বেড়াচ্ছে।

অন্য পুরোহিতরা যখন তাদের জপ চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন দ্বারকা শাস্ত্রী উঠে বিদ্যুতের কাছে গেলেন। দেবতার কানের কাছে গিয়ে জোরে কথা বললেন যাতে গুহার ভেতরের এই মনোমুগ্ধকর অবস্থা পেরিয়ে বিদ্যুৎ তার কথা শুনতে পায়।

'এসো, বিদ্যুৎ...সময় হয়ে গেছে!' বলে তিনি তার নাতির কবজি ধরলেন।

* * * * *

দ্বারকা শাস্ত্রী বিদ্যুৎকে তার বাহু ধরে গর্ভগৃহের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা ভগবান শিবের অপূর্ব পাথরের ভাস্কর্যের কাছে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। মূর্তিটি এখন কর্পূরের উজ্জ্বল প্রদীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত, আর একটা পবিত্র আলোয় জ্বলজ্বল করছে। মঠাধীশ রুদ্রের কাছে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করলেন। প্রায় সাথে সাথেই তিনি শিবের ভারী তামার ত্রিশূলটি টেনে বের করলেন, যা পাথরের মাটিতে লাগানো ছিলো।

এক মুহূর্ত পরে নীলকণ্ঠ শিবের বিশাল মূর্তির পেছনের কোথাও থেকে একটা অদ্ভুত নড়াচড়ার শব্দ হলো। এই ক্ষীণ গর্জন কেবল বিদ্যুৎ আর দ্বারকা শাস্ত্রীই শুনতে পাচ্ছেন। ত্রিশূল বের করার কারণে খুব সম্ভবত কোনো লুকোনো লিভার বা গিয়ার সক্রিয় হয়ে গেল। এর ফলে সবাইকে অবাক করে দিয়ে শিবমূর্তিটি সরে গেল। মসৃণ, বৃত্তাকার গতিতে বিশাল পাথরের ভাস্কর্যটি পুরো একশত আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল। শিবের পিঠ এখন কেন্দ্রীয় গর্ভগৃহের দিকে মুখ করে আছে। কিছুক্ষণ পর শিবের মূর্তির পেছনের অংশ মাঝখান থেকে তার কাঁধ থেকে উপবিষ্ট দেবতার কোমর পর্যন্ত আলাদা হয়ে গেল। শিবমূর্তির মধ্যে থাকা পাথরের মেরুদণ্ডের মতো দেখতে একটা অংশ থেকে কয়েকটি পাথর সরে যেতেই একটা উল্লম্ব, ফাঁপা গহ্বর সৃষ্টি হলো।

উজ্জ্বল নীল রঙে জ্বলজ্বল করছে ওটা। সমস্ত দৈর্ঘ্য জুড়ে খোদাই করা আছে গরুড় পুরাণের ভয়ংকর শ্লোক। জিনিসটা মৃত্যুর প্রাচীন দূতের মতোই দীপ্তিময়।

মহা-তরবারি।

রত্ন-মরু!

* * * * *

বিদ্যুতের মুখ তলোয়ারের নীল আভাকে প্রতিফলিত করছে। রত্ন-মরু শিবমূর্তির ধড় বরাবর উল্লম্বভাবে আবদ্ধ ছিলো। এর রত্নখচিত হাতল এখন দেবতার নাগালের মধ্যে আছে। সে পাথরের আবরণ থেকে অস্ত্রটি বের করার তাগিদ অনুভব করলো।

'এটা ঐশ্বরিক তলোয়ার, বিদ্যুৎ। বিভাসন পূজারি অসুরদের সাথে তার শেষ যুদ্ধের সময় এটা ব্যবহার করেছিলেন। তখনই এটা ঐশ্বরিক মহাজাগতিক আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়েছে। এরপর এটা তার পুত্র অমর পুরোহিতরাজ সত্যব্রত মানুকে দেওয়া হয়। প্রলয় যখন আঘাত হানে আর প্রায় দুই বছর স্থায়ী হয়, তখন রত্ন-মরুই ছিলো জাহাজের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এরপর প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে আমাদের বংশধররা এই স্বর্গীয় অস্ত্রটি রক্ষা করে আসছেন। এটা একটা

অজেয় অস্ত্র, বিদ্যুৎ। এই অস্ত্রের মালিক চিরদিনের জন্য অপরাজেয়। যাই হোক, শুধু একটাই বাধা–এই তলোয়ার নিজের তার মালিক বেছে নেয়। অন্য কোনোভাবে এই তলোয়ারের শক্তি ব্যবহার করা যায় না।'

পুরোহিতরা তাদের পবিত্র জপ চালিয়ে গেলেন। দামিনী, ন্যায়না, বলভান্ত, পুরোহিতজি, গোবর্ধন এবং সনু এখন দেবতার চারপাশে জড়ো হয়েছেন।

'আপনি মনে করেন অস্ত্রটা আমাকে বেছে নেবে, বাবা?' বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করলো। সে কী করবে তা নিয়ে অনিশ্চিত অনুভব করছে।

'হয়তো নেবে, বিদ্যুৎ। হয়তো নেবে না। কিন্তু সেটা আসলে মুখ্য ব্যাপার নয়। মহান তরবারি তোমার জন্য নির্ধারিত নয়, বাছা...' মঠাধীশ উত্তর দিলেন।

এক সেকেন্ডের জন্য বিব্রত বোধ করলো বিদ্যুৎ। শেষ দেবতা হওয়ার যে সমস্ত বোঝা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তার উপর চাপানো হয়েছে, তার পর দ্বারকা শাস্ত্রীর এই শেষ বিবৃতিটি আসলেই বেশ হতাশার।

দ্বারকা শাস্ত্রী এখন অবিশ্বাসের অভিব্যক্তি নিয়ে তার প্রপৌত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন।

'তুমি এখনো কালো মন্দিরের রহস্য বুঝতে পারোনি, তাই না, বিদ্যুৎ?'

দেবতা শূন্য অভিব্যক্তি দিলো। মহামান্য বৃদ্ধ একটা ছোট হাসি দিলেন, সেই সাথে তার প্রিয় বিদ্যুতের অজ্ঞতার জন্য মৃদু বিরক্তিও প্রকাশ করলেন।

এরপর দ্বারকা শাস্ত্রী সহজভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি শাস্ত্র পড়েছ, বিদ্যুৎ। তুমি কি জানো না রত্ন-মরুর পরম কর্তা কে হবে?'

জাহাজের চারপাশের জলাভূমি, আর্যাবর্ত, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৮ অব্দ
মৎস্য-জাতির অশ্বারোহী

চারপাশে পুরোই বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে।

জাহাজের রক্ষক এবং মানব ভক্ষক দৈত্যদের মধ্যে দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ ছিলো একটা রক্তস্নাত দিন, যা ধরিত্রি মাতার হৃদয়কেও নাড়া দিয়েছে। তিনি এর আগে কখনো তার সন্তানদের এমন নির্দয় পাগলামিতে একে অপরের রক্ত ঝরাতে দেখেননি।

দৈত্যরা ক্ষুধার্ত শিকারি পাখির ঝাঁকের মতো একজনের বিরুদ্ধে পাঁচজন করে যুদ্ধ করছে। দুইজন দৈত্য প্রতিপক্ষ সৈন্যের হাত-পা চেপে ধরেছে এবং অন্য একজন তলোয়ার দিয়ে আঘাত করছে। অন্যদিকে, চতুর্থজন শত্রুর চোখ খুবলে নিতে চাইছে। পঞ্চমজন তার দাঁত দিয়ে শরীরে আক্রমণ করেছে, শত্রুকে খেতে শুরু করেছে।

যদিও হরপ্পার সৈন্য আর অসুররা ভয়ানক শক্তিশালী, তবুও দৈত্যদের সংখ্যা এবং অপ্রচলিত যুদ্ধশৈলীর কারণে তারা নরখাদকদের সাথে পেরে উঠছে না। দৈত্যদের শত শত মারা গেলে বিপরীতে জাহাজের রক্ষকদের হাজার হাজার মারা পড়ছে।

'আমাদের এভাবে চলার কোনো মানে নেই, মানু!' ধ্রুব চিৎকার করে বললো। সে আক্রমণকারী মানব ভক্ষকের ফুসফুস ভেদ করে একটা তীর ছুঁড়ে দিয়েছে এইমাত্র।

'লড়াই করতে করতে আজকের দিনটা কাটিয়ে দেবো ভাবছি...কেবল তো শুরু!' মানু উত্তর দিলো। হাঁফাতে হাঁফাতে তার চারপাশের হিংসাত্মক বিশৃঙ্খলা জরিপ করছে। সে তার সৈন্য পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে জীবিত অবস্থাতেই নরখাদকদের দ্বারা গ্রাস হতে দেখছে।

'আর কয়েক ঘণ্টা এভাবে চলতে থাকলে কোনো শেষ বা শুরু কিছুই থাকবে না, মানু!' চিৎকার করে উঠলো ধ্রুব, মানুকে কঠিন বাস্তবতা দেখাতে চাইলো।

চুপ করে রইলো জাহাজের প্রধান। সে জানে ধ্রুব ঠিক বলছে। কিন্তু সে এটাও জানতো যে এখনো তাদের সেরা সৈন্যদের ডাকার সঠিক সময় আসেনি।

'ঠিক আছে, ধ্রুব...ডাকো ওদের।'

প্রধান তীরন্দাজ মাথা নেড়ে একটা গোলাকার মাথাওয়ালা তীর বের করলো। মাথাটা রুক্ষ মাটিতে ঘষতেই লাল শিখায় জ্বলে উঠলো তীরটা। ধ্রুব সেটাকে আকাশে, জাহাজের দিকে নিক্ষেপ করলো।

এটা একটা সংকেত ছিলো।

ঐ সময় আকাশে লাল রেখা দেখতে পেয়েছে তারা। সে প্রথমে দেখে অবাক হয়ে গেল। এরপর বুঝতে পারলো যে ওরা যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে।

ওকে সর্বনিম্ন ডেকে রাখা হয়েছে। জাহাজের বাঘিনী দামিনী-সেনার একজন সেনাপতির দিকে ফিরে চিৎকার করে হুকুম দিলো তারা। 'এক্ষুনি!'

এক মুহূর্ত পরে দৈত্যরা যা দেখলো এবং শুনলো তাতে তারা হতবাক হয়ে গেল। জাহাজের নিচের মোটা কাঠের বিশাল প্ল্যাটফর্মগুলো খুলতে শুরু করেছে। বিশাল লুকোনো চেম্বারগুলোকে খোলার জন্য শক্তিশালী চেইন ব্যবহার করে জাহজের নিচের দিকের বেশিরভাগ অংশকে নিচে নামানো হলো। নরখাদকদের ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য প্রতিটি চেম্বার জাহাজের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের শত শত অশ্বারোহী বাহিনীতে পূর্ণ ছিলো।

পরাক্রমশালী মৎস্য-মানব!

* * * * *

টর্নেডোর মতো করে নিজের পথে যা কিছু দাঁড়িয়ে আছে তা ধ্বংস করে এগোচ্ছে ওরা। তাদের সাধারণ কিন্তু সুসংগত চলনে পৃথিবী কেঁপে উঠছে। মৎস্য-মানবরা ছিলো অপ্রতিরোধ্য। তাদের তরবারিগুলো এমন এক ধরনের মিশ্র ধাতু দিয়ে নির্মিত হয়েছে যা আগে কখনো কেউ দেখেনি। প্রতিবার বজ্রপাত হলে তাদের যুদ্ধের ঢালগুলো ঝলঝল করে, শত্রুকে অন্ধ করে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হলো যেন যুদ্ধের জোয়ার হঠাৎ ঘুরে গেছে। মৎস্য বাহিনীর নির্ভুল আঘাতে দৈত্যদের শিরশ্ছেদ হওয়া মাথাগুলো হাওয়ায় উড়ছে। মৎস্য-মানবেরা এরপর তাদের সারি ভেঙে পাঁচ দিকে বিভক্ত হয়ে গেল এবং কেন্দ্রের সাথে সাথে পাশ থেকেও দৈত্যদের আক্রমণ করলো।

যুদ্ধের এই হঠাৎ পরিবর্তন হরপ্পার সৈন্য ও দৈত্য উভয়ের উপরেই প্রভাব ফেলেছে। নতুন শক্তিতে আক্রমণ শুরু করেছে জাহাজের সৈন্যরা। জাহাজের রক্ষকরা সংখ্যায় কম ছিলো, কিন্তু মনে হচ্ছে যে মৎস্য-মানবের আবির্ভাব শীঘ্রই সমীকরণ পরিবর্তন করে দেবে।

'গ্ররাআআআআআআআহহহ...!'

হঠাৎ প্রচণ্ড যুদ্ধের মাঝখানে কেউ এমনভাবে গর্জন করে উঠলো যেন দশটি সিংহ একসাথে গর্জন করছে। দূর থেকে তারা যা দেখলো, তাতে মানু, ধ্রুব, সোমদত্ত ও প্রচণ্ডের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা শিহরন বয়ে গেল।

নারা-মুন্ডা অন্য জাগতিক শয়তানের মতোই গর্জন করছে। তার মাথা পেছন দিকে হেলানো, হাত প্রসারিত, কনুই বাঁকানো। তার হাতের বাইসেপ ফেটে যাওয়ার অবস্থা। আঙুলগুলো থাবার মতো করে রেখেছে।

'উউররররগগগগগররাআআআআআআআআআআআআআআআহহহ!'

এবার আরো ভয়ানকভাবে গর্জে উঠলো সে। শত্রুর খোঁজে নিজের মাথা নাড়ছে।

হাজার হাজার হৃদয় থেমে গেল। রক্ত জমাট বেঁধে গেল শিরায়। উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে সে একটা বিশাল টাইটানের মতো দাঁড়িয়ে আছে, এমনকি আরোহীদের চেয়েও উঁচুতে। তার দ্বিতীয় গর্জন যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে লড়াই কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। উভয় পক্ষের যোদ্ধারা তাদের দেবতাদের স্মরণ করতে শুরু করেছে।

* * * * *

মানু আর ধ্রুব দৃষ্টিবিনিময় করলো। যদিও তারা অন্ধকার বনের সম্রাট সম্পর্কে বেশ কিছু অদ্ভুত কিংবদন্তি এবং লোককাহিনি শুনেছে, তাদের কেউই তাকে এখনকার মতো অস্বাভাবিকভাবে ভয়ংকর বলে কল্পনা করেনি।

'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, সত্যব্রত। সে কোনো মানুষ নয়। সে একটা বিশুদ্ধ শয়তান যে এমন একটা দেহ ধারণ করেছে যা নরকেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আমাদের একে ঘিরে ধরতে হবে। অবশ্যই হত্যা করতে হবে!'

'না, ধ্রুব! সে যাই হোক না কেন...সে আমাদের শত্রুদলের নেতা। এবং সে সম্মানের সাথে লড়াই করার যোগ্য।'

'সম্মান? তুমি কি এইমাত্র সম্মানের কথা বললে? অসহায়, এতিম শিশুদের তীরের মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া একজন দানবের জন্য? যে দানব তার মিত্রদের ঘুমের মধ্যে হত্যা করে? সত্যব্রত মানু, সম্মানের সীমারেখার মধ্যে এমন একজন বদমায়েশের সাথে লড়তে চাও?' বন্ধু ও রাজার একগুঁয়ে আদর্শবাদে হতবাক ধ্রুব বিরক্ত হয়ে জবাব দিলো।

মানু শান্ত ছিলো কারণ সে তার প্রায়-অজেয় শত্রুকে দূর থেকে দেখেছে।

ও তার তরবারি টেনে নিলো। নারা-মুন্ডা যেখানে ওক গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে যাওয়ার আগে ধ্রুবর দিকে তাকালো একবার।

'আমাকে কথা দাও, ধ্রুব...যাই ঘটুক না কেন, নরখাদক রাজার সাথে আমার লড়াইয়ে তুমি হস্তক্ষেপ করবে না।'

'কিন্তু মানু...' ধ্রুব প্রতিবাদ করলো।

মানু তার নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করলো। 'মনে রেখো, ধ্রুব...যাই হোক না কেন।'

বানারস, ২০১৭

'পদর্পণম কুরু, প্রভু!'

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বিদ্যুৎ, নীল তরবারির শক্তি তাকে টানছে। ওটা এমনভাবে জ্বলজ্বল করছে যেন এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। নিজের স্মৃতি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলো কোথাও রত্ন-মরুর কথা শুনেছে কিংবা পড়েছে কি না।

কিন্তু কোনো লাভ হলো না।

'দুঃখিত, বাবা...এই শক্তিশালী অস্ত্রের কথা কোথাও পড়েছি কি না মনে করতে পারছি না। দয়া করে আমাদের জানান। এই তরবারি কার কাছে পৌঁছানোর কথা? কালো মন্দিরের এই রহস্য এত শতাব্দী ধরে কেন লুকিয়ে ছিলো?'

দ্বারকা শাস্ত্রী মাথা নাড়লেন, এখনো সরাসরি তার নাতির চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন, মানতে প্রস্তুত নন যে বিদ্যুৎ এখন পর্যন্ত সত্যের পাঠোদ্ধার করতে পারেনি। 'এই তলোয়ার কালো মন্দিরের রহস্য নয়, বিদ্যুৎ। রহস্য হলো ওটা!'

মহান মঠাধীশ আঙুল দিয়ে কোথায় ইশারা করছেন তা দেখার জন্য সবাই ঘুরে তাকালো।

তিনি তুলনামূলক কম চিত্তাকর্ষক একটা বস্তুর দিকে ইশারা করেছেন, যা শিবমূর্তির গহ্বরের নিচে প্রায় পচনশীল একটা কাঠের স্ট্যান্ডের উপর ছিলো, জ্বলন্ত রত্ন-মরুর ঠিক নিচে।

* * * * *

বিদ্যুৎ এবং তার সহযোগীরা মনোযোগ সহকারে বস্তুটি পর্যবেক্ষণ করছে, এখনো ওটা স্পর্শ করার সাহস পায়নি।

'যাও, বাছা। শুধু তুমিই এটা তুলতে পারবে। শুধু পৃথিবীর শেষ দেবতাকে নিয়েই মানব জাতির সবচেয়ে মূল্যবান রহস্য উন্মোচন করার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।'

দ্বারকা শাস্ত্রী বিদ্যুৎকে কাঠের স্ট্যান্ড থেকে অদ্ভুত বস্তুটি তুলতে আমন্ত্রণ জানালেন।

দেবতা এগিয়ে গিয়ে বস্তুটি তার হাতে তুলে নিলো। কিছু একটা ওকে সেই বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধায় হাতজোড় করতে বাধ্য করছে। আঙুলগুলো আঁকাবাঁকা কাঠামো স্পর্শ করার সাথে সাথেই বিদ্যুৎ কানের পর্দা ফাটানো একটা চিৎকার শুনতে পেল। যেন তার মন এবং আত্মার মধ্যে চিৎকার করছে একটা প্রাচীন ড্রাগন।

কিন্তু বাকিরা কেউ কিছু শুনলো না।

বিদ্যুৎ হঠাৎ বস্তুটিকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে তার বাহু প্রসারিত করলো।

'কী হয়েছে, বিদ্যুৎ?' মঠাধীশ জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি...আমি বলতে পারবো না, বাবা। মনে হচ্ছে যেন একটা আদিম সামুদ্রিক দানব আমার হৃদয়ের গভীরে গর্জন করছে...'

ওরা এখন গভীরভাবে বস্তুটিকে পর্যবেক্ষণ করছে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। এই আঁকাবাঁকা গঠনে এমন কিছু আছে যা তাদের আত্মাকে উন্নীত ও পরিশুদ্ধ করছে।

'দেখে মনে হচ্ছে কোনো এক দৈত্যাকার জন্তুর শিং,' দামিনী বললো, অব্যক্ত ভক্তিতে তার কণ্ঠ ধরে এলো।

'হ্যাঁ...কিন্তু এটাও দেখতে অনেকটা পাকানো, বিশাল সামুদ্রিক শঙ্খের মতো। এটা একটা জলজ দৈত্যের শিং!' বিদ্যুৎ চিৎকার করে বললো। অবশ্য, যা বললো তা নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

'তুমি ঠিকই বলেছ, বিদ্যুৎ। এটা ছিলো সত্যব্রত মানুর প্রতি মৎস্যের উপহার। এ হলো সেই শিঙা যার মাধ্যমে প্রাচীন পুরোহিতরাজ প্রভুকে সাহায্যের জন্য ডেকেছিলেন, প্রলয় মহাতরীটিকে গ্রাস করার সময়।'

* * * * *

'সামুদ্রিক শিংয়ের ভেতরে দেখো, বিদ্যুৎ,' দ্বারকা শাস্ত্রী বললেন।

তারপরে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে সবাইকে ইশারা করলেন পিছু হটে দেবতাকে স্থান দিতে।

বিদ্যুৎকে খুব একটা কষ্ট করতে হলো না। সে শিংয়ের ভেতরে তাকাতেই ভেতরে একটা প্যাঁচানো স্ক্রল দেখতে পেল। টেনে বের করলো ওটাকে।

স্ক্রলটা হলুদ-বাদামি রঙের। বিদ্যুৎ এর আগে এর চেয়ে পুরোনো কিছু কখনো দেখেনি। এটা এমন কিছু দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা বিদ্যুৎ কখনো অনুভব করেনি। মনে হচ্ছে যেন এটা দেবতার সাথে কথা বলছে।

'এই প্রাচীন স্ক্রল ৩৭০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে আসছে, বিদ্যুৎ। এটি আমাদের মহান পূর্বপুরুষ সত্যব্রত মানুর দ্বারা হরপ্পার

লিপিতে পুনরায় লেখা হয়েছে, যা তিনি স্বয়ং মৎস্যের নির্দেশে করেছেন,' দেব-রাক্ষস মঠের প্রধান বললেন।

বিদ্যুৎ একটা ঘোরের মধ্যে আছে। সে এখন খুব তীব্রভাবে অনুভব করছে যে সে এই কিংবদন্তির একটা অংশ। স্ক্রলটা হাতে নেওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো দেবতা তারা যেমন বলেছে ঠিক সেইরকমই অনুভব করছে।

অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ঈশ্বর।

* * * * *

'তোমাকে প্রাচীন স্ক্রলটা পড়তেই হবে, বিদ্যুৎ। সময় এসেছে, বাছা...'

'কিন্তু বাবা...আপনি বলেছেন এটা হরপ্পার ক্যালিগ্রাফিতে আছে। আমার কথা বাদ দিন, ইতিহাসের কেউ এই আদিম লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেনি,' দেবতা দ্বিধান্বিতভাবে বললেন।

মন্ত্রের বধির করা জপ এবং করতালের সংঘর্ষ অবিরাম চলতে থাকলো।

পুরো কলিযুগের পবিত্রতম সময়টিকে উদ্‌যাপন করে পুরোহিত এবং সাধুরা এখন উন্মত্ততায় ভুগছেন। দ্বারকা শাস্ত্রী আবার তার শঙ্খ তুললেন, উচ্চ স্বরে প্রতিধ্বনিত কণ্ঠে বললেন, 'এটা খুলুন, পড়ুন এবং মানব জাতির গৌরব ও মঙ্গলের রহস্য উদ্‌ঘাটন করুন!

'স্ক্রলটি আপনার কাছে নিজেকে প্রকাশ করবে, হে দেবতা! ভবিষ্যদ্বাণীতে এটাই বলা আছে!

'পড়ুন, তারপর নতুন ভোরকে স্বাগত জানান!

'পড়ুন, এরপর রক্তধারার অভিশাপের অবসান ঘটান!

'হে পরাক্রমশালী দেবতা, পড়ুন, তারপর কালো মন্দিরের প্রাচীন রহস্য উন্মোচন করুন!'

দ্বারকা শাস্ত্রী হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। এমনভাবে বাহু প্রসারিত করলেন যেন কোনো ঐশ্বরিক শক্তির কাছে অনুরোধ করছেন। নিঃশব্দ ভক্তির সাথে চিৎকার করলেন, 'পদর্পণম কুরু, প্রভু!'

দেব-রাক্ষস মঠের মোহাবিষ্ট পুরোহিত এবং সাধুরা উচ্চ স্বরে তার পেছনে পুনরাবৃত্তি করলেন, 'পদর্পণম কুরু, প্রভু!'

'হে প্রভুদের প্রভু, নিজেকে উপস্থাপন করুন!'

বিদ্যুৎ এমন ঐশ্বরিক, অতীন্দ্রিয় প্রাণশক্তিতে জ্বলছে যা সে আগে কখনো অনুভব করেনি। সে অনুভব করছে যে সে ঈশ্বরের সাথে একীভূত হয়ে গেছে।

আদিম ভবিষ্যদ্বাণীতে যেভাবে বলা আছে ঠিক সেভাবে রোহিণী নক্ষত্রের পবিত্র সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পৃথিবীর শেষ দেবতা প্রাচীন স্ক্রলটি উন্মোচন করলো।

জাহাজের চারপাশের জলাভূমি, আর্যাবর্ত, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৮ অব্দ
গন্ধক

জাহাজের ডেকগুলো এখন বিশাল, অস্থায়ী ধর্মশালা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ এত পরিমাণ অসুস্থ মানুষজন আছে যে জাহাজের হাসপাতালে জায়গা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পতিত, আহত এবং বিকৃত সৈন্যদের কান্নার কারণে কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়ছে। যদিও মৎস্য-মানবদের আকস্মিক আক্রমণে দ্বিতীয় দিনের সমীকরণ ঘুরে গেছে, কিন্তু ওরা ইতোমধ্যেই অনেক লোক হারিয়ে ফেলেছে। প্রথম দিনটি ছিলো জাহাজবাসীদের। কিন্তু দ্বিতীয় দিনটি দৈত্যরা নিজেদের করে নেয়।

সবাই বলতে পারে যে যুদ্ধ তৃতীয় দিনের বেশি স্থায়ী হবে না। তাদের পরেরবারের যুদ্ধই হবে চূড়ান্ত লড়াই।

এই যুদ্ধ আগামী কাল তার বিজয়ী খুঁজে পেতে যাচ্ছে। তাছাড়া, যুদ্ধের ময়দানে দৈত্যদের যুদ্ধের পরাক্রম এবং পাগলামি নিষ্ঠুরতা দেখার পরে মানু জানতো যে তারা পরের দিন হেরে গেলে দামিনী-সেনারা শক্তিশালী দৈত্যদের বিরুদ্ধে সম্ভবত কয়েক ঘণ্টার বেশি জাহাজটিকে রক্ষা করতে পারবে না।

এমনকি নারা-মুন্ডার ভয়ংকর হাতে জাহাজের হাজার হাজার পুরুষ, মহিলা এবং শিশুর পড়ার চিন্তাও পুরোহিতরাজকে তার আগের চেয়ে আরো বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তার উপরে দুটি জিনিস এখন জাহাজের বাহিনীর বিরুদ্ধে ছিলো।

মৎস্য-মানবদের দ্বারা দৈত্যদের অবাক করার যে ব্যাপারটি তা ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। দৈত্যরা পরের দিন তাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

এবং জাহাজের সৈন্যরা নারা-মুন্ডাকে তার সবচেয়ে ভয়ংকর মহিমায় দেখেছে। ফলস্বরূপ, তাদের মনোবল একদম শেষ সীমায় চলে গেছে। জাহাজের নেতাদের কেউ কিছু বলছে না। কিন্তু গুঞ্জনটা স্পষ্ট।

নারা-মুন্ডা অপরাজেয়।

* * * * *

ওরা একে অপরের থেকে আধা মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে গর্জন-তর্জন করতে থাকা মাংসের জন্য ক্ষুধার্ত দৈত্যরা। অন্য দিকে জাহাজের ক্ষতবিক্ষত, সংখ্যায় কম, দৃঢ়চিত্ত সৈন্যরা।

মহাপ্রলয় সব গ্রাস করে নেওয়ার আগে এটাই শেষ যুদ্ধ। বন্যার জল এখন বিশাল জাহাজের চারপাশের জলাভূমিতে পৌঁছে গেছে। উভয় দলের সৈন্যরা এখন হাঁটুপানিতে দাঁড়িয়ে আছে। যা স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিলো।

ভয়ংকর ঢেউয়ের গর্জন খুব ভালোভাবেই শোনা যাচ্ছে। জলের পর্বত, যা ইতোমধ্যে আর্যাবর্তকে ধ্বংস করেছে, তার অগ্রভ বার্তাবাহক হিসেবে বাতাসের গতি দ্রুত বাড়ছে।

উভয় বাহিনীর সৈন্যরাই প্রাণপণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। কোনো রাজ্য রক্ষা বা দখল করার উদ্দেশ্যে নয়। দেশপ্রেম কিংবা লুটপাটের জন্য নয়।

উভয় পক্ষের সৈনিকদের পেছনে তাদের সন্তান, তাদের স্ত্রী এবং তাদের বৃদ্ধ পিতামাতা ছিলো। তাদের কাছে জয়ের কোনো বিকল্প নেই। কারণ পরাজয়ের মানে হবে শুধু তাদের নিজেদের শেষ নয়, তাদের প্রিয়জনের নিশ্চিত মৃত্যু।

আর এটাই ছিলো সর্বোচ্চ, উন্মত্ত প্রেরণা, যা উভয় বাহিনীকে সামনের দিকে চালনা করছে।

এক নজিরবিহীন রক্তপাত হতে চলেছে আজ।

* * * * *

সোমদত্তের নির্দেশে মৎস্য-মানবদের একটা দল নারা-মুন্ডার দিকে মোড় নিলো। জাহাজের সৈন্যরা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু একটা উদ্দেশ্য নিয়েই আলোচনা করেছে–যেকোনো মূল্যেই হোক নারা-মুন্ডাকে থামাতে হবে। তারা যে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে, নারা-মুন্ডার মতো একটা জানোয়ার তার গতিপথ পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট। সে একাই পুরো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। সে চাইলেই জাহাজের যেকোনো কমান্ডারকে হত্যা করতে পারে, জাহাজের যোদ্ধাদের মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের শিহরন জাগাতে পারে। নিজের নরখাদক যোদ্ধাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য সে একাই যথেষ্ট। তার বর্বর রণকৌশল শত্রুকে পঙ্গু করে দেয়, শত্রুর আত্মাকে হিমায়িত করে ফেলে।

মনু, তারা, ধ্রুব, সোমদত্ত এবং প্রচণ্ড খুব ভালো করেই জানতো, যদি নারা-মুন্ডা আজ বেঁচে থাকে, তাহলে জাহাজ চিরতরে হারাতে হবে।

* * * * *

কয়েক মাইল দূর থেকেই তাকে দেখা যাচ্ছে। সে জাহাজের সৈন্যদের চিরে ফেলছে, ছুঁড়ে মারছে, পিষে মারছে নিজের দানবীয় পায়ের নিচে। তার চার পাশের মাটি পরিণত হয়েছে মৃত মানুষের তাজা রক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত একটা গর্তে।

মৎস্য-মানবদের দল অন্ধকার বনের সম্রাটকে চ্যালেঞ্জ করার এবং তাকে শেষ করার মিশন নিয়ে এগিয়ে গেল।

অতীতে ওরা খুব কম যুদ্ধেই হেরেছে। কিন্তু মৎস্য-মানবদের বাছাই করা অশ্বারোহীরাও নরখাদক প্রধানের নৃশংস শক্তি এবং দক্ষতাকে অবমূল্যায়ন করে ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে। যখন ওরা তাকে বের করে এনে ঘিরে ফেলতে সক্ষম হলো, নরখাদক শয়তান তখন ক্ষিপ্ত হাসিতে ফেটে পড়লো। নির্ভীকতার উন্মাদ প্রদর্শনীতে নিজের মাথায় নিজেই চাপড় মারছে এখন। পর মুহূর্তেই তার উচ্ছ্বসিত মুখ পুনরায় বর্বর রূপ ধারণ করলো। দৈত্যদের সম্রাট পানির নিচে হাত ডুবিয়ে বিশাল একটা গাছের কাণ্ড বের করে এনেছে এইমাত্র।

* * * * *

কেউ এভাবে একটা ওক গাছের কাণ্ড হাতে করে এমন স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে তা জাহাজের কমান্ডারদের কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। নারা-মুন্ডার পেশির শিরাগুলো কাঁপছে। গাছের কাণ্ডটিকে একটা সাধারণ দাঁত খিলানের মতো করে ঘোরাচ্ছে সে। শুধু একটা আঘাতেই মৎস্য-মানবদের বিশজন আরোহীকে ঘায়েল করে ফেললো। তাদের বুক ও পাঁজরের হাড় ভেঙে গেল মুহূর্তের মধ্যে। গুঁড়ো হয়ে গেল তাদের মাথার খুলি ও কাঁধের হাড়। কয়েক মিনিটের মধ্যে নরখাদকদের রাজা মৎস-মানবদের দলটিকে ধ্বংস করে ফেললো। তার অদ্ভুত অস্ত্র মৎস্য-মানবদের বর্মগুলোর মতোই চুরমার করে ফেললো ঘোড়ার খুলিগুলোকে।

ব্যাপারটা এখন সবার কাছেই স্পষ্ট। মৎস্য-মানবদের রক্ত দিয়েই তা লেখা হয়ে গেছে।

রাক্ষস নারা-মুন্ডা হলো নরকের আশ্রয়দাতা।

সে-ই হতে যাচ্ছে মহাতরীর ভবিষ্যৎ রাজা। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রভু।

* * * * *

‘গন্ধকের বিধ্বংসী শিখার সামনে সে দাঁড়াতেও পারবে না, ধ্রুব...’

ধ্রুবর পুরো শরীর রক্তে মাখা, কিছুটা তার নিজের ক্ষত থেকে আসা এবং বাকিটা দৈত্যদের কেটে যাওয়া ধমনি থেকে।

দুই মহিমান্বিত ব্যক্তি, যারা একসাথে মানব জাতিকে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বেঁচে থাকার পথে টেনে নিয়েছিলো, তাদের হতাশা এখন পরিমাপের উর্ধ্বে চলে গেছে। সেই চূড়ান্ত অস্ত্রের দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই, যা তিনি তাদের জন্য রেখে গেছিলেন।

মৎস্যের সেই গণবিধ্বংসী অস্ত্র।

গন্ধক।

বানারস, ২০১৭

'তিনি এখানেই আছেন...'

বিদ্যুৎ অনুভব করছে যে সে মহাকাশে ভ্রমণ করছে; এই ভ্রমণ সময়ের মধ্য দিয়ে, ছায়াপথের ভেতর দিয়ে। জন্ম ও মৃত্যু, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব ও নবজাগরণ পার হয়ে সাধু এবং শয়তান, পরিবার এবং ভাগ্যের সাথে সাক্ষাৎ করছে। তার মনে হচ্ছে সে বহুবার মারা গেছে, বিভিন্ন জগতে আবার জীবিত হয়েছে। মনে পড়ছে অনেক মায়ের সুবাস, অনেক প্রেমিকার চুম্বন, সন্তানদের হাসি, হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের ক্ষোভ। তার সুখী ঘরবাড়ি আর নোংরা গোরস্থান, রাজাদের দরবার এবং সন্ন্যাসীদের কুঁড়েঘর।

তার মনোনীত আত্মা সময়, জগত এবং দূরত্বের রাজ্যের বাইরে মহাবিশ্ব জুড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

আর এইসবই ঘটছিলো যখন বিদ্যুৎ তার কাঁপতে থাকা হাতে ধরে রাখা পবিত্র স্ক্রলে লেখা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অক্ষরগুলোতে চোখ রেখেছে।

'আমি...আমি...কিছুই বের করতে পারছি না, বাবা...' সে হাঁফাচ্ছে।

দ্বারকা শাস্ত্রী প্রার্থনা-মন্ত্রের ঘোরের কারণে তার প্রিয় প্রপৌত্রের কথা শুনতে পাননি। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছেন। তিনি চোখের ইশারায় দেবতাকে আরো ভালো করে ও কাছ থেকে দেখতে অনুরোধ করলেন।

'তোমার আত্মার চোখ দিয়ে পড়ো, বিদ্যুৎ...'

মঠাধীশ কিছু বলেননি। কিন্তু বিদ্যুৎ মনে মনে এই কথাগুলো শুনতে পেয়েছে।

* * * * *

বিদ্যুৎ আবার ক্রলের দিকে তাকালো, যে আধ্যাত্মিক শক্তি তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, তার কারণে আবারো তার মাথা ঘোরার বোধ হলো।

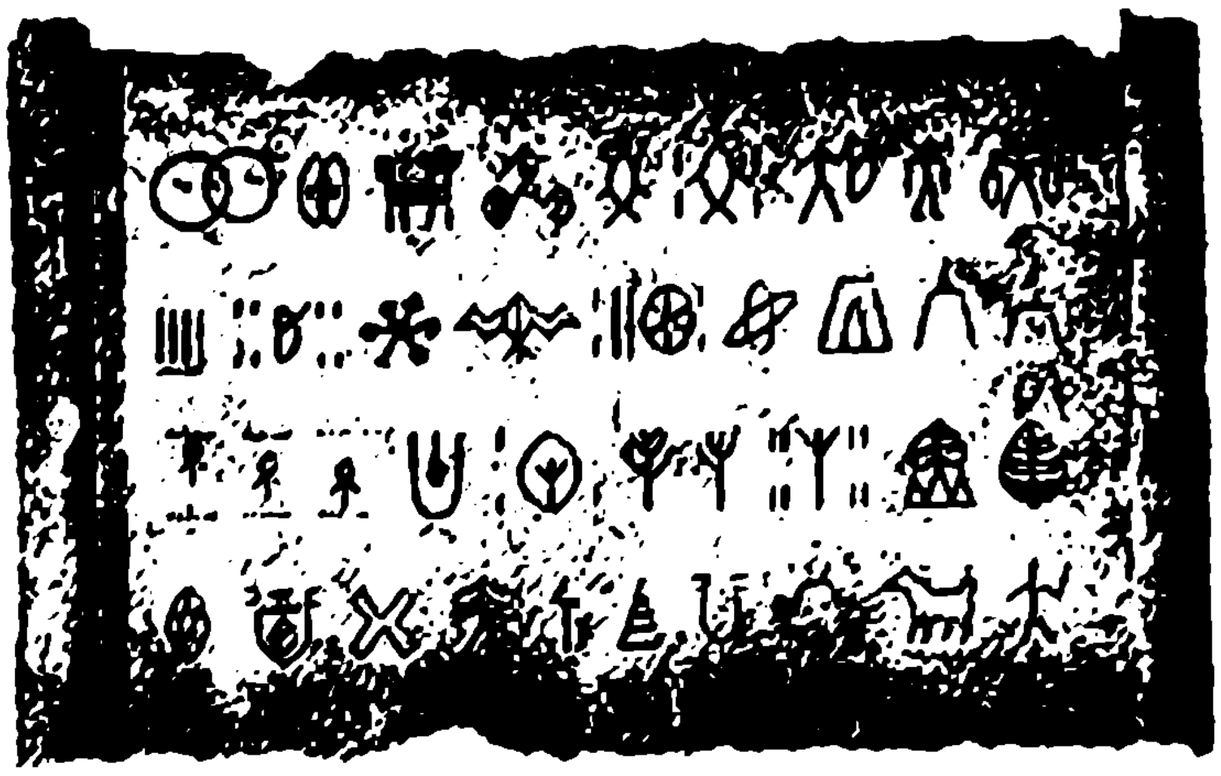

তার মনে বিদ্যুতের মতো জ্বলে উঠলো অদ্ভুত সব দৃশ্য। সে দেখতে পেল একটা বিশাল প্রলয় একটা দুর্দান্ত শহরকে গ্রাস করছে। সে একটা মৃত মহিলার ক্ষীণ হাসি দেখতে পেল, যাকে তীর দ্বারা আঘাত করা হয়েছে। নিজেকে ছাইয়ে ঢাকা অসংখ্য যোদ্ধার দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় দেখতে পেল। একটা সুখী পরিবার একসাথে পুরি এবং ক্ষীরের ভোজ উপভোগ করছে। একজন অসাধারণ সুন্দরী নর্তকী চমৎকার একটা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছে। সে একটা ভূতুড়ে গুহায় তিনজন অন্ধ কালো জাদুকরকে পৈশাচিক শ্লোকগুলো উচ্চারণ করতে দেখলো। একজন লোক চিৎকার করে বলছে, 'পূর্ব দিকে যাত্রা করুন...কালো মন্দির খুঁজুন।' একটা ঝাপসা পাহাড়, যেখানে শিবের একটা বিশাল মূর্তি রয়েছে। সে নিজেকে পাহাড় থেকে পড়ে যেতে দেখলো, ইট এবং ব্রোঞ্জের তৈরি পাহাড়ের মধ্যে তীর নিক্ষেপ করছে। নিজেকে দেখলো রক্ত, ঘাম ও থুতুতে ভিজে থাকা অবস্থায় একটা প্রাগৈতিহাসিক অঙ্গনে আপামর জনতার দ্বারা নির্যাতিত হতে। অট্টহাসিরত বিচারকদের একটা আদালত কক্ষ। এক শিংওয়ালা ষাঁড়সহ একটা মাটির সিল। অন্ধকূপে মানুষের আর্তনাদ। তীব্র নীল আগুন। মানুষের ধারণার বাইরে এক বিশাল জাহাজ।

একজন শক্তিশালী রোমান সম্রাট। আর তারপর সে তাকে দেখতে পেল। একটা মুখ...তার থেকেও বেশি সুদর্শন...আনন্দে হাসছে। মাছের সোনালি-নীল চামড়ার এক অবর্ণনীয় মানুষ! বিদ্যুৎ অসাধারণ মৎস্য-মানবকে শিবের কালো গুহা-মন্দিরে দেখলো, অবিচ্ছেদ্য বন্ধুর মতো তার সাথে ঠাট্টা করছে সে। আগুনের পাশে বসে পরিবারের সদস্যের মতো একসাথে পোহা খাচ্ছে। একজন কঠোর পরামর্শদাতার মতো মহাপ্রলয়ের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করছে, 'প্রলয়...আসীৎ...।' এরপর সে দেখতে পেল নীল মৎস্য-মানব একটা উঁচু পাথরের উপরে বসে আছে, গর্জন করছে আকাশের দিকে মুখ করে, অবতারদের অবতারের মতো জ্বলজ্বল করছে।

চোখ খুললো শেষ দেবতা। প্রাচীন স্ক্রলটির দিকে তাকালো। লেখাগুলোতে অলৌকিকভাবে প্রাণ এসে পড়ায় তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে।

দেবতার কাছে এখন সবকিছু পরিষ্কার। সে সব বুঝতে পারছে।

এই দিনটির ভবিষ্যদ্বাণী করার ৩৭০০ বছর পর অবশেষে বিদ্যুৎ কালো মন্দিরের রহস্য উন্মোচন করলো।

* * * * *

সে ভগবান শিবের মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করলো। যদিও দেবতা অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁদছে, একটা ঘোরের মধ্যে আছে।

পুরো কাশী এখন উৎসবমুখর হয়ে পড়েছে। তারা জানতো না কী বা কাকে স্বাগত জানাচ্ছে। কিন্তু রোহিণী নক্ষত্র এখন শীর্ষে। বানারসের পবিত্র পুরুষরা জানতো দেব-রাক্ষস মঠ আনন্দ করছে...শতাব্দী পর! এর শুধু একটাই অর্থ।

ত্রাণকর্তা এসে পড়েছেন!

দামিনী বিদ্যুৎ থেকে আর দূরে থাকতো পারলো না। সে তার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বোঝা ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। সামনের দিকে পা বাড়াতেই কিছু একটা দেখে জমে গেল দামিনী। বিদ্যুতের সামনে এক অতি বৃদ্ধ অথচ অতীন্দ্রিয় চেহারার যোগী এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ভয়ংকর ও উপকারী উভয়ই ছিলেন। দামিনী তার চামড়ার দিকে তাকিয়ে হাঁফিয়ে উঠলো। ঠিক সাপের মতো! কিন্তু তার ভয় বাষ্প হয়ে গেল যখন সে অদ্ভুত, বিশাল, আঁশযুক্ত মানুষটিকে গভীর ভালোবাসা এবং আশীর্বাদে বিদ্যুতের মাথায় হাত বুলাতে দেখলো। সর্প-মানবের চোখে একধরনের কোমলতা আছে, যেন তিনি তার নিজের সন্তানকে আদর করছেন।

'এখানে এসো, মা...' বললেন দ্বারকা শাস্ত্রী। তাকে অনেক ক্লান্ত, কিন্তু পরম তৃপ্ত দেখাচ্ছে।

তার জীবনের উদ্দেশ্য আজ পূরণ হয়েছে।

* * * * *

'তিনি এখানেই আছেন, দামিনী...এখানেই...' বিদ্যুৎ তার আত্মার সাথীর কানে কানে বললো। তাকে চেপে ধরে রেখেছে মেয়েটা।

'হ্যাঁ, বিদ্যুৎ...ঠিক আছে...এখন না, পরে বলো...' জবাব দিলো দামিনী। তার জন্য বিদ্যুতের মঙ্গল ছিলো মহাবিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান গোপনীয়তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

'কেন আমি আরো তাড়াতাড়ি বুঝতে পারলাম না, দামিনী?' দেবতা বলে চললো। মাথা নত করে আছে, তার অশ্রু শিবমূর্তির পায়ে পড়ছে। দামিনীর বাহু তখনো জড়িয়ে আছে তার দেবতার চারপাশে।

'কী বুঝতে পারোনি, বিদ্যুৎ? এখানে কে ছিলো, প্রিয়তম?' সে জিজ্ঞেস করলো। বুঝতে পেরেছে যে বিদ্যুৎ তার সাথে কালো মন্দিরের রহস্য ভাগ করে নিতে চায়।

'তিনি এখানেই আছেন, দামিনী...এই কিছুক্ষণ আগে এসেছেন...পবিত্র নক্ষত্রমণ্ডলীর চূড়ান্ত অবস্থায়...বিষ্ণু...'

সুন্দরী দামিনী বুঝতে পারছে না বিদ্যুৎ কী বলছে। সে তাকে আবার জিজ্ঞেস করলো, এবার মৃদু স্বরে।

'এখানে কে আছেন, প্রিয় দেবতা? কালো মন্দিরের রহস্য কী, বিদ্যুৎ?'

বিদ্যুৎ ওর দিকে তাকালো। দেবতার চোখ অন্য রকম লাগছে। সেগুলো এই মুহূর্তে বেশ আলোকিত।

'কল্কি...' খুব কম শব্দে জবাব দিলো সে। 'পাপীরা যার ভয়ে থাকে, পুণ্যবানরা যার প্রতীক্ষায় থাকে...বিষ্ণুর সেই দশম অবতার পৃথিবীতে এসেছেন, দামিনী। কল্কি অবতারের জন্ম হয়েছে।'

পৃথিবীর কেউ এর আগে এত আগুন দেখেনি।

সবকিছু পুড়ে যাচ্ছে। আগুনে জ্বলছে নরখাদক সৈন্যরা। তাদের ঘোড়াগুলো ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। গলে যাচ্ছে ধাতব তলোয়ার। চারপাশে এত তাপ যে তা সূর্যের সাথেই কেবল তুলনীয়।

অন্ধকার ঝড়ের রাত এমনভাবে আলোকিত হলো যে মনে হচ্ছে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের বিস্ফোরণ ঘটছে। যুদ্ধের ময়দানে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হলো তাতে দৈত্যরা ভীত হয়ে পড়েছে, ছুটে পালাচ্ছে। আগুনের এই বৃষ্টি তারা আগে কখনো দেখেনি। এমনকি জাহাজের সৈন্য এবং কমান্ডাররাও কখনো এমন নারকীয় বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করেনি। এ ছিলো অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য কিছু।

জাহাজের ডেক থেকে অগ্নিপিপাগুলো উড়ে যাচ্ছে। রাতের আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, দৈত্য রেজিমেন্টের মাঝে বিস্ফোরিত হয়েছে কানফাটানো শব্দে, মুহূর্তের মধ্যে তাদের শত শতকে পুড়িয়ে দিয়েছে। নারা-মুন্ডা এবং তার জেনারেল ডুন্ডা কিছুক্ষণের জন্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, কী ঘটছে তা বুঝতে পারছে না।

নরকের আগুনের এত বড় গোলাগুলো কীভাবে একের পর এক মহাতরী থেকে উড়ে আসতে পারে, তাদের সৈন্যদের পুড়িয়ে ফেলতে পারে, তাদের সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করতে পারে?

এক ঘণ্টা কি তারও কম সময়ের মধ্যে যুদ্ধের মোড় আবার ঘুরে গেল এবং নিখুঁত সমতায় পৌঁছে গেল।

বর্তমানে এটা যে-কারো যুদ্ধ।

একটা যুগান্তকারী সত্য জাহাজের রক্ষকদের কাছে স্পষ্ট ছিলো। এরা আগুনকে খুব ভয় পায়। দৈত্যরা অপ্রত্যাশিতভাবে, অস্বাভাবিকভাবে আগুনকে ভয় পেয়েছে!

মৎস্য এটা জানতেন। তিনি জাহাজকে গন্ধক দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। আর এর কথা আর্যাবর্ত জুড়ে এর আগে কেউ কখনো শোনেওনি।

তিনি মানু এবং ধ্রুবকে বিশাল নিক্ষেপক তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, যা শত্রু দলের উপর গন্ধকভরা পিপা ছুঁড়তে পারে।

এই প্রথম মহাতরী আর তার বাসিন্দাদের রক্ষা করলেন মৎস। কিন্তু এবারই শেষ নয়।

* * * * *

অন্ধকার অরণ্যের সম্রাটের নিজেকে গুছিয়ে নিতে এবং নিজের চিরাচরিত হিংস্র রূপে ফিরে যেতে খুব বেশি সময় লাগলো না। সে তার ভয়ংকর কণ্ঠে, যা শুনতে সিংহের গর্জন ও হাতির ডাকের মিশ্রণের মতো লাগছে, নিজের সমগ্র নরখাদক সেনাকে পুনরায় লড়াইয়ের জন্য ডাকলো।

উভয় বাহিনীই আবার একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করলো, এবার নতুন উদ্যমে। ধাতুর সাথে ধাতুর সংঘর্ষ, তলোয়ারের সাথে তলোয়ার, বর্মের উপর বর্শা, ঢালের উপর রণ-কুঠারের বধীর করা শব্দ।

'আসুন আমরা নারা-মুন্ডার কাছে একজন বার্তাবাহক পাঠাই, শান্তি চুক্তির প্রস্তাব নিয়ে,' মানু সোমদত্তকে বললো। তিনি মানুর ঠিক পাশে তার ঘোড়ার উপর আছেন। দুজনেই এখন জ্বলন্ত যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করছে।

'কী?' ধ্রুব হস্তক্ষেপ করলো। সত্যব্রত মানুর ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো সে। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মানু? তুমি এই দানবের সাথে শান্তি চুক্তি করতে চাও?'

'দেখো ধ্রুব, আমি জানি ঐ পশুর কাছ থেকে কোনো সভ্য প্রতিক্রিয়া আশা করাটা পাগলামি। তবে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমাদের অবশ্যই শান্তির সুযোগ দিতে হবে। এ সময় তার লোকজনের উপর অগ্নিগন্ধকের ঝড় বয়ে গেছে। এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ হতে পারে। সে যদি শান্তিপূর্ণ মিমাংসা করতে রাজি হয়, তবে আমরা দৈত্য আর তাদের পরিবারসহ হাজার হাজার মানুষের জীবন বাঁচাতে পারবো।'

ধ্রুব জানতো মানু ঠিকই বলছে।

এমনকি এখনো তাদের এই যুদ্ধে জেতার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। কেবল শান্তি চুক্তিই এখন এই দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটাতে পারে। কিন্তু সে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে জানতো যে নারা-মুন্ডা বন্ধুত্বপূর্ণ বা শান্তির মানুষ নয়। সে আসলে মানুষই না।

অন্যদিকে, সোমদত্ত মানুর প্রস্তাবে অনেক গুরুত্ব খুঁজে পেলেন। আর তাই পুরোহিতরাজের সমর্থনে কথা বললেন তিনি।

'দস্যুরা মারা যাওয়ায় এবং দৈত্য বাহিনীর অর্ধেক ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তাদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে গেছে। আমরাও হাজার হাজার লোক হারিয়েছি। এই নতুন পরিস্থিতিতে আমরা মহাতরীতে বাকি দৈত্যদের তুলে নিয়ে তাদের সাথে মানিয়ে চলতে পারি।'

ধ্রুব এবার ঘুরে দুই আরোহীর মুখোমুখি হলো। তার ক্ষোভ একদম স্পষ্ট ছিলো। 'ওদের সাথে মানিয়ে চলা? আমি কি আপনাকে সত্যিই এই কথাটা বলতে শুনলাম, সোমদত্তজি?'

সোমদত্ত ও মানু উভয়কেই শান্ত দেখাচ্ছে। ধ্রুব তার দুই সহযোগীকে শান্তি চুক্তির প্রচেষ্টার অসাড়তা এবং সেই সাথে মহাতরীতে দৈত্যদের থাকার প্রভাব সম্পর্কে বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে গেল।

'আপনি কি ভুলে গেছেন, হে জ্ঞানী সোমদত্তজি, ওরা নরখাদক!' সে চিৎকার করে বললো। অবাক হয়ে গেছে যে তার সরল যুক্তি তারা বুঝতে পারছে না। 'তারা আপনার আর আমার মতো মানুষদের ধরে ধরে খায়। আপনি যা বলছেন তা অনেকটা একদল নেকড়ে আর একদল ভেড়াকে একসাথে রাখার মতো শোনাচ্ছে।'

* * * * *

তিনজনেই চুপ করে রইলো। মানু আর সোমদত্তের ঘোড়ার সামনে পায়চারি করছে ধ্রুব, যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে ওদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে।

'আমি এ নিয়ে ভালো করেই ভেবেছি,' মানু কয়েক মিনিট পর সতর্কতার সাথে বললো। 'আমরা নারা-মুন্ডাকে তাদের নারী, শিশু আর আহতদেরকে জাহাজের প্রধান ডেকে রাখার প্রস্তাব দেবো। তার যোদ্ধা বাহিনীকে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে এবং জাহাজের কারাগারে রাখতে রাজি হতে হবে। এভাবে আমরা নিজেদের লোকদের বাঁচাবো, দৈত্যদের নিরপরাধ নারী ও শিশুদের বাঁচাবো এবং দৈত্য যোদ্ধাদেরও বন্দি রাখবো। বিনিময়ে দৈত্যরা প্রলয়ের মধ্যে বাঁচতে পারবে, যদি বিশাল জাহাজটা সত্যিই টিকে থাকতে পারে।'

সোমদত্ত মানুর দিকে ফিরে সম্মতি জানালেন। ধ্রুব দূরে তাকিয়ে রইলো, আপাতদৃষ্টিতে বিপর্যয়কর এই সিদ্ধান্তটি হজম করতে পারেনি।

* * * * *

অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো যে সোমদত্ত দৈত্যরাজের কাছে যাবেন। মানু, ধ্রুব এবং প্রচণ্ডের প্রতিরোধ সত্ত্বেও বিজ্ঞ স্থপতি জোর দিয়েছেন যে তারই শান্তির দূত এবং আলোচক হওয়া উচিত। পদমর্যাদায় এর চেয়ে কম কাউকে পাঠানোর কোনো সুযোগই নেই। কম প্রভাবশালী কারো কথা নারা-মুন্ডা কখনো আমলে নেবে না।

ধ্রুবকে অবাক করে দিয়ে নারা-মুন্ডা কথা বলতে রাজি হয়ে গেল।

পিছু হটলো উভয় সৈন্যদল, সারিবদ্ধ হয়ে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়ালো। মাঠে উপস্থিত প্রতিটি আত্মা, তা সে দৈত্য শিবিরেই হোক আর জাহাজের উপরেই হোক, মনের গভীরে কোথাও শান্তির আশা করছে। যুদ্ধটা অনেক বেশি ভয়ংকর এবং বিধ্বংসী ছিলো। খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক সৈনিকের বেদনাদায়ক মৃত্যু হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ অসহ্য যন্ত্রণায় কান্নাকাটি করছে। এদিকে মহাপ্রলয় কড়া নাড়ছে ওদের দ্বারে।

সবাই আশা করছে যে সোমদত্ত এবং নারা-মুন্ডার মধ্যকার আলোচনা এই যুদ্ধের অবসান ঘটাবে।

নারা-মুন্ডা মাঠের মধ্যে চলে গেল। তার সাথে কোনো অস্ত্র ছিলো না। সবাইকে অবাক করে দিয়ে আট-নয় বছরের দশটি শিশু তার সাথে ছিলো। দৈত্য সম্রাটের কাছ থেকে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির এমন নিদর্শন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিলো। সোমদত্ত ধ্রুবর দিকে ফিরে আশান্বিত হাসি দিলেন। নারা-মুন্ডা এসেছে বাচ্চাদের নিয়ে।

অবশেষে শান্তির একটা সুযোগ হলো।

কিন্তু মানু ও সোমদত্ত দুজনেই ভুলে গেছে। রক্তধারার অভিশাপ ভুলে গেছে তারা।

'ঈশ্বর তোমাকে তোমার ঘৃণ্য নিয়তি থেকে মুক্তি দেবেন না। সহিংসতা এবং রক্তপাতের সাপগুলো মানব জাতির উপর তাদের শ্বাসরোধ করা বাঁধন কখনোই শিথিল করবে না। তারা যেই ঈশ্বরের সাথে আজ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সেই ঈশ্বরের নামেই একে অপরকে হত্যা ও ধ্বংস করবে! গণহত্যা ও বর্বরতা কখনো তোমার সঙ্গ ছাড়বে না। এটা আমার অভিশাপ, হে পতিত দেবতা! মানব জাতি তাদের শেষ পর্যন্ত সীমাহীন যন্ত্রণা ভোগ করবে।

'আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম!

'আমি তোমাদের সবাইকে অভিশাপ দিলাম!'

বানারস, ২০১৭

‘ওরা তোমাকে ধরার জন্য আসছে, বিদ্যুৎ’

তারা শিবের পায়ের কাছে আচারের আগুনের চারপাশে বসলো। বিদ্যুৎ, দামিনী, দ্বারকা শাস্ত্রী এবং তাদের সবার উপরে একটু লম্বা ব্যবধানে ভয়ংকর শেষনাগ। ন্যায়না, পুরোহিতজি, সনু, বলভান্ত এবং গোবর্ধন শ্রদ্ধায় তাদের হাত গুটিয়ে কয়েক ধাপ দূরে বসে ছিলো। কয়েকজন বিশ্বস্ত সাধুও চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলেন। কালো মন্দিরে উপস্থিত প্রত্যেকে এখন পবিত্র অবতারের ভালোবাসা আর সর্বশক্তিতে হারিয়ে গেছে।

বিদ্যুতের হাতে প্রাচীন স্ক্রল। মৎস্য এবং মানুর স্ক্রলে খোদাই করা সংক্ষিপ্ত অথচ অমূল্য তথ্য এখন বিদ্যুতের আত্মায় খোদাই করে রাখা হয়েছে। সে এখন বুঝতে পেরেছে কেন নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই রহস্য খুঁজছিলো।

দ্বারকা শাস্ত্রী এবং শেষনাগ পূজার শিখায় নৈবেদ্য ছুঁড়ে দিচ্ছেন। এমন মন্ত্র উচ্চারণ করছেন যা এমনকি বিদ্যুৎ আর পুরোহিতজির মতো দক্ষ যোগী আর তান্ত্রিকরাও কখনো শোনেনি। এগুলো হচ্ছে গোপন, উন্নত শ্লোক, যা বিশ্বের মাত্র দুইজন অতি বৃদ্ধ লোকের জানা ছিলো। আর তারা দুজনেই আচারের আগুনের পাশে বসে আছেন। মন্ত্রগুলো এতই শক্তিশালী যে মনে হচ্ছে যেন দৈব শব্দগুলো কর্পূর বোঝাই যজ্ঞ-আগুনের ধোঁয়ার সাথে উঠে সরাসরি ভগবান বিষ্ণুর স্বর্গীয় আবাস বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত চলে যাচ্ছে।

* * * * *

‘এখনই অগ্নিতে পবিত্র স্ক্রলটি অর্পণ করো, বিদ্যুৎ,’ দ্বারকা শাস্ত্রী নির্দেশ দিলেন।

বিদ্যুৎ ইতস্তত করলো। যে কয়েক মিনিট সে এটাকে হাতে ধরে রেখেছিলো, দেবতার মনে হচ্ছে সে সময়ের মধ্যেই স্ক্রলটি এবং তাতে থাকা স্বর্ণলিপির সাথে তার একটা গভীর বন্ধন তৈরি হয়ে গেছে।

'এটাকে এখন এখানেই যেতে হবে, বিদ্যুৎ...কারণ এখান থেকেই এটা এসেছে। কালো মন্দিরের রহস্য এখন শুধু তুমিই জানো। আসলে তুমিই এখন কালো মন্দিরের রহস্য!'

দামিনীকে খুব বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। সে বিদ্যুৎকে চরম ভক্তিতে ভেঙে পড়তে এবং কল্কি নামটি উচ্চারণ করতে দেখেছে। তবে স্ক্রলে ঠিক কী লেখা ছিলো তা সে স্পষ্ট করে জানতে পারেনি।

মঠাধীশ দামিনীর মুখের এই বিভ্রান্ত ভাব লক্ষ করলেন।

'এই স্ক্রল হাজার হাজার বছর ধরে যে রহস্য লুকিয়ে রেখেছে, তা জানার অধিকার দামিনীর আছে, বিদ্যুৎ।'

বিদ্যুৎ মাথা নেড়ে হেসে তার ভালোবাসার মানুষের দিকে ফিরলো। মনে মনে ভাবছে সে যা বলতে যাচ্ছে দামিনী তা বিশ্বাস করবে কি না।

'আমি তোমাকে যেমনটা বলেছিলাম, দামিনী, মহান ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক্ষিত অবতার, কল্কি অবতারের জন্ম হয়েছে কয়েক মিনিট আগে, এখান থেকে দূরে কোথাও। ভবিষ্যদ্বাণীকৃত রোহিণী নক্ষত্র পৃথিবীতে ভগবান কল্কির অবতরণের সময়ই নির্দেশ করেছে, আর কিছু নয়।'

দিল্লির সুন্দরী সাংবাদিক এই কথাগুলো শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে বিষ্ণুর দশম অবতার কল্কির কথা শুনেছে, কলিযুগে যখন পাপ ও পাপীরা তাদের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে, তখন তিনি পৃথিবীতে আসবেন। কিন্তু সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে সে এখন সেই ঐশ্বরিক ঘটনার একটা অংশ।

'তো স্ক্রলে এটাই বলা হয়েছে, ভগবান কল্কির জন্মের সময়?'

বিদ্যুৎ হেসে উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ...সাথে আরো কিছু ছিলো।'

দামিনী সাথে সাথে তার ভ্রু কুঁচকে বিদ্যুৎকে কথা শেষ করতে বললো।

'আর কী, বিদ্যুৎ?' সে জিজ্ঞেস করলো।

'স্ক্রলটিতে শুধু ভগবান কল্কির জন্মের সময়ই নেই, দামিনী...তার জন্মের সঠিক স্থানও রয়েছে। আমি এখন জানি তিনি কোথায় আছেন।'

* * * * *

কালো মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার সময় প্রায় ভোর হয়ে গেছে। ওরা শেষনাগের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়ার পর তাকে বিদায় জানালো। রহস্যময়, সর্বশক্তিমান সর্পরাজ ভৈরব মন্দিরের বেসমেন্টে বেশিক্ষণ থাকবেন না। তার প্রভুর পাশে তার উপস্থিতি প্রয়োজন। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূরণের দিনের জন্য তিনি দুই হাজার বছর

অপেক্ষা করেছেন।

দ্বারকা শাস্ত্রীর কুটিরের বারান্দায় বসে তারা কাশীর সকালের পরিচিত শব্দ শুনতে পেল। সনু সবার জন্য চা নিয়ে এসেছে। এখন তারা একটা নিচু সেন্টার টেবিলের চারপাশে রাখা চেয়ারে বসে আছে।

মহান বৃদ্ধকে অনেক ক্লান্ত দেখাচ্ছে, ক্লান্তিতে তার শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। তবুও তার মুখে একটা তৃপ্তির ছাপ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তিনি জানতেন তার কাজ এখনো শেষ হয়নি।

বা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বিদ্যুতের কাজ এখনো শেষ হয়নি। কয়েক চুমুক গরম চা আর কয়েকটি বিস্কুট তাদের পেছনের দীর্ঘ, উত্তেজনাপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক রাতের পরে সবার জন্য বিস্ময়কর কাজ করেছে বলে মনে হচ্ছে।

'বলভান্ত, মঠের সব যোদ্ধাদের নিয়ে মন্দিরের সুরক্ষা দ্বিগুণ করে দাও। তুমি নিজে প্রতিটি গেট ও প্রাচীর পরিদর্শন করবে। ন্যায়না, দামিনীকে তোমার সাথে নিয়ে যাও। ওকে সুরক্ষিত রাখাই হলো তোমার কর্তব্য। তার এখন বিদ্যুতের আশেপাশে থাকা উচিত নয়, অন্তত কিছু সময়ের জন্য নয়।'

বলভান্ত বৃদ্ধকে প্রণাম করে তার আদেশ পালন করার জন্য সাথে সাথে চলে গেলেন। তাকে অনুসরণ করলো সনু, তার দেবতার জন্য আরেকটা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হলো।

'এখন আবার কী, বাবা? আপনি কি মনে করেন অর্ডার আমার পেছনে আসবে?'

দ্বারকা শাস্ত্রী বিস্মিত হয়ে বিদ্যুতের দিকে ফিরলেন।

'আমার কি মনে হয় ওরা তোমার পেছনে আসবে, তুমি কি এটাই বললে, বিদ্যুৎ? তুমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করায় আমি অবাক হচ্ছি। জেনে রাখো, বাছা...কালো মন্দিরের গোপন রহস্য যা অর্ডার যেকোনো মূল্যে চায়, এখন তোমার হৃদয়ে সমাহিত। তাই মনে কোনো সন্দেহ রেখো না। ওরা তোমাকে ধরার জন্য আসছে, বিদ্যুৎ।'

* * * * *

'কনস্ট্যান্টাইন কল্কি অবতারের কথা জানতেন। তিনি বিশ্বে সবচেয়ে ক্ষমতাবান ও দক্ষ রহস্যবাদী ছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে অতীতের ঐশ্বরিক বার্তাবাহক, নবী এবং অবতারদের মতোই ভগবান কল্কির আবির্ভাব নিশ্চিত। তিনি আরো জানতেন যে পবিত্র অবতারের আত্মপ্রকাশের সঠিক স্থান এবং সময় কালো

মন্দিরে লুকিয়ে আছে। তিনি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার গঠন করেছেন পৃথিবীকে আরো ভালো ও শান্তিময় একটা জায়গায় রূপান্তর করার জন্য, পাশাপাশি মানব জাতির জন্য ন্যায়বিচার, সুখ এবং চিরস্থায়ী শান্তি আনতে কল্কিকে সহায়তা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হিসেবে মারাত্মক ভুল করেছেন। প্রভুর একজন দক্ষ সেবক তৈরি করতে গিয়ে তিনি মানব ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য দানবের সৃষ্টি করেছেন।'

মহান দ্বারকা শাস্ত্রীর আশেপাশের সবাই তার কথা শুনছে কারণ তিনি কালো মন্দিরের ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত স্তরটি উন্মোচন করেছেন।

'যেমন আমি আগে ব্যাখ্যা করেছি, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের অশরীরী এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর উপর গভীর দখল রয়েছে। তাদের সেবায় সবচেয়ে ভয়ংকর শয়তান-উপাসক রয়েছে। তাদের নিজস্ব অতীন্দ্রিয়বাদী, ভূতপ্রেত এবং কালো জাদুকর রয়েছে। তাদের যাত্রার প্রথম দিকে কল্কির আগমন এবং কলিযুগের সমাপ্তি সম্পর্কে এই বিকৃত জাদুবিদ্যার অনুশীলনকারীরাই তাদের সতর্ক করেছে।

'অর্ডারের সর্বোচ্চ অধিপতিদের কোনো অনিশ্চিত শর্তে বলা হয়েছে যে একমাত্র শক্তি যা তাদের থামাতে পারে তা হলো কল্কি। তাদের আরো পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে কল্কি উজ্জ্বল, পবিত্র নক্ষত্রমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করবেন যা সবেমাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে। আর যদি তাকে তেরো বছর বয়স অতিক্রম করতে দেওয়া হয়, তবে অর্ডারের পরিসমাপ্তি নিশ্চিত।

'সুতরাং, যখন গোপন সমাজ যুদ্ধ সৃষ্টি করেছে, স্বৈরশাসক বসিয়েছে, মহামারি ছড়িয়ে দিয়েছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিকে শতাব্দী ধরে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তাদের প্রাথমিক অনুসন্ধান ছিলো সব সময় কালো মন্দিরের রহস্য খুঁজে বের করা এবং অবতারের জন্ম কোথায় হবে তা নিশ্চিতভাবে জানা। গোপন স্ক্রলটি পাওয়ার জন্যই তারা দেব-রাক্ষস মঠের সাথে নিরলসভাবে, অপ্রতিরোধ্যভাবে যুদ্ধ করেছে।'

বিদ্যুৎ এখন জানতো যে যুদ্ধ শেষ হয়নি। আসলে, আসল যুদ্ধ এখন শুরু হবে।

'বাবা, অর্ডার এখন কী চায়? কেন তারা বিদ্যুতের পেছন আসবে? শত শত বছরের রক্তপাত এবং সহিংসতা সত্ত্বেও কল্কি অবতার ইতোমধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন। তারা কি এখনো পরাজয় মেনে নেবে না?' ন্যায়না জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি মনে হয় অর্ডার সম্পর্কে পুরোপুরি বুঝতে পারোনি, ন্যায়না,' মহান মঠাধীশ বললেন। 'তারা কখনো পিছু হটবে না। অর্ডার বিশ্বের সবচেয়ে সক্ষম, সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী এবং এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বিপজ্জনক পুরুষদের নিয়ে গঠিত। খ্রিষ্টের জন্মের সময় রাজা হেরোড যা চেষ্টা করেছেন, তারা তা চেষ্টা

করবে। ভগবান কৃষ্ণের জন্ম হওয়ার পর রাক্ষস সম্রাট কংস যা চেষ্টা করেছেন, তারা সেই চেষ্টা করবে।

'কল্কিকে হত্যা করার জন্য তারা তাদের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করবে। এমনকি তাকে শিশু অবস্থায়ও হত্যা করতে তারা পিছপা হবে না।'

* * * * *

হঠাৎ ন্যায়নার মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। মোবাইল বের করে বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে রইলো সে।

'খুব অদ্ভুত। মহন্ত ভবাণীশঙ্কর ব্যতীত এই ফোন নম্বর কারো কাছে নেই। আর এখন তার কল দেওয়ার কথা নয়,' সে কল ধরার সাথে সাথে অন্যদের বললো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখ জমে গেল। ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে ফোনটা রেখে দিলো সে। কলকারী সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে।

'প্রফেসর ত্রিপাঠি বা ব্রহ্মানন্দ নামের একচোখের দানব কল দিয়েছে। সে পাগলের মতো হাসছিলো।'

সবাই হতবাক হয়ে গেল। বিদ্যুৎ চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। ন্যায়না কী বলছে তা শুনতে চাইছে না। সবার পরামর্শের বিপরীতে সে-ই ব্রহ্মানন্দকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো।

নায়না শান্ত গলায় বললো।

'মহন্ত ভবাণীশঙ্কর মারা গেছেন। সাদা মুখোশ নামের কেউ একজন আজ বিকেলে বিদ্যুৎকে ঘাটে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।'

ওরা কিছু শুনতে পাচ্ছিলো না। মানু, প্রচণ্ড ও ধ্রুব প্রায় তিনশো গজ দূর থেকে তীক্ষ্ণভাবে কার্যধারা লক্ষ করছে আর মনে মনে প্রার্থনা করছে।

সোমদত্ত দৈত্যাকার নরখাদকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছোট ছোট দৈত্য শিশুরা নারা-মুন্ডার স্তম্ভের মতো পায়ের চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে, কী ঘটছে তা জানে না।

মনে হচ্ছে সবকিছু ভালোই যাচ্ছে। সোমদত্ত নির্ভয়ে কথা বলছেন, তার হাতের মাধ্যমে চারপাশে ইঙ্গিত করে নরখাদক-রাজাকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে চাচ্ছেন যে জাহাজ দখলের এই যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ না হলে উভয় পক্ষের জন্য আরো কী ধ্বংস এবং রক্তপাত অপেক্ষা করছে।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে দৈত্য সম্রাট হাত ভাগ করে জ্ঞানী স্থপতিকে প্রণাম করলো।

তাহলে অবশেষে কি যুদ্ধের অবসান ঘটলো?

অবিরাম বৃষ্টির নিচে হাজার হাজার আহতের ক্ষতগুলোকে সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে লড়াই করার পাশাপাশি উভয় পক্ষের সৈন্যরা আশার সাথে তাকিয়ে আছে।

এরা সবাই শান্তি চায়।

* * * * *

অত্যন্ত উচ্ছ্বাসের সাথে সোমদত্ত তার নিজের সৈন্য ও সহকর্মীদের দিকে ফিরলেন। দূর থেকেই মানু বিজ্ঞ স্থপতির মুখে হাসি দেখতে পেল। শান্তি চুক্তির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে নারা-মুন্ডা!

উভয় পক্ষের সৈন্যরা এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাদের অস্ত্র এবং বর্মগুলোতে ঝাঁকুনি দিতে শুরু করে। যখন সোমদত্ত তার শিবিরে ফিরে যেতে শুরু করেছেন, তখন তার নির্ভীক প্রচেষ্টাকে অভিবাদন জানিয়ে জাহাজের বাহিনী তাদের তলোয়ার এবং বর্শা উপরে তোলে। হরপ্পার প্রধান স্থপতি, বিভাসন পূজারির সবচেয়ে অনুগত বন্ধু এবং মানুর একজন প্রিয় পিতৃমূর্তি স্বস্তির নিঃশ্বাসে তার লোকদের দিকে হাত দোলালেন।

সবাই শান্তি চেয়েছিলো।

শুধু নরখাদক সম্রাট ছাড়া।

মুহূর্তের মধ্যে কোবরার গতিতে সে সামনে এগিয়ে গেল। এমনকি উপস্থিত দর্শকরা তাদের চোখের পলক ফেলার আগেই নারা-মুন্ডা সোমদত্তের ঘাড় চেপে ধরে তাকে উপরে উঠিয়ে ফেললো। শুধু তার বাম হাত ব্যবহার করে জ্ঞানী বৃদ্ধকে সকলের দেখার জন্য উঁচু করে তুলে উন্মাদ রাগে গর্জন করে উঠলো, 'তোরা শান্তি চাস?' জাহাজের সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে গর্জন করলো সে, নিষ্ঠুর উপহাস করে তার হাতে ঝুলতে থাকা লোকটিকে দেখালো।

'তোরা শান্তি চাস?' সে আবার চিৎকার করে উঠলো। এবার তার নিজের সৈন্যদের দিকে ফিরেছে। উন্মাদনায় রক্তের মতো লালবর্ণ ধারণ করেছে তার চোখ।

তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে সোজা জাহাজের রাজা সত্যব্রত মানুর দিকে তাকালো। এতক্ষণে বন্দি স্থপতি তার খঞ্জর বের করে নরখাদকের বাহুতে আঘাত করার চেষ্টা করলেন। তার এই নড়াচড়া নারা-মুন্ডার উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারলো না। নরখাদক পিশাচ এখনো মানুর দিকে তাকিয়ে রইলো, অন্য দিকে মানু প্রধান স্থপতিকে বাঁচাতে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চাওয়ায় ধ্রুব আর প্রচণ্ড তাকে জড়িয়ে ধরে আটকে রেখেছে।

'তুই শান্তি চাস, সত্যব্রত মানু?' তৃতীয়বার গর্জন করলো বিশাল দৈত্য।

পর মুহূর্তেই নারা-মুন্ডা বৃদ্ধ স্থপতিকে খরগোশের মতো করে তার দিকে ঘোরালো, তারপর বৃদ্ধের গলায় তার বিশাল চোয়াল বসিয়ে দিলো। এরপর টেনেহিঁচড়ে সোমদত্তের কণ্ঠনালি ছিঁড়ে নিয়ে এসে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো। এরপর মাটিতে ছুঁড়ে ফেললো শান্তির দূতের তখনো জীবিত, রক্তাক্ত দেহটি। নারা-মুন্ডার সাথে আসা দশটি শিশু রেশন শেষ হয়ে যাওয়ায় অনাহারে ছিলো। দৈত্যরাজ আজ তাদের খাবার খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অল্পবয়স্ক হায়েনাদের মতো তারা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রক্তাক্ত স্থপতির উপর।

হাজার হাজার সৈন্যের সামনে, জাহাজের বাসিন্দাদের সামনে, মানু, ধ্রুব এবং প্রচণ্ডের চোখের সামনে, হরপ্পার প্রধান স্থপতিকে জীবন্ত খেয়ে ফেলা হচ্ছে।

* * * * *

'একে ঘিরে ফেলো! এই নরকের কীটকে ঘিরে ধরো। ধ্রুব...তোমার সেরা সৈন্যদের পাঠাও!' সত্যব্রত মানু কেঁদে উঠলো, তার স্বরে যন্ত্রণা ও ঘৃণা স্পষ্ট। ধ্রুবসহ তার দশজন লোক তাকে এখনো আটকে রেখেছে। ওরা জানতো যে মানু এখন অবর্ণনীয় দুঃখ এবং শাস্তিমূলক অনুশোচনায় ভুগছে। যদি ওরা তাকে ছেড়ে চলে যায়, তাহলে সে নারা-মুন্ডার দিকে যাবে–এবং সম্ভবত নিশ্চিত পরাজয় ও মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। সোমদত্তকে নরখাদকের কাছে শাস্তির বার্তা নিয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ছিলো তার। ধ্রুব তাকে এর বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছে, তবুও সে এগিয়ে গেছে। সম্প্রীতির জন্য তার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা তাকে ঝুঁকি নিতে বাধ্য করেছে। আর এটাই অন্ধ করে তুলেছে তার যুক্তিবোধকে।

অমানবিকতার এমন ভয়ংকর দৃশ্য জাহাজের সৈন্যদের কেউ আগে কখনো দেখেনি। নারা-মুন্ডা বর্বতার সকল সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে।

মানু এখন স্পষ্ট যে এই শয়তানকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এর জন্য যাই করতে হোক না কেন। সম্মানের যত নিয়মই ভাঙতে হোক না কেন। প্রবলভাবে কান্নারত এবং শ্বাস নিতে প্রায় অক্ষম মানু তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু এবং মিত্রের দিকে ফিরলো।

'ওকে মারতে হবে, ধ্রুব। দড়ি আনো। সেরা যোদ্ধাদের আনো। তুমি আর আমি তাদের নেতৃত্ব দেবো। এই অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করবো–যাই হোক না কেন! আমরা একে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করবো। ঘিরে ফেলবো, এর হাত বেঁধে টুকরো টুকরো করে ফেলবো!'

স্বয়ং মহিমান্বিত, ধার্মিক সত্যব্রত মানুর নিজের আদর্শবাদকে তার শুদ্ধতম রূপে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে হিংসা, প্রতারণা এবং কলহের যুগের সূচনা হয়েছে।

কলিযুগ শুরু হয়েছে!

বানারস, ২০১৭

শয়তান!

পাঁচ-তারা হোটেলটিতে উন্মাদনা চলছে।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশ বিলাসবহুল রিসোর্টের চত্বরটি ঘিরে রেখেছে। প্রত্যেক কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সেদিন দুপুরের দিকে একজন গৃহকর্মী মহিলা কোন এক ঘরে একটা মৃতদেহ দেখতে পান।

এ এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

কোনো সুচালো বস্তু দিয়ে কপাল আর চোখসহ দেহের প্রায় পঁয়ত্রিশটি অংশে আঘাত করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। খুন হওয়া ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সে ছিলো মুম্বাইয়ের কুখ্যাত ডন আসলাম বাইকার। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে খুনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত সুচালো বস্তুটি সম্ভবত একটা সাধারণ স্ক্রু ড্রাইভার ছিলো।

ওরা তাকে যে সম্পদ, অস্ত্র এবং সুরক্ষা প্রদান করেছে, তার বিনিময়ে আসলাম বাইকারকে অর্ডার একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে। কালো মন্দিরের রহস্য কেদারনাথের মন্দির থেকে অন্য কোথাও সরানো হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করা এবং সেই স্থান খুঁজে বের করা–এ-ই ছিলো তার দায়িত্ব।

কিন্তু নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে সে। অর্ডারের অজান্তেই রহস্যটি কেদারনাথ থেকে একটা নতুন, অজানা কালো মন্দিরে সফলভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে।

আসলাম বাইকার তাদের হতাশ করেছে। আর সাদা মুখোশকে যে হতাশ করে, তাকে মারাত্মক পরিণতি সম্মুখীন হতে হয়।

* * * * *

'তুমি আমার সাথে মজা করছো, বিদ্যুৎ!' দামিনী বলে উঠলো। দ্বারকা শাস্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রথমবারের মতো দামিনী তার মেজাজ হারিয়ে ফেললো। বিদ্যুৎ দৃঢ় স্বরে বলে যাচ্ছে যে সে এই সাদা মুখোশের সাথে দেখা করবে।

'বাবা, দয়া করে এই লোকটার মাথায় কিছু জ্ঞান দিন। সে জানে সে এ ব খুনি ভ্রাতৃসংঘের প্রধান লক্ষ্য। আপনি আমাদের বলেছেন যে কীভাবে তারা বিদ্যুৎকে ধরে রাখতে এবং ভগবানের জন্মস্থানের ঠিকানা বের করতে যেকোনো পর্যায়ে যেতে পারে। তাহলে সে কীভাবে মঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে?'

দ্বারকা শাস্ত্রী হস্তক্ষেপ করার আগেই দেবতা কথা বললো।

'আমি কী করছি তা বোঝার চেষ্টা করো, দামিনী। এই লোকটি যে-ই হোক না কেন, সে-ই মহন্ত ভবাণীশঙ্করের হত্যার পেছনে আছে। সে সম্ভবত আসলাম বাইকারেরও হত্যাকারী, যেমনটি আমরা আজ সকালে সংবাদপত্রে পড়েছি। ব্রহ্মানন্দও তার সেবা করছে। স্পষ্টতই, এই সাদা মুখোশ গোপন ভাতৃত্বের খুব প্রভাবশালী কেউ। অর্ডার আমার পেছনে একভাবে না একভাবে আসবেই। অন্তত এই লোকটার মুখোমুখি হলেই বুঝবো শত্রু কে। কত দিন আমরা অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি? কত দিন পর্যন্ত আমি এমন একজন প্রতিপক্ষের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারবো যাকে আমরা চিনি না এবং দেখতেও পাই না?'

'কিন্তু বিদ্যুৎ...' দামিনী প্রতিবাদ করলো, তার কাঁপতে থাকা হাত দিয়ে নিজের কপাল চেপে ধরলো।

'আমাকে যেতে দাও, প্রিয়। এই লোকটি বানারসে পৌঁছেছে। সে জানে আমি মঠের দেয়ালের মধ্যে আছি। সে যদি মহন্ত ভবাণীশঙ্করের মতো দক্ষ এবং মুম্বাইয়ের একজন বড় ডনকে হত্যা করতে পারে, তবে মঠের রক্ষীরা তাকে আটকাতে পারবে না।'

দামিনীর কপালে চুমু খেলো বিদ্যুৎ।

'আমাকে যেতে হবে, দামিনী। আমার কিছুই হবে না। ভগবান কল্কি এসে পড়েছেন। তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।'

* * * * *

বিদ্যুৎ নিচু হয়ে মহান মঠাধীশের পা স্পর্শ করতেই তিনি বিদ্যুৎকে আশীর্বাদ করলেন।

'মনে রাখবে, বিদ্যুৎ, এই মানুষটি রুমি পেরেরা, ডাকিনী, ভাড়াটে গুপ্তঘাতক বা এমনকি ত্রিজাত কাপালিক ও ব্রহ্মানন্দের থেকে অনেক আলাদা। আমি দামিনীর সামনে কথা বলতে চাইনি, কিন্তু সাদা মুখোশ বা মাশ্চেরা বিয়ানকা, যেটাই তাকে বলা হোক না কেন, অনেক ভয়ংকর কিছু।'

বিদ্যুৎ লক্ষ করলো যে তার বাবা মাশ্চেরা বিয়ানকাকে বর্ণনা করতে 'কেউ' নয় বরং 'কিছু' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

'বাবা, ন্যায়না আমাকে বলেছে যে মহন্ত ভবাণীশঙ্কর তাকে লুসিফার বা শয়তানের স্বয়ং কাশীতে চলাফেরা সম্পর্কে কিছু বলেছেন। আমি মশান-রাজের যজ্ঞশালায় শয়তানের একটা ভয়ংকর মূর্তিও দেখেছি। সাদা মুখোশ কি লুসিফারের কোনো অবতার, বাবা?'

'না, বিদ্যুৎ। সে লুসিফার নয়। আর আমরা নিশ্চিত নই যে লুসিফার এবং শয়তান একই শক্তি কি না। ধর্মগ্রন্থেও তা স্পষ্ট নয়। আমাদের বেশ কিছু গোষ্ঠী বিশ্বাস করে যে সাদা মুখোশ হলো স্বয়ং শয়তান। মহন্ত ভবাণীশঙ্কর ছিলেন সেই বিশ্বাসীদের একজন। তবে আমি নিশ্চিত যে সে তা নয়। যখন, ভগবান না করুক, শয়তান আসবে, সারা বিশ্ব জানবে, বিদ্যুৎ। সে তার সাথে সমগ্র মহাজগতের অন্ধকার বাহিনীকে সাথে করে নিয়ে আসবে। আর তুমি বা এমনকি পরাক্রমশালী শেষনাগও তার পথে দাঁড়াতে পারবে না। আমরা মহাবিশ্বের কাছে প্রার্থনা করি যে কল্কি প্রস্তুত হওয়ার আগে যেন এটা না ঘটে।'

দেবতার মনে পড়ে গেল লুসিফারের বিশাল আবক্ষ মূর্তিটি মৃতদেহ এবং ত্রিজাত কাপালিকের আচারের গর্তের মাঝে দেখেছে।

'তাহলে এই সাদা মুখোশটা কে, বাবা?' দ্বারকা শাস্ত্রীর মুখে প্রথমবারের মতো গভীর উদ্বেগের আভাস ফুটে উঠলো।

'মাশ্চেরা বিয়ানকা হলো শয়তানের বার্তাবাহক, বিদ্যুৎ। আরো ভালোভাবে বললে, সে অর্ধ-মানব, অর্ধ-দানব!'

* * * * *

মাশ্চেরার সূক্ষ্ম, দামি লিনেনের তৈরি সাদা শার্টটা তার পাঁজরের সাথে লেপটে আছে। তাকে হলিউডের সিনেমার তারকাদের মতোই দেখাচ্ছে। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ একটা কালো টি-শার্ট পরে গঙ্গার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। টি-শার্টের উপর দিয়ে তার

পেটানো শরীরের গঠন বোঝা যাচ্ছে। ওকে পুরো দেবতার মতোই দেখাচ্ছে। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, পুরুষ দুজনের শার্টের রং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী মহাজাগতিক শক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত।

'হ্যালো, বিদ্যুৎ,' মাশ্চেরা বললো, বরাবরের মতোই তার মুখে একটা উজ্জ্বল হাসি।

দেবতা আসলাম বাইকার ছিলো না। মাশ্চেরার স্পষ্টত বুদ্ধিমান উপস্থাপনায় সে তার সতর্কতা শিথিল করেনি।

'তোমাকে কী বলে ডাকবো, বন্ধু?' বিদ্যুৎ বললো। তারা দুজন এখন হাত মেলাচ্ছে।

'আচ্ছা, আমি নিশ্চিত যে তুমি ইতোমধ্যেই জানো আমাকে কী বলা হয়, বিদ্যুৎ,' উত্তর দিলো সাদা মুখোশ, সানগ্লাস খুলে সেই কিংবদন্তি সবুজ চোখে বিদ্যুৎকে দেখছে।

দেবতা দমে গেল না।

'আমি মানুষের নাম না জেনে কথা বলি না।'

আনন্দে হেসে উঠলো সাদা মুখোশ। চশমা ভাঁজ করে পকেটে রাখলো। ঘাটের সিঁড়িতে বসতেই তার গোলাপি ডিজাইনার ট্রাউজার্স টেনে উঠালো সে। বিদ্যুৎকে তার সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলো, ঠিক যেভাবে একবার রুমি আর দেবতা পাথরের আসন ভাগ করে নিয়েছিলো।

'তুমি জানো, বিদ্যুৎ...অন্য সময় তুমি আমাকে উইনস্টন বলে ডাকতে পারতে। অথবা জোসেফ। এমনকি অ্যাডলফও। কিন্তু আপাতত তোমার জন্য মাশ্চেরা...বন্ধু।'

মানুর চোখ অশ্রু ও বিষে ভরা অঙ্গারের মতো চকচক করছে।

ধ্রুব তার বন্ধুকে এই বর্বর রূপে আগে কখনো দেখেনি। সত্যব্রত মানু তার এবং নারা-মুন্ডার মধ্যে থাকা যেকোনো দৈত্য যোদ্ধাকে কুপিয়ে হত্যা করছে। মনে হচ্ছে যেন সে একটা হত্যাকারী দানবে রূপান্তরিত হয়েছে।

উভয় সৈন্যই আবার একে অপরের উপর তাদের তলোয়ার, বর্শা, মুষ্টি ও দাঁত দিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ করতে শুরু করলো।

শান্তির শেষ আশা নিয়ে প্রধান স্থপতির লাশের টুকরোগুলো মাটিতে পড়ে আছে। উভয় দলের সৈন্যরাই একে অপরের রক্তের পিপাসী হয়ে উঠেছে। প্রতি মুহূর্তে আরো জোরালো হচ্ছে মহাপ্রলয়ের গর্জন। বাতাসের গতি এখন প্রায় টর্নেডোতে পরিণত হয়েছে, যা যোদ্ধাদের জন্য এমনকি ভারসাম্য বজায় রাখাও কঠিন করে তুলেছে।

ব্যাপারটা এখন একদম পরিষ্কার। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক সময় আছে হাতে। যারা সময়মতো জাহাজে আরোহণ করবে, তারা আরো একটা দিন দেখার জন্য বাঁচতে পারবে। যারা জাহাজে উঠতে পারবে না, তারা প্রলয়ের প্রবল ঢেউয়ে পোকার মতো ভেসে যাবে।

* * * * *

জাহাজের পুরোহিতরাজ যখন নরখাদক দৈত্যের দিকে এগিয়ে গেল, ধ্রুব আর তার লোকেরাও কাছে এগোতে থাকলো।

ওদের কাছে মানুর অনুমতি ছিলো। ওরা অন্ধকার বনের সম্রাটকে ঘিরে ধরবে এবং তাকে তার সমস্ত পাপের মূল্য চুকাতে বাধ্য করবে। ধ্রুবর প্রত্যেক সওয়ারের হাতে দড়ির একটা ফাঁস আছে। ওরা জানতো যে যতক্ষণ নারা-মুন্ডার হাত-পা মুক্ত

থাকবে, ততক্ষণ এই জানোয়ারকে পরাজিত করা অসম্ভব। তার শরীরে দশজন মানুষের শক্তি, তাই তাকে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে পাঠানোর আগে অবশ্যই বন্দি করতে হবে।

ধ্রুবই প্রথম বিশাল দৈত্যের চারপাশে ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরতে শুরু করলো। নারা-মুন্ডা তার ঘোড়া থেকে ধ্রুবকে খেলনার মতো ছুঁড়ে ফেলার জন্য শুক গাছের কাণ্ডটি বাড়াতে পারার আগেই ধ্রুব তার পাশ দিয়ে গিয়ে দড়ির ফাঁসটি দ্রুত বেগে জন্তুটির ঘাড় এবং কাঁধে ছুঁড়ে দিলো।

নারা-মুন্ডা কিছু বোঝার আগেই আরো পাঁচটি দড়ির ফাঁস তার গলায় এসে পড়লো। ধ্রুবর সওয়াররা এখন নরখাদক-সম্রাটকে ঘিরে ঘুরছে এবং দড়ির বাঁধন আরো শক্ত করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশেষজ্ঞ যোদ্ধারা নরখাদকের গোড়ালিতে লতার তৈরি একধরনের বিশেষ তার, যার শেষ প্রান্তে ধাতব বিয়ারিং যুক্ত ছিলো, ছুঁড়ে মারলো। কয়েক সেকেন্ডেরও বেশি সময়ের মধ্যে নারা-মুন্ডাকে তার কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত দড়ি এবং তারের জালে আটকে ফেলেছে ওরা।

এক মুহূর্তের জন্য জাহাজের রক্ষকদের চোখ হলহল করে উঠলো।

নারা-মুন্ডা এই তীব্র বাতাস ও গর্জনরত বজ্রপাতের মধ্যে নড়াচড়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু শরীরের কোনো অঙ্গ নাড়াতে পারছে না।

কিন্তু তাদের চোখের সেই হলহল ভাব পর মুহূর্তেই আবার চলে গেল।

* * * * *

নারা-মুন্ডা কয়েক পলকের জন্য চুপচাপ ছিলো কারণ সে তার সমস্ত পাশবিক শক্তি একত্র করছে। ধ্রুবর অশ্বারোহীদের হতবাক করে দিয়ে নারা-মুন্ডা এমনভাবে তার পা ছাড়িয়ে নিলো যেন লতার তৈরি বিশেষ তারগুলো সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। রাক্ষসটা আবার গর্জে উঠলো। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটি মানুষের মেরুদণ্ডে ভয়ের ঢেউ খেলে গেল তাতে। ড্রাগনের মতো গর্জনে সে নিজের ভেতরকার উন্মাদনাকে ফিরিয়ে আনলো এবং যে দড়িগুলো দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে সেগুলো চেপে ধরলো। চার-পাঁচটা দড়ি একত্রে তার দৈত্যাকার মুঠোয় নিয়ে অমানুষিক শক্তিতে টান দিলো। পর মুহূর্তেই ধ্রুবর প্রায় এক ডজন অশ্বারোহীকে রক্তাক্ত জলাভূমির দিকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো। নারা-মুন্ডা একটা বন্য হাতির চেয়েও শক্তিশালী।

এই ব্যর্থ প্রচেষ্টায় হতাশ হয়ে ধ্রুব নিজেই এই জানোয়ারকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলো। তলোয়ার উঠিয়ে তার ছুটে চলা ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নরখাদকের কাছে গেল সে। ধ্রুবকে কাছে আসতে দেখে রাক্ষসটা গবলিনের মতো

হেসে উঠলো। সাহসী তীরন্দাজ কাছে আসার সাথে সাথে নারা-মুন্ডা একটা চকচকে, বিশালাকার কুড়াল তুলতে নিচু হলো ধীরে ধীরে। ধ্রুবর মনে কোনো বাস্তব পরিকল্পনা ছিলো না যা এই নিষ্ঠুর মানব-ভক্ষককে পরাজিত করবে। সে এটাও জানতো যে তার তলোয়ার নরখাদকের কুঠারের একটা আঘাতও সহ্য করতে পারবে না। তবুও সে এগিয়ে যাচ্ছে।

অরপর হঠাৎ পেছন থেকে ধ্রুব একটা আওয়াজ শুনতে পেল। এরকম সময়ে তার প্রিয় একটি কণ্ঠ।

'আমাকে নিয়ে যাও, ধ্রুব!'

তীরন্দাজ দেখার জন্য ঘুরলো। সত্যব্রত মানু আহত সিংহের মতো দৌড়ে আসছে, তার ছোট তলোয়ারগুলো হাতে দুলছে। সে আবারো চেঁচিয়ে উঠলো।

'আমাকে নিয়ে যাও, ধ্রুব!'

ধ্রুব তৎক্ষণাৎ বেঁকে হাত দিয়ে কাপের মতো আকৃতি বানালো। মানু সোজা ধ্রুবর দিকে এগিয়ে গেল, এক পা রাখলো তার বন্ধুর হাতের উপর, আরেকটা তার কাঁধে। এরপর নিজেকে উঁচুতে বাতাসের মাঝে ছুঁড়ে দিলো, এরপর সেখান থেকে সরাসরি নারা-মুন্ডার উপরে গিয়ে পড়লো।

সূর্যপুত্রের সাহসিকতা দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। মানু লাল-কালো আকাশে কয়েক ফুট উড়ে গিয়ে তার একটা ছোট তরবারি নরখাদক পশুর কাঁধের গভীরে গেঁথে ফেললো।

ব্যথায় কুঁকড়ে গেল নির্দয় রাক্ষস। সমগ্র যুদ্ধে এটাই ছিলো নারা-মুন্ডার উপর করা প্রথম আঘাত।

ধ্রুব তার রাজা এবং বন্ধুকে নির্ভীক যুবক প্যান্থারের মতো লাফ দিতে দেখলো। কিছুক্ষণের জন্য যেন থমকে গেল সময়।

মানব জাতির ভবিষ্যৎ, মহাতরীর নির্মাতা ও রক্ষক, মহৎ সত্যব্রত মানু যুদ্ধে নেমেছেন!

'সিগারেট?'

বিদ্যুৎ লক্ষ করলো মাচ্চেরা তার দিকে একটা ভারতীয় ব্র্যান্ডের সিগারেট বাড়িয়ে দিয়েছে। সাদা মুখোশ দেবতার চোখ দেখে হাসলো।

'তোমার বন্ধু বালা আমাকে প্রতিমাসে এগুলোর একটা কার্টন পাঠাতো। ব্যাপারটা লজ্জাজনক যে ইউরোপের কোনো সিগারেট এই ভারতীয় ব্র্যান্ডের স্বাদের ধারেকাছেও যেতে পারে না।'

বিদ্যুৎ ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। সে জানে যে মাচ্চেরা বিয়ানকা তার সাথে ঠাট্টা করছে। বালা মাচ্চেরার খেলনা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। বিদ্যুতের কাছে এটা ভাবতেই অসহ্য লাগছে যে কত বছর আগে অর্ডার তার জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে। কীভাবে তারা তার কাজ, তার বাড়ি, তার আবেগ নিয়ে খেলেছে...আর এখনো এই সবুজ চোখের মানুষটি অনুতাপহীনভাবে বিদ্যুতের পাশে বসে আছে। সম্পূর্ণ নির্ভয়ে।

'তুমি কী চাও, মাচ্চেরা? আমরা এখানে কেন এসেছি?'

হেসে উঠলো সাদা মুখোশ। সিগারেট জ্বালিয়ে ঠোঁটের মাঝখানের সামান্য ফাঁক থেকে মসৃণ, রেশমি ভঙ্গিতে ধোঁয়া উড়িয়ে দিলো। এরপর বিদ্যুতের দিকে ফিরলো, তখনো হাসছে।

'আমি তোমাকে কোটিপতি বানাতে চাই, বিদ্যুৎ। আমি চাই তুমি দামিনীকে বিয়ে করো। সুন্দর সন্তানের পিতা হও। আমি চাই তুমি দীর্ঘ, সুখী জীবনযাপন করো। আমি এটাই চাই, দেবতা।'

এবার বিদ্যুতের হাসার পালা। মাচ্চেরার অফার বিদ্যুতের কাছে খুব মজার লাগছে।

ও জানে যে তারা সময় নষ্ট করছে। আর মাচ্চেরার নোংরা মুখে দামিনীর নাম শোনার সময় মনে হলো কোনো মৌমাছি তাকে হুল ফোটাচ্ছে।

'এ তো তোমার মহানুভবতা,' বিদ্যুৎ বললো। 'আর এর বিনিময়ে তুমি কী চাও?'

সাদা মুখোশ হাসলো, পবিত্র গঙ্গার শেষ প্রান্তের দিকে তাকিয়ে সিগারেটে আরেকটা টান দিলো।

ওরা দুজনেই জানতো সাদা মুখোশ কী চায়।

* * * * *

'তুমি চেষ্টা করার জন্য আমাকে দোষ দিতে পারো না, বিদ্যুৎ। যদিও আমি জানতাম যে আমার এই রাজার হালে জীবন কাটানোর প্রস্তাব তোমাকে তোমার ভাগ্য থেকে বিচ্যুত করবে না।'

বিদ্যুৎ শুনছে। সে এই মানুষ সম্পর্কে আরো জানতে চাইছে। সাদা মুখোশের মতো নির্মম কারো মনে কী কাজ করে তা সে বুঝতে চাইছে।

'আমাকে বলো, বিদ্যুৎ। আমি কাশী বিষ্ণুতে হাজার হাজার ভক্তকে দেখেছি...'

'কাশী বিশ্বনাথ,' বিদ্যুৎ তাকে শুধরে দিলো।

'হ্যাঁ, সেটাই। আমি সেখানে মানুষের এক মহাসমুদ্র দেখেছি। উপাসনা করছে, জপ করছে, মাথা ঠেকাচ্ছে...মূলত তাদের ভক্তি দ্বারা গ্রাস হচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বর্ণনাতীত দরিদ্র। তারা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। তারা কুঁচকানো, রোগাক্রান্ত, শোকাহত, নিঃস্ব ছিলো...তবুও তারা তোমার ঈশ্বরের কাছেই প্রণাম করছিলো, যেন দুঃখ তাদের কাছে কিছুই না। কেন?'

'*তোমার ঈশ্বর?*' বিদ্যুৎ ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো। 'সেক্ষেত্রে, তোমার নিজের ঈশ্বর কে, মাচ্চেরা?'

সাদা মুখোশ হেসে মাথা নাড়লো। 'আমি অবাক হয়ে যাই যে তুমি এই জিনিসগুলো কত কম বোঝো, তবুও তুমি এদের জন্য তোমার জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক! তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, বিদ্যুৎ–ভালো আর মন্দ, ঈশ্বর আর শয়তান, আলো আর অন্ধকার...এরা সব একই শক্তির সৃষ্টি। যে শক্তি চায় কোটি কোটি মানুষ তাদের সারা জীবন কষ্ট করুক, তাদের দুঃখজনক অস্তিত্বের প্রতিটি দিন তার কাছে নত হয়ে কাটাক। অবশেষে তাদের তথাকথিত ঈশ্বর এবং সৃষ্টিকর্তার সাথে দেখা করার আশায় মারা যাক। তোমার ঈশ্বরের কি শুধু যন্ত্রণা, ক্ষতি, কান্না, শোক, অসুস্থতা আর মৃত্যুই দেওয়ার আছে?'

সাদা মুখোশ অদ্ভুত প্রত্যয়ের সাথে কথা বলছে। সম্ভবত সেই একই বুদ্ধিহীন ধর্মান্ধতা যা ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও সহিংসতা ছড়াতে মন্দকে প্ররোচিত করে। ঈশ্বরের নামে। একই ধ্বংসাত্মক, অমানবিক এবং নির্বোধ প্রত্যয়।

'আমি জানি না ঈশ্বর কী দেবেন। কিন্তু আমি তোমাদের চূড়ান্ত সমাধান সম্পর্কে জানি, মাচ্চেরা। কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করা...নির্দয়ভাবে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে? এটাই তোমাদের বিকল্প হিসেবে দেওয়ার আছে?'

* * * * *

'মানুষ হত্যার যোগ্য কারণ হলো, এদের বেশিরভাগই সমগ্র মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় বেকুব। এই পৃথিবী কষ্ট, রোগ এবং ঘৃণার জায়গা, তোমরা তা ভালো করে জানার পরেও শিশুদের এই পৃথিবীতে নিয়ে আসো। তোমরা বিবাহের মতো মূল্যহীন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করো, নারী-পুরুষ উভয়েই ধার্মিক হওয়ার ভান করো, অন্য নর-নারীর প্রতি লালসা নিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দাও। আজ তুমি বলছো মানব হত্যা ভুল। এখন থেকে একশো বছরেরও কম সময়ে তৃষ্ণা, তাপ আর রোগে এই সাতশো কোটি মানুষ পরিণত হবে মানুষখেকো জম্বিতে। মাংসের জন্য ক্ষুধার্ত কারণ তাদের আর কিছুই খাওয়ার বাকি থাকবে না। রক্তের জন্য তৃষ্ণার্ত কারণ পান করার আর কিছুই থাকবে না। তখন তোমার ঈশ্বর কোথায় থাকবে?

'তুমি কি দেখছো না, বিদ্যুৎ? তোমরাই আসলে মন্দ। তোমাদের ঈশ্বর একটা নকল, উজ্জ্বল সাদা আলোর নিচে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার শক্তিগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। যেখানে আমরাই সত্য, গুণী...আর ভবিষ্যৎ!

'কী একটা পাথরকে এত শক্তিশালী করে তোলে? বা মন্দিরকে? অথবা বই বা প্রতিমাকে? তোমরা–তোমরা মানুষরা! তোমরা এই নিষ্প্রাণ বস্তুর পূজা করো। শত শত বছর ধরে তোমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষের মহাজাগতিক, সমষ্টিগত, আধ্যাত্মিক শক্তি এতে স্থানান্তর করো। স্বাভাবিকভাবেই পাথরটি ঐশ্বরিক হয়ে ওঠে। আর তারপর এটা তোমাদের কাছ থেকে যে শক্তি সংগ্রহ করেছে তা ব্যবহার করে তোমাদেরই শাসন করতে। স্বাধীন ইচ্ছার আড়ালে তোমাদের ব্যথা, দুঃখ এবং বিদ্বেষপূর্ণ জীবন দিতে।'

সাদা মুখোশ আরেকটা সিগারেট বের করে দ্রুত জ্বালালো। এরপর সে একটা গভীর টান দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার মুখের ভেতরে ধোঁয়া রাখলো। দেবতার প্রতিক্রিয়া শুনতে আগ্রহী হয়ে বিদ্যুতের দিকে তাকালো এরপর।

কিন্তু বিদ্যুৎ কিছু বলার আগেই মাচ্চেরা আরো কিছু কথা শীতলভাবে বললো। তার সবুজ চোখগুলো দেবতার দিকে জ্বলজ্বল করছে।

'আজই কাশী ছেড়ে চলে যাও, বিদ্যুৎ। আমি তোমার মতো অনেক যুবককে হত্যা করেছি। কিন্তু সেই তালিকায় তোমার নাম যোগ করতে চাই না।'

* * * * *

সাদা মুখোশ যে বারবার মানুষকে 'তোমরা মানুষরা' বলে সম্বোধন করছে, বিদ্যুৎ তা লক্ষ করেছে। যেন সে নিজে কোনো মানুষ নয়।

দেবতা জবাব দিতে বাধ্য হলো। 'তোমার জন্য আমার করুণা হয়, মাচেরা বিয়ানকা–বা তুমি নিজেকে যে নামেই ডাকো। তুমি মনে হচ্ছে আত্মার আড়ম্বর সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। আমরা শিশুদের এই পৃথিবীতে নিয়ে আসি তাদের কষ্ট এবং রোগে ভোগানোর জন্যে নয়, আমরা তাদের আনি বেঁচে থাকার জন্য, ভালোবাসার জন্য। তাদের জন্য ঈশ্বরের অসীম কৃপা, মায়ের কোলের দোলনা, বাবার হাতের আঙুল, প্রেমিকার অবিস্মরণীয় স্পর্শ, উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুন, অর্জনের জয়, শীতল বাতাসের স্নেহ, মন্দিরের শান্তি, পুত্র-কন্যার হাসি, বন্ধুত্বের উদাসীন বিসর্জন...এইসবের জন্যই আমরা আমাদের সন্তানদের পৃথিবীতে আনি। এমন করুণভাবে বিয়ের কথা বললে যে তাতে আমার হাসি পাচ্ছে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ পুরুষ আর মহিলারা হয়তো পুরোপুরিভাবে তাদের সহজাত ইচ্ছাগুলো বন্ধ করতে পারে না, তবুও তাদের বেশিরভাগই তাদের পুরো জীবন নিজেদের জীবনসঙ্গীর প্রতি নিবেদিত ও গভীর প্রেমে কাটিয়ে দেয়। এত বেশি ভালোবাসা যে এটা তাদের সাধারণ আকাঙ্ক্ষাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর এটাই বিয়ের পবিত্রতার সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। এ হলো একাত্মতা, যা এই জীবনের অবসানের পরেও যাত্রার জন্য আত্মার সঙ্গী তৈরি করে, যে একাত্মতা তোমার অন্ধকার সত্তার চেয়েও বেশি মূল্যবান।

'হ্যাঁ, আমরা মন্দির তৈরি করি। হ্যাঁ, আমরা আমাদের ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধতম অনুভূতি নিবেদন করি। এগুলো তার সাথে একটা বন্ধন তৈরি করার ও মানুষ হিসেবে আমাদের সীমিত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তার উপস্থিতি অনুভব করার একটা নম্র উপায়। কিন্তু শাস্ত্র যেমন বলে, "অহম ব্রহ্মাস্মি", বা "আমি ব্রহ্ম", বা সহজভাবে "ভগবান আমার মধ্যে থাকেন"–এটাই প্রতিটি ব্যক্তি এবং প্রভুর মধ্যে মহাজাগতিক সংযোগ বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায়। এই গ্রহে বিচরণকারী প্রতিটি পুরুষ বা মহিলা সর্বশক্তিমানের জীবন্ত মন্দির। তুমি বলছো তিনি আমাদের শাসন করেন। কোনো কিছুই সত্য থেকে দূরে থাকতে পারে না। আমরা যেভাবে বাঁচতে পছন্দ করি তাতে ঈশ্বর কখনো হস্তক্ষেপ করেননি। তবুও তিনি আমাদের উপর নজর রাখেন। এমনকি তিনি নাস্তিকদেরকেও পুরোহিতদের সমান ভালোবাসেন।

'আর এই সাতশো কোটি মানুষের মানুষখেকো জম্বিতে পরিণত হওয়ার ব্যাপার, সেটা নিয়ে তোমার বেশি চিন্তা না করলেও হবে। মানব জাতির স্থিতিস্থাপকতাকে অবমূল্যায়ন করে তোমার মতো বেশ কিছু নাশকতাকারী এবং কেয়ামতের ভবিষ্যদ্বাণীকারী এসেছে এবং চলেও গেছে। দেখতেই তো পাচ্ছো, আমরা এখনো টিকে আছি। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাগুলো আমাদের

দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, তবে আমরাই এখন আমাদের শহরগুলোকে আলোকিত করার জন্য সূর্য এবং বাতাসের শক্তি ব্যবহার করছি। যদিও আমরা সত্যিই আমাদের বায়ু আর মহাসাগর দূষিত করেছি, তারপরেও এই আমরাই এখন পরিবেশবান্ধব গাড়ি তৈরি করছি, লড়াই করার জন্য পরিবেশবান্ধব ভবন নির্মাণ করছি।

'আমাদের প্রজাতির মহৎ ব্যক্তিরা বিশাল ধাপ অতিক্রম করে মঙ্গল গ্রহে বাস করার পরিকল্পনা করছে। আমাদেরকে গ্রহ-গ্রহের সভ্যতায় রূপান্তর করার প্রচেষ্টা করছে।

'আমরা এখানে ভালোর জন্য এসেছি, মাচেরা। আমাদের একা থাকতে দাও। আর তোমার সঙ্গীদেরও তা বলে দাও।

* * * * *

দেব ও রাক্ষসের মধ্যে বৈঠক শেষ হলো।

চলে যাওয়ার জন্য উঠলো বিদ্যুৎ। মাচেরা বিয়ানকা তখন দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে, দাঁত কিড়মিড় করছে।

দেবতা চলে যাওয়ার আগে শীতল কিছু কথা যোগ করলো। তার বাদামি চোখ রাক্ষসের উপর নিবদ্ধ।

'আজকের মধ্যেই কাশী ছেড়ে চলে যাও, মাচেরা। আমি আমার জীবনে কখনো কোনো মানুষকে হত্যা করিনি। আমাকে এই স্বভাব বদলাতে বাধ্য কোরো না।'

বিদ্যুৎ ঘুরে গঙ্গার ধারে চলে গেল, ধীরে ধীরে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। সে তার শেষ কথাগুলো নিয়ে ভাবছে এখন।

এই সবুজ চোখের দৈত্য যদি মানুষ না হয়, তবে তার পাপের জন্য তাকে শাস্তি দিলে ভুল কিছু হবে না।

আর এই শাস্তি সে দেবে তার নিজস্ব উপায়ে।

জাহাজের চারপাশের জলাভূমি, আর্যাবর্ত, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৮ অব্দ
নর-বলি

বাকি যুদ্ধ ধীরে ধীরে থমকে গেল। উভয় পক্ষের যোদ্ধারা রুদ্ধশ্বাসে এই রক্তাক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখছে। মানুষ এবং নর-খাদকের মধ্যকার এই দ্বন্দ্বটি জাহাজ এবং পৃথিবীর জন্য যুদ্ধের সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ হতে চলেছে।

তারা জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। নারা-মুন্ডা কী করতে পারে তা সে ভালো করেই জানে। মহান স্থপতির ভয়াবহ পরিণতির সাক্ষী ছিলো সে। দেখেছে কীভাবে নরখাদকরাজ মৎস্য-গোত্রের সওয়ারিদের পিষে ফেলেছে। দানবটা যখন বারোজন ঘোড়সওয়ারকে একাই টেনে নিয়ে গেল, তারার হৃদয় থমকে গেছিলো।

আর এখন তার প্রিয় মানু একা সেই শয়তানের সাথে যুদ্ধ করছে। সে চোখ বন্ধ করে তার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো যিনি সত্যব্রতের কোনো ক্ষতি হতে দেবেন না।

সে মৎস্যের কাছে প্রার্থনা করলো।

* * * * *

কাঁধের ক্ষত নিয়ে ক্ষণিকের জন্য নড়বড়ে হলেও নারা-মুন্ডা পুনরায় নিজেকে সামলে নিলো। এবার আগের চেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। মানুকে উপরে তুলে

দূরে ছুঁড়ে ফেললো সে। দৈত্যটা এতই শক্তিশালী ছিলো যে মানু বিশ হাত দূরে গিয়ে পড়লো। কিন্তু মানু মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথে উঠে মাথা দিয়ে আঘাত করার জন্য দানবের দিকে ধাবিত হলো। মানু তার বিশাল প্রতিপক্ষের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে নরখাদক রাজা তার বিশাল পা দিয়ে মানুর বুক ও পেটে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারলো। সূর্যপুত্র আবারো কয়েক পা পিছিয়ে গেল, আঘাতের কারণে শ্বাস নিতে পারছে না। কিন্তু আবারো জলাভূমিতে পড়ার সাথে সাথে উঠে দৈত্যকে আক্রমণ করতে গেল।

মানু আহত বাঘের মতো বন্য হাতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পিছু হটছে না, ভয় পাচ্ছে না।

তৃতীয়বারের আক্রমণে মানু নরখাদকের বিশাল কুঠারের হাত থেকে বেঁচে তার ছোট তরবারি দিয়ে সরাসরি দৈত্যের হাঁটুতে আঘাত করলো। মানু যেই নৈপুণ্যে আঘাত করেছে, সাধারণ কেউ হলে তার পা দুই ভাগ হয়ে যেত। কিন্তু নারা-মুন্ডার চামড়া ছিলো গন্ডারের মতো শক্ত। তার পায়ে কয়েক ইঞ্চি গভীর ক্ষত ছাড়া কিছুই হলো না।

গর্জে উঠলো দৈত্য। ঐ মুহূর্তে মানু তার চারপাশে পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় ঘুরছে।

* * * * *

নারা-মুন্ডা ও মানু উভয়েরই দম ফুরিয়ে আসছে, জোরে জোরে হাঁফাচ্ছে দুজনেই, বৃষ্টির রাতেও তাদের প্রচণ্ড ঘাম ঝরছে। মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে লড়াই করছে ওরা। নরখাদক সম্রাট তরুণ পুরোহিত রাজার হাতে বেশ কয়েকটি আঘাত সহ্য করেছে, কিন্তু একটাও যথেষ্ট মারাত্মক ছিলো না। রাক্ষসটা পরাজিত হওয়ার ধারেকাছেও যায়নি এখনো।

প্রতি মিনিটে মানুর চাল, ধারণা এবং শ্বাস ফুরিয়ে আসছে। চরম হতাশার কারণে সে তার প্রথম ভুল করে বসে। দৈত্যের ঘাড়ের ধমনিতে আঘাত করতে যেতেই নারা-মুন্ডার হাতের কাছে চলে যায় সে। নারা-মুন্ডা এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি। মানুকে আঘাত করলো তার শক্তিশালী মুষ্টি দিয়ে। বিধ্বংসী এই আঘাত একটা প্রাচীর ভেঙে ফেলার জন্য যথেষ্ট। মানু সাথে সাথে হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো, মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। যখন সে অনুভব করলো যে একটা বিশাল হাত তার লম্বা চুল ধরে ফেলেছে, তার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল।

চুল ধরে টানতে টানতে নারা-মুন্ডা মানুকে মাঠের চারপাশে ঘোরালো সবাইকে দেখানোর জন্য।

তারা নিজের তলোয়ার তুলে নিয়ে জাহাজের ডেকের পুরু কাঠের রেলিং থেকে নেমে আসা দড়ির সিঁড়ির দিকে দৌড়ে যেতে যেতে কান্নায় ভেঙে পড়ে। দামিনী-সেনার বেশ কয়েকজন যোদ্ধা ওকে আটকে রেখেছে। ওরা এখন মহাতরীর পূর্ণ এবং চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে।

দৈত্য তখন মানুকে নিজের থেকে কয়েক কদম দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। এরপর প্রথমে সে তার নিজের সৈন্যদের দিকে বিজয়ী দৃষ্টিতে দেখলো। দৈত্যরা তাদের অজেয় সার্বভৌমত্বের জন্য উল্লসিত গর্জন করছে, বিজয়ের উদ্‌যাপনে নিজেদের অস্ত্র তুলেছে। এদিকে নারা-মুন্ডা নিষ্ঠুর চোখে জাহাজের রক্ষকদের দিকে তাকালো, শীতলভাবে ইঙ্গিত করলো যে তাদের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে। এরপর ধীরে ধীরে সূর্যপুত্রের দিকে এগিয়ে গেল। তার স্বাভাবিক শৈলীতে দৈত্য নিজের বিশাল, পেশিবহুল পা তুলে মানুর মাথায় চাপ দিলো।

পতিত যোদ্ধার মুখের উপর চাপ বাড়ানোর আগে দৈত্যাকার গবলিনের মতো হেসে উঠলো সে।

মানুর মাথার খুলি গুঁড়ো করতে যাচ্ছে সে।

* * * * *

দৈত্য বুঝতে পারলো না কী তার পা ভেদ করে চলে গেল। বোকা দৈত্য ভুলে গেছে সে কার সাথে যুদ্ধ করছে। তার অকাল উদ্‌যাপনে সে ভুলে গেছে যে বিভাসন পূজারির ছেলে আহত হয়েছে কেবল, কিন্তু মারা যায়নি। দৈত্যের পায়ের নিচে চাপা পড়া অবস্থাতেই মানু তার ছুরি বের করলো। এরপর নিজের শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে তার পায়ের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো। মুহূর্তের মধ্যে নারা-মুন্ডার পায়ের মাংস ছিঁড়ে ফিবুলা হাড় উন্মুক্ত করে ফেললো মানু।

অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো নারা-মুন্ডা। দৈত্য যখন ব্যথায় কাতরাচ্ছিলো, মানু সে সুযোগে উঠে দাঁড়ালো। নরখাদকের মুষ্টির নৃশংস আঘাতে মানু কেঁপে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু সূর্যের পুত্রকে যখন টেনে নিয়ে গেছে, তখন সে অজ্ঞান হয়ে যায়নি। জাহাজের রক্ষক লড়াইয়ে ফিরে আসার জন্য সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলো কেবল। দৈত্য এখন পাগলের মতো তার কুঠার ঘোরাচ্ছে, গর্জন করছে পশুর মতো, কিন্তু নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছে না। সতব্রত মানু আবার রক্তাক্ত নরখাদকের চারপাশে ঘুরতে লাগলো। এবার একটু ধীরে হাঁটছে। জাহাজের রাজা সোমদত্তকে টুকরো টুকরো করে ফেলার বিভীষিকাময় দৃশ্য ভুলতে পারেনি সে। স্পষ্ট মনে আছে সেই দৃশ্য। এই নৃশংসতার কোনো ক্ষমা নেই।

ঘুরে দাঁড়ালো দানব, পুরোহিতরাজকে আঘাত করার নিরর্থক প্রচেষ্টায় তার কুঠার দোলালো। ঠিক তখুনি আকস্মিক গতিতে সেখান থেকে সরে দাঁড়ালো মানু। কী ঘটছে দৈত্য তা বুঝতে পারার আগেই মানু পেছন থেকে নরখাদকের বিশাল কাঁধে উঠে পড়লো।

'এই আঘাত আমার বাবার শেষ বন্ধুর জন্য, নারা-মুন্ডা! হরপ্পার স্থপতির জন্য! এই আঘাত পণ্ডিত সোমদত্তের জন্য!' মানু রাক্ষসের কানে চেঁচিয়ে বললো।

পর মুহূর্তে নিজের ছোট তরবারি দিয়ে দৈত্যের ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করলো সূর্যপুত্র। মোচড় দিয়ে গভীরে ঠেলে নরখাদকের গলা কেটে ফেললো।

সমান নৃশংসতার সাথে সোমদত্তের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়া হলো।

নারা-মুন্ডার গলা থেকে ঝরনার মতো করে রক্ত বের হচ্ছে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো সে। নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছে যে দৈত্য প্রচুর রক্ত ক্ষরণের কারণে মারা যাবে।

যদিও সে তখনো ক্রোধে কাতর হয়ে ছিলো, এরপরেও মানু দৈত্যের কষ্ট শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলো।

অন্ধকারের সম্রাটের কুঠারটি উঠালো মানু, ভারী কুঠারটি সুনির্দিষ্টভাবে একবার ঘোরালো। তাতেই অবসান ঘটলো দৈত্য রাজার।

নারা-মুন্ডার বিশাল মাথা বাতাসে উড়ে গেল। তার মস্তকহীন দেহ পড়ে রইলো ময়লা কাদায়।

* * * * *

একটা দৈত্যের অবসানের সাথে সাথে আরেকটা দৈত্যের উত্থান ঘটলো।

'দৈত্যদের বন্দি করো! আর সবাই জাহাজে ফিরে যাও। সবাইইই জাহাজে ফিরে যাওওওও!' মানু চেঁচিয়ে তার সৈন্যবাহিনীকে বললো।

ঝড়ো মেঘ ভেদ করে, গজরাতে থাকা বজ্রপাতকে স্তব্ধ করে, নিজের ধ্বংসাত্মক পর্দার নিচে অর্ধেক আকাশ ঢেকে দিয়ে অবশেষে উপস্থিত হয়েছে সে।

প্রলয়!

মহাপ্লাবনের বিপর্যয়কর ঢেউগুলো জাহাজের দিকে ধেয়ে আসছে।

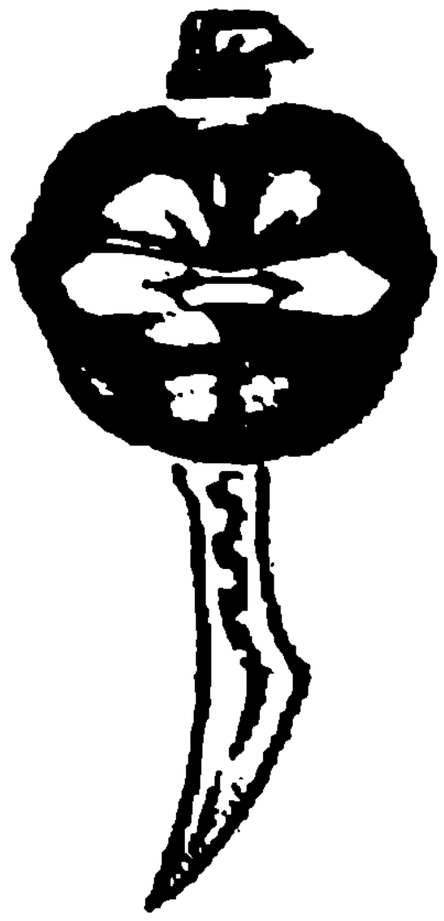

বানারস, ২০১৭

ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক গুপ্তঘাতক

'ওরা এসেছে, বিদ্যুৎ দাদা!'

অর্ডার কোনো সময় নষ্ট করেনি। ওরা জানতো যে কালো মন্দিরের রহস্য, কল্কি অবতারের সঠিক জন্মস্থান, তার নশ্বর পিতামাতার নাম...সবকিছু এখন দেবতার হৃদয়ে সমাহিত আছে। রোহিণী নক্ষত্রের সময় পবিত্র আগুনে প্রাচীন স্ক্রলটি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

গোপন ভ্রাতৃসংঘের কাছে আর কোনো বিকল্প পথ ছিলো না। তাদের বেঁচে থাকা এবং নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার সৃষ্টির স্বপ্ন এখন শিশু কল্কির হত্যার উপর নির্ভর করছে। অতীতের অত্যাচারী শাসকদের দ্বারা করা ভুলের পুনরাবৃত্তি করছে তারা। ভগবান কৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, তখন সমস্ত শিশুকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন মথুরার রাক্ষসরাজ কংস। যিশু খ্রিষ্ট যখন গ্রহে পা রেখেছিলেন, তখন জুডিয়ার সম্রাট হেরোড একই চেষ্টা করেছিলেন। আর এখন অর্ডারও একই রকম ভুল করার চেষ্টা করছে।

বিদ্যুৎই হলো কালো মন্দিরের রহস্য। অর্ডারের সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিলো না। আর তাই বিদ্যুৎকে বন্দি করতে হবে। তাকে অত্যাচার করতে হবে। যেকোনো মূল্যেই হোক তার থেকে সকল তথ্য বের করতে হবে। আর কল্কি অবতারকে দোলনায় থাকা অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

মধ্যরাতের পর বিদ্যুতের দরজায় কড়া নাড়লো সনু।

'আপনি বিশ্বাস করবেন না, দাদা...কিন্তু ওরা মঠে আক্রমণ করেছে,' দেবতা দরজা খুলতেই সে ফিসফিস করে বললো।

'সবাই কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ। 'আর তাদের কয়জন হামলা করেছে?'

সনু উত্তর দেওয়ার আগে নিজেকে শান্ত করার জন্য একটা গভীর শ্বাস নিলো।

'আমরা জানি না, দাদা। ওরা...'

তাকে দেখে মনে হলো সে বলার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলো না।

বিদ্যুৎ তার চোখের দিকে তাকালো। 'ওরা কী, সনু?'

'কী বলবো বুঝতে পারছি না, বিদ্যুৎ দাদা। ওরা কালো পোশাক পরে আছে। কোবরার মতো নিঃশব্দে চলাফেরা করে, কারো চোখে পড়লে সাথে সাথে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তাদের মুখ ঢাকা, শুধু চোখদুটো বের করা। আর তাদের কাছে অদ্ভুত সব অস্ত্র আছে। মঠের তিনজন নাইট গার্ডকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পেছন থেকে কেউ তাদের গলা কেটে ফেলেছে।'

বিদ্যুৎ এবার সনুর হাত ধরে দামিনী ও ন্যায়না যেখানে থাকতো সেই দিকে ছুটে গেল। মাস্টেরার পাঠানো আক্রমণকারী কারা ছিলো তা সে তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পেরেছে। এটা খুবই খারাপ খবর।

ওরা ছিলো পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক যোদ্ধা এবং গুপ্তঘাতক।

নিনজা।

* * * * *

'এতক্ষণে শেষনাগ হয়তো প্রভুর কাছে পৌঁছে গেছেন, কব্বি অন্তত এখনকার জন্য সুরক্ষিত থাকবেন,' ন্যায়না বললো।

তারা এখন মঠের বেসমেন্টে থাকা বিশাল মিটিং হলের ভেতরে আছে, সমস্ত দরজা ভারী লোহার খিলান দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি প্রবেশদ্বার পাহারা দিচ্ছে মঠের এক ডজন যোদ্ধা। নিনজা আক্রমণের কয়েক মিনিটের মধ্যে মঠের বেশ কিছু যোদ্ধা নিহত হয়। দ্বারকা শাস্ত্রী, বিদ্যুৎ, বলভদ্র আর ন্যায়না ছুটে গেছে মঠের সমস্ত বাসিন্দা আর যোদ্ধাদের হলের অস্থায়ী সুরক্ষায় আনতে। দেব-রাক্ষস আশ্রমের বাসিন্দা, তরুণ ছাত্র ও শিশুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তারা কোনোভাবেই দুর্বল ছিলো না। কেবল যুদ্ধ ও সহিংসতার জগতে নতুন ছিলো। কিন্তু নিনজাদের যুদ্ধ-কৌশল এমন কিছু ছিলো যা তাদের কেউ আগে কখনো

দেখেনি বা শোনেনি। গুপ্ত আক্রমণকারীরা ধীরে ধীরে মঠের প্রতিটি আলোর উৎস–প্রতিটি বাল্ব, প্রতিটি টিউব-লাইট, প্রতিটি সোডিয়াম বাতি এবং এমনকি পূজার জন্য রাখা মাটির দিয়াও চুরমার করে ফেলেছে। ধীরে ধীরে পুরো মঠ সম্পূর্ণ অন্ধকারের চাদরে ঢেকে গেল। অত্যাধুনিক টেলিকম প্রযুক্তি ব্যবহার করে টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, জ্যাম করা হয়েছে মোবাইল সিগন্যাল। দ্বারকা শাস্ত্রীর মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না যে সর্বশক্তিমান গোপন ভ্রাতৃসংঘ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকেও কিনে ফেলবে। তাতে এটা নিশ্চিত হয় যে তারা পরবর্তী কয়েক ঘন্টার জন্য মঠ থেকে দূরে থাকবে, যাই ঘটুক না কেন। অন্য কথায়, মঠাধীশ এবং তার ভক্ত অনুগামীরা একটা জিনিস নিশ্চিতভাবে জানতেন।

আজ রাতে, তারা সম্পূর্ণ একা।

* * * * *

'তুমি ঠিকই বলেছ, ন্যায়না...এটা একটা রুপার আস্তরণ,' উত্তর দিলেন মহান মঠাধীশ।

'আমি আনন্দিত যে ঐশ্বরিক সর্পরাজ প্রভুর পাশে আছেন। কিন্তু এখন বিদ্যুৎ ও দামিনীকে আমাদের সবকিছু দিয়ে রক্ষা করতে হবে।'

সবাই সম্মতিতে মাথা নাড়লো, যদিও পরবর্তীতে কী করা দরকার তা কেউই পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত নয়। এক মিনিটের নীরবতার পরে দ্বারকা শাস্ত্রী বলভান্ত এবং বিদ্যুতের দিকে ফিরলেন, মরিয়া হয়ে উত্তর খুঁজছিলেন তারা। তিনি ভালো করেই জানেন যে তারা এমন শত্রুর সাথে লড়াই করতে পারবে না যাকে তারা চিনেও না, বুঝেও না।

'এই দুষ্ট আক্রমণকারীরা কারা, যারা পেছন থেকে অসম্মানজনকভাবে হত্যা করে, বিদ্যুৎ? বলভান্ত, এই জঘন্য ঘাতক কারা? আমি আগে কখনো এমন গোপনীয় পদ্ধতি দেখিনি!' মহান বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন। প্রতিরক্ষা এবং পালটা আক্রমণের পদ্ধতি খুঁজছেন তিনি।

বিদ্যুৎ দ্রুত তার প্রপিতামহ এবং মঠের প্রতিটি যোদ্ধাকে প্রাণঘাতী নিনজা সম্পর্কে বলতে যাচ্ছিলো, ঐ মুহূর্তে সে লক্ষ করলো বেসমেন্টের ভেন্টিলেটর জুড়ে অন্ধকার ছায়া ঘোরাঘুরি করছে।

'ওরা এখানে এসে পড়েছে, বাবা...' বিদ্যুৎ ফিসফিস করে বললো। 'আমাদের সবার এখানে থাকা উচিত হবে না। ওরা একসময় না একসময় এখানে ঢুকে পড়বে। এমনকি তারা নির্মমভাবে বেপরোয়া হতে পারে এবং এক ধরনের

স্নায়বিক গ্যাস ব্যবহার করতে পারে। মোবাইল জ্যামারগুলো তাদের অত্যাধুনিক পদ্ধতির একটা ছোট উদাহরণ মাত্র। সাদা মুখোশ মঠের প্রতিটি পুরুষ, মহিলা এবং শিশুকে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না, যদি এতে তার লক্ষ্য পূরণ হয়।'

'বিদ্যুৎ, এরা কারা?' দামিনী ভয়ে চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলো।

'ওরা নিনজা, দামিনী। জাপানে উদ্ভূত ঘাতকদের একটা মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়। বর্বরতা এবং প্রতারণামূলক পদ্ধতির কারণে এরা সামুরাইদের থেকেও নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত। নিনজা যুদ্ধ-শিল্প ১৯ শতকে পশ্চিমে চর্চা করা শুরু হয়েছে। এরা এখন পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক ঘাতক।'

রুমে আবারো পিনপতন নীরবতা নেমে এলো, কয়েকজন দরদর করে ঘামছে।

'তাহলে...তাহলে এর মানে কী, বিদ্যুৎ?' বলভান্ত জিজ্ঞেস করলো।

'এর মানে হলো আপনি যদি ভেবে থাকেন, যে শুধুঘাতকরা রুমি পেরেরার সাথে এসেছে তারা অনেক দক্ষ যোদ্ধা ছিলো, তাহলে নিনজারা এক কথায় অপরাজেয়।'

মহাপ্রলয়, খ্রিস্টপূর্ব ১৬৯৮ অব্দ
'মজ...অ্যস্য!'

'ওরা সবাই মারা যাবে...' মানু নিজেকেই বিড়বিড় করে বললো। 'আর আমিও তাদের সাথে মারা যাবো।'

এই দুর্দান্ত মানুষগুলো, এই যুবক-যুবতী, শিশু, বৃদ্ধ এবং নিঃস্ব, এই সমগ্র সমষ্টিকে আমি চিরকাল রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তারা এখন পিঁপড়ার মতো পিষ্ট হবে।

মানু এখন প্রথমবারের মতো তার সাহসী উদ্যোগের ভয়াবহ বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করছে। সত্যের এই বিভীষিকাময় মুহূর্ত পর্যন্ত সে সমুদ্র-গোত্রের রহস্যময় প্রভুর উদ্ভট অথচ নিয়তিপূর্ণ আদেশ পালনে নিমগ্ন ছিলো।

যখন সে দেখলো বিশ হাজার পাটের রশি ও গাছের লতা ব্যবহার করার পরেও দৈত্যাকার জাহাজটি হেলে পড়েছে, তখন প্রায় ভঙ্গুর, জোড়াতালি দেওয়া স্থাপত্য শক্তির তরুণ এই নেতা জমে গেল। নদী-সমুদ্রের হিংস্র, দানবীয় ঢেউ মানব জাতির নির্মিত সবচেয়ে বড় জাহাজে আছড়ে পড়ছে। আর ভয়ংকর বন্যা তা ডুবিয়ে দিতে যাচ্ছে।

ঘাতক প্রলয় কি জানে এই শেষ তরীটি কী অপূরণীয় পণ্য বহন করে?

* * * * *

চূড়ান্ত, সর্বজনীনভাবে ধ্বংসাত্মক বন্যা যে এগিয়ে আসছে তা বলা কঠিন কিছু ছিলো না।

লাল-কালো বেগুনি মেঘ, যেগুলো দেখে মনে হচ্ছে কোনো উন্মাদ স্বর্গীয় চিত্রকর বাসি রক্তের রঙে আকাশ রাঙিয়ে দিয়েছে, সমস্ত পরিচিত পৃথিবীকে আবৃত করেছে।

ইন্দ্রের বজ্রপাতের উন্মত্ত গর্জন এবং হিংস্রভাবে বর্ষিত প্রবল বৃষ্টির অপ্রাকৃতিক ঝড় কেয়ামত বা চূড়ান্ত সমাপ্তির ঘোষণা করছে। বাঘের দাঁতের

আকারের ফোঁটাগুলো আকাশ থেকে পড়ছে, মানু এবং তার অনুগামীদের আঘাত করছে। মনে হচ্ছে যেন আকাশ থেকে যন্ত্রণাদায়ক জলের বর্শা নিক্ষেপ করা হচ্ছে এবং তাদের শরীর ভেদ করে চলে যাচ্ছে।

বীর নারী ও পুরুষদের এই দল যেই জাহাজে নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখছিলো তা কোনো সাধারণ জাহাজ ছিলো না।

এ ছিলো শেষ জাহাজ। বন্দর থেকে ছাড়া শেষ জাহাজ নয়। বহরের শেষ জাহাজ নয়। ঋতুর জন্য বন্দর ছেড়ে যাওয়া বা রাতের জন্য দূরে থাকা নাবিকের জন্য শেষ জাহাজ নয়। এ ছিলো সৃষ্টির শেষ জাহাজ। সেই জাহাজ যেখানে পৃথিবী নিজেই আশ্রয় নিতে যাচ্ছে তার সমস্ত সন্তানদের সাথে করে।

এ ছিলো মহান যোদ্ধা, পুরোহিত, তপস্বী, দার্শনিক এবং রাজা মানুর চূড়ান্ত পরিত্রাণ। এ ছিলো তার জাহাজ।

মানুর জাহাজ।

* * * * *

একটা জাহাজের বিরুদ্ধে এক লক্ষেরও বেশি নর-নারীর নিষ্ঠুর সংগ্রাম, যার বিস্তৃতি এমনকি দেবতারাও কল্পনা করতে পারেননি, এমন এক দৃশ্য যা আগে কখনো এই গ্রহে দেখা যায়নি। আর কখনো দেখাও যাবে না।

মানুর বিশাল জাহাজটি একটা পরিপূর্ণ শহরের আকারের ছিলো। এর উদ্দেশ্য এতটাই মহৎ ছিলো যে মানব জাতি কখনো তা অনুধাবন করতে পারবে না।

এটা ছিলো একটা দরজা। ধারাবাহিকতার একমাত্র সেতু। ক্ষয়িষ্ণু, প্রাচীন পৃথিবী থেকে পুনরুত্থানের নতুন ভোরের। এটা প্রকৃতির নির্দেশে হওয়া কেয়ামত ও মানুষের বেঁচে থাকার প্রবৃত্তির মধ্যকার এক ভয়ংকর প্রতিযোগিতাকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। এমনকি স্বর্গও মনে রাখবে, এমন লড়াই ছাড়া মানব জাতি অত সহজে ধ্বংস হবে না।

কিন্তু এই বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অনেক কিছু হারাতে যাচ্ছে। মানব জাতি দ্বারা অর্জিত বহুমূল্য এবং অপরিবর্তনীয় জ্ঞান এই দুর্যোগময় দ্বার পার হয়ে যেতে পারেনি। প্রাচীন আলকেমি, চিকিৎসাবিদ্যা, বিমান চালনা, জাদুবিদ্যা, স্থাপত্য, অস্ত্রশস্ত্র এবং আধ্যাত্মিকতা সবই চিরতরে বিলুপ্ত হতে চলেছে, মহাপ্লাবনের পরে ডুবে যেতে চলেছে প্রবল মহাসমুদ্রের তলদেশে। তবুও পুরো আর্যাবর্ত জানতো যে জাহাজটি জীবনের জন্য আশার শেষ রশ্মি ছিলো।

আমরা যেমন নক্ষত্র, ছায়াপথ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের মতো সৃষ্টির মাঝে ঈশ্বরের গভীর নিদর্শন দেখে হতবাক হয়ে যাই, তেমনি প্রভুর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহে জীবন।

মহৎ, স্থিতিস্থাপক...জীবন।

সেই সত্তা যারা কাঁদে, ব্যথা পায়, জন্ম দেয় এবং সীমাহীনভাবে ভালোবাসে। সেই সত্তা যারা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব।

আর এই সত্তাকেই রক্ষা করা দরকার ছিলো।

সবকিছুর আগে।

* * * * *

মোটা, বাঁকানো এবং ভিজে যাওয়া দড়ি আর লতাগুলো এখন মানুর সৈন্যদের বাহু, ঘাড় আর মাংস কেটে ফেলছে। একটা ভাসমান শহরের মতো বড় জাহাজকে রশি দিয়ে টানতে যে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে, তাতে তাদের আঙুলগুলো ভেঙে গেছে, কাঁধ স্থানচ্যুত হয়েছে এবং বাহু কেটে-ছড়ে যাচ্ছে। পুরুষ, মহিলা এবং শিশুরা অকল্পনীয় ওজনের এক ভয়ংকর শক্তির বিরুদ্ধে সমানভাবে লড়াই করছে। এরা সবাই নশ্বর রক্ত ও হাড় দিয়ে তৈরি, অথচ জাহাজ তৈরি হয়েছে ভারী কাঠ, তামা ও শিলাপাথর দিয়ে, এতটাই বিশাল যে জলে দড়ি টেনে নিয়ে যাওয়া লোকেরা এই বিশাল জাহাজের মাস্তুলের আভাসও পায়নি। এমনকি যদি তারা বীভৎস আকাশের দিকে সরাসরি না তাকায় এরপরেও।

জাহাজটি সুমেরু পর্বতের চেয়ে লম্বা এবং দাসরাজনা বা দশ রাজার চূড়ান্ত যুদ্ধ আয়োজন করা রক্তাক্ত মাঠের চেয়েও চওড়া। ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠছে মানু। সে আঁকাবাঁকা শঙ্খটি বের করলো, যা মৎস্য তাকে দিয়েছে শুধু সবচেয়ে খারাপ বিপর্যয়ের সময় সংকেত হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। আর সেই সময়টা এসে পড়েছে। তার নিবেদিতপ্রাণ মানুষের আসন্ন ও বেদনাদায়ক মৃত্যুর চেয়ে বিপর্যয়কর আর কিছুই হতে পারে না।

মানু তার চামড়ার কবজি-গার্ড দিয়ে মুখ মুছে একটা গভীর শ্বাস নিয়ে শঙ্খে ফুঁ দিলো। ভয়ানক, উন্মাদনাপূর্ণ ডাকে চিৎকার করে উঠলো ওটা, ঝড়ে আক্রান্ত আকাশকে যেন বিভক্ত করে ফেললো। মানু একা দাঁড়িয়ে আছে এক ভয়ংকর পাহাড়ের চূড়ায়, যেটাকে রক্তলাল আকাশের নিচে কয়লার মতো কালো দেখাচ্ছে। মানু তার হাতের তালু দিয়ে বৃষ্টির বিরুদ্ধে চোখ ঢাকলো, তাকিয়ে রইলো কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তের দিকে। কিছুই দেখতে পেল না সে। প্রতি মুহূর্তে হতাশা বাড়ছে তার। সে পরাজয়ের অশ্রু চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আবারো সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঁকানো শিংয়ে ফুঁ দিলো মানু। বাঁকানো শিংয়ের চিৎকারটা একটা ক্রুদ্ধ ড্রাগনের কান্নার মতো শোনাচ্ছে। এই চিৎকার মানুর হাজার হাজার

লোকের কানের পর্দায় আঘাত করছে সুচের মতো। মানু আকাশের দিকে তাকালো এবং চোখ কুঁচকে পাহাড়ের সমান ঢেউয়ের ওপারে তাকানোর চেষ্টা করলো। সে যাকে সত্যিকারের ত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস করেছে, তার ম্লান ছায়া দেখার আশা করছে।

কিন্তু সে কিছুই দেখতে পেল না।

* * * * *

'মঅ...অৎস্য!' মানু চিৎকার করে উঠলো, সে একধরনের ঘোরের মাঝে ছিলো। সে বিশাল পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে রইলো, যা সে নজরদারি, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তার ক্লান্ত, ভীত ও আশাভরা চোখ প্রলয়ংকরী প্রলয়ের দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলো। বৃষ্টির ফোঁটা তার সুদর্শন, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত মুখের উপর পড়ছে। সে সম্ভবত তার উচ্চাভিলাসী উদ্যোগকে ধীরে ধীরে ব্যর্থ হতে দেখে ভয় পেয়ে কাঁদছিলো। এই একটা চিন্তাই তার এই অপ্রাকৃত টাইফুনের সাথে লড়াই চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব করে তুলেছে।

তার প্রিয় বাবা, মহান বিভাসন পূজারির পর সে একমাত্র যাকে বিশ্বাস করেছে, সে কি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো? তার বন্ধু, পরামর্শদাতা, নিরাময়কারী...তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো? তার প্রিয় মৎস্য কি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো?

'মঅঅঅত্তত্তসস্যাঅআআআআআ...আআআআরআরহহ!' আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো মানু। তার বাহু প্রসারিত, ফুসফুস বিস্ফোরিত হওয়ার অবস্থায় আছে। যেন সে চাইছে স্বর্গ থেকে তার মরিয়া আবেদন কেউ শুনুক।

এরপর সে ওটাকে দেখতে পেল। বন্যার শেষ মাথায় সমুদ্রের নির্দয় ঢেউয়ে চড়ছে।

লোক-নাস, সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক দানব, দূরের ঢেউয়ে তার বিশাল মাথা ওঠাচ্ছে। মানু এই প্রথম রূপকথার এই দানবের ঝাপসা বাহ্যিক গঠন দেখতে পেল।

আর সেখানেই হাইড্রার জ্বলন্ত চোখের মাঝে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। মৎস্য।

ঠিক করা হলো, বিদ্যুৎ, বলভান্ত ও ন্যায়না পালটা আক্রমণের নেতৃত্ব দেবে। একমাত্র তাদেরই ভয়ংকর নিনজাদের সাথে লড়াই করার মতো দক্ষতা রয়েছে। মঠের ত্রিশজন বাছাই করা যোদ্ধা তাদের পিছু পিছু যাবে। ওরা সবাই আপাদমস্তক তলোয়ার, বর্শা ও শটগানসহ নানান অস্ত্রে সজ্জিত। সনুকে দামিনী, দ্বারকা শাস্ত্রী, পুরোহিতজি এবং মঠের বাকি বাসিন্দাদের পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যারা আপাতত বেসমেন্টেই আশ্রয় নেবে। সনুর সাথে দেব-রাক্ষস মঠের আরো বিশজন সৈন্য পাহারা দেবে।

'এটা রাখো, বিদ্যুৎ।' দেবতার হাতে একটা ঝলমলে কালো বেরেটা ৯২ সেমি-অটোমেটিক পিস্তল তুলে দিলেন বলভান্ত। 'আমি জানি তুমি আমার যুদ্ধের উপায়গুলোকে অনুমোদন করো না, তবে যখন অন্য কোনো কিছু কাজ করবে না, তখন এটা তোমাকে সাহায্য করবে।'

বিদ্যুৎ ভদ্রভাবে মাথা নাড়লো, প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলো।

'তোমার আশীর্বাদ আমার সাথে থাকলে আমার দরকার হবে না, বলভান্ত, দাদা। বাবা আমাকে এখন নিরস্ত্র এবং অরক্ষিত অবস্থায় বের হতে দেবেন না, তাই না? তাছাড়া, আমাকে সাহায্য করার জন্য সব সময় তুমি তো আছোই আমার সাথে।'

এই বলে বিদ্যুৎ বৃদ্ধ যোদ্ধার কাঁধে হাত রেখে হাসলো।

বলভান্তের মনে হলো তার বুক থেকে একটা পাহাড় সরে গেছে। অবশেষে তার প্রিয় বিদ্যুৎ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে!

'সুস্থভাবে আমার কাছে ফিরে এসো, প্রিয়,' দামিনী তার দেবতাকে বিদায় জানাতে গিয়ে ফিসফিস করে বললো, কণ্ঠস্বর আবেগে ভারাক্রান্ত। 'আমাদের একসাথে ওপারে যেতে হবে, মনে আছে?'

'একসাথে,' বিদ্যুৎ উত্তর দিলো। এরপর সে তার কপালে স্নেহের সাথে স্পর্শ করলো, তার চোখের গভীরে তাকালো। দেবতা জানতো যে সে তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধে নামতে চলেছে, যার মানে সে আর কখনো ফিরে না-ও আসতে পারে।

ও আসলে মারাত্মক নিনজাদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলো না। তাদের পরে যে আসতে যাচ্ছে তাকে নিয়ে সে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলো।

মাশ্চেরা বিয়ানকা। শয়তানের দূত।

* * * * *

এখন নিনজাদের আঘাত পাওয়ার পালা। তিনটি ভিন্ন দিকে বিভক্ত হয়ে বিদ্যুৎ, ন্যায়না এবং বলভান্ত দেব-খণ্ডের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের মতো প্রশিক্ষিত মার্শাল আর্টিস্টদের অন্ধকারের লড়াইয়ে অভ্যস্ত হতে বেশি সময় লাগেনি। অন্ধকারে যত তাদের চোখে সয়ে আসতে লাগলো, তারা অন্ধকার কোণের ছায়াগুলোকে ততই আরো স্পষ্টভাবে দেখতে থাকলো। একবার দেখতে শুরু করার পর থেকে আরো কঠোরভাবে পালটা আঘাত করতে শুরু করলো তারা।

একটা জাপানিজ ছুরি এড়িয়ে গেল বিদ্যুৎ, যা প্রায় তার কান ছুঁয়ে চলে গেল। প্রায় সাথে সাথে আক্রমণকারীর দিক ও দূরত্ব বিচার করে বিদ্যুৎ নিনজার গলায় তার মুষ্টি দিয়ে একটা নিখুঁত ইসরায়েলি ক্রাভ মাগা বসিয়ে দিলো। আক্রমণকারীর কয়েক সেকেন্ডের জন্য দম বন্ধ হয়ে গেল। আর তারপর সে তার ঘাড় চেপে ধরে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল এবং অসহ্য যন্ত্রণায় চেঁচাতে থাকলো। এভাবে আরো দুজন নিনজাকে ধরাশয়ী করলো সে। বিদ্যুৎ এরপর একটা খোলা করিডরে এসে পড়লো যেখান থেকে দেব-খণ্ডের পুরো লন ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। সে যা দেখলো তাতে তার মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের শীতল শিহরন বয়ে গেল।

বাবা!

দ্বারকা শাস্ত্রীকে তাদের সাধারণ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ঘিরে রেখেছে সাতজন নিনজা। বুড়ো মঠাধীশকে বুনো কুকুরের দলে ঘেরা একটা বৃদ্ধ সিংহের মতো দেখাচ্ছে। মহান মঠাধীশ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেননি; কারণ তার প্রিয় প্রপৌত্র বাইরে ভয়ংকর শত্রুর সাথে লড়াই করছে। তিনি ত্রিশূল হাতে বাইরে বের হয়ে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত, ১০৮ বছর বয়সি এই মহাতান্ত্রিক বিশ্বের সবচেয়ে দক্ষ পেশাদার খুনিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তাদের প্রশিক্ষিত তলোয়ার তাকে চোখের পলক ফেলার আগে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

* * * * *

বরফের ধসের মতো ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো দেবতা। নিনজারা বুঝতে পারলো না কী তাদের উপর আক্রমণ করেছে। আর তারপর তারা দেবতাকে ঘাসের উপর হাঁটতে দেখলো, যেমনটা হিংস্র চিতা তার শিকারের আশেপাশে ঘোরে। সে প্রথম তলার করিডর থেকে সোজা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, আর দুর্বল করে দিয়েছে আচমকা আক্রমণ করে। তার চোখ এখন ক্রোধ আর ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে। যে-ই বিদ্যুতের প্রিয় পিতামহের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে, সে-ই তার কাছে পরিণত হয়েছে সবচেয়ে ঘৃণ্য শত্রুতে। আর যে ব্যক্তি দেবতার চূড়ান্ত ক্রোধের শিকার হওয়ার বিশাল ভুল করেছে, সে খুব হতভাগ্য। ভয়ংকরভাবে হতভাগ্য। এদিকে ছয়জন নিনজা বিদ্যুৎকে আক্রমণ করলো। সাত নাম্বার জন তার তলোয়ার চালালো মহান মঠাধীশের উপর।

এই বৃদ্ধ বয়সেও মহান মঠাধীশ তার ত্রিশূল দিয়ে তলোয়ারটি আটকে ফেললেন। বিদ্যুৎ যখন অর্ধ-ডজন ঘাতককে আক্রমণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে, তখন হেলিকপ্টার রোটারগুলোর গর্জনসহ একটা চোখধাঁধানো আলো গোটা দেব-খণ্ডকে সোনালি হলুদ আভায় আলোকিত করে ফেলেছে।

দেব-রাক্ষস মঠের উপরে ঘুরতে থাকা বিশাল রুপালি পাখিটির থেকে একটা ধাতব তারের সাহায্যে কমান্ডোদের মতো করে সাদা মুখের কালো রাক্ষস নিচে নামলো।

সে তার সবুজ চোখ দিয়ে প্রায় সবকিছু ভস্ম করে ফেলছে।

যাচ্ছেরা বিরানকা দেব-রাক্ষস গোত্রের পবিত্র মাটিতে অবতরণ করেছে।

* * * * *

হাত তুলে ব্ল্যাক নাইটদের থামতে বললো সাদা মুখোশ। এরপর বাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটে বিদ্যুতের থেকে মাত্র দশ মিটার দূরে এসে দাঁড়ালো। হেলিকপ্টারের বধির গর্জন শুনতে পেয়ে ন্যায়না এবং বলভান্তও ছুটে এলো।

'তুমি সত্যিই অসাধারণ, বিদ্যুৎ...বিগম্যান ঠিকই বলেছে!' চেঁচিয়ে উঠলো সাদা মুখোশ। তার যান্ত্রিক পাখিটি ধীরে ধীরে মঠ থেকে সরে কাশীর রাতের আকাশে উড়ে গেল।

সাদা মুখোশ কথা চালিয়ে গেল।

'আমি শুনেছিলাম তুমি কীভাবে একাই দশজন রাশিয়ান ভাড়াটে খুনিকে হারিয়েছ, কিন্তু আমি আশা করিনি যে তুমি নিন...'

'বারোজন ছিলো।'

সাদা মুখোশ বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

'দুঃখিত, কী বললে?'

'বারোজন ভাড়াটে খুনি ছিলো...দশজন নয়,' বিদ্যুৎ তার সবুজ চোখের দিকে তাকিয়ে নির্ভয়ে বললো।

সাদা মুখোশ হেসে উঠলো, আরো নিনজা বাগান এলাকায় এসেছে। প্রায় একই সময়ে মঠের বেশ কয়েকজন যোদ্ধা-পুরোহিতও লড়াইয়ের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছেছে।

'বিদ্যুৎ, তোমার কাছে এখনো সময় আছে। আমাকে বলো তোমার সর্বশক্তিমান কল্কি কোথায় আছে। একদম সহজ হিসাব, বন্ধু। আজও আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো। আর এই লম্বা বুড়োকে যেতে দেবো। এমনকি তোমার প্রিয়তমাকেও যেতে দেবো। কিন্তু তুমি যদি সব সময়ের মতোই জেদ ধরে থাকো, তবে আমি এই পুরো আশ্রম পুড়িয়ে ফেলবো। এই মঠের প্রতিটি প্রাণীর চামড়া জীবিত অবস্থাতেই তুলে নেবো আজ রাতে।'

বিদ্যুৎ ঘৃণার সাথে তার মুষ্টি বন্ধ করলো।

'ওদের সবাইকে যেতে দাও, মাশ্চেরা। তোমার ব্ল্যাক নাইট, আমার যোদ্ধা পুরোহিত...সবাইকে। চলো, শুধু আমরা দুজনেই সকল হিসাব মিটিয়ে নেই। তুমি আর আমি। আজ এবং এখনই।'

মাশ্চেরার চেহারা পালটে গেল। বিদ্যুৎ যা দেখছে তা বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে হচ্ছে ইটালিয়ান ডনের চোখের সব রং শুষে নেওয়া হচ্ছে...চোখগুলো একেবারে সাদা বর্ণের হয়ে গেল।

সাদা চোখের রাক্ষস বিদ্যুৎকে ঘিরে রাখা নিনজাদের দিকে তাকালো। মাথা নাড়লো সে। পরের মুহূর্তেই বিদ্যুৎ তার কাঁধে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলো। পেছন থেকে আক্রমণকারী কাপুরুষদের মোকাবেলা করতে দেবতা যখন ঘুরে দাঁড়ালো, তখন সে তার উরুতে আরেকটা তরবারির আঘাত অনুভব করলো। পায়ে ক্ষত থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ একটা নিখুঁত জুজুতসু লাথিতে একজন তলোয়ারধারীর চিবুকে আঘাত করলো। ঘুরে পাঁচ ফুট দূরে গিয়ে পড়লো লোকটি।

কিন্তু মেরুদণ্ডহীনের মতো করা এই অঘোষিত, বেদনাদায়ক আক্রমণ দেবতাকে বিস্মিত করেছে। অসহ্য যন্ত্রণার অস্পষ্টতায় বিদ্যুৎ একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

সে জানে এটা কে।

'তুমি বোকা, হে দেবতা!' বললো মাশ্চেরা বিয়ানকা। 'যাদেরকে কখনো হারাতে পারবে না, তাদের সাথেই লড়ছো তুমি। দুঃসাহসিক সাহসে আমার চোখে

চোখ রেখেছ, আমাকে দেখাতে চাইছো যে তুমি ভয় পাও না। তুমি কি জানো না, তুচ্ছ ছেলে? এমনকি মৃত্যুও সাদা মুখোশকে ভয় পায়!'

ওরা যেখানে ছিলো সেখানে যাওয়ার চেষ্ট করলো বিদ্যুৎ।

কিন্তু আরো নানচাক এবং জাপানি তরবারি তাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো। আঘাত ও রক্তের মায়াত্মক বাঁধে চাপা পড়ে বিদ্যুৎ কোনোমতে নিজের চেতনা ঠিক রাখতে পারছে। একই সাথে হাত বাড়িয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করছে মঠাধীশের কাছে যাওয়ার। তার মুখ দিয়ে শেষ একটা যন্ত্রণাদায়ক শব্দ বের হলো।

'বাবাআআআআআআহ!'

সাদা মুখোশ এখন ঠিক মঠাধীশের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

তার চোখ ছিলো স্বয়ং মৃত্যুর শীতল চোখ।

মহাপ্রলয়, খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৯৮ অব্দ
লোক-নাস!

বিশাল জাহাজটি এখন বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়ছে, প্রলয়ের বিশাল ঢেউ সামলাতে অক্ষম। বিশাল জাহাজটির ওজন পাহাড়ের চেয়েও বেশি, অথচ এরপরেও এই ভাসমান শহরটি ডুবে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

জাহাজের বিশাল কাঠামোতে সমুদ্রের ঢেউ এমন ভয়ংকরভাবে চাপ দিচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন এক মিলিয়ন তিমি জাহাজের হালে ধাক্কা দিচ্ছে। বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টি এতটাই তীব্র যে জাহাজের বেশ কয়েকটা শীর্ষ ডেক প্লাবিত হয়ে উপচে পড়েছে। হাজার হাজার নারী-পুরুষ পানি ফেলার জন্য অবিরাম কাজ করছে, কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না।

প্রবল ঢেউয়ের সাথে ঝড়ো বর্ষণের আক্রমণ জাহাজকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। মহাতরীর সব বাসিন্দাকে আতঙ্ক গ্রাস করতে শুরু করেছে। মায়েরা তাদের বাচ্চাদের ধরে রেখেছে, বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করছে, তাদের উদ্ধারে আসার জন্য তাকে অনুরোধ করছে। হাজার হাজার প্রজাতির পাখি ও প্রাণী এখন বিশৃঙ্খল আতঙ্কে কাতরাচ্ছে, গর্জন করছে, কান্নাকাটি করছে, ঝাঁকুনি দিচ্ছে। বন্দি দৈত্যরা তাদের হাত, মাথা ও শরীর দিয়ে কারাগারের শিকগুলোতে আঘাত করছে, তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছে। কারণ এই অবস্থায় কারাগারগুলো ছিলো নিশ্চিত মৃত্যুফাঁদ।

দড়ি ব্যবহার করে হাজার হাজার নারী-পুরুষ তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে জাহাজের ভারসাম্য ঠিক রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে। জাহাজের অনেক বাসিন্দাই তাদের হাত-পা হারালো, অনেকে জাহাজের হাজার হাজার ফুট নিচে টাইফুনের ভয়ংকর চোয়ালের মাঝে পড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল চিরতরে।

* * * * *

মানু যে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলো সেটাও ডুবে গেল। মারাত্মক এক নৌকা যাত্রার পরে সে আবারো ফিরে এসেছে জাহাজে, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সেই দানবটার জন্য যেটা বিশাল ঢেউ ভেদ করে ডুবতে যাওয়া এই কাঠের শহরের দিকে এগিয়ে আসছে।

রূপকথার সামুদ্রিক দানবের সত্যিই তাহলে অস্তিত্ব রয়েছে। এটা কোনো কিংবদন্তি নয়। আর মৎস্য তার কর্তা!

মানুর চমৎকার বিভ্রম শীঘ্রই শ্বাসরুদ্ধকর বাস্তবতার কারণে দূর হয়ে গেল।

সম্ভবত দশ হাজার লোক আছে ওখানে। ঝকঝকে মাছের আঁশ দিয়ে তৈরি পোশাক পরে তারা জীবের মতো চলাফেরা করছে। সত্যব্রত মানু, শতরূপা, ধ্রুব, প্রচণ্ড এবং বাকি জাহাজিরা এই ভাসমান উপনিবেশটিকে মহাতরীর কাছে আসতে দেখে হতবাক হয়ে গেল।

মৎস্য-মানবেরা দ্রাক্ষালতা ব্যবহার করে ছোট নৌকাগুলোর মধ্যে একটা অন্তর্নির্মিত নেটওয়ার্ক তৈরি করে একে অপরের সাথে সংযুক্ত আছে, যে সংযোগ কয়েক মাইলব্যাপী বিস্তৃত। হালকা ডিঙিগুলোর এই জালের মতো গঠনের কারণে এই বিস্তীর্ণ কলোনিটি এই ঢেউয়ের মধ্যেও ডুবে যায়নি। ওরা সকলেই মাছ এবং সর্পের চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক পরেছে, যা কয়েক মাইল দূর থেকে আসা বজ্রপাতের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। জলজ উপনিবেশের একদম সামনের নৌকাটি ছিলো মৎস্যের নিজের। একটা চওড়া ভেলা, যার উভয় পাশে একশত দাঁড় রয়েছে। জাহাজের সামনের মাথার উভয় প্রান্তে দুটি চকচকে গোলাকার ঢাল লাগানো। যা সমুদ্র-যুদ্ধে সূর্যের আলো বা বজ্র প্রতিফলিত করে নিকটবর্তী শত্রুকে অন্ধ করতে ব্যবহৃত হয়। বিশাল ঢালগুলো দেখে মনে হচ্ছে কোনো বিশাল হাইড্রার চোখ।

তাহলে এইভাবে ভয়ংকর সামুদ্রিক দানবের কিংবদন্তি চলে এসেছে! কয়েক হাজার মৎস্য-মানবের ঝলকানো মৎস্য-চামড়ার পোশাক, তাদের অনুশীলন, ক্রমান্বয়ে চলাফেরার কারণে এটাকে একটা বিশাল সাপের মতো দেখা যায় এবং সামনের ঢালগুলো বিশাল চোখের মতো জ্বলজ্বল করে। লোক-নাস কোনো জীবন্ত জল-দানব নয় তবে। এ তবে মৎস্য-গোত্রের ভাসমান শহর!

* * * * *

মৎস্য-উপজাতির নৌকা থেকে লক্ষাধিক হুক এবং হারপুন উড়ে গেল। অসংখ্য প্রজেক্টাইল এই বিশাল জাহাজের নিচের ডেকের রেলিং এবং জানালার সাথে আটকে যাচ্ছে। সমুদ্রের উপর মহৎ নীল-মানব এবং তার মৎস্যজীবীদের যে

আধিপত্য আর প্রভুত্ব ছিলো, তা এখন মানু আর তার লোকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অগণিত হুক আর হারপুনের দড়ি তাদের চটপটে তরীর সাথে সংযুক্ত করে ভাসমান উপনিবেশের বিস্ময়কর মানবরা সারিবদ্ধ হয়ে প্রায় উলটে যাওয়া জাহাজ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছে। মৎস্য-মানবরা তাদের শরীরের প্রতিবিন্দু শক্তি ব্যবহার করে দাঁড় বাইতে শুরু করলো। মাঝিদের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য পালগুলোকে একটা জটিল বিন্যাসে সাজানো হয়েছে। পালগুলোকে দক্ষতার সাথে চালিত করা হচ্ছে, শক্তিশালী বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে জাহাজের পক্ষে।

পদ্ধতিটা ধীরে ধীরে কাজ করতে শুরু করেছে। দশ হাজার জোড়া হাত ও বিশেষভাবে প্রকৌশল করা শত শত পালের সম্মিলিত শক্তি প্রবল চালিকাশক্তি সৃষ্টি করেছে যা একটা পাহাড়কেও নাড়াতে সক্ষম ছিলো। মহাতরীটি ধীরে ধীরে ঘুরে তার সঠিক ভারসাম্যে ফিরে আসছে।

বিষ্ণু তাদের প্রার্থনা শুনেছেন। মানব জাতি প্রলয় থেকে বাঁচতে যাচ্ছে!

বানারস, ২০১৭

'বাবাআ...আআআহ!'

'আমাদের আবার দেখা হবে, বিদ্যুৎ, আমার বাছা...আমাদের আবার দেখা হবে অন্য জীবনে...' হাঁফিয়ে উঠলেন দ্বারকা শাস্ত্রী। মাশ্চেরা বিয়ানকা তার পছন্দের অস্ত্রটি মহান মঠাধীশের পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে বিদ্যুৎ, শরীরের বেশ কিছু গভীর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পৃথিবীটা যেন একেবারে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, হিংস্র কুয়াশার মতো ঝলমল করছে তার ম্লান চোখের সামনে। মুখ থেকে প্রচুর রক্ত ঝরছে, চরম যন্ত্রণায় ঠান্ডা ঘামে ভিজে যাচ্ছে।

'বাবা...' সে আবার ফিসফিস করে বললো, জ্ঞান না হারানোর জন্য লড়াই করছে।

কিন্তু মাথা ঘোরা যন্ত্রণার মধ্যেও ভয়ংকর সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে...যেন অন্য কোনো মহাবিশ্ব থেকে আসছে।

রক্তধারার অভিশাপ!

এই দুর্ভাগ্যজনক রাতে তুমি যেভাবে ঐশ্বরিক ঋষিদের একের পর এক জ্বলতে দেখেছ, ভাগ্যও তোমার বংশকে তেমন হিংস্রভাবে ধ্বংস হতে দেখবে, পুত্রের পর পুত্র, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। আমি তোমাকে এবং তোমার সমগ্র রক্তরেখাকে অভিশাপ দিলাম, হে পতিত দেবতা...

* * * * *

সাদা মুখোশ দ্বিতীয় আঘাতটি সরাসরি মঠাধীশের হৃদয়ে করলো। দীর্ঘ স্ক্রু ড্রাইভারের লাল মাথাটি ক্রুশের পেরেকের মতো মহান বৃদ্ধের বুক থেকে বেরিয়ে এসেছে। মহান মঠাধীশের মুখ থেকে রক্ত বের হয়ে আসতেই তিনি তার স্রষ্টার

সাথে দেখা করার প্রস্তুতির জন্য প্রার্থনা করলেন। এই শেষ সময়েও তাকে দেখে একজন গর্বিত এবং তৃপ্ত মানুষ বলে মনে হচ্ছে। কাশীর এই মহাতান্ত্রিক তার দৈব নিয়তি পূর্ণ করেছেন।

মৃত্যুর মুহূর্তে এমনকি দেব-রাক্ষস বংশের পুরোনো মঠাধীশও রক্তধারার হিংস্র কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন, যার প্রতি তিনি পরম এবং একনিষ্ঠ ভক্তি নিয়ে চোখ বন্ধ করেছেন।

'তোমার বংশের প্রত্যেকটি ছেলের আজকের মতো হিংস্র ও ভয়ংকর মৃত্যুর শিকার হবে।

আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম!

তোমার পুরো রক্তরেখাকে অভিশাপ দিলাম!

এই অভিশাপ শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হবে!'

'আমি আপনাকে রক্ষা করবো, বাবা...' বিদ্যুৎ বিড়বিড় করে বললো। সে তার শক্তি ও দৃঢ়তার শেষ বিন্দুকে জড়ো করার চেষ্টা করছে। তার জায়গায় অন্য যেকোনো মানুষ থাকলে এতক্ষণে ব্যথায় আত্মহত্যা করতো। কিন্তু বিদ্যুৎ শুধু সাধারণ একজন মানুষ ছিলো না। সে ছিলো দেবতা!

সে উঠে দাঁড়ানোর জন্য লড়াই করার সময় হাত দিয়ে তার মুখের রক্ত মুছলো। কিন্তু সে খুব দেরি করে ফেলেছে। সে যখন চোখ খুললো, ততক্ষণে মহিমান্বিত দ্বারকা শাস্ত্রীর মহান জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। বিদ্যুতের চোখের সামনে মাশ্চেরা তার প্রাণঘাতী স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে বিদ্যুতের প্রিয় প্রপিতামহের দেহ নির্দয়ভাবে খোঁচাচ্ছে।

অন্ধকার প্রাচীন অভিশাপকে সত্য করে দিয়ে শাস্ত্রী রক্তরেখার আরো একজন দুর্দান্ত পুত্র একটা সহিংস, নৃশংস পরিণতির মুখোমুখি হয়েছে।

'নাআআআআআআআআআআআ!' সেই ভয়াবহ দৃশ্যের যন্ত্রণা সইতে না পেরে চিৎকার করে উঠলো বিদ্যুৎ।

নিষ্ঠুর মাশ্চেরার চোখগুলো এখন সম্পূর্ণ সাদা। সে মহান মঠাধীশের বিকৃত দেহটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিদ্যুতের দিকে শীতলভাবে হাসলো, এরপর সম্মুখ লড়াইয়ে আমন্ত্রণ জানালো দেবতাকে।

* * * * *

রক্তাক্ত রাতের অন্ধকারে বেরেটা থেকে ছোঁড়া গুলির শব্দ ভেসে এলো। তাদের আরাধ্য মঠাধীশের অমানবিক হত্যায় গভীর থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে থাকা বলভান্ত

এবং ন্যায়না তাদের ক্রোধ সংবরণ করতে পারেনি। ভালো এবং মন্দ; সঠিক এবং ভুলের সমস্ত চিন্তাভাবনা ত্যাগ করে তারা নিনজাদের উপর তাদের মারাত্মক বেরেটা দিয়ে গুলি চালাতে শুরু করেছে। মাচেরা বিয়ানকাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে বলভান্ত। তার বুলেট রাক্ষসের উরুতে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এই ক্ষতটি সাদা মুখোশকে হত্যা করতে পারবে না, তবুও এই আঘাত তার লড়াইয়ের ক্ষমতা সীমিত করার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

আর সেই সামান্য পার্থক্যই যথেষ্ট ছিলো বিদ্যুতের জন্য, তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। যদিও সে নিজে গুরুতর আহত ছিলো।

বিদ্যুৎ এখন যেন রাগের মূর্ত প্রতীক। আহত অবস্থায় সে ঝাঁপিয়ে পড়লো মাচেরার উপর। সাদা মুখোশ বিদ্যুৎকে অভিবাদন জানালো একটা শক্তিশালী মুষ্টির আঘাতে। ঐ আঘাতে দেবতার চোয়াল ভেঙে যেতেই সাথে সাথে রক্তক্ষরণ শুরু হলো। সাদা চোখের দৈত্যের ঘুসি ছিলো নৃশংস। কিন্তুক্ষণিকের জন্যও নড়বড়ে না হয়ে মাচেরাকে হতবাক করে দিয়ে দেবতা তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

এবার বিদ্যুতের পালা। ইতালীয় ডনের স্থির পেটে সে তার মুষ্টি দিয়ে আঘাত করলো। আঘাতটা মাচেরার জন্যও ভয়ংকর ছিলো। যন্ত্রণায় কাশতে থাকলো সে। আবার আঘাত করলো বিদ্যুৎ, এবার তার হাঁটু দিয়ে ঠিক মাচেরার পাঁজরের মধ্যে আঘাত করলো। হাড় ভেঙে গেল মাচেরার, মাটিতে পড়ে কাঁপছে। এই আক্রমণ তার কল্পনার চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক ছিলো।

কিন্তু সে এত সহজে দমবার পাত্র নয়; কারণ সে ছিলো স্বয়ং শয়তানের দূত। মুহূর্তের মধ্যে সে উঠে দাঁড়ালো, এখন আগের চেয়েও ভয়ংকর দেখাচ্ছে। তার চেহারায় একটা অদ্ভুত ভীতিপূর্ণ ছাপ আছে। সে তার ডান হাত দিয়ে তার প্রিয় অস্ত্রটি শক্ত করে ধরে রেখেছে। সেই স্ক্রু ড্রাইভার, যেটা থেকে তখনো শাস্ত্রী বংশের রক্ত ঝরছে।

* * * * *

মাচেরা বিয়ানকা দেখলো যে বিদ্যুতের প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এর আগে যখন সে মঠে নেমেছিলো, সাদা মুখোশ চায়নি দেবতা মারা যাক। কিন্তু বিদ্যুৎ শয়তানের দূতের প্রত্যাশার চেয়েও আরো ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে এখন। দেবতার আঘাতে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সাদা মুখোশ তার উদ্দেশ্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। তার ক্রোধের কারণে সে ভুলে যাচ্ছে যে বিদ্যুতের জীবন অর্ডারের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সে বিদ্যুতের জ্বলন্ত চোখে রক্তপিপাসা দেখতে পেয়েছে।

দ্রুত সিদ্ধান্তে এলো মাশ্চেরা। হয় সে আজ বিদ্যুৎকে হত্যা করবে, নয়তো বিদ্যুৎ তাকে মঠ থেকে বেঁচে ফিরতে দেবে না।

'জাহান্নামে যাক তোর অবতার, বিদ্যুৎ...আজ আমার হাতে তোর মৃত্যু হবে, তোর বৃদ্ধের দুর্গন্ধময় লাশের পাশে!'

কথাগুলো বলেই সাদা মুখোশ দৌড়ে এসে বিদ্যুতের মুখে জোরে লাথি মারলো। বিদ্যুৎ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। মাটিতে পড়ে গিয়ে প্রায় অজ্ঞান হওয়ার অবস্থায় চলে গেল।

বিদ্যুতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সাদা মুখোশ, ওকে চেপে ধরলো মাটির সাথে। বাম হাত দিয়ে দেবতার গলা চেপে ধরেছে রাক্ষস, ডান হাত দিয়ে ধরে আছে তার প্রিয় স্ক্রু ড্রাইভার, আঘাত করার জন্য প্রস্তুত। সে স্ক্রু ড্রাইভারের মাথাটি প্রায় বিদ্যুতের চোখ স্পর্শ করে এমন দূরত্বে রেখে হিসহিস করছে।

'কল্কির জন্মস্থানের কথা আমাকে বলে দে, হাঁদারাম...তাহলে আমি তোকে দ্রুত মেরে ফেলবো। আর যদি এখনো তুই জেদ ধরে থাকিস, আমি যেভাবে তোর বৃদ্ধ বাবাকে হত্যা করেছি, তার থেকেও যন্ত্রণাদায়কভাবে তোকে হত্যা করবো...তোর প্রতিটা লোককে জবাই করবো...'

রাক্ষস তার হুমকি শেষ করার আগেই বিদ্যুৎ তাকে বাধা দিলো।

'মাশ্চেরা, তোমাকে আগেই বলেছি, বানারস ছেড়ে চলে যাও।'

ন্যায়না, বলভান্ত, নিনজা এবং মঠের যোদ্ধা-সন্ন্যাসীরা এরপর যা দেখলো, তা তারা কখনো ভুলতে পারবে না।

মাশ্চেরা বিয়ানকা একটা রৌপ্য তীর দ্বারা আঘাত করা ড্রাগনের মতো চিৎকার করে উঠলো। মাথা পেছনের দিকে মোচড় দিয়েছে, ঘাড়ের শিরাগুলোর বিস্ফোরিত হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণার কারণে তার মুখ থেকে জিহ্বা বের হয়ে গেল, এমনকি তার ক্ষুধার্ত চোখে রং ফিরে আসতে শুরু করলো। সমস্ত অস্ত্র ছিঁড়ে মাশ্চেরার পিঠ থেকে দেবতার নখরযুক্ত হাত বেরিয়ে এলো।

'আআআআরআরগগগহহ...!' চিৎকার করে উঠলো দেবতা। সে তার বাহুকে রাক্ষসের পেটের গভীরে ঠেলে দিতেই তার প্রিয় বাবার রক্তমাখা শরীরের কথা মনে পড়লো।

একের পর এক আঘাত করে যাচ্ছে সে, মাশ্চেরার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলছে। যখন তার রক্তমাখা আঙুল এবং বাহুগুলো রাক্ষসের পেছন থেকে বের হয়ে এলো, তখন সেগুলোতে সম্মুখযুদ্ধের জন্য একটা প্রাচীন, গুপ্ত শক্তিশালী অস্ত্র দেখা গেল।

ব্যাঘ্র-নখর!

সেই একই তামার-হুক যা নখরের আকারে তৈরি করা হয়েছে এবং মহান মানু পূজারি ব্যবহার করেছেন রাক্ষস রাজাকে পরাজিত করতে। সেই একই ব্যাঘ্র-নখর, যা দিয়ে মার্কন্ডেয় শাস্ত্রী মধ্যযুগীয় গোয়ায় পর্তুগিজ খুনি অ্যাগোস্টিনহোকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিলেন। ব্যাঘ্র-নখর ছিলো তার যোগ্য প্রপৌত্রের জন্য দ্বারকা শাস্ত্রীর দেওয়া শেষ উপহার। এই কারণেই বিদ্যুৎ বলভান্তের কাছ থেকে বেরেটা পিস্তল নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

'আআআআররররগগগহহহহ...!'

'ইয়াআআররররগগহহহহ...!'

'বাবাআআআআআআআ...!'

মৃত রাক্ষসের শরীরকে তার বাহু দিয়ে এখনো আঘাত করছে বিদ্যুৎ, সেই সাথে চিৎকার করছে, হাহাকার করতে করতে তার প্রপিতামহের নাম ধরে ডাকছে।

মহাপ্রলয়, খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৯৮ অব্দ
বিদ্যুৎ

'প্রথম দেখাতেই আমি তোমাকে বলেছিলাম, এই জলের কৌটার জন্য আমি তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবো, সত্যব্রত!'

মানু তাকে শক্ত আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে ছুটে গেলে মৎস্য হাসলেন। নীল-মানবটিও জড়িয়ে ধরলেন সূর্যের ছেলেকে। কে কাকে বেশি মিস করেছে বলা মুশকিল। মানুষ কি তার ঈশ্বরকে মিস করেছে? নাকি ঈশ্বর তার নশ্বর ভক্তকে মিস করেছেন?

'তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে কেন, মৎস্য? কেন?' মানু জোর দিয়ে বললো।

'আমি তোমাকে ছেড়ে যাইনি, মানু। এক মুহূর্তের জন্যও না। তোমাকে ছাড়া আমি কীভাবে থাকতে পারি, বন্ধু, আমার ভাই? আমি তোমাকে দেখছিলাম। যখন তুমি তোমার নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে শহরগুলোকে খালি করছিলে, আমি সেখানে ছিলাম। তুমি যখন এই অমর জাহাজটি তৈরি করছিলে, এমন একটা কীর্তি গড়ছিলে যা এমনকি ঈশ্বরের পক্ষেও অসম্ভব ছিলো, আমি তখন সেখানে ছিলাম। তুমি যখন দৈত্য নারা-মুন্ডাকে বধ করছিলে, আমি সেখানে ছিলাম, মানু। আমি সব সময় তোমার সাথেই ছিলাম।'

'তাহলে হে দিব্য মৎস্য, তুমি নিজেকে দেখালে না কেন? কেন তুমি আমাকে তোমার দর্শন দিয়ে আশীর্বাদ করলে না, আমার প্রভু?'

'*আমার প্রভু?* তুমি তো দেখছি বড় বড় শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করেছ, শ্রী সত্যব্রত মানু! তোমার জীবনে কোনো মেয়েমানুষের উপস্থিতিই কি এই পরিবর্তন এনেছে? হে পরাক্রমশালী যোদ্ধা, তুমি কি নরম হয়ে যাচ্ছো নাকি?' মৎস্য রসিকতা করলেন।

'আচ্ছা...তবে আমার প্রিয়তমার কাছ থেকে কড়া ধমক খেতে প্রস্তুত হও, শ্রী মৎস্য। সে আমার উপর যতটা রেগে আছে, তোমার উপরেও ঠিক ততটাই ক্ষেপে আছে। হয়তো কিছুটা বেশি।'

'এই ব্যাপারটা তো আমাকে মহাপ্রলয়ের বিপর্যয়কর ঢেউয়ের চেয়ে বেশি ভয় পাইয়ে দিচ্ছে,' নীল লোকটা বললো।

দুই বন্ধু, প্রভু এবং তার ভক্ত, ভগবানের অবতার এবং মানব জাতির ত্রাণকর্তা, পুরোনো বন্ধুর মতো হাসতে লাগলো।

* * * * *

'পাশবিক রাঙা, মেসোপটেমিয়ার তিন কালো জাদুকর, এপ, শা, গান, সুন্দর কিন্তু জঘন্য প্রিয়ংবদা, রাক্ষসরাজ সুরা এমনকি নারা-মুন্ডা...তাদের কেউই অশুভ এই অন্ধকারের কাছাকাছিও ছিলো না, যা এই গ্রহকে গ্রাস করতে চলেছে, মানু। আমরা কলিযুগে প্রবেশ করেছি, আর এই যুগে পৃথিবী হিংসা, প্রতারণা, চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা, মৃত্যু এবং ধ্বংসের একটা বিশৃঙ্খল স্থানে রূপান্তরিত হবে। তুমি মানব জাতিকে বেঁচে থাকার একটা নতুন ভোরে নিয়ে যাচ্ছো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'কিন্তু প্রলয়ের ওপারে আমাদের জন্য যা অপেক্ষা করছে তা হলো এমন এক পৃথিবী যেখানে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তারা বন ধ্বংস করবে, নদী শুকিয়ে ফেলবে, আকাশকে বিষাক্ত করবে এবং গণহত্যার অস্ত্র ব্যবহার করে রক্ত ঝরাবে। নারা-মুন্ডা একবারে একজনকে হত্যা করেছে...তাও শুধু তার নিজের বেঁচে থাকা এবং তার সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু কলিযুগে পুরুষরা ক্ষণস্থায়ী সিংহাসনের অতৃপ্ত লালসা পূরণের জন্য হাজার হাজার নিরপরাধ নারী-শিশুকে নিশ্চিহ্ন করবে।'

তারা জাহাজের একটা উঁচু ডেকের কাছে দাঁড়িয়ে মৎস্য-উপজাতির তৈরি সুস্বাদু ওয়াইন পান করছে। মৎস্য তার বন্ধুর জন্য বিশেষভাবে এটা নিয়ে এসেছেন। তারাও তাদের সাথে ছিলো। বেশ কয়েক দিন কেটে গেছে, ঝড় ধীরে ধীরে কমে আসছে, আর ঢেউয়ের তীব্রতাও তুলনামূলক কম বিপজ্জনক লাগছে।

জাহাজের নেতারা জানতো যে তাদের সামনে এখন একটাই কঠিন কাজ, বিপজ্জনক প্রলয়কে এগিয়ে যেতে দেখা। কিন্তু তারা সবাই আশা করছে, অনুভব করছে যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি শেষ হয়ে গেছে।

'আমাদের জন্য তোমার আদেশ কী, মৎস্য? এমন অন্ধকার যুগ মোকাবেলা করতে আমি আর তারা কী করতে পারি?' মানু জিজ্ঞেস করলো।

মৎস্য হেসে তাদের দিকে তাকিয়ে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি তার মুখের উপর পড়ছে।

'তোমাদের কাঁধে এখন অনেক দায়িত্ব, তোমাদের দুজনেরই,' মৎস্য বললো। 'তোমাদের সন্তান এবং তাদের সন্তানরা মানব জাতির জন্য শেষ আশার রশ্মির প্রতিনিধিত্ব করবে।'

শতরূপা তার ওয়াইনে এক চুমুক দিতেই লজ্জা পেয়ে গেল।

'কে বলেছে আমি এই পাগল ছেলেকে বিয়ে করবো, মৎস্য? তার সাথে সন্তান তো অনেক পরের কথা,' সে দুষ্টুমির স্বরে বললো।

মৎস্য হেসে উঠলেন, শতরূপার মানুকে উন্মুক্ত করা উপভোগ করছেন।

'আমি একমত, এই বেপরোয়া লোকটিকে বিয়ে কোরো না, জায়া,' মৎস্য বললেন। 'সে একটু বেশিই পাগলাটে, কী বলো?'

বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো হাসতে শুরু করেছে তিনজনেই। মৎস্য আর তারা উভয়েই জানে যে তারা মানুকে কতটা ভালোবাসে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

* * * * *

'রত্ন-মরু তলোয়ার সুরক্ষিত রাখবে, সত্যব্রত। এটা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তোমার বংশধরদের মাধ্যমে সুরক্ষায় থাকবে। এই ঐশ্বরিক অস্ত্রটির ভগবান বিষ্ণুর শেষ অবতারের কাছে পৌঁছানোর জন্য সৃষ্টি হয়েছে। পাপ ও অশুভ শক্তি যখন তাদের সীমা অতিক্রম করবে, তখন তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। কলিযুগের শেষ সময়ে কল্কি অবতারের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বে তুমি আর তোমার বংশধারা এটা রক্ষা করবে।'

তারা আর মানু একে অপরের দিকে তাকালো। কল্কি নামটা একাই তাদের ভেতরটা নাড়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

'তুমি যেমন বলবে, মৎস্য। স্বর্গীয় তলোয়ারকে নিরাপদ রাখতে আমরা কোনো কসুর রাখবো না। তুমি এইমাত্র যা বর্ণনা করলে এমন অন্ধকার ভবিষ্যৎ

থেকে মানব জাতিকে বাঁচাতে আমাদের আর কিছু করতে হবে?'

মৎস্য মাথা নেড়ে দূরের বিশাল ঢেউয়ের দিকে তাকালো।

'তুমি আটকাতে পারবে না, মানু। কিন্তু দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবে না। মহাপ্রলয়ের পরের ভোরও নানা দিক থেকে মানব জাতির জন্য স্বর্ণযুগ। তখন মানুষ আকাশ জয় করবে, পাখির মতো উড়বে। মানুষ সমুদ্রের হৃদয়ে যাবে, জলের গভীরে রথ চালাবে। সম্পদ আর প্রজ্ঞার কোনো সীমা থাকবে না। আজ যা বোধগম্য নয়, বিজ্ঞান তা অর্জন করবে। মানুষ এমন উঁচুতে লাফ দেবে যে এমনকি চন্দ্র আর মঙ্গলকে পর্যন্ত স্পর্শ করে ফেলবে। এবং তারা যখন সমৃদ্ধি ও জ্ঞান, দারিদ্র্য ও হিংসা, রোগ ও অগ্রগতির শীর্ষস্থানে পৌঁছাবে...তখনই হরপ্পার সূর্য, মহান বিভাসন পূজারির আবার জন্ম হবে। তোমার বংশধরদের একজন হয়ে, মানু। সে হবে তোমার রক্তরেখার মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

* * * * *

'কালো মন্দিরের যে স্ক্রলটি হরপ্পা লিপিতে পুনঃলিখন করেছ, মানু, সেটাই হবে কলিযুগের সবচেয়ে বড় রহস্য। এটাকে নিরাপদে রাখো। কালো মন্দির তৈরি করো, আর তাতে এই মূল্যবান স্ক্রলটি লুকিয়ে রাখবে। তুমি কি জানো যে প্রলয় সমস্ত পরিচিত আর্যাবর্তকে গ্রাস করে ফেললেও এর বাইরে একটা পবিত্র শহর আছে যা এখনো অস্পৃশ্য রয়ে গেছে?'

'অস্পৃশ্য? আমি তো ভেবেছিলাম মহাপ্রলয় সমগ্র গ্রহকে ডুবিয়ে দিয়েছে!'

মৎস্য আবার হাসলো, কিছুক্ষণ থেমে চোখ বন্ধ করলো। সে তার পরবর্তী কথা বলার আগে কারো কাছে প্রার্থনা করছে বলে মনে হলো।

'শিবের ত্রিশূলের ডগায় থাকা শহরকে ডুবিয়ে দিতে পারে, মানু? কাশীকে ডুবাতে পারে? মহাপ্রলয় কমে গেলে সেখানে যাও। এখন থেকে হাজার হাজার বছর পর কাশী শহরেই তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ বংশধর, তোমার মহৎ পিতার পুনর্জন্ম হবে। সে-ই কালো মন্দিরের রহস্য উন্মোচন করবে এবং কল্কিকে পৃথিবীতে স্বাগত জানাবে। অবতারের তেরো বছর না হওয়া পর্যন্ত এবং রত্ন-মরুর সাথে একত্র না হওয়া পর্যন্ত সে-ই কল্কিকে রক্ষা করবে। এই ঐশ্বরিক কাজের জন্যই এই মহৎ মানুষ, এই দেবতাকে পৃথিবীতে আবার পাঠানো হবে।'

কয়েক মুহূর্ত সবাই নীরব রইলো। এরপর তারা মৎস্যের দিকে ফিরে তার মনে কয়েক মিনিট ধরে ঘুরতে থাকা প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলো।

'আমাদের এই মহান বংশধর সম্পর্কে বলো, মৎস্য। যে কলিযুগে, কাশীতে স্কলটি উন্মোচন করবে। সে কেমন হবে?'

মৎস্য মুচকি হেসে তার গ্লাসের অবশিষ্ট ওয়াইনটুকু শেষ করলো। বালকসুলভ আচরণে গ্লাসটি পানিতে ফেলে দিলো সে। তারা আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো; কারণ জাহাজের প্রতিটি বস্তু হিসেব করা।

'কী বলবো, তারা? সে অসাধারণ হবে। পুরুষদের মধ্যে একটা হীরা হবে। একজন যোদ্ধা, একজন যোগী, একজন প্রেমিক, একজন মোহনীয় ব্যক্তি এবং একজন নেতা। সে হবে অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ঈশ্বর।'

কিছুক্ষণ থেমে মৎস্য তার আগের বর্ণনায় যোগ করলেন, 'তুমি হয়তো বলবে, তাহলে তো সে হবে বিদ্যুতের মতো। আসলেও তাই। সে হবে...বিদ্যুৎ।'

বানারস, ২০১৭
বিদ্যুৎ

ছাই পবিত্র জলের উপরিভাগে ভেসে উঠলো। এ ছিলো মহান দ্বারকা শাস্ত্রীর জন্য একটা উপযুক্ত সমাপ্তি। কারণ তার আত্মা এই জীবন থেকে অন্য জীবনে চলে গেছে। তিনি ত্রয়ম্বকেশ্বর শহরে মৃত্যুবরণ করেছেন। বিশ্বাস করা হয় যে কাশী শহরে যারা মারা যায়, স্বয়ং ভগবান শিব তাদের কানে পরিত্রাণের মন্ত্রটি ফিসফিস করে বলেন। বিদ্যুৎ তার প্রপিতামহের প্রতিটি কণা পবিত্র গঙ্গায় বিলীন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। পুরোহিতজি এবং দেব-রাক্ষস মঠের অন্যান্য যোগীদের নির্দেশনায় তিনি মহান মঠাধীশের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছেন। ছোট ছোট স্মৃতি মনে করে তার হৃদয় কেঁদে উঠছিলো। তার প্রপিতামহের প্রতিটি স্মৃতি তার চোখে ভাসছে। মহান মঠাধীশের সাথে তার প্রথম দেখা হয়েছে দুই দশকেরও বেশি সময় পর মঠে এসে। তার মনে পড়লো কীভাবে তিনি তাকে আদর করে খাইয়ে দিয়েছেন। দ্বারকা শাস্ত্রী কীভাবে বিশ্বাস করেছেন যে বিদ্যুৎই তাকে মার্কেশের বিরুদ্ধে রক্ষা করেছে।

গভীর দুঃখ গ্রাস করছে বিদ্যুৎকে। শৈশবে তার পিতামাতাকে দ্রুত হারানোর পরে এটাই ছিলো দেবতার দুই দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দ্বারকা শাস্ত্রীই ছিলেন তার একমাত্র পরিবার।

অনেকগুলো বছর পর আবারো হঠাৎ করেই তার নিজেকে এতিম মনে হচ্ছে।

* * * * *

'আমাদের এখন চলে যাওয়া উচিত, বাছা।' কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর পুরোহিতজি এসে দেবতার কাঁধে হাত রাখলেন। 'তাকে শান্তিতে এই দুনিয়া ছেড়ে

চলে যেতে দাও, বিদ্যুৎ। যত বেশি শোক করবে, তার জন্য চলে যাওয়া তত কঠিন হবে।'

'হ্যাঁ, পুরোহিতজি...আমি বুঝতে পেরেছি,' উত্তর দিলো বিদ্যুৎ। এরপর সে তার প্রপিতামহের ম্লান দেহাবশেষের দিকে হাতজোড় করে শেষ প্রণাম করলো।

* * * * *

'এখন কী, পুরোহিতজি?' জিজ্ঞেস করলো বিদ্যুৎ।

তারা দশাশ্বমেদ ঘাটের সিঁড়িতে বসে ছিলো, পবিত্র নদী থেকে প্রবল বাতাস তাদের মুখ ও চুলে এসে লাগছে।

'অর্ডার এখন তাদের মিশন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবে...অন্তত কিছু সময়ের জন্য, বিদ্যুৎ। রুমি, ত্রিজাত এবং মাচেরাকে কয়েক দিনের মধ্যে শেষ করে দিয়ে তুমি তাদের প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছ। তাদের পুনরায় দলবদ্ধ হতে সময় লাগবে, আর তারা দলবদ্ধ হবেও। ওরা সব সময় এটা করে। ধৈর্য এমন একটা গুণ যার অভাব তাদের কখনো হয় না। কিন্তু যখন তারা পালটা আক্রমণ করবে, তখন আমরা যা দেখেছি তার চেয়ে কঠিন এবং আরো ভয়ংকর হবে।'

সনু তাদের জন্য পান্নার গ্লাসে করে মশলাদার আম এনেছে। এক ধরনের সতেজ কাঁচা আমের পানীয়।

'ধন্যবাদ, সনু,' বিদ্যুৎ বললো। একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিলো পুরোহিতজির দিকে।

'বাবা ছাড়া আমাদের পক্ষে তাদের সাথে লড়াই করা খুব কঠিন হবে, পুরোহিতজি। কে আমাদের নেতৃত্ব দেবে?'

পুরোহিতজি মুখে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি নিয়ে বিদ্যুতের দিকে ফিরলেন। 'আমাদের নতুন মঠাধীশ আমাদের নেতৃত্ব দেবে, বিদ্যুৎ। পরাক্রমশালী দ্বারকা শাস্ত্রীর উত্তরসূরি আমাদের নেতৃত্ব দেবে। তুমি আমাদের নেতৃত্ব দেবে, হে দেবতা।'

* * * * *

'কল্কি শুধু হিন্দুদের জন্য আসছেন না। তিনি মুসলিম বা খ্রিষ্টানদের জন্যও আসছেন না। শিখ বা ইহুদিদের জন্যও না। তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য

আসছেন! ভগবান বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধ যেমন সকলের জন্য এসেছিলেন, তেমনি কল্কি প্রতিটা ধার্মিক আত্মা, প্রতিটা ধার্মিক মানুষ এবং প্রতিটা নির্দোষ ব্যক্তিকে রক্ষা করবেন।'

বিদ্যুৎ গভীর একাগ্রতার সাথে পুরোহিতজির কথা শুনছে। তার প্রপিতামহের পরে এই জ্ঞানী পুরোহিতকে দেবতা বিশ্বাস করে।

'যাই হোক, এখন তোমার পরিকল্পনা কী, বাছা?' প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করলেন দেব-রাক্ষস মঠের বিজ্ঞ পুরোহিত। তিনি জানেন যে এরই মধ্যে বিদ্যুৎকে অনেক কিছু পার হতে হয়েছে।

'আহ...ঠিক আছে, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই, পুরোহিতজি,' দেবতা জবাব দিলো। 'আমি কাজে ফিরে যাবো এবং আমার কোম্পানিতে জিনিসগুলো ঠিক করার জন্য কয়েক দিন ব্যয় করবো। তারপর আমি সেখানে চলে যাবো যেখানে অবতারের জন্ম হয়েছে, এবং আমার বাকি বছরগুলো তার দেখাশোনা করে, তাকে রক্ষা করে কাটিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আমি একটা বিলাসবহুল জিনিস ব্যবহার করবো। আমার অফিস আমার জন্য একটা সুপার-বাইক সংগ্রহ করবে। বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী মোটরসাইকেল। আমার চাহিদা ও নির্দেশনা অনুযায়ী তৈরি করা হচ্ছে বাইকটা। এটাতে একটা দুর্দান্ত ডুয়াল-ডাক্ট ইঞ্জিন রয়েছে, যার কারণে আমার স্থানীয় মেকানিক বাবলু বাইকটিকে দেবদূত বা দেবদাস বা অন্য কিছু বলে ডাকে। কারণ সে কখনোই ডুয়াল-ডাক্ট শব্দটা ঠিকঠাক উচ্চারণ করতে পারে না।'

পুরোহিতজি হেসে মাথা নাড়লেন। তিনি সুস্বাদু আমের জুস পান করলেন। তারপর সহজভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর দামিনীর কী হবে?'

* * * * *

বিদ্যুৎ দামিনীর হাত ধরলো, আগের চেয়ে শক্ত করে। দেবতার পরিকল্পনা শুনে দামিনী কিছুটা ক্ষিপ্ত হয়েছে, সাথে বিরক্তও হয়েছে। দেবতা কল্কিকে রক্ষা করার জন্য তার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে–অবতার তেরো বছর বয়সে পৌঁছানো পর্যন্ত এবং তার পরেও। দামিনী তাকে এই বিপজ্জনক এবং ত্যাগী জীবন-পরিকল্পনা থেকে বিরত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

'তুমি কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময়ও তার দেখাশোনা করতে পারো, বিদ্যুৎ। তোমাকে সপ্তাহে দুই দিন তোমার কোম্পানিতে কাটাতে হবে। তুমি প্রভুর সুরক্ষার জন্য একটা নিরাপত্তা দল তৈরি করতে পারো। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, জায়গাটা পরিদর্শন করতে পারো প্রতি...'

'আমাকে বিয়ে করবে, দামিনী?'

'তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো না...আরো ভালো উপায় আছে...' বিদ্যুতের প্রশ্ন তার মাথাতে ঢুকতেই সে চুপ হয়ে গেল। 'কীইই...কী বললে বিদ্যুৎ?' সে মনে মনে প্রার্থনা করছে যে যা শুনেছে তা যেন সঠিক হয়ে থাকে।

'আমাকে বিয়ে করো, দামিনী। তোমাকে ছাড়া আমি এই পথ পাড়ি দিতে পারবো না।'

দিল্লির সুন্দরী সাংবাদিক চোখের জল ধরে রাখতে পারলো না।

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...হাজারবার হ্যাঁ, বিদ্যুৎ। আমি তোমাকে বিয়ে করবো...বোকা ছেলে!'

* * * * *

দেব-রাক্ষস মঠের সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে বিদ্যুৎ। তাদের দেবতাকে চলে যেতে দেখে মঠের পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা কাঁদছে। এরা সকলেই নিঃসন্দেহে জানতো, বিদ্যুৎ দেব-রাক্ষস মঠের নতুন মঠাধীশ।

বলভান্ত, সনু এবং গোবর্ধনের মতো তার প্রিয়জনকে বিদায় জানানোর পরে দেবতা তার দেখা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির মুখোমুখি হলো।

'উফ...কেন তুমি আমার সাথে এমন করলে, নাইনু?' সে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পরম সুন্দরীকে উত্ত্যক্ত করার জন্য বললো।

'ধুর, বাদ দাও...আমি নিশ্চিত গুরগাঁওয়ের প্রতিটা পাবের প্রতিটা মেয়ে তোমার হৃদয়কে দোলা দেয়, বিদ্যুৎ,' সে চোখ ঘুরিয়ে জবাব দিলো।

ও তাকে পরিমাপের উর্ধ্বে ভালোবাসে। আগে তাকে যতটা চাইতো, এখনো ঠিক ততটাই চায়।

বিদ্যুৎ হেসে উঠলো। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গম্ভীর হয়ে গেল; কারণ সে লক্ষ করলো ন্যায়নার চোখ তার সাথে হাসছে না।

'শুধু এটা জেনে রেখো, ন্যায়না, তুমিই একমাত্র মেয়ে যার প্রেমে আমি প্রায় পড়েই গেছিলাম...যেখানে আমার প্রেমে পড়াই উচিত ছিলো না।'

ন্যায়না তাকে একটা ক্লান্ত হাসি উপহার দিলো, যেমনটা সুন্দরী মেয়েরা সাধারণত মিথ্যা অবজ্ঞা দেখাতে দেয়। কিন্তু তারপর সে বুঝতে পারলো যে এটাই সম্ভবত দীর্ঘ সময়ের জন্য ওদের শেষ দেখা।

'শুধু এটা জেনে রেখো, বিদ্যুৎ...আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর সব সময়ই বাসবো।'

দেবতার গালে চুমু দিলো সে। আর তারপর দেবতাও চুমু দিলো তাকে।

* * * * *

রুপালি-সাদা ট্যাংকের মোটরবাইকটি এর অসাধারণ শক্তিশালী ইঞ্জিনের গর্জনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। সবাইকে শেষবারের মতো বিদায় জানাচ্ছিলো বিদ্যুৎ, এমন সময় পুরোহিতজির হঠাৎ এমন একটা তথ্য মনে পড়ে গেল যা আগে কখনো তার মাথায় আসেনি। আর সেটা মনে করেই পৃথিবীর শেষ দেবতাকে বিদায় জানানোর সময় তিনি পরম সুখে হাসলেন।

শাস্ত্রমতে, ডুয়াল-ডাষ্ট বা দেবদূত হলো কোনো এক ঐশ্বরিক সত্তার বাহনের নাম।

যার অর্থ, ভগবান কল্কির বাহন হতে যাচ্ছে এটা।

সমাপ্ত

নতুন শুরু...

উপসংহার

এই ঝড়ের রাতে তাকে ভূতের মতো লাগছে।

তার চারটা অঙ্গ ঘোরাঘুরি করছে এক কবর থেকে অন্য কবরে। তীব্র বৃষ্টি ও বাতাস এই মধ্যযুগীয় গোরস্থানের কবরগুলোকে ধুয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে তার পরোয়া করছে না।

তার হাতে একটা ছোট কেরোসিন বাতি, যা সে তার জীবন দিয়ে পাহারা দিচ্ছে। মনে হচ্ছে সে তার ঘৃণ্য কালো আচারের জন্য সঠিক মৃতদেহ খুঁজছে। তাকে দেখে আর মানুষ মনে হচ্ছে না, বরং তাকে জীবিত থেকে মৃতই বেশি মনে হচ্ছে। তার নোংরা চুলগুলো এলোমেলো, কপালের উপর থেকে গালে এসে পড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো অন্ধকার অশুভ শক্তি ভর করেছে তার উপর।

অবশেষে সে দূর থেকে ওটাকে দেখতে পেয়ে পাগলাটে উল্লাসে সেদিকে গেল। তার চারটা অঙ্গই এলোমেলোভাবে লাফাচ্ছে। অদ্ভুতভাবে বাঁকানো আঙুল দিয়ে সমাধি ফলকের উপর থেকে মাটি এবং বৃষ্টির জল পরিষ্কার করলো সে, কেবল এপিটাফে খোদাই করা নামটি নিশ্চিত করার জন্য।

অন্ধকার শাস্ত্রে উল্লিখিত শক্তিশালী সারকোফ্যাগাস খুঁজে পেয়ে সন্তুষ্ট হলো সে। নোংরা আঙুলের নখ দিয়ে কবর খনন শুরু করার আগে চাঁদহীন রাতের দিকে তাকিয়ে আদিম জাদুকরের মতো গর্জে উঠলো।

ঘিঞ্জি কবর খুঁড়ে চারপাশে মুষ্টিমেয় ভেজা মাটি ছুঁড়ে ফেললো সে, এরপর ঘোরের মধ্যে কিছু বিড়বিড় করলো, যেন অনেক দূরের কারো সাথে যোগাযোগ করছে। তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো অন্য কোনো জাগতিক শক্তিকে আহ্বান করছে, পৃথিবীতে ডাকছে।

'ওঠো!' বিড়বিড় করছে সে। 'পৃথিবীর হৃদয়কে চিরে দাও, উঠে এসো এর কালো গভীরতা থেকে!' ঝড়বৃষ্টির নিচে তার চোখগুলো পাগলামিতে চকচক করছে।

'ওঠো, লুসিফার!'

ব্রহ্মানন্দ জানতো যে কলিযুগের ত্রাণকর্তাকে কেবল শয়তান নিজেই থামাতে পারে।

আর সেজন্যই শয়তানকে পৃথিবীতে ডাকছে সে।

❖

নিজাম উদ্দিন অপু জন্মগ্রহণ করেন ১৯৯৮ সালে ২৫ শে সেপ্টেম্বর। তার বেড়ে ওঠা মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত ঝাউচর গ্রামে। তিনি সোনারগাঁ স্টার ফ্লাওয়ার এস. আর স্কুল & কলেজ থেকে এস. এস.সি ও এইচ.এস.সি পাশ করেছেন। সম্প্রতি হামদার্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন। বই পড়ার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা থেকেই মূলত অনুবাদের দিকে আকৃষ্ট হওয়া।

১৬৯৯ খ্রিষ্টপূর্ব, আর্যাবর্তের জলাশয়- প্রলয়ের দৈত্যাকার ঢেউগুলো যখন শহরের পর শহর গ্রাস করতে শুরু করে, জাহাজ ও পৃথিবীর মধ্যকার চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। একজন ভয়ঙ্কর বর্বর রাজা মানবজাতির অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে এবং কলিযুগের সূচনা করে।

২০১৭, বেনারস- রাতের আকাশে ভবিষ্যদ্বাণীকৃত সময়ে পবিত্র নক্ষত্র ভেসে ওঠে। একটি দেবতা-বলি যা একটি ভয়ঙ্কর রাক্ষসবলিতে পরিণত হয়, যেখানে দেবতা একটি অশুভ গোপন ভ্রাতৃসংঘের রক্তাক্ত উপাখ্যান উন্মোচিত করে।

৭৬২ খ্রিষ্টাব্দ, রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের পরাক্রমশালী পৃথ্বীবল্লভের কাছে পবিত্র শহর থেকে একজন রহস্যময় দর্শনার্থী উপস্থিত হন। তার রাজ্যের উপর একটি প্রাচীন গোপনীয়তাকে সংরক্ষণ করার ভার দেওয়া হয়েছে এবং তাকে একটি অসম্ভব ও কিংবদন্তি অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ কি ভ্রাতৃসংঘের সাথে তার সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধে টিকে থাকতে পারবে ? ইউরোপের চতুর্দশ শতকের ব্ল্যাক ডেথের পিছনে ভয়ঙ্কর সত্য কী? আলো এবং অন্ধকার, ভাল এবং মন্দ, ঈশ্বর এবং দানবদের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধের সাক্ষী হতে বইটি পড়ুন।

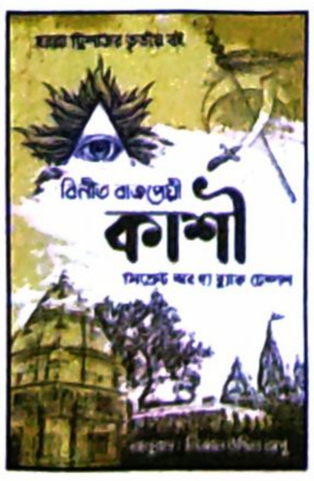

কাশী
সিক্রেট অব দ্য ব্ল্যাক টেম্পল
বিনীত বাজপেয়ী
অনুবাদ : নিজাম উদ্দিন অপু
প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন

নয়া উদ্যোগ
Facebook.com/নয়া উদ্যোগ পাবলিকেশন্স
email: nayaudyogdhaka@gmail.com
শোরুম: ৩৮/এ এন আলী টাওয়ার, ২য় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN
9 789849 699316